প্রথম প্রকাশ —১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

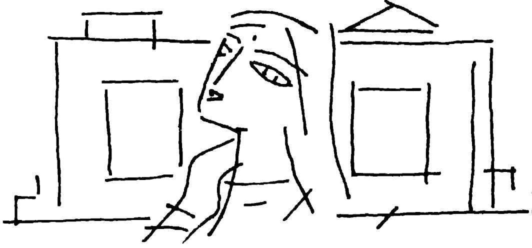
মুদ্রক :
শ্রীরণজিৎ সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

সূচী



# বাড়ি বদলে যায়





১

ধ্রুবর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। অথচ ওর সঙ্গে এ ব্যাপারটার কি সম্পর্ক। একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ। ভদ্রলোকের মুখ ও কোনওদিন দেখেছে কিনা জানে না। ভদ্রলোক যে এ পাড়ায় ছিলেন তাও জানত না, এবং জানার কোনওদিন প্রয়োজনও হয়নি। হয়তো এই মুহূর্তে ওঁকে দেখতে পেলে মনে পড়ত কোনওদিন আসা-যাওয়ার পথে দেখেছে কিনা। হতে পারে এই রাস্তায়, কিংবা দোকানে-বাজারে ওঁকে প্রায়ই দেখতে পেত। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সকলেই আছে, শুধু ভদ্রলোক নেই। থাকলেও বোধহয় চিনতে পারত না, কারণ ধ্রুব হাঁটাচলার পথে চোখ তুলে বড় একটা কারও মুখের দিকে তাকায় না। লোকজনকে এড়িয়ে চলাই ওর চরিত্র। পাড়ার কেউ ডেকে দু'একটা কথা বলতে চাইলেও হ্যাঁ না গোছের ক্ষুদ্র বাক্যে ভদ্রতা সারে, বড় জোর মুখে একটু স্মিত হাসি। ওটুকুও বানানো সৌজন্য। আসলে মানুষকে এড়িয়ে চলাই ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, অথচ লোকে ভাবে এটা ওর অহঙ্কার। ধ্রুব নিজের মনেই হাসে, যখন আত্মীয়স্বজন কেউ এসে তেমন একটা অভিযোগ করে। কি নিয়ে অহঙ্কার করবে ও, কি আছে অহঙ্কৃত হবার মতো।

লোকটির কোনও পরিচয়ই যে জানত না, তাও স্বভাবের দোষে।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ধ্রুব হনহন করে বাড়ি ফিরছিল, কিছুটা দেরি হয়ে গেছে বলে, কিছুটা চড়া রোদ্দুরের জন্যে। এই গলি দিয়ে এলে পথ অনেকখানি সংক্ষেপ করা যায়, তাই এদিক দিয়েই ওর যাতায়াত। বাস থেকে নেমে বকুলবাগানের বাড়িতে পৌঁছতে সময়ও লাগে, অনেকখানি হাঁটতেও হয়।

হনহন করে হেঁটেই আসছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। নিছক কৌতূহল ছাড়া তখন আর কিছুই ছিল না। শুধু পথচারী দু'একজনের মুখের দিকে তাকাল, তাদের চোখেও কৌতূহল।

ডানদিক থেকে আরেকটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে, সেটুকু পার হওয়ার সময়েই ওর হঠাৎ চোখে পড়ল। সামান্য কিছু লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তা দেখে ভিড়ের

মধ্যে ঢুকে পড়ার মানুষ ও নয়। কোলকাতার রাস্তাঘাটে জটলা তো লেগেই আছে, সেসব দেখে সারস পক্ষীটির মতো গলা বাড়িয়ে রহস্যের হদিস পাবার চেষ্টা করে না ধ্রুব। ও বরং এসব এড়িয়েই যায়। কিন্তু ওকেও থমকে দাঁড়াতে হল।

চুম্বকের মতো একটা আকর্ষণে ও এগিয়ে গেল। কারণ দৃশ্যটার দিকে চোখ পড়তেই ওর বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠেছে। আকস্মিক কোনও ভয় যেন মুহূর্তে ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

দ্রুত পায়ে ও সেদিকে এগিয়ে গেল।

এ রাস্তায় ফুটপাথ নেই বললেই চলে, তবে রাস্তাটা গলির মতো নিতান্ত সরু নয়। তারই অর্ধেক জুড়ে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে একটি সংসারের যাবতীয় আসবাব। কেউ যেন ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যে ছুড়ে ছুড়ে বের করে দিয়েছে।

খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবল, বুক কেস। ত্রিভঙ্গ হয়ে পড়ে আছে নারকেল ছোবড়ার পুরু গদি। আর চারপাশ ঘিরে বালতি, মগ, হাঁড়িকুড়ি, রাশি রাশি মসলাপাতির কৌটো। একটা পুরোনো টিন টলে পড়েছে, তা থেকে গড়িয়ে পড়ছে সরষের তেল। একজন কে গিয়ে সেটা সোজা করে বসিয়ে দিল।

ধ্রুব ততক্ষণে ভিড়ের ফাঁকে উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। নিজেরই মনে হ'ল ওর মুখ কি এক অজানা আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেই মুখ অন্যকে দেখাতেও যেন ভয়।

বিস্ময়ের চোখে ও তন্ন তন্ন করে জিনিসগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিল। অস্ফুটে বলে উঠল, ইস্!

এক কোণে একটা তোলা উনোন, কেউ জ্বলন্ত উনোনে জল ঢেলে দিয়েছে। আর তারই আশেপাশে কড়াইয়ে আধ-রান্না কিছু একটা তরিতরকারি, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা কাত্ হয়ে পড়ে আছে, তা থেকে ভাত গড়িয়ে পড়েছে ফুটপাথে।

একজন কে পিছন থেকে ধ্রুবকে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে মশাই?

ধ্রুব কোনও উত্তর দিল না। প্রশ্নটা তো ওরও।

পাশেই প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকানো ছেলেটি, বলে উঠল, শালা ছোটলোক, রান্না ভাতটুকুও খেতে দেয়নি।

আরেকজন ও প্রান্ত থেকে বললে, কি অবস্থা বেচারিদের।

তার গলার স্বরে বিষণ্নতা মাখানো।

ততক্ষণে ধ্রুবর চোখ পড়ল বেশ কিছুটা দূরে একজন ভদ্রমহিলা, সঙ্গে দুটি বাচ্চা ছেলে, একটি ফ্রক পরা মেয়ে। ওরা সকলেই অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। ভদ্রমহিলা মুখ নিচু করে আছেন, লজ্জায়। পাড়ার এত লোকের সামনে এমনভাবে অপদস্থ হওয়ার লজ্জা? কিংবা কে জানে, এখন তো ওঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, হয়তো লজ্জা-অপমানের বোধটুকুও আর নেই।

ব্যাপারটা কি, বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকানো ছেলেটি হঠাৎ বললে, ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?

ওপাশের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধ লোকটি জবাব দিলেন, শুনছি তিনি তো সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেছেন। হয়তো কোর্টে।

হাতে ব্রীফ কেস ঝোলানো কাঁচাপাকা চুলের লোকটি বললে, কোর্টে গিয়ে আর এখন কি হবে, হয়তো কোনও আস্তানার খোঁজে।

না, ধ্রুব একজনও চেনা লোক দেখতে পেল না। শেষে ওই ব্রীফ কেস হাতে লোকটিকেই জিগ্যেস করল, কি হয়েছে? জানেন কিছু?

লোকটি ভারী ব্রীফ কেস হাতে ঝুলিয়েও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে, দেখে বুঝতে পারছেন না ? ইজেক্টমেন্ট। ভাড়াটে উচ্ছেদ।

বুঝতে যে পারছিল না, তা নয়। তবু কথাটা যেন শুনতে চাইছিল না। অন্য কিছু শুনতে পেলে খুশি হত। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর কথাটাই শুনতে হল। ইজেক্টমেন্ট।

একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ, সে লোকটির মুখও দেখেনি ধ্রুব, কেমন চরিত্রের মানুষ, ভাল না মন্দ, কিছুই জানে না, তবু ওর বুকের মধ্যে আধখানা জুড়ে যেখানে আতঙ্ক শিকড় গেড়েছে, তারই পাশে অসহায় অচেনা মানুষটির জন্যে সমবেদনা উথলে উঠল।

ধ্রুব ধীরে ধীরে বললে, ওঁদের কেউ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসতে দিলেও তো পারত।

ধুতি পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধের কানে গেল কথাটা। তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলেন, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসতে দেবে ? পাড়ার কেউ আসেনি মশাই, কেউ আসেনি। শুধু দোতলা তিনতলা থেকে উঁকি দিয়েই সরে যাচ্ছে।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকানো ছেলেটি প্রতিবাদ করল। —পাশের বাড়ির লোক তো ডাকতে এসেছিল, ওঁরাই যাননি।

ঠিক তখনই দেখা গেল, একটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বছর আঠারো কুড়ির একটি মেয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলার কাছে গেল। কিছু বলল। হাত ধরে ডাকল। ভদ্রমহিলা প্রথমটা না না করে শেষে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার সঙ্গে চলে গেলেন।

ওঁরা চলে যেতেই রাস্তায় পড়ে থাকা খাট, আলমারি, বুককেস, জল ঢালা তোলা উনোন, ভাত গড়িয়ে পড়া অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি রাস্তার একপাশে বিস্ময়ের, আতঙ্কের একটা বিশাল প্রশ্নচিহ্ন হয়ে পড়ে রইল।

একে একে সকলেই চলে যাচ্ছিল। ধ্রুব দেখল, ওরা কেউই পাড়ার লোক নয়। ধ্রুবর মতোই পথ দিয়ে যেতে যেতে হয়তো দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ধ্রুবও চলে এল। কিন্তু দৃশ্যটা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারল না।

লোকটি অচেনা। সরল নিরপরাধ শান্তশিষ্ট সংসারী মানুষ, না জটিল ধুরন্ধর প্রকৃতির, তাও জানে না। তবু, নিজেরই অজান্তে কি ভাবে যেন অদেখা মানুষটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

পাড়ার কেউ এগিয়ে আসেনি। এসে থাকলেও দু'একজন। অথচ কেন ? মানুষটি যত খারাপই হোক, এই দুঃসময়ে দুটো মুখের কথার সমবেদনা জানাবে না ? বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে দুদণ্ড বসতে দেবে না ? এই কৌতূহলী জনতার চোখের সামনে উপহাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ?

ধ্রুব কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। এটা যদি ধ্রুবরই পাড়ার ঘটনা হত, ও কি এগিয়ে যেত ? বলত, আসুন আমাদের বাড়িতে ? ছেলেমেয়েদের বলত, এসো। তোমাদের বাবা যতক্ষণ না ফিরে আসেন...

ধ্রুব বুঝতে পারল না।

এখন তো পাড়ার মধ্যে এরা অচ্ছুত হয়ে গেছে। লাঞ্ছিত, অপমানিত একটি মানুষের সঙ্গ থেকে সকলেই দূরে সরে থাকতে চায়। পাছে তার গায়েও সেই অপমানের ছিটে লাগে। না কি ভয় ? এ রাস্তার বেশির ভাগই তো ভাড়াটে। দোতলা তিনতলা বাড়ির সারি। বাড়িওয়ালা ওপরে থাকেন। নীচের একতলা দোতলা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়াটেরা একা একা বাড়িওয়ালাকে তোয়াজ করে চলার চেষ্টা করে। উচ্ছেদ হওয়া ভাড়াটের পাশে এসে দাঁড়ালে বাড়িওয়ালা রুষ্ট হবে সেই ভয় থেকেই কি কেউ এসে দাঁড়ায়নি।

অসম্ভব। বাড়িওয়ালাকে আজকাল কেউ এত ভয় পায় নাকি ?

আসলে তা নয়। ভদ্রমহিলাই হয়তো যেতে চাননি। ওঁর সর্বাঙ্গে তো এখন অসীম লজ্জা। দু'দিন আগে যাদের সঙ্গে হেসে কথা বলেছেন, তাদের চোখের সামনে এই দৃশ্য। উনি চোখ তুলে তাদের দিকে তাকাবেন কি করে! সেজন্যেই যেতে চাননি। কেউ আর এগিয়েও আসেনি। শেষে রাস্তার লোকের ভিড় থেকে পালাবার জন্যেই মেয়েটির সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছেন।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ধ্রুব এইসব কথাই ভাবছিল। ওর হঠাৎ মনে হ'ল, কি আশ্চর্য। লজ্জা কি শুধু ওই ভদ্রমহিলার? আমিও তো লজ্জিত অপমানিত বোধ করছি। আমাদের রাস্তায় এ-ঘটনা ঘটলে এ অপমান আমাকে আরো বেশি করে স্পর্শ করত। আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসে ওদের কাছে যেতে পারতাম না। কেবলই মনে হত তিনতলার ব্যালকনিতে দাঁড়ানো বাড়িওয়ালার খুশি খুশি উপহাসের দৃষ্টি আমার পিঠের ওপর আছড়ে পড়ছে। এ তো প্রতিটি ভাড়াটের লজ্জা।

ধ্রুবর নিজেরই খুব অবাক লাগছিল। বাড়িওয়ালার সঙ্গে তো ওর এখনও মৌখিক সদ্ভাব আছে। অথচ ও এখন আলাদা মানুষ হয়ে যাচ্ছে কি করে। এই মুহূর্তে বাড়িওয়ালা মানুষটিকে ধ্রুব ওর বিপরীত দিকে দেখতে পাচ্ছে কেন!

সব দিক থেকে ওরা মিলেমিশে একই মানুষ। কোনও তফাত নেই। শুধু একজনের বাড়ি আছে, আরেকজনের নেই। শুধু সেজন্যেই ওরা আলাদা মানুষ হয়ে যাবে?

বকুলবাগানের এই বাড়িতে ঢোকার সময় অজান্তেই ওর চোখ চলে যায় ওপাশের তেতলার বারান্দায়। কেউ সেখানে না থাকলে নিশ্চিন্ত।

আসলে ধ্রুবরা এদিকের ফ্ল্যাটে ভাড়া আছে অনেকদিন। ওদিকটায় আরেক ভাড়াটে। বাড়িওয়ালা তো তেতলায়। ইদানীং ভদ্রলোকের সঙ্গে আর তেমন ভাব ভালবাসা নেই। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে দু'জনের মুখেই মিষ্টি হাসি দেখা যায়, দু'চারটে অন্তরঙ্গ ভনিতা। তারপর ধ্রুবই ব্যস্ততা দেখিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে। কারণ ওর আশঙ্কা, আর কিছুক্ষণ সময় দিলেই রাখালবাবু কথাটা তুলবেন। সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনের জন্যে মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্রুব অবশ্য হেসে হেসেই কিছু একটা বলবে, স্তোক দেবে, হয়তো মিথ্যে স্তোক। কিংবা মুহূর্তে রেগে গিয়ে কিছু একটা বলে বসবে। তখন তার আবার কি প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে!

সেজন্যেই ও তেতলার বারান্দার দিকে চোখ তুলে তাকায় না। চোখাচোখি হওয়াকেও ভয়। কতদিন তো রাস্তায় দূর থেকে রাখালবাবুকে আসতে দেখে ও ফুটপাথ পাল্টেছে।

কিন্তু আজ আর শুধু রাখালবাবুকেই ভয় নয়। ভয় প্রীতিকেও।

রাস্তার ওপর ছুড়ে ফেলে দেওয়া একটা গোটা সংসার, কয়েকটা অভুক্ত মানুষের লুকোনো মুখ, ব্যস্, এই দৃশ্যটুকু দেখার পর থেকে ধ্রুবর মনে হচ্ছে ওর যেন হাঁটুতে কোনও জোর নেই। নিজেকে কেমন অসহায় লাগছে।

প্রীতির কাছে এ-সব কথা গোপন রাখতে পারবে না। ধ্রুবর যা স্বভাব, কোনও কথাই গোপন রাখতে পারে না। অথচ প্রীতিকে এই দৃশ্যটার কথা বললেই, ও জানে, প্রীতির মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হয়ে যাবে।

বাড়িতে ঢুকে ধ্রুব চুপচাপ শার্ট খুলল, প্যান্ট বদলে পাজামা পরল। কথাটা চেপে রাখার চেষ্টা করছে ও তখনও। যদি না বলে পারা যায়, প্রীতিকে অকারণ ভয় পাইয়ে দিয়ে কি লাভ। কিন্তু না বলেও পারছে না। কোনও একজনকে না বলে ফেলতে পারলে ও নিজেই যে হাল্কা হতে পারবে না।

চেয়ারটা বেশ শব্দ করে টানল, রান্নাঘর থেকে প্রীতি যাতে শুনতে পায়। হয়তো জানেই না, ধ্রুব ফিরে এসেছে।

সকালের দিকে এই সময়টুকু ধ্রুব নিজে যত ব্যস্ত, প্রীতি তার হাজারগুণ। হাতের ঘড়িটা একবার দেখে নিল ধ্রুব।

খুট খাট ঠুং ঠাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। কথাও। কখনও বালতি টানার কিংবা জল ঢালার শব্দ, কখনও হাঁড়ি কড়াই খুন্তির। এ সময় প্রীতির কাজ কি একটা। ঠিকে ঝি একদিকে, অন্যদিকে একজন রান্নার কাজের জন্যে—সুধা, তাদের ওপর নানারকম নির্দেশ দিতে দিতে প্রীতি নিজেও ছোটাছুটি করে কাজ করে। কি কাজ তা অবশ্য ধ্রুব ঠিক জানে না, জানার চেষ্টাও করে না। এ সময়টা সমস্ত বাড়িটার যেন এক জট পাকানো অবস্থা। এসব সময়ে ধ্রুব একটু দূরে সরে থাকতে চায়। এমন কি এক কাপ চায়ের কথা বলতেও দ্বিধা।

চায়ের কথা বলতে হ'ল না। প্রীতির গলা শোনা গেল, সুধা দেখ, বোধহয় দাদাবাবু ফিরেছে, চা করে দে।

অর্থাৎ চেয়ার টানার শব্দটা ওর কানে গেছে।

যথা সময় চা এল। সুধাই নিয়ে এল।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল ধ্রুব।

প্রীতি ঘরে ঢুকল কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট হাতে নিয়ে। বোধহয় রাখতে এসেছিল।

ধ্রুব কাগজ থেকে চোখ তুলে বললে, মন খারাপ হয়ে গেল আজ, একটা জিনিস দেখে।

কি দেখে এসেছে ও, বলতে গেল।—জানো, আজ রাস্তায়, বিশুর পানের দোকানের পাশের রাস্তায়...

আরো একটু এগিয়েছে, বর্ণনা দিতে শুরু করেছে ও, শুনেই প্রীতি বলে উঠল, শুনেছি, কাজল বলছিল।

কাজল ওই ঠিকে ঝিয়ের নাম, ধ্রুব আন্দাজে বুঝে নিল। হয়তো এর আগে শুনেছে, মনে পড়ে গেল। আসলে ওই নামগুলো তো এক থাকে না, দু'তিন মাস অন্তরই বদলে যায়। এত মনে রাখাও যায় না। যেমন ওই চব্বিশ ঘণ্টার কাজের লোক সুধা। যাকে দিয়ে প্রীতি এখন রান্না করায়। ও নামটাও কতবার যে বদলে গেছে। র‍্যাশন কার্ডে ওরা সকলেই অবশ্য মীরা...পদবী কি মনে নেই। মান্ধাতা আমলে ওই নামের কেউ ছিল, সেই নামই চলে আসছে। বার বার নাম বদলানো তো সম্ভব নয়, ধ্রুব হাসতে হাসতে একবার বলেছিল, দু'মাস অন্তর কার্ড বদলাতে গেলে তো মশাই গভর্নমেন্টই গণেশ ওল্টাবে।

ইনস্পেক্টর ভদ্রলোকও হেসে ফেলেছিলেন।

'শুনেছি, কাজল বলেছিল।' বাস্, ওইটুকু বলেই প্রীতি চলে গেল।

আশ্চর্য, একটা কথা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, সময় নেই ওর কথা বলার। এতই ব্যস্ত। বলবে তো কি শুনেছে? ঠিকে ঝিরাই তো পাড়ার গেজেট। সত্যিমিথ্যে মিশিয়ে নানারকম গুজব তো ওরাই ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। তিলকে তাল বানায়। কথাটা মনে হতেই ধ্রুব ভাবল, আমরা ভদ্রলোকরাই বা কম কি। ওই ভাড়াটে ভদ্রলোককে নিয়ে এতক্ষণে বাড়িতে বাড়িতে কত গুজব রটে গেছে কে জানে।

কিন্তু কাজল কি শুনে এসেছে, কি বলেছে প্রীতিকে তা জানার কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিল না ধ্রুব। এইসব সময়ে ও তাই মাঝে মাঝে প্রীতির ওপর চটে যায়। কাজ তো সকলেই করে, তা বলে দু'টো কথা বলার সময় হবে না?

আর কিছুক্ষণ পরে ধ্রুবরও তাড়াহুড়ো। স্নান, খাওয়া, পোশাক বদলানো, এটা ওটার খোঁজ। লেটে অফিস যাওয়া।

অফিস যাওয়া মানে তো বিভীষিকা। যত দেরি হবে, তত ভিড় বাড়বে বাসে। লেটে

গেলে তবু কিছুটা স্বস্তি। লেটে, অর্থাৎ সেই বারোটায়।

প্রীতি আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এল এতক্ষণে। এসেই বেশ রাগত স্বরে বললে, দেখলে তো। ঠাকুমা বলত, গরিবের কথা বাসী না হলে মিষ্টি হয় না।

ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না। ও তবু প্রীতির রাগ কমাবার জন্যে হেসে বললে, যা ব্বাবা, আমি আবার বড়লোক হয়ে গেলাম কবে থেকে। আর আমি বড়লোক হলে তো তুমিও বড়লোক, গরিব হতে যাবে কোন দুঃখে।

উল্টো কাজ হ'ল। মেয়েরা কথায় কথায় হাসে ঠিকই, কিন্তু ওদের সেন্স অফ হিউমার কম। ধ্রুবর রসিকতায় হেসে ফেলার বদলে প্রীতি প্রচণ্ড রেগে গেল।

বলে বসল, দেখবে দেখবে, যেদিন ওদের মতোই সব ঘর থেকে টেনে বের করে দেবে, সেদিন বুঝতে পারবে।

ধ্রুবর মুখ নিমেষে চুপসে গেল। এই একটা কথাই তো ও দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিল। কোথায় সাহস দেবে, বলবে, 'তুলে দেওয়া অত সহজ নয়, আইন আছে,' তার বদলে...

ধ্রুব প্রতিবাদ করার বা হেসে উড়িয়ে দেবার জোর পেল না। তাই ধীরে ধীরে জিগ্যেস করল, কাজল কি বলেছে ? কি করে তুলে দিল ?

—কি করে আবার। কাজল বলছিল, ভদ্রলোক নাকি ভীষণ ভালমানুষ, সবাইকে বিশ্বাস করেছিল...

একটু থেমে বেশ রাগের স্বরে আবার বললে, ভালমানুষ হয়েই থাকো। ভালমানুষির আর দিন নেই, বুঝলে !

ধ্রুব আর কোনও কৌতূহল দেখায়নি, আর কোনও প্রশ্ন করেনি। কৌতূহল দেখিয়েই বা কি লাভ। কাজল তো বাসন মাজার ঠিকে ঝি। ঝি, ঠিকে ঝি বললে প্রীতি অবশ্য চটে যায়। ওর ভাষায় 'কাজের লোক'। এখন বলে কাজল। এর আগেরটা ছিল লক্ষ্মীর মা। ধ্রুবর অতশত নাম মনে থাকে না।

চটি ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে প্রীতিকে একদিন বলেছিল, মুচিটা যখন যাবে এদিক দিয়ে, ডেকে দিয়ো তো !

সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে ফিরে তাকিয়েছিল প্রীতি। প্রায় ধমকের সুরে বলেছিল, মুচি আবার কি ? জুতো সারাই বলতে পার না ! বাথরুম পরিষ্কার করতে আসে যে লোকটা, তাকে জমাদারও বলা যাবে না। একদিন বলেছিল, কেন, ওর কি নাম নেই ? রঘুয়া বললেই তো পারো। কথাগুলোর পিছনে যুক্তি আছে, কিন্তু অভ্যাস কি এত সহজে বদলানো যায়। প্রীতিই বা কি করে অভ্যাস বদলে নিল। ওরা, মেয়েরা বোধহয় এসব চটপট পারে।

ধ্রুব শুনতে পেল, ওদিকের বারান্দায় প্রীতি হেসে হেসে কাজলের সঙ্গে কথা বলছে। রান্নার লোক সুধার সঙ্গেও এভাবেই কথা বলে। ওদের কারও সামান্য অসুখবিসুখ হলে কত মিষ্টি মিষ্টি করে খোঁজ খবর নেয়, উপদেশ দেয়, এমন কি দু'চারটে ওষুধের বড়িও। —দেখো কাজল, মনে করে খেয়ো কিন্তু, দিনে তিনবার।

আসলে এ-সবই এক ধরনের তোষামোদ। কাজল একদিন না এলে, কিংবা সুধা অসুখে দু'দিন পড়ে থাকলে ও যে চোখে অন্ধকার দেখবে। সে জন্যেই এত হেসে হেসে কথা।

তোষামোদ দরকার হয় না শুধু ধ্রুবর বেলায়, তখন আর মুখে হাসি আসে না।

ধ্রুব একদিন বলেছিল, ওদের এত তোয়াজ করে কি হবে, পাঁচটা টাকা কোথাও বেশি পেলেই তো কেটে পড়বে। তখন আর...

প্রীতি রেগে গিয়ে বলেছিল, হেসে হেসে কথা বলব না তো কি দিনরাত ওদের নিয়ে অশান্তি করব !

সকলের সঙ্গে দিব্যি শান্তি বজায় রেখে চলবে প্রীতি, কিন্তু ধ্রুবর ভালমানুষিতেই ওর আপত্তি। যাও, বাড়িওয়ালা রাখালবাবুকে কড়া করে বলে এসো। অথচ ও বাড়িওয়ালা লোকটিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চায়, মুখোমুখি হলেই উদ্বেগ বাড়ে, অশান্তি বাড়ে। এমনকি ভাড়া দেওয়ার পর রসিদটা দিতে দু'এক সপ্তাহ দেরি করলেও ওর কাছে গিয়ে মনে পড়াতেও ইচ্ছে করে না। রাখালবাবুদের চাকর-বাকরকে বলে, বাবুকে বলিস, রসিদটা এখনও পাইনি। কিংবা গোঁপওয়ালা বিহারী দারোয়ানকে বলে বাবুকে মনে পড়িয়ে দিতে।

তারপরও হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা, কবে বাবুটি রসিদ পাঠাবেন। আর রসিদে কে যে সই করে কে জানে, ধ্রুব প্রথম দিকে রসিদের সঙ্গে সই মিলিয়ে দেখেছে ; এখন আর একেবারেই মেলে না। এ-সবে কোনও আইনের প্যাঁচ আছে কিনা তাও জানে না। অথচ ধ্রুবর ভদ্রতাবোধে লাগে, বলতে পারে না, মশাই সইটা আমার সামনেই করুন। কিংবা—টাকা দিচ্ছি, রসিদটা এখনই দিয়ে দিন।

এ যেন জমিদার আর প্রজার সম্পর্ক। ভাড়ার টাকাটা দিতে যাবার সময় নিজেকে বড় ছোট লাগে।

অফিসের অবিনাশ হাসতে হাসতে বলেছিল, যত কমিউনিজম গ্রামের জমি নিয়ে, কলকাতায় ষোলো আনা ধনতন্ত্র।

ধ্রুব বলেছিল, ধনতন্ত্র বলছ কেন, এখনও সেই ফিউডেলিজম্। দশ বিশখানা বাড়ি থাকলেও কোনও আপত্তি নেই।

ও-সব কথা বলে মনের ঝাল মেটানো যায়। কিন্তু বুকের ভিতর থেকে উদ্বেগ দূর করা যায় না। ভাড়াটে হয়ে থাকা মানেই একটা চিরন্তন অশান্তির সঙ্গে সহ-বাস করা।

সকালে দেখা দৃশ্যটা বারবার মনে পড়ছিল বলেই ধ্রুব মন থেকে উদ্বেগটা দূর করতে পারছিল না। সকলেই তো বলে আজকাল নাকি ভাড়াটেকে তুলে দেওয়া যায় না। তা হ'লে ওই দৃশ্যটা দেখতে হ'ল কেন ?

শেষ অবধি অবিনাশকেই বললে।

অবিনাশের পৈতৃক সূত্রে পাওয়া কিছু জমিজমা আছে হুগলিতে। গ্রামে চাষবাস হয়। এখানে বাড়ি ভাড়া করে আছে, কিন্তু র‍্যাশনকার্ড জমা দিয়ে পারমিট করিয়ে দারুণ ভাল চাল নিয়ে আসে গ্রাম থেকে।

ধ্রুব ওকে তাই ঠাট্টা করে বলে জমিদার।

অবিনাশের বেশ কিছু জমি ভেস্ট হয়ে গেছে, ক্ষতিপূরণের টাকা এখনও পায়নি। পেলেও তা সামান্য টাকা, সেজন্যে ঘুষ-ঘাস দিয়ে আদায় করার চেষ্টাও করেনি। বলে, যা ছোটাছুটি করতে হবে খরচ পোষাবে না।

কলকাতার বাড়িওয়ালাদের ওপর ওর রাগ সেজন্যেই। রাগ আসলে বাড়িওয়ালাদের ওপর, না কি আইনকানুনের ওপর, তা ঠিক বোঝা যায় না। আসলে ভেস্ট হয়ে যাওয়া জমির মায়া ও ভুলতে পারে না। বলে, কলকাতার একটা ফ্ল্যাটের দাম তো গ্রামের একশো বিঘে জমির চেয়ে বেশি। কিন্তু এখানে কোনও গরমেন্টই হাত বাড়াবে না।

অবিনাশকে কিন্তু ধ্রুবর বেশ ভালই লাগে। ওর দেশে জমিজমা আছে বলে কোনও ঈর্ষাও হয় না। বরং অবিনাশও ভাড়াটে বলে কেমন এক ধরনের আত্মীয়তা বোধ করে।

বেশ প্রাণখোলা মানুষ এই অবিনাশ। গায়ের রঙ চাপা, কালোই বলা চলে। চুলে ঈষৎ পাক ধরেছে। পাঞ্জাবির ওপর একটা জহরকোট পরে। মাঝে মাঝেই দাড়ি কামাতে

ভুলে যায়, কিংবা দাড়ি কামায় না। কেউ সে-কথা বললে হাসতে হাসতে বলে, কি হবে গাল চকচকে করে, অফিসার করে দেবে ? না কি এ বয়সে কোনও মেয়ে এসে গালে হাত বুলিয়ে দেবে ?

যেন প্রতিদিন দাড়ি কামানোর প্রয়োজন ওইসব কারণেই।

সকাল থেকেই ধ্রুবর মনে অনেকগুলো প্রশ্ন। প্রীতির কাছ থেকেও শুনতে পায়নি কাজল কি জেনে এসেছে।

ও তো এতদিন বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। রাখালবাবু যত অশান্তিই ঘটাক, ওকে তো আর বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবে না। আইন ভাড়াটেদের পক্ষে।

কিন্তু তা হ'লে ওই ভদ্রলোকের আসবাবপত্র টেনে বের করে দিল কি করে ? ভাড়া বাকি পড়েছিল ? ভাড়া দিত না ?

শেষে অবিনাশকেই বললে।

—আজ সকাল থেকেই ভাই মনটা খারাপ হয়ে আছে।

খাটো মাপের চেহারায় খাদির খয়েরি জ্যাকেটে অবিনাশকে আরো বেঁটে লাগে। কিন্তু সবসময়েই মুখে হাসি লেগে থাকে বলে দাড়ি কামিয়েছে কি কামায়নি চোখে পড়ে না।

অবিনাশ হাসল। —আরে বৌ কাছে থাকলে মাঝে মাঝে মন খারাপ হবে না তাও কি হয় ?

একটু থেমে বললে, আমি তো ভাই মাঝে মাঝেই বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই, বৌয়েরও মন ভাল থাকে, আমারও মন ভাল থাকে। নো খিটিমিটি, নো ঝগড়া।

ধ্রুব হেসে ফেলল। ও জানে অবিনাশ এই রকমই। বয়সে ধ্রুবর চেয়ে দু'বছরের বড় হলেও হতে পারে, কিন্তু সব দিক থেকে মানুষটা হাফ সেঞ্চুরি পেছিয়ে আছে। চেহারায়, পোশাক পরিচ্ছদে, কথা বলার ধরনে। আবার গুণগুলোতেও। হাফ সেঞ্চুরি আগেকার মানুষের মতোই খোলামেলা মন, কোথায় একটা আন্তরিকতা আছে। বিপদের সময় এগিয়ে আসে, সান্ত্বনা দেয়। ওর সঙ্গে কি করে যে এত বন্ধুত্ব হ'ল ধ্রুব খুঁজে পায় না। ধ্রুব তো পোশাক আশাকের ব্যাপারে রীতিমতো খুঁতখুঁতে। শার্টের কিংবা ট্রাউজারের ক্রিজ নষ্ট হল কিনা তা নিয়ে সদাই সচেতন।

প্রীতির কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কি নিয়ে যেন ঝগড়াটা শুরু, ঝাঁঝের গলায় বলেছিল, তোমার শার্ট প্যান্টে ইস্ত্রি ঠেলে ঠেলে হাতের কব্জি তো খসে গেল।

কথাটা মিথ্যে নয়। ধ্রুব সত্যি একটু ঝকঝকে থাকতে ভালবাসে।

অফিসে এসে হাসতে হাসতে অবিনাশকে সে প্রসঙ্গ বলতেই অবিনাশ ধীরেসুস্থে কৌটো থেকে সুগন্ধি সুপুরি বের করে মুখে পুরে বলেছিল, জবাব দিলে না ?

ধ্রুব হেসে বললে, কি জবাব দেব ?

অবিনাশ হাসল। —বলতে হত, ম্যাডাম, পোশাক আশাক কি আর নিজের জন্যে ? ওসবে আমার কি দরকার। তবে কিনা তোমার স্বামী বলে তো পরিচয় দিতে হবে।

ক্যান্টিনে আরো কে কে যেন ছিল, শব্দ করে হেসে উঠেছিল।

এই হ'ল অবিনাশ।

সকালের দৃশ্যটার কথা বললে ও হয়তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু না বলেও উপায় নেই। মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ, একটা দুর্ভাবনা। কোনও একজনকে তো বলতে হবে। বলে হাল্কা হতে হবে। ভেবেছিল প্রীতিকে বলবে, কিন্তু সে তো বলার সুযোগই দিল না। কাপড়ে কতখানি সাবানের গুঁড়ো দিতে হবে, থালায় কেন ছাই লেগে আছে, আর বালতিতে জল ভরা নিয়েই ব্যস্ত। ঠিকে ঝি কিংবা রান্নার লোকের সঙ্গে, সেই ফাঁকে, গল্প জুড়ে দেয়। শুধু ধ্রুবর সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। সকালের প্রীতি আর

সঙ্কের প্রীতি যেন দুটো পৃথক মানুষ।

শেষ অবধি অবিনাশকেই বলল। আসলে ও জানতে চায়, কিভাবে এটা সম্ভব হল। ও তো শুনে আসছে, আজকাল ভাড়াটেকে তোলা যায় না। তবে? আইনের নিশ্চয় কোনও ফাঁকফোকর আছে, সেটাই জানতে চায়। ও নিজেও না কোনওদিন আইনের সেই ক্ষুরস্য ধারায় পড়ে যায়।

অবিনাশের কাছে দৃশ্যটা বর্ণনা করে বলতে অবিনাশ বলে উঠল, ইস্!

বেশ যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে।

ধ্রুব তো লোকটিকে চেনেও না, দেখেনি কোনওদিন। তবু দৃশ্যটা দেখেছে। অবিনাশ সেটুকুও দেখেনি। তবু মনে হল ও যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেল।

অবিনাশ একটু পরে বললে, ইনহিউম্যান।

এই শব্দটা ধ্রুবর মনের মধ্যেও সকাল থেকেই ঘুরছে। ওর কেবলই মনে প্রশ্ন জাগছে, ভদ্রলোক কোনও ব্যবস্থা করতে পারলেন কিনা। এই এত সব ফার্নিচার, হাঁড়িকুড়ি, একটা গোটা সংসার। হয়তো দশ কিংবা বিশ বছর ধরে একটু একটু করে সাজিয়েছিলেন। এখন কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবেন! স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় গিয়ে উঠবেন?

ধ্রুব বললে, ভদ্রলোক হয়তো ইদানীং অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ভাড়া বাকি পড়েছিল। অসুখ-বিসুখ চললে কার মনে থাকে!

অবিনাশ বললে, উঁহু, সেও তো আজকাল ইনস্টলমেণ্টে দেওয়া যায়। অবশ্য জানি না...

ভাড়া বাকি পড়ার কথাটাই ভাবতে ভাল লাগছিল ধ্রুবর। কারণ, তা হলে ও নিশ্চিন্ত। ভাড়া বাকি ফেলার কথাই ওঠে না ওর ক্ষেত্রে। ফাইলের মধ্যে রসিদগুলো ঠিক ঠিক সাজিয়ে রেখেছে।

বেশ বোঝা গেল অবিনাশ নিজেও চিন্তিত। অবিনাশও তো ভাড়া বাড়িতেই থাকে, স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে। প্রথম জীবনটা ওর কেটে গেছে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, তারপর একটু সচ্ছল হতেই গ্রামের বাড়ি থেকে সংসার তুলে এনেছে।

ধ্রুব বললে, আমি ভাবছি ভদ্রলোকের কথা। আজকাল তো সকলেরই মাত্র দু'তিনখানা ঘর নিয়ে সংসার, বেচারির কোনও আত্মীয়টাত্মীয় থাকলেও কি আর থাকার জায়গা পাবে!

অবিনাশও যেন ভদ্রলোকের জন্যে চিন্তিত। বললে, সত্যি, রাতটা কোথায় যে কাটাবে। তাছাড়া অত সব জিনিসপত্র। কি করবে কে জানে।

দু'জনই সেই অজানা অচেনা ভদ্রলোকের সমস্যার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল।

ধ্রুব হঠাৎ বললে, বোধহয় ভাল করে মামলা লড়তেও পারেনি। অবস্থা তো তেমন ভাল নয়, তোলা উনোন ছিল, গ্যাস স্টোভ কি সিলিন্ডার তো দেখলাম না। ফ্রিজও না।

কথাটা বললে বোধহয় মনে জোর পাবার জন্যে। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে ও নিজে কিন্তু ভাল উকিল দিয়ে মামলা লড়তে পারবে। ওর গ্যাস স্টোভও আছে। ফ্রিজও আছে। এই সব দুঃস্থ টাইপের লোকদের সঙ্গে এতদিন ও খুব একটা একাত্ম বোধ করেনি। বরং দূরত্ব রেখেই চলত। অভাবে ওদের স্বভাব নষ্ট হয়, অনেকসময় ওদের ছেলেমেয়েরা বিগড়ে যায়, এই সব যুক্তি বানাত। অথচ এখন ওই ভদ্রলোক যেন আপনজন হয়ে উঠেছেন। কারণ উনিও ভাড়াটে।

অবিনাশ চাপা দুশ্চিন্তার হাসি হেসে বললে, রসিদটসিদগুলো দেখে রাখতে হবে, শালা এমনিতেই তো জল দেয় না।

তারপর একটু থেমে বললে, আমাদের পাড়ায় অবশ্য একজনকে গুণ্ডা লাগিয়ে তুলে দিয়েছিল, সে অনেককাল আগে।

ধ্রুব অবাক হয়ে বললে, গুণ্ডা লাগিয়ে ? এই কলকাতা শহরে ?

অবিনাশ হাসল। —হ্যাঁ হে, এই কলকাতায়। এখানে কি না হয় ? তবে সে ভদ্রলোক মামলা লড়ে ফিরে পেয়েছিলেন, কিন্তু লজ্জায় আর আসতে চাইলেন না।

—এই যে বাড়িওয়ালা ! শোনো শোনো তোমাদের কির্তি।

সুনন্দকে যেতে দেখে অবিনাশ হাঁক দিল।

সুনন্দই বোধহয় প্রথম অবিনাশকে জমিদার আখ্যা দিয়েছিল, কারণ দেশে ওর কিছু জমিজমা আছে। তার পাল্টা জবাবে অবিনাশ ওকে বাড়িওয়ালা বলে ডাকে। কারণ সুনন্দর পৈতৃকসূত্রে পাওয়া একটা বাড়ি আছে।

বেশ ভাল বাড়ি, তিনতলা। আমহার্স্ট স্ট্রিটের ওপর।

বাড়িওয়ালা বললে সুনন্দ প্রথম প্রথম ক্ষুণ্ণ হত। ওটা নিশ্চয় কোনও সম্মানজনক পরিচয় নয়।

একদিন রেগে গিয়ে বলেছিল, কি বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালা করেন।

পরক্ষণেই রেগে যাওয়াটা অশোভন মনে হওয়ায় ইয়ার্কির ঢঙে বলেছিল, যদি বলতেই হয়, ল্যান্ডলর্ড বলুন, আপত্তি করব না।

অবিনাশ চোখ কপালে তুলে বলেছে, আরে ব্বাস, ল্যান্ডলর্ড ! লর্ড বলতে হবে।

সুনন্দ তখনই চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছে অবিনাশের কাছে। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলেছে। —অবিনাশদা, বাড়ি একটা আমার আছে ঠিকই, কিন্তু আমার অধিকারে মাত্র দু'খানা ঘর, তিনতলায়। শরিকি ঝামেলা বিস্তর, বেচে দেব তার উপায়ও নেই, তার ওপর ভাড়াটেদের অত্যাচার।

অবিনাশ হেসে ফেলেছে। —তাই নাকি ? ভাড়াটেরাও অত্যাচার করে ?

সুনন্দ বোঝাবার চেষ্টা করেছে, অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছে। বলেছে, বাবা সেই কোনকালে ভাড়াটে বসিয়ে দিয়ে গেছে, কত ভাড়া পাই জানেন ?

সব শুনে মুখে বিষণ্ণ ভাব এনেছে অবিনাশ, কিন্তু ওর দুঃখ-বেদনা কিংবা আরেকখানা ঘরের অভাব, এসবের কিছুই অবিনাশকে স্পর্শ করেনি।

বলেছে দ্যাখো ভাই, তোমার অনেক দুঃখ মানছি, কিন্তু তোমার ভাড়াটেদের দুঃখ আরো বেশি। এই যেমন তুমি তাদের 'ভাড়াটে' বল।

অবিনাশের আশেপাশে যারা ছিল, তারা শব্দ করে হেসে উঠেছে। কিন্তু আঘাত দেবার জন্যে বলেনি অবিনাশ। ও তাই সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, এই যেমন দেখ, আমার জমিজমা চলে গেছে, গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে, তার জন্যে আমারও খুব দুঃখ। কিন্তু যাদের জমি নেই, পরের জমিতে চাষবাস করে, তাদের চেয়ে বেশি দুঃখ তো নয়।

সেই সুনন্দকে অবিনাশ আজ আবার ডাকল বাড়িওয়ালা বলে। এখন আর বাড়িওয়ালা বললে সুনন্দ চটে না। ও বুঝে নিয়েছে, এটা অবিনাশের নির্দোষ ঠাট্টা। তাছাড়া এ অফিসে এই এতগুলো ভাড়াটের মধ্যে একা সুনন্দরই বাড়ি আছে, সে পরিচয়টা খারাপ কিসে ! বাড়ি মালিক হওয়ার মধ্যেও তো বেশ একটা গর্ব আছে।

তাই ডাক শুনে হাসতে হাসতে এসে বসল সুনন্দ।

আর ধ্রুব সকালে যা যা দেখেছে বলে গেল। যতখানি দয়া মায়া এবং সমবেদনা সেই অচেনা অজানা ভদ্রলোকের জন্যে ঢেলে দেওয়া সম্ভব, কথার মধ্যে তা মিশিয়ে দিয়ে। তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের বিষণ্ণ লজ্জিত মুখের বর্ণনা দিল। এবং শেষে বললে, যাই বল সুনন্দ, এটা একটা ইনহিউম্যান ব্যাপার।

সুনন্দর মুখ দেখে বোঝা গেল ও খুব আহত হয়েছে। যেন ধ্রুব বলছে, সুনন্দ, তুমিও একটা অমানুষ। হয়তো সত্যি তাই।

সুনন্দ প্রতিবাদ করল।—দেশে আইন আছে, কোর্টকাছারি আছে। লোকটার নিশ্চয় গলদ কিছু ছিল...

অবিনাশ হাসতে হাসতে সুনন্দর উরুর ওপর একটা থাপ্পড় বসাল। বললে, সেটাই তো জানতে চাইছি। তুমি তো ভাই একজন ল্যান্ডলর্ড, অন্ধিসন্ধি তোমারই জানার কথা। কোনও প্যাঁচে তাকে ওঠাল বল তো, আমরা তা হলে সাবধান হতে পারি।

সুনন্দ কোনও কথাই বলেনি, উঠে চলে গিয়েছিল। বেশ বোঝা গিয়েছিল ও রেগে গেছে।

ও চলে যাওয়ার পর ধ্রুব আর অবিনাশ দু'জনেরই অনুশোচনা হল। এভাবে সুনন্দকে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়। অথচ আঘাত তো দিল। কিন্তু কেন ? ঈর্ষা ? সুনন্দর একটা বাড়ি আছে বলে কি ওদের মনে কোনও ঈর্ষা আছে ? কই, কখনও তো মনে হয়নি। সুনন্দর সঙ্গে এতদিনের বন্ধুত্ব, পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করে, একজনের বিপদে আরেকজন এসে দাঁড়িয়েছে কতদিন, অথচ তাকেই ওরা ভাবল বিপরীত দিকের মানুষ। কি আশ্চর্য, একজন অজ্ঞাতকুলশীল, কেমন ধরনের লোক কে জানে, ধ্রুব তাকে কোনওদিন দেখেওনি, চেনে না, জানে না, সেই লোকটাই ওদের সমবেদনা পেল। মনে হল আপনজন, আত্মীয় ! শুধু সেও একজন ভাড়াটে বলেই ?

বাড়ি ফেরাব পথে ধ্রুবর মনে আবার উদ্বেগ ফিরে এল।

প্রীতি একসময় প্রায়ই বাড়ি করার কথা বলত। মাথা গোঁজার মতো একটা আশ্রয়। কিন্তু ধ্রুবর তখন বিষয়আশয়ের দিকে মন ছিল না। কিংবা ওর তেমন বিষয়বুদ্ধিই ছিল না। না, ওসব নিতান্তই অজুহাত। বাড়ি করার মতো টাকাই ছিল না ওর।

এখনও নেই। তবু একটা আশ্রয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে। দিনরাত অশান্তি নিয়ে বাস করা যায় না।

ফেরার পথে ধ্রুব সেই রাস্তাটা দিয়েই এল। এখনও সব আসবাবপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কিনা দেখে আসবে। ওগুলো যেন ওর বুকের ওপরই চেপে বসে আছে।

নাঃ, সব সরে গেছে, রাস্তাটা পরিষ্কার। কোথাও কিছু পড়ে নেই। কখন নিয়ে গেছে কে জানে, কোথায় গেছে তাই বা কে বলবে।

ওর বুকের ওপর থেকে একটা গুরুভার যেন নেমে গেল। তা হলে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু কি ব্যবস্থা। ধ্রুব ভেবেই পেল না। আজকাল তো আগেকার দিনের মতো বাড়িতে বাড়িতে 'টু লেট' ঝোলে না।

দাদুর কাছে ধ্রুব শুনেছে ওঁদের সময়ে নাকি বাড়িওয়ালারাই ভাড়াটে পেলে ধন্য হয়ে যেত। নিয়মিত ভাড়া পেলে তো কথাই নেই। বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটের মধ্যে কোনও ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ ছিল না। দুয়ে মিলে যেন একই সংসার। একজনের বিপদ মানে অপরেরও। তখন পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ছিল না. শত্রু ছিল বাইরে। চোর, গুণ্ডা, মাতাল।

কিন্তু এখন অন্যরকম। বাড়িভাড়া কথাটাই মিথ্যে হয়ে গেছে। বাড়ি কোথায়, দু'এক ঘরের ফ্ল্যাট যদি বা পাওয়া যায়, মাসমাইনের অর্ধেকটাই দিয়ে দিতে হবে। তার ওপর মোটা টাকা অ্যাডভান্স। কোত্থেকে পাবে সে-চিন্তা আমার নয়, দেবার লোক আছে। তাও কাছেপিঠে পাবে না, সরে যেতে হবে শহরের শেষপ্রান্তে। ফ্ল্যাটটাও মনঃপূত হবে না।

তা হলে ভদ্রলোক কি করে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেললেন ? হয়তো

পাঁচজন আত্মীয়ের বাড়িতে ছড়িয়ে রেখেছেন। পরে নিয়ে যাবেন। কিন্তু নিজেরা ? সেটা অবশ্য দু'পাঁচদিনের জন্যে সমস্যা নাও হতে পারে।

বুকের ওপর থেকে গুরুভার নেমে যেতেই বেশ হাল্কা মনে বাড়ি ফিরল ধ্রুব।

দরজার বাইরে থেকেই বেশ খুশি খুশি অনেকগুলি কণ্ঠে হইহল্লা শুনতে পাচ্ছিল। নিজেদের ফ্ল্যাটে, নাকি ওপাশের ফ্ল্যাট থেকে, বুঝতে পারেনি।

না, নিজেদের ফ্ল্যাটেই। দরজাটাও খোলা, তাই অনেকগুলো চটি দেখতে পেল। মেয়েদের স্লিপার।

প্রীতি ফ্রিজ থেকে কি বের করছিল, ধ্রুবকে দেখতে পেয়েই হাসি হাসি মুখে বললে, কে এসেছে দেখবে এসো। ঢুকেই অবাক। ছোটপিসিমা আর দুই পিসতুতো বোন। রুনি আর সুমি।

প্রীতির এত খুশি হওয়ার কারণ ছোটপিসিমা বড় একটা ধ্রুবদের বাড়িতে আসে না। ওদের অবস্থা খুবই ভাল। পিসেমশাই বড় চাকরি করেন। সেজন্যে ধ্রুবর হয়তো নিজেকে ও বাড়িতে নগণ্য মনে হত। ওরা আসে না বলে ধ্রুবও যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। যায়, ওই একবার বিজয়ার পর। ব্যস্।

রুমি বড়, এর মধ্যে আরো বড় হয়ে গেছে। দেখতেও বেশ সুন্দর হয়েছে। শুনেছিল গতবার এম-এ পাশ করে গেছে। ধ্রুব ওদের হাতের দিকে তাকাল, রুমিব বিয়ে নাকি ! কই, নিমন্ত্রণের চিঠিফিটি তো নেই।

অথচ সবারই মুখে হাসি উপছে পড়ছে।

পিসিমা হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে ধ্রুবর হাতখানা ধরে বললে, কি রে, সব সম্পর্কটম্পর্ক ছেড়ে দিলি নাকি ? একবারও যাস না।

ধ্রুবকেও হাসতে হল। —সময় কই বল, তার ওপর বাসট্রামে যা ভিড়।

বাসট্রামে ভিড়ের জন্যেই মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, না সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটা ভাল অজুহাত এই বাসট্রামের ভিড়, সেই মুহূর্তে বুঝতে পারল না ও।

সুমি ছোট, কিন্তু কথার খৈ ফোটে ওর মুখে। বলে বসল, ট্রাম-বাসে ভিড় বলে যাও না ? তা ধ্রুবদা, একটা ফোন করে দিলেই পারো, গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

এতক্ষণে ধ্রুবর মনে পড়ল, বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা চিনতে পারেনি, হয়তো ড্রাইভার বদলে গেছে বলে। তাছাড়া, ওর মনেও হয়নি গাড়ি করে কেউ ওর কাছে আসতে পারে। ভেবেছিল অন্য কোনও বাড়িতে কেউ এসেছে।

সুমির কথা শুনে ধ্রুব ভিতরে ভিতরে একটু অপ্রসন্ন হলেও মুখে হাসি আনল। —গাড়ি যখন আছে, তখন তোরা এলেই তো পারিস।

পিসিমা তখনও হাত ছাড়েনি ধ্রুবর। হাসতে হাসতে বললে, ভাইবোনের ঝগড়া এখন রাখ। যোধপুর পার্কে ফ্ল্যাট কিনেছি। এই মঙ্গলবার গৃহপ্রবেশ। তোরা যাবি কিন্তু।

এই ব্যাপার ! এর জন্যেই এত উচ্ছল হাসি আনন্দ।

ধ্রুবরও কিন্তু শুনতে বেশ ভাল লাগল। আত্মীয়স্বজন কি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, কেউ বাড়ি করলে কিংবা ফ্ল্যাট কিনলে এক ধরনের আনন্দও হয়। কেমন একটা আশা জাগে, তা হলে আমিও হয়তো পারব।

ধ্রুব খুশি-খুশি মুখেই বললে, দারুণ খবর। তা হলে ভাড়াটে নাম ঘুচল, কি বলিস সুমি !

তারপরই বললে, আমরা তো ভেবেছিলাম, বাড়ি করবে ! ফ্ল্যাট কেন ?

সঙ্গে সঙ্গে বললে, তবে জমি তো আজকাল পাওয়াই যায় না। বোধহয় সান্ত্বনা দিতে চাইলে।

পিসিমা বললে, প্রীতি বলছিল, তোরাও একটা কিছু করার কথা ভাবছিস। করে ফেল এখনই।

প্রীতির মুখে তখনও হাসি। এগিয়ে এসে পিসিমাকে বলল, ওকে বলুন না সেই জমির কথা।

• পিসিমা বললে, শোন ধ্রুব, যাস একদিন। জমিই হোক ফ্ল্যাটই হোক, যদি চাস, তোর পিসেমশাইয়ের কাছে অনেক খবর পাবি।

বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে ধ্রুবর পিসিমারা চলে গেল।

প্রীতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। —এবার আমাদেরও একটা কিছু করে নিতে হবে।

ধ্রুব কোনও জবাব দিল না।

## ২

মানুষের উপকার করলে কখনো-সখনো বড় কাজে লেগে যায়।

বকুলবাগানের এই ফ্ল্যাটখানা পাওয়ার পর ধ্রুবর এ-কথাই মনে হয়েছিল। অথচ কারও উপকার করার কথা ও ভাবেনি।

প্রীতি আর অপেক্ষা করতে রাজি ছিল না। বিশেষ করে ধ্রুবর চাকরিতে একটা ছোটখাটো লিফট হওয়ার পর। ধ্রুব নিজেও আর অপেক্ষা করতে চায়নি।

হরিশ মুখার্জি রোডের যে ভাড়া বাড়িটায় ওরা থাকত, একখানা দোতলা, ছোট বাড়ি, সেখানে ঘরের সংখ্যা ছিল কম। ধ্রুবর বাবা মা এখনও সে-বাড়িতেই। ওর দাদা-বৌদিরা সেখানেই। শুধু ধ্রুবকে সরে আসতে হয়েছে। ধ্রুব জানত, সরে আসতে হবে।

প্রীতি ওদের বাড়িতে নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। কয়েকবারই গিয়েছে। নানা অজুহাতে।

ধ্রুবর মেজবৌদি রীতিমত বুদ্ধিমতী। দু'দিনেই ধরে ফেলেছিল। হাসতে হাসতে বললে, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। যখন ঠিকই করে ফেলেছ ধ্রুবদা, বাবা-মাকে বলতে এত ভয় কিসের?

মেজবৌদি বয়সে ধ্রুবর চেয়ে সত্যি ছোট কি না বোঝা দায়। সেইজন্যেই হয়তো প্রথম থেকেই মেজবৌদি ওকে ধ্রুবদা বলত।

ধ্রুবর বোন সুমিতা ঠাট্টা করে বলেছিল, সে কি গো বৌদি, ঠাকুরপো বলতে পারো না? ধ্রুবদা আবার কি!

তখন মেজবৌদি তো নতুন বৌ, সদ্য বিয়ে হয়েছে। ধ্রুব হেসে বলেছিল, বুঝতে পারছিস না, বয়েস কমানোর তাল।

মেজবৌদি হেসে ফেলে বলেছিল, না ভাই, বিয়ে যখন হয়ে গেছে এখন আর বয়েস কমাব কোনও দুঃখে।

আসলে এ-বাড়ির তুলনায় মেজবৌদি ছিল রীতিমত মডার্ন। ওর মুখে নাকি ঠাকুরপো, ঠাকুরঝি ধরনের কথা আসত না, বলতে গেলেই হেসে ফেলত। সেইজন্যেই ধ্রুবদা।

মেজবৌদির সঙ্গেই খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুত্ব হয়েছিল বলেই তার কাছে ধরাও পড়ে গিয়েছিল ধ্রুব।

বিয়ের পর সকলের সামনে সেই সব দিনের কথা ফাঁস করে দিয়ে বলেছিল, ধন্য বাবা তোমরা দু'জন। কি নাটকই করলে। আমি ভাবতাম একসঙ্গে পড়ে, আজকাল তো সব বন্ধু-বন্ধু, হয়তো তাই।

একঘর লোক, সবাই হাসছিল। সে-সব উচ্ছল আনন্দের দিন। ধ্রুবর মেজদা

ছিল। লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুমিতা টিপ্পুনি কেটেছিল, ছোটবৌদি কি ধূর্ত বাবা, কেউ টেরও পায়নি। মেজেবৌদি তখন খুশিতে হাসছে।—তাই তো বলছি, দু'জনে টেবিলে ঝুঁকে পড়েছে বইয়ের ওপর, ফিসফিস করে কথা বলছে, দেখে আমি ভাবতাম, দু'জনের কি পড়ায় মন। ভিতরে ভিতরে যে এত চলছে...

প্রীতি অবশ্য প্রতিবাদ করেছে, এই না, সত্যি বলছি মেজবৌদি, তখন সত্যি পড়তাম।

—ছাই পড়তে। তারপর হেসে উঠে বলেছে, ওকে বই পড়া বলে না, প্রেমে পড়া বলে।

সকলে হো হো করে হেসে উঠেছে।

তবে ধ্রুব জানে, মেজবৌদি না থাকলে ব্যাপারটা এত সহজে হত না। বাবা মাকে বলতে সাহসই পেত না ও।

ও তো ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে, বাবা-মা যাবতীয় ধ্যান-ধারণায় কত গোঁড়া। বাবার হাতে তো সব সময় পাঁজি ঘুরছে। কালবেলা বারবেলা না দেখে কারও কোথাও যাওয়া চলবে না। মা তার চেয়েও বেশি।

মেজদার বিয়ে তো প্রায় ভেঙে যায়। ঠিকুজিকুষ্ঠির মিল হচ্ছিল না। অথচ মেজবৌদিকে দেখে মেজদার দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে।

শেষে নতুন একজন জ্যোতিষীকে শিখিয়ে পড়িয়ে ডেকে আনা হয়েছিল। ধ্রুবই সে-সব ব্যবস্থা করেছিল।

ধ্রুব তাই বলেছিল, তোমার একটু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। আমি ব্যবস্থা করে কুষ্ঠি না মিলিয়ে দিলে তোমার বিয়ে হত না।

মেজবৌদি জবাব দিয়েছে, আজ্ঞে না। হয়তো আরো ভাল বিয়ে হত। কৃতজ্ঞ থাকতে হয় তো তোমার মেজদার। আমাকে দেখে তারই মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

ধ্রুব হেসে বলেছে, সে তোমরা দু'জনে বুঝবে কার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু প্রীতিকে বিয়ে করতে চাই এ-কথা বাবা-মাকে তোমাদেরই বলতে হবে। আমি বলতে গেলেই হয়তো পাঁজি ছুড়ে মারবেন।

মেজবৌদি হেসে ফেলেছে। তারপর হাসি থামিয়ে বলেছে, দেখি কি করা যায়। বাবাকে রীতিমত ভয় পেত ধ্রুব। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, ঠাকুরদেবতায় ভক্তি, সব সময় নীতিনিয়ম মেনে চলেন। বাড়িতে নিজেদের মধ্যে একটু হাসিহুল্লোড় হ'লে ধমক দিতেন।

ধ্রুব জানত, প্রীতিকে ও বিয়ে করতে চায় এ-খবর শুনলেই এ-বাড়িতে একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। সেজন্যেই বলতে পারছিল না।

প্রীতি যেদিন ধ্রুবর খোঁজে প্রথম এসেছিল, হাতে একরাশ বই খাতা নিয়ে, সেইদিনই রাত্রে খেতে বসে বাবা গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেছিলেন, মেয়েটি কে ? আজ তোর খোঁজে এসেছিল ?

তখন তো প্রীতি-সম্পর্কে কোনও দুর্বলতা ছিল না। দিব্যি বলতে পেরেছিল, আমাদের সঙ্গে পড়ে। অসুখ হয়ে পড়েছিল, তাই নোট নিতে পারেনি। খাতাটা নিতে এসেছিল।

—হুঁ।

ব্যস, আর কোনও কথা বলেননি।

ধ্রুবর পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট। ও বেশ বুঝতে পেরেছিল, ওর এ-বাড়িতে আসা, ধ্রুবর খোঁজ নেওয়া, বাবার পছন্দ নয়। মনে মনে সেজন্যে বাবার ওপর রেগেও গিয়েছিল। এইসব পুরোনো দিনের লোকদের নিয়ে মহা সমস্যা। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে দেখলেই এরা প্রেম ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। অথচ তখন তো প্রীতির সঙ্গে ভালবাসাবাসি শুরু

হয়নি। একসঙ্গে পড়ত, কাছাকাছি থাকত বলেই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এসে হাজির হত। অথচ ধ্রুব তাকে নিষেধও করতে পারত না। নিষেধ করলেই তো প্রীতি হেসে উঠত, বন্ধুবান্ধবদের কাছে গল্প করে বলত, আর সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ত যে ধ্রুবরা ভীষণ ব্যাকডেটেড। প্রাচীনপন্থী। সে এক লজ্জা।

কিন্তু তারপর হঠাৎ কি ভাবে যেন মেজবৌদির সঙ্গে, সুমিতার সঙ্গে প্রীতির বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ধরা পড়ে গেল মেজবৌদির কাছে। অথচ প্রীতি তখন খুব কমই আসত।

পরীক্ষাটরিক্ষা হয়ে গেল, দু'জনেই পাশও করে গেল। আর ধ্রুব খুব সহজেই একটা চাকরি পেয়ে গেল। সামান্য চাকরি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটা লিফ্‌ট পেয়ে গেল বছর খানেকের মধ্যেই।

মেজবৌদি বললে, ঠিক আছে আমিই বলব। প্রতিদিন মেজবৌদি স্তোক দেয়, আজই বলব।

আব ধ্রুব অফিস থেকে ভয়ে-ভয়ে ফেরে, বেশ রাত করে। না জানি ফিরেই কি শুনতে হবে।

এসেই মেজবৌদিকে প্রশ্ন করে, বলেছিলে ? কিংবা কোনওদিন প্রশ্নও করতে হয় না। ওর চোখের দৃষ্টিই বলে দেয় প্রশ্নটা কি।

মেজবৌদি ঠোঁট উল্টে ইশারায় জানিয়ে দেয়, না, বলতে পারিনি। আসলে মেজবৌদিও ভয় পাচ্ছিল।

তারপর একদিন মেজবৌদি ওর ঘরে এসে হাজির। মুখে উচ্ছল হাসি। উচ্চকিত স্বরে বলে উঠল, এই ধ্রুবদা, আমরা বাবাকে এতদিন একটুও বুঝতে পারিনি। একেবারে অন্য মানুষ, তোমরা কেউ ওঁকে চেনোই না।

ধ্রুবর মনে তখন উদ্বেগ আর কৌতূহল। —ব্যাপারটা কি তাই বল।

—সে কথাই তো বলছি। বাবার গম্ভীর মুখটাই এতকাল দেখে এসেছ। ভিতরে কি আছে জানতে চাওনি।

ধ্রুব অধৈর্য হয়ে উঠল, আঃ, বলই না কি বললেন।

মেজবৌদিকে হেসে হেসে বললে, অনেক ধানাইপানাই করে তুললাম কথাটা। প্রীতিকে তো আপনি দেখেছেন...। মেজবৌদি আবার হেসে উঠল।—বাবা সব শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর ; আমার তো বুক ধড়ফড় করছে। হঠাৎ বাবা কি বললেন জানো, শুনলে অবাক হয়ে যাবে।

—কি বললেন ?

মেজবৌদির মুখে এমন অঢেল হাসি দেখেই বুঝেছে সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। তবু উৎকণ্ঠা যায় না।

—বল না, কি বললেন।

মেজবৌদি হাসতে হাসতে বললে, সেই অকালকুষ্মাণ্ড তোমাকে ঘটকালি করতে পাঠিয়েছে কেন ? নিজে এসে বলতে পারে না ? আমি বাঘ না ভালুক ? আমি তো তার বাবা।

ধ্রুবর মুখেও তখন হাসি ফুটেছে। হাসতে হাসতেই বললে, অসম্ভব। আমি নিজে গিয়ে এখনও বলতে পারব না। কিন্তু রাজি হয়েছেন কি না বলবে তো ?

মেজবৌদি বললে, তোমরা মনে কর তোমরাই বেশি চালাক। বাবা কি বললেন জানো ? বললেন, ও আমি অনেকদিন থেকেই বুঝতে পেরেছি, শুধু ভাবছিলাম

আহাম্মকটা কিছু বলছে না কেন ! মেয়েটি শেষ পর্যন্ত রাজি হ'ল না নাকি।

ধ্রুব হেসে ফেলল। বললে, আর মা ?

—বাবার মত ছাড়া মা'র কি আর কোনও মত আছে নাকি ? মাও খুশি। সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবর বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। কিন্তু ওর তখন অবাক হবার পালা। সত্যি ভাবতে পারছিল না বাবা এত সহজ ভাবে নেবেন, এত সহজে মত দেবেন।

মেজবৌদি বললে, তার চেয়ে বড় কথা কি জানো ? দিদি জিগ্যেস করেছিল, ঠিকুজিটা একবার মিলিয়ে নেবেন না ? বাবা উত্তর দিলেন, নিজেরা বিয়ে করছে, সেখানে আবার ঠিকুজিকুষ্ঠি কি হবে ? যেখানে আমরা ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছি, কেমন ভয়-ভয় করত। অজানা অচেনা সব, তাই অত ভাবতে হয়। বলে হাসলেন।

ধ্রুব শুনে বললে, আমার কুড়িটা টাকা জলে গেল।

—কেন ? মেজবৌদি হেসে তাকাল ধ্রুবর চোখের দিকে। আর ধ্রুব বললে, বাবা যদি রাজিও হন, ঠিকুজি চাইবেন ভেবে জ্যোতিষীকে দিয়ে এমন রাশিচক্র বানিয়ে নিয়েছি প্রীতির, একেবারে রাজযোটক।

মেজবৌদি হাত পেতে বললে, এবার ঘটক বিদেয় কি দেবে দাও। বাবা নিজেই বলেছেন, ঘটকালি করতে তোমাকে পাঠাল কেন।

ধ্রুব বললে, দেব দেব।

তারপর বেরিয়ে গেল। তখনই খবরটা প্রীতিকে দেবার জন্যে। ইচ্ছে করেই সেদিন অনেক রাত করে ফিরেছিল। রাত্তিরে বাবার সঙ্গে, বাবার সামনে যাতে খেতে বসতে না হয়। কি বলে বসবেন, কি জিগ্যেস করবেন সেই ভয়ে।

তারপর বিয়েটা হয়ে গেল। হরিশ মুখার্জি রোডের সেই আগের বাড়িতেই। ওই বৌভাতের দিনেই রাখালবাবুকে ভাল করে দেখেছিল। দু'একটা কথাও বোধহয় বলেছিল ; তবে তেমন একটা আদর আপ্যায়ন করেনি। কেন করবে। ছোট হলেও পুরো বাড়িটাই ওরা তখন ভাড়া নিয়ে আছে। বাবা সদ্য রিটায়ার করেছেন, কিন্তু তিন ছেলেই চাকরি করে। বেশ সচ্ছল।

আর রাখালবাবু থাকতেন ওদের সামনের বাড়ির একতলার একখানা কি দেড়খানা ঘর নিয়ে। স্ত্রী ও দু'তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। দেখে মনে হত বেশ দুঃস্থ।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটার সামনেই রাস্তার ওপারে তখন ছিল টানা ব্যারাকের মতো দোতলা একটি বিধ্বস্ত বাড়ি। তার খোপে খোপে অনেকগুলি ভাড়াটে পরিবার। তারই একটিতে থাকত রাখালবাবুর সংসার। পলেস্তারা খসে খসে দেয়ালের ইট বেরিয়ে পড়েছে, জানালা দরজার কি রঙ ছিল বোঝাই যায় না, জানালা বন্ধ করার সময় সারা পাড়ার লোক শুনতে পেত। বাড়ির মালিক হেমন্তবাবু থাকতেন দোতলায়। বিরাট সংসার, এবং শেষের দিকে তাঁকে দেখেও বেশ দুঃস্থ মনে হত। ঘরে চল্লিশ পাওয়ারের টিমটিমে বাল্‌ব জ্বলতো, তাও দু'খানি কি একখানি ঘরে।

কিন্তু হেমন্তবাবু মানুষটি ছিলেন খুব সজ্জন। যৌবনে তাঁর হয়তো একটু সৌন্দর্য পিপাসাও ছিল। বাড়ির এককোণে একটা পলাশ গাছ যখন লাল হয়ে থাকত, দেখতে ভালই লাগত ধ্রুবর। দেয়াল বেয়ে ওঠা বোগেনভেলিয়া বয়েসের বলিষ্ঠতায় আর লতা ছিল না, প্রায় কাণ্ড। ফুলে ছাওয়া। পিছনের দিকে খালি জমিতেও ঘাসঝোপের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা গাছ নিতান্ত অযত্নেও ফুল ফোটাত। সেটা তখন আর বাগান ছিল না, বেশির ভাগ সময়েই সেখানে নীচের ভাড়াটেরা কাপড় শুকোতে দিত। কাপড় শুকোনোর জায়গা নিয়ে, কিংবা কাপড় টাঙানোর দড়ি ছেঁড়া নিয়ে ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও শোনা যেত।

এই ভাড়াটেদেরই একজন রাখালবাবু। রাস্তায় যেতে আসতে কদাচিৎ দেখা হত। সুমিতা কিংবা বড়বৌদির কাছে ধ্রুব শুনেছিল ভদ্রলোক কিসের যেন ব্যবসা করেন। ধ্রুব ভেবেছিল, দোকানটোকান আছে হয়তো। ওঁর সম্পর্কে ধ্রুবর কোনও ঔৎসুক্যও ছিল না। বৌভাতের দিনে যা দু'চারটে কথা।

তারপর হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হতেই রাখালবাবু ডেকে বসলেন।—এই যে ধ্রুব, তোমার সঙ্গে একট কথা ছিল।

ধ্রুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখে হাসি আনল।

—তোমার বড়দার কাছেই আমি গেসলাম, বড়দা বললেন, বুঝলে কি না, তুমি ভাল ইংরিজি জানো, তুমিই ভাল পারবে।

ধ্রুব রাখালবাবুকে এড়িয়ে চলে আসার জন্যে তখন ব্যগ্র। সদ্য অফিস থেকে ফিরছে, এমনিতেই ক্লান্ত। তাছাড়া তখন তো বিয়ের পরের দিনগুলো, প্রীতির কাছে ফিরে আসার জন্যেও বেশ একটা ব্যগ্রতা ছিল।

রাখালবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, সেজন্যেই তোমাদের কাছে ধর্না দেওয়া। তোমরা না করে দিলে কার কাছে যাই বল ?

ওঁর বলার ধরনে ধ্রুব একটু নরম হ'ল।—কি বলুন ?

—আমাদের গাঁয়ে একটা ইস্কুল আছে, বুঝলে কি না। সেখানে একজন উপমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বুঝলে কি না। তাঁর নামে ইংরিজিতে একটা অভিনন্দন লিখে দিতে হবে। সরকারি গ্র্যান্ট না বাড়ালে ইস্কুলটা উঠে যাবে।

ধ্রুবর একটুও ইচ্ছে ছিল না। সাবা শরীর চিড়বিড় করে উঠেছে। রাগ গিয়ে পড়েছে দাদার ওপর। নিজে কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামাবার জন্যে কি দরকার ছিল ধ্রুবর নাম করার। ধ্রুবই ভাল পারবে ! কেন ? তুমি নিজে করে দিতে পারতে না ? কিংবা বলতে পারতে না, অন্য কাউকে বলুন !

রাখালবাবু বললেন, এই শনিবারেই চাই কিন্তু ধ্রুব। বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করেছেন।—সব লেখা আছে, দেখে নিও। ইস্কুলের নামটাম, উপমন্ত্রীকে কি বলতে হবে।

এ ধরনের কাজ কখনও করেনি ধ্রুব, জানেও না। তবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে হয়েছে।

কাজের দায়িত্বটা নিয়েই রাখালবাবু লোকটির ওপরই ও রেগে গেছে, বিরক্ত হয়েছে।

বাড়িতে ফিরেই রাগ গিয়ে পড়েছে বড়বৌদির ওপর।—দাদার কি দরকার ছিল লোকটাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দেওয়ার। অত যদি দয়ামায়া, নিজে করে দিলেই তো পারত।

সব শুনে বড়বৌদিও রেগে গেছে। বলেছে, ওসব কথা আমাকে বলছ কেন, নিজের দাদাটিকে বললেই তো পার।

কিন্তু যত রাগই হোক ধ্রুবকে কাজটা করে দিতে হয়েছিল। রাত জেগে, তিন দিন ধরে সেটা ঘষামাজা করে একটা গুরুগম্ভীর স্তবের মতো করে লিখে দিয়েছিল।

শেষ হতেই প্রীতিকে বলেছিল, উপমন্ত্রীকে তৈলদান কমপ্লিট।

প্রীতি আধখানা পড়েই হেসে লুটোপুটি।

কিন্তু রাখালবাবু অভিনন্দন পত্রখানা পেয়েই একবার ভাঁজ খুললেন, ভাঁজ করলেন। তারপর পকেটে রেখে দিলেন। মুখে তৃপ্তির হাসি। পড়ে দেখলেনও না।

ব্যস, এটুকুই পরিচয়, এটুকুই উপকার।

ওই ব্যারাকের মতো বাড়িটাকে ওরা উপেক্ষাই করত। এমনকি ওই বাড়ির মালিক

হেমন্তবাবুকেও এড়িয়ে এড়িয়ে চলত, যদিও মানুষটি ছিলেন খুবই সজ্জন, বিনয়ী ভদ্রলোক। ওঁর বিনয় হয়তো বা খানিকটা হতাশা থেকে, দারিদ্র্য থেকে। অথচ সত্যি তো দরিদ্র ছিলেন না। একটা বাড়ির মালিক। দরিদ্র হবেন কেন।

ধ্রুবদের ভাড়া-বাড়িটা ছিল রীতিমত ভাল, বলতে গেলে একেবারে ঝকঝকে নতুন। আর হেমন্তবাবুর নিজের বাড়িটা ধসে পড়া পুরনো বলেই মনে হত, একরাশ জঞ্জালের মতো। বোগেনভেলিয়া আর পলাশ গাছ থাকা সত্ত্বেও। সেজন্যেই হেমন্তবাবুদের বোধহয় ওরা উপেক্ষা করত।

একদিন মাঝরাত্তিরে লরির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ধ্রুবর। জিনিসপত্র যেন নামানো বা ওঠানো হচ্ছে। কুলিদের কথাবার্তা।

ধ্রুব বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসছিল। এত রাত্রে কিসের শব্দ জানার আগ্রহে। ও ভেবেছিল, রাখালবাবুর ড্রাম এসেছে। না, তা নয়। এসে দেখল, আসবাবপত্র ওঠানো হচ্ছে লরিতে।

ভেবেছিল, সামনের বাড়ির নীচতলার ভাড়াটেরা কেউ উঠে যাচ্ছে। কিন্তু না, নীচতলার ভাড়াটেরাও কেউ জানতে পারেনি। বোধহয় ঘুম ভাঙেনি তাদের। শুধু ধ্রুবরা লক্ষ করল, পরপর ক'দিনই দোতলার কোনও ঘরেই আলো জ্বলল না। শেষে একদিন জানা গেল হেমন্তবাবু বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছেন। বাড়ি বিক্রি করার লজ্জায় রাত্রে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে চলে গেছেন তিনি।

ধ্রুবর বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মানুষটির জন্যে।—বেচারা বোধহয় ভাল দামও পায়নি। গোপনে গোপনে তো বিক্রি করেছেন।

কে যে বাড়িটা কিনল তা ধ্রুবরা জানত না। অনেকদিন পড়ে ছিল, কোনও নতুন মালিক এসে দোতলায় দরজা জানালা খোলেনি।

এখন আর ধ্রুবর স্পষ্ট মনেও পড়ে না, নীচের ভাড়াটে রাখালবাবুরা কবে উঠে গেলেন। অন্য ভাড়াটেরাও।

শুধু মনে আছে, একদিন কয়েকজন লোক এসে কি সব মাপজোক করল, আর পরের দিন থেকে বাড়িটা ভাঙতে শুরু করল।

ওঃ, সে যে কি বিড়ম্বনা। মাসখানেক ধরে চলল বাড়ি ভাঙার কাজ। ধ্রুবদের বাড়ি তখন ধুলোয় ধুলো, যতবার ধোয়া মোছা হয়, দেখতে দেখতে ঘরগুলো আবার ধুলোয় ভরে ওঠে। কি বিরক্তিকর দিনই না গেছে।

নতুন বাড়ি উঠতে শুরু হ'ল সেই জমিতে। একটা সাইনবোর্ডও ছিল তখন। শোনা গেল ওই জমিতে চারতলা বাড়ি উঠবে, আটখানা ফ্ল্যাট হবে। ফ্ল্যাট বিক্রি হবে।

প্রীতির তখন থেকেই খুব বাড়ি-বাড়ি নেশা। ও বলেছিল, খোঁজখবর নাও না, একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখলে ভাল হত।

ফ্ল্যাট কেনার কথা ধ্রুব তখন কল্পনার মধ্যেই আনতে পারে না। টাকা কোথায়। তাছাড়া নিজেকে ও তখনও সংসার থেকে পৃথক করে ভাবতে শেখেনি।

তাই প্রীতির কাছে শোনা কথাটা গিয়ে বলেছিল বড়বৌদির কাছে। বলেছিল, বাবাকে একবার বলে দেখ।

বড়বৌদিরও বোধহয় কথাটা মনে ধরেছিল। ধ্রুব বড়বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বাবার কাছে।—একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখলে হত। একেবারে পাড়ায়, বাড়ির সামনেই।

ধ্রুবর বাবা হাসলেন।—এই বিরাট পরিবার, ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট কিনে কি হবে? তার চেয়ে কোথাও জমিটমি পাওয়া গেল বাড়ি করা যেত।

ব্যাস। ওখানেই সব স্বপ্ন থেমে গিয়েছিল। ওরা তখন সকলেই ব্যস্ত চাকরি নিয়ে।

জমিটমি কে খুঁজবে। তাছাড়া বাবার কাছেও তেমন উৎসাহ পায়নি ধ্রুব। ইতিমধ্যে টিপু এসেছে। টিপু বড় হচ্ছে।

টিপু যতই বড় হচ্ছিল, ততই ঘরের অভাব দেখা দিচ্ছিল। ওদিকে একে একে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আসবাব বাড়ছিল ঘরের। পরিবারের লোকজন যতই বাড়ছে, বাড়িটা দিনেদিনে ততই যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে। দাদার দু'দুটি ছেলে। স্কুলে পড়ে। মেজদার একটি মেয়ে, সেও স্কুলে। সবশেষে এই টিপু, এও বড় হবে। বড়বৌদির সবসময়ে অভিযোগ, ছেলেদের পড়ার জায়গা নেই। মেজবৌদির অভিযোগ মেয়ের শোবার জায়গা নেই। এর ওপর সুমিতার আরো নানান বায়না। আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়ারও বিরাম নেই। মেয়ে-জামাইও আসে মাঝে মাঝে।

একটা অশান্তি যেন দানা বাঁধছিল দিনে দিনে। আর চোখের সামনে ফ্ল্যাট বাড়িটা উঠছে। সেই পলাশ গাছটাও নেই, বোগেনভেলিয়াও সারা পাড়াটা এখন আর আলো করে রাখে না। ওদিকে তাকালে মাঝেমাঝে হেমন্তবাবুর কথা মনে পড়ে। পুরনো হতশ্রী বাড়িটাকে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। পারলেন না। শেষে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে পালাতে হল।

সেইজন্যেই হেমন্তবাবুর জন্যে ধ্রুবর দুঃখ হয়। আচ্ছা, উনি কি আবার সেই ধ্রুবদের মতোই ভাড়াটে হয়ে গেলেন ! নাকি যা কিছু টাকা পয়সা পেয়েছেন, অনেক দূরে, শহরের বাইরে গিয়ে নতুন একটা বাড়ি করেছেন। কেউ জানে না।

বারান্দা থেকেই প্রীতি একদিন ডাকল, এই শোনো শোনো, দেখে যাও।

ধ্রুব টিপুকে নিয়ে খেলা করছিল। একটা খেলনা মোটরগাড়ি কিনে দিয়েছে টিপুকে। টিপুর আব্দারে সেটায় বারবার চাবি ঘুরিয়ে দম দিতে হচ্ছিল ওকে।

প্রীতি আবার ডাকল, এসো না, দেখে যাও, কি সুন্দর রঙ করছে।

ধ্রুব উঠে গেল। বাড়িটা তখন শেষ হয়ে এসেছে। গিয়ে দেখল, বাইরের দেয়ালে রঙ শুরু হয়েছে।

ধ্রুব দেখে বললে, বাঃ দারুণ লাগছে। খুব সুন্দর রঙ।

প্রীতি বললে, ওই পরের বাড়ির প্রশংসা করেই জীবনটা কেটে যাবে, নিজেদের তো কিছু হবে না।

ধ্রুব দমে গেল। এই একটা কথা শুনলেই ওর নিজেকে বড় অক্ষম লাগে। অসহায় লাগে।

বাবার কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে না। আন্দাজে আন্দাজে যেটুকু বোঝে ধ্রুব, যা আছে বাবার—ওই পেনসান, তাতে তাঁর নিজের জীবনটা কেটে গেলেই যথেষ্ট। এত বড় পরিবারের জন্যে একটা বাড়ি করা সম্ভবও নয়। দাদা মেজদারা প্রায়ই এবাড়ির অসুবিধের কথা বলে। হয়তো কোনওদিন নিজেরাই ফ্ল্যাট কিনবে।

এদিকে বাড়িওয়ালাও প্রায়ই উঠে যাওয়ার কথা বলছে।

প্রীতি একদিন বললে, দেখো ফ্ল্যাট কেনাটেনার কথা ভেবে লাভ নেই, বরং একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে উঠে চল।

আসলে ধ্রুব নিজেই তো আর মানিয়ে চলতে পারছিল না। প্রীতি পারবে কি করে।

ও সব সময় একটা হীনম্মন্যতায় ভুগত। এবাড়ির বড়বৌ, মেজবৌ দু'জনেই বাপের বাড়ি থেকে যথেষ্ট দানসামগ্রী নিয়ে এসেছে। প্রচুর গয়নাগাঁটি। এ বাজারের দরদামে হিসেব করলে অনেক টাকা। সে তুলনায় প্রীতি প্রায় কিছুই আনেনি। ওর বাবা অবশ্য সাধ্যের তুলনায় যথেষ্ট দিয়েছেন, কিন্তু প্রীতি জানে ওদের তুলনায় তা কিছুই নয়।

ওরা যখন জড়োয়া গয়নায় সেজে বিয়েবাড়িতে যায়, প্রীতি সঙ্গে যেতে চায় না।

সেজন্যে ওর লজ্জা, সেজন্যে ওর রাগ। মনে মনে ভাবে, মেয়েরা কি কোনওদিনই বদলাবে না ! আসলে ছেলেরা না বদলালে মেয়েরাই বা বদলাবে কি করে।

কিন্তু এইসব থেকে ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে বারুদ জমছিল। হঠাৎ একদিন বিস্ফোরণ ঘটল।

প্রীতি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলে বসল, আমি আর এ-বাড়িতে এক দণ্ডও থাকব না।

ধ্রুবও তার কথায় সায় দিল। —না, এক দণ্ডও না।

দপদপ করে পা ফেলে গিয়ে দাঁড়াল বাবার কাছে। বাবা সব শুনেছেন। শুনলেও উনি আজকাল চুপচাপ থাকেন। কারও হয়ে কোনও কথা বলেন না। উনি জানেন, এখন আর ওঁর কথার কোনও দাম নেই। ছেলেদের ওপর ওঁর আর কোনও জোর নেই। কারণ ছেলেরা সবাই এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে গেছে বলেই উনি সংসারের কাছে ফালতু মানুষ হয়ে গেছেন।

অথচ এই ছেলেরাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে বলে বুকের ভিতরে একসময়ে কত গর্ব ছিল। গর্ব এখনও।

খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বুঝতে পারলেন ধ্রুব এসেছে ; কিছু বলতে চায়। তবু চোখ তুললেন না।

—বাবা !

—বল।

ধ্রুবর গলার স্বরে তখনও ক্রোধ উপছে পড়ছে। বললে, এই অশান্তি নিয়ে এ-বাড়িতে আর থাকা যায় না।

ধ্রুবর মা বারান্দার এক চিলতে রোদ্দুরে বড়ি শুকোতে দিচ্ছিলেন। ভুরু কুঁচকে একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। বেশ রাগত স্বরে বললেন, অশান্তি তো তোরাই করছিস। সংসার তো এখন তোদের, শান্তি থাকলে তোদেরই, অশান্তি করলেও তোরাই।

—আমরা অশান্তি করছি ? ধ্রুব আরো রেগে গেল।

মা বললেন, তোরা সবাই। সংসার যখন আমাদের ছিল, তখন তো এ-সব অশান্তি ছিল না।

ধ্রুবর বাবা এতক্ষণে কথা বললেন। —এসবের মধ্যে আমাদের আর টানছিস কেন ! আমরা সাতেও নেই পাঁচেও নেই। দু'বেলা দুটি খাই, আর কাজ তো নেই, পড়ে পড়ে ঘুমোই। বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা।

বাবার গলার স্বরে, বলার ধরনে, কি যেন ছিল। ধ্রুবর মন নরম হয়ে আসছিল। হয়তো রাগ পড়েও যেত।

তার আগেই প্রীতি এসে দাঁড়িয়েছে। —আপনি বলছেন, এই সব অন্যায় সহ্য করে চলতে হবে !

ধ্রুবর বাবা মুখ না তুলেই বললেন, আমি কিছুই বলছি না। রিটায়ার্ড ম্যান, আমার আর বলার এক্তিয়ার কোথায় ?

প্রীতি বলল, বাবা, এভাবে অশান্তি বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। বলে ধ্রুবকে চোখের ইশারা করল। অর্থাৎ যা বলতে এসেছিল বল।

ধ্রুব আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, আমরা উঠে যাচ্ছি। আমরা উঠে গেলেই তো ওরা শান্তি পাবে।

প্রীতি বললে, হ্যাঁ বাবা, আমরা চলেই যাব।

বাবা চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকালেন ছেলের মুখের দিকে।

—চলে যাবি ?

মাথা নীচু করলেন। একটু থেমে বললেন, যেতে চাস, যা। কেউ যেতে চাইলে কি আর ধরে রাখা যায়।

হঠাৎ হেসে ফেললেন। হাসিটা কান্নার মতো। বললেন, আমাদেরও তো যাবার সময় হয়ে এল।

ধ্রুব আর প্রীতি চলে এল। বাবার সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না ধ্রুব।

ফিরে আসতেই বড়বৌদি বলে বসল, চলে যাবে সে তো ঠিক করেই রেখেছিলে, অজুহাত দেওয়ার দরকার কি ছিল।

ধ্রুব আরো রেগে গেল সে কথা শুনে। কোনও জবাব দিল না। কিন্তু চলে যাব বললেই তো চলে যাওয়া যায় না। কোথায় যাবে ! তার আগে তো একটা ভাড়ার ফ্ল্যাট জোগাড় করতে হবে।

এই বাড়িটা যখন ভাড়া নিয়েছিল, তখন বাড়ির সামনে 'টু লেট' ঝুলত। ভাড়াও কম। ভাড়া বাড়িয়ে বাড়িয়েও এখনও যথেষ্ট কম।

অফিসের বিনোদবাবু শুনে ধ্রুবকে বলেছিলেন, আপনি তো মশাই বিনা ভাড়ায় একটা গোটা বাড়ি নিয়ে আছেন। নতুন ভাড়াটেদের দুঃখ আপনি বুঝবেন না।

সত্যিই বুঝত না ধ্রুব। কোনওদিন তো খোঁজ করতে হয়নি। হয়তো দু'চারজনের কাছে শুনেছে, কিন্তু মনে দাগ কাটেনি।

অথচ এখন আর উপায় নেই। বলে ফেলেছে, চলে যাব। আর মা এসে একটুও কান্নাকাটি করেননি। বাবাও বলেছেন, যেতে চাস, যা। এখন আর উপায় নেই। মানমর্যাদার প্রশ্ন।

মেজবৌদি একদিন বললে, চলে যাবার আগে আমাকে অন্তত জানিয়ো ধ্রুবদা, দুম করে চলে যেও না।

অর্থাৎ সকলেই ধরে নিয়েছে ওরা চলে যাবে।

তখন ধ্রুবর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান একটা ভাড়ার ফ্ল্যাট। যার সঙ্গেই দেখা হয়, কথায় কথায় জানিয়ে রাখে। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে চোখ বুলিয়ে যায়। দালাল ধরে।

প্রীতি বলেছিল, তিনখানা ঘর না হলে চলে না। একখানা শোবার ঘর, একটা বসার : আর টিপু তো বড় হচ্ছে, ওর জন্যে একটা। ও তো বড় হচ্ছে, শোয়ার আর পড়ার জন্যে ওই একটা বাড়তি ঘর দরকার।

প্রীতি ওর দাদাকেও বললে একটু খোঁজ রাখতে।

সে সব শুনে বললে, তিনখানা ঘর ? সে তো চার পাঁচশো টাকা ভাড়া হবে। তাছাড়া এদিকে কোথায় আর পাবি। অনেক দূরে যেতে হবে।

প্রীতি বললে, চার পাঁচশোই দেব।

—দিবি ? তা হলে খাবি কি ? পাঁচশো টাকা যদি ভাড়াতেই চলে যায় !

ধ্রুব সে-কথাও ভেবেছিল। একটু ভয় ভয় করত। যদি চালাতে না পারি !

তখন অবশ্য এমন বাজার ছিল না। আর চার পাঁচশো টাকাতেও ফ্ল্যাট পাওয়া যেত।

কিন্তু হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে ধ্রুব তখন হয়রান হয়ে গেছে। কোথাও আর মনের মতো ফ্ল্যাট মিলছে না। যদি বা পাওয়া যায় তাদের আবার ভাড়াটেকেই পছন্দ হয় না। বিনোদবাবুর কথাগুলো তখনই মনে পড়েছিল। পুরোনো ভাড়াটেদের ওপর কেন তাঁর এত রাগ বুঝতে পেরেছিল।

একদিন বলেছিলেন, আইনটাইন বদলানো উচিত। একশো দেড়শো টাকায় একটা পেল্লায় বাড়ি নিয়ে থাকবে কেন মশাই ? আর আমি তো চারশো দিতে চাই, কোথাও

পাচ্ছি না।

শুনে বিছুটির জ্বালা ধরত। যেন বিনোদবাবু ওদের হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটা সম্পর্কেই বলছেন।

ভাড়ার ফ্ল্যাট খুঁজতে খুঁজতে ধ্রুবও তখন বিনোদবাবুর দলে। ক্রমশই যেন হতাশ হয়ে পড়ছিল।

বাড়িতেও তখন সবসময় থমথমে ভাব। কোথাও কোনও হাসিহল্লা নেই, রেডিও চলে না, চললেও চাপা গলায়, রেকর্ডে গান শোনা যায় না। যেন বাড়িতে কোনও মুমূর্ষু রোগী আছে।

প্রীতি হেসে বলেছিল, এরই নাম কোল্ডওয়ার।

ধ্রুবর তখন একটাই কাজ। সকালে উঠেই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা। ঠিকানা থাকলে সটান সেখানেই চলে যাওয়া। বেশির ভাগই বক্স নম্বর। অতএব বসে বসে চিঠি লেখো। তারপর ব্রোকারের অফিসে তাগাদা দিতে যায়। রাস্তার মোড়ে কিংবা চায়ের দোকানের সামনে কোথাও কোথাও জনাকয়েক উটকো দালাল জটলা করে। তাদের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করে, কিছু খবর পেলেন? বেশ তোষামোদের গলায় বলতে হয়। যেন তারা ইচ্ছে করলেই একটা ভাল ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিতে পারে। কামধেনুর মতো তারা তিনচারটে দারুণ ভাল ভাল ফ্ল্যাটের খবর বলে। ধ্রুব উৎসাহ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাড়ার অঙ্কটা শুনতে হয়। শুনেই থমকে যেতে হয়। কিংবা অন্য কোনও শর্ত।

কেউ কেউ ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে যায়। বাড়িটায় ঢোকার আগেই ফ্ল্যাট অপছন্দ, তবু দালালকে খুশি রাখার জন্যে চারতলায় উঠতে হয়, জানলা দরজা খুলে ঘর দেখতে হয়।

তারপর অন্য কোনও কারণ দেখিয়ে বলতে হয়, না এটা চলবে না।

দালাল হাত পাতে, হেসে বলে, ঘোরাঘুরি তো করছি, দেখি..

পাঁচ, দশ, বিশ টাকা দেয় ধ্রুব। জানে, এদের অনেকের এই টাকাটাই রোজগার।

কোথাও পাড়াটা খারাপ, কোথাও বাড়িটা পুরনো, জানালা দরজা ভাঙা। কোথাও বাথরুম কিংবা রান্নাঘরই সমস্যা। অথবা আলোবাতাস নেই।

ধ্রুব বেশ বুঝতে পারে, যে-বাড়িটা ছেড়ে আসছে, ও সেই রকম একটা ফ্ল্যাট খুঁজছে। যে পাড়া ছেড়ে আসছে, সেই রকম পাড়া খুঁজছে।

দেখতে দেখতে দুটো মাস পার হয়ে গেল। প্রীতি অনুযোগেব স্বরে বললে, তোমার এখান থেকে যাওয়ার ইচ্ছে নেই সে-কথাটা ফ্র্যাঙ্কলি বললেই তো পার।

ধ্রুব অবাক হয়ে তাকাল প্রীতির মুখের দিকে। কোনও কথা বলল না। একটা অক্ষমতা, একটা অসহায়তার মধ্যেই ও তখন নিপীড়িত। প্রীতির কথায় ও বোধহয় রীতিমত ধাক্কা খেল।

বাড়ির পরিবেশও এদিকে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

ঠিক সেই সময়েই একটা ঘটনা ঘটে গেল। অভাবিত।

ফ্ল্যাট দেখতে যাওয়ার জন্যে প্রায়ই লেট হয়ে যেত অফিসে। কোনও কোনওদিন অবশ্য প্রীতি একাই চলে যেত। টিপুকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর এক সময় বিষণ্ণ মুখ নিয়ে ফিরে আসত।

সেদিনও বিকেলে একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা। টেলিফোনে অফিসেই খবর পেল। তাই একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল।

ফিরেই দাদার মেয়ে সিমলির কাছে শুনল, ছোটকাকিমা বেরিয়ে গেছে।

—কোথায় গেছে বলে গেছে?

সিমলি ঠোঁট ওল্টালো।—কি জানি।

এটাই এখন এ বাড়ির রীতি। যেটুকু খবর বলেছে সেটুকুই যেন বাড়তি। বড় অভিমান হয়, বুকে লাগে। বিয়ের আগে দাদা বৌদিরা কত আপন ছিল। এই সিমলিকে ধ্রুব তো কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। অথচ এখন সিমলিও যেন কেমন পর-পর। হয়তো মা-বাবার কথা শুনে শুনে দূরে সরে যাচ্ছে।

ঠোঁট উল্টে 'কি জানি'। যেন জানার প্রয়োজনই নেই। দোষ শুধু সিমলির নয়। প্রীতিও ওদের কোনও কথা জানিয়ে যায় না। ধ্রুবকেও তখনই বেরোতে হবে, তা না হলে বাড়িওয়ালা থাকবে না। এদিকে সন্ধেও হয়ে আসছে। ও ভেবেছিল, প্রীতিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ভাবল, একাই চলে যাই।

বেরোতে যাচ্ছে, মেজবৌদি বললে, প্রীতি তো, সেই গুণ্ডামতো দালালটা এসেছিল একদিন, একটা হাত কাটা, তার সঙ্গে কি সব কথা বলছিল, হঠাৎ বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে।

গুণ্ডামতো! কথাটা কানে বিস্বাদ লাগল ধ্রুবর। মনে হল যেন ইচ্ছে করেই বললে মেজবৌদি।

কিন্তু লোকটিকে চিনতে পারল। বেঁটেখাটো দারুণ ভাল স্বাস্থ্য লোকটির। কপালে একটা দাগ আছে, বাঁহাতের কনুই থেকে ফুল হাতা শার্টের হাতাটা ঝুলে থাকে। ওটুকুর জন্যেই লোকটিকে নিরাপদ মনে হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে তাকে ধ্রুবরও অপছন্দ। কথাবার্তাতেও অশালীন।

ওই লোকটির সঙ্গে প্রীতি একা বেরিয়ে গেল? কোথায় কতদূরে নিয়ে যাবে কে জানে। এত তাড়াহুড়োর কি ছিল। ওকে তো সন্ধের পর কিংবা কাল সকালে আসতে বললেই হত।

বাড়িওয়ালা লোকগুলোকে এই দু'মাসে হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছে ধ্রুব। কথাবার্তার ধরনই অন্যরকম। এই আজ যেখানে যাবার কথা, দালাল ফোন করতেই ও বললে অফিস ছুটির পর যাবে। সে উত্তর দিলে, তা হলে উনি বেরিয়ে যাবেন, বলেছেন সাড়ে ছ'টার মধ্যে যেতে হবে। যেন ট্রেন ধরার ব্যাপার, ঘড়ি ধরে পৌঁছতে হবে। অবশ্য বলা যায় না, দালালটির নিজের ব্যগ্রতাও হতে পারে। একটা ফ্ল্যাট জুটিয়ে দিলেই তো একমাসের ভাড়া পাবে।

প্রীতির জন্যে খানিকটা উৎকণ্ঠা নিয়েই বেরিয়ে পড়ল ও।

বাস স্টপে পৌঁছতে দেখতে পেল ট্যাক্সি থেকে নামছে প্রীতি।

ধ্রুব কিছু প্রশ্ন করার আগেই প্রীতি হাসতে হাসতে বলে উঠল, দারুণ সুন্দর ফ্ল্যাট। এইমাত্র দেখে এলাম। কাছেই, বকুলবাগানে।

এমন স্বতঃস্ফূর্ত হাসি প্রীতির মুখে বহুদিন দেখেনি ও।

প্রীতি বললে, আজই, এখনই টাকা নিয়ে চলে যাও। তা না হলে, কাল সকালে একজন আসার কথা।

ধ্রুব বললে, কিন্তু দালাল লোকটা এল না কেন? কোথায় পাব ওকে?

প্রীতি ভুরু কুঁচকে বললে, কি যে বল, ওই গুণ্ডাটাইপের লোকটাকে কি আমি ট্যাক্সিতে সঙ্গে নিয়ে আসব!

তারপরই বললে, ওর চেহারাটাই ওই রকম, লোকটা কিন্তু ভীষণ ভাল।

মেজবৌদি বলেছিল, 'গুণ্ডামতো', তখন খুব খারাপ লেগেছিল। এখন প্রীতি বলছে গুণ্ডাটাইপের। শুনতে অন্য কারণে খারাপ লাগল। একটা ভাল ফ্ল্যাট পাওয়া গেছে, অন্তত পাওয়ার আশা। ওই লোকটাই জোগাড় করে দিচ্ছে, তাই এখন ওকে গুণ্ডাটাইপ বলতেও খারাপ লাগছে।

ধ্রুব জিগ্যেস করল, কোন তলায় ? ভাড়া কত ?

প্রীতি বললে, ওকে সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সিতে আসব না বলেই বুদ্ধি করে বললাম, আধ ঘণ্টা পরে আসতে।

ধ্রুব আগের প্রশ্নগুলো আবার করল।

প্রীতি বললে, দোতলায়, সাড়ে চারশো। শুধু এক মাসের অ্যাডভান্স।

সাড়ে চারশো। প্রীতির দাদার কথাটা মনে পড়ল। বাড়ি ভাড়াতেই অত বেরিয়ে গেলে খাবে কি ? কথাটা সেদিন বুকে গিয়ে লেগেছিল, কিন্তু কথাটা তো সত্যি। তা হোক। ধ্রুব ভাবল, যেমন করে হোক চালিয়ে নেব। এই একটা দিক নিয়ে কারও কোনও ভাবনা নেই। না সরকারের, না কোম্পানিগুলোর। মাইনে দিয়েই দায়দায়িত্ব শেষ। তার অর্ধেক যে বাড়িওয়ালার গর্ভে চলে যাবে সে খেয়ালই নেই। অর্থাৎ কলকাতায় থাকার তোমার অধিকারই নেই, আহা, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করো। সেখানেও ঘন ঘন ট্রেন লেট, মানে হাজরি-খাতায় লাল দাগ। বড় সাহেব, মেজ সাহেবের লাল চোখ।

ওদের তো কোনও চিন্তা নেই, অফিসের খরচায় ভাল-ভাল ফ্ল্যাট। গাড়ি। ব্যাটাবা পাংচুয়েলিটির বড়াই করে।

ওদের জন্যে কোম্পানিগুলো বেশি বেশি টাকা দিয়ে ভাল ফ্ল্যাটগুলো নিয়ে যাচ্ছে বলেই তো সাধারণ মানুষের এই হাল।

পকেটে টাকাটা নিয়ে ধ্রুব অপেক্ষা করল বাড়িতে ফিরে। দালাল লোকটা কখন আসে। আসবে তো !

—দক্ষিণ খোলা ?

প্রীতি অবাক হয়ে তাকাল। বললে, তা তো জানি না। রান্নাঘরটা বেশ বড়। বাথরুম ছিমছাম, পরিষ্কার।

দক্ষিণ খোলা কি না তা দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি ও। তাই স্তোক দেবার মতো করে বললে, দক্ষিণে আর কতটুকু হাওয়া আসে।

—বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হল ?

—না। বাড়িতে একটা ইয়া গোঁপওয়ালা দারোয়ান আছে, সেই দেখাল ফ্ল্যাটটা। দালালটা বললে, বাড়িওয়ালার সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে হবে। কোন কোম্পানি, কত মাইনে, আরও কি সব জানতে চাইবে। এর আগে একজনকে দেয়নি। একজন মাদ্রাজি আজই দেখে গেছে, কাল আসবে সকালে।

ধ্রুব বললে, তা হলে আর গিয়ে লাভ কি, ইন্টারভিউয়ে ফেল করে যাব। একজন মাদ্রাজি ক্যান্ডিডেট যখন আছে...বাড়িওয়ালারা আজকাল খুব মাদ্রাজি পছন্দ করে।

প্রীতি হেসে বললে, না এখন আর তা নেই ; এখন ওরা মাদ্রাজিদেরই বেশি ভয় পায়। বাঙালিকে ফ্রায়িংপ্যান ভাবত, এখন ফায়ার কি বস্তু বুঝতে পারছে। দালালটা অবশ্য সে-রকমই বললে।

দালালটা, দালালটা। ধ্রুবর শুনতে ভাল লাগছিল না। ব্রোকার বললেই তো হয়। কারণ, ওই একজন এতকাল পরে একটু আশার আলো দেখিয়েছে। ও তো হতাশ হয়ে পড়েছিল। হতাশ এবং ক্লান্ত।

লোকটা এল। পকেটে টাকা নিয়ে ধ্রুব বেরিয়ে গেল।

রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে লোকটা কেবলই বলছে, ওই তো আর একটু। বাড়িটা এত চমৎকার, ফার্স্টক্লাশ ফ্ল্যাট, বৌদির খুব পছন্দ হয়েছে।

সামনেই একটা ঝকঝকে চমৎকার বাড়ি, দোতলায় ব্যালকনি আছে। একেবারে ছবির

মতো সুন্দর। ধ্রুব ভাবলে, ওই বাড়িটাই। বাইরে থেকে দেখে ফ্ল্যাটটা ভারী ভাল লেগে গেল। ধ্রুব ভাবলে ওটাই হবে হয়তো। বেশ খুশি হয়ে উঠল।

কিন্তু না। ওটা নয়। লোকটা ও বাড়ি পার হয়ে এগিয়ে চলেছে। আরেকটা বেশ ভাল বাড়ি। ঝকঝকে নতুন। এটাই হয়তো, ধ্রুব ভাবলে।

না, ওটাও নয়।

শেষে আরেকটা বাঁক নিয়ে সরু গলিটার মধ্যে ঢুকল। গলিটা দেখেই ওর পছন্দ হয়নি। কিন্তু বাড়িটা ভাল লেগে গেল। আগে যে দুটো চমৎকার বাড়ি ওর মন কেড়েছিল, সুন্দর লেগেছিল, তেমন ভাল নয় এটা। তবু মনকে বোঝাল, খারাপই বা কি!

বাইরে থেকে দেখল। তারপর বললে, ফ্ল্যাটটা আমি তো দেখিনি, একবার দেখলে হয় না?

দারোয়ান বললে, চলিয়ে। লেকিন বাত্তি নেই।

সিঁড়িতে আলো ছিল। কিন্তু ফ্ল্যাটের ঘরগুলো একেবারে অন্ধকার। আগের ভাড়াটে ভদ্রলোক তাঁর বাল্‌বগুলো খুলে নিয়ে যেতে ভোলেনি।

দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে যেটুকু দেখা যায় দেখল ধ্রুব। পছন্দ হল কি হল না নিজেও বুঝতে পারল না।

দালাল লোকটি বললে, বৌদির কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে।

লোকটার মুখে বারবার বৌদি কথাটা ভাল লাগছিল না।

আসলে ধ্রুবর চেয়েও দালালটির ব্যগ্রতা যেন বেশি।

ধ্রুব বললে, ঠিক আছে।

দরজায় তালাচাবি লাগল দারোয়ান।

গোঁপওয়ালা বিহারি দারোয়ানের পিছনে পিছনে ওরা নেমে এল।

দরজার বাইরে এসে দারোয়ান ওদের বললে, ঠহরিয়ে। অর্থাৎ অপেক্ষা করুন।

বলে আবার সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে গেল। যাবার আগে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

লোকটা খুবই সাবধানি। বিশ্বাস করে দরজাটা খুলে রেখেও গেল না। সঙ্গে করে ওপরেও নিয়ে গেল না।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এভাবে অপেক্ষা করতে হলে বড় হীনম্মন্যতায় ভুগতে হয়। ধ্রুব সেজন্যে ভিতরে ভিতবে বিরক্তি বোধ করছিল। লেনদেনের ব্যাপার। তুমি ভাড়া দেবে, আমি ভাড়া নেব। দুজনেরই স্বার্থ। তুমি আমার উপকার করার জন্যে ভাড়া দিচ্ছ না। তুমি তিনতলার হাওয়া খেতে চাও, তাই নীচের তলা এবং দোতলা বানাতে হয়েছে। সুতরাং সেগুল খালি ফেলে রাখতে চাও না। হিসেব করে দেখেছ, ফেলে রাখলে লোকসান। তাই ভাড়া দিচ্ছ। দয়া করে নয়। অথচ ভাবটা এমন, যেন উনি জমিদার আর ধ্রুব প্রজা।

এভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে ধ্রুবর খুবই খারাপ লাগছিল। অথচ মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ। ওকে বাড়িওয়ালার পছন্দ হবে কি না, ভাড়া দিতে রাজি হবে কি না।

পছন্দ না হলে হয়তো এক কথায় বলে দেবেন, না মশাই দেব না। কিংবা ভদ্রতা করে বলবেন, আগে এলে না, একজনকে দিয়ে ফেলেছি।

দু'মাস ধরে ঘুরে ঘুরে এদের চিনে ফেলেছে ধ্রুব।

কিছুক্ষণ পরেই গোঁপওয়ালা দারোয়ানটা ফিরে এল। বললে, চলিয়ে। ধ্রুব তার পিছনে পিছনে ওপরে উঠে গেল।

একটা দরজা দেখিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকতে বলল দারোয়ান।

ধ্রুব পা বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক গলায় বললে, আপনি!

ভদ্রলোকও চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মুখে হাসি। বললেন, বসো, বসো।

ধ্রুব বসল। তাকিয়ে তাকিয়ে চারপাশ দেখে নিল। বেশ গোছানো বসার ঘর। দামি সোফা কৌচ, রবারের গদি। নীচে কার্পেট।

এ-সবে যত না অবাক তার চেয়ে বেশি ভদ্রলোকের পোশাক-আশাক দেখে।

সেই রাখালবাবু। ওদের বাড়ির সামনে হেমন্তবাবুর ধসে পড়া জরাজীর্ণ বাড়ির একতলার দেড়খানা ঘরে যিনি থাকতেন। তাঁকে তো লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে বাজারে যেতে দেখে এসেছে, ধুতি পাঞ্জাবি পরে যখন কাজে বেরোতেন, কি কাজ কে জানে, ধুতিটা হাঁটু অবধি উঠে থাকত।

সেই রাখালবাবুর পরিধানে এখন ট্রাউজার্সের শোভা। অনভ্যস্ত বলে কেমন ঢিলেঢালা। গায়ে চকরবকর বুশশার্ট।

ধ্রুব হাসতে হাসতে বললে, আপনার বাড়ি! আমি ভাবতেই পারিনি।

রাখালবাবুও হাসলেন। —সবই লক্ষ্মীর কৃপা।

তারপর বললেন, তোমরা তা'হলে এখনও ভাড়াবাড়ি খুঁজছ? কিছু একটা করলে না?

অর্থাৎ বাড়ি।

ধ্রুব বললে, কই আর হল। তবে ওঁদের জন্যে নয়, আমি খুঁজছি আমার নিজের জন্যে।

রাখালবাবু বললেন, সেই ভাল, ওই জয়েন্ট ফ্যামিলি শুধু শুনতেই ভাল, যত দূরে থাকবে তত শান্তি।

ধ্রুব শুধু হাসল। ভদ্রলোক তা হলে সবই বুঝে ফেলেছেন।

ও পকেট থেকে টাকাটা বের করলে। বললে, এই নিন সাড়ে চারশো।

রাখালবাবু যাতে দোমনা হবার সুযোগ না পান সেজন্যেই, নাকি তাঁর গলার স্বরেই বুঝে নিয়েছে ফ্ল্যাট ও পেয়ে গেছে, তাই বৃথা বাক্যব্যয় না করে ধ্রুব টাকাটা এগিয়ে দিল।

রাখালবাবু হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলেন। ধীরে সুস্থে বুকপকেটে রাখলেন, তারপর হাসতে হাসতে বললেন, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মিল হয় না, বুঝলে কি না। তোমরা এখনও সেই ভাড়াটে।

বলে উঠে গিয়ে রসিদ বইটা নিয়ে এলেন। বললেন, তুমি আমার একটা উপকার করেছিলে একবার, আমি ভুলিনি।

রসিদটা লিখতে গিয়ে পকেট থেকে টাকাটা বের করলেন। গুনেগুনে পাঁচটা দশ টাকার নোট ফেরত দিয়ে বললেন, তুমি চারশোই দিয়ো, পাশের ফ্ল্যাটও তাই দেয়।

একমুখ হেসে ধ্রুবর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভেবেছিলাম ভাড়া বাড়াব, পঞ্চাশ টাকা বেশি নেব। থাক্, ওই চারশোই দিয়ো।

কড়কড়ে পাঁচখানা দশটাকার নোট ফেরত পেয়ে ধ্রুব তখন খুশিতে ডগমগ। বারবার খোঁচা দিয়ে ভাড়াটে ভাড়াটে বলছিলেন বলে যেটুকু তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল মনের মধ্যে নিমেষে তা মিলিয়ে গেল। না, ইচ্ছে করে বলেননি। তা হলে কি উপকারের কথা তুলতেন।

ফেরার পথে ও যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

আর তখনই মনে হয়েছে, মানুষের উপকার করলে কখনো-সখনো বড় কাজে লেগে

যায়।

অথচ ও তো উপকার করতে চায়নি। বরং বিরক্ত হয়েছিল। নিতান্তই বাধ্য হয়ে, ভদ্রতার খাতিরে অভিনন্দনপত্র লিখে দিয়েছিল।

আশ্চর্য, রাখালবাবু কিন্তু সেকথা মনে রেখেছেন। মনে করে রেখেছেন বলেই বোধহয় পঞ্চাশ টাকা ভাড়া কমিয়ে দিলেন। ইচ্ছে করলেই তো নিতে পারতেন।

৩

ধ্রুব যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরছে এমন একটা আনন্দ নিয়ে হাঁটছিল। ওদের দোতলা বাড়িটার সামনে রাস্তার ওপারে বিশাল চারতলা ফ্ল্যাটে বাড়িটা মাথা তুলে দাঁড়ানোর পর থেকে ওদের দক্ষিণ চাপা পড়ে গেছে, হাওয়া ঢোকে না। ধ্রুবর ঘরে তো একেবারেই না। জানালা আছে, সামনের দিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা, তবু বাতাসের নামগন্ধ নেই। জানালা তো আর হাত ধরে দখিনা বাতাসকে আসুন আসুন বলে ডেকে আনতে পারে না। সে আসার আগে বেরোনোর রাস্তা আছে কিনা দেখে নেয়। কোথায় যেন পড়েছিল, চোর এবং হাওয়া একই চরিত্রের, পালানোর পথ না থাকলে ঢোকে না।

রাখালবাবুর ফ্ল্যাটে উঠে এলে নিশ্চয় প্রচুর হাওয়া পাবে। আর কতখানি জায়গা। তিন তিনখানা ঘর।

মনের ভিতর তখন একটা দারুণ ফুর্তি। রাস্তায় বেশ হাওয়া দিচ্ছে। বাড়িতে না থাক, রাস্তায় হাওয়া থাকে বলেই তো বিকেল হতে না হতে সকলেই বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তাই এত ভিড়।

ধ্রুব এসে ঘন ঘন দরজার কড়া নাড়ল। কলিং বেলটা অনেককাল খারাপ হয়েছে, সারানো হয়নি। কেই বা মিস্ত্রি ডেকে এনে সারাবে। ধ্রুব ইচ্ছে করে মিস্ত্রি খুঁজতে যায়নি। বারবার ওকেই যেতে হবে কেন। দাদা কিংবা মেজদাও তো ডাকতে পারত। সবাই ভাবছে আরেকজন কেউ ডেকে আনবে। মিস্ত্রি ধরে আনাও এক ঝামেলা, একবার গেলেই তো আর পাবে না। তাছাড়া বেল্টা খারাপই হয়ে গেছে, নতুন কিনতে হবে। যে কিনে আনবে তাকেই দিতে হবে টাকাটা। বাবা রিটায়ার্ড মানুষ, এখন তো আর সব ব্যাপারে হাত পেতে টাকা চাওয়া যায় না।

দরজা খুলতেই এক এক লাফে দু'দুটো সিঁড়ি ভেঙে সটান নিজের ঘরে চলে এল। প্রীতি শুয়ে একটা সিনেমার কাগজ পড়ছিল।

ধড়মড় করে উঠে ব্যগ্র গলায় প্রশ্ন করল, বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হ'ল ?

ধ্রুব উজ্জ্বল মুখ নিয়ে রসিদটা পকেট থেকে বের করে দেখাল।—ফাইনাল। একেবারে রসিদ নিয়ে এসেছি।

প্রীতির মুখেও উজ্জ্বল হাসি। যেন এতদিন বাদে সত্যি সত্যি যুদ্ধ জয় করেছে।

তারপরই ধ্রুব বললে, একটা অবাক কাণ্ড, তোমাকে তো আসল কথাটাই বলা হয়নি।

প্রীতির চোখে প্রশ্ন।

ধ্রুব হাসতে হাসতে বললে, বাড়িওয়ালা তো চেনা লোক, খুব চেনা। ওই সামনের ফ্ল্যাট বাড়িটা হওয়ার আগে...

কথাটা বলে ফেলে ধ্রুবর নিজেরই কেমন খারাপ লাগল। চেনা লোক, খুব চেনা। সত্যি কি তাই ?

কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল ওর গলার স্বর।—জানো প্রীতি, মাত্র একখানা না দেড়খানা অন্ধকূপ ঘর নিয়ে থাকত একটা গোটা সংসার। এখন ফেঁপেফুলে বড়লোক হয়ে গেছে।

কিসের ব্যবসা কে জানে।

চেনা লোক বলার অধিকার কি ধ্রুবর আছে! ও তো লোকটিকে এড়িয়ে এড়িয়ে যেত। লুঙ্গি পরে ফতুয়া গায়ে দিয়ে থলি হাতে করে যখন বাজার যেত, ডেকে কথা বললেও ধ্রুব এড়িয়ে যেত। যেন পাড়ার কেউ দেখলে ওর নিজেরও দাম কমে যাবে। ওর ট্রাউজার্সের কাপড় যে বেশ দামি, কেউ ভাববে না। অথচ এখন তাকেই খুব চেনা লোক হিসেবে স্বীকার করতে একটুও অস্বস্তি হচ্ছে না।

ধ্রুবর মনে হয়েছিল ও যুদ্ধজয় করে ফিরছে। এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না।

শুনলে বাবার হয়ত একটু সম্মানে লাগবে। দাদাদের বৌদিদের।

আশ্চর্য, ভাগ্য এক একজন মানুষকে কত তাড়াতাড়ি বদলে দিতে পারে।

কিন্তু একে কি যুদ্ধজয় বলে। এতদিন তো ওর সামনে ছিল আত্মসম্মানের প্রশ্ন। সে আত্মসম্মান শুধু নিজের পরিবারের কাছে, দাদা বৌদিদের কাছে, তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে।

খুব অহঙ্কার নিয়ে বলেছিল, এত অশান্তি নিয়ে থাকা যায় না। আমরা উঠে যাচ্ছি।

কথা রাখতে পেরেছে, একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে তাদের চোখের সামনে দিয়ে সদর্পে উঠে যাবে, সেটাই যেন যুদ্ধজয়।

অথচ এটা যে এত বড় পরাজয় ধ্রুব এতক্ষণ ভেবে দেখেনি। পরাজয় একটা নগণ্য মানুষের কাছে। দীনদরিদ্র দুঃস্থ মানুষ বলে মনে হত, ধ্রুবদের সঙ্গে কথা বলতে পেলেই ধন্য মনে করত। দু' লাইন ইংরিজি লিখতে পারে না। রসিদে সইটা দেখেই হাসি পেয়ে গিয়েছিল।

উপমন্ত্রীকে গ্রামের স্কুলে নিয়ে যাবে, একটা অভিনন্দনপত্র লিখে দেবেন ইংরিজিতে। কাকে কি ভাবে তোয়াজ করতে হয়, ঠিক জানে। হাসতে হাসতে বলেছিল, না না, ইংরিজি। ইংরিজিতে হলেই ওঁরা খুব খুশি হন। ছাপার অক্ষরে ইংরিজিতে নিজের নাম, বুঝলেন কিনা!

প্রীতি সব শুনে বলে উঠল, তা হোক্। তারপরই হেসে বললে, দেখো, এবার ওর ব্যবসার চিঠিপত্র সব না তোমাকে দিয়ে লেখাতে আসে।

ধ্রুবও হাসল।

মাকে গিয়ে বলল, আমরা চলে যাচ্ছি, ফ্ল্যাট পেয়ে গেছি।

মা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালেন। —সত্যি চলে যাবি?

মা'র মুখ দেখে মনে হ'ল যত রাগারাগি করেই ও সেদিন বলে থাকুক, মা একটুও বিশ্বাস করেননি। দু'মাস ধরে ও ফ্ল্যাট খুঁজছে বটে, কিন্তু ও-সব নিয়ে আর তো কথা হয়নি; তাই ভেবেছিলেন, ওটা রাগের কথা, সত্যি চলে যাবে না।

—ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কোন সংসারে ঝগড়াঝাঁটি হয় না।

মা এসে প্রীতিকে ধরলেন, ছোটবৌমা, তুমিই একটু বুঝিয়ে বল।

প্রীতি কোনও কথা বলল না। ও তখন একটা সজারু হয়ে আছে, সর্বাঙ্গে কাঁটা ফুলিয়ে। কেউ না গায়ে হাত দিয়ে একটু আদর করে ফেলে।

শেষ পর্যন্ত মা বুঝতে পারলেন ও-সবে কিছু হবে না।

তাই ধীরে ধীরে বললেন, তোর বাবাকে একটা ভাল দিন দেখে দিতে বলিস। তোর সংসারের মঙ্গলও তো আমাকেই ভাবতে হবে।

অর্থাৎ পাঁজি দেখিয়ে দিনস্থির করতে হবে। ওসরে ধ্রুবর কোনও বিশ্বাস নেই, প্রীতিরও না। তবু মনটা কেমন নরম হ'ল। বললে, তুমিই ব'ল।

মা'র এ ইচ্ছেটা অন্তত রাখতে চাইল। না কি, নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়ার আগে

ওদেরও ভয়-ভয় করছিল। এতদিন ধরে এখানে আছে, মাথার ওপর বাবা-মা। পাড়াটাও রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে গেছে।

এখন তো যেতে হবে একেবারে নতুন পরিবেশে। বিপদ-আপদ অসুখ-বিসুখে এখন আর কারও ওপর ভরসা করা চলবে না।

টিপুর হঠাৎ একদিন একেবারে একশ-তিন জ্বর। ধ্রুব বাড়ি ছিল না। প্রীতি এপাড়ার কোনও ডাক্তারকেই চিনত না। দাদা অফিস থিকে ফিরে যেই শুনল, পোশাক না বদলেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার নিয়ে এসেছিল। প্রীতি তখন উদ্ভ্রান্ত, ডাক্তারের কথায় ঠাণ্ডা জল নিয়ে টিপুর মাথা ধুইয়ে দিতে ব্যস্ত। ডাক্তারকে ফি দেওয়ার কথা মনে ছিল না।

ধ্রুব এসে সব শুনে জিগ্যেস করল, ডাক্তারের ফি কে দিল ?

—তা তো জানি না। এই যা ! আমি তো দিতে ভুলেই গেছি।

ধ্রুব দাদাকে টাকাটা দিতে গিয়েছিল। দাদা হেসে ফেলেছিল।—তুই কি রে ? টিপু কি আমাদের পর ?

টাকা নেয়নি।

অথচ এদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ। একটা ফ্ল্যাট পেয়ে আলাদা হতে পারছে বলে ভাবছে যুদ্ধজয় করেছি।

দিনকয়েক পরে মা এসে তারিখটা বললেন।—তোর বাবা বলছিল, এ মাসে তেমন ভাল দিন নেই। সাতাশে ফাল্গুন, একটা অবধি বারবেলা, তার পর।

ধ্রুব বললে, আচ্ছা।

ও বাবার সামনে যেতেই পারছিল না। সেদিন প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল বলেই বলতে পেরেছে। এখন আর সম্ভব নয়। সেজন্যই মাকে বলেছে, তুমি বল। মাকে বলতেও খুব কষ্ট হয়েছে ধ্রুবর। মা-বাবার কি দোষ। ওঁরাও তো ধ্রুবর মতোই, কিংবা ধ্রুবর চেয়েও অনেক বেশি ভিতরে ভিতরে ছিন্নভিন্ন হচ্ছেন। দোটানার মধ্যে ভিতরে ভিতরে পুড়ছেন। ওঁরা তো আর বিচারকের আসনে বসতে পারেন না, যে কার দোষ সেটাই বিচার করবেন।

মা আক্ষেপের স্বরে একদিন বলেছিলেন. কার দোষ ? আমার কপালের দোষ রে, আর কারও দোষ নয়।

এ সব কথা শুনলে বড় ব্যথা লাগে, মন খারাপ হয়ে যায়। বাবার চাপা কষ্টের মুখ কিংবা মা'র দীর্ঘশ্বাস মাখানো কথা যখন ধ্রুবর বুকের ভিতরটা নিঙড়ে দেয়, তখনও তা প্রীতিকে স্পর্শ করে না। অন্তত ধ্রুবর তাই মনে হয়।

অবশ্য কেন তা স্পর্শ করবে প্রীতিকে। ধ্রুবর সঙ্গে ওঁদের সম্পর্কটা জন্ম থেকে। প্রীতি তো সম্পর্ক গড়ে তোলারই সময় পেল না, দিল না। তার জন্যে দোষও দিতে পারে না। ধ্রুবই কি কোনওদিন বুঝতে চেয়েছে, ওর নিজের বাবা-মাকে ছেড়ে প্রীতির এ বাড়িতে আসার সময় প্রীতির ভিতরটা কতখানি ছিন্নভিন্ন হয়েছিল ? কেউ বুঝতে পেরেছে ? বুঝতে চেয়েছে ? দাদা, মেজদা, ও নিজে ! কেউ না।

মেজবৌদি এই সেদিন তার বাবা-মা'র কাছে গিয়ে দিনকয়েক থাকবে বলেছিল।

মেজদা রেগে গিয়ে ধমক দিয়েছিল—তোমার তো এ বাড়িতে থাকতেই ইচ্ছে করে না, সুযোগ পেলেই কেবল বাপের বাড়ি যাব।

ধ্রুবরও শুনে খারাপ লেগেছিল। বাবা মা যেন শুধু ছেলেদের, মেয়েদের বাবা মা যেন সত্যি সত্যি বাবা মা নয়। কই, তাদের বুকের ভিতরটা কি ভাবে ছিঁড়ে যায় আমরা তো ভেবে দেখি না। আমরাই তো ওদের স্বার্থপর করে তুলি। ওরা হয়ত মনে মনে বলে,

আমার আজন্ম সম্পর্কটা যদি এতই তুচ্ছ, যদি তোমার জন্যে ছিঁড়ে ফেলতে হয়, তা হ'লে তোমার জন্মসূত্রের স্নেহ ভালবাসাই বা তুমি ছিঁড়ে ফেলবে না কেন।

ধ্রুব তো মনে মনে ভেবে দেখেছে, মা তো এত ভাল, প্রীতিকে এত ভালবাসেন, কিন্তু ওর যে একটা আলাদা পছন্দ থাকতে পারে, রুচি থাকতে পারে, সে কথা মনে রাখেন না কেন ? যেন মা যা চায়, যা ভাল মনে করে, সেটাই ঠিক। বাড়ির বউ হয়ে এসেছ, তোমার সমস্ত অস্তিত্ব ডুবিয়ে দিতে হবে। কেন ? মাকে দোষ দিয়ে কি হবে, ধ্রুব নিজেও তো সে-রকমই ভাবে। ঠাণ্ডা মাথায় যখন ভাবে তখন বুঝতে পারে প্রীতির, মানে প্রীতিদের কি অসীম সহ্যশক্তি।

—হোয়াইট ওয়াশের কথাটা কিন্তু বলে আসতে ভুলো না।

প্রীতি মনে পড়িয়ে দিয়েছিল।—আর তালাচাবি নিয়ে গিয়ে দরজায় লাগিয়ে দিয়ে আসতে হবে। বাড়িওয়ালাদের কিচ্ছু বলা যায় না।

ধ্রুব হেসে বলেছে, না না, সকলে কি একই রকম নাকি ? রাখালবাবু দারুণ ভালমানুষ, আমরাই আগে বুঝতে পারিনি।

বুঝতে সত্যিই পারেনি কেউ। কত সাদাসিধে ভাবে থাকতেন ওঁদের সামনের বাড়ির একতলায়। এত বড় একখানা বাড়ি হাঁকিয়ে বসবেন কোনওদিন ভাবেনি কেউ। ধ্রুব অবশ্য বাড়ির কাউকেই বলবে না। ওরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু সম্মানেও লাগবে।

বড় বৌদি হয়ত বলে বসবে, ওই লোকটাকে তোমরা অত হতশ্রদ্ধা করতে, তারই বাড়ির একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে তোমাব লজ্জা করল না।

ঘরগুলো চুনকাম করিয়ে দেওয়ার কথা বলার জন্যেই ধ্রুব গেল একদিন। এমন কিছু রাত হয়নি তখন।

গোঁপওয়ালা পালোয়ান টাইপের দারোয়ানকে বললে, বাবুকে একবার খবর দাও, দেখা করব।

দারোয়ান বললে, সকালে আসবেন।

ধ্রুব বললে, তুমি গিয়ে খবরই দাও না। বল, ধ্রুববাবু এসেছেন। বলবে, ধ্রুববাবু। যিনি ওই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন।

দারোয়ান অখুশি মুখ করে বললে, ঠহরিয়ে।

একটু পরেই ওপর থেকে নেমে এসে বললে, বাবু শুয়ে পড়েছেন।

ধ্রুবর বিশ্বাস হ'ল না। এত তাড়াতাড়ি কেউ শুয়ে পড়তে পারে না। তা হ'লে কি ইচ্ছে করেই দেখা করলেন না রাখালবাবু ? এতখানি হেঁটে এসেছে ও, আবার ফিরে যেতে হবে। আবার আসতে হবে কাল। অথচ দু'মিনিটের তো কথা।

ধ্রুবর রীতিমতো অপমান লাগল। প্রীতি ঠিকই বলেছে। বাড়িওয়ালা হলেই বোধহয় এইরকম হয়ে যায়। ভাড়াটের সুখসুবিধে, সম্মান-অসম্মান যেন কিছুই নয়।

রাগ চেপে ধ্রুব বললে, কাল আর আসতে পারব না হয়ত, তুমি বলে দিও ঘরগুলো চুনকাম করিয়ে দিতে। আসলে দারোয়ানের কাছে আত্মসম্মান রাখার জন্যেই বলতে হল, কাল আসতে পারব না।

দারোয়ান ঘাড় নেড়ে বললে, আচ্ছা বাবুজি।

ধ্রুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে আসছিল। দারোয়ান হাসল।—রাতমে বাবুর সঙ্গে মোলাকাত হয় না বাবুজি। ওর হাসিটা কেমন রহস্যজনক।

—কেন ? ধ্রুব প্রশ্ন করল।

দারোয়ান হাসতে হাসতে হাতটা মুখের কাছে তুলে গ্লাসে চুমুক দেওয়ার ভঙ্গি করলে।

তাই বুঝি !

রাখালবাবু তা হ'লে টাকাই করেননি, এই গুণটাও হয়েছে। না কি আগে থেকেই ছিল, ওরা জানত না।

এতক্ষণ ওর অপমান লাগছিল, মুহূর্তে তা ধুয়েমুছে গেল। কিন্তু প্রীতি আবার এ কথা শুনলে বেঁকে বসবে না তো ? হয়তো বলে বসবে, একটা মাতালের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলছ !

না, প্রীতিকে বলার দরকার নেই।

আসলে রাখালবাবু লোকটাই একটা রহস্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধ্রুব কবে এতটুকু উপকার করেছিল, তার জন্যে আজও কৃতজ্ঞ। কোনও কোম্পানি, কত মাইনে কিছুই জিগ্যেস করেনি। অথচ হাতকাটা দালালটা কত ভয় দেখিয়েছিল। জিগ্যেস তো করেইনি, উপরন্তু পঞ্চাশটা টাকা ফিরিয়ে দিল। প্রথমে হয়ত লোভে পড়ে সব টাকাটাই পকেটে ঢুকিয়েছিল, পরে কিছু মনে হতে ফেরত দিয়েছে।

কিসের ব্যবসা ভদ্রলোকের ধ্রুব জানে না। যখন ওদের বাড়ির সামনের একতলায় থাকত, তখন কোনও কোনওদিন দেখত, অনেক রাতে, রাত এগারোটা কি বারোটা, অন্ধকারে একটা ঠ্যালা গাড়ি এসে দাঁড়াত। বিরাট বড় বড় পিপের মতো ড্রাম, তিনটে কি চারটে—কুলিদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে রাখালবাবু সেগুলো বাড়ির ভিতর ঢোকাতেন। আবার আরেকদিন একটা ঠ্যালা গাড়ি আসত, ড্রামগুলো নিয়ে চলে যেত। সেও ওই মধ্যরাত্রে।

ওরা নিজেরা বলাবলি করত। ড্রাম তোলা নামানোর শব্দে প্রায়ই ঘুম ভেঙে যেত ওদের। বারান্দায় গিয়ে কোনও কোনওদিন দাঁড়িয়ে দেখত। কিন্তু ওই ড্রামগুলোর ভিতরে কি আছে কেউ জানত না।

ধ্রুব আজও জানে না।

ওসব জানার ওর প্রয়োজনও নেই। এখন একটাই কাজ, ইলেকট্রিকের মিটার নিজের নামে করাতে হবে। বাড়ি বদলাতে গেলে কত রকম ঝামেলা। আরেকটা কাজ লরি জোগাড় করা। দিনে দিনে তো কম আসবাবপত্র জমা হয়নি। খাট, আলমারি, আয়না, বুককেস, আরো হাজার রকম টুকিটাকি। জমতে জমতে এমন অবস্থা, ঘরে পা ফেলার জায়গা নেই। তা হোক, ওখানে গিয়ে আর এত অসুবিধে হবে না, তিন তিনখানা ঘর, দিব্যি ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজিয়ে রাখা যাবে।

তবে সময় থাকতে থাকতে লরির ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। কোথায় পাওয়া যায় কে জানে। অফিসে কাউকে জিগ্যেস করে দেখবে। কিন্তু লরির চেয়ে বেশি চিন্তা কুলিদের নিয়ে। ট্রেন্‌ড কুলি না হ'লে হয়ত কাচফাচ ভেঙে কেলেঙ্কারি করে বসবে।

প্রীতি একসময় বললে, এই বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, সেই হাতকাটা দালালটা টাকার তাগাদায় এসেছিল।

—ও হ্যাঁ, ওকে তো আবার এক মাসের ভাড়া দিতে হবে।

প্রীতি হেসে বললে, না, বাড়িওয়ালা কমিয়ে দিয়েছে বলেও ছাড়বে না, বলেছে পুরো সাড়ে চারশোই দিতে হবে।

কথাটা শুনে ধ্রুব একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল, তবু বললে, তাই দেব।

আসলে লোকটা তো আমাদের উপকারই করেছে, ও না থাকলে তো যোগাযোগ হ'ত না। এর আগে তো এক জায়গায় মোটামুটি পছন্দও হয়েছিল, কিন্তু বাড়িওয়ালার কত রকম ফিরিস্তি। চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েও এত কথা বলতে হয়নি। সে জায়গায় এখানে তো কিছুই বলতে হ'ল না। সেজন্য ও লোকটার কাছে কৃতজ্ঞ।

কিন্তু, যে লোকটা এমন একটা উপকার করল, প্রথম থেকে আজ এখন অবধি সে একজন হাতকাটা দালাল হয়েই রয়েছে। পঞ্চাশটা টাকা বেশি দিতে হবে বলে মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল লোকটা কি লোভী। আশ্চর্য, ওর তো একটা নাম আছে, কোনওদিন জিগ্যেস করতেও ইচ্ছে হয়নি। একজন দুঃখী লোক, নামমাত্র উপার্জন, কোনও দুর্ঘটনায় হয়ত হাতটা কাটা গেছে, তার পরিচয় হয়ে গেল হাতকাটা দালাল। নামটা জেনে নিলে নাম ধরেই তো ওরা কথা বলতে পারত। ধ্রুবর মনে হ'ল, আমরা কি স্বার্থপর, বোধহয় প্রথম থেকেই ভেবে নিয়েছি ফ্ল্যাট পেলেই ওর দালালির টাকাটা দিয়ে বিদেয় করে দেব, তার আবার নাম জানার কি দরকার। কিংবা লোকটা হয়ত নাম বলেও ছিল মনে রাখা প্রয়োজন মনে করেনি। পঞ্চাশটা টাকা তাকে বেশি দিতে হচ্ছে বলে এখন গায়ে লাগছে!

—তোকে একটা কথা বলছিলাম...

মা এসে চুপ করে দাঁড়ালেন।

আসলে মা'র তো খুবই খারাপ লাগছে। হয়ত আবার বলে বসবেন থেকে গেলেই ভাল করতিস ; অথবা ওই রকম কিছু, এই আশঙ্কায় ধ্রুব একটু কঠিন স্বরে বললে, কি বলছ বল না।

মা ধীরে ধীরে বললেন, তোরা তো এ সব কিছু মানিস না, তবু আমার কথা ভেবে, বলছিলাম কি, যাবার আগে তোদের ফ্ল্যাটে যদি সত্যিনারাণ দিস।

একটু থেমে বললেন, ছোটবৌমা তো ওসব জানে না, আমি বলছিলাম, যদি আমি গিয়ে ওখানে ওসব দেবার ব্যবস্থাটা করে দিই...

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি একটু মনে শান্তি পেতাম আর কি।

ধ্রুব একবার প্রীতির মুখের দিকে তাকাল। ও চাইছিল প্রীতি খুশি হয়ে মাকে বলুক, হ্যাঁ, মা, আপনি গিয়ে দেখেশুনে দেবেন, পুজোআর্চার আমি তো কিছুই জানি না...

কিন্তু না, প্রীতি যেন কি একটা কাজে বড় ব্যস্ত, শুনতেই পায়নি।

তাই ধ্রুব বললে, হ্যাঁ তা তো দিতে হবেই, তুমি যদি পারো মা, খুব ভাল হয়।

মা হাসলেন।—পারব না কি রে। যেন খুব খুশি হয়েছেন ধ্রুব ওঁর কথায় সায় দিয়েছে বলে। বললেন, আমি মরতে মরতেও তোদের জন্যে সব পারব।

মা হাসতে হাসতেই বললেন, কিন্তু চলে যাবার সময়, ধ্রুবর মনে হ'ল, মা যেন চোখে আঁচল ঘষলেন।

ওর মনের ভিতরটায় একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। এ বড় যন্ত্রণা। কষ্টও হয়, অথচ যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে, ছেড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ও এবং প্রীতি যেভাবে বাঁচতে চায়, এখানে সেভাবে বাঁচা যাবে না। সমস্ত বন্ধনগুলো একে একে ছিঁড়ে গেছে। যেন অনেকদিন ধরে হাতকড়া পরানো ছিল, হাতকড়া খুলে ফেলে মনে হচ্ছে আমি মুক্ত, আমি আর বন্দি নই, কিন্তু হাতের কব্জিতে এখনও যেন হাতকড়ার স্পর্শটা লেগে রয়েছে। মনেই হচ্ছে না ওটা খুলে ফেলেছে।

বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় চলছে, কাউকে না বলেও যেন শান্তি নেই। অথচ এ-সব কথা প্রীতিকে বলা যাবে না। ও শুনলে উপহাস করবে, কিংবা কথায় বিছুটি মাখিয়ে বলবে, তা হ'লে বৌদিদের আঁচল জড়িয়েই থাকো, এতই যখন ছেড়ে যেতে কষ্ট।

অফিসে গিয়ে অবিনাশকেই বললে। ওর সঙ্গেই তো অন্তরঙ্গতা। জীবনের অনেক কথাই ওকে বলতে পেরেছে। কিন্তু ঘরোয়া টানাপোড়েনের খবর একটুও জানতে দেয়নি। বলতে লজ্জা। সঙ্কোচ। যেন বললেই অবিনাশের চোখে ও ছোট হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল।—বড় অশান্তির মধ্যে দিন কাটছে ভাই। জয়েন্ট ফ্যামিলির মতো খারাপ জিনিস আর নেই।

অবিনাশ হো হো করে হেসে উঠল।—তোমাদের আবার জয়েন্ট ফ্যামিলি কোথায় হে। বাবা মাকে নিয়ে তিন ভাইয়ের সংসার, একে কি জয়েন্ট ফ্যামিলি বলে।

হাসতে হাসতে বললে, যেতে আমাদের হুগলির গ্রামের বাড়িতে, এখন নয়, বছর দশেক আগে, দেখতে কাকে যৌথপরিবার বলে।

একটু থেমে বললে, রান্নাঘর মানে টাটা কোম্পানির ফার্নেস, দাউ দাউ জ্বলছে সব সময়।

অবাক হয়ে গেল ধ্রুব। আগে কখনো শোনেনি ওর কাছে।

হেসে ফেলে বললে, তাই নাকি ?

অবিনাশ বললে, একটা বড় বারান্দায় লাইন দিয়ে দু'পাশে বাইশজন খেতে বসতে পারে। সব মেঝেতে, আসন নয় হে, গোটা কয়েক কম্বল আধ ভাঁজ করে।

—বাইশজন আর এমন কি ! ধ্রুব এবার আর অবাক হ'ল না।

অবিনাশ হাসল।—শুনবে তো সবটা।

একটা কাঁসর বাজানো হ'ত খাবার সময় হলে। গ্রামে যে যেখানে আছে। পরিবারের লোক, শুনেই চলে আসবে। তার আবার ফার্স্ট বেল, সেকেন্ড বেল, থার্ড বেল।

এবার সত্যিই অবাক হতে হ'ল ধ্রুবকে।

অবিনাশ বললে, ফার্স্ট বেল বাচ্চাদের জন্যে, বিলো ফোর্টিন, ছেলেমেয়েদের সব। সেকেণ্ড বেল পুরুষদের, ফর অ্যাডাল্ট মেল মেম্বার্স। থার্ড বেল মেয়েদের, সে প্রায় বেলা তিনটেয়।

ব'লে হো হো করে হাসল।—পুজোর সময় সে এক এলাহি কাণ্ড, যে যেখানে আছে সব আসত, ছেলে মেয়ে জামাই নন্দাই।

এখনও আছে ? ধ্রুব জিগ্যেস করল।

অবিনাশ হেসে বললে, দশ বছর আগেও ছিল। প্রথম পৃথক হলেন জ্যাঠামশাই, তারপর একে একে সকলেই। লাস্ট আমি, কলকাতায় সংসার নিয়ে চলে এলাম। বাবা মা সেই গ্রামেই, মাঝে মাঝে আসেন। ও সব আর চলে না হে, চলে না। নিকুচি করো তোমার ওই জয়েন্ট ফ্যামিলির। মার সারাটা জীবন তো কেটেছে ওই রান্নাঘরে, বউটাকে হাড় জিলজিলে করে দিয়েছিল, পালিয়ে এসে বেঁচেছি। বউয়ের কোনও সাধআহ্লাদ থাকবে না, ভালবাসা মানে রাতে একসঙ্গে শোয়া। ধুত্তোর।

ধ্রুবর সঙ্কোচ কেটে গেল। যতখানি না বললে নয় সেটুকুই বলল। তারপর জানাল, ফ্ল্যাট পেয়েছে। কিন্তু বড় কষ্ট।

অবিনাশ গম্ভীর হয়ে বললে, হবেই তো। বলে কেমন আনমনা হয়ে গেল, যেন কিছু মনে পড়ে গেছে। যেন ওর চোখের সামনে কিছু ভেসে উঠছে, কোনও স্মৃতি। মুখের ওপর কি ওটা বেদনার ছাপ ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে অবিনাশ। ধীরে ধীরে বললে, জন্মের পর যখন নাড়ি কাটে তখন শিশু কিছু টের পায় কিনা কে জানে। কিন্তু এতকাল এক সংসারে কাটিয়ে আবার নাড়ি কাটা, কষ্ট হবে না ? কিন্তু উপায় নেই ধ্রুব, সব মেনে নিতে হয়। একদিকে অনেক কিছু ছাড়তে হয়, আবার অনেক কিছু পাওয়াও তো যায়। নিজের মতো করে বাঁচতে কে না চায় বল।

একটু থেমে বললে, ভালই করেছ। সাহস করে চলে যাও, দিব্যি ভাল থাকবে। দেখবে দূরে থাকলেই আরো আপন মনে হবে।

অবিনাশের কাছে সমর্থন পেয়ে ধ্রুবর মনের অপরাধবোধ অনেকখানি সরে গেল। যেন নিজেই নিজেকে বোঝাতে চাইছে এ-ভাবে বললে, ভেবে কি হবে বল, এটাই এ যুগের নিয়ম।

অবিনাশ সায় দিয়ে বললে, হিউম্যান নেচার। সব ব্যাপারে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়ানো, সে যে কি দিন ছেলেবেলায় দেখেছি। স্বাধীনতার চেয়ে দামি জিনিস আর কিছু নেই, বুঝলে ধ্রুব। বাবা-মাও তার কাছে তুচ্ছ।

অবিনাশই লরির ব্যবস্থা করে দিল।

চুনকাম হয়ে যেতেই মা গিয়ে সত্যনারায়ণ পুজো দিয়ে এলেন। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল ধ্রুব আর প্রীতি।

পুরুতঠাকুর দেখে বললেন, বাঃ এ তো চমৎকার ফ্ল্যাট।

মা বললেন, হ্যাঁ, ভালই।

পুজোর বাসনকোসন কোশাকুশি সব মা নিয়ে গিয়েছিলেন। পিতলের গামলায় খুব যত্ন করে সিন্নি বানালেন।

প্রীতি বেশ খুশি। ও মাকে সাহায্য করছিল, হেসে হেসে গল্প করছিল। দেখে ভাল লাগছিল ধ্রুবর। কিন্তু বুকের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছিল একটাই কথা। কি অকৃতজ্ঞ, কি অকৃতজ্ঞ।

রাখালবাবু লোকটার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। বরং তাচ্ছিল্যই করত তাকে। তবু, কবে সামান্য একটা উপকার করেছে ধ্রুব, বিরক্তির সঙ্গে, চাপা রাগের সঙ্গে তুচ্ছ একটা উপকার করতে বাধ্য হয়েছিল, অথচ রাখালবাবু কৃতজ্ঞতা দেখালেন, একটাও প্রশ্ন না করে ওকেই ফ্ল্যাট ভাড়া দিলেন, উপরন্তু পঞ্চাশ টাকা ফেরতও দিলেন। 'তোমার পাশের ফ্ল্যাটও চারশোই দেয়'।

আর ধ্রুব দিব্যি সব ভুলে যেতে পারল। এমন কি-আর অসুবিধে কিংবা অশান্তি! ও চলে আসার পর বাবা-মা যা কষ্ট পাবেন, যে অশান্তিতে ভুগবেন তার তুলনায় কতটুকু। তবু সব ভুলে যেতে পারল ধ্রুব।

বেশ কয়েকবছর আগের একটা দৃশ্য মনে পড়তেই নিজেকে ভীষণ ছোট লাগে। অনুশোচনা হয়।

মা এসে ধ্রুবকে বললেন, তোর বাবা ডাকছে! আয়।

এর আগেও একবার ডেকে গিয়েছিলেন। ধ্রুব তেমন গা করেনি। আজকাল বাবার ডাক মানেই তো ফালতু আজেবাজে কথা। বড় বেশি কথা বলেন আজকাল, এমন সব কথা যার সম্পর্কে ধ্রুবর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

দ্বিতীয়বার মা ডাক দিয়ে যেতেই বড়বৌদি এসে বললে, কি ব্যাপার বলো তো? তিন ভাইকেই একসঙ্গে ডাকছেন?

ধ্রুব ঠোঁট ওল্টাল। অর্থাৎ কি জানি। কিন্তু ওদের তিন ভাইকেই একসঙ্গে ডেকেছেন জেনে একটু কৌতূহলও হল।

গিয়ে দেখল মা একটা মোড়ায় বসেছেন, বাবা সেই হাতলওয়ালা আরামকেদারায়। দাদা আর মেজদা দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, দুপ্রান্তে।

ঘরগুলো, বারান্দা চুনকাম হয়নি বহুদিন। এখানে ওখানে দাগ লেগে বেশ নোংরা হয়েছে, তাই এখন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় সবাই। বাড়িওয়ালা তো আজকাল হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে দেয় না, তাই নিজেদের খরচেই করা হয়েছিল। প্রথম প্রথম তখন কত সাবধানতা, ঠিকে ঝি এসে দেয়ালে ঠেস দিলে সকলেই ধমক দিত। এখন নিজেরাই ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। আসলে নোংরা দেখলেই মানুষ নোংরা করতে চায়।

ধ্রুব কি করবে, সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা তাঁর তিন ছেলের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

বললেন, আমার বয়েস হয়েছে। ক'দিন আছি না আছি কেউ বলতে পারে না। তোর মা বলছে বেঁচে থাকতে কিছু একটা ব্যবস্থা করে যেতে। পরে যাতে লাঠালাঠি না হয়।

বলে হাসলেন। বললেন, তোরা লাঠালাঠি করবি না তা জানি, তবু আমারও তো একটা দায়িত্ব আছে।

মা বলে উঠলেন, শোন তোরা, ওসব কথা নয়, তোর বাবা যদি আমাকে ফেলে পালায়, আমি বাপু ওসব টাকাপয়সা সইসাবুদ ওসব পারব না। তাই বলছি...

কথাটা বাবাই শেষ করলেন। বললেন, আমার পেনশন আছে, তার চেয়েও বড় কথা তোরা তিন ভাই আছিস। আমাদের আর ভাবনা কীসের।

একটু থেমে বললেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডে কিছু বেশি বেশি জমিয়েছিলাম। সুদে বেড়ে এখন প্রায় এক লাখ কুড়ি। তা এখনই তোদের তিনজনের নামে চল্লিশ হাজার করে ইউনিট কিনে দিতে চাই।

বাবা স্বেচ্ছায় কাণ্ডটা করছেন বলে ধ্রুবর অবশ্য মনে হল না। মা'র প্ররোচনা। মা সই করতে খুব ভয় পান, যে কোনও ফর্মেই হোক বা রেজিস্ট্রি চিঠির জন্যেই হোক। সব সময় বাবাকে জিগ্যেস করেন সই করবেন কিনা।

ধ্রুবর শুনে ভালই লেগেছিল, কিন্তু দাদা বোধহয় পিতৃভক্ত ভাল ছেলে সাজবার জন্যে ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করলে, এখনই ওসব নাই বা করলেন। সে পরের কথা পরে।

মা বললেন, হ্যাঁরে শেষদিন কি কারো নোটিস দিয়ে আসে? যা কিছু আছে তা তো তোদের জন্যেই। আমাদের জন্যে তো তোরাই আছিস।

'আমাদের জন্যে তো তোরাই আছিস'। মনে পড়লেও এখন খারাপ লাগে। সেই চল্লিশ হাজার টাকা এখন প্রায় পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। কিংবা আরো বেশি।

ও বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় এ-সব কথা মনেই পড়েনি। তখন শুধু সর্বাঙ্গে রাগ। এখন নিজেকে ছোট লাগে, অনুশোচনা হয়।

এখন সমস্ত ব্যাপারটা ঠাট্টার মতো মনে হচ্ছে। মার অভিযোগ অনুযোগ কোনও কিছুতেই কান দেয়নি। একটা নেশা তখন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, নতুন ফ্ল্যাট, আলাদা ফ্ল্যাট। অথচ মা বুকের মধ্যে সব কষ্ট, সব অশান্তি চেপে রেখে এই ফ্ল্যাটে এসেছেন সত্যনারায়ণ দিতে। ধ্রুব আর প্রীতি যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে।

—তোদের মঙ্গল, অমঙ্গল, টিপুর মঙ্গল অমঙ্গল, তোমরা যতই দূরে সরে যাও ছোটবৌমা, আমি তো নির্ভাবনা হতে পারব না।

মা এমনভাবে কথাগুলো বলছিলেন যেন ভিক্ষে চাইছেন। জানেন, ধ্রুব আর প্রীতি ওসবে বিশ্বাস করে না, হয়তো মনে মনে অসন্তুষ্ট হচ্ছে এই ভেবে বলেছিলেন, শুধু একটা দিনের তো ঝামেলা, কয়েক ঘণ্টা, তোরা যাবার আগে অন্তত আমাকে পুজোটা দিতে দিস।

বাইরে একটা ফূর্তির ভাব রেখেছিল ধ্রুব। কিন্তু ভিতরে ভিতরে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। ও মা'র মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিল না।

বাবার মুখের দিকেও তাকাতে পারেনি।

চলে আসার সময় কেবলই মনে হচ্ছিল যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

লরি এলো নির্দিষ্ট দিনে। বাবা পাঁজি দেখে বলেছিলেন একটা পর্যন্ত বারবেলা। কুলিদের বসিয়ে রেখেছিল কিছুক্ষণ। হাতের ঘড়িতে একটা বাজতেই তাদের মাল তুলতে

বললে। তারা ঝটপট খাটটা খুলে ফেলল। আলমারি বুক কেস বসার চেয়ার সব একে একে লরিতে তুলতে শুরু করল।

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। কেউ কোনও কথা বলছে না। যেন কারো মৃতদেহ পড়ে আছে উঠোনে, সবাই শোকে নিঃশব্দ।

ধ্রুবও মাথা তুলে কারো দিকে তাকাতে পারছে না। যেন সকলের কাছে ও ছোট হয়ে গেছে। অথচ তখন ভেবেছিল যুদ্ধজয়।

হেমন্তবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। সামনের সেই ভাঙা পোড়ো বাড়িটা আঁকড়ে ধরে পড়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে যে নিঃস্ব হয়ে গেছেন কেউ জানতে পারেনি। গোপনে গোপনে বাড়িটা বেচে দিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়েছিলেন। সেও কি এই রকমই কোনও লজ্জা!

—লোকটা কি বোকা, এত লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি বিক্রি না করে যদি সকলকে জানিয়ে করত, হয়তো অনেক বেশি দাম পেত। ধ্রুব বলেছিল।

ও জানত না, দাম বেশি পাওয়ার চেয়েও দামি জিনিস কিছু আছে। আত্মসম্মান। পাড়ার এই এতগুলি লোকের সামনে ছোট হয়ে যেতে চাননি।

ধ্রুবর মনে হল হেমন্তবাবুর মতোই ও পালিয়েই যাচ্ছে।

যাবার আগে কি বাবাকে একটা প্রণাম করবে, বলবে, আমি যাচ্ছি!

সেটা যে কত কঠিন কাজ, ধ্রুব ভাবতে পারেনি।

প্রীতির ভাই গিয়ে লরিতে বসল। বললে, তোমরা কিচ্ছু ভেবো না, আমি সব গোছগাছ করে দেব। তোমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসো।

ধ্রুব গিয়ে বাবাকে প্রণাম করল। প্রীতিও।

বাবা মাথা তুললেন না। নিজের পায়ের দিকেই যেন তাকিয়ে আছেন।

'আমরা চলে যাচ্ছি' এ-কথাটাও বলতে পারল না ধ্রুব। বলার তো কিছু নেই, নিজেই পাঁজি দেখে দিন বলে দিয়েছিলেন, মা সত্যনারায়ণ দিতে গিয়েছিলেন, তাও জানেন, লরিতে মালপত্র তোলা হচ্ছে দেখেছেন, অথবা শুনেছেন সিমলির কাছে।

ধ্রুব আর বাবার সামনে দাঁড়াতে পারছিল না, চলে আসছিল। বাবা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন, ছোটবৌমা। টিপুকে একবার দেবে, কোলে নেব।

ধ্রুবর বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা হল। দাঁড়িয়ে পড়েছিল ও।

টিপু তো সারাক্ষণ বাবার কাছে কাছেই থাকত। বাবার যত কথা ওর সঙ্গে। যত হাসি।

তা নিয়ে বড়বৌদি মেজবৌদি একটু টীকাটিপ্পনী করতেও ছাড়ত না।

মেজবৌদি বলেছিল, কই আমাদের ছেলেমেয়েদের তো কোনওদিন এত আদর করতে দেখিনি।

ওসব ঈর্ষার কথা। ধ্রুবর সব মনে আছে, ওরাই ভুলে গেছে।

প্রীতি টিপুকে নিয়ে গিয়ে বাবার কোলে দিল।

উনি টিপুকে একেবারে বুকের ওপর চেপে ধরলেন, যেন একেবারে হৃৎপিণ্ডের ওপর। ধ্রুবর ভয় হল, টিপুর ব্যথা লাগবে। একটা বাচ্চা ছেলেকে এমন করে কেউ চেপে ধরে নাকি।

ওর গালে থুতনি ঘষলেন। গালে গাল ঠেকালেন। তারপর টিপুকে ফিরিয়ে দিলেন প্রীতির কোলে। এমনভাবে হাত দু'খানা বাড়িয়ে ওকে ছেড়ে দিলেন, যেন চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছে।

আর তখনই প্রীতি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওর দু'চোখে জল।

ধ্রুব আর দাঁড়াতে পারছিল না। মাকে প্রণাম করেই তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল।

বড়বৌদি, মেজবৌদি, সিমলি সবাই তখন নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

বড়বৌদি ধীরে ধীরে বললে, একেবারে পর করে দিও না ঠাকুরপো।

মেজবৌদি কান্না কান্না মুখে এগিয়ে এসে ধ্রুবর হাত ধরল।—কাছেই তো রইলে ধ্রুবদা, এসো মাঝে মাঝে।

এতদিন ধ্রুবর মনে হয়েছে, সকলেই যেন শুধু বাঁধন ছিঁড়তে চাইছে। এখন মনে হচ্ছে, সবাই যেন বাঁধতে চাইছে। আর ও সেই বাঁধন ছিঁড়ে কিছুতেই বেরোতে পারছে না।

ধ্রুব বললে, প্রীতিকে দাঁড়াতে বলো। আমি ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছি।

আশ্চর্য, ট্যাক্সিও যেন ওর সঙ্গে শত্রুতা করছে। একটুও সময় দিতে চায় না। বাড়ি থেকে বের হতে না হতেই কাছেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। সে যেতে রাজিও হল।

নতুন ফ্ল্যাটে এসে উঠতেই মুহূর্তে সব যেন ধুয়েমুছে গেল। আসবাবপত্র ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা তিনজনই। ধ্রুব, প্রীতি, প্রীতির ভাই পুলক।

ডবল বেড খাটখানা খুলে আনা হয়েছে, ওটা প্রীতির বাবা মেয়ের বিয়েতে দিয়েছিলেন। ডবল বেডের চেয়েও একটু বেশি চওড়া। ভবিষ্যতে টিপু আসবে ভেবে নিয়েই অর্ডার দিয়ে বেশি চওড়া করিয়ে নিয়েছিলেন প্রীতির মা। ওঁর দূরদৃষ্টি আছে।

ওরা তিনজনে মিলে সেই খাটটা লাগাল শোবার ঘরের জানালা ঘেঁষে। তারপরও অনেকখানি জায়গা। খাটে গদি তোলা হল ধস্তাধস্তি করে। তোষক বালিশ।

একটা বসার ঘরও হয়ে গেল। সেটায় আপাতত বুককেস, আলমারি। তৃতীয় ঘবখানাতেও সামান্য কিছু আসবাব।

ওখানে এই ক'খানা জিনিসেই ঘরটা ছিল একেবারে ঠাসা। পা ফেলার জায়গা নেই, যে আসত সেই বলত। ওদের নিজেদেরও শুনতে খারাপ লাগত।

এখানে এসে একেবারে উল্টো।

পুলক প্রথম দেখেই বলেছিল, কত স্পেস রে প্রীতি। এত জায়গা নিয়ে কি করবি? দু'খানা ঘর হলেই তোদের চলে যেত।

প্রীতির দাদাও একটু সাবধানী প্রকৃতির মানুষ। সাড়ে চারশো টাকা ভাড়ার কথা শুনে বলেছিল, বাড়ি ভাড়াই দেবে সাড়ে চারশো, তা হলে খাবে কি!

তিন-তিনখানা ঘর বেশ ফাঁকা ফাঁকা রয়েছে দেখে পুলকও বললে, দু'খানা ঘর হলেই চলে যেত।

ওদের তো সরকারি ফ্ল্যাট, ভাল জায়গায়, ভাড়াও নামমাত্র। তাই জানে না, এ বাজারে অর্ডার মতো ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না। চারশো টাকাই মনে হচ্ছে দিব্যি সস্তা। দু' মাস ধরে ফ্ল্যাট খুঁজে খুঁজে তো হন্যে হয়ে গিয়েছিল ধ্রুব।

জিনিসপত্র সব কিছুটা গুছিয়ে রেখে প্রীতি মেঝের ওপরেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল, কিছুটা ক্লান্তিতে।

তারপর ফুর্তিতে বলে উঠল, আঃ, এতদিনে স্বাধীন হলাম।

ধ্রুবর নিজেরও সে-রকমই মনে হচ্ছিল, কিন্তু প্রীতির মুখে শুনতে ভাল লাগল না। বিশেষ করে পুলকের সামনে। এ ক'বছর আগের বাড়িতে প্রীতি কি খাঁচায় পোরা বন্দি হয়ে ছিল! সেখানেও তো স্বাধীনই ছিল, শুধু মনে হয়নি স্বাধীন।

ধ্রুব আর পুলকও টিপুকে নিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল।

ধ্রুবর মনে ফ্ল্যাট সম্পর্কে তখনও একটু অসন্তোষ লেগে আছে।

আক্ষেপের সঙ্গে বললে, ব্যাটা দালালটা এত তাড়াহুড়ো করল, আর আমরাও দু'জনই

এসে দেখলাম, বাড়িটার যে দক্ষিণ একেবারে চাপা, খেয়ালই হয়নি।

পুলক বলল, একেবারে হাওয়া পাবে না।

প্রীতি ওই দক্ষিণের ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চাইছিল। একটা পৃথক ফ্ল্যাটে উঠে আসতে পেরেছে, তাতেই সারা শরীরে ওর খুশি উপছে পড়ছে।

বললে, কলকাতায় ক'খানা ফ্ল্যাটে হাওয়া-বাতাস খেলে ? দক্ষিণ খোলা হবে, বে অফ বেঙ্গলের হাওয়া খাব, ওসব ভাবতে গেলে খাবার বেলাতেও হাওয়াই জুটবে।

ওরা দু'জনই হেসে উঠল।

আর তখনই প্রীতি বলে বসল। এবার বাবা হাউসকোট পরব, আর কাউকে কেয়ার করি না।

ধ্রুব আর পুলক আবার হেসে উঠল।

আসলে কার যে কোথায় লাগে, সামান্য একটা ইচ্ছে না মেটাতে পারলে মানুষ যে কত দুঃখী হয়, বন্দি ভাবে নিজেকে, বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। ধ্রুব জানে, প্রীতির ট্রাঙ্কের মধ্যে দু'-দু'খানা হাউসকোট একেবারে নতুন হয়েই পড়ে আছে। ও বাড়িতে হাউসকোট পরার সাহসই হয়নি প্রীতির। একদিন ধ্রুবকে জিগ্যেস করেছিল। —নিজের ঘরের মধ্যে পরলে কার কি বলার আছে !

ধ্রুব নিষেধ করেছিল। বাবা-মা কি মনে করবে। কিংবা ওঁরা কিছু না মনে করলেও বড়বৌদি তো ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে ছাড়বে না। উপরন্তু বাবা-মা'র বিরুদ্ধেও বিষোদগার করবে। 'এখন ছোটবৌমা যাই করুক, কোনও আপত্তি নেই, অথচ আমার বেলায় পান থেকে চুন খসলেই...'

প্রীতি বুঝি একদিন মেজবৌদিকে চুপিচুপি বলেছিল হাউসকোট পরার কথা।

মেজবৌদি উৎসাহ দেখিয়েছিল। —পর না, কে কি বলবে ভাবছিস কেন। তারপর হেসে বলেছিল, তুই চালু করে দিলে আমিও পরব।

কিন্তু ধ্রুব নিষেধ করেছিল বলে প্রীতি আর ওপথে যায়নি।

আশ্চর্য। এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে বাবা-মাকে অসন্তুষ্ট করতে, আঘাত দিতে চায়নি ধ্রুব। প্রীতিও চেষ্টা করেছে মেনে চলতে। অথচ শেষ পর্যন্ত একটা বড় আঘাত দিতে বাধল না। নিশ্চিন্তে ছেড়ে চলে এল। এর চেয়ে ছোটখাটো বাধানিষেধগুলো তুচ্ছ করতে পারলে হয়তো বড় আঘাতটা দিতে হত না। অন্তত এত তাড়াতাড়ি দিতে হত না।

একটা কেরোসিন স্টোভ কিনে রেখেছে প্রীতি, কেরোসিনও জমা করে রেখেছিল কিছু। বাসনকোসনও মোটামুটি চলে যাবার মতো।

কিন্তু রান্নার পাট নেই এখন। প্রীতিদের বাড়িতে রাত্তিরে খাওয়ার কথা। ওরাও খুব একটা দূরে থাকে না। রাত্তিরে খেয়ে ফিরে আসবে, নাকি ওখানেই রাতটা কাটাবে, এখনও ঠিক করেনি।

প্রীতি বললে, গ্যাসের জন্যে নাম লেখাতে হবে। কবে পাব কে জানে !

ধ্রুব হতাশ সুরে বললে, কোনটা যে আগে করি, কোনটা পরে। এত কাজ .

প্রীতি হাসল। বললে, বসার ঘরের জন্যে শোফাকৌচ...

ধ্রুব বললে, আপাতত তিনটে বেতের চেয়ার হলেই হবে।

প্রীতির মনঃপূত হল না। —তুমি কি বারবার বদলাবে নাকি ? কতগুলো টাকা জলে দিয়ে লাভ কি !

ধ্রুব চুপ করে রইল। কোনটাকে যে জলে দেওয়া বলে ও বুঝতেই পারছে না।

কিন্তু দিনে দিনে বাড়িটার শ্রী ফিরে আসছিল। খুব সুন্দর করে সাজিয়ে নিচ্ছিল প্রীতি,

বাড়িটা, অর্থাৎ এই তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট। এখন তো এটাই বাড়ি।

প্রীতির বাবা-মা দু'দিন এলেন, অনেকক্ষণ থাকলেন, গল্পগুজব করলেন, টিপুকে আদর। দেখে মনে হচ্ছিল ওঁরাও খুব খুশি।

প্রীতির বাবা হাসতে হাসতে মেয়েকে বললেন, ইচ্ছে হলেই এবার থেকে তোর এখানে চলে আসব।

একটু থেমে বললেন, যাই বলিস, তোদের আগের বাড়িতে যেতে কেমন সঙ্কোচ হত। ওঁরা খুবই ভালমানুষ, আমি গেলে খুব খুশি হতেন, আদর আপ্যায়ন করতেন, কিন্তু তবু...

ধ্রুবর নিজেরও সে-কথাই মনে হল। আগের বাড়িতে প্রীতির বাবা মা, কিংবা দাদা দিদি কেউ বেড়াতে গেলে, মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ধ্রুবর ভাল লাগত। কিন্তু কেমন আড়ষ্ট লাগত। এখানে এঁদের যতখানি আপন মনে হচ্ছে, আপন করে নিতে পারছে, আগের বাড়িতে তা সম্ভব ছিল না। সব সময়েই কেমন একটা সঙ্কোচ। কিছুটা লজ্জা, কিছুটা ভয়। প্রীতির তো আরো বেশি। যেন সব ক'টা চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, সব ক'টা কান সজাগ।

এখানে এখন সত্যি একটা মুক্তির হাওয়া।

প্রীতির মা নানা রকম উপদেশ দিচ্ছিলেন প্রীতিকে। ভাঁড়ারের জিনিসপত্র। কোথায় কীভাবে রাখবে, একটা মীটসেফ আনিয়ে নে, আরো কত কি।

বাড়িওয়ালা রাখালবাবুও খোঁজখবর নিতেন। সকালে মর্নিং ওয়াক করতে বেরোতেন। বেরোবার সময় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করতেন, ধ্রুব, কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তো? কিছু দরকার হলে বলো। একসঙ্গে আছি আমরা, বুঝলে কিনা...

হরিশ মুখার্জি রোডে থাকার সময় রাখালবাবু লুঙি পরে ফতুয়া গায়ে বাজারে যেতেন। হাতে থলি নিয়ে। এখন আর ওসব করেন না। চাকরবাকরদের হাতে বাজার তুলে দিয়েছেন। কিন্তু সকালে বাইরে একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরতে যেতেন বাজার করার নাম করে। এখন বাজার করা সাজে না, তাই মর্নিং ওয়াকে বের হন।

—তোমার তো গ্যাস স্টোভ নাই! একদিন হঠাৎ বললেন, রিনা বলছিল। আমার একটা চেনা লোক আছে, করিয়ে দোবো, বুঝলে কিনা।

প্রীতি শুনে বললে, যাই বলো, সব বাড়িওয়ালা একরকম নয়। রাখালবাবু লোকটি কিন্তু সত্যি খুব ভাল লোক।

রাখালবাবুর সংসার নিতান্ত ছোট নয়। দুই ছেলে, এক মেয়ে—রিনা। ছোট ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে হরিশ মুখার্জি রোডের একতলার ঘরে কি করে থাকতেন কে জানে। আসলে ব্যবসার ব্যাপারটাই হয়তো এই রকম। প্রথম দিকে কষ্টেসৃষ্টে থেকে টাকা জমাতে হয়। তখন সবাই ভাবে লোকটা দুঃস্থ। তারপর হঠাৎ একদিন মুখোশ খুলে ফেলতেই সকলে অবাক হয়ে যায়।

কিন্তু তার জন্যে রাখালবাবু মানুষটা বদলে যাননি। কোনও গর্ব নেই, ভাড়াটে বলে তাচ্ছিল্য করেন না। বরং ধ্রুবকে যেন একটু সমীহই করেন।

ধ্রুবর শুধু একটাই অনুশোচনা হয়। না জেনে মানুষটিকে দুঃখ দিয়ে ফেলেছে।

প্রীতিকে একদিন বলেছিল, ভদ্রলোক এত খোঁজখবর নেন, গ্যাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, একদিন ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এসো।

প্রীতি হেসে বললে, যাব। তবে গ্যাসের জন্যে ওঁর চিন্তাই বেশি, কেন জানো? তা না হলে বাড়ি নষ্ট হবে যে। কয়লা কিংবা কেরোসিনে শেষে এত যত্নের বাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে কে চায় বলো।

এদিকটা ধ্রুব একবারও ভাবেনি। বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হল না।

সেদিনই রাস্তায় রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি মর্নিং ওয়াক করে ফিরছেন। ওঁকে খুশি করার জন্যেই বললে, আপনার স্ত্রীকে তো একদিনও দেখলাম না, প্রীতি আজ যাবে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।

রাখালবাবু কথাটা শুনেই ধ্রুবর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

ধ্রুবর হাতটা ধরলেন, থরথর করে যেন কাঁপছেন, বললেন, সে তো নেই ধ্রুব। আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে। তিন-তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে...

গলা কাঁপছিল ওঁর। ছলছল চোখে বললেন, কি আর বলব তোমাকে, তিনটে মাসও পার হল না, শুধু বাড়িই করলাম আমি, সে ভোগ করতে পেল না ধ্রুব। বুঝলে কিনা, এ বাড়িতে আসার তিন মাসের মধ্যে...

ধ্রুব সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। অনুশোচনায় মনটাও খারাপ হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে প্রীতিকে সে-কথা বলতেই ও বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল। হেসে বললে, দূর, তুমি কি শুনতে কি শুনেছ।

ধ্রুব বললে, ভুল শুনব কেন, বললাম, তুমি ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। স্পষ্ট বললেন, গৃহপ্রবেশের তিন মাসের মধ্যেই মারা যান।

প্রীতি অবাক হয়ে বললে, কিন্তু ওঁর ছেলেমেয়েরা, রিনি বিল্টু ওরা তো এসেছিল, কত গল্প হল। কিছু তো বলেনি। বরং মা মা বলে কি যেন বলছিল।

তারপর বললে, ওরা ভীষণ ভাল, জানো।

এটুকুই পরম তৃপ্তি। এতকাল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে বাড়িওয়ালাদের সম্পর্কে কত কি শুনে এসেছে। খারাপ, খারাপ, বাড়িওয়ালা মানেই খারাপ লোক।

অফিসে অবিনাশকে আগেই বলেছিল একদিন, শুনে এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে প্রত্যেককে ডেকে ডেকে বলেছে, শুনুন শুনুন, বাড়িওয়ালা ভালও হয়। ধ্রুবর বাড়িওয়ালা ওর মুখ দেখে এমন গলে গেছে যে পঞ্চাশটা টাকা ভাড়া কমিয়ে দিয়েছে।

অবিনাশকেই এসে বললে। রাখালবাবু মানুষটা একেবারে ভালমানুষ। স্ত্রীকে বোধহয় খুবই ভালবাসতেন। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন, বেচারি বউটা নতুন বাড়িটা ভোগ করতে পেল না বলে দুঃখ করছিলেন।

অবিনাশ বললে, তুমি খুব লাকি ধ্রুব। এ বাজারে এমন ভাল বাড়িওয়ালা পাওয়া পরম সৌভাগ্য। তুমি বরং একটা কাজ করো, একটা লটারির টিকিট কেটে ফেল, সময়টা তোমার খুবই ভাল যাচ্ছে।

ধ্রুব হাসল। কিন্তু সত্যিই মনের মধ্যে একটা পরম তৃপ্তি। বাড়িওয়ালাকে নিয়ে কত লোকের কত ঝামেলা। নিত্যই তো শুনছে। ছোটমাসিদের তো মামলা চলছে। অফিসের বীরেশ্বরও সেদিন বলছিল, হাইকোর্টে ঝুলছে, নিত্যদিন উকিলের বাড়ি। তা ছাড়া ওর আবার একটু ভয়ও আছে, রেন্ট কন্ট্রোলে ভাড়ার টাকা জমা দেওয়া নিয়ে কি যেন ভুলভ্রান্তি...

ধ্রুবকে অন্তত সে-সব কথা ভাবতে হবে না। তেমন অবস্থা হলে ও নিজেই ছেড়ে দেবে।

ভালমানুষ ! কিন্তু একটা লোক, একজন মানুষকে কি বিচার করে ভাল বা মন্দ বলা যায় !

গলির মোড়ের বাড়ি থেকে যে ভদ্রলোক সেদিন বের হলেন, এখন নাম জেনে গেছে, অনাদিবাবু...মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা হত, হাসতেন, কখনও মুখ ফুটে 'ভাল ?', ধ্রুবও

সংক্ষেপে সারত।

কথায় কথায় একদিন জিগ্যেস করলেন, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো!

তারপরই অনাদিবাবু বলে বসলেন, লোক সুবিধের নয় মশাই, আপনার ওই বাড়িওয়ালা।

ধ্রুব আশ্চর্য হয়ে বললে, না না, উনি খুব ভাল, আমাদের সঙ্গে তো রীতিমত ভাল ব্যবহার করেন!

অনাদিবাবু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানবেন সব। বাইরে খুব মিষ্টি মিষ্টি ব্যবহার, কথাবার্তা...'

কথা শেষ না করেই ঝট করে ছাতাটা খুলে মাথায় দিয়ে হনহন করে চলে গেলেন।

অনাদিবাবু লোকটিকেই খারাপ মনে হয়েছিল ধ্রুবর। হয়তো কোনও কারণে রাখালবাবুকে পছন্দ করেন না। কিংবা স্রেফ ঈর্ষা। রাখালবাবুর এই বিশাল তিনতলা বাড়ি, দোতলায় আর গ্রাউন্ড ফ্লোরে চারখানা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েছেন, দু'খানা গাড়ি, বিরাট ব্যবসা। ঈর্ষা হবারই তো কথা।

কিন্তু তার জন্যই কি যেচে আলাপ করে তাঁর সম্পর্কে সাবধান করলেন অনাদিবাবু? নাকি ভালমানুষ বা খারাপ মানুষ বলে কেউ নেই। প্রত্যেকটি মানুষ তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক দিয়ে বিচার করে। যে একজনের কাছে ভাল, অন্যজনের কাছে সেই খারাপ।

অবিনাশকে ধ্রুব পছন্দ করে, এত আপন মনে হয়, ধ্রুবর তো ধারণা ও খুবই ভালমানুষ, অথচ অফিসের অনেকেই অবিনাশকে পছন্দ করে না। টীকাটিপ্পনীও করে।

কিন্তু রাখালবাবু যে এভাবে ওকে অবাক করে দেবেন ধ্রুব ভাবতেও পারেনি।

বাড়ি ফিরেই দেখলে একেবারে শোবার ঘরে প্রীতি মেয়েদের সভা বসিয়েছে। হো হো হাসির শব্দ আগেই শুনতে পেয়েছিল। যেন অনেকগুলি মেয়ে একসঙ্গে কথা বলছে। আর এলোপাথারি একটা হাসির ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

দরজা থেকে উঁকি দিয়ে দেখল। আভাসে বুঝতে পারল তিন তিনটি ফ্ল্যাটের মেয়েরা। কিন্তু এত হাসি হল্লা কেন বুঝতে পারেনি।

বসার ঘরের জন্যে এখনও কিছু কেনা হয়ে ওঠেনি। তাই সকলেই শোবার ঘরে। নতুন সংসার পাততে গেলে যে একসঙ্গে এত জিনিস কিনতে হয়, ধ্রুবর ধারণাই ছিল না।

শুধু পাখা আর বাল্‌ব কিনতে গিয়েই হেসে বলেছিল, ফতুর হয়ে গেলাম।

প্রীতি হেসে বলেছিল, এর মধ্যেই? এখনও তো সবই বাকি।

তারপর চোখ বুজে গলার স্বরটা কিম্ভূত করে মৃদু মৃদু হেসে বলেছিল, একসঙ্গে আড্ডা দেব, একসঙ্গে ঘুরব, একসঙ্গে বাড়ি ফিরব...একই বাড়িতে...

ধ্রুব ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলেছিল।

প্রীতি ধ্রুবর কথাগুলোই আউড়ে যাচ্ছিল। বিয়ের আগের কথাগুলো।

তখন ওরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল, প্রীতি ঝট করে উঠে পড়ে বলেছিল, সর্বনাশ, ন'টা বেজে গেছে। পৌঁছতে পৌঁছতে...

ধ্রুব তখনই বলেছিল প্রীতিকে।—দু'জনে একসঙ্গে আড্ডা দেব, একসঙ্গে ঘুরব, একসঙ্গে বাড়ি ফিরব, একই বাড়িতে, এমন হলে, কি ভাল যে হত।

শুনে প্রীতি বুঝতে পারেনি, বিস্ময়ের গলায় বলেছিল, যাঃ, তা কি করে সম্ভব?

ধ্রুব হেসে বলেছিল, কেন, বিয়ে করে।

মুহূর্তের জন্যে লজ্জা পেয়েছিল প্রীতি। মাথা নীচু করেছিল, সারা পথ ধ্রুবর মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। কিংবা ধীর পায়ে ধ্রুবর পাশে পাশে হেঁটে বাসস্টপ অবধি আসার

সময় ওর বুকের মধ্যে কিছু গুনগুন করে উঠেছিল।

পাশের ঘরে একা বসে ছিল ধ্রুব। ও এসেছে দেখেই বোধহয় মেয়েদের হাসিহল্লা থেমে গেল। একে একে সকলে চলে গেল।

আর প্রীতি হাসতে হাসতে এসে বললে, আজ যা একটা খবর দেব-না, দাঁড়াও...

বলে ওষুধের তাক থেকে স্মেলিং সল্টটা নিয়ে এসে বললে, নাও, হাতে রাখো, কি জানি যদি ফেন্ট হয়ে যাও খবর শুনে...

ধ্রুব সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

প্রীতি বললে, তোমার ওই রাখালবাবু, তুমি বলছিলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন স্ত্রীর কথা বলতে বলতে...

ধ্রুব বললে, কী হয়েছে ?

প্রীতি হেসে লুটোপুটি।—দ্বিতীয় পক্ষকে আজ নিয়ে এলেন, নতুন বৌকে দেখলাম আজ...

ধ্রুব বিশ্বাস করতে পারছিল না।

প্রীতি বললে, আমি একা নই, সব ফ্ল্যাটের সবাই দেখেছে।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, দু'মাস আগেই নাকি রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল। কী অসুবিধে ছিল বলে এতকাল আনতে পারেনি।

তারপরই সেই ব্রহ্মাস্ত্র।—অবাক হবার তো কিছু নেই। তোমরা ছেলেরা স্যার, সবাই এক।

ধ্রুব কোনও উত্তর দিল না, প্রতিবাদ করল না। শুধু মনে হল, সত্যিই অবাক হবার কিছু নেই। প্রত্যেকটি মানুষই এই রকম কিনা কে জানে। তার একটা দিক যখন বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে, হয়তো অন্যদিকটা তখন আরেকজনকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সেটাই স্বাভাবিক। নাকি, কান্নাটা রাখালবাবুর অভিনয় ?

## ৪

কয়েকটা বছরের মধ্যে প্রীতি ফ্ল্যাট গুছিয়ে নিয়েছে সুন্দর করে। প্রথম প্রথম ঘরগুলো বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগত। একটাই লাভ ছিল, টিপু নড়বড়ে পায়ে সারা বাড়ি ছুটে বেড়াতে পারত। এখন আর ওর পা নড়বড়ে নেই, দিব্যি হাঁটতে পারে, দৌড়তে পারে। কিন্তু দৌড়ে বেড়ানোর জায়গা নেই আর।

বসার ঘরে চমৎকার শোফাকৌচ বানিয়ে নিয়েছে।

ওসব ধ্রুবর একটুও পছন্দ ছিল না। ওর ইচ্ছে ছিল বেশ হেলান দিয়ে বসা যায় এমন একসেট বেতে বোনা চেয়ার। তার দামও বেশ কম, বসেও আরাম। কিন্তু প্রীতি রাজি হল না।

কোত্থেকে একটা আমেরিকান ফ্যাশন ম্যাগাজিন নিয়ে এল, বোধহয় নীচের তলার বঙ্কিমবাবুদের কাছ থেকে। পাতা উল্টে উল্টে এমন একটা ডিজাইন পছন্দ করল, যা কারও বাড়িতে দেখা যায়নি। যেন অন্য কারো বাড়িতে দেখা গেলেই সেটাকে যথেষ্ট ভাল বলা যাবে না।

বসার ঘরে একটা ডিভান এল। এক কোণে টি ভি।

ধ্রুব আপত্তি করে বলেছিল, কেই বা আসছে আমাদের এখানে, এত শোফাকৌচ ডিভান কি হবে।

প্রীতি বললে, বাঃ রে, কেউ আসবে বলেই কি বসার ঘর ? কেউ যদি আসে হঠাৎ, ওই

তো পাশের ফ্ল্যাটের ওরা একদিন এল, খাটে বসতে দিতে হল।

হেসে বললে, ধরো দাদাই যদি একদিন এসে থাকতে চায়। শোবে কোথায়। আমি ডিভানের অর্ডার দিয়ে এসেছি, বক্স মতো হবে। ভিতরে লেপতোষক তুলে রাখা যাবে, ওপরে গদি। কেউ এলে শুতেও পারবে।

তারপরই এই ডিভান। আর একটা আলমারিও এল। কাপড় রাখার নাকি জায়গা নেই। শেষে ফ্রিজ।

ফ্ল্যাটটা ক্রমশ সাজিয়ে তুলছে প্রীতি, আর তা দেখে ধ্রুবর ভালই লাগত। কিন্তু ধ্রুবর আরেক চেষ্টা ছিল টাকা জমানোর। সেটা আর সম্ভব হচ্ছিল না বলেই ভিতরে ভিতরে রাগ।

আসলে ধ্রুব একটা স্বপ্ন দেখত। কোথাও এক টুকরো জমি কিনে বাড়ি করবে। অন্তত একটা ফ্ল্যাট কিনবে। আজকাল তো লোন পাওয়া যায়, সব টাকা দিতে হয় না। মাসে মাসে ভাড়ার মতোই কিস্তিতে লোন শোধ করা যায়। আছে তো সেই বাবার দেওয়া হাজার পঞ্চাশ টাকা। না, সুদে বেড়ে এখন বোধহয় ষাট। কিন্তু আরও অনেক লাগবে।

প্রীতিকে খরচ কমানোর জন্যে সে-কথা বলতেই ও বলে উঠেছিল, অত টাকা জমাবে তুমি ? টিপু বড় হচ্ছে না ? স্কুলে দিতে হবে না ?

অর্থাৎ খরচ বাড়বে বই কমবে না।

অথচ এখন ধ্রুবর বড় অনুশোচনা হয়। প্রথম থেকেই যদি চেষ্টা করে টাকা জমিয়ে ফেলত, তা হলে লোনটোন নিয়ে হয়তো হরিশ মুখার্জি রোডে ওদের বাড়ির সামনে যে চারতলা ফ্ল্যাট বাড়িটা উঠল, তার একখানা ছোট ফ্ল্যাট কিনে ফেলতে পারত। তখন কত সস্তায় পাওয়া যেত। এখন শুনছে দিনে দিনে নাকি দাম বাড়ছে।

প্রীতিকে সে-কথা বলতেই ঈষৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, ভাগ্যিস কিনে ফেলনি। ও বাড়ির সামনেই ? দরকার নেই আমার ফ্ল্যাটের।

আসলে স্মৃতির গায়ে জড়ানো তিক্ততাটুকু ও কিছুতেই যেন ভুলতে পারছে না।

তিক্ততা একসময় ধ্রুবর মনেও ছিল। কিন্তু এতদিন বাদে, এখন তো ও রীতিমত সুখী, তেমন কোনও অশান্তি নেই, তাই তিক্ততাটুকুও ধুয়ে মুছে গেছে। হাল্কা হয়ে গেছে চাপা অপরাধবোধ।

প্রথম প্রথম ও অফিস থেকে ফেরার সময় বাবা-মার সঙ্গে দেখা করে আসত। একদিন তো ভুলে ও বাড়িতে চলে গিয়েছিল। যেন বাড়ি ফিরছে। দরজার সামনে পৌঁছে ভুল ভাঙল। নিজের মনেই হেসে ফেলেছিল সেদিন। এতদিনের অভ্যাস, ভুল সেজন্যেই। যেন ওদের সঙ্গেই দেখা করতে গেছে এমন স্বাভাবিক মুখ করেই ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু এতদিনের সেই ভুলটা নিজের মধ্যেই গোপন হয়ে আছে। ওদের তো বলেইনি, প্রীতিকেও না। শুনলেই কিছু একটা বলে বসত।

আজকাল মাঝেসাঝে যায়। সময়ের ব্যবধান ক্রমশই বাড়ছে। বাস থেকে ওখানে নামলে বকুলবাগানে আসা রীতিমত কষ্টকর। সরাসরি বাস নেই, হয় ট্যাক্সি, কিংবা হেঁটে আসা। আজকাল বড় ক্লান্ত লাগে।

ওখানে গেলে মা এটা ওটা খাওয়াতে চায়, বাবা টিপুর কথা, প্রীতির কথা জিগ্যেস করে। ধ্রুবর বড় অস্বস্তি লাগে।

কেবলই মনে হয় কী স্বার্থপর আমি। অথচ স্বার্থপর না হলেও বাঁচাও যায় না। যেন সুখ শান্তি সব স্বার্থের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে।

বড়বৌদি মেজবৌদি খুব অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলে, যেতে না যেতে চা করে নিয়ে আসে, প্লেটে করে খাবার। —আহা, তুমি তো আপিস থেকে আসছ।

মেজবৌদি একদিন হেসে বলেছিল, বাড়ি থেকে যদি আসতে, দিতাম নাকি ? স্রেফ এক কাপ চা। খাওয়াতে হয় সে মুখপুড়ি খাইয়ে পাঠাবে, আমি কেন দেব।

কথাগুলো খুব আপন আপন মনে হত।

মেজবৌদিও মাঝেমধ্যে ধ্রুবদের কাছে বেড়াতে আসে। সিমলিকে সঙ্গে নিয়ে। সিমলি কেমন চড়চড় করে বড় হয়ে গেল।

কলিং বেল বাজাতেই ধ্রুব ভেবেছিল মেজবৌদি এসেছে। রবিবারের দুপুরে, এ সময়ে আর কেই বা আসতে পারে। প্রীতিদের বাড়ি থেকে কেউ এলে সন্ধের দিকে আসে।

প্রীতি দরজা খুলতে গেল। খুলেই, 'ও মা আপনি ? কি ভাগ্যি।'

কথা শুনেই বিছানা ছেড়ে ধ্রুবও এগিয়ে গেল।

তারপরই বলে উঠল, ছোটমাসি, তুমি। এতকাল পরে হঠাৎ ? পিছনে ছোটমেসো, হেসে বললে, পর্বত তো মহম্মদের কাছে যাবে না।

আসলে ছোটমাসিকে দেখে অবাক হবার কথা নয়। আগেও একবার এসেছে। অবাক করেছে ছোটমেসো। এই প্রথম।

ওদের বসার ঘরে বসিয়ে প্রীতি বাচ্চা চাকরটাকে ফিসফিস করে কী বললে, টাকা দিল।

মিষ্টি আনতে পাঠাল।

ছোটমাসি বোধহয় বসার ঘরে বসেই টের পেল। চিৎকার করে বললে, এই ধ্রুব, বৌকে বারণ কর, কিছু যেন না আনায়। আমরা এইমাত্র খেয়ে এলাম।

কিন্তু প্রীতি সে-কথায় কান দিল না।

অনেক হাসাহাসি-গল্পগুজবের পর ছোটমেসো ঘুরে ঘুরে ঘর ক'খানা দেখল, রান্নাঘরে উঁকি দিল, একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। রোদ্দুরের জন্যে চলে এল।

বারান্দায় রেলিং ধরে একটা লতানে মানি প্ল্যান্ট অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছে প্রীতি, কয়েকটা ঝোলানো টবে ফুলের গাছ।

ছোটমেসো হেসে বললে, বাড়িতে মানিপ্ল্যান্ট রাখলে নাকি খুব টাকা হয় ? কি বৌমা, সত্যি ?

প্রীতি হেসে উঠল। —প্রচুর। রাখার জায়গা পাচ্ছি না।

ছোটমেসো বললে, নাঃ, চমৎকার ফ্ল্যাট, চমৎকার।

আর তখনই ছোটমাসি বললে, নিজে তো দিব্যি এমন একটা ফ্ল্যাট বাগিয়ে নিয়েছিস ধ্রুব, আমাদের একটা জোগাড় করে দে না।

এই ব্যাপার ! সেজন্যেই আসা।

প্রীতি বললে, কেন মাসিমা, আপনাদের ও বাড়ি কি হল ?

ছোটমাসি দুঃখী দুঃখী মুখ করে বললে, সে আর বলিস না। তোর ছোটমেসো বলছে উকিল ওকে ডুবিয়েছে, উকিল বলছে তোর ছোটমেসো ডুবিয়েছে। মামলা তো হেরে গেছি, মাত্র এক বছর সময় দিয়েছিল...

—সে কি ! আজকাল আবার মামলায় হারে নাকি কেউ ? ধ্রুব অবিশ্বাসের সুরে বললে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটমাসি ধ্রুবর হাত দু'খানা ধরে বললে, দ্যাখ না বাবা তুই, আমরা তো খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে গেলাম।

ছোটমেসো জিগ্যেস করল, তোমাদের ফ্ল্যাটের কত ভাড়া ধ্রুব ?

—সাড়ে চারশো। আগে চারশো ছিল, পঞ্চাশ টাকা বাড়াতে হয়েছে।

ছোটমেসো বলে উঠল, মাত্র ?

তারপরই বললে, খুব সময়মতো পেয়ে গিয়েছিলে। এখন আটশো হাজারেও পাবে না, তার ওপর দশ বিশ হাজার অ্যাডভান্স। তাও তো পাচ্ছি না।

এবার ধ্রুবরই অবাক হবার পালা। বাড়ি ভাড়ার কোনও খবরই রাখত না ও। জানার প্রয়োজনও হয়নি।

এই ফ্ল্যাটের ভাড়া এখন আটশো কিংবা হাজার! শুনে ভালই লাগল।

ভিতরে ভিতরে বেশ একটা গর্ব অনুভব করল।

যাবার সময়েও ছোটমাসি মনে পড়িয়ে দিল। —একটু খোঁজ রাখিস বাবা, কোথায় যে গিয়ে উঠব কোনও কূলকিনারা পাচ্ছি না।

ছোটমেসোকেও খুব উদ্‌ভ্রান্ত লাগল।

ওরা চলে যেতেই প্রীতি বললে, দেখলে তো? যে আসে সেই বলে চমৎকার ফ্ল্যাট, তোমারই কেবল দক্ষিণ দক্ষিণ। তখন না নিলে কী হত বুঝতে পারছ!

ধ্রুব কোনও উত্তর দিল না। এই ফ্ল্যাটটা নিজেব মনোমত হয়নি, মন্দের ভাল, কিন্তু অন্য অনেকে চমৎকার চমৎকার বলে বলেই পছন্দ করিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া এর চেয়ে ভাল আর কোথায় বা পেত।

কিন্তু ছোটমেসোর চিন্তিত উদ্‌ভ্রান্ত মুখ দেখে ওর মনও খারাপ হয়ে গেল। বেচারি। এই বয়সে নিরাশ্রয় হওয়ার ভয় যে কি দুঃসহ, ধ্রুব বুঝতে পাবে। বাবাকেও তো দেখেছে, যখনই বাড়িওয়ালা এসে মিষ্টি মিষ্টি হেসে উঠে যাওয়ার কথা বলত, বেশ কয়েকদিন ধরে বাবার মুখে ভয়ের ছাপ দেখতে পেত। ছোটমেসো তো আবার মামলায় হেরে বসে আছে। এক বছর সময় পেয়েছে, এই যথেষ্ট। কিন্তু যত দেরি হবে, ততই তো ভাড়া বাড়বে।

ইনফ্লেশন কথাটা মাঝে মাঝেই শোনা যায়। তর্কবিতর্ক উঠলে ধ্রুবও উচ্চারণ করে। কিন্তু কাউকে যেন স্পর্শ করে না, নাড়া দেয় না। যেন স্বাভাবিক কোনও ব্যাপার। অবযবহীন, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অনুভূতির বাইরে কোনও অশরীরী দৈত্য যেন।

আজকাল বাড়ি ভাড়া এত বেড়ে গেছে ওর ধারণাই ছিল না। এই সেদিনও তো রাখালবাবুদের ওপর রেগে গিয়ে প্রীতিকে বলেছিল, এভাবে থাকা যায় না, অন্য ফ্ল্যাট দেখতে হবে।

ভেবেছিল, আরো বেশি ভাড়া দিলে আরো ভাল ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে।

ধ্রুবর অবশ্য ইতিমধ্যে অফিসে দু'দুটো লিফ্‌ট হয়েছে। মাইনে বেড়েছে। কিন্তু খরচখরচাও বেড়েছে। তবু মনে হয়েছে আরো বেশি ভাড়া দিতে পারবে।

দিতে পারবে বলে ভিতরে ভিতরে একটু অহঙ্কারও ছিল।

প্রীতিকে বলেছিল, তোমার দাদার কথা মনে আছে? বলেছিল, সাড়ে চারশো টাকা বাড়ি ভাড়া দিলে খাবে কি!

বলে হাসল। হাসির মধ্যে যেন একটা অহঙ্কার। অর্থাৎ দিতে তো পারছি। দিয়েও অভাবের মধ্যে তো সংসার চালাতে হচ্ছে না।

প্রীতি বলল, দাদা সেভাবে বলেনি। সত্যি তো, যেভাবে বাড়ি ভাড়া বাড়ছে, লোকগুলো যাবে কোথায়?

তারপরই বললে, আর এখন যাদের নতুন করে ফ্ল্যাট দরকার, তাদের কথা ভাবো তো।

এ সব ভাবনাচিন্তার বাইরে। কেউ কিছু ভাবে না। যে যার নিজের কথা ভাবে। নিজের সমস্যার নিজেকেই সমাধান করতে হয়।

ধ্রুব ভেবে রেখেছে যেমন করে হোক একটা ফ্ল্যাট কিনবে। টাকা জমানোর চেষ্টাও

করছে। কিন্তু তার দামও তো বাড়ছে চড়চড় করে। নাগাল পাবে কি না কে জানে।

রাখালবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটা এখন আর তেমন নেই। অথচ প্রথম প্রথম কত অন্তরঙ্গতা। ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও দু-একবার এসেছেন।

ধ্রুবর, প্রীতির ভালই লেগেছিল।

তারপরই একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

রাখালবাবু একদিন রাস্তায় ধরলেন ধ্রুবকে। মর্নিং ওয়াক করে ফিরছিলেন, ধ্রুব ফিরছে বাজার থেকে।

রাখালবাবু চারপাশ দেখে নিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, একটা কথা ভাবছিলাম।

ধ্রুব সপ্রশ্ন চোখে তাকাল ওঁর দিকে।

রাখালবাবু একমুখ হেসে বললেন, তোমরা তো সোয়া দু'জন লোক, তিন-তিনখানা ঘর নিয়েছ। অনেক জায়গা।

ধ্রুবর বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। একটা ঘর ছেড়ে দিতে বলবে নাকি ? নাকি আবার কোনও অজুহাত দেখিয়ে আবার ভাড়া বাড়াতে বলবে।

ভয় পাওয়া মুখে ও শুধু তাকিয়ে রইল।

রাখালবাবু ট্রাউজার্সের দু' পকেটে দু'খানা হাত ঢুকিয়ে একেবারে আধুনিক ছোকরা হবার ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন পা ফাঁক করে। ওঁকে অবশ্য এ সব একেবারেই মানায় না, তার ওপর পায়ের ঘের বড় বেশি ঢিলেঢালা। মানুষটার মতোই।

বললেন, তোমাদের অসুবিধে কিছু হবে না। মানে...

ধ্রুব অধৈর্য হয়ে বললে, বলুন না, কি বলতে চান।

রাখালবাবু বললেন, আমার একটা লোহার সিন্দুক আছে, তোমাদের ঘরে রাখতাম। কখনো-সখনো হয়তো এসে খুলব, কাগজপত্র রাখব...

ধ্রুব প্রায় বলে ফেলেছিল, তাতে আর আপত্তি কি !

আসলে উনি যে একখানা ঘর ছিনিয়ে নিতে চাইছেন না, সেটুকু জেনেই ও খুশি হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, প্রীতিকে একবার জিগ্যেস করে দেখি।

—সিন্দুক রাখবে আমার ঘরে ? প্রীতি শুনেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

রেগে গিয়ে বললে, সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতে পারলে না যে ও-সব চলবে না।

ধ্রুব ওর রাগ দেখে হেসে ফেলল। বললে, বলব বলব, এত তাড়া কিসের।

প্রীতি বললে, বুঝতে পারছ না, ব্ল্যাকের টাকা রাখবে, আর নয়তো কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা। সার্চ হলে তো ওর বাড়ি সার্চ হবে। কিছুই পাবে না।

ধ্রুব বললে, আর আমাদের বাড়ি সার্চ করে যদি পায় আমরা ধরা পড়ব। ওর জিনিস প্রমাণ করতেই পারব না।

বলে দু'জনেই হেসে উঠল।

পরের দিনই রাখালবাবুকে জানিয়ে দিল ধ্রুব। জানিয়ে দিয়ে তবে স্বস্তি। যেন দেরি হলে জোর-জবরদস্তি সিন্দুকটা ঢুকিয়ে দিতেন উনি।

বললে, প্রীতি রাজি হচ্ছে না। আপনি ব্যাঙ্কের লকারে রাখছেন না কেন ? ওখানে রাখুন। উল্টে উপদেশ দিয়ে দিল ও, যেন সে-কথা রাখালবাবু জানেন না।

মনোমালিন্যের সূত্রপাত তখন থেকেই। বেশ বোঝা গেল, রাখালবাবু রেগে গেছেন। কিন্তু মুখে হাসিটা লেগেই রইল।

সপ্তাহখানেক বাদেই একটা ঘটনা ঘটল।

ধ্রুবর নিজের টেলিফোন নেই। প্রয়োজনও হয় না। রাখালবাবু অবশ্য প্রথম দিকে,

যখন খুব সদ্ভাব, বলেছিলেন, দরকার হলে আমার ওখান থেকেই করো।

ধ্রুব কখনও করেনি। প্রয়োজনই হয়নি। আর রাখালবাবুর টেলিফোনের নম্বরটাও জেনে রাখেনি।

ধ্রুব অফিসেই দাদার ফোন পেল। —বাবার খুব শরীর খারাপ, একবার আসিস।

ধ্রুব তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে ইদানীং ওর যাওয়া হয়ে ওঠে না। পনেরো বিশ দিন পরপর যায়। রবিবার তো একটাই ছুটির দিন, কখনো সিনেমা থিয়েটার, কখনো টি ভি-তে ভাল ছবি থাকে। বন্ধুবান্ধবের বাড়ি, নেমন্তন্ন। সময়ই পায় না।

তাই বাবার শরীর খারাপ শুনেই ধ্রুব বিচলিত বোধ করল। কেমন একটা অন্যায়বোধ। দু' সপ্তাহ কোনও খবরই রাখেনি। তেমন গুরুতর কিছু নয় তো?

ভাবল, প্রীতি আর টিপুকে নিয়ে যাওয়া উচিত।

এসেই প্রীতিকে বললে, শিগগির তৈরি হয়ে নাও, বাবার খুব অসুখ। দাদা ফোন করেছিল।

ওদের নিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে এসে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

বাড়ির সামনে পৌঁছেই দেখল ডাক্তারের গাড়ি। কাচের ওপর লাল ক্রশ।

দ্রুত ওপরে উঠে গেল ও। সিমলিকে দেখতে পেয়েই জিগ্যেস করল, কেমন আছেন রে!

সিমলি দৌড়ে এসে টিপুকে কোলে নিল। প্রীতিকে বললে, কতদিন পরে এলে কাকিমা! তোমাদের একটু আসতেও ইচ্ছে হয় না।

আধখানা সিঁড়ি উঠতেই ধ্রুব দেখতে পেল ডাক্তারবাবু নামছেন।

ও সরে দাঁড়াল। দু-চারটে কথা শুনল। উনি বেরিয়ে গেলেন।

সিমলি এতক্ষণে ওর কথার জবাবে বললে, দুপুরে তো বড় ডাক্তার এসেছিল। কাল যে কি অবস্থা গেছে ভাবতে পারবে না।

ওপরে উঠে এসে বাবার খাটের পাশে দাঁড়াল। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে শুয়ে আছেন।

দাদা ডাক্তারবাবুকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে বললে, সকালে এত ছুটোছুটি গেছে, তোকে খবর দিতে পারিনি।

তারপর বললে, কিডনির রোগ। দুপুরে ডাক্তার দাঁ এসেছিলেন, বললেন, ভয়ের কিছু নেই। এখন ভালর দিকে। দিন সাতেক আগে থেকেই, আমরা ভেবেছিলাম ঠাণ্ডা লেগে জ্বর...

ধ্রুবকে যে আরো আগে খবর দেওয়া হয়নি সেজন্যেই যেন দাদার এত সঙ্কোচ।

ধ্রুবর নিজেরও খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ওকেই সব শেষে খবর দেওয়া হয়েছে। বাড়ি ভর্তি লোকজন। মামা মাসিমাও এসে গেছেন। পিসিমাকেও দেখেছে। ওদের আগে খবর না দিলে এসে পড়ল কি করে। ওরা অবশ্য, ধ্রুব আগে যে ঘরে থাকত, সেই ঘরে বসে গল্প করছে। যেন গল্প করতেই আসা। দু বৌদি ওদের চা বানানো, খাবার দাবার নিয়ে ব্যস্ত। বাড়িতে একটা গুরুতর অসুখ না হলে আত্মীয়স্বজনের আড্ডা জমে না। যাদের সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়, এই সুযোগে তাদের রীতিমত একটা রি-ইউনিয়ন।

ধ্রুব ভেবে এসেছিল বাবার অসুখ বাড়াবাড়ি দেখলে রাতে এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু এত লোকজন দেখে থাকতে ইচ্ছে হল না। শোবার জায়গাই হবে না।

মেজবৌদি বললে, রাত্রে থাকবে তো।

ধ্রুব বললে, না।

—সে কি, তোমাদের যে ভাত চড়িয়ে দিলাম। অন্তত এখানে খেয়ে যাও।

প্রীতিই জবাব দিল—কেন ওসব করতে যাচ্ছ দিদি। তাছাড়া এত লোকজন, আমরা ফিরেই যাব।

তবু মেজবৌদি ওদের ছাড়ল না। না খেয়ে যেতে দেবে না।

তারপরও কিছুক্ষণ থাকতে হল। শোবার জায়গা, বিছানাপত্তর যে পিসিমা আর মাসিমার দল দখল করে নিয়েছে বলেই চলে যেতে হচ্ছে তা কি আর ওরা বুঝবে! হয়তো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে, দ্যাখো, ছেলের কাণ্ড, বাবার এমন অসুখ, শুনেই আমরা ছুটে এলাম, আর ছেলে তার বৌকে নিয়ে চলে গেল।

দাদা বললে, তোরা চলেই যা। এখন তো আর ভয়ের কিছু নেই।

কেন বললে কে জানে। হয়তো অসুবিধে বুঝেই। নাকি পিসিমা মাসিমার কাছে দেখাতে চাইল বড়ছেলে কত কর্তব্যপরায়ণ, আর ছোটছেলে বাবা-মা'র তোয়াক্কাই করে না।

ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কি এমন রাত।

বকুলবাগানের এই দিকটা দিনের বেলাতেই নির্জন। সন্ধের পর থেকে লোকজনের যাতায়াত কমে যায়। বড় বেশি নিঃশব্দ। আশপাশের বাড়ির আলোও তখন নিভে গেছে।

ট্যাক্সি আসতে রাজি হয়নি বলেই একটা রিক্সা ধরতে হয়েছিল।

ঠুং ঠুং করে রিক্সাটা এলও খুব আস্তে আস্তে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর রিক্সাওয়ালা বোধহয় ক্লান্ত। তাই তাড়া দিতে ইচ্ছে হয়নি।

বাড়ির সামনে এসে নামল। বাড়িটা একেবারে রাস্তার ওপর।

দেখল সদর দরজা বন্ধ।

এত তাড়াতাড়ি তো দরজা বন্ধ হয় না।

দরজা থেকেই সিঁড়ি উঠেছে। নীচের তলায় দুদিকে দুই ভাড়াটে, আর সিঁড়ির পাশেই একখানা ছোট ঘর।

ওই ঘরে সেই গোঁপওয়ালা লম্বা চওড়া চেহারার দারোয়ান থাকে। একাই। কোনও কোনওদিন দেহাতি বন্ধুদের জুটিয়ে এনে তাস খেলে, কি রেডিও শোনে। একটা ট্র্যানজিস্টার রেডিও সব সময় ওর বগলে ঘোরে।

ভাড়াটেরা সকলে ফিরে আসার পর রাত এগারোটা কি বারোটায় ও সদর দরজা বন্ধ করে।

ধ্রুব দরজার কড়া নাড়ল। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

বিরক্ত হয়ে খুব জোরে জোরে কড়া নাড়ল।

শেষে জোরে জোরে চিৎকার করে ডাকল, রামদয়াল! এই রামদয়াল।

নীচের তলার ভাড়াটেরাও কেউ কি শুনতে পাচ্ছে না?

তিনতলার জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল আলো নেভানো। এত তাড়াতাড়ি সব শুয়ে পড়েছে? হাতের ঘড়িটা দেখল। কই তেমন রাত তো হয়নি।

ভিতরে ভিতরে বিব্রত বোধ করছিল। প্রীতি আর টিপুকে নিয়ে এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সেজন্যেই অস্বস্তিতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। দড়াম দড়াম করে দরজায় দুটো লাথি কষিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমবাবুদের একটা জানালা খুলে গেল।

বঙ্কিমবাবু প্রশ্ন করলেন, কে?

—আমি ধ্রুব। দেখুন তো, দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

ভিতর থেকে বঙ্কিমবাবুর হাঁকডাক শোনা গেল।

রামদয়াল দরজার তালা খুলল। রাত্রে ও দরজায় তালা দিয়ে রাখে। কপাট খুলে দিয়ে বললে, ছাদে ছিলাম।

ধ্রুব তখনও উত্তেজিত। ঘড়ি দেখিয়ে বললে, এর মধ্যে তালা দিয়েছিলে কেন ?

ও কোনও উত্তর দিল না।

আর ধ্রুব সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে রাগের মাথায় বললে, শালা !

ঘরে ঢুকে প্রীতি বললে, এমন এক একটা কাণ্ড করো, দারোয়ানটা শুনতে পেল।

ধ্রুবর রাগ তখনও পড়েনি। বললে, শোনাবার জন্যেই।

প্রীতি অবাক হয়ে বললে, তুমি দারোয়ানকে শালা বললে ? ও যদি কিছু বলে বসত ?

ধ্রুব বললে, ও বুঝতে পেরেছে যে ওকে বলিনি।

একটু থেমে বললে, তুমিই বুঝতে পারোনি। ছাদে গিয়েছিল না ছাই। সব ওই রাখালবাবুর প্ল্যান, আমাদের যাবার সময় দেখেছিল। অপদস্থ করার জন্যেই তালা দিতে বলেছে।

প্রীতি হেসে ফেলে বললে, কি যে বলো !

ধ্রুব বললে, ঠিকই বলছি। ওই যে সিন্দুক রাখতে দিইনি আমাদের ঘরে, সেজন্যেই।

ধ্রুবর খুব অপমান লেগেছিল। এতদিন বুঝতে পারেনি বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটের মধ্যে কোনও দাগ টানা আছে কিনা। এই একটা ঘটনায় বুঝতে পারল। রাগের মাথায় গালাগাল দিয়ে ফেলেছে, দারোয়ান নিশ্চয় রিপোর্ট করবে, তখন আবার রাখালবাবু যদি কিছু বলতে আসেন. .

সকালে উঠেই বাকি তিনটে ফ্ল্যাটের বঙ্কিমবাবু, সুধাংশুবাবু, অমিতবাবু—প্রত্যেককে গিয়ে রাতের ঘটনার কথা বললে।

—এভাবে যদি দবজায় তালা দিযে দেয়, এ কি মেয়েদের হোস্টেল পেয়েছে মশাই ?

সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। অবশ্য চাপা স্বরে।

বঙ্কিমবাবু বললেন, দরকার হয় আমরা সব একসঙ্গে গিয়ে বলব। প্রোটেস্ট করা উচিত।

আর তখনই তিনতলার সিঁড়ির মাথা থেকে রাখালবাবুর হাঁক শোনা গেল, রামদয়াল ! এই রামদয়াল !

নীচের ঘর থেকে রামদয়াল সাড়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে রাখালবাবুর চটির শব্দ শোনা গেল। নীচে নামছেন।

বঙ্কিমবাবুকে দেখতে পেয়েই বললেন, আর পারছি না মশাই, ওই রামদয়ালটাকে নিয়ে। রিনি বলছিল, কাল রাত্রে নাকি তাড়াতাড়ি দরজায় তালা দিয়ে দিয়েছিল...

রাখালবাবু রামদয়ালকে ধমকে দিলেন। —সকলে ফিরেছে কিনা দেখে তবে তো তালা দিবি।

রামদয়াল কোনও কথা বলল না। মাথা নীচু করে রইল।

আবার উঠে চলে গেলেন।

প্রীতি বললে, দেখলে তো। অকারণ চটে গিয়েছিলে।

ধ্রুবর নিজেরও মনে হল, অকারণ। তবু কেমন একটা সন্দেহ রয়েই গেল। সব ব্যাপারটাই বোধহয় সাজানো।

সামান্য একটা ঘটনা। হয়তো সত্যিই গুঁপো দারোয়ানটা খেয়াল করেনি যে ধ্রুবরা তখনও ফেরেনি, গরমের জন্যে ছাদে চলে গিয়েছিল, আর দরজায় তালা দেওয়া তো ওর অভ্যাস, তাই তালা দিয়েছিল।

ধ্রুবকে সেজন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে প্রীতি আর টিপুকে নিয়ে। নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারছি না, বিশেষ করে প্রীতিকে এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। তাই ধ্রুবর নিজেকে অপমানিত লেগেছে।

অফিসে এসে পরের দিনই বললে। বাবার অসুখ নিয়েই শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দরজায় তালা দেওয়া।

অবিনাশ হাসতে হাসতে বললে, এই তো সবে শুরু। সেদিন বলছিলে না, তোমাদের রাস্তায় একটা ফ্ল্যাট খালি হয়েছিল...

ধ্রুবর মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে বললে, তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?

—সম্পর্ক আছে ব্রাদার, আছে। কলকাতায় কোথাও এখন ফ্ল্যাট খালি হয় না। কারণ, আইন ভাড়াটেদের পক্ষে। তবু ফ্ল্যাট খালি হয় কেন ?

ধ্রুব বেশ কিছুদিন আগে বাজারে যাওয়ার সময় দেখেছে ওদের বাড়ির তিন-চারখানা বাড়ির পরেই একটা লরিতে মালপত্র বোঝাই হচ্ছে। ফ্রীজ, আলমারি, খাট, আরো কত কি। ঠিক একদিন ধ্রুব এ বাড়িতে যেভাবে এসেছিল।

রাস্তার একজনকে জিগ্যেস করে জানল, তিনতলার ভদ্রলোক চলে যাচ্ছেন।

কেন চলে যাচ্ছেন জিগ্যেস করার কৌতূহল হয়নি। ফ্ল্যাট খালি হচ্ছে এটাই বড় খবর। এসেই প্রীতিকে বলেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি বলেছে, একবার গিয়ে খবর নিয়ে দেখো না, কেমন ফ্ল্যাট। কত ভাড়া।

অর্থাৎ ছোটমাসিদের জন্যে। ওদের কথা ধ্রুবরও মনে পড়েছিল। মন্দ কি, একই পাড়ায় যদি আত্মীয়স্বজন কেউ থাকে সে তো ভালই।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছে পরের দিনই।

গিয়ে শুনেছে, ভাড়া হয়ে গেছে। পাশের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বলেছেন, বিশ্বাস করবেন না, এই ছোট ছোট তিনখানা ঘর, এক হাজার টাকা ভাড়া। সিন্ধি ব্যবসাদার, অ্যাডভান্স যে কত নিয়েছে কে জানে।

রাখালবাবুও সে খবর পেয়েছেন। পেয়েই ধ্রুবর নীচের ফ্ল্যাটের বঙ্কিমবাবুকে শুনিয়েছেন।

দুটো বছর ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে, কিন্তু ধ্রুবর তো মনে হয় এই সেদিন। এরই মধ্যে ফ্ল্যাটের ভাড়া যে এমন আকাশচুম্বী হয়ে উঠবে কল্পনাও করেনি।

রাখালবাবুর হয়তো সেজন্যেই অনুশোচনা। তখন এমন বাজার ছিল না, তখনও দু'চারটে ফ্ল্যাট খোঁজাখুঁজি করলে পাওয়া যেত।

অবিনাশ বললে, সিন্দুক নয় হে, সিন্দুক নয়। আসলে এখন তোমার বাড়িওয়ালা পস্তাচ্ছেন, ভাবছেন কি ভুলই করে ফেলেছি।

তারপর হেসে বলেছে, স্টেপ বাই স্টেপ, দেখে নিও। এ তো সবে শুরু। কর্পোরেশনের ট্যাক্স বেড়েছে, বলবে ভাড়া বাড়াতে হবে। ইলেকট্রিকের চার্জ বেড়েছে, ভাড়া বাড়াও। তারপর মোক্ষম দাওয়াই, জলযুদ্ধ।

—মানে ? ধ্রুব বুঝতে পারেনি।

হো হো করে হেসে উঠেছে অবিনাশ।—তাও জানো না ? আমিও ভুক্তভোগী হে, এখন জলপথে যুদ্ধ চলছে।

সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলেছে, নাও একটা ধরাও। হার্টকে তাজা করে নাও।

তারপর।—স্টেপ বাই স্টেপ, মিলিয়ে নিও। ভাড়া বাড়ালেও যা, না বাড়ালেও

তাই। তিনবারের জায়গায় দু'বার পাম্প চালাবে। কতক্ষণ চালায় ? আধ ঘণ্টা হলে বিশ মিনিট, তারপর পনেরো কি দশ। তুমি চটবে। চ্যাঁচাবে, গালাগালি দেবে। দু'দিন পাম্প চালাবে ঠিকমত, কিন্তু ছাদে বসে বাড়িওয়ালা কলকাঠি নাড়বে। ট্যাঙ্কের চাবি আছে জানো ? সেটা তিন প্যাঁচ মাত্র খোলা রাখবে। চুরচুর চুরচুর করে জল পড়বে কলের মুখ দিয়ে, বালতি ভরবে না।

সিগারেটে দুটো বড় বড় টান দিয়ে অবিনাশ পাশের টেবিলের সুনন্দকে ডাকল।—এই যে বাড়িওয়ালা শুনে যাও।

সুনন্দ হাসল। তারপর সামনে উঠে এসে বললে, সব শুনছি, কিন্তু আমার ভাড়াটেদের তো দেখেননি। গুণ্ডা, দাদা, সব গুণ্ডা। গালাগালির ভাষা যদি শোনেন...

অবিনাশ বললে, ওদের মতো হতে পারলে তবেই ভাই টেকা যায়। আইন আদালত নিয়ে কি আর জলপথে যুদ্ধ করা যায় তোমাদের সঙ্গে।

তারপরই ধ্রুবকে প্রশ্ন করল, ভাড়াটেরা যে এখনও টিকে আছে কেউ কেউ, এই আমার মতো, কেন বলো তো ? কারা টিকিয়ে রেখেছে ?

ধ্রুব হেসে বললে, জানি না।

—ভারী ! ভারী কাকে বলে জানো ? ওই যে বাঁকের দু'পাশে দুটো কেরোসিনের টিন বাঁধা ? রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়। ওরা। সব রাস্তায় দেখতে পাবে।

হাসতে হাসতে বললে, পুরমন্ত্রীমশাই মাঝে মাঝে বিবৃতি দেন দেখেছ ? জল সাপ্লাই বাড়িয়ে দিচ্ছি। জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে, কাকে সাপ্লাই দিচ্ছ ? সে তো বাড়িওয়ালাকে। আমাদের সাপ্লাই তো ওই ভারী, তাও কল নয়, টিউবওয়েল থেকে। সকাল থেকে দেখবে, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঝগড়া মারামারি। কি ? না, ও-বাড়ির তিনতলায় এ-বাড়ির দোতলায় জল সাপ্লাই দিতে হবে। রীতিমত একটা প্রফেশন তৈরি হয়ে গেছে হে, এই বাড়িওয়ালাদের কল্যাণে।

স্টেপ বাই স্টেপ। অবিনাশ বলেছিল।

ঠিক তাই। ধ্রুব একবার পঞ্চাশটা টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল, রাখালবাবু সন্তুষ্ট হবেন।

বঙ্কিমবাবু রাজি হননি। বলেছিলেন, জলে দিচ্ছেন টাকাটা।

অমিতবাবু প্রথমে খুব হম্বিতম্বি করেছিলেন। গালাগালিও। 'আইন আছে' বলে শাসিয়েছিলেন। তারপর বুঝে গেলেন আইন ওই খাতাকলমেই।

শেষ পর্যন্ত চার-চারটে ফ্ল্যাটেই 'ভারী' এসে ঢুকল। সুযোগ বুঝে তারাও রেট বাড়িয়ে দিল। এক ভার জল ষাট থেকে লাফিয়ে এক টাকা। তার আবার দুদিন আসে না, দর বাড়ায়। কোনওদিন টিউবয়েলটাই খারাপ। গরমের দিনে মাথা গরম হয়ে যায়। বঙ্কিমবাবু একদিন বাড়িওয়ালার ওপর এমন রেগে গিয়েছিলেন, বাড়িওয়ালাকে হয়তো খুনই করে বসতেন।

এর ওপর আবার নতুন ঝগড়া গোঁপওয়ালা দারোয়ানের সঙ্গে। কারণ সিঁড়িতে জল পড়লে ভারীকে ধমক লাগায় সে। একদিন নাকি ঢুকতে দেবে না বলে শাসিয়েছিল।

একদিকে রাখালবাবু। অন্যদিকে চার-চারজন ভাড়াটে। এক ভাড়াটের সঙ্গে অন্য বাড়ির ভাড়াটের দেখা হলেই ফিসফিস আলোচনা।—কি করা যায় বলুন তো। এক বাড়িওয়ালাকে আরেক বাড়িওয়ালা পরামর্শ দেয়। —চাবি বন্ধ করে দিন, চাবি বন্ধ করে দিন।

অবিনাশ কথাটা ভালই বলেছিল। জলপথে যুদ্ধ।

শেষে বাড়ির মধ্যেই অশান্তি।

প্রীতির মেজাজ সব সময়েই সপ্তমে। কণ্ঠস্বরও।

কোথাও শান্তি নেই। পৃথিবীটাই যেন অগোছালো। এক অশান্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আরেক অশান্তিতে ঝাঁপ দেওয়া। আলাদা ঘরসংসার করেও সুখ নেই।

ধ্রুবর এক একসময়ে মনে হয় বিয়ের আগের দিনগুলোই যেন ভাল ছিল।

দিনরাত সংসার সংসার, অফিস থেকে ফিরে ধ্রুবর হঠাৎ একদিন মনে হয়েছিল প্রীতির ওপর বড় অবিচার হচ্ছে, মাঝে মাঝে সেই পুরনো দিনে ফিরে যেতে পারলে মন্দ হয় না।

অফিস থেকে ফিরে একদিন বললে, বাইরে যাওয়া মানে তো সিনেমা আর দোকান, দোকান আর সিনেমা, চলো আজ একবার লেকে বেড়িয়ে আসি।

প্রীতি হেসে বললে, যাক তা হলে এখনও ইচ্ছে হয়!

লেকে বেড়াতে বেড়াতে ওরা একটা গাছের নীচে দিয়ে যখন চলেছে, নড়বড়ে পায়ে টিপু হাঁটছে ধ্রুবর হাত ধরে, প্রীতি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, এই, কিছু মনে পড়ে?

ধ্রুবর মনে পড়ছে না দেখে হেসে উঠল। প্রশ্ন করলে, কী গাছ বলো তো এটা?

ধ্রুবর মনে পড়ে গেল। বললে, সোঁদাল।

—ইস্ কি আনরোমান্টিক, অমলতাস বলতে পারো না!

দু'জনেই হেসে উঠল। কারণ বিয়ের আগে ঠিক এই গাছটাকে নিয়ে এই কথাগুলোই হয়েছিল।

গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে ধ্রুব মৃদু হেসে বললে, গাছটা মনে থাকবে না? দ্য বিগিনিং।

প্রীতি হেসে বললে, এখন তো মনে হয় দি এন্ড।

ধ্রুব হাসল। এই গাছটার অন্ধকার মেখে যাবার সময়েই, সেই প্রথম সাহস করে ধ্রুব বলেছিল, আমি এবার একটা চুমু খাবো।

পায়ে সাপ জড়িয়ে গেছে এমনভাবে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠেছিল প্রীতি। —এই না, ন্না, ন্না।

ততক্ষণে প্রতিরোধ দুর্বল, প্রীতি স্থির।

ধ্রুবর বাঁ হাত প্রীতির কাঁধ বেষ্টন করে সাপের মতোই তার কণ্ঠতট বেয়ে নেমে আসতে চাইছিল।

প্রীতি ঝট করে ধ্রুবর সরীসৃপ আঙুলগুলো মুঠোর মধ্যে ধরে জোরে মোচড় দিয়েছে।

—উফ্। চিৎকার করে উঠেছে ধ্রুব।

ফেরার সময়ে ধ্রুবর অভিমানে থমথম মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আগেই সব শেষ করে দিলে বিয়ের পরে আর কি থাকবে!

লেকে আবার বেড়াতে গিয়ে সেই গাছটার তলা দিয়ে যেতে যেতে প্রীতি স্বগত উক্তিতে বললে, বিয়ের আগের দিনগুলোই ভাল ছিল। একটু থেমে বললে, সব সুখ কেড়ে নিল ওই রাখালবাবুটা। একটা ট্যাঙ্কের চাবি!

দু'জনেই হেসে উঠল।

এমনি সময়েই হঠাৎ একটা সুখবর শুনল অফিসে এসেই। অনেকদিন ধরে কথাবার্তা চলছিল, সুরাহা হয়ে গেছে। অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে মোটা টাকা লোন পাওয়া যাবে বাড়ি তৈরির জন্যে। ফ্ল্যাট কেনার জন্যেও।

সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবর মনে হল যেন ওর ফ্ল্যাট কেনা হয়ে গেছে। কিংবা একটা বাড়ি।

স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিল।

প্রীতিও শুনল। স্বপ্ন দেখল। সে কি উল্লাস।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন বঙ্কিমবাবু বিশুষ্ক মুখ নিয়ে এসে হাজির হলেন। —ধ্রুববাবু, আপনার সঙ্গে কথা ছিল।

ধ্রুব 'আসুন আসুন' বলে তাঁকে নিয়ে গেল বসার ঘরে। কপাট বন্ধ করে দিল। একটাই তো আলোচনা এখন। একটাই বিষয়। বাড়িওয়ালা। সেজন্যে যখনই নিজেদের মধ্যে কোনও পরামর্শ হয়, বসার ঘরের কপাট বন্ধ করে দেয় ধ্রুব। রাখালবাবু বা তার ছেলেমেয়ে কেউ সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করার সময় না শুনতে পায়।

বঙ্কিমবাবু একখানা লম্বা খাম এগিয়ে দিলেন।

—কী ব্যাপার ? ধ্রুব সন্ধিগ্ধ স্বরে জিগ্যেস করল।

বঙ্কিমবাবু বললেন, বাড়ি ছাড়ার নোটিস।

ধ্রুব চমকে উঠল। —সে কি ?

বঙ্কিমবাবু বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। —হ্যাঁ। কাল এসেছে রেজিস্ট্রি ডাকে।

ধ্রুব সাহস জোগাতে চাইল। —ছেড়ে দাও বললেই ছেড়ে দিতে হবে, কি আব্দার। কোন গ্রাউন্ডে তুলবে শুনি !

বঙ্কিমবাবু হাসলেন। —মামলা করবে ভয় দেখাচ্ছে, মামলাকে আমি ভয় পাই না। আমাকেও তো আত্মরক্ষা করতে হবে ধ্রুববাবু, ও জানে না তখন আমার অন্য চেহারা দেখবে। তবে ওই, মামলা মকদ্দমার ঝামেলা কে চায় বলুন। কিন্তু উপায় তো নেই।

বঙ্কিমবাবু খবরটা জানিয়ে গেলেন। বললেন, ভাড়া দিতে গিয়েছিলাম, তাও নেয়নি। না নেয়, রেন্ট কন্ট্রোলে দেব।

বলে চলে গেলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুব কেমন বিচলিত বোধ করল। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে বিরোধ, ধ্রুবর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। ওর বিরুদ্ধে তো রাখালবাবু মামলা করতে যাচ্ছেন না। তবু মনে হল যেন ওরই বিরুদ্ধে। বঙ্কিমবাবুও তো একজন ভাড়াটে। সব ভাড়াটের স্বার্থ তো একসঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ওর মনে হল বাইরের পরিচয়গুলো কিছুই নয়। বঙ্কিমবাবুকে ও চিনতও না। হয়তো ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষিও হয়েছে কখনো-সখনো। বঙ্কিমবাবুরা সিঁড়ির প্যাসেজে বাড়িসুদ্ধ লোকের জুতো রাখতেন।

ধ্রুব বলে বলেও বন্ধ করাতে পারেনি।

শেষে একদিন রেগে গিয়েই বলেছিল, এটা কমন প্যাসেজ, এভাবে এনক্রোচ করা চলে না। আমার বাড়িতে কেউ এলে সে সামনে জুতোগুলো দেখলে কি ভাববে বলুন তো। ভাববে আমিই রেখেছি।

রাগ সামলে নিয়ে হেসে বলেছিল, জুতো দেখিয়ে অভ্যর্থনা !

সেদিন থেকেই ওটা বন্ধ হয়েছিল।

অন্যদিকে রাখালবাবুর সঙ্গে কতদিনের চেনা, পুরনো সম্পর্ক। 'কিছুই ভুলিনি, কিছুই ভুলিনি', বলে পঞ্চাশটা টাকা ফেরত দিয়েছিলেন। তখন কত ভালমানুষ।

এখন বুঝতে পারছে, বঙ্কিমবাবু অনেক আপন। কারণ ধ্রুব আর বঙ্কিমবাবু একই শ্রেণী। রাখালবাবুরা অন্য শ্রেণী। ওঁরা বাড়িওয়ালা। অর্থাৎ ওঁদের ভাড়াটে আছে। অথচ দু-চারজন ভাল বাড়িওয়ালার কথাও তো শুনেছে। আর যারা ভাড়াটাড়া দেয় না, বাড়ির মালিক, নিজেই থাকে, কই তারা তো এত খারাপ হয় না। নাকি তারা আবার আরেক চরিত্রের ! একই মানুষ এক-এক পরিচয়ে এক-এক চরিত্রের মানুষ হয়ে ওঠে হয়তো।

বঙ্কিমবাবু চলে যাবার পরই কি মনে হতে আলমারি খুলে ভাড়ার রসিদগুলো দেখল

ধ্রুব। কয়েক মাস আগে থেকেই খটকা লাগছিল। রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ওপর সইটা যেন অন্য কার, আগের সইগুলোর সঙ্গে হুবহু মিল নেই।

বঙ্কিমবাবুকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে জেনেই এক পরিচিত উকিলের কাছে ছুটে গিয়েছিল ধ্রুব।

সে তো প্রথমেই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, তা হলে তো ফোজদারির মামলা হবে। উপদেশ দিল, সামনে সই করতে বলবেন।

যেন এতই সহজ। সামনে সই করতে বললে তো রেগে টং হয়ে যাবে। তারপর কী করবে কে জানে। টাকা দেওয়ার পর বারবার মনে পড়াতে হয় রসিদ দেবার জন্যে। তার চেয়ে বড় কথা নিজেকে মনে রাখতে হয়। যেন টাকা নিয়েই তিনি ধ্রুবকে ধন্য করছেন।

অবশ্য দেখা গেল অন্য ভাড়াটের সঙ্গে রসিদের নম্বরের কোনও গরমিল নেই। উকিলবাবু বললেন, ওটাই যথেষ্ট প্রমাণ। দরকার হয় ভাড়াটেদের সাক্ষী ডাকবেন।

তারপর হাসতে হাসতে উকিলবাবু বললেন, ভাড়াটে তোলা যায় না মশাই, তোলা যায় না। ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? মৌলালিতে আমার একটা বাড়ি আছে, মাত্র দেড়শো টাকা ভাড়া দেয়, নিজে উকিল হয়েও কিছুতেই তুলতে পারলাম না। পারব কি করে, নিজে তো থাকি না!

একটু থেমে বিষণ্ণ মুখে বললেন, অথচ তুলে দিতে পারলেই বেচে দিতাম। ভাল দামও পাওয়া যেত। স্রেফ ব্যাঙ্কে এফ ডি করে মাসে মাসে সুদ খাও। বাবা কেন যে বাড়ি করতে গিয়েছিল...

ধ্রুব কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। কিন্তু জলপথে যুদ্ধ নিয়েও থাকা যায় না। নিত্যদিন জল নিয়ে অশান্তি। মাথা গরম হয়ে গিয়ে কখন যে কী করে বসবে ধ্রুবর সেও এক ভয়।

প্রীতি বললে, ওসব ছেড়ে দাও, একটা ফ্ল্যাট কেনার ব্যবস্থা করো, অন্তত মাথা গোঁজার জায়গা।

হেসে ফেলে বললে, কিচ্ছু চাই না, শুধু কল খুললেই জল চাই।

## ৫

বকুলবাগানের এই এলাকাটা বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আশপাশের কয়েকটা বাড়ি একটু পুরোনো আমলের, কিন্তু বাড়ির মালিকরা কেউ দুঃস্থ নয়, দেয়ালের খসে পড়া পলেস্তারা মাঝে মাঝে সারানো হয়। কেউ কেউ বাইরের রঙও ফিরিয়েছে, সবুজ রঙ পড়েছে দরজা জানালায়।

এখানে অনেক সুবিধে। অফিস তেমন দূর নয়, একটুখানি হাঁটতে হয় ঠিকই, কিন্তু বাস-ট্রামের অভাব নেই। দোকানপাট, বাজার এমন কিছু দূরে নয়। এমন পাড়া ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু ঘরে যদি শান্তিই না থাকে, এ-সব সুখসুবিধে নিয়ে কি লাভ।

বঙ্কিমবাবু বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পেয়ে প্রথমে বোধহয় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। উনি তো ভয় পাবেনই, ওঁর নামেই নোটিশ। তাঁর সঙ্গে ধ্রুবর কোনও সম্পর্ক নেই, তবু সেও ধাক্কা খেয়েছিল।

অমিতবাবু বলেছিলেন, আমার তো মনে হয় ওয়ান বাই ওয়ান সকলের নামেই আসবে। আমাদের এখন ইউনাইটেড থাকতে হবে ধ্রুববাবু। বঙ্কিমবাবুর মামলা এখন আমাদের সকলের মামলা, একজোট হয়ে লড়তে হবে।

—ঠিকই বলেছেন। ধ্রুব মন্তব্য করেছে, ব্যাটা একজনকে ওঠাতে পারলেই একে একে সকলকে ওঠাবে।

বঙ্কিমবাবু শুনে সাহস পেয়েছেন। সেটুকুই বা কম কি। বলেছেন, আমার এখন তো উপায় নেই, দেয়ালে পিঠ দিয়েও আত্মরক্ষা করতে হবে।

কিন্তু মুখে যাই বলুক, ধ্রুবর নিজেকে বড় বিভ্রান্ত লেগেছে। এ-সব মামলা মকদ্দমা নিয়ে জড়িয়ে পড়া ওর একেবারেই পছন্দ নয়। সে আরেক অশান্তি।

তাছাড়া একটা ফ্ল্যাট কেনার স্বপ্ন ও অনেকদিন থেকে দেখছে। প্রীতিও মাঝে মাঝেই তাগাদা দেয়।—সময় থাকতে থাকতে কিছু একটা করে ফেল। এই তো অনুপমদা কেমন একটা চমৎকার ফ্ল্যাট কিনে ফেলল। তোমার চেষ্টা নেই।

শুনে এতদিন বড় অসহায় আর অক্ষম লাগত। এখন তো অফিস থেকে লোন পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কেও কিছু জমেছে। বাকিটা মাসে মাসে ভাড়ার মতো কিস্তিতে শোধ করে দিলেই চলবে।

ধ্রুব বঙ্কিমবাবুকে বললে, ভাবছি একটা ফ্ল্যাট কিনব, আপনিও একটু খোঁজখবর রাখুন।

শুনেই হাসলেন বঙ্কিমবাবু।—আপনার তো টাকা আছে, তাই ও লাইনে ভাবছেন। আমার নেই। কলকাতায় ক'জন ভাড়াটের মশাই টাকা আছে, যে জল বন্ধ করলেই ফ্ল্যাট কিনে চলে যাবে। এ যুগে বাঁচতে হলে বাড়িওয়ালা যদি ছোটলোক হয় আপনাকেও হতে হবে। তা না হলে বাঁচতে পারবেন না।

বঙ্কিমবাবু বেঁচে থাকাকে সত্যি সত্যি জীবনযুদ্ধ মনে করেন। মানিয়ে চলা বা হটে যাওয়ার পক্ষপাতী নন। একসিশটেন্সের সঙ্গে যে স্ট্রাগল কথাটা জড়িয়ে আছে উনি তা বিশ্বাস করেন। সেজন্যেই বলেছিলেন, পঞ্চাশটা টাকা আপনি এক কথায় বাড়িয়ে দিলেন ? কত বাড়াবেন ? তরতর করে বাড়িভাড়া বাড়ছে, হাজার দু'হাজার, পারবেন পাল্লা দিতে ? ও তো জানে তুলে দিতে পারলেই হাজার কি দেড় হাজার পাবে, আপনার পঞ্চাশে কি হবে ওর !

ধ্রুব কোনও উত্তর দিতে পারেনি। ও ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে চায়। তাছাড়া ও তো স্বপ্ন দেখছে, সুন্দর একটা ফ্ল্যাট কিনবে। নিজস্ব ফ্ল্যাট হবে। বাড়িওয়ালাকে ভাড়ার টাকা দেবার সময় যে হীনম্মন্যতায় ভোগে, তা আর ভুগতে হবে না।

কিন্তু কিন্তু করে বলেছে, লোভ হওয়া তো স্বাভাবিক, বঙ্কিমবাবু। পাশের ওই বাড়ির ফ্ল্যাট খালি হল, একেবারে হাজার পেয়ে গেল। শুনলে কোন বাড়িওয়ালার না লোভ হয়।

—পেলেই যদি নিতে হবে, তা হলে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারকে গালাগাল দেন কেন ? ঘুষখোরকে গালাগাল দেন কেন ? ওরাও তো পায় বলেই নেয়। সোজাসুজি না পেলে বাড়িওয়ালাদের মতোই প্যাঁচ কষে আদায় করে।

ধ্রুব আর কোনও কথা বলেনি, বরং রাখালবাবু সম্পর্কে দুটো কটূক্তি করেছে। পাছে ইউনিটি নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফ্ল্যাটের খোঁজ করেছে।

ওর মনের মধ্যে সব সময়েই একটা উদ্বেগ। ফ্ল্যাট কেনার আগেই না রাখালবাবু কিছু একটা করে বসেন। মামলাটামলা। কে তখন ছোটাছুটি করবে। অবশ্য বিশ্বস্ত ভাল উকিল ওর চেনা আছে। বাধ্য হলে তখন বঙ্কিমবাবুর মতোই লড়তে হবে। কিন্তু কে ওসব ঝুটঝামেলা চায়। তার ওপর ওই সদর দরজায় চাবি দেওয়া। একটা ডুপ্লিকেট চেয়েও পায়নি। আর গোঁপওয়ালা দারোয়ানটা দশটা বাজতে না বাজতেই চাবি দিয়ে

এক-একদিন ছাদে চলে যায়। কেউ বেড়াতে এলে ধ্রুবকে ঘড়ির দিকে চোখ রাখতে হয়, নিজেকেই হাসতে হাসতে বলতে হয়, আসুন এবার। কারণ হাঁকাহাঁকি করে ও ব্যাটাকে ছাদ থেকে নীচে নামাতে আধ ঘণ্টা লেগে যাবে। বড় অপমান লাগে।

সব কারসাজি, সব কারসাজি।

আর এইসব ছোটখাটো ব্যাপারের জন্যে নিজেকে বড় নিরাশ্রয় লাগে।

ছোটমাসির দুর্ভাবনা ও এখন বুঝতে পারছে।

এই সময়েই সেই দৃশ্যটা দেখল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

হনহন করে হেঁটেই আসছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

এই গলিটা দিয়েই বাড়ি ফেরে ও। বকুলবাগানের দিকে যেতে হলে পথ সংক্ষেপ হয়।

দৃশ্যটা ওকে চুম্বকের মত টানল। দেখল রাস্তার অর্ধেক জুড়ে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে একটি সংসারের যাবতীয় আসবাবপত্র। কেউ যেন ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যে ছুড়ে ছুড়ে বের করে দিয়েছে।

খাট, আলমারি, ড্রেসিংটেবল, বুককেস। ত্রিভঙ্গ হয়ে পড়ে আছে নারকেল ছোবড়ার পুরু গদি। তার চারপাশ ঘিরে বালতি, মগ, হাঁড়িকুড়ি, রাশি রাশি মশলাপাতির কৌটো। একটা পুরোনো টিন টলে পড়েছে, তা থেকে গড়িয়ে পড়ছে সরষের তেল।

বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। ধ্রুবর মুখ অজানা আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে।

অস্ফুটে বলে উঠল, ইস্।

হঠাৎ নজরে পড়ল এক কোণে একটা তোলা উনোন, কেউ জ্বলন্ত উনোনে জল ঢেলে দিয়েছে। রান্নাও শেষ করতে দেয়নি, খাওয়ার কথাই ওঠে না। এক পাশে কড়াইয়ে আধ-রান্না কোনও একটা তরকারি, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা কাত হয়ে পড়ে আছে, তা থেকে ভাত গড়িয়ে পড়েছে ফুটপাথে।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকানো ছেলেটি বলে উঠল, শালা ছোটলোক, রান্না ভাতটুকুও খেতে দেয়নি।

ধ্রুবর চোখে পড়ল কিছুটা দূরে একজন ভদ্রমহিলা, সঙ্গে দুটি বাচ্চা ছেলে, একটি ফ্রক পরা মেয়ে। ভদ্রমহিলা মুখ নিচু করে আছেন। লজ্জায়, অপমানে।

ভদ্রলোক নেই। হয়তো তাড়াতাড়ি কোথাও কিছু একটা ব্যবস্থার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন।

কে একজন বললে, ইজেক্টমেন্ট।

কথাটা শুনেই যেন শিউরে উঠল ধ্রুব।

মনে পড়ে গেল ছোটমাসির কথা।—তোর ছোটমেসো বলছে উকিল ডুবিয়েছে, উকিল বলছে তোর ছোটমেসো ডুবিয়েছে। ছোটমাসির গলার স্বর কাঁদো কাঁদো। একটা ফ্ল্যাট কোথাও দেখে দে না।

ওই নিরাশ্রয় অচেনা লোকটার জন্যে বুকের ভিতরটা হা-হুতাশ করে উঠছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি নিজের জন্যে অজানা আতঙ্ক।

মনে পড়ে গেল বঙ্কিমবাবুর নামে উচ্ছেদের নোটিশ এসেছে।

কে যেন বলেছিল, আইন-আদালত ওই খাতায়-কলমে।

নিরাশ্রয়, নিরাশ্রয়। এই শহরের বেশিরভাগ মানুষ নিতান্তই নিরাশ্রয়। একটা অজানা আতঙ্ক নিয়ে বাস করে। বাড়িওয়ালার মেজাজ-মর্জির ওপর নির্ভর করে।

আইন আছে। আইন তো অনেকরকমই আছে। আইনের বই দেখলে মনে হবে এ

দেশের প্রতিটি মানুষ কত নিশ্চিন্ত, সুখী। কারও কিছু ভয় পাওয়ার নেই। শুধু অফিস কামাই করে উকিলের কাছে, কোর্টঘরে ছুটে বেড়াতে পারলেই হল। শুধু টাকার জোরে ভাল উকিল জোগাড় করো। তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারবে না।

ওই অচেনা অজানা লোকটা স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় যাবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পেল না ধ্রুব। তার সঙ্গে ওই গোটা সংসারের আসবাবপত্র।

ধ্রুব একটা বাড়ি করার স্বপ্ন দেখছে বেশ কিছুদিন থেকে। অন্তত একটা ফ্ল্যাট। প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে ও মনে মনে উচ্চারণ করল, আমি আশ্রয় খুঁজব। শুধু নিজের জন্যে। হয়তো বাড়ির মালিক হব, কিন্তু বাড়িওয়ালা হব না। ভাড়াটের সুখ স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে শুধু কিছু টাকার লোভে নির্দয় বাড়িওয়ালা হবো না।

কিন্তু ওসব মহৎ সঙ্কল্প এখন থাক।

প্রীতি অনেককাল থেকে বলে আসছে, ও কান দেয়নি। কারণ কান দেবার মতো অবস্থা ওর ছিল না।

ছোটমাসি বলেছিল, তোর পিসিদের মতো তো টাকা নেই, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ফ্ল্যাট কিনব কোত্থেকে।

ক'জনেরই বা আছে। এখন চড়চড় করে যা ভাড়া বেড়ে গেছে। সেই ভাড়া দেবার মতো সঙ্গতিই বা ক'জনের।

সেসব চিন্তা করার কারও সময় নেই। পুরমন্ত্রী বলেছেন, জলের সাপ্লাই বাড়িয়ে দেব। সে জল কার ঘরে যাবে সে হিসেব রাখার কথা তাঁর নয়।

তাছাড়া রাস্তায় রাস্তায় ভারীরা তো খেয়ে পরে বাঁচছে। নতুন একটা প্রফেশন। আধুনিক কলকাতায় পুরনো একটা বৃত্তি। সেই সেকালের ভিস্তিওয়ালা এখন অন্য চেহারায়।

ল্যান্সডাউন রোডের চেহারাটা কি চমৎকার বদলে যাচ্ছে। দেখে গর্ব হয়। আমাদের কলকাতা। ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে বিরাট সুপারমার্কেট হচ্ছে। দেখে তাক লেগে গেল ধ্রুবর। আঃ, কলকাতা বড় সুন্দর দেখতে হবে।

বাসের জানালা থেকে ঢাকুরিয়ার সুপার-মার্কেট ঘেঁষে আকাশছোঁয়া বাড়িটা দেখতে দেখতে যোধপুর পার্কে পৌঁছে গেল।

ঠিকানাটা মনে নেই। কিন্তু পিসিমার গৃহপ্রবেশের দিন এসেছিল। অনেক লোক, বন্ধু আত্মীয়স্বজন। সবাই খুব প্রশংসা করছিল। দারুণ ফ্ল্যাট, দারুণ। পাশাপাশি দু'খানা ফ্ল্যাট জুড়ে নিয়ে সে এক এলাহি কাণ্ড। কেটারার ডেকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। খুব ভাল খাইয়েছিল পিসিমা। গোটা গোটা গলদা চিংড়ি আর মুর্গির ঠ্যাং।

পিসিমা বলেছিলেন, জমি বাড়ি কি ফ্ল্যাট যদি কিনতে চাস, তোর পিসেমশাইয়ের কাছে খবর পাবি। ও তো কম খোঁজেনি।

ধ্রুব সেজন্যেই চলে গেল একদিন। খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেল।

বিশাল ফ্ল্যাট, খুব সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলেছেন।

ও তো বিজ্ঞাপন দেখে দেখে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। কোথাও নাগালের বাইরে। বেশির ভাগই ফ্ল্যাটের সঙ্গে ঝামেলাও কিনতে হবে।

টাকাটাই মার যাবে কিনা স্থির নেই। কিংবা টাকা দিয়ে পাঁচ সাত বছর বসে থাকো।

পিসেমশাই সব শুনে বললেন, ফ্ল্যাটে সুখ নেই ধ্রুব, তার চেয়ে জমি কিনে বাড়ি করা ভাল। কিনবে জমি? আছে।

ধ্রুব বললে, সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। আমি একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাট কিনব ভাবছি। শুধু মাথা গোঁজার আশ্রয়।

পিসেমশাই বললেন, আমি তো ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেব ভাবছি।

একটু থেমে বললেন, একটা জমি আছে, পাঁচ কাঠা। বায়না করে রেখেছিলাম অনেক আগে। অ্যাদ্দিন ঝামেলা চলছিল। কিন্তু ফ্ল্যাট কিনে টাকা আটকে গেছে, দু'কাঠা কেউ যদি নেয়...

দামটাম শুনল প্রীতি। দু'দিন ধরে হিসেব কষা হল। ব্যাঙ্কে ইউনিটে কত আছে, অফিস থেকে কত লোন পাওয়া যাবে।

জায়গাটাও একদিন দেখে আসা হল। দিব্যি পছন্দ। একটু দূর, তা হোক।

একজন কারও ওপর নির্ভর করার মতো আনন্দ আর নেই। পিসেমশাই চৌকোশ লোক। ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পিসেমশাই বললেন, ভালই হল, বাইরের কাউকে দিতে হল না। তুমি পাশে থাকবে সেও শান্তি।

বললেন, জমির জন্যে টাকা বায়না নিয়েই জমির মালিকটা মরে গেল, পাঁচজনের পরামর্শে বিধবা বৌটা আর বেচতেই চায় না। মামলা চলছিল, পাব কি পাব না ভেবে ফ্ল্যাট কিনে ফেললাম। এখন রায় বেরিয়েছে, এক মাসের মধ্যে পুরো টাকা দিয়ে কিনে ফেলতে হবে। তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছ ধ্রুব।

কীভাবে এত টাকার ড্রাফট করাতে হয় ধ্রুব জানত না। ছোটাছুটি করে সমস্ত টাকা একটা অ্যাকাউন্টে এনে যেদিন ড্রাফট নিয়ে দিতে যাবে, বেশ ভয়-ভয় করছিল। একটাই ভরসা, পিসেমশাই সঙ্গে ছিলেন।

কেনা হয়ে গেল। অবশ্য ভাল দিকটাই পিসেমশাই তিন কাঠা নিয়ে নিলেন। তা হোক।

তখন রাতে ভাল ঘুম হত না ধ্রুবর। আনন্দে।

ওর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। একটা বাড়ি। ছোট ছোট দু'খানা ঘর, ব্যস আর কিছু চাই না।

কিনবে বলে যখন প্রায় ঠিক করে ফেলেছে, অফিসে অবিনাশকে বলল। অবিনাশ খুব উৎসাহ দিল, যেন তার নিজেরই বাড়ি হচ্ছে, এমন খুশি দেখাল ওকে।

—করে ফেল ধ্রুব, করে ফেল। ও শুরু করলে কি করে যেন হয়ে যায়।

সেদিনই চলে গিয়েছিল হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে। ভিতরে ভিতরে এমন একটা আনন্দ হচ্ছিল চেপে রাখতে পারছিল না।

বাবা সব শুনে খুশি হলেন, তবু বললেন, দেখেশুনে কিনবি।

মা আরও খুশি।

বড়বৌদি শুনে বললে, যাক্, তোমার হলেও সুখ। আমাদের তো আর হবে না, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে, তাদের পড়ার খরচ...

মেজবৌদিও খুব খুশি।—ধ্রুবদা করে ফেল, তোমার দাদাদের দেখিয়ে দাও, ইচ্ছে থাকলে করা যায়।

এমন যে হবে ধ্রুব ভাবতেও পারেনি। সেজন্যেই মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় ঈশ্বর আছেন। অন্তত যাদের বাড়িঘর হয়, টাকাপয়সা হয়, নানাদিকে সাফল্য, তাদের নিশ্চয়ই ঈশ্বর আছেন। না, যাদের কিছুই নেই তাদেরও সেই ঈশ্বরই ভরসা।

ধ্রুব দৈবে বিশ্বাস করত না, কিন্তু ওরও মনে হল দৈব বলে কিছু থাকলেও থাকতে পারে। তা না হলে জগন্নাথবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে কেন। জগন্নাথবাবু এসেছিলেন পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে কি একটা কাজে। উনি বড় কন্ট্রাক্টর।

ধ্রুব নিজে দেখাশোনা করে বাড়ি করবে তা তো সম্ভব নয়। এসবের ও কিই বা

বোঝে।

পিসেমশাই হাসতে হাসতে বললেন, কি ধ্রুব, এখনই বাড়ি শুরু করে দেবে নাকি ?

কে জানে কেন, ধ্রুবকে ভাল লেগে গেল জগন্নাথবাবুর। বললেন, করতে হলে এখনই করে ফেলুন, এরপরে আর পারবেন না। হু হু করে দাম বাড়ছে জিনিসপত্রের।

ধ্রুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছে, বাড়ি বলবেন না, পারলে শুধু দুখানা ঘর, মাথা গোঁজার মতো।

জগন্নাথবাবু বললেন, আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে দেব, কম খরচে করিয়ে দেব।

হেসে বললেন, ভয় নেই, আমি মাঝে মাঝে দেখে আসব।

জগন্নাথবাবু রীতিমত বড় কন্ট্রাক্টর, বেশির ভাগই সরকারি কাজ। পাঁচ-সাতখানা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংও বানিয়েছেন।

ধ্রুব তাই ভয় পেয়ে বললে, না না, আমি একেবারে সাদাসিধে ছোট্ট একটা বাড়ি করব। অত টাকা কোথায় ? ধারধোর করে...

জগন্নাথবাবু একটা কার্ড বের করে দিলেন ধ্রুবকে। বললেন, কত টাকা জোগাড় করতে পারবেন হিসেব করে, একদিন চলে আসুন। বাকিটা আমার দায়িত্ব।

সত্যি সত্যি বাড়ি শুরু হয়ে গেল। শুধু জগন্নাথবাবুর পরামর্শে নানা জায়গায় একটু ছোটাছুটি করতে হল ধ্রুবকে। কিন্তু সেটুকু এখন আর বিরক্তিকর নয়। বাড়ি হবে, নিজের বাড়ি। এর চেয়ে আনন্দের ব্যাপার যেন আর কিছু নেই।

ভিত পুজো হল, ভিত খোঁড়া হল, বাড়ি উঠতে শুরু করল।

ধ্রুব প্রায়ই যায়, দেখে আসে। ও একা গেলে প্রীতি অনুযোগ করে। প্রীতিকেও তাই প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

এ যেন এক ধরনের নেশা। চোখের সামনে দেয়াল উঠছে, কংক্রিট ঢালাই হচ্ছে। বহুদিনের একটা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।

যেদিন প্ল্যান স্যাংশন হয়ে এসেছিল, কাগজের ওপর আঁকা নকশাটায় চোখ রেখে ও কল্পনায় যেন বাড়িটা দেখতে পেয়েছিল। এখন সেটা আরো স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। ইটের ওপর ইট গাঁথা হচ্ছে, আর কি অধৈর্য লাগতো ধ্রুব আর প্রীতির। মনে হত যেন বড় বেশি সময় লাগছে। যেন রাতারাতি বাড়িটা তৈরি হয়ে যাবার কথা।

ধ্রুবর ইচ্ছে ছিল একতলায় দু'খানা ঘর। আপাতত ওইটুকুই। প্রীতি অবশ্য রান্নাঘর সম্বন্ধে কি সব ফরমাশ করেছিল। কোথায় শেল্‌ফ হবে, কোথায় গ্যাস সিলিন্ডার থাকবে।

জগন্নাথবাবু হেসে ফেলে বলেছেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

দেখতে দেখতে ছাদ পর্যন্ত হয়ে গেল।

কিন্তু জগন্নাথবাবু থামতে চাইলেন না। বললেন, প্ল্যান তো তিনতলা অবধি স্যাংশন হয়ে আছে, এখন অন্তত দোতলা অবধি করে দিই।

ধ্রুব ভয় পেয়ে গেল। হতাশ গলায় বললে, যা কিছু ছিল, যেখানে যা লোন পাবার সবই তো পেয়ে গেছি। আর তো কোথাও কিছু পাব না জগন্নাথবাবু। আমার ওই একতলাই ভাল।

জগন্নাথবাবু বলে বসলেন, আপনাকে এখন টাকা দিতে হবে না। আপনি যখন যেমন পারবেন দিয়ে দেবেন। হাসলেন উনি।

পিসেমশাই একদিন বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলেন। সব শুনে বললেন, তুমি তো ভাগ্যবান হে, নিজের টাকায় দোতলাটা করে দেবেন।

প্রীতি তো শুনে অবাক।

ধ্রুবর মনে হল জগন্নাথবাবুর মতো মানুষ হয় না। প্রীতি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, ভগবান, ভগবান।

শুধু পিসিমা বললেন, আমাদের বাড়িটাও এই সময় করে নিলে হত। টাকাগুলো সব ফ্ল্যাট কিনে আটকে গেছে, তা না হলে...

তারপরই রহস্যটা ফাঁস করলেন। বললেন, এ রকম বাড়ি আরো দু-চারটে করে দিচ্ছেন উনি। দিব্যি সুযোগ ছিল।

ধ্রুব বুঝতে পারল না। ওর কাছে ব্যাপারটা সত্যি এক রহস্য। নিজের টাকায় দোতলা করে দিচ্ছেন। কেন কে জানে।

পিসিমা হেসে বললেন, বড় কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন গভর্নমেন্টের। বুঝতে পারছিস না ? সব সেখান থেকে এখানে পাচার করছেন। পকেটের টাকা তো নয়।

কথাটা শুনেই ধ্রুবর চোখে জগন্নাথবাবু ভগবানের আসন থেকে একেবারে নীচে পড়ে গেলেন। তা হোক্। ওর দোতলা তো উঠছে।

এতকাল এ সব কাজ ও ঘৃণা করেছে। অন্যায় মনে হয়েছে।

একদিন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাখালবাবু সম্পর্কে বলেছিল, কালো টাকায় তো মশাই বাড়ি বানিয়েছে, পাপের টাকায়, এখন বাড়িওয়ালা বনে গেছে।

এখন আর ধ্রুবর অন্যায় মনে হচ্ছে না। মনকে বোঝাল, আমি তো অন্যায় কবছি না। জগন্নাথবাবু কোত্থেকে কী আনছেন আমার জানার কথা নয়। আমি টাকা দিয়েই খালাস।

দেখতে দেখতে দোতলা উঠে গেল। সামনে ছোট্ট এক টুকরো ব্যালকনি বের করে দিয়েছেন জগন্নাথবাবু।

শুধু রঙ করা বাকি। সে পরে করা যাবে। জগন্নাথবাবুই করে দেবেন বলেছেন। অর্থাৎ ওঁর সরকারি কন্ট্রাক্টের বাড়ি এখনও হয়তো শেষ হয়নি। শেষ হলে রঙ করার সময় রঙ করিয়ে দেবেন।

কথাটা কীভাবে যেন রাখালবাবুর কানে পৌঁছে গিয়েছিল। কীভাবে আর, কাজের লোকের মারফত।

ইদানীং তো ওর আর প্রীতির মধ্যে আর কোনও কথাই ছিল না। শুধু বাড়ি আর বাড়ি। আর কতদিন লাগবে। জানালার গ্রীল যেন সুন্দর হয়।

ঠিকে ঝি বাসন মাজতে মাজতে নিশ্চয় শুনেছে।

রাখালবাবুকে এড়িয়ে এড়িয়েই চলত ধ্রুব। কথা বলতেও ইচ্ছে করত না। লোকটা জল বন্ধ করে দিয়েছে, ভারীর কাছ থেকে জল নিতে হয়। এদিকে পাম্প দিব্যি চলছে দু'বেলা, শুধু নিজেই নেন।

লোকটার চক্ষুলজ্জাও নেই। একবার বলতে গিয়েছিল, উত্তর এল, এত অসুবিধে যখন, ছেড়ে দিলেই তো পারো। জল নেই, জল নেই, কর্পোরেশন দিচ্ছে না তো আমি দেব কোত্থেকে।

সারা শরীর জ্বলে উঠেছিল ধ্রুবর।

এই লোকের সঙ্গে দেখা হলে দিব্যি হেসে হেসে কথা বলতে হবে। তার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

অবিনাশ অবশ্য বলেছিল, ও তোমার রাখালবাবুকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সব বাড়িওয়ালা একই ডিজাইনের ভাই, একই প্যাটার্ন। দু-চার জন শুধু আমাদের সুনন্দর মতো।

ভারীকে দিয়ে জল আনিয়ে জলের সমস্যা মেটানো যায়। একটু খরচ বাড়ে। ধ্রুব প্রীতিকে বুঝিয়েছিল, কত আর খরচ, একশো দেড়শো। দেড়শো টাকা বেশি দিলেও এ তল্লাটে কোথাও আর এ-রকম ফ্ল্যাট পাবে নাকি।

প্রীতিকে বোঝানো যায়, নিজেকে নয়।

এই ভারীকে দিয়ে জল আনানোয় বড় সম্মানে লাগে।

প্রথম প্রথম কি অস্বস্তি। সকালের দিকে বন্ধুবান্ধব কি আপিসের কেউ এসে পড়লে ভয়ে তটস্থ, যদি দেখে ফেলে।

উপেন থাকে চক্রবেড়িয়ায়। একদিন সকালে চলে এসেছিল কি একটা কাজে। ভারী তখন এক ভার জল নিয়ে গেছে, আবার আসবে। কাঁধে বাঁক লোকটাকে যদি দেখে ফেলে, কি আতঙ্ক। পর্দা টেনে যদি বা আড়াল করা যায়, দু'দিকের কেরোসিন টিন থেকে জল উপছে পড়বে বারান্দায়। হয়তো কিছু জিগ্যেস করে বসবে উপেন। কি লজ্জা!

এখন পুরোনো হয়ে গেছে। ওসব লজ্জাটজ্জা নেই।

বাড়িওয়ালা উঠিয়ে দিতে চাইছে। সুতরাং উঠে যাওয়াটাই নাকি ভদ্রতা।

হয়তো বলে বসবে, এত অপমান সহ্য করে থাকেন কী করে?

রাখালবাবু হয়তো দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন। মর্নিং ওয়াক করে ফিরছেন। ঢিলেঢালা প্যান্টে যতটা সম্ভব স্মার্ট হয়ে হাঁটছিলেন।

দেখতে পেয়েই হয়তো ফুটপাথ বদলে নিলেন, ফলে একেবারে সামনাসামনি। সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে গেল ধ্রুবর।

রাখালবাবু একমুখ হেসে বললেন, সুখবরটা জানাওনি তো এতদিন? তোমাদের নাকি বাড়ি হয়ে গেছে?

ধ্রুবকে হাসতে হল। বললে, হয়ে গেছে বলবেন না, হয়ে আসছে।

—তা কবে নাগাদ উঠে যাবে ঠিক করেছ?

ধ্রুবর মন তেতো হয়ে গেল। সঠিক কোনও উত্তর দিল না। দেবেই বা কী করে। ও নিজেই তো জানে না। জলের পাইপ, বাথরুম, ইলেকট্রিক।

শুধু বললে, উঠে যেতে পারলে তো আমারও লাভ, মাসে মাসে ভাড়া গুনতে হবে না।

শুনে প্রীতি বললে, এবার বোধহয় জল দেবে। দেখছে, যখন উঠেই যাবে...

কিন্তু না। উপরন্তু মাঝেমাঝেই, সিঁড়িতে ওঠানামার সময়, ডেকে জিগ্যেস করেন। —কদ্দূর কি হল? দিন ঠিক করেছ কিছু?

সে আরেক যন্ত্রণা। দরজাটা একদিন শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে ধ্রুব রাগের গলায় বললে, শালা!

বাড়িটা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ধ্রুব প্রীতিকে বললে, দেখো, ছোটমাসি এলে যেন বলে বসো না বাড়ি হয়ে এসেছে। শেষে যদি নীচের তলাটা ভাড়া চেয়ে বসে...

প্রীতি বললে, ছোটমাসিরা তো বাড়ি পেয়ে গেছে, অবশ্য অনেক দূরে, ছ'শো টাকা নাকি ভাড়া।

ধ্রুব বললে, তা হোক, তবু কি জানি, যদি বলে বসে। বরং সে কথা তুললে বলে দেবে ভাড়া হয়ে গেছে।

প্রীতি সায় দিল। —ঠিক বলেছ।

তারপর একটু থেমে বললে, নীচের তলাটা কিন্তু ভাড়া দিতে হবে। তা হলে তাড়াতাড়ি জগন্নাথবাবুর ধার শোধ হয়ে যাবে।

ধ্রুব বললে, তা বলে আজেবাজে কাউকে দেওয়া যাবে না। শুধু কোম্পানি লীজ। একজন বলছিল হাজার টাকা ভাড়া হবে।

প্রীতি বলে উঠল, বাঃ শুধু ভাড়া ? অ্যাডভান্স নেবে না ?

ধ্রুব মাথা নাড়ল। —দেখি।

পাওয়া যাবে না মানে ? দাদা তো বলেছিল, মাড়োয়ারিকে দিলে তিরিশ চল্লিশ হাজারও পেয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

—সত্যি ! খুব খুশি খুশি মুখে ধ্রুব বললে।

প্রীতি যেন একটা আশার কথা শোনাল। ঠিক বিশ্বাস হল না, তবু শুনতেও ভাল লাগল।

এখন তো ধ্রুব একদিক থেকে নিশ্চিন্ত। আর কয়েকটা মাস, তখন আর নিজেকে নিরাশ্রয় মনে হবে না। কিন্তু ঘাড়ের ওপর একরাশ দেনা। অবশ্য জগন্নাথবাবুর কাছে যা বাকি আছে সেটা নিয়েই চিন্তা। বাকি সবই তো মাইনে থেকে কেটে নেবে। কেটে নিচ্ছে। এরপর বাড়িভাড়াটাও দিতে হবে না। হয়তো দু'এক বছর একটু কষ্টেসৃষ্টে চালাতে হবে।

একটা ইচ্ছে ছিল, বাড়ি করবে শুধু নিজে থাকার জন্যে। ভাড়া দেবে না। বাড়িওয়ালা হবে না। তাছাড়া ভাড়াটে নিয়ে তো ঢের অশান্তি। তবু পাকেচক্রে, টাকার টানাটানিতে, কিছুটা হয়তো লোভ, এখন ভাড়া দেওয়ার কথা ভাবতে হচ্ছে।

একটাই সান্ত্বনা, এখন আর নিজেকে নিরাশ্রয় মনে হয় না।

নিরাশ্রয়। কথাটা ভাবতে গিয়ে হাসি পেল। একটা বাড়িই কি মানুষের আশ্রয় ? শুধু ক'খানা ঘর ? হয়তো তাই। এই সমাজে, এই সমাজব্যবস্থায়। তা না হলে আজকের মানুষের সমস্ত জীবনটাই অতৃপ্ত, অসুখী কেন, শুধু একটা আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ ভাড়ার ফ্ল্যাট খুঁজছে, কেউ তা পেয়েও উদ্বেগ কিংবা অশান্তি নিয়ে টিকে আছে। একদিন ভারী জল দিতে না এলেই চক্ষুস্থির, হন্যে হয়ে তাদের খুঁজে বেড়াতে হয়। আর ধ্রুবর মতো যারা একটা কিছু করে ফেলেছে, তারাও তো ভাবছে সব কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। যেন জীবনে একটা ফ্ল্যাট কিংবা বাড়ি করা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। এই টাকায় গড়া সমাজ মানুষের জীবনের কাছ থেকে যেন আর কিছু চায় না। আর কোনও চাহিদা নেই। তোমার সমস্ত কিছু বিষয়বুদ্ধির কাছে বিকিয়ে দিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, রুচি ও শিল্পবোধ, তা হলে একটা আর্ট ফিল্ম দেখে এসো, সম্ভব হলে গরিব কিংবা হরিজনদের সম্পর্কে। ছবিটা তোমার ভালই লাগবে, কারণ যারা তুলেছে, বিশ্বজোড়া নাম, তারাও ভাড়াটে। এতটুকু বিষয়বুদ্ধি নেই যে, সময় থাকতে একটা ফ্ল্যাট কিংবা বাড়ি করে ফেলবে।

ধ্রুব দৈবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। দৈব না থাকলে ওর পক্ষে এই বয়েসে কি একটা বাড়ি করে ফেলা সম্ভব হত। পিসেমশাই বে-কায়দায় পড়ে হঠাৎ দু'কাঠা জমি সেই বায়নার দরে দিতে চাইবেন কেন ! তিন বছর আগেকার দাম। ভাবাই যায় না, ফ্ল্যাট কিনে ফেলে পাঁচ কাঠা জমি কেনার টাকাই ছিল না ওঁর হাতে।

তার ওপর এই জগন্নাথবাবু। দোতলাটা করে দিচ্ছি, আপনি সুবিধেমতো শোধ দেবেন।

কোত্থেকে কীভাবে যেন হয়ে গেল।

কিন্তু এখন আর দৈব মনে হচ্ছে না ধ্রুবর।

—কি ভাগ্য রে তোর, এই বয়েসে একটা বাড়ি করে ফেললি। তোর মেসো সারাজীবন চাকরি করে কিছুই করতে পারল না।

একটু থেমে বললে, আগে রিটায়ার করে লোকে বাড়ি করার কথা ভাবত। তাও পারত না। তোরা আজকাল অনেক চালাকচতুর। কত কম বয়েসে সব করে ফেলছিস।

ছোটমাসি খবর পেয়েই একদিন চলে এসেছিল।

ধ্রুব হাসতে হাসতে বললে, দেনায় চুল পর্যন্ত ডুবে আছে, তোমরা শুধু ভাগ্যই দেখছ।

ছোটমাসি হাসল, বিশ্বাসই করল না।

তারপর বললে, নীচের তলাটা কি ভাড়া দিবি নাকি ?

ধ্রুব চটপট বললে, ও তো ভাড়া হয়ে গেছে, অ্যাডভান্সের টাকা নিয়েই বাড়ি।

ছোটমাসি হতাশ গলায় বললে, অ্যাডভান্স না হয় আমরাই দিতাম, বললি না কেন ?

ধ্রুব কোনও উত্তর দিল না। আত্মীয়কে কেউ বাড়ি ভাড়া দেয় নাকি। নিয়মিত ভাড়া না দিলে তখন কিছু বলাও যাবে না। আত্মীয় তো দূরের কথা, বাঙালিকেই দেবে না। অবাঙালির মতো অত টাকা এরা দিতে পারবে নাকি।

প্রীতি অবশ্য একদিন বললে, বাঙালি ভাড়াটে হলেই কিন্তু ভাল হত। একটা কথা বলার লোক পেতাম।

ধ্রুব বললে, কথা বলার ? না ঝগড়া করার ? সম্ভব হলে ভাড়াই দিতাম না। ভাড়াটে নিয়ে বাস করা মানেই অশান্তি।

প্রীতি সশব্দে হেসে উঠল।—এই, তুমি বাড়িওয়ালা হয়ে গেছ এর মধ্যে। এখনো তো আমরা ও বাড়িতে উঠে যাইনি।

ধ্রুবও হেসে ফেলল। —হ্যাঁ, এখন তো আমরা বাড়িওয়ালাই।

একটু থেমে বললে, ভেবেচিন্তে করতে হবে সব। বাজারে এখন যেভাবে ভাড়া বাড়ছে, দিয়ে ফেললে তখন আর বাড়ানো যাবে না।

প্রীতি হাসতে হাসতে বললে, কেন ? সে তো আমরা শিখে নিয়েছি, জল বন্ধ করে দিলেই হবে। উঠিয়ে দিয়ে আবার বেশি ভাড়ায়...

ধ্রুব বললে, জল বন্ধ করলে সবাই কি আর উঠে যায় ? যার উপায় নেই সে কি করবে ?

তারপর হেসে বললে, তা দেখা অবশ্য আমাদের কাজ নয়। গভর্নমেন্টই তাদের কথা ভাবে না, বাড়িওয়ালারা ভাববে কেন !

একটা কি যেন চিন্তা করল, তারপর বললে, ভাড়া যতই বাড়ুক, তাতেও লাভ হয় না।

আগে এ সব বুঝত না। এখন হিসেব কষে।

—ধরো ডিবেঞ্চারে টাকা রাখলে ফিফটিন পার্সেন্ট সুদ।

প্রীতি বললে, তুমি তো দোতলায় থাকবে বলে দোতলা করেছ, নীচের তলা তো করতেই হত। এখন সেটাকেও ইনভেস্টমেন্ট ভাবছ কেন ?

ধ্রুব ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, কারণ লোন শোধ করতে হবে। এর পর কর্পোরেশন ট্যাক্স আছে, এটা ওটা সারানো আছে।

একটাই সুবিধে, জলের পাম্প করতে হয়নি। রিসার্ভয়েরটা এতই কাছে, তার প্রেসারেই দোতলায় জল উঠে যায়।

জগন্নাথবাবু বলেছিলেন, পাম্পের দরকার হবে না।

একদিন গিয়ে দেখল। সত্যি, ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে উপছে পড়ছে।

জগন্নাথবাবুর ওভারসিয়ারকে বললে, ট্যাঙ্কে একটা কল লাগিয়ে দেবেন।

প্রীতি ছিল সঙ্গে। বলল, কেন ?

—পরে বলব।

পরে আড়ালে হাসতে হাসতে বললে, একটা সুবিধে কি জানো ? পাম্প নেই, কতক্ষণ

চালাচ্ছ তা নিয়ে ভাড়াটে ঝগড়া করতে পারবে না। যখন দরকার হবে, ধরো ভাড়াটে যদি মাথা নিচু করে থাকে, সে অন্য কথা, তা না হলে জল উঠবে একদিকে, কল খুলে আরেকদিকে বের করে দাও। বেশি চিৎকার চেঁচামেচি করলে বলা যাবে এসে দেখুন, জল ওঠেই না। সবাই তাই করে।

প্রীতি হাসল। বললে, আমার কিন্তু আর একদিনও ও বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। চটপট সব করিয়ে নাও।

ধ্রুব নিজেও অধৈর্য হয়ে উঠছিল। শুধু সামনে এই স্বপ্নটা আছে বলেই ধৈর্য ধরেছে। একটা বাড়ি করতে যে এত সময় লাগে ও জানতই না। জগন্নাথবাবু তো প্রথমে অনেক কম সময় বলেছিলেন, কিন্তু পারলেন না।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে গেলে আজকাল প্রীতির খাতির যত্ন অনেক বেশি হয়। দূরে সরে আসার জন্যে ওরা কাছের মানুষ হয়ে গেছে বলে, নাকি বাড়ি করছে বলেই ওদের দাম বেড়ে গেছে।

বড়বৌদি বললে, একদিন চলো দেখিয়ে নিয়ে এসো। একজন অন্তত ভাড়াটে নাম ঘোচাল, দেখে আসব না ?

দাদা বললে, সবই ভাল, বলছিস দু'খানা ঘর এক এক তলায়, তিনখানা না হলে...

ধ্রুব বললে, প্ল্যানে আছে, ওটা পরে বাড়িয়ে নেব।

বড়বৌদি দাদাকে ধমক দিল। —তুমি থামো, দু'খানাও তো করেছে।

মেজবৌদি বললে, আমি বাবা রঙটঙ করার পর দেখতে যাব। রঙ না পড়লে বাড়ি ঠিক খোলতাই হয় না।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, ধ্রুবদা, গৃহপ্রবেশে খুব খাওয়াতে হবে কিন্তু। তোমার পিসেমশাইদের মতোই, গোটা গোটা গলদা চিংড়ি আর মুর্গির ঠ্যাং।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

মেজদা বললে, হ্যাঁ, দেখিয়ে দিবি পিসেমশাইকে, আমরাও পারি। টাকা হয়েছে বলে ওঁর খুব গর্ব। কেমন বলছিলেন, পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট জুড়ে নিয়েছি। আসলে বোধহয় বলতে চাইছিলেন, তোরা তো একটাই কিনতে পারলি না।

মেজদার কথাটা ধ্রুবর প্রথমে ভাল লাগেনি। পিসেমশাই না থাকলে বাড়িটাই তো হত না। উনি তো ও দু' কাঠা অন্য কাউকেও দিতে পারতেন। অবশ্য বাইরের লোককে বোধহয় দিতে চাননি। গায়ে গায়ে বাড়ি, আত্মীয় খুঁজেছিলেন। কিন্তু জগন্নাথবাবু ? উনিও তো বিশ্বাস করেছেন পিসেমশাই মাঝখানে আছেন বলেই। একজন টাকাওয়ালা লোক, অনেকদিনের পরিচয়...

কিন্তু মেজদার কথাটা শোনার পর ধ্রুবর মনে হল, পিসেমশাই একটু টাকাও দেখাতে চেয়েছিলেন। তা না হলে ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশে অত এলাহি কাণ্ড করার কি দরকার ছিল। এত লোককে নেমন্তন্নই বা কেন!

বাবা আর মার দারুণ আনন্দ। —কবে যাচ্ছিস ?

মা বললেন, বাবাকে বলিস পাঁজি দেখে দিন ঠিক করে দেবে।

হাসতে হাসতে প্রীতিকে বললেন, আমি কিন্তু সত্যিনারাণ দিয়ে আসব বৌমা।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ, তোর মায়ের সত্যিনারাণের খুব পয়া আছে, বাড়ি হয়ে গেল।

মা বাধা দিয়ে বললেন, সে-কথা বলো না, পয়া যদি কারো থাকে সে বৌমার।

প্রীতি খুব খুশি, কুলকুল করে হেসে উঠল। তোষামোদ করে বললেন, না মা, সে আপনাদের আশীর্বাদ।

এখন এ ধরনের কথা বলতে ওর অস্বস্তি নেই। আগে পারত না।

ধ্রুব চলে আসার আগে মা ওকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন। চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ রে, শ্বশুরের কাছে কিছু নিসনি তো ? বাড়ি করার জন্যে ?

ধ্রুব চমকে উঠল। রেগে গেল।--কেন ? তাঁর কাছে নিতে যাব কেন ?

—না, সে-কথাই জিগ্যেস করছি। তেমন হলে তোর বাবার শুনলে তো খারাপ লাগবে। বড় বৌমা বলছিল কিনা, অনেক টাকার ব্যাপার...

ধ্রুব রাগের গলায় বললে, ওদের বলে দিও, আমার একটা আত্মসম্মান বলে জিনিস আছে।

আবার কি একটা ঝামেলা হয় এই ভয়ে মা বললেন, না না, ওরা সেভাবে বলেনি, ধার নেয়ার কথা বলছিল...

ধ্রুব হেসে বললে, না, তাও নিইনি।

একটু থেমে বললে, ধার দেওয়ার মতো অবস্থাও তাঁর নয়।

ফেরার পথে প্রীতিকে কথাটা বলতে পারল না। চেপে গেল। শুনলে বড়বৌদি আর মেজবৌদির ওপর আবার রেগে যাবে। উল্টে হয়তো ভাববে, ধ্রুব যখন চতুর্দিকে লোনের চেষ্টা করছে, তখন হয়তো ভেবেছে, প্রীতি কেন তার বাবাকে বলছে না। একবার লোভ সত্যি হয়েছিল ধ্রুবর, কথাটা প্রীতিকে বলার। ভাগ্যিস বলেনি।

এখন জানে, উনি দিতে পারতেন না। উল্টে না দিতে পারার জন্যে লজ্জা পেতেন।

অথচ প্রীতি যদি শোনে ও মাকে বলেছে, ধার দেওয়ার মতো অবস্থাও তাঁর নেই, তা হলেও রেগে যাবে। শ্বশুরবাড়িতে বাবার দুরবস্থার কথা প্রকাশ করে দেওয়ার কি দরকার ছিল। 'শ্বশুরের কাছে ধার নিতে আমার আত্মসম্মানে বাধে', এটুকু বললেই তো পারতে।

হয়তো রেগে গিয়ে বলত, ওদের কাছে আমার বাপের বাড়িকে ছোট করে তোমার কি লাভ হল !

বাড়ি ফিরেই মেজাজটা আরো বিগড়ে গেল।

ঢোকার আর বেরোনোর সময়টা বড় অস্বস্তিতে কাটে। গোঁপওয়ালা বিহারি দারোয়ানটা আজকাল এতটুকু সমীহ করে না। আগে করত। এমন ভাবভঙ্গি করে যেন ধ্রুব এই ফ্ল্যাটে থাকে না। ধ্রুব বেশ বুঝতে পারে এর পিছনে রাখালবাবুর উৎসাহ আছে। কিংবা কে জানে, ওঁদের কথাবার্তা শুনে লোকটা সব বুঝে নিয়েছে।

কিন্তু মেজাজ আরো বিগড়ে গেল হাত-কাটা দালালটাকে দেখে।

ধ্রুবর জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

কনুই থেকে ফুল-হাতা শার্টের হাতাটা ঝুলছে, সেই হাতটাই নেড়ে বললে, এই ফ্ল্যাটটা আমিই আপনাকে দেখে দিয়েছিলাম।

ধ্রুব রেগে গিয়ে বললে, সে আর মনে নেই ? এই রকম একটা বাড়িওয়ালার কাছে জেনেশুনে...

একমুখ হাসল লোকটা।—বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালার মতোই তো হবে বাবু ?

—তা তুমিও কি জানতে এসেছ কবে উঠে যাচ্ছি ?

আবার হাসল।—হ্যাঁ, সে-কথাই বলতে এলাম। আমাকে একটু আগে থেকে বলবেন, আবার অন্য কোনও দালাল না মেরে দেয়। আগে থেকে জানলে, আমার লোক নিয়ে আসব, কটা টাকা পেতাম, দেখছেন তো হাতটা কাটা। কিছুই করার নেই। দুটো পয়সা যদি পাই দালালি করে...

ধ্রুব বললে, ঠিক আছে, বলব।

লোকটা তবু দাঁড়িয়ে রইল।—আরেকটা কথা বলছিলাম। আপনার তো বাড়ি হয়ে

গেছে, নীচের তলাটা নাকি ভাড়া দেবেন...

—সে কথাও জেনে গেছ ?

লোকটা হাসল। ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

লোকটাকে বলতে পারত, পরে বলব। কিংবা ভাড়া দেব না।

তবু একটু যাচিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল।

জায়গাটার মোটামুটি একটু ধারণা দিল। বললে, দু'খানা ঘর, ভিতর দিকে বারান্দা, সামনে ব্যালকনি...

—ব্যালকনি আছে ? লোকটা খুব খুশি।

ধ্রুব বললে, সে তো দোতলায়।

—কিচেন খুব ছোট নয় তো ?

ধ্রুব বললে, না।

লোকটা বললে, খুব ভাল পার্টি আছে, আজ রাত্রেই নিয়ে আসব স্যার। অ্যাডভান্স দেবে মোটা টাকা। কত চান বলুন...

লোকটা যেন ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

ধ্রুব বললে, এখন নয়, এখন নয়।

কোনওরকমে তাকে বিদায় দিল।

তারপর নিজেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

ভিতরের রঙ আগেই হয়ে গিয়েছিল, বাড়ির বাইরেটায় রঙ পড়তেই সমস্ত পাড়াটাই যেন ঝলমল করে উঠেছে। ধ্রুব যখনই বাড়ি ফেরে, অফিস থেকে, কিংবা বাজারের থলি হাতে নিয়ে, প্রাণভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। দেখে আর গর্বে, পুলকে বুক ভরে ওঠে। মনে মনে বলে আমার বাড়ি, নিজস্ব বাড়ি।

এর প্রতিটি ইট যেন ধ্রুবর স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা। কৃচ্ছ্রসাধনই কি কম আছে এর পিছনে, কে তার খোঁজ রাখে। পরিশ্রম, উদ্বেগ, অর্থ, কি না দিয়েছে এই বাড়ির জন্যে।

আমার নিজের বাড়ি। বলতেও আনন্দ।

ধ্রুব, প্রীতি আর টিপু। দেখতে দেখতে টিপু কত বড় হয়ে গেছে। মাস দুই হল ওরা এই নতুন বাড়িতে উঠে এসেছে। ভাবছে, টিপুকে এবারই পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দেবে।

সেখানেই খবর নিতে গিয়েছিল। রিকশা করে ফিরছিল।

রিকশা থেকেই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ধ্রুব।

—যাই বলো, রঙটা কিন্তু চমৎকার ম্যাচ করে করেছে। জগন্নাথবাবু ভদ্রলোকের রুচি আছে।

প্রীতি বললে, তুমি তো প্রথমে আপত্তি করেছিলে, উনিই বললেন খুব ব্রাইট দেখাবে।

ধ্রুব বললে, তখন কি ছাই এ-সব বুঝতাম। এখন আমি নিজেই কন্ট্রাক্টর হয়ে যেতে পারি, সব জেনে গেছি।

প্রীতি হেসে ফেলল। —তা হলে সেই কাজই শুরু করে দাও।

তারপর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে, যাই বলো, আমাদের বাড়িটাই বেস্ট, এ পাড়ায়।

ধ্রুবরও সে-রকমই মনে হচ্ছিল। আশেপাশে কয়েকটা বেশ বড়সড় বাড়িও আছে, কিন্তু সেগুলোকে এখন আর তেমন সুন্দর লাগছে না। হয়তো অনেককাল বাইরেটা রঙ করেনি বলে, রোদে-জলে কেমন মরামরা লাগে। দু-একটা বাড়ির রঙ নতুন, কিন্তু

কোনও রুচি নেই। নীল কিংবা সবুজ ঢেলে দিয়েছে।

প্রীতি একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললে।—হরিব্‌ল্‌, এই রকম ব্লু কেউ দেয়!

ধ্রুব গম্ভীরভাবে বললে, ওটা সুধীনবাবুর বাড়ি, চমৎকার লোক। এমন ভদ্র আর মিশুকে, কোনও গর্ব নেই...

প্রীতি আর কিছু বলল না।

এ পাড়ায় উঠে এসেই ধ্রুব অনেকের সঙ্গে আলাপ করে ফেলেছে। প্রীতির এখনও চেনাজানার গণ্ডি তেমন বাড়েনি। কে কেমন লোক ও কিছুই জানে না।

জানার দরকারও নেই। বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে বেতের চেয়ারে এলিয়ে বসে সিনেমার ম্যাগাজিনের পাতায় ডুব দিয়ে ওর অবসর কেটে যায়।

প্রীতির নিজেকে বেশ সুখী মনে হয়। ধ্রুবরও। যেন জীবনের কাছে সব চাওয়া ফুরিয়ে গেছে। এই বয়েসেই। এখন শুধু টিপুকে মানুষ করে তোলা। ও তো আপনা থেকেই হবে। শুধু একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করে দিলেই হবে।

এর মধ্যে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সেই হাত-কাটা দালালটা একদিন এসে হাজির।—কিছু ঠিক করলেন স্যার, ভাল পার্টি আছে, অবাঙালি চান অবাঙালি, বাঙালি চান বাঙালি...

ধ্রুব তাকে ফিরিয়ে দিল।—এখন নয়, এখন নয়।

আরো দু'চারজন এসেছে, আপনা থেকেই। বিব্রত, বিরক্তবোধ করেছে ধ্রুব। নীচের তলাটা খালি পড়ে থাকাও যেন এক অশান্তি।

—শালা ভাড়াটেদের জ্বালায় টেকা দায়।

একজনের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ধ্রুব বললে।

প্রীতিও সমান বিরক্ত। বললে, সামনে লিখে দাও, ভাড়া দেওয়া হবে না।

ধ্রুব হাসল।—তা হলে তো আরও বিরক্ত করবে। সবাই জেনে যাবে নীচের তলা খালি আছে।

আসলে ধ্রুব এখনও মনস্থির করতে পারছে না, ভাড়া দেবে কিনা। ভাড়া না দিয়ে যদি ধার দেনা শোধ হয়ে যায়! না, ওর কেবলই ভয়, হয়তো ঠকে যাবে। হয়তো আরো ভাড়া বাড়বে, তখন ভাড়াটে তুলতে পারবে না।

ভাড়াটেকে তোলা এ-বাজারে যে কঠিন কাজ, ধ্রুব জানে। ওর মতো সকলেই তো আর বাড়ি করে উঠে আসতে পারে না। তাই সব অত্যাচার সয়েও দাঁত কামড়ে পড়ে থাকে। উঠে আসতে কি আর পারে না, চেষ্টাই করে না। ধ্রুবর তো এখন তাই মনে হয়। ও পারল কী করে।

অফিসে অবিনাশ তো ঠাট্টা করে ওকে মূর্খ বলল। ভাড়ার ফ্ল্যাট এমনি এমনি ছেড়ে দিয়েছে শুনে বলে উঠল, তুমি তো একটি মূর্খ হে। এমনি কখনো ছাড়ে? জানো, পঞ্চাশ হাজার দিলেও ভাড়াটে ওঠে না। আদায় করে নিতে হত।

ধ্রুব হেসেছিল ওর কথা শুনে।

অবিনাশ বলেছে, হাসির কী আছে? এটা তোমার রাইট। ও লোকটা আইনের জোরে বাড়িওয়ালা, তুমি আইনের জোরে ভাড়াটে। যখন ভাড়া দিয়েছিল তখন তো ও অনেক দেখেশুনে দিয়েছে। কার বেশি দরকার তা তো দেখেনি, যে ভাড়া বেশি দেবে, ভাড়া ঠিক ঠিক দিতে পারবে তাকেই দিয়েছে। সবাই তাই দেয়। স্বার্থ দেখে। তা হলে ভাড়াটেই বা স্বার্থ দেখবে না কেন?

শুনে সমস্ত মন তেতো হয়ে গিয়েছিল। অবিনাশের কাছে এই কথাগুলো শুনে ধ্রুব রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে। ও যদি ভাড়া দেয়, ভাড়াটেকে তুলতে চাইলে সেও এ-রকম

টাকা চেয়ে বসবে হয়তো। অথচ ভিতরে ভিতরে একটা লোভ। ভাড়া দিলে তাড়াতাড়ি ধারদেনা শোধ করে দেওয়া যাবে।

এখন ধ্রুবর কাছেও ভাড়াটেরা একটা আতঙ্ক।

আসা-যাওয়ার পথে পাড়ার সুখেনবাবুর সঙ্গে আলাপ। মাঝে মাঝেই দেখা হত, আর ভদ্রলোক টানাটানি করতেন, আসুন, চা খেয়ে যান। কিংবা স্ত্রীকে নিয়ে একদিন আসুন।

ভদ্রলোকের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে, হাঁটা-চলা দেখে ধারণা হয়েছিল উনিই বাড়িটার মালিক। তা নয়, ভাল চাকরি করেন। অনেক টাকা ভাড়া দিয়ে আছেন।

একদিন সপরিবারে এলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব জমিয়ে গল্প করতে পারেন। যতক্ষণ ছিলেন সময় যে কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারেনি ওরা।

যাবার সময় বললেন, নিজে বাড়ি করেছেন, অনেক শান্তিতে আছেন। আমাদের যা বাড়িওয়ালা মশাই, ছবি টাঙাব বলে দেয়ালে একটা পেরেক ঠুকছি, গুণ্ডামতো ছেলেটা ছুটে এসে সে কি হম্বিতম্বি।

সুখেনবাবুর স্ত্রী বললেন, ছোটলোক, ছোটলোক।

চলে গেলেন ওঁরা, কিন্তু ধ্রুবর সমস্ত মন বিস্বাদ করে দিয়ে।

ধ্রুবর তো এই দু'মাসের মধ্যেই বাড়িটার ওপর মায়া পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভাল জায়গা ভাল বাড়ি যেন হতে পারত না।

দরজার ঝকঝকে নব্ দু'বেলা ঘষেমেজে চকচকে করে রাখে প্রীতি।

বলছিল, জিনিস রাখার জন্যে রান্নাঘরে কয়েকটা কাঠের খোপ বানিয়ে নেবে।

—আর হ্যাঁ, বসার ঘরের জন্যে বেশ বড় একটা ছবি। কোনও মডার্ন আর্টিস্টের। প্রীতি বলেছিল, বসার ঘরে কোনও অরিজিনাল পেন্টিং না থাকলে ড্রয়িং রুম বলে মনেই হয় না।

ধ্রুবর মডার্ন আর্ট অত পছন্দ নয়। বলেছিল, যামিনী রায়।

প্রীতি উল্লসিত। —তা হলে তো কথাই নেই, কিন্তু অরিজিন্যাল!

এখনও ওদের বাড়িটাকে ঘিরে নানা স্বপ্ন। যেমন টিপুকে ঘিরে। বাড়িটাও যেন আরেকজন টিপু। আসলে এও তো রক্তমাংস দিয়েই গড়া। শেষে কি একজন ভাড়াটে এসে দুম দুম করে এর দেয়াল খুঁড়তে আরম্ভ করবে নাকি। সে এক আতঙ্ক।

সুখেনবাবুর কথাটা মনে পড়ে গেল। বললে, ভাড়াটে, তার আবার ছবি টাঙানোর শখ।

ওর স্বগতোক্তি প্রীতির কানে গেল। —আগের ফ্ল্যাটে আমরাও তো টাঙিয়েছিলাম। তুমি না, কেমন যেন বদলে যাচ্ছ।

ধ্রুব বললে, বদলে যাচ্ছি না, বদলে গিয়েছি। এখন আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তখন পেতাম না।

প্রীতি ভুরু কুঁচকে তাকাল ধ্রুবর চোখের দিকে। —তুমি কি যেন হয়ে যাচ্ছ।

ধ্রুব চুপ করে গেল। ও কি সত্যি সত্যি বদলে যাচ্ছে নাকি?

তা না হলে ও সুখেনবাবুকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চাইল কেন? ওঁরা তো নিজে থেকেই একদিন আলাপ করতে এসেছিলেন। ধ্রুব কথা দিয়েছিল, ওরাও একদিন যাবে।

কিন্তু গেল না।

প্রীতি একদিন বলেছিল। ধ্রুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছে, না না, অত মেলামেশার কি দরকার।

একটু পরে বলেছে, জীবনবাবুকে চটিয়ে কি লাভ।

জীবনবাবু অর্থাৎ সুখেনবাবুর বাড়িওয়ালা। লোকটিকে ভালই লাগে ধ্রুবর। খুব

খোলামেলা। কথাবার্তায় কোনও রাখাঢাকা নেই।

এখানে এসে ও ভেবেছিল সকলের খুব বন্ধু হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম বোধহয় চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু পারেনি। কেন, কে জানে।

ওর নিজেরই দোষ কিনা জানে না।

এখন প্রীতিও বলছে, তুমি না, কেমন যেন বদলে যাচ্ছ!

ধ্রুব মনে মনে বললে, বদলে যেতেই তো চাই। আমি তো বাড়ি বদল করেছি। বাড়ি বদল মানে তো শুধু একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়িতে যাওয়া নয়।

এসে একদিন প্রীতিকে বললে, চলো অরিন্দমবাবুদের বাড়ি যেতে হবে। উনি আজ আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন।

প্রীতি অবাক হয়ে বললে, অরিন্দমবাবু, সে আবার কে?

—বাঃ, তোমাকে তো কতদিন বলেছি, প্রায়ই দেখা হয়। নামগুলো তো মনে রাখবে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, ওই তিনতলা বড় বাড়ি, ওঁরই। বলেছেন, ওঁর কর্পোরেশনে চেনা আছে, বাড়ির ট্যাক্সটা যাতে কম হয় ব্যবস্থা করে দেবেন।

প্রীতি শুধু বললে, ও।

গেল। কিন্তু খুব মন খুলে আলাপ করল না। বোধহয় ভদ্রলোকের গিন্নিকে পছন্দ হয়নি। পছন্দ হবার কথাও নয়। বেশ বয়স্ক, জবুথবু। একটু প্রাচীনপন্থী।

অরিন্দমবাবুকেও ধ্রুবর খুব ভাল লাগেনি। কেবল ঘরের মোজেক দেখাচ্ছিলেন। কী রকম পালিশ দেখেছেন? ডিজাইনটা আর কোথাও দেখবেন না। বারান্দার গ্রীল দেখাচ্ছিলেন।

তবু বন্ধু মনে হল তাঁকে। অরিন্দমবাবু বললেন, ট্যাক্স নিয়ে আপনি ভাববেন না, আমার লোক আছে। এই গোটা বাড়ির কত ট্যাক্স করিয়েছি জানেন, মাত্র একশো কুড়ি।

বলে হো হো করে হাসলেন।

ফেরার সময় ধ্রুব বলেছিল, যাই বলো, ভদ্রলোক খুব পরোপকারী। যেচে কে এই উপকার করে আজকের বাজারে।

পরোপকারী কথাটা নিজের কানেই খট্ করে লাগল। পরের উপকার? কিন্তু অরিন্দমবাবু কি ধ্রুবকে পর ভাবছেন? নাকি ধ্রুবই ওঁকে পর ভাবছে। কেমন যেন আপন আপন মনে হচ্ছে। শুধু স্বার্থের জন্যে? না কি স্বার্থই ওদের এক করে দিয়েছে, আপন করে দিয়েছে।

হয়তো তাই।

সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি। রাস্তায় রাস্তায় জল জমে গেছে। অফিস থেকে বেরিয়ে ভেবেছিল ট্যাক্সি করেই বাড়ি ফিরবে। কিন্তু পকেটে টাকাও বেশি ছিল না। আজকাল খরচ কমানোর চেষ্টা করছে, সেজন্যেই পকেটে টাকাও বেশি রাখে না। থাকলেই খরচ হয়ে যায়। ভয় হল, জ্যামে আটকে গিয়ে মিটার কোথায় উঠবে কে জানে। শেষে বাড়ি পর্যন্ত যদি না আসে, মাঝপথে টাকা দিতে পারবে না।

দু' দুবার বাস বদলাতে গিয়ে একেবারে কাকভেজা।

বাড়ি ফিরেই শুনতে পেল প্রচণ্ড উল্লাস। হাসিহল্লা।

বেল্ বাজানোর পর এসে দরজা খুলতেও দেরি করল প্রীতি। কিংবা একে ক্লান্ত তার ওপর ভিজে গেছে বলেই ধ্রুবর মনে হল দরজা খুলতে বড় বেশি দেরি করছে প্রীতি।

রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করল।

কিন্তু ঢুকেই চক্ষুস্থির। জামাকাপড় বদলানোর জন্যে বসার ঘরে এসে অপেক্ষা

করল। প্রীতি শুকনো জামাকাপড় এনে দিয়ে গেল।

এক ঝলক দেখেছে, তাতেই বিরক্তি। সুখেনবাবুর স্ত্রী।

ওঁরই সঙ্গে এত হাসিগল্প। এত হল্লা। দুড়ুমদাড়াম করে দেয়াল খুঁড়ছিল বলে জীবনবাবু একটু আপত্তি করেছেন, তাঁরই তো বাড়ি, মায়া হবে না। তার জন্যে বাড়ি বয়ে বলতে এসেছিলেন এই সুখেনবাবুরা।

উদ্দেশ্য তো একটাই। অরিন্দমবাবুর বিরুদ্ধে পাড়ায় প্রোপাগাণ্ডা করা।

অনেকক্ষণ ধরে বসার ঘরে বসে বসে রাগ চাপছিল ধ্রুব। ভদ্রমহিলার যাবার নাম নেই।

শেষে শুনতে পেল, ভদ্রমহিলা বলছেন, ছাতাই দাও ভাই, চলে যাই। কতক্ষণ আর উনি বসে থাকবেন।

এ-কথাটা যেন আগে বলা যেত না।

উনি চলে যেতেই রাগে ফেটে পড়ল ধ্রুব।

—বার বার বলেছি, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করো না, করো না।

প্রীতি অবাক হয়ে বলল, কেন, কি করল ওরা? বরং আমি একা একা থাকি, উনি এলেন বলে তো...

ধ্রুব গলার স্বর তুলল।—মেলামেশার আরো তো লোক আছে। এখন তো খুব হাসাহাসি, নীচের তলায় যদি ভাড়াটে বসাই, তখন দেখবে তার সঙ্গে দল বাঁধছে। সব চেনা আছে আমার।

প্রীতি বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে রইল ধ্রুবর চোখের দিকে।

ধ্রুব তখনও ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছে।

বললে, ওরা তো শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখে। গল্প বলতে তো, বাড়িওয়ালা মাথার ওপর শিলনোড়ায় মশলা বাটে, বললেও শোনে না। কিংবা এই সেদিন এসেছি, এর মধ্যে ভাড়া বাড়াতে বলছে। আর নয়তো ওই এক কথা, জল দেয় না। ওরা একটা আলাদা ক্লাশ, বুঝলে।

প্রীতি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ধ্রুবর চোখের দিকে। তারপর কেমন একটা রহস্যের হাসি হাসল।

আর ধীরে ধীরে বললে, বাড়িটা সত্যি বদলে গেছে।



# স্বার্থ



জয়শ্রী থেকে জয়া। এবাড়িতে কেউ ওকে বৌমা বলে ডাকে না। ঠিক বিয়ের পরে পরে মুখ ফসকে শ্বশুর দু'একবার বৌমা বলে ফেলতেন। দু'একবারই শুধু। মনে পড়লে জয়ার এখনও হাসি পায়। সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ির সে কি দাবড়ানি। চোখে কড়া ধমক নিয়ে বলে উঠেছিল, তুমি বুড়ো হতে চাও হও, আমি সেকেলে শাশুড়ি হব না। একটা কমা না সেমিকোলন দিয়ে, জয়ার মনে পড়ে, সুকল্যাণের মা, মানে জয়ার শাশুড়ি, মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে যেতে চৌকাঠ ডিঙোবার আগে একটা চীনে পটকা ছুড়ে দিয়েছিল, কেন, জয়া বলে ডাকতে কি জিভে তেতো লাগে...এত সুন্দর নাম !

জয়া বলে বাপের বাড়িতে কেউ ডাকত না। সেখানে ও সবার মুখেই ফুটকি। বেশ বাজে নাম, স্কুলের মেয়েরা কেউ কেউ জেনে গিয়েছিল বলে প্রথম প্রথম খ্যাপাত। ডাকনামগুলোর সব সময় কি কোনও ইতিহাস থাকে ! বাবা-মা আদর করতে গিয়ে সেই মুখে কথা না ফোটার বয়সে কত যে ইকড়ি মিকড়ি নাম দিয়ে বসে, সেটাই হয়ে যায় ডাকনাম। আর বেচারি বড় হওয়ার পর সেটাই হয়ে দাঁড়ায় অস্বস্তি। বিয়ের পর সুকল্যাণ ওদের বাড়ি গিয়ে যেদিন জানতে পেরেছে, জয়ার কি লজ্জা। জয়শ্রী ছিল শুধু স্কুল কলেজের খাতায়, ছেলেবেলাতেই তাকে জয়া বানিয়ে নিলে কত ভাল হত। তা হলে নামটা নিশ্চয় খুব আপন লাগত। এখন লাগে না, কেমন একটা দূরত্ব আছে। স্কুল কলেজের রোল নাম্বারের মতো। বড় হওয়ার পর কি নামবদল হয় !

জয়া বা জয়শ্রী কোনওটাই অবশ্য ওর কাছে খুব সুন্দর নাম মনে হয় না। শাশুড়ি যাই বলুক। ও বোধহয় মন রাখা কথা। আর ফুটকি নামটাতে ওর যতই লজ্জা থাক, বাপের বাড়ি গেলে কেউ যখন ফুটকি বলে ডাকে, কি ভাল লাগে। কত নিজের মনে হয়। বাপের বাড়িতে এসে শ্বশুর-শাশুড়ির কোনও কথাকে ইনভার্টেড কমার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে জয়া নামটা উচ্চারণ করার সময় প্রথম প্রথম তো মনে হত কেউ যেন জিভে ডিমেশাক ঘষে দিচ্ছে। তেতো। তার চেয়ে ফুটকি ভাল। ছেলেবেলায় একটু ছোটখাটো দেখতে ছিল বলে, নাকি মুখে খই ফুটত বলে, মা একবার হাসতে হাসতে কাকে যেন বলেছিল।

সুকল্যাণ জানে না, জানলে বলত, তখন যদি এত কথা ফুটত, এখন এত চুপচাপ কেন।

জয়া এখন যে একটু চুপচাপ তা অবশ্য নয়। তবে ওর মডার্ন শাশুড়ির মতো অতিরিক্ত প্রগলভতা, অত্যধিক হাসি মস্করা ওর পছন্দ নয়। শাশুড়ি শাশুড়ির মতো হলেই যেন বেশি মানায়।

মীনা বলেছিল, তোর মতো শাশুড়ি পেলে আমি বর্তে যেতাম। পেয়েছিস তো, তাই জানিস না তুই কি লাকি।

শুনে বিষণ্ণ হাসি হেসেছে জয়া।—দ্যাখ মীনা, এদের কারো বাইরেটা মডার্ন, হাসিখুশি, কেউ ব্যাকডেটেড, পুজোআর্চা আছে, গুরু আছে। ভেতরে ভেতরে সব এক, শুনতে তো পাস।

মীনার সঙ্গে তুইতোকারিতে নেমে এসেছে এই ক'মাসেই। আরো কয়েকজনের সঙ্গে। গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। কারণ অন্তরের অসন্তোষ বোধহয় সকলের একই। একজন শুরু করলেই ভেতরের ক্ষোভ বের করে আনে অন্যজন। শুধু কমলাদি যা-একটু

পৃথক, বেশ চাপা ধরনের। শোনে, কিন্তু পেট থেকে একটা কথাও বের করে না। হাসি হাসি মুখে এমন একটা ভাব করে যেন বেদম খুশির জীবন। সংসারে কোনও অতৃপ্তি নেই। অথচ থাকে তো জয়েন্ট ফ্যামিলিতে। জয়েণ্ট ফ্যামিলি! বাপরে। শুনে জয়া-মীনা দু'জনেই বলে উঠেছিল, হেসে ফেলেছিল। তখন খেয়ালই হয়নি, ওদের নিজেদেরগুলোও তো তাই, তুলনায় একটু ছোট এই যা।

কমলাদিকে সেজন্যেই ওরা খুব একটা পছন্দ করে না। দুঃখ এক না হলে কি এক হওয়া যায়। সম্পর্ক গড়ে ওঠে? দুঃখ নেই তা হতে পারে না। তবে এত চাপা স্বভাব, কিছুতেই জানতে দেবে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করলেও 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'। জয়তী, কৃষ্ণা, মীনাক্ষীদের তবু বোঝা যায়। ওরা দিব্যি স্বামী আর বাচ্চা নিয়ে আলাদা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে, শ্বশুরশাশুড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। অটোরিক্সার শেয়ারে অথবা মিনিবাসে এক টাকা কি দেড় টাকা দিলেই দুপুরে বাপের বাড়ি চলে যাওয়া যায়। টেলিফোনে আধঘণ্টা গল্প করে বলা যায়, 'মা একটু আমের আচার করে রেখো তো, গিয়ে নিয়ে আসব।' মীনাক্ষীর শ্বশুরশাশুড়ি তো বাইরে থাকে, জয়তীর ব্যারাকপুরে। কৃষ্ণার সল্ট লেকে। দু'এক সপ্তাহ অন্তর ও একবার গিয়ে দেখা করে আসে।

আসলে জয়াদের একটা ক্লাব আছে। একেবারে দিশি ধাঁচের ক্লাব।

যে কে জি স্কুলটায় পিঙ্কুকে ভর্তি করেছে তার সামনের বাড়ির রোয়াকে এই ক্লাব। স্কুলবাস নেই, তাই সকাল বেলাতেই তাদের পৌঁছে দিতে এসে বসে থাকে, গল্পগুজব করে, যাকে বলে আড্ডা। আবার ফিরে গিয়ে বাচ্চাকে নিতে আসা, শরীরেও পোষায় না, বাড়তি খরচও। যাদের উপায় নেই, কিংবা বাড়ি কাছে, তারাই শুধু চলে যায়। কিন্তু ছুটির পর তারাও ছেলেমেয়ের হাত ধরে দল বেঁধে যেতে যেতে গল্প জুড়ে দেয়। খিধে-পেট ছেলেটার কথা মনেই থাকে না, সে তাড়া দিলে উল্টে ধমক দিয়ে ফেলে।

এটাকেই জয়া মীনারা ঠাট্টা করে ক্লাব বলে। এখানেই জীবনের যত ক্ষোভ দুঃখ অসহায়তা উজাড় করে দেয়। কে.জি. পার হলে আবার তো ভর্তির হাঙ্গামা আছে, কোন স্কুলে কখন ফর্ম দেয় সেসব খবরও পায় এখানেই।

রান্নার লোক ছিল না, একটা গেলে আজকাল আরেকটা কাজের লোক পাওয়া যে কি দায়, জয়া একটা মাস আড্ডা দিতে পারেনি, স্রেফ রান্নাঘরে কাটাতে হয়েছে, শাশুড়ি একটুআধটু সাহায্য যে না করেছে তাও নয়, কিন্তু সুকল্যাণের মুখে একটা মাস কি বিরক্তি। পিঙ্কুকে শুধু স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, পৌঁছে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে স্নানখাওয়া, অফিস যাওয়া। শাশুড়ির আদরের 'সুকুর বড় কষ্ট হচ্ছে'। জয়াকে যে রান্না করে সুকল্যাণকে অফিস পাঠিয়ে ছুটতে ছুটতে এই চড়া রোদ্দুরে ঘেমেনেয়ে যেতে হয়েছে পিঙ্কুকে আনতে, সেটা যেন কষ্টই নয়। ঘর্মসিক্ত শরীরে ফিরে লোডশেডিং বা জল নেই।

জয়ার শ্বশুর অবশ্য সহকারী অফিসে কাজ করেন, সেজন্যে অফিস যাওয়ার অত তাড়া নেই। ধীরেসুস্থে পান চিবোতে চিবোতে যান ; সুকল্যাণের মতো মাল্টিন্যাশনাল নয়, চোখেমুখে গুঁজে নটার সময় ছুটতে হয় না।

খবরটা পিঙ্কুর কাছে আভাসে শুনেছিল, কোনও গুরুত্ব দেয়নি, ভাল বুঝতেও পারেনি। শুনতে হল মীনার কাছ থেকেই।

মীনাই বললে, সে কি রে, শুনিসনি কাণ্ড!

জয়া প্রশ্ন করেছিল, 'অরিজিৎকে নিয়ে গেল, ও আবার কে?'

অরিজিৎ ছেলেটাকে ওরা সবাই চেনে, যদিও তার মা'র সঙ্গে তেমন সৌহার্দ্য কোনওদিন গড়ে ওঠেনি। বরং ওরা একটু এড়িয়েই চলত। ছেলেটাকে চেনার কারণ

শুধু দেখতে ফর্সা ফুটফুটে বলেই নয়, ওদের আন্টি একদিন সকলের সামনেই বলেছিল, জুয়েল, ভাবতে পারবেন না কি দারুণ ইনটেলিজেন্ট।

সেটা ওর চোখ আর টিকলো নাকেই স্পষ্ট। দোষের মধ্যে উচ্চিংড়ের মত ছিটকে ছিটকে বেড়ায়, বড্ড চঞ্চল। কিন্তু তার জন্যে আবার ভালও লাগত। ওই যে ইনটেলিজেন্ট, হায়েস্ট মার্ক পায়। গুণ এমন জিনিস, দোষটাও ভালবাসা পেয়ে যায়।

কিন্তু ওর মাকে ওদের একদম পছন্দ নয়। বয়েস ওদের মতোই, একটাই তো বাচ্চা, কত আর হবে। শরীরে আঁট আছে। ওদেরই কি নেই ? কে যেন ঠাট্টা করে বলেছিল, ইয়াং মাদার্স ক্লাব। ওদের রোয়াকে অবশ্য দু'দশজন আছে, যারা একটু বয়স্ক, কাঁধে কোমরে একটু ভারী, দ্বিতীয় কি তৃতীয় সন্তান, একটু দেরিতে, চাই না চাই না করে হঠাৎ দ্বিতীয় প্রহরে মত বদল, কিংবা নিতান্তই অ্যাকসিডেন্ট। একটু ঘোর সংসারী ধরনের। তাদের অত অপছন্দ নয়। ছেলেমেয়ের কানে ব্যথা হলে টোটকা বলে দেয়।

কিন্তু অরিজিতের মা ? চালু মেয়ে। ঠোঁটের লিপস্টিক, নখের নেলপালিশ সবসময় ফিটফাট। মাঝে এক একদিন ইরার টিপ্পনী, দেখেছিস জয়া, ভেতরের জামা পরেনি, কি বেহায়া বাবা। অর্থাৎ ব্রা। ওটাই নাকি এখন নতুন হাওয়া। একসময় পরাটাই ছিল দোষের। অসভ্যতা। আর একসময় তো ছিল চাপা জামা, মেয়েদের ওসব থাকাই যেন অপরাধ।

অরিজিতের মা অবশ্য রোয়াকে বড় একটা বসত না, পায়চারি করতে করতে এর ওর সঙ্গে কথা বলত, তারপর কখন যে সরে পড়ত কেউ লক্ষ্যই করত না। ছুটি হয়ে গেছে, অরিজিৎকে আটকে রেখেছে দারোয়ান, ওর মা ছুটতে ছুটতে এসে, মুখে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্যে আতঙ্ক, ছেলের হাত ধরে তবে মুখে নিশ্চিন্ত হাসি, ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে চুল ঠিক করত।

মীনা আর জয়া চোখোচোখি করে ইঙ্গিতে হাসত। আরো কেউ কেউ।

বিল্লুর মা কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।—পাগল নাকি তোরা ? তাও কি সম্ভব, এই কটকটে রোদ্দুরের সময় !

ওর ধারণা এয়ারকন্ডিশনড পরিবেশ না হলে অ্যাফেয়ার হয় না। মুখ্যু আর কাকে বলে। হায়ার সেকেন্ডারির পর তো আর এগোয়নি, নিজেই একদিন বলেছিল বিল্লুর মা। 'ইংরিজি নিয়ে ভাই হিমসিম, তোরা তো তবু জানিসটানিস।' সে অবশ্য ওরা সবাই হিমসিম, তখনকার পড়া আর এখনকার পড়া। 'গেট' এই ভার্বটার যে এতরকম ব্যবহার কে জানত, আমরা তো ব্রিং বলে এসেছি।

বিল্লুর মা মজার লোক। পাঁচ অক্ষরের নাম, ডাকতে গেলে জিভ এলোমেলো হয়ে যায়। তাই বিল্লুর মা হয়ে গেছে ও।

ওদের অবাক হওয়া দেখে হেসে বলেছিল, কেন রে, বেশ তো লাগে, যখন দৌড়তে দৌড়তে এল, হাঁপাচ্ছে, একেবারে কত্থকের থালি নাচ...

বলতে বলতে দু'হাতের আঙুল ডিমি ডিমি নাচিয়ে দিয়েছিল। ওরা হেসে লুটোপুটি।

বিল্লুর মা বলেছিল, পারলে আমিও পরতাম, মানে পরতাম না।

আবার একচোট হাসিহুল্লোড়, তারপর বিল্লুর মা—শালা যা একখানা বাড়ি না, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেবে।

কখনো সখনো 'শালা' বলে ফেলে ও। রুচিতে বাধে ওদের। মেয়েদের মুখে ? ছিঃ। ওরা রেগে গেলে মনে মনে বলে বটে, কিন্তু মুখ ফুটে ? তবে বিল্লুর মা তো মজার মানুষ, তাই ওরা গায়ে মাখে না। বলুক।

যাকে নিয়ে এত কথা, সেই অরিজিতের মা কেন আসেনি সেটাই চোখে পড়ল

জয়ার।

—অরিজিৎকে নিয়ে গেল, ও আবার কে ? জয়া প্রশ্ন করেছিল।

ও তো অনেকদিন আড্ডা দিতে পায়নি। যাদের কাজের লোক নেই, কিংবা সংসারের আরো পাঁচটা কাজ থাকে, আবার অনেকের বাবারাই পৌঁছে দিয়ে যায় বাচ্চাকে। মা এসে নিয়ে যায়। কেউ কেউ ধড়িবাজ, নানা বাহানা বানিয়ে সত্যি মিথ্যে গল্প শুনিয়ে দিব্যি শাশুড়ির ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে আসে, আবার গর্ব করে বলেও। উপায়হীন ভালমানুষ শাশুড়িও তো আছে।

অরিজিতের মা সেই দলের কি না কে জানে।

বিল্লুর মা ও ব্যাপারে নট নড়নচড়ন। বলে, দ্যাখ মীনা, আমাকে শেখাস না, অনেক দেখেছি। শালা শাশুড়ি কখনো ভাল হয় না। হতে পারে না। শাশুড়িরা ভাল বউ হতে পারে, ভাল মা হতে পারে, মাসিপিসিও, কিন্তু ভাল শাশুড়ি হওয়া ইমপসিবল।

মীনারা জানে ওটা ওর চাপা রাগ। হবে নাই বা কেন, ওর যৌবনকালটা হয়তো নষ্ট করে দিয়েছে। মীনা জয়ারাই কি কম ভুগেছে, এখন একটু শান্তি এসেছে এই যা। কিংবা অভ্যাস হয়ে গেছে, তাচ্ছিল্য করতে শিখেছে।

'শাশুড়িদের দোষ দিয়ে কি হবে, ছাগল ছেলেগুলোর জন্যেই তো মেয়েদের এই অবস্থা।' নন্দিতা, হ্যাঁ নন্দিতা বলেছিল, 'স্বামীগুলো ঠিক থাকলে সব ঠিক করা যায়।'...একটু থেমে বলেছিল, 'সব তো অপদার্থ।'

'অপদার্থ' শব্দটা কথার কথা, নাকি কিছু বলতে চেয়েছিল নন্দিতা, তা বুঝতে পারেনি ওরা।

বিল্লুর মা কি বুঝল কে জানে, হেসে উঠে বললে, সেটাই তো বোঝে না শাশুড়িগুলো, জানলে আর এত হিংসে করত না।

—তা কেন, মুঠো থেকে ছেলে বেরিয়ে যাচ্ছে কে চায় বল। মীনা বোধহয় কথা ঘোরাবার জন্যেই বললে। 'অপদার্থ' শব্দটাকে আর বেশি টানাটানি করা ওব পছন্দ হচ্ছিল না।

—যাই বল, মেয়েদেরও দোয আছে, এই অরিজিতের মা...

অরিজিতের মায়ের দিকে চোখ সবারই।

জয়া এতদিন আসতে পারেনি, ছুটির পর এসেই তাড়াহুড়ো করে পিঙ্কুকে নিয়ে চলে যেত। মীনা কিংবা বিল্লুর মায়ের সঙ্গে জমিয়ে গল্পও হয়নি।

ও তাই বলে উঠল, অরিজিৎকে নিয়ে গেল, ও আবার কে ?

মীনা বললে, সে কি রে, শুনিসনি কাণ্ড ?

পিঙ্কুকে পড়াতে বসিয়েছে, সন্ধেবেলায়, তখন তো কাজের লোক নেই, এই আড্ডায় আসাও হয়নি, মীনার সঙ্গে যদি বা দেখা হয়েছে, তাড়াহুড়োয় ওর হয়ত মনেও পড়েনি, তাই জানে না, পিঙ্কু বলেছিল, মা, অরিজিৎ খুব কাঁদছিল।

—কেন রে ? জয়া জিগ্যেস করল ছেলেকেই।

—ওর মা হাসপাতালে গেছে।

একটু থেমে বলেছিল, ও স্কুল থেকে যেতে চাইছিল না, মা নিতে না এলে যাবে না।

জয়া ভেবেছিল, অসুখবিসুখ।

তা নয়।

মীনা বললে, ওটা অরিজিতের পিসি। রোজ আসে।

তারপর হেসে বললে, যা ভেবেছিলাম তাই বোধহয়। হাসপাতালটাতাল বাজে কথা, পিসিটা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। অরিজিৎকে বোধহয় সে-কথাই বুঝিয়েছে।

মা আর আসে না, তার পিসি এসে অরিজিৎকে নিয়ে যায়, পৌঁছে দিয়ে যায় তার বাবা। এটা তো চোখে পড়ার মতো ঘটনা। কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সেই কৌতূহলের আশাপ্রদ উত্তর না পাওয়া অবধি কেউ থেমে থাকতে পারে না। অপরের অন্দরমহল সম্পর্কে কৌতূহল ছাড়া অবসর বিনোদনের কি-ই বা আছে আমাদের।

মীনা বললে, এ-সব কথা ক'দিন আর চেপে রাখবে রে বাবা।

একটু থেমে বললে, অণিমা কি ধূর্ত জানিস না। পিসিটা যখন বলছিল, ওর চোখমুখ দেখেই ওর সন্দেহ হয়। কি সাহস, ঠিকানা তো জানত, একদিন হোম টাস্ক জেনে আসবে বলে গিয়ে হাজির।

—তারপর ? জয়ার চোখে একই সঙ্গে কৌতুক আর আতঙ্ক। শুনতে আগ্রহ ঠিকই, কিন্তু ভয়ও। আমাদেরও কিছু একটা তো...গোপন করার মতো, লজ্জা পাবার মতো, কোন্ বাড়িতে নেই। এসব মেয়েরা ঠিক খুঁজে বের করে ফেলবে। তিলকে তাল বানাবে।

মীনা হাসল।—তারপর আর কি। পিসিটা ছিল না, বাড়ির ঠিকে ঝি'র সঙ্গে দেখা। সে-ই বলেছে।

—কি ? কি বলেছে সে ?

মীনা গম্ভীর হল, এবার আর হাসল না।—চলে গেছে। কোথায় কেউ জানে না।

একটু থেমে বললে, কি অমানুষ ভাই, ওই ফুটফুটে ছেলেটাকে ফেলে রেখে যেতে পারল ! আত্মধিক্কারের কণ্ঠে, 'মেয়েরা দেখছি সব পারে।'

জয়ার চোখের সামনে অরিজিতের চঞ্চল ফুটফুটে মুখটা ভেসে উঠল। বুকের ভেতর একটা মোচড়। কি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিস রে। ক্লাসে হায়েস্ট মার্ক পেলে কি হবে, ভগবান তোকে এই বয়সেই সারা জীবনের জন্যে ফেল করিয়ে দিল। জয়ার ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু ততক্ষণে অরিজিৎকে তার পিসি নিয়ে চলে গেছে।

ভাগ্যিস চলে গেছে, অরিজিৎকে আদর করতে গেলে না জানি পিসিটা কি বলে বসত। মুখচোখ দেখলেই বোঝা যায় খিটখিটে আর রাগী। শুকনো চেহারা। চেহারা দেখে অবশ্য সব সময় বোঝা যায় না, গায়ে মাংস থাকলেই যে মানুষের মাংস থাকবে এমন কোনও কথা নেই। অরিজিতের মা তো দিব্যি স্বাস্থ্যবতী, মাংস দেখানোই রোগ ছিল।

জয়া তবু বললে, খারাপ ভাবছিস কেন, হয়ত স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ঘাপটি মেরে আছে।

মীনা হাসল।—দ্যাখ জয়া, ওই বাচ্চাকে ফেলে রেখে কেউ রাগ দেখাতে যায় না। সঙ্গে নিয়ে যেত।

কথাটা মিথ্যে নয়। রহস্য তো ওখানেই। তাছাড়া অরিজিতের মাকে দেখে কেমন একটা সন্দেহ-সন্দেহ ওদের সকলেরই।

কিন্তু ঘটনাটা জয়াকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলল, নাড়া দিল। ফেরার পথে ও যে পিঙ্কুর হাত ছেড়ে দিয়েছিল, খেয়ালই ছিল না। পিঙ্কু এমনিতেই হাত ধরতে দেয় না, ওই বয়সের ছেলেদের ওই এক দোষ, ভাবে খুব বড় হয়ে গেছি, একা একা হাঁটলেই বা। তবু জোর করে হাত ধরেই স্কুল ছুটির ভিড় থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, রাস্তা পার হওয়ার সময়ও।

মন কি বস্তু, অপরের ছেলের দুঃখের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের ছেলেকে ভুলে গিয়েছিল। হাত না ধরেই রাস্তা পার হয়েছে। ভাগ্যিস কিছু একটা ঘটে যায়নি।

আতঙ্কের সময়টুকু পার হয়ে এসে বুকের ভেতরটা আতঙ্কে কেঁপে উঠল।

বাড়ি ফিরে এল। এখন পিঙ্কুকে স্নান করানো, খাওয়ানোর তাড়া। নানান কাজ পড়ে আছে সংসারের। কিন্তু কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরছে তো ঘুরছেই। না, বাড়িতে কাউকে বলবে না। বললে বড় জোর সুপ্রভাতকে বলত। সুকল্যাণের ছোট ভাই, সে চাকরি পেয়ে জামশেদপুরে চলে গেছে বেশ কিছুকাল। বড় একটা আসেও না। ওই একমাত্র জয়ার দুঃখ বুঝত।

শ্বশুরশাশুড়ি কিংবা ছুটকুকেও বলবে না। সুকল্যাণকে তো নয়ই। বললে যেন নিজেই ছোট হয়ে যাবে। আর সুকল্যাণকে বললে হয়ত বলে বসবে, তোমরা মেয়েরা সব পার। কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠবে শুনলে। অথচ একথাই তো মীনা বলেছে, 'মেয়েরা দেখছি সব পারে'। তখন নিজেও সায় দিয়েছে।

কথাটা মিথ্যে নয়, বলার মতোই। কারণ অরিজিতের মায়ের মতো একজনই পেরেছে। খবর সেটাই। ছেলেরা যে হামেশাই এরকম কাণ্ড করে বসছে, বউ ছেলেকে ফেলে রেখে অন্যত্র সংসার বাঁধছে, সুতরাং সেটা আর খবর হবে কি করে। ছেলেরা যে সব পারে সেটা তো জানা কথা, মুখ ফুটে বলতে হয় না।

জুতো দেখতে পেয়ে বুঝল শ্বশুর এখনো বেরোননি। কবে কখন বেরোবেন তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। সরকারি চাকরি তো। গাভমেণ্ট সার্ভিস হলেই যে দেরিতে যাওয়া যায় তা অবশ্য নয়। জয়ার মেজমামারও গাভমেন্ট সার্ভিস, কিন্তু মেজমামাকেও দেখেছে সুকল্যাণের মতো নাকেমুখে গুঁজে ছুটতে হয়।

গরমে বাসের ভিড়ে ঘেমে নেয়ে এসেছে জয়া। এসেই পাখাটা জোরে চালিয়ে দিল, পিঙ্কুকে বললে, এখানে দাঁড়া। অর্থাৎ হাওয়া খেয়ে নে।

কি ভাগ্য, কারেন্ট আছে।

ছোট্ট একটা কথা, অথচ সমস্ত জীবনটাই বিস্বাদ করে দেয়। এখন ওসব বিশেষ শুনতে হয় না, কিন্তু মনে পড়ে যায়। সেই প্রথম প্রথম।

এমনি গরম, পাখা ঘুরছিল। শ্বশুর কাকে শুনিয়ে কে জানে বারান্দা থেকে বলেছিলেন, তোমাদের কি চব্বিশ ঘণ্টাই পাখা লাগে!

জয়া ভয়ে ভয়ে পাখা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে সুপ্রভাতের গলা শুনেছিল। হয়ত জয়ার পক্ষ নিয়েই। 'পাখা আছে যখন, গরম করলে খুলবে না?'

—খুলতে তো বারণ করছি না। একটু অসহায় শুনিয়েছিল শ্বশুরের কণ্ঠস্বর। বলেছিলেন, গত মাসের বিলটা দেখেছিস!

সুকল্যাণের ছোট ভাই সুপ্রভাত তখনো বেকার, কিন্তু ন্যায়অন্যায়ে তার গলার জোর বেশি ছিল। সুকল্যাণের মাইনে তখনো খুব একটা বলার মতো নয়।

সুকল্যাণ তখন মাইনের টাকাটা মায়ের হাতে তুলে দিত। কত মাইনে, হাতে কত পায় এসব কিছুই জানত না জয়া।

ও পরে জেনেছে। শ্বশুরের মাইনেও যে তেমন নয় তাও জানে। দেরি করে অফিস যাওয়ার কথা শাশুড়িই বলেছিল একদিন, তোমার জন্যে আমি তো চান করতেও যেতে পাই না।

শ্বশুর হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, যাই সেটাই যথেষ্ট। আর তো ক'টা বছর! বারো বছর আগে একটা প্রোমোশন পেয়েছিলাম। ব্যস, তারপর থেকে শুধু ইনক্রিমেন্ট। গ্রেডে পৌঁছলেই যথেষ্ট। তার আবার কাজ। পাংচুয়াল হবে অফিসাররা, আমাদের জন্যে ওসব নয়।

ব্যস্, ওইটুকু থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছে। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছে, ইলেকট্রিকের বিলটা সত্যি হয়ত গায়ে লাগত। লাগারই কথা। তবু কথাটা তীর হয়ে বিঁধে আছে : 'তোমার কি চব্বিশ ঘণ্টাই পাখা লাগে !'

এখন ওসব কথা শুনতে হয় না। সুপ্রভাত আর বেকার নেই, সুকল্যাণের উন্নতি হয়েছে চাকরিতে।

সুপ্রভাত মাসে মাসে কিছু পাঠায় কিনা জানার উপায় নেই। কি করেই বা পাঠাবে। নিজেরটা চালাতে পারলেই যথেষ্ট। প্রথমে জামশেদপুরে চাকরি হয়েছে শুনে জয়া খুব খুশি হয়েছিল, বাড়ির সবাই। সে কি হৈ হৈ। বাবা, মানে সুকল্যাণের বাবা চলে গেলেন মাংস আনতে। জয়া ধরে নিয়েছিল টাটায়। পরে শুনল তা নয়, নাম শোনেনি কোনও একটা কোম্পানি। মাইনে কত তাও বলেনি সুপ্রভাত, এড়িয়ে গিয়ে হেসে বলেছিল, চায়ের দোকান ছাড়া বসার জায়গা ছিল না, এখন একটা বসার চেয়ার পাব সেই যথেষ্ট। তার আবার মাইনে !

হেসে ফেলেছিল জয়া। বুঝেছিল ওটা মুখ ফুটে বলার মতো নয়। তা হোক্, চাকরি তো।

কিন্তু অরিজিতের মায়ের কথাটা কিছুতেই মাথা থেকে যাচ্ছিল না। ছেলেটার জন্যে মায়া হচ্ছিল পিঙ্কুকে স্নান করাতে করাতে।

গায়ে জল ঢেলে দিয়েছে। সোপকেস খুলে দেখে পাতলা এক চিলতে পড়ে আছে, নতুন সাবান রাখা হয়নি। হয়ত সুকল্যাণই শেষ করে দিয়ে গেছে। স্নান করতে গিয়ে সাবানের কৌটোয় সাবান শেষ, কি শ্যাম্পুর শিশিতে তলানি পড়ে থাকতে দেখলে বিরক্তি তো হবেই। মনে হয় আগে যে ব্যবহার করেছে সে নতুন একটা সাবান কিংবা নতুন শ্যাম্পুর শিশিটা রেখে যায়নি কেন।

বিরক্তির সঙ্গেই সেজন্যে জয়া চেঁচিয়ে ডাকল, ছুটকু, একটা সাবান দিয়ে যাবে ?

—ছুটকু ! আবার ডাকল সাড়া না পেয়ে।

একটু পরেই সাবানের প্যাকেট খুলতে খুলতে এল ছুটকু, দিয়ে চলে গেল, বেশ বিরক্তির সঙ্গে।

ছুটকু মানে শ্রীময়ী। এ বাড়ির ছোট মেয়ে। জয়ার ননদ।

ছুটকুর এই এক দোষ, সাড়া দেয় না। শুনল কি শুনল না, জানার উপায় নেই। অথচ বেশ শুনতে পেয়েছে, সাবানটা এনেও দিল। সাড়া দিতে কি অসুবিধে কে জানে। আসলে বিরক্তি, কাজ করতে হচ্ছে বলে নয়। বিয়ে হচ্ছে না বলে।

বিয়ের আগে মা-বাবা বেশ ভয় পেয়েছিল। অবিবাহিত ননদ আছে শুনলে মেয়ের বাপ-মা আঁতকে উঠবেই। জয়ারও ভয় ছিল। কিন্তু উপায় ছিল না বলেই রাজি হয়েছিলেন ওঁরা। জয়াও আপত্তি করেনি।

বিয়ের পর কিন্তু ছুটকুকে ওর ভালই লেগেছিল। সব সময় বৌদিভাই, বৌদিভাই, কাছে কাছে ঘুরত। জয়াও বেশ খুশি খুশি, একটা সঙ্গী তো, গল্পগুজব করা যায়। বিয়েতে পাওয়া দু'চারটে শাড়ি পরতে দিয়েছে, সেণ্ট ক্রিম শ্যাম্পু এমনকি কানের রিং পরতে দিয়েছে ওকে।

অথচ দিনে দিনে কেমন যেন একটা দূরত্ব গড়ে উঠল।

বোধহয় ওই একটাই কারণ, বিয়ে। কিন্তু সেটা তো জয়ার দোষ নয়। বোঝে না কেন ?

এই বয়সের মেয়েদের নিয়ে সত্যি বড় সমস্যা। জয়াকে নিয়েই কি ওর বাবা-মার কম দুর্ভাবনা ছিল। শ্রীময়ী নাম যখন রেখেছিল ছুটকুর, তখন নিশ্চয় ছেলেবেলায় দেখতে

ভালই ছিল। জয়া এসেও তো দেখেছে, দিব্যি চোখ টানে, একটা আলগা শ্রীও ছিল। যত বয়েস হচ্ছে সেটুকু দ্রুত উবে যাচ্ছে। এত সাজগোজ সত্ত্বেও। দোষের মধ্যে রঙটা একটু চাপা। ওখানেই ওর হার, ওখানেই জয়ার জিত।

বউভাতের পরের দিনই কে যেন রসিকতা করে শুনিয়ে দিয়েছিল।

শাশুড়ি তো প্রথমবার দেখতে যায়নি। ফিরে এসে ওরা প্রশংসা করছিল, নাকমুখচোখ, হাইট, কথাবার্তা, হাঁটাচলা, অনার্সে নম্বর।

শ্বশুরকে দমিয়ে দিয়ে শাশুড়ি নাকি বলেছিল, ওসব ছাড়ো তো, গায়ের রঙ কেমন।

আর তখনই, সুপ্রভাতও গিয়েছিল তো, সুপ্রভাত বলেছিল, থিন অ্যারারুট বিস্কুটের মতো। হাতটা ঢেউয়ের মতো করে দুলিয়ে বলেছিল, আর কি চুল।

তারপর থেকে আত্মীয়স্বজনদের কেউ এসে কথা প্রসঙ্গে যদি বলে ফেলেছে জয়া তো বেশ ফর্সা, অমনি সুকল্যাণ বলেছে, থিন অ্যারারুট।

বাঙালি ঘরের মেয়ের গায়ের রঙ যত চাপা হবে অন্যদিকের পাল্লা তো ততই ভারী করতে হয়। ছুটকুকে নিয়ে সেজন্যেই সমস্যা। দুশ্চিন্তা জয়ারও।

শ্বশুরের রিটায়ার করতে দেরি নেই। কি আছে না আছে একদিন আভাসে জানিয়েও দিয়েছেন ছেলেদের। পি এফে এমন কিছু জমেনি, এতকাল সুদের হারও ছিল যৎসামান্য। কেটেকুটে নিয়ে যা হাতে পেতেন তা থেকে নাকি আব জমানো সম্ভব ছিল না। ছেলেমেয়েদের স্কুলকলেজ, অসুখবিসুখ। ভরসা একমাত্র পেনশন। কিন্তু হাবেভাবে বোঝা যায় আসল ভরসা সুকল্যাণ।

জয়ার এখানেই আপত্তি, এখানেই আতঙ্ক। ও এখন এই বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হত।

শ্বশুর একদিন রাতের খাওয়ার সময়, ছেলেদের সঙ্গে খেতে বসতেন, ওইটুকুই দেখাসাক্ষাৎ, কথা বলা, দুঃখ, হেসে বলেছিলেন, একসময় চাইলেই ঘুষ পেতে পারতাম, অনেকেই নিত, নিইনি। স্টুপিড ছিলাম তো।

ছেলেরা চুপ করে ছিল। কোন কথা বলেনি।

জয়ার ভাল লেগেছিল। বাঃ, মানুষটা সৎ। অর্থ চিন্তায় এখন নিজেকে নামিয়ে আনতে চাইছে, হতাশায় স্টুপিড ভাবছে নিজেকে। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট-কষ্ট ভাব এসেছিল জয়ার।

শ্বশুরের জন্যে মায়াও হয়।

বলেছিলেন, সেদিনই, ছেলেরা কিছু বলল না দেখে নিজেই ব্যাখ্যা দিলেন। গাভমেন্ট যখন চায় লোকে ডিজঅনেস্ট হোক্...পেনশন তো আধা-মাইনে, লোকটা চালাবে কি করে তা তো ভাবে না।

সুকল্যাণ সায় দিয়ে বলেছিল, জিনিসের দাম তো বেড়েই চলেছে।

আর বেকার সুপ্রভাত হেসে উঠে বলেছে, চাকরি একবার পাই, ঘুষ নেওয়া কাকে বলে দেখিয়ে দেব।

সবাই হেসে উঠেছে। হাসির কথা হলেও জয়া হাসতে পারেনি।

শুধু ছুটকু টিপ্পনী কেটে বলেছে, সব চাকরিতেই কি ঘুষ আছে নাকি, তোর যেমন বুদ্ধি !

ছুটকু বড় একটা হাসে না। হাসির কোনও কথা হলে হেসে ওঠাও যেন অপরাধ। মেয়েটা কেমন যেন দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে, বাড়িতে থেকে নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায়। বিয়েটাই কি মেয়েদের সব, জয়া বুঝতে পারে না।

বাড়িটাও অদ্ভুত। সব ব্যাপারেই এক ধরনের গা ছেড়ে দেওয়া অবস্থা। এক সময়

ছুটকুর বিয়ের চেষ্টা অবশ্য হয়েছিল। কিন্তু আজকাল কত কি পড়া যায় শেখা যায়, কিছু একটা করলেও তো পারে। চাকরি ? চাকরি আর পাবে কোথায়, কে দেবে ! সেজন্যে সবাই ভাবে বিয়েটাই একমাত্র গন্তব্য। সাধারণ মেয়েদের সামনে আর কোন পথই বা আছে।

যথেষ্ট টাকা থাকলে হয়ত একটা বিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তার পরের জীবনও সেই অন্ধকারে লাফ দেওয়া। কতরকমই তো দেখছে শুনছে।

জয়ার নিজের জীবনই বা কি ! সুখী না অসুখী নিজেই বুঝতে পারে না।

পিঙ্কুকে খাওয়াতে বসিয়ে ছুটকুর কথা মনে এল। একটু রাগ এবং বিরক্তি ছিল। পিঙ্কুকে স্নান করানোর সময় ছুটকুকে ডেকে সাড়া পায়নি বলে। সাবানটা দিয়ে গেল এমন অবহেলার সঙ্গে যেন বাড়ির লোক নয়, জয়ার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

অথচ একসময় কত ভালবাসত। দু'জনে দু'জনকে।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম ছুটকুর আব্দার, ওর কসমেটিকসে ভাগ বসাত, কিছু মনে করত না জয়া। দু'চারটে শাড়ি পরতেও দিয়েছে, একেবারে দিয়ে দিয়েছে উপহারে পাওয়া কয়েকটা ভাল শাড়ি। ও নিজেই দিয়ে দিয়েছিল নাকি শাশুড়ি হাসতে হাসতে বলেছিল বলে, তা অবশ্য মনে নেই।

প্রথম রাগ সেই সেন্টের শিশি নিয়ে। সেন্টের শিশি তো টেবিলের ওপরই থাকত। সিনেমা যাওয়ার আগে সেজেগুজে এসে, তখন সাজত, ছুটকু ওখান থেকে সেন্ট নিত। জয়া কিছু মনে করত না।

কিন্তু একটা শিশি ছিল, আড়ালে আড়ালে রাখত জয়া। দামি বিলিতি সেন্ট। বিয়ের বাজার করতে গিয়ে ও নিজেই কিনেছিল। তখন অনেক খরচ হয়ে গেছে, বাবা একটু হাতটান শুরু করেছে, দামি কিছু কিনে ফেললেই মা বিরক্ত হচ্ছে, বাবার কাছে ধমক খাওয়ার ভয়ে, তবু জেদাজেদি করে জয়া কিনেছিল ওটা, নিউ মার্কেট থেকে, বেশ দামি।

ও জানত একবার ফুরিয়ে গেলে আর কোনওদিন কেনা যাবে না।

লুকিয়ে লুকিয়ে কৃপণের মতো ক্বচিৎ কদাচিৎ ব্যবহার করত, সুকল্যাণের সঙ্গে সিনেমা যাওয়ার সময়। একবার চীনে রেস্তরাঁয় খেতে গিয়েছিল, সেদিনও।

তারপর ধরা পড়ে গেল হঠাৎ। ছুটকু দেখতে পেয়েই ছুটে এল, দেখি দেখি।

শিশিটা নিয়ে নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, কোথায় পেলে ? দাদা কিনে দিয়েছে ?

রাগ চাপতে হয়েছিল জয়াকে।—না, বাপের বাড়ি থেকে এনেছিলাম, বিয়েতে দিয়েছিল।

একটু হেসে মিথ্যে করেই বলতে হয়েছিল, ভুলে গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ পেয়ে গেলাম।

ছুটকু বিশ্বাস করেনি বোধহয়। ভেবেছিল, ওর দাদা ভালবেসে বউকে কিনে দিয়েছে। রাগ সেজন্যেই।

—বিলিতি ? খুব দাম তাই না ? একটু থেমে বলেছিল, তবে আজকাল চেনার উপায় নেই, এত জাল বেরিয়েছে এসব।

মনে মনে জয়া তখন বলছে, আমার বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া, জাল তো হবেই।

ড্রেসিং টেবিলে দু'তিনটে সেন্টের শিশি পড়েই থাকত, কিন্তু তার পর ছুটকু মাঝে মাঝেই এসে বলত, তোমার সেই বিলিতিটা কই !

দিতে হত। ঢেলে নিয়েছিল কোনও শিশিতে, নাকি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিল, হঠাৎ একদিন ফেরত দিয়ে গেল, তলানি একটুখানি পড়ে আছে।

দেখেই অবাক হয়ে ও ছুটকুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তারপর বেশ রাগের গলায় বলেছিল, ওটা আর ফেরত দিচ্ছ কেন, তুমিই নিয়ে নাও।

নেয়নি, ঠক করে শব্দ হল, ওটা ছুটকুর রাগ, টেবিলে রেখে চলে গিয়েছিল সে।

আর জয়ার চোখে তখন জল এসে গেছে। মনে পড়ে গেছে, হাত খালি হয়ে আসা বাবার চোখেও যেন জল এসে গিয়েছিল, মার্কেটিং করতে গিয়ে মা-মেয়ে সব টাকা খরচ করে এসেছে শুনে। তখনও কত কি বাকি, বিয়ের রাতটাও।

এখন ছুটকুর ব্যবহার পছন্দ করে না ঠিকই, একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, কিন্তু মাঝে মাঝে মায়াও হয়।

ও তো একটা সাধারণ মেয়ে, না রূপ না গুণ। চেষ্টা করলেও চাকরি পাবে কোথায়। যথেষ্ট বয়েসও হয়ে গেছে। জীবনটা কাটাবে কি করে। ও তো আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধূপ বিক্রি করতে পারবে না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এগরোল ভাজতে পারবে না। সেসব করলে তো লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাবে।

স্নান করিয়ে এনে পিঙ্কুকে খাওয়াতে বসিয়েছিল। নিজেরই খিদে পেয়ে গেছে, স্নান হয়নি, তাছাড়া টুকিটাকি সংসারের কিছু কাজও বাকি। আর পিঙ্কুকে খাওয়ানো মানে...

ছুটকু আগে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে গান শুনত, আজকাল শোনে না। সবকিছুই যেন ওর কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে।

জয়া হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখতে চাইল। ওর অনেক টাকা হয়েছে। অনেক টাকা। আঃ, সত্যি যদি তা হত, ও মনে মনে ভাবল, তা হলে আর টাকার জন্য ছুটকুর বিয়ে আটকাবে না। ওর বিয়ের জন্যে যা লাগে জয়া দিয়ে দেবে। তাহলেই ও আর ছুটকু থাকবে না, আবার শ্রীময়ী।

ছুটকুর জন্যে মায়া, নাকি নিজেই পরিত্রাণ চাইল ? বিয়ে দিতে পারলে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া।

শাশুড়ি একদিন বলেছিল, তোমাদের কোনও গা নেই, শ্বশুরের না হয় বয়েস হয়েছে, তোমরা তো একটু চেষ্টাচরিত্তির করতে পারো।

যেন দোষ জয়ার। দেখতে তো পাচ্ছে ছেলেকে নিয়ে ও কি রকম নাজেহাল। সুকল্যাণকে যে অফিস যাওয়ার সময় নিজের হাতে খেতে দেবে তারও উপায় নেই। রান্নার লোকের ওপর ছেড়ে দিয়ে ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যেতে হয়। আর সুকল্যাণ ন'টার মধ্যে গিয়ে অফিসের বাস ধরে, ফেরে ক্লান্ত হয়ে সন্ধের পর।

দু'একবার বিজ্ঞাপন দিয়েছিল ছুটকুর জন্যে। কিছুই তো হল না। কখনো পছন্দ হয় না, কখনো টাকাপয়সায় আটকায়। দু'এক জায়গায় ছুটকুর কিংবা শাশুড়ির আপত্তি।

ছুটকুর বিয়ে দিতে পারলে ও নিজেই তো নিস্তার পেতে পারত।

বিয়ের পর সব মেয়েরই ভিতরে একটা স্বপ্ন থাকে, স্বামী পুত্র নিয়ে একটা পৃথক সংসার। জয়ারও ছিল। ভেবেছিল কোনও একদিন সুকল্যাণকে নিয়ে অন্যত্র উঠে যেতে পারবে। এখন আর ভাবে না। আর্থিক অসুবিধে নেই, কিন্তু জেনে গেছে সুকল্যাণ কোনওদিনই এই সস্তা ভাড়ার বাড়িটা ছেড়ে যেতে চাইবে না। জয়া নিজেও বোধহয় কেমন একটা মায়ায় জড়িয়ে গেছে। কিংবা মায়া নয়, অভ্যাসে।

প্রথম যেদিন সুকল্যাণ ওর মাইনের টাকাটা জয়ার সামনেই শাশুড়ির হাতে তুলে দিয়েছিল সেদিন বুকের কোণে একটু খিচ করে লেগেছিল ঠিকই, তবু মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, আমি তো এখন নতুন বউ, এতদিন তো মাকেই দিয়ে এসেছে, হয়ত লজ্জা।

শাশুড়ি এদিকে এমন ভাব করত যেন কত মডার্ন, কিন্তু মাইনের টাকাটা কই ওর হাতে দিয়ে তো বলতে পারেনি, জয়া, তুমিই রাখো। আমি চেয়ে নেব।

ভেবেছিল কোনও একদিন বলবে, কিংবা সুকল্যাণই ওর হাতে তুলে দিয়ে বলবে, যা লাগে মাকে দিয়ে দিও।

বলেনি। স্বামীর উপার্জনের টাকাটা রাখার অধিকারটুকুও না থাকলে ভিতরে ভিতরে নিজেকে কত ছোট লাগে ওরা বোধহয় বোঝেও না।

আর সেজন্যেই পিঙ্কুকে স্নান করাতে গিয়ে সাবান ফুরিয়ে গেছে দেখে ছুটকুকে ডেকে নতুন সাবান চাইতে হয়। প্রথম প্রথম চাইতেও লজ্জা হত, শাশুড়ি না বলে বসে, এই তো সেদিন বের করে দিলাম একটা।

সেকথা ওরা বলেনি কোনওদিনই, তবু একটা আশঙ্কা ছিলই। তাই চাইতে ভয় পেত। এখন আর পায় না।

সুকল্যাণ যেবার প্রোমোশন পেল, প্রোমোশনের পর কিছু বাড়তি মাইনে, সুকল্যাণ সেই প্রথম বাড়তি মাইনেটা জয়াকে দিয়েছিল, রেখে দাও।

তারপর সুকল্যাণ যে টাকাটা মাকে দিত সেই টাকাটাই দিতে গেল। জয়ার কৌতূহল, শাশুড়ি কিছু বলে কিনা শোনার জন্যে সুকল্যাণের পিছনে পিছনে গেল। ওরা তো জানত প্রোমোশন হয়েছে, মাইনে বেড়েছে। জয়ার একটু ভয়ও হচ্ছিল।

দেখল, শাশুড়ি টাকাটা নিল, গুনল না। জিগ্যেস করল, কত ?

সুকল্যাণ কি বলল, শুনতে পেল না। কিন্তু শাশুড়ি বোধহয় অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকাল।

তারপর সহজ হবার চেষ্টা করে চুপচাপ নিয়ে গিয়ে আলমারিতে তুলে রাখল। সেদিন খুশিতে মন ভরে গিয়েছিল জয়ার। সুকল্যাণ এটুকু অন্তত করতে পারল বলে। এখন আব ওসব ভাবে না।

জেনে গেছে এই বাড়িটাই ওর বর্তমান, এটাই ওর ভবিষ্যৎ।

॥ ২ ॥

এ রকম সুযোগ আগে কখনো আসেনি। তাই খবরটা শুনেই বাপের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল জয়ার।

বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। পিঙ্কুর স্কুল আছে, কে জি হলেও স্কুল তো, শুধু শুধু কামাই করা চলে না।

পিঙ্কু হবার পর থেকে এই একটা পিছুটান। হেসে ফেলল জয়া, পিঙ্কু যখন হয়নি তখনই বা কত ছুটি পেয়েছে! বিয়ের আগে ভাবত, বিয়ের পরের জীবনটা ছুটি। সব মেয়েরাই ভাবে হয়ত। বাপের বাড়ির বাধানিষেধ, কড়া শাসন, ইলা সুস্মির সঙ্গে পার্কের কোণে ফুচকা খেতে গিয়েও এপাশ ওপাশ তাকানো, বাড়ির কেউ না দেখে ফেলে। কলেজে ভর্তি হয়ে সেই প্রথম মাকে জানিয়ে ইলাদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া। তখন ভেতরে ভেতরে রাগ হত। ক্ষোভ। সমস্ত বাড়ির বিরুদ্ধে। সব মেয়েরাই কত স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি নিয়ে কারো কোনও মাথাব্যথা নেই, হেসে উড়িয়ে দেয়, যত ঘেরাটোপ জয়াকে ঘিরে।

একদিন সুস্মি বললে, চল জয়শ্রী, একদিন চীনে রেস্তরাঁয় সবাই মিলে খাব।

ইলা হেসে বললে, তুই খাওয়াস তো যাব।

—ইল্লি! যার যার নিজের নিজের, কত আর লাগবে।

ওরা টাকার কথা বলছিল, অথচ টাকাটাই জয়ার কাছে বড় কথা নয়। ও জানত টাকা চাইলে হয়ত পেয়ে যাবে। বাবা না দিক মা দেবে।

কিন্তু ওর সমস্যা অন্য।

ও বলে বসল, না ভাই, মাকে জিগ্যেস না করে যেতে পারব না।

ইলা সুস্মি দু'জনেই হেসে উঠল। ইলাকে দেখে মনে হয় ও কাউকেই তোয়াক্কা করে না, একটু জেদিও আছে। ইলাই হাসতে হাসতে বললে, দেখালি জয়শ্রী, কারো সঙ্গে প্রেম করতে গেলেও তুই শেষে ছেলেটাকে বলে বসিস না যেন, মাকে জিগ্যেস করে আসি।

তিনজনই হেসে উঠেছিল। আর অপ্রতিভ মুখ নিয়ে জয়া বলেছিল, দূর, আমার দ্বারা প্রেম ফ্রেম হবে না।

সুস্মি হেসেছিল—ঠিক বলেছিস, তোর দ্বারা প্রেম হবে না।

আর ইলা বলেছিল, তার চেয়ে সুস্মি তুই একটা প্রেম করে দেখিয়ে দে না ভাই, তবু প্রেম কাকে বলে দেখতে পাব!

তিনজনই আবার হেসে উঠেছিল।

জয়ার অপ্রতিভ ভাবটা তখন কেটে গেছে, ঠোঁট টিপে বলেছিল, অঞ্জন? লেগে পড় না।

কলেজে যাতায়াতের পথে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছেলে, তার বন্ধুরা অঞ্জন বলে ডেকেছিল বলেই নাম জানতে পেরেছিল, সে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকত সুস্মির দিকে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে সুস্মি, তার দিকে তাকাবে না তো কার দিকে তাকাবে। ছেলেটা সাহস করে একদিন সুস্মিকে জিগ্যেস করেছিল, কটা বাজে। ওর বন্ধুদের হাতে ঘড়ি ছিল তা সত্ত্বেও, সুস্মিকেই।

সুস্মি দারুণ স্মার্ট, ঝট করে বলেছিল, বাজেনি। বলেই গটগট করে এগিয়ে এসেছিল।

বেশ খানিকটা এসে হাসতে হাসতে সুস্মি বলেছিল, ভুল বললাম, না রে! বললে হত, আপনার বারোটা।

মনের ওপর আদৌ কোনও ছাপ ফেলেনি এমন মজার ঘটনা মাঝে মাঝেই যে ঘটেনি তা নয়। কিন্তু ওসব নিয়ে জয়ার কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না।

একটা কথাই মনে হত, স্বাধীনতা নেই।

দিব্যি ইচ্ছেমতো ইলা সুস্মির সঙ্গে ঘুরব বেড়াব, সিনেমা দেখব, নিউ মার্কেটে। ব্যস, তা হলেই যথেষ্ট। কোনও কিছুর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে না।

বাড়িটা এক একসময় অসহ্য লাগত।

তখন একটা কথাই মাঝে মাঝে মনে হত। বিয়ে। স্বপ্ন দেখত বিয়ে হলেই এই শাসন, এই জবাবদিহি থেকে মুক্তি। ছুটি, অফুরন্ত অফুরন্ত ছুটি। আর স্বাধীনতা।

বিয়ে সম্পর্কে কত ভুল ধারণাই না ছিল। হয়ত সব মেয়েরেই থাকে।

এখন বুঝতে পারছে, হাড়ে হাড়ে। পিঙ্কু হবার পর থেকে তো আরো। একবছর দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই কে জি স্কুলটাতেই দিতে হয়েছে। পরের বছর সময় থাকতে ফর্ম নিয়ে কোনও ভাল স্কুলে যদি ঢোকাতে পারে তবেই নিশ্চিন্তি। স্কুলবাস পেয়ে গেলে আর এই দুর্ভোগ থাকবে না। বাসে দু'বার আসা যাওয়া পোষায় না বলেই বসে থাকা। অনেকেই থাকে।

ভাগ্যিস রান্নার লোকটা পেয়েছে, সে-ই সব রেডি করে শাশুড়িকে ডেকে দেয়। শাশুড়ি যত পারে আদরের ছেলেকে সামনে বসে খাওয়াক।

—সুকুকে আরেকটু মোচার ঘণ্ট দাও, ও ভালবাসে।

কে কি খেতে ভালবাসে এতদিনে সবই জানা হয়ে গেছে জয়ার। সেটা বলে দেওয়ার দরকার হয় না। মনে মনে ভেবেছে, ভালবাসার আর জিনিস পেল না আপনার ছেলে?

মোচা ? মোচা ছাড়ানো যে কি হাঙ্গামা, হাতে দাগ হয়ে যায়, তোলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া, সকালে অফিস যাওয়ার সময় অত ধীরেসুস্থে মোচার ঘন্ট খাওয়ার সময় আছে নাকি সুকল্যাণের ? সে সময় থাকলে তো সুকল্যাণই পিঙ্কুকে স্কুলে পৌঁছে যেতে পারত। যখন রান্নার লোক ছিল না তখনও তো জয়াকেই পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। তবে শাশুড়িকে দোষ দেবে না, সমানে হাত লাগিয়েছে। জয়াকেই বরং ফিরে এসে বলতে হয়েছে, সরুন মা, আমি করে নিচ্ছি।

বিয়ের পর পরই সুকল্যাণের মাকে মা আর বাবাকে বাবা বলতেই কি কম অস্বস্তি হত। তারপর কেমন করে যেন আপনাআপনি অভ্যাস হয়ে গেল।

সুকল্যাণের মামামামি যেবার এল, এসে জিগ্যেস করেছিল, বৌমা, বাবার খবর কি, কেমন আছেন ?

জয়া বলে বসল, ভালই তো আছেন, ওই তো বারান্দায় কাগজ পড়ছেন।

মামা হেসে উঠে বলেছিল, আরে ও বাবা নয়, ও বাবা নয়, তোমার বাবার কথা জিগ্যেস করছি।

এই মামা বিয়েতে গিয়েছিল, বাবার সঙ্গে খুব গল্প জমিয়েছিল। তারপরও একবার দেখা হয়েছিল এ বাড়িতে।

মনে পড়লে হাসি পায় জয়ার। এখন বাবা মা বলতে তো এরাই। নিজের বাবা মা কত দূর হয়ে গেছে। যেটুকু আছে সে শুধু মনের মধ্যে।

মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় কতকাল বাপের বাড়ি যায়নি। বুকের ভেতরটা এক একসময় ছটফট করে ওঠে, ইচ্ছে হয় কাউকে কিছু না বলে বাসে উঠে বসি। এখন মনে হয় ওখানেই অফুরন্ত ছুটি। অবাধ স্বাধীনতা। অনর্গল কথা বলে বলে গল্প করে করে শেষ আর হয় না। গতবার যখন গিয়েছিল জয়া, রাত একটার আগে কেউ ঘুমোতে যায়নি। শুধু কথা আর কথা।

একদিন পিঙ্কুকে স্কুল থেকে নিয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে, একটা বাসের কন্ডাক্টর উল্টো দিকে বাস থামিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'মৌলালি মৌলালি, শিয়ালদা.' সঙ্গে সঙ্গে জয়ার বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল, কেমন একটা ব্যথার মোচড়, মুহূর্তে ইচ্ছে হয়েছিল, ছুটে গিয়ে উঠে পড়ে, পিঙ্কুর হাত ধরে একটা টানও হয়ত দিয়েছিল, পিঙ্কুকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সারাক্ষণ কানে বাজছে, 'মৌলালি, মৌলালি'। পদ্মপুকুর তো কাছেই, সি আই টি রোড, ওই তো গলিটা দেখতে পাচ্ছে, পানের দোকানটা। মৌলালিতে নেমে একটা রিক্সা নিলেও চলে যাওয়া যায়।

অথচ যাওয়া হয় না। কি করে যাবে, সংসার আছে না। এর নাম সংসার। পিঙ্কু, পিঙ্কুর স্কুল।

পিঙ্কুর স্কুলের সামনে রোয়াকে বসা ক্লাবে একদিন বাপের বাড়ির কথা উঠেছিল। মীনাই বোধহয় কথাটা তুলেছিল।

আর বিল্লুর মা বলে উঠেছিল, যাই বল ভাই, বাপের বাড়ির মতো জিনিস হয় না। দিব্যি ফুর্তিসে ঘুরে বেড়াও, ঘোমটা দেবার বালাই নেই। আর এখানে শালা এই গরমে সব সময় একে দেখে ঘোমটা দাও ওকে দেখে ঘোমটা দাও।

বিল্লুর মা যে ঘোমটা দেয় তা জানত না ওরা। মীনাও অবাক হয়েছিল।

মীনা হেসে বলেছিল, প্রথম প্রথম দিয়েছিলাম, তারপর আর দিইনি, শাশুড়ি বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

জয়াকে এসব একেবারেই করতে হয়নি। সেজন্যেই তো মীনা শুনে বলেছিল, তোর শাশুড়িটা তো দিব্যি মডার্ন রে।

নতুন বউ, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শ্বশুরকে চা দিতে যাবার আগে অনভ্যস্ত হাতে ঘোমটাটা কপালের দু' আঙুল ওপর পর্যন্ত টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকেছে, সবে দু'পা এগিয়ে চায়ের কাপ নামাতে যাবে, শাশুড়ি কোথায় ছিল, এসে দেখেই বলে উঠেছে, খুব হয়েছে, তোমাকে আর ঘোমটাটোমটা দিতে হবে না। এ বাড়িতে তোমায় বউ সেজে থাকতে হবে না।

শাশুড়িকে সেদিন কি ভাল যে লেগেছিল জয়ার। ও মনে মনে ভেবেছিল, এত ভাল, এত ভাল, ও এ বাড়ির মেয়ে হয়ে যাবে।

হওয়া যায় না। মাঝে মাঝেই হাঁপিয়ে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাপের বাড়িটা। ওই তো বাস থেকে নেমে পেট্রোল পাম্পের পাশ দিয়ে রাস্তাটা, তারপরই ডান দিকের গলি, কাঠগুদাম পার হলেই দোতলার বারান্দা দেখা যায়। বারান্দায় দাঁড়াতেও এখন ভয় হয়, ঝোলা বারান্দা তো, আর এতকালের বাড়ি, সময়মত সারানো হয় না। দেয়ালের পলেস্তারা খসে খসে গিয়েছিল, সেটুকু সারাতে গিয়েই বাবার হাত খালি।

তবু বিয়ের পর ছুটকু যেদিন জিগ্যেস করেছিল, 'তোমাদের নিজেদের বাড়ি, না ভাড়া ?' সেদিন উত্তর দেবার সময় বোধহয় একটু গর্বও হয়েছিল। চাপা গর্বের সঙ্গেই বলেছিল, না, ভাড়া কেন হবে ? যেন ওটা আবার জিগ্যেস করার কথা নাকি।

বাবার ঠাকুর্দা করে গিয়েছিল, জয়া তো নিজের ঠাকুর্দাকেই দেখেনি। শুনেছে, বাবার কাছেই শুনেছে, সেই ধুরন্ধর প্রপিতামহ কোন সাহেব কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সে চাকরিতে ঘুষফুসের বালাই ছিল না, বেতনও যৎসামান্য, তবু সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল, কিভাবে যেই এই বাড়িটা বানিয়ে ফেলেছিলেন।

বাবা একদিন ক্ষোভ করে বলেছে, আমরা এত মাইনে পেয়েও বাড়িটা সারিয়ে তুলতে পারলাম না। দাদু কি করে যে বাড়ি করেছিল !

গলায় একটু হা-হুতাশ ছিল, মা এক ঝটকায় উত্তর দিয়ে ছিল, তাঁর মেয়ে ছিল না। বিয়ে দিতে হয়নি মেয়েদের।

শুনে জয়ার খুব খারাপ লেগেছিল। তখনো তো বিয়ে হয়নি, বিয়ের ব্যবস্থাই করে উঠতে পারছিল না বাবা। সেজন্যে কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। মা'র ওপর একটু রাগও হয়েছিল। আমি তোমাদের বোঝা হয়ে আছি, তাই না ?

পরে ভেবে দেখেছে, মা কিছু অন্যায় বলেনি। সত্যি তো, জয়ার আগেও বাবাকে দিদি আর মেজদির বিয়ে দিতে হয়েছে। দিতে পেরেছেন এটাই তো অনেক। এমনকি জয়ারও বিয়ে দিয়েছেন, ভালই দিয়েছেন, খারাপই বা বলে কি করে। খারাপ যদি কিছু হয়ে থাকে, সে ওর ভাগ্য।

—নিজেদের বাড়ি ? তা হলে ওভাবে থাকো কেন ? ভেঙেচুরে একেবারে নতুন করে নিলে তো পারো। একটু থেমে বলেছে ছুটকু, অতখানি জায়গা, অথচ...

জয়া মুখের ওপর বলতে পারেনি, ছুটকুরা ভাড়া বাড়িতে থাকে জেনে ওর প্রথম প্রথম কি খারাপ লাগত। ভাঙা হোক, নোংরা হোক্, নিজের বাড়ি অন্য জিনিস। ওর শ্বশুররা ভাড়াটে একথা শুনতেও খারাপ লেগেছে, বলতেও লজ্জা। দিদিমেজদির বিয়ের কথাবার্তা শুরুর আগেই বাবা জেনে নিত পাত্রপক্ষের নিজেদের বাড়ি কিনা। ওটাই একরকমের ইনসিওরেন্স, ছেলের মাথাগোঁজার আশ্রয়টুকু থাকলে অসুখে পঙ্গু হয়ে পড়ুক, অফিসে ছাঁটাই হোক, ছেলে কিছু একটা করে চালিয়ে নিতে পারবে।

জয়ার বিয়ের সময় অত বাছবিচারের সময় ছিল না অর্থাৎ অবস্থা ছিল না। তাছাড়া জয়াকে কেউ জানতেও দেয়নি।

জয়া তো ভেবে নিয়েছিল সুকল্যাণদের নিজের বাড়ি। তাই বেশ খুশি হয়েছিল।

ওদের নিজেদের বাড়ির তুলনায় বেশ ঝকঝকে, ঘরগুলোও বড় বড়, কোথাও পলেস্তারা ওঠেনি, শ্যাওলা জমেনি দেয়ালে, জলে ভিজে ভিজে সিঁড়ির ধাপগুলো ক্ষয়ে যায়নি। বাপের বাড়িতে সবাইকে রীতিমত সাবধানে ওঠানামা করতে হয়। বাবা উঠত সিঁড়ির জং ধরা রেলিং ধরে ধরে। মায়ের ধমক খেয়ে ওই অভ্যাসটা করতে হয়েছিল বাবাকে।

হাতে ভিজে ছাতা নিয়ে বাবা অফিস থেকে ফিরে, ভিজে জুতো, রেলিং না ধরেই উঠছিল।

—খুব মস্তান হয়ে গেছ দেখছি। ওপর থেকে দেখতে পেয়ে মা ধমক দিয়েছিল। বলেছিল, রেলিং ধরে ওঠো।

বাবা অপ্রতিভ হাসি হেসে বলেছিল, মরচে ধরে ওগুলো যা নোংরা হয়ে আছে, হাত দিতে ইচ্ছে করে না।

—সে তো তোমার জন্যেই, এত বছর ধরে একটা কথাই শুনে এলাম, পরের বছর সারাব।

বাবা আর কোনও কথা বলেনি। অসহায় বাবাদের কত কথাই না শুনতে হয়। বাইরে তো বটেই, ঘরেও।

তবু নিজের বাড়ি।

শরিকি বাড়ি। ঠাকুর্দারা ছিল দু'ভাই, তাই বাড়িটা আধাআধি পার্টিশন হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। জয়া জন্মে থেকেই এই হাফ পোর্শেন দেখে আসছে।

বিয়ের সময় ছাদে দু'বাড়ি জুড়েই মণ্ডপ হয়েছিল, মানে ওদিকের পোর্শেনে অতিথিঅভ্যাগতদের বসানোর ব্যবস্থা, ছাদে দেয়াল ওঠেনি কোনওদিন, তাই লোক খাওয়ানো হয়েছিল ছাদেই।

ছুটকুরা বোধহয় সেজন্যেই ভেবেছিল গোটা বাড়িটাই ওদের। 'অতখানি জায়গা'। ছুটকুর মুখে ও কথাটা শুনে বেশ মজা লেগেছিল জয়ার, ইচ্ছে করেই ভুল ভাঙেনি। ভেঙেচুরে তাকে কেন ঝকঝকে নতুন বাড়ি বানাতে পারেনি ওরা, তাও বলেনি।

শ্যাওলা ধরা পলেস্তারা খসা বাড়িটার জন্যে একটু একটু লজ্জা-লজ্জা করে। কোথায় যেন সুকল্যাণদের এই ঝকঝকে ভাড়াবাড়িটার কাছেও ছোট হয়ে গেছে। এই সাজানো গোছানো বাড়িটার কাছে ওর বাপের বাড়ি হীনম্মন্যতায় ভুগছে। বাপের বাড়ির এখানে ওখানে তার টাঙানো, কাপড় শুকোচ্ছে, কোথাও গামছা ঝুলছে। কলতলায় পিছল, দরজার কাঠ পচে গেছে, টিন সেঁটে দেওয়া। রান্নাঘর ঝুলে ধোঁয়ায় আলকাতরা হয়ে আছে, তিন বছর আগে একবার চুনকাম হয়েছিল, এলামাটি রান্নাঘরে। ও সব দিয়ে কি দারিদ্র্য ঢাকা যায়।

তবু বাপের বাড়ি মানে বাপের বাড়ি। এক একসময় প্রাণ হু হু করে ওঠে।

বাস কন্ডাকটরের মুখে মৌলালি শুনে মনটা বিষাদে ভরে গিয়েছিল। আরেকটু হলেই হয়ত ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠে পড়ত। তারপর ফিরে এসে কি শুনতে হত কে জানে।

ভাগ্যিস যায়নি। ফিরছে না দেখে এরা হয়ত থানা-পুলিশ করে বসত, কিংবা হাসপাতালে ছোটাছুটি। ভাবত অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

ছুটকু কিংবা শাশুড়ির কথা তো অন্য, একবার বাপের বাড়ি যাবে বায়না ধরেছিল, তখন পিঙ্কুর ছুটি, সুকল্যাণই বলে বসল, ওই ভাঙা বাড়িটায় কি আছে, এই তো দু'মাস আগে ঘুরে এলে।

একটু থেমে বলেছিল, আমার তো দম বন্ধ হয়ে যায়।

—তোমাকে তো যেতে বলিনি। কি আছে সে আমি বুঝি।

ব্যস্, এর বেশি আর কি বলবে। বাড়ির বউকে এর বেশি বলতে নেই।

সমস্ত রাগ ভেতরে ভেতরে চেপে গিয়েছিল।

বিল্লুর মা যে কেন কথায় কথায় 'শালা' বলে ফেলে, ওদের রুচিতে বাধে বটে, মেয়েদের মুখে এ-সব কথা উচ্চারণ করা এক ধরনের নোংরামি, নিজেদের মধ্যে সে-সব কথা মীনার সঙ্গে আলোচনা করেছে, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না, কতখানি মানসিক নির্যাতন বিল্লুর মাকে সহ্য করতে হয়, অতবড় বাড়িতে থেকেও, অত লম্বা রাস্তা-দেখা বারান্দা সত্ত্বেও তার দমবন্ধ হয়ে আসে বলেই না রাগ আর গালাগালির জানলা খুলে দিয়ে নিশ্বাস পেতে চায়।

—তোদের সব বাপের বাড়ি কলকাতায়, দিব্যি আছিস।

বিল্লুর মা একদিন মীনাকে বলেছিল, হয়ত জয়াকেও।

জয়া কিছু বলতে চায়নি। বিল্লুর মা বলেছিল, আমার ভাই বহরমপুর। যেতে আসতেই দুটো দিন, যেতে না যেতে ফেরার কথা মনে পড়ে যায়।

জয়া বলতে পারেনি, কাছে থেকেও লাভ হয় না। বাপের বাড়ি যত কাছেই হোক, বিয়ের পর সেটাই হয়ে যায় সবচেয়ে দূরের জায়গা। বিয়ের মন্ত্র তো মোলায়েম করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে-কথাটাই বলিয়ে নেয়।

অথচ বিয়ের আগে সব মেয়েই ভাবে এত যে বাধানিষেধ, কড়া শাসন, বারান্দায় দাঁড়াতে না-পাওয়া, একবার বিয়েটা হতে দাও না, তখন একেবারে স্বাধীন। সারাজীবনের মুক্তি।

সেজন্যেই জয়ার মুখচোখে একঝলক আনন্দ দেখা দিয়েছিল। এমন সুযোগ আগে তো কখনো আসেনি। খবরটা শুনেই বাপের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল।

বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল মুখে।

পিঙ্কুর স্কুল। তা থাক না।

সুকল্যাণ রসিকতা করে বললে, কি ব্যাপার, এত খুশি খুশি ? আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি সঙ্গে যাবার বায়না ধরবে।

বিষণ্ণ মুখে সুকল্যাণই বললে, ওরে বাব্বা, এক মাসের হোটেল চার্জ, তার ওপর প্লেনের ভাড়া, যাতায়াতের। ফতুর হয়ে যাব।

প্লেনে কখনো চড়েনি জয়া, ভেতরে ভেতরে একটা চাপা ইচ্ছে আছে কিনা তাও জানে না। তবু সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই যেতে চাইত। মীনা কিংবা বিল্লুর মায়ের কাছে গল্প করে বলতে পারত। বাবা-মা শুনে তো দারুণ খুশি হত। সব বাবা-মা মেয়ের সুখ যাচাই করে এই সব দিয়ে। মেয়ের সুখে সুখী হয়। কিছু বোঝে না ওরা।

সুকল্যাণও এর আগে কখনো প্লেনে চড়েনি। ওকে খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। প্লেনে চড়বে, ভাল হোটেলে থাকতে পাবে বলে, নাকি অফিস ওকে এই প্রথম একটা বড় দায়িত্বের কাজ দিল বলে, জয়া বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ওর মুখ দেখে কেমন মনে হল সুকল্যাণ ভিতরে ভিতরে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কেন কে জানে।

জয়া হাসতে হাসতেই বললে, প্লেনে চড়তে তোমার ভয় করবে না ?

—দূর, ভয় কিসের ! সুকল্যাণ হেসে উঠল এমনভাবে যেন জয়ার ভয় ভাঙিয়ে দিতে চাইছে। বললে, আমাদের অফিসাররা তো হামেশাই যাচ্ছে আসছে। বিলেত আমেরিকাও। এ তো দিল্লি।

জয়া আদৌ ভয় পায়নি। ভয় পাবে কেন, কত লোকই তো যাচ্ছে আসছে। ও তো তখন মনে মনে ভাঁজছে কথাটা কি করে পাড়বে।

জয়ার শোনা হয়ে গেছে, এখন চেপে রাখা ইচ্ছেটা বলার সুযোগ খুঁজছে।

তবু সুকল্যাণকে বললে, আগে বাবাকে-মাকে বলো।

এ-রকম একটা খবর টাটকা থাকতে থাকতে ওদের না বললে, বাসী হয়ে যাবার পর শুনলে শাশুড়ি কিংবা ছুটকু তো বলে বসবে, অফিস থেকে ফিরেই তো বউকে বলতে পেরেছিস, এতক্ষণে আমাদের জানানোর সময় হল।

ওদের জানার আগে সুকল্যাণের পোশাক-আশাক গুছিয়ে দেবে কি করে। ওরা কেউ দেখলেই তো প্রশ্ন করবে। —কি ব্যাপার, কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ নাকি ?

শ্বশুর এ-সময় বারান্দার ডেকচেয়ারে বসে কাগজ পড়েন। সকালে অত খুঁটিয়ে পড়া হয় না। এ-পাড়ায় খবরের কাগজ এমনিতেই এসে পৌঁছয় দেরিতে, কিংবা ওটা অজুহাত, আসলে ওই হকার ছোকরাটাই আসে দেরিতে।

আগে যখন সুপ্রভাত ছিল, তখন কাগজ আসার পর কারো হাত দেবার অধিকার ছিল না। বেকার ছিল তো, তাই তার সময়ের বড় অভাব।

তার অবশ্য কাগজ পড়া মানে শুধু খেলার পাতাটা। প্রথম পাতা ভাল করে চোখ বুলিয়েও দেখত না। —কি যে পড়ো তোমরা ওসব, শুধ পলিটিক্স আর পলিটিক্স। কতকগুলো মূর্খ কি বলছে না বলছে তা জেনে কি লাভ। যারা মানুষ চেনে না তারা আবার সমাজ চিনবে, দেশ চিনবে !

জয়া শুনে ঠোঁট টিপে হাসত।

একদিন বলেছিল, কাল তো মায়ের কাছে টাকা নিয়ে খেলাটা দেখেই এলে, আজ আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার কি আছে ?

সুপ্রভাত অবাক হয়ে চোখ তুলেছিল, বাঃ দেখব না, নিজের চোখে যেটা দেখলাম অফসাইড, সেটা এরা কি বলছে দেখব না ?

জয়া হেসে ফেলেছিল। আশ্চর্য, নিজের চোখকেও কেউ বিশ্বাস করে না। কাগজের লেখা তার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে পারে, নিজের চোখকেই তখন আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হবে না। আর নয়ত তর্ক জুড়ে দেবে, রেগে যাবে, নিজের মনের মতো কথা না হলেই বলবে, ওরা সব মিথ্যে কথা লেখে।

ভাই বেকার বলে তার ওপর সুকল্যাণের একটা দুর্বলতা ছিলই, লজ্জাও। লজ্জা অক্ষমতার, নিজে তার কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারছে না বলে। সেই অক্ষমতার জন্যেই একটু স্নেহের চোখে দেখত। স্নেহ মানুষকে কতকগুলো অধিকার দিয়ে দেয়, তার তখন যুক্তিবুদ্ধি থাকে না। ভাবে অধিকার তারই। অর্জিত কিংবা প্রাপ্য।

সুকল্যাণকে অফিস বেরিয়ে যেতে হয় সকাল-সকাল। ও সেজন্যেই ঘোরাঘুরি করে, এক ফাঁকে বাথরুম থেকে আসে, দাড়ি কামিয়ে নেয়, কতক্ষণে আদরের ভাই কাগজটা হাতছাড়া করে।

একখানাই কাগজ। তাছাড়া সুকল্যাণের হাতে অত সময়ও নেই, ঝটপট দেখে নিত চোখ বুলিয়ে। তারপর জয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে, যাও, বাবাকে দিয়ে এসো।

নিজে গিয়ে সেটুকু আর দিয়ে আসতেও পারত না। অথচ জয়ার তখন তাড়াহুড়ো, পিঙ্কুকে তৈরি করে নিয়ে স্কুলে পৌঁছতে হবে। সুপ্রভাতকে দিয়ে সেটুকু কাজও হবার নয়। দু'দিন জ্বর জ্বর হয়েছিল, ছুটকুকে দিয়ে পাঠিয়েছিল, যাও না ভাই, ওর ক্লাস কামাই হবে। ছুটকু গিয়েছিল নিতান্তই অনিচ্ছায়। তারপর থেকে আর বলে না।

বাড়িটাই অদ্ভুত। দু'ভাইয়ের কেউই বাজার যাবে না। সময় নেই। আসলে সুপ্রভাতকে কেউ বাজার পাঠাতেই চাইত না বোধহয়। একদিন পাঠিয়েছিল, ফিরে এসে সে কি রাগ, মা'র ওপর রেগে গিয়ে বলেছিল, অতশত হিসেব দিতে পারব না।

বেকার ছেলে, হাতখরচের জন্যে কিছু সরাবে সে তো জানা কথা। তার আবার অত হিসেবনিকেশ কি। জয়া ওর রাগ দেখে হেসেছিল মনে মনে।

নিত্যদিনের বাজার তাই শ্বশুরই করেন। কিন্তু তার আগে কাগজটা একদফা পড়া চাই। সন্ধেবেলায় ফিরে এসে ওই বারান্দায় বসে বাকিটুকু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

দুপুরে ছুটকু আর শাশুড়ি। পাখার হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো কাগজখানা নিয়ে ভাঁজ করে তুলে রাখার কাজ জয়ার, শ্বশুর চাইবেন, সুকল্যাণও কোনও কোনওদিন কিছু একটা দেখতে চায়, না পেলেই হুলস্থুল। সেই ফাঁকে যদি ইচ্ছে হয়, আগ্রহ থাকে, তবে একটু চোখ বোলায় জয়া। কাগজ পড়ার নেশাটাই চলে গেছে ওর।

এখন আর সুপ্রভাত নেই, কিন্তু ওর সময়ও নেই।

ওর কাজ এখন শুধু কাগজটা গুছিয়ে তুলে রাখার। খাটের নীচে পরপর সাজিয়ে রাখা। দু'তিনমাস অন্তর কাগজওয়ালাকে ডেকে শাশুড়ি নিজে ওজন করে বেচে দেয়। দাঁড়িপাল্লায় একটু হেরফের হলেই তাকে ধমকধামক। ওটাই শাশুড়ির নিজস্ব রোজগার। লুকোনো হাতখরচ।

জয়ার হাসি পায়। বাপের বাড়িতেও ঠিক এই দৃশ্যটাই দেখেছে। সব বাড়িতেই হয়ত।

—যাই, বলেই আসি। সুকল্যাণ বললে। অর্থাৎ খবরটা।

সুকল্যাণের পিছনে পিছনে জয়াও গেল, একটু দূরত্ব রেখে।

দরজার ফাঁক থেকে শুধু ডেকচেয়ারের পায়া আর শ্বশুরের চটিখোলা পা দু'খানা দেখা যাচ্ছিল।

এসে দেখলে ওপাশে শাশুড়িও মোড়ার ওপর বসে। হাতে একটা বড় কানা-উঁচু কাঁসার থালায় মটর। বোধহয় ঘুগনি বানাবে, পোকাধরা মটর বেছে বেছে বারান্দা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিচ্ছে।

বললে চটে যাবে, তাই বলে না। একটা বাটিতে ওগুলো রেখে জমাদারের বালতিতে ফেলে দিলেই তো হয়। তা নয় ছুড়ে ছুড়ে ফেলবে নীচে।

—তোর মতো মডার্ন শাশুড়ি পেলে আমি বর্তে যেতাম।

মীনা না বিল্লুর মা কে যেন বলেছিল।

মডার্ন।

—বাবা! অফিস থেকে আমাকে দিল্লি পাঠাচ্ছে। এক মাসের জন্যে।

—দিল্লি! অবাক হয়ে তাকাল মা। —কেন রে?

—এ-ক-মা-স! জগদীশ অবাক হলেন দিল্লির জন্যে নয়, দীর্ঘ সময়টার কথা শুনে।

জয়া লক্ষ করল শাশুড়ির কপাল কুঁচকে উঠেছে। এত কপাল কোঁচকানোর কি আছে। অফিসের কাজে যেতে হলে এত অবাক হবে কেন। এক ছেলে জামশেদপুরে চলে গেছে, এর পর বিয়ে-থা হলে সেখানেই থাকবে। ওরা কি ভাবছে সুকল্যাণও এ বাড়ি থেকে সরে পড়তে চায়? তারই প্রস্তুতি? তা না হলে শাশুড়ি জয়ার মুখের দিকে তাকাল কেন।

সুকল্যাণ বললে, কাজ হয়ে গেলে আগেও ফিরতে পারি।

—দিল্লিতে কি কাজ?

জয়ার মনে হ'ল শ্বশুরের মনেও বোধহয় ওই একই সন্দেহ। দিল্লিতে সরে যাবার ব্যবস্থা করছে না তো! মনে মনে হাসল। না বাবা না, তোমাদের ছেলেকে বাড়ি থেকে আলাদা করে নিয়ে যেতে চাইছি না, কলকাঠি আমি নাড়িনি। সব বউদেরই ওই একটাই অপবাদ, তোমাদের আর দোষ কি।

পরক্ষণেই ভাবল, তা নয়, সুকল্যাণ তো কখনো বাইরে যায়নি। বাইরে যেতে হতে পারে চাকরিতে এমন কথাও ছিল না। সেজন্যেই অবাক হয়ে গেছে।

সুকল্যাণ বললে, আমার ওপরওয়ালারই যাবার কথা। এ পি এমের। তার স্ত্রীর হঠাৎ ক্যান্সার ধরা পড়েছে, তাই।

একটু থেমে বললে, একটা প্রোজেক্ট আটকে আছে মিনিস্ট্রিতে। ফাইলপত্তর নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে আসতে হবে।

শ্বশুর বললেন, এ তো খুব দায়িত্বের কাজ। না পারলে বলবে ইনএফিসিয়েন্ট।

সুকল্যাণ হেসে ফেললে।—তা কেন, এ সবের জন্যে তো দিল্লিতেই ওপরওয়ালারা আছে। অন্য লোকও।

হেসে বললে, পারব নাই বা কেন।

—কবে যেতে হবে? বাবার প্রশ্ন।

সুকল্যাণ বললে, কালই।

জয়ার হাসি পাচ্ছিল। 'এ তো খুব দায়িত্বের কাজ।' দায়িত্বের কাজকে শ্বশুরের এত ভয়! সেজন্যেই মানুষটা জীবনে উন্নতি করতে পারেনি। অফিস দায়িত্বের কাজ দিলে সেটা গর্ব করে বলার মতো। কোথায় গর্ব হবে, তা নয়, 'এ তো খুব দায়িত্বের কাজ'। সব চাকরিই কি পান চিবোতে চিবোতে দেরিতে গিয়ে গল্পগুজব করে ফিরে আসা!

—রিজার্ভেশন পাবি এত তাড়াতাড়ি? শ্বশুর আবার প্রশ্ন করলেন।

সুকল্যাণ হেসে বললে, প্লেনে। ব্যবস্থা সব অফিস করেছে।

—প্লেনে? আরেকবার অবাক হবার পালা।

আসলে এ-বাড়িতে কেউ কখনো প্লেনে চড়েনি। না সুযোগ হয়েছে, না প্রয়োজন।

—ও।

জয়া এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিল। সুকল্যাণকে কথাটা বলব বলব করেও বলতে পারেনি। ভালই হয়েছে, একসঙ্গে সবাইকে বলা যাবে। সুকল্যাণ একবার 'না' বলে দিলে তো সব নাকচ হয়ে যেত। তখন আর শ্বশুর বা শাশুড়িকে বলা যেত না।

শ্বশুর ওর একটা কথাও ফেলেন না। এ বাড়িতে ওর ওপর অকৃত্রিম স্নেহ যদি কারো থাকে সে ওই শ্বশুরের।

জয়া আদুরে গলায় বলে উঠল, বাবা, এই ফাঁকে আমি তা হলে বাবার কাছ থেকে ঘুরে আসব। কতদিন যাইনি বলুন!

শাশুড়িও হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বললে, যার যেদিকে তাল।

নির্মলেন্দুও হাসতে হাসতে বললেন, তা যাও না, ঘুরে এসো কিছুদিন।

জয়া মুচকি হেসে সুকল্যাণের মুখের দিকে তাকাল। অর্থাৎ, কেমন জব্দ। এখন আর তোমার মতামতের কোনও দাম নেই।

সুকল্যাণ কিন্তু কিন্তু করে বললে, পিঙ্কুর স্কুল!

জয়া হেসে বললে, আমি তো আর দিল্লি যাচ্ছি না। পদ্মপুকুর থেকেও তো কত বাস।

ব্যস্। ছুটি মঞ্জুর। জয়ার বুকের ভেতরটা আনন্দে নেচে উঠল। বাপের বাড়ি মানে খোলা আকাশ। সমুদ্রের অফুরন্ত ঢেউ। তুষারশৃঙ্গে প্রথম সূর্যের আলো। মুক্তি, মুক্তি।

এই প্রথম জয়াকে কোনও অজুহাত দেখাতে হ'ল না। বিনা প্রয়োজনে যেন বাপের বাড়ি যেতে নেই। যেতে ইচ্ছে হওয়াটাই যেন বড় নয়। বাবার অসুখ, মা'র অপারেশন, কারো বিয়ে, কিংবা মুখেভাত, কিছু না কিছু বলতেই হবে। স্রেফ আমার যেতে ইচ্ছে করছে এ-কথাটাই যেন যথেষ্ট নয়। আর তার জন্য ভেতরে ভেতরে কি এক ধরনের কষ্ট। সেজন্যেই তো জয়ার মনে হয় জীবনে কোনওদিন স্বাধীন হলাম না।

কিন্তু, এমন তো হতে পারে দোষ এদের নয়, দোষ আসলে জয়ার নিজেরই, ও সাহস

করে বলতে পারেনি, আমার এখানে ভাল লাগছে না, যেতে ইচ্ছে করছে। যাব, দিন কয়েক কাটিয়ে আসব।

তাই ভয়ে ভয়ে কোনও একটা অজুহাত দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু সেগুলো কি সত্যি অজুহাত। মোটেই নয়। বাবার অসুখ কি মার অপারেশন সুযোগ এনে দিয়েছে শুধু। অথচ তখন গিয়ে ছুটি মনে হয়নি। মুক্তি মনে হয়নি। কারণ দুর্ভাবনাও সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছে। যে ক'দিন ছিল দুশ্চিন্তাও সঙ্গ ছাড়েনি। ওকে বাপের বাড়ি যাওয়া বলে না।

আসলে বলতে সাহসই হয়নি ওর। আজই কি হত নাকি। যদি সুকল্যাণ মাসখানেকের জন্যে দিল্লি যাওয়ার কথা না বলত।

সাহস হবে কি করে, সেই সাহসটুকুই তো এরা নিয়ে নিয়েছে।

সুপ্রভাতের মতোই।

যখন বেকার ছিল বেচারির কি অবস্থা। বাবার কাছে বা মার কছে হাত পাততেও লজ্জা। অথচ না পেতেও উপায় নেই। ট্রামে-বাসে গিয়ে পকেট মারবে, না ছিনতাই করবে ? মা ইচ্ছে করলেই তো মাসে মাসে কয়েকটা টাকা ওকে হাতখরচের জন্যে তুলে দিলেই পারত। সংসারের টানাটানি, কোন সংসারে টানাটানি নেই !

সুপ্রভাতকে জয়ার খুব ভাল লাগত। একটু মায়াও হত। ও কি করবে, চাকরি যদি না পায় সে কি ওর দোষ।

—কি মশাই, অমন গোমড়া মুখ করে বসে আছ কেন ?

রসিকতাও পছন্দ করছে না তা বুঝতে পারত, বুঝে হেসে ফেলত এই বয়সের ছেলের হাতে টাকাপয়সা না থাকলেও অক্ষমতাও লুকোনো যায় না। ও জানে। দাদাকে মানে ভাইয়াকে তো একসময় দেখেছে।

সুপ্রভাত মুখ ফেরাল। সে মুখে তিক্ততা দেখতে পেল জয়া।

সুকল্যাণ অতশত হিসেবনিকেশ বোঝে না। শাশুড়ির মতো পেনি-ওয়াইজ পাউন্ড-ফুলিশ নয়। দু-আনা চার-আনা টানাটানি করবে, সুপ্রভাতকে বাজার পাঠিয়ে, হিসেব দে, হিসেব দে, নিজের ছেলেকেও বিশ্বাস করে দু'পয়সা রোজগার করতে দেবে না, অথচ কারো মুখেভাত হলে, যত দূর সম্পর্কই হোক, ঝট করে একটা দু'আনা সোনার আংটি দেওয়া চাই। কার মেয়েকে যেন একজোড়া সোনার বালা দিয়ে দিয়েছিল অন্নপ্রাশনে। সোনার কি করে হবে, তামার ওপর সোনার পাত। তবু তো এ-বাজারে দাম কম নয়।

সুকল্যাণ একেবারে অন্যরকম। দু-দশ টাকাকে ও টাকা বলেই গণ্য করে না। মোটা অঙ্কের টাকার দিকে ওর লক্ষ্য। একদিন বড়লোক হয়ে দেখিয়ে দেবে, সেটাই ওর স্বপ্ন। দোষ নেই, বাবাকে সারাজীবন যৎসামান্য মাইনেতে চাকরি করতে দেখে এসেছে, সবসময় অভাব অভাব, মার গঞ্জনা, চাকরি পেয়ে সবে সচ্ছলতার মুখ দেখছে এই ক'বছর, বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখা অপরাধ নয়।

জয়া সেজন্যেই তো ভাবে যদি সত্যি বড়লোক হয়ে যেতে পারে, তা হলে ছুটকুর বিয়ে কোনও সমস্যাই থাকবে না।

একটু সহানুভূতি দেখিয়ে ছুটকুর বিয়ে সম্পর্কে একদিন আলোচনা করছিল। ছুটকু দুঃখ চেপে গল্প করে বলছিল, বিয়ে হতে হতেও কতবার ভেঙে গেছে। জানো বৌদিভাই, ডাক্তার ছেলে, ওদের পছন্দও হয়েছিল বাবা আরো দশভরি যদি দিতে রাজি হত...

ছুটকুর মুখচোখ দেখে জয়ার বুকেও কান্না এসে গিয়েছিল, ও দুম্ করে বলে বসল, আমার যদি কখনো টাকা হয় ছুটকু, দেখে নিও, টাকার জন্যে তোমার বিয়ে আটকাবে না।

'আমার যদি কখনো টাকা হয়', মানে সুকল্যাণের যদি কখনো টাকা হয়। জয়া খুব ভাল করেই জানে, সুকল্যাণের টাকা মানেই ওর টাকা নয়। তবু এক একসময় অধিকারবোধও জন্মায়। আমার টাকা বলে ফেলে, আমার টাকা ভেবে খরচও করে। কিন্তু সে ওই দু-দশ টাকা।

কিন্তু ছুটকু যেন খড়কুটো পেলেও বেঁচে যায়, স্বপ্ন দেখতে পারে।

তাই জয়ার কথা শুনেই ও চমকে চোখ তুলে তাকাল জয়ার মুখের দিকে। দু-হাত বাড়িয়ে জয়ার হাতটা ধরল, চোখে জল টলটল, বললে, তুমি কি ভালো বৌদিভাই, কান্নার গলায় বলে উঠল, তুমি তবু তো মুখে বলতেও পারলে !

কথাটা সত্যি। শুধু মুখে বলা। তাতেই অভিভূত হয়ে গেল ছুটকু।

সেই সব দিনগুলো এখন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

সুপ্রভাতও হয়ত ভুলে যাবে। মাকেই চিঠি লেখে না, জয়াকে তো একটাই লিখেছিল।

তবু সুপ্রভাতের জন্যে ওর মধ্যে একটা মমতা আছে। এ সংসারে যখনই যা-কিছু হয়েছে জয়াকে নিয়ে, সুপ্রভাত সবসময় জয়ার পক্ষ নিয়েছে। ঝগড়া করতেও পিছ পা হয়নি।

সুকল্যাণও একদিন শোয়ার ঘরে এসে চাপা গলায় বলেছে, ভাল উকিল পেয়েছ দেখি বিনাপয়সার।

জয়া রেগেই ছিল, আরো রেগে গিয়েছিল। কড়া চোখে তাকিয়ে থেকেছে সুকল্যাণের মুখে দিকে। সুকল্যাণ তখন হাতের ঘড়িটা খুলে ঘড়িতে দম দিচ্ছে।

জয়া তাকিয়ে থেকে বুঝতে চেয়েছে কথাটার মধ্যে অন্য কোনও ব্যঙ্গ আছে কিনা। কিছু খাবাপ সন্দেহ নাকি ! গা রি রি করে উঠেছে। কারো সঙ্গে একটু সহানুভূতির সম্পর্কও রাখতে দেবে না। যদি সত্যি সে-রকম কোনও কথা কোনওদিন বলে বসে, ও আর এক মুহূর্তও এ-বাড়িতে থাকবে না। সব সম্পর্ক চুকিয়ে চলে যাবে।

সুপ্রভাতের জন্যে এদের কোনও মায়াও হয় না। জয়ার তো হয়।

ছুটকুর বিয়ে দিতে না পারলে সেটা ছুটকুর দোষ। মা হয়েও শাশুড়ি বলে ফেলেছিল একদিন, চেহারাটা কি করছিস দিন দিন, টাকা দিতে পারলেই কি লোকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাবে !

তেমনি সুপ্রভাতের বেলায়ও। চাকরি না পাওয়া যেন তারই দোষ। এই দেশটার যেন কোনও দোষ নেই।

সুপ্রভাতের রাগ দেখে জয়ার হাসিও পেত।

—কি মশাই, এমন গোমড়া মুখে বসে আছ কেন ?

সুপ্রভাত তাকাল বিরক্ত হয়ে, ওর মুখে স্পষ্ট তিক্ততর ছাপ।

জয়া হেসে দুটো দশ টাকার নোট এগিয়ে দিল, এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে। কেউ না দেখে ফেলে।

এমন আগেও দিয়েছে। সুকল্যাণ মাইনের বাড়তি টাকা কত তা মাকে বাবাকে জানায়নি। যা দিত আগে সেই টাকাই দিয়েছে। ওই বাড়তি টাকা জমা হচ্ছে জয়ার কাছে, দরকার মতো সুকল্যাণ চেয়ে নেয়।

তা থেকেই ওই দুটো দশ টাকার নোট সরিয়ে ফেলে সুপ্রভাতকে দিয়ে বললে, যাও সিনেমাটিনেমা দেখে এসো, কিংবা খেলাটেলা। মন ভাল হয়ে যাবে।

সুপ্রভাতের মুখে হাসি ফুটল।—দেখে নিও। সব ফেরত দিয়ে দেব একদিন।

—সুদ সমেত আদায় করে নেব। জয়া হাসতে হাসতে বলেছিল।

তার পরই সুপ্রভাত অদৃশ্য। লম্বা লম্বা ঠ্যাং, চাপা ট্রাউজারের পা সিঁড়িতে দ্রুত অপসৃত।

ছবিটা চোখে লেগে আছে। অথচ জামশেদপুরে গিয়ে জয়াকে সেই একটাই চিঠি। উত্তর দিয়েছিল, আর চিঠি আসেনি। নিজে থেকে আবার চিঠি লিখতেও সঙ্কোচ হয়। যদিও আজকাল যা ডাকঘরের হাল, চিঠি পেয়েছিল কিনা তাও জানে না।

না পেলে সেও তো ভাবতে পারত জয়াকে লেখা তার চিঠিও এসে পৌঁছয়নি। ও না, সুকল্যাণ একটা চিঠি দিয়েছিল, তাতে লিখেছে তোর বৌদি আগেই উত্তর দিয়েছে।...

সুপ্রভাত উত্তর দিল কি না দিল বয়েই গেল। এখন আর ওসব ওর মনেই নেই। মন জুড়ে আছে বাপের বাড়ি।

ছুটি পেয়েছে।

—আরে বাবা, আমার সব গোছাতে হবে তো। তুমি তো বাপের বাড়ি যাওয়ার আনন্দেই মশগুল হয়ে আছ। সুকল্যাণ বললে।

পিঙ্কুকে জয়া বলছিল, মামার বাড়ি যাবি, না এখানেই থাকবি। ইয়ার্কি করে : থাক না এখানে। ছুটকুপিসি নিয়ে যাবে নিয়ে আসবে।

ছেলের সঙ্গে রসিকতা করেই থমকে গেল। উঁহু, না বাবা, আর অসুখ হলেও ছুটকুর সঙ্গে পিঙ্কুকে পাঠাব না। অরিজিৎকে তার পিসি দিতে আসে নিতে আসে, তা থেকে কত কি জল্পনাকল্পনা ওই রোয়াকে বসা ক্লাবে। শেষে জয়াকে নিয়েও যদি...

জয়া উঠে গেল, সুকল্যাণের পোশাক আশাক গুছিয়ে দিতে।

—একটা মাস থাকবে, জামাকাপড় ধোয়াবে কোথায় ? জয়ার কাছে সেটাই সমস্যা।

সুকল্যাণ হেসে ফেলল।—তুমি দেখছি একেবারে আনাড়ি। আরে বড় হোটেলে থাকব, কম্পানির খরচে, সেখানে...

আনাড়ি ! সুকল্যাণ এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন কতই বড় বড় হোটেলে থেকেছে, কতই প্লেনে চড়ে হিল্লিদিল্লি ঘুরে এসেছে। জয়া মনে মনে হাসল। কোথাও বড় একটা বেড়াতে যেতে পায় না বলে ওর যে খুব একটা আক্ষেপ আছে তাও নয়। পিঙ্কু এতকাল ছোট ছিল, ওকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হাঙ্গামার একশেষ। তার চেয়ে না-যাওয়াও ভাল ! আর ছেলেটাও এমন, দাদু-ঠাকুমার কাছে যে রেখে যাবে তারও উপায় ছিল না। মা-বাবার সঙ্গ ছাড়বে না কিছুতেই।

বিয়ের পর একবারই গিয়েছিল।

ছুটকুর সঙ্গে তখন তো খুব ভালবাসাবাসি।

ছুটকু বললে, বৌদিভাই, তোমরা হানিমুনে যাবে না ?

জয়া হেসেই ফেলেছিল।

ও তো পদ্মপুকুরের সরু গলির ভাঙা বাড়ির মেয়ে। গরিব ঘর থেকে এসেছে, হ্যাঁ গরিব ঘরই তো। আজকাল যে বিয়ের পর হানিমুনে যাওয়ার ফ্যাশন হয়েছে, তার খবরহ জানত না।

ওদের সঙ্গে বিমলা পড়ত কলেজে। পড়তে পড়তেই বিয়ে হল, বেশ ধুমধাম করে। হবে না কেন, জজের মেয়ে, ওদের গাড়ি ছিল ; বিমলা মাঝেমাঝেই গাড়িতে আসত। ও কলেজটায় বিমলার পড়ার কথা নয়। আসলে হায়ার সেকেন্ডারিতে রেজাল্ট ভাল হয়নি, তাই বাধ্য হয়ে ওখানেই ঢুকতে হয়েছিল। জজ হ'লে কি হবে, ওর বাবার নিশ্চয় তেমন ইনফ্লুয়েন্স ছিল না।

বিয়ের পরও বিমলা আবার কলেজ করতে এল। সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর, যতখানি দেবার কথা তাব চেয়েও এক ইঞ্চি পিছিয়ে গেছে। যেন মোটা আঙুলে সিঁদুরের

কৌটোটাই শেষ করে এসেছে। কপালের টিপটাও সিঁদুরে ডোবানো গিনি। ঠিক গিনির মাপে, মা'র কাছে একটা সোনার গিনি দেখেছিল, মাকে কে যেন মুখদেখানি দিয়েছিল। আজকাল তো ওসব পাট চুকেই গেছে, সোনার যা দাম।

দেড়মাস পরে বিমলাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন অন্য মেয়ে। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল বলার নয়। একটু গায়ে মাংস লেগেছে, সে তো সবারই লাগে। কিন্তু ওকে বদলে দিয়েছিল অন্য কিছু। মনে হচ্ছিল ওর বুকের মধ্যে একটা খুশির ফোয়ারার মুখ কেউ খুলে দিয়েছে হঠাৎ। খুশিটা কাঁধে গায়ে মুখে লাবণ্য হয়ে ঝরে পড়ছে।

একটু কি হিংসে হয়েছিল ? ঠিক মনে নেই। তবে ওরা কেউই কথায় ব্যবহারে উল্লাস দেখাতে কার্পণ্য করেনি।

ইলা কপট তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলেছিল, ইস, আহ্লাদে একেবারে ডগমগ করছে। বিয়ে যেন আর কারো হয় না।

হাসতে হাসতে বলেছিল, তাই বোঝা গিয়েছিল ওটা ব্যঙ্গ নয়।

সুস্মি ততক্ষণে বিমলাকে জাপটে ধরেছে। কি দারুণ লাগছে তোকে, সব সাজগোজ বাজে, বুঝলি, সিঁদুরের চেয়ে ভাল সাজ কিছু নেই। তোকে দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কি বিমলা সেজেও এসেছিল। দামি শাড়ি, গলায় সেটিংয়ের নেকলেস, হাতে সেটিংয়ের চুড়।

জয়া হাসতে হাসতে বলেছিল, আসল সাজটার কথাই তো বলছিস না তোরা। পাশে কি রকম রাজপুত্রের মত বরটা দেখলি বল।

বরকে দেখার পর জয়া পিঁড়িতে বসা বিমলার কানে কানেও বলেছিল। রাজপুত্তুর রে রাজপুত্তুর। সত্যি, খুব সুন্দর চেহারা।

ওরা সবাই তো গিয়েছিল বিমলার বিয়েতে। ফেরার পথে ইলা হেসে উঠেই বলেছিল, জজের মেয়ে হয়ে কেন জন্মালাম না রে !

এদিক ওদিক দু-একটা খুঁত বের করতেও পিছোয়নি ওরা। সেগুলো মনকে স্তোক দেওয়া না ঈর্ষা, জানে না।

সেই বিমলাকে আবাব আসতে দেখে সব হয়ত মন থেকে মুছে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, বিমলা এখনো আমাদেরই।

জয়া ওকে ছুঁয়ে, ছুঁয়েও আনন্দ, বললে, এত সুন্দর কি করে হলি রে !

বিমলা হাসল, হানিমুনে গিয়েছিলাম যে।

সেই প্রথম 'হানিমুনে' যাওয়ার কথা শুনল একজন চেনাজানা মেয়ের কাছে। আগে যেটুকু শুনেছে সে হাওয়ার মতো, ধরাছোঁয়ার বাইরে। সাহেব মেমরা যায়, ইলার বড়মাসির মেয়ে। খুব বড়লোক ওরা, গিয়েছিল।

এ একেবারে টাটকা হানিমুন. বলতে গেলে নিজেদের চোখে দেখা।

কিন্তু নিজেও একদিন হানিমুনে যেতে পারবে, স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবেনি। বরং বিয়ের পর ভয়-ভয়, কখন ভাতের হাঁড়িটা হাতে তুলে নিতে হয়।

মা যখন ওর বিয়ের জন্যে বাবাকে অতিষ্ঠ করে তুলত, মাঝে মাঝেই বলত, ফুটকির বিয়ে তুমি দেবে না নাকি ? তখন একদিন বাবা রেগে গিয়ে বলেছিল, বিয়ে বিয়ে করো তোমরা, বিয়ে মানে তো হাঁড়িঠেলা !

কথাটা মনে ছিল বলেই, সবাই তো তাই বলে, জয়াই বা অন্য রকম স্বপ্ন দেখবে কী করে।

কিন্তু, ছুটকুর সঙ্গে তখন নতুন নতুন, বেশ ভাবসাব, ছুটকু বলে বসল, বৌদিভাই,

তোমরা হানিমুনে যাবে না ?

—হানিমুন ? অবাক হয়ে গিয়েছিল জয়া, হেসে ফেলেছিল।

ভেতরে ভেতরে চাপা ইচ্ছে যে ছিল না, তা নয়। সে ওই বিমলার কাছ থেকে শোনার পর থেকে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওরা অনেক কিছু জানার চেষ্টা করত, কিন্তু এমন চাপা মেয়ে, শুধু হাসত, কিছু বলত না। শুধু বেড়ানোর গল্প বলত, কোথায় কি দেখেছে, কোন হোটেলে থেকেছে।

—দূর, তোর ওসব কে শুনতে চায়, আসল কথা বল।

তখন হাসি, শুধুই হাসি।

ওই হাসির মধ্যে কত কি যে রহস্য রয়ে গেছে, ভেবে ভেবে আকুল হয়ে যেত। শুধু শোনার জন্যে, শুধু জানার জন্যে।

এখন বুঝতে পারে সত্যিই তো, হাসি ছাড়া আর কিছুই নেই।

কিন্তু ছুটকু বলেছিল, জয়াকে অবাক হতে দেখেই হয়ত বলেছিল, মা তো বলছিল, তোমাদের কোথাও যাওয়া উচিত। সবাই যায়।

একটু থেমে বলেছিল, দাদাকে বলো না।

সুকল্যাণের সবেতেই লজ্জা। এক বিছানায় শুতেও যেন লজ্জা। কপাটে খিল্ দেওয়ার সময় যেন শব্দ না হয়। সেই সুকল্যাণকে বলবে, হানিমুনে যাব ?

তবু ভেতরে ভেতরে একটা ইচ্ছা ছিল বলে একদিন বলেই ফেলল।

সুকল্যাণ হাসল, হেসে বললে, দেখি।

জয়া বুঝে গেল, যাওয়া হবে না।

যাওয়া এত সহজ নাকি।

তবু সাহস জোগাবার জন্যে বললে, ছুটকু তো বলছিল, মা নিজেও বলেছেন।

—যাঃ। বিশ্বাসই করল না সুকল্যাণ।

শাশুড়িদের দোষ দেয় লোকে। তাদের দোষ কি। ছেলেগুলো যদি ত্যাঁদোড় হয়, মা'র আঁচলের মধ্যে থাকতে চায়...

একদিন সিনেমা দেখতে যাবে, রাজি করিয়েছে সুকল্যাণকে, কিন্তু বাবুর সাহস নেই মাকে বলার। টিকিট কেটে এনেও কেবল বলছে, তুমি বলো মাকে।

কেন সুকল্যাণ কি সাহস করে নিজে বলতে পারে না।

শেষ অবধি জয়াকেই বলতে হয়েছিল।

সিনেমা দেখাটা বড় কথা নয়। সিনেমা দেখার আনন্দ তখন উবে গেছে।

কোথায় ভেবেছিল সুকল্যাণই ওকে নিয়ে মেতে উঠবে, চলো চিনে রেস্তরাঁয় খেয়ে আসি, সিনেমা দেখে আসি, হানিমুনে যাই, তা নয় ভিখিরির মতো ওকেই বলতে হচ্ছে। কি লজ্জা, কি লজ্জা।

সিনেমা দেখার আনন্দ ছিল না, তবু দেখতে হয়েছে।

বাপের বাড়ি গেলে মাকে বলতে হবে তো। বন্ধুবান্ধবদের বলতে হবে। দিদি জামাইবাবুরা আসবে, রসিকতা করে প্রশ্ন করবে। তখনো তো বলা চাই। ভাব দেখাতে হবে ও রীতিমত সুখী। না হলে বাবা-মা কষ্ট পাবে। আর জয়া নিজেই লজ্জা পাবে। বন্ধুদের কাছে, দিদি-জামাইবাবুর কাছে।

কোথাও না গিয়ে সব বানিয়ে বানিয়ে বলা, সে তো নিজের কাছেই নিজের লজ্জা। আর পরে কোনওদিন যদি ধরা পড়ে যায় সে আরো লজ্জা।

শেষ অবধি হানিমুনে যাওয়া হ'ত না। ভেবে নিয়েছিল কপাটের খিল্টাই হানিমুন।

বাবার কথাটা মনে পড়ে যেত।—বিয়ে মানে তো হাঁড়িঠেলা, কেন যে বিয়ে বিয়ে

করে পাগল হয় সকলে।

মানে, মেয়ের বিয়ে।

বড়লোকদের বেলাও তাই। মেয়েদের ভাগ্যটাই এমনি। বাড়িতে বাবুর্চি থাকলেও, এন্তার চাকরবাকর, শুয়ে-বসে আয়েসে জীবন কাটালেও ঘর মানে ঘর, চারটে দেয়াল। তারই নাম হাঁড়িঠেলা।

ওটা বসবাসের জন্যে। খাওয়া পরার জন্যে। কিন্তু জীবন তো অন্য কিছু চায়। কয়েকটা জানালা, একটা লম্বা বারান্দা। একটা ইচ্ছের সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তা দিয়ে নিরুদ্দেশ হেঁটে যাওয়া। হেঁটে যেতে যেতে মনে হওয়া আমি শুধুই আমি।

বাপের বাড়িতে জয়ার মনে হত আমি কিছুতেই 'আমি' হতে পারছি না। বিয়ের পরও মনে হচ্ছে এখানেও আমি আদৌ 'আমি' নই। তা হ'লে কোথায় 'আমি' হব ? 'আমি' হওয়ার কোনও ঠিকানা আছে কি ?

তার বদলে কতকগুলো সাজানো সুখ। ওকেই কি সুখ বলে ?

সুকল্যাণকে সাহস দেখাতে হল না। দেখাতে পারতও না।

ওর মা নিজেই একদিন, খাবার টেবিলে, বলে বসল, হ্যাঁ রে সুকু, তোরা কোথাও বেড়াতেটেড়াতে যাবি না ? বিয়ের পর সবাই তো যায়।

কি লাজুক ছেলে দ্যাখো, লাজুক না জয়াকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেই ছিল না, কে জানে, কেমন উদাস গলায় সুকল্যাণ বলল, কোথায় আর যাব।

—সে কি রে, কত জায়গা রয়েছে, যেখানে খুশি ঘুরে আয়।

সুপ্রভাতও খেতে বসেছিল, ও রেগেই গেল।—যাবে না মানে ? জায়গার কি অভাব আছে ?

বলে বসল, তুমি কি ! তোমার মধ্যে কোনও লাইফ নেই।

ছুটকুও বললে, যাও না দাদা।

শ্বশুর তখন মাথা নিচু করে মিটিমিটি হাসছেন।

আর তখনই শাশুড়ি বলে বসল, যেখানে হোক্ ঘুরে আয়, আমি বলছি। না গেলে লোকে বলবে কি, দোষ তো দেবে আমাকে। শাশুড়ির দোষ পেলে তো আর ছেড়ে কথা বলবে না।

একটু থেমে বললে, সবাই বলবে এমন শাশুড়ি বিয়ের পর ছেলে ছেলের বউকে কোথাও বেড়াতে যেতে দিল না।

ওদের কথা শুনতে শুনতে জয়া খুশি হয়ে উঠছিল। কি ভাল, কি ভাল। এরা সবাই চায় ওরা সুখী হয়ে উঠুক। ওদের সুখ দেখতে চায় সকলে।

কিন্তু শাশুড়ির কথাগুলো ওকে যেন ঘাড় ধরে আচমকা নাড়া দিল। ও হরি ! এই ব্যাপার ! হানিমুনে যাওয়া নয় ! শুধু লোকে কি বলাবলি করবে সেই ভয়।

গিয়েছিল। হানিমুনেই গিয়েছিল শেষ অবধি। শুধুই বেড়ানো।

আসলে ওদের মতো মেয়েদের, বাঙালি ঘরের মেয়ে তো, ওদের হানিমুন সেই কোনওদিন হঠাৎ জানালা দিয়ে বিছানায় চাঁদের আলো ঠিকরে পড়া। তার বেশি কিছু নয়।

॥ ৩ ॥

বর্ষাকাল এলেই মুকুল বড় ভয় পায়। ভয় এবং বিরক্তি। একটু বৃষ্টি হল কি এদিকটায় রাস্তায় রাস্তায় জল। বেশি হলে তো কথাই নেই। রাস্তায় যত জঞ্জাল, ভিখিরিদের প্রাতঃকৃত্য, থুতু, কফ। কি নেই। ঠাট্টা করে বলে, এরই নাম অমৃতমন্থন। বৃষ্টির জলে সব একাকার হয়ে যায়, তার ওপর দিয়ে হাঁটু ডুবিয়ে ডুবিয়ে ফিরতে হয় জগদীশকে। সে এক দৃশ্য, এক হাতে ছাতা, আগে বাঁশের ঘোরানো বাট ছিল, ফুটকি এসে জোর করে একটা স্টিলের আধা-শৌখিন ছাতা কিনে দিয়ে গিয়েছিল একবার। জগদীশ হেসে নাকি মুকুলকে বলেছিলেন, ফুটকির বোধহয় প্রেস্টিজে লাগে। শ্বশুরবাড়ির কেউ দেখলে কি ভাববে।

মুকুল ধমক দিয়েছিল, প্রেস্টিজ শুধু ওর শ্বশুরবাড়ির কাছে নয়, লোকের কাছেও। তুমি আর কি বুঝবে।

অর্থাৎ ওর এই ভিখিরিপনা মুকুলকেও আঘাত দেয়, আঘাত দিয়ে এসেছে। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, সব সহ্য করে যায়। কিংবা সহ্য করতেও হয় না, শুধু দেখে যায়। কিংবা দেখেও না, দেখাব চোখ চলে গেছে বহুকাল আগেই।

কিন্তু বৃষ্টির পর রাস্তায় জল জমলেই, আর স্বামীর ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেলেই, সন্ধে তো হয়ই, কোনও কোনও দিন বেশ রাত, কারণ বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম-বাসও কমে যায়, কিংবা জ্যাম ভিড়, ভিড় ঠেলে ওঠা নাকি দুঃসাধ্য, উনি তো হ্যা হ্যা করে হেসেই খালাস, মুকুলের দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না।

দুশ্চিন্তা ম্যানহোলগুলোর জন্যে। মাঝে মাঝেই দুটো একটার মুখ খোলা, যেগুলো আগে লোহার ছিল সব তো চুরি হয়ে গেছে, পরে কংক্রিটের দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোও উধাও। একবার জল ডিঙোতে ডিঙোতে পা ফসকে পড়লে উদ্ধার নেই। ভয় সেজন্যেই।

ইদানীং তো নিত্যদিন লোডশেডিং।

বাড়িটার সামনে লম্বা বারান্দা আছে, আগে গিয়ে দাঁড়াত, আজকাল ঝড়বৃষ্টি হলে দাঁড়াতেও ভয়। কবে ভেঙে পড়ে কে জানে।

জানালা থেকে যেটুকু দেখা যায়! আলো থাকলে সে এক দৃশ্য। এক হাতে ছাতা আর জুতোজোড়া, অন্য হাতে ট্রাউজার্সের পা দুটো টেনে তোলার চেষ্টা। ওটা অভ্যাস, বলে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে মুকুল। গোটানো পা দুটো আর কত টেনে তুলবে।

জল ঠেলে ঠেলে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখলে ওর বুক ঢিপ ঢিপ করত আগে। আজকাল আর করে না। কিন্তু দুশ্চিন্তা থাকেই।

একদিন রেগে গিয়ে বলেছিল, তোমার আর কি, হ্যা হ্যা করে হেসে দিলেই সাতখুন মাপ।

জগদীশ হাসি থামাননি, বউয়ের কাছে ধমক খাওয়া ওঁর রপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল। অভাবী সংসারে ওটুকু রপ্ত করে না নিলে টিকে থাকাই দায়। বউকে রাগতে দিলে সমস্ত অক্ষমতা দিব্যি পুষিয়ে নেওয়া যায়।

জগদীশ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আরে গান্ধারী সারাজীবন চোখে ফেট্টি বেঁধে চালিয়ে দিল, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়েও রাজত্ব করে গেল, আর আমি দু' দুটো চোখ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব না?

মুকুল গম্ভীর ভাবে বলেছিল, হস্তিনাপুরে ম্যানহোল ছিল না, বৃষ্টি হলে এমন জলও জমত না।

অর্থাৎ তখন রাগ পড়ে গেছে, দুশ্চিন্তা কেটে গেছে।

জগদীশ তখনও হাসছেন। —চোখ বেঁধে দিলেও আমি ঠিক আসতে পারব। কোথায় কোথায় ম্যানহোল, কোথায় খানাখন্দ সব মুখস্থ।

বললেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, সত্যি তো এতকাল যাওয়া আসা করছেন, সেই জন্ম থেকে, এ বাড়িতেই তো জন্মেছেন, তবু চোখ বেঁধে দিলে একেবারে অসহায়। কই, কোনওদিন তো ভাল করে লক্ষ করেননি, কোথায় কি আছে। দেখলে সবই পরিচিত লাগে ঠিকই, কিন্তু মনে থাকে না। মনের মধ্যে সব পরপর সাজানো নেই। মজার ব্যাপার। সেই জন্যেই তো জুতোর মাপ জিগ্যেস করলে দোকানিকে চট করে উত্তর দিতে পারেন না, গেঞ্জির মাপ বলতে গিয়ে দু'বার থমকে যান।

তবু রহস্য করে বললেন, মুকুলিকা গো, বুড়ো হচ্ছে বটে তোমার স্বামী, কিন্তু মাথায় এখনো কিছু বুদ্ধি আছে। যত বৃষ্টি হোক, আর যত অন্ধকারই থাক ঠিক ফিরে আসব।

মুকুলিকা নাম নয়, মুকুলই নাম। কিন্তু বিয়ের পর প্রথম চিঠি লিখেছিলেন, তখন তো রঙ ছিল, বয়েসটাও রঙিন, একটু কাব্য করে মুকুলিকা সম্বোধন লিখেছিলেন চিঠির শুরুতে।

নামটা স্বামীর ভাল লেগেছিল ভেবে মুকুল চিঠির যে উত্তর দিয়েছিল তার নীচেও লিখেছিল 'মুকুলিকা'।

জগদীশ তার পর থেকে হঠাৎ কখনো কখনো রসিকতা করে মুকুলিকা বলেন। তা না হলে আটপৌরে সময়ে ওই মুকুল।

আজ আবার মুকুলিকা শোনার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। লোডশেডিং নেই, তাই মুকুল দূর থেকেই দেখতে পেল সেই দৃশ্য। এক হাতে জুতো জোড়া আর ছাতা, কোন্ কায়দায় যে সামলায় কে জানে। অন্য হাতে প্যান্টের গোটানো পা দুখানা টেনে তোলার চেষ্টা।

লোডশেডিং নেই বলেই হাসি পেল। সঙ্গে সঙ্গে মুকুল দ্রুতপায়ে রান্নাঘরে চলে গিয়ে গ্যাস জ্বেলে কেটলি চাপিয়ে দিল। গ্যাস ওই তাড়াহুড়োর সময়ের জন্যে, মাসে একটা সিলিন্ডার, বাকি সময়ে কেরোসিন স্টোভ। এতে খরচ বাঁচে।

ফুটকি এসে সেবার খুব রাগারাগি করেছিল, একই ঘরে গ্যাস আর কেরোসিন স্টোভ! কোনদিন পুড়ে মরবে।

মুকুল হেসেছিল, কিন্তু মেয়ের চাপে পড়ে তখন স্টোভটা সরাতে হয়। যে-কদিন ছিল গ্যাসেই রান্নাবান্না। মেয়ে বাপের বাড়ি এলে খরচ তো সামান্য বাড়বেই। কিন্তু ওটুকু গায়ে লাগে না। বরং পরিবর্তে যা পাওয়া যায় তার দাম অনেক।

তারপর ফুটকি বহুদিন আসেনি, কেমন আছে কে জানে। টেলিফোনও নেই কাছেপিঠে, যে ফোন করে জিগ্যেস করবে। ফুটকির বাড়িতেও নেই। টাকা থাকলে আজকাল নাকি গাড়ি কেনা যায়, বাড়ি পাওয়া যায়, কিন্তু টেলিফোন পাওয়া যায় না। জগদীশ একদিন বলেছিলেন। সত্যি না মিথ্যে জানে না। খরচ পোষাতে পারবে না বলেই হয়তো ওই সব অজুহাত।

মুকুলের বড় মাসির বাড়িতে আছে। বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছে মেয়েদের, কি সুবিধে তার। দিব্যি মায়ের সঙ্গে গল্প করে, ভাপা ইলিশ কি করে করতে হয় ফোন করে জেনে নেয়।

একবার কার বিয়েতে যেন দেখা হয়েছিল, বড়মাসি মুখ বাঁকিয়ে অবশ্য বলেছিল, ছাই সুবিধে, সব সময় তো খারাপ।

এটাও সত্যি না মিথ্যে জানে না।

গ্যাস স্টোভে চায়ের কেটলি বসিয়ে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল মুকুল। সিঁড়ির নীচে

এক চিলতে উঠোন, এক কোণে একটা কল আছে।

জগদীশ জুতো নামিয়ে কল খুলে কাদামাখা পা ধুতে ব্যস্ত।

পা ধুয়ে ছাতা বন্ধ করে জুতোজোড়া হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে মুকুলের দিকে চোখ পড়ল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে। হেসে বললেন, একটা সুখবর আছে।

পরমুহূর্তেই নিজেকে সংশোধন করলেন, না না আমার কিছু নয়। ব্যাপার হল, এর আগে একবার ঠিক এই রকমই বলেছিলেন। 'সুখবর'।

মুকুল সব শুনে বলেছিল, 'এমন ভাবে বললে, ভাবলাম তোমার বুঝি অনেক মাইনে বেড়েছে।' বেশ হতাশ দেখিয়েছিল মুকুলকে।

পাছে আজও মুকুল সে-রকম কিছু ভেবে বসে, তাই আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া। 'না না আমার কিছু নয়।'

তবে একটা সুখবর নিশ্চয়ই। মুকুল শুনে নিশ্চয় আনন্দে নেচে উঠবে।

জগদীশের নিজের বুকের ভেতরটাও তো খুশিতে নাচছে। আজ আর জলকাদা ডিঙিয়ে আসতে একটুও বিরক্তি হয়নি। ভিড় বলে একটাও বাস ছেড়ে দেননি। কতক্ষণে এসে পৌঁছবেন, সুখবরটা মুকুলকে জানাবেন সেই চিন্তা।

বাস থেকে নেমে পেট্রোল পাম্পের কাছে পৌঁছতে জুতো খুলেছেন, হাতে নিয়েছেন, তারপর পাশের রাস্তাটা দিয়ে জল ঠেলে ঠেলে এসে ডান দিকের সরু গলিটায় ঢুকেই তাকিয়েছেন। ওখান থেকে যে বারান্দা দেখা যায় না, জানেন, তবু মনে পড়েনি। কাঠগুদামটা বেআইনি ভাবে খানিকটা এগিয়ে এসেছে বলেই দেখা যায় না।

কাঠগুদাম পার হয়ে এসেই বারান্দা চোখে পড়ল। না, মুকুল দাঁড়িয়ে নেই। ওকে চিন্তিত মুখে দাঁড়াতে দেখলে যেন খুশিই হতেন। আজকাল আর দাঁড়ায় না। ভয়ে। বারান্দাটা কখন ভেঙে পড়ে এই ভয়। জগদীশও আজকাল দাঁড়ান না। আগে দাঁড়াতেন, রাস্তা দেখতেন, কলেজে পড়ার সময় সামনের বাড়ির জানালার দিকেও। জানালায় একটা মেয়েও দাঁড়াত, কি নাম যেন ভুলে গেছেন। সত্যি সত্যি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন নাকি জগদীশ? মেয়েটা তো নির্ঘাত। দেখে তাই মনে হত।

ভাড়াটে তো, উঠে গেল একদিন। হয়ত আরো ভাল বাড়িতে। অনেককাল পরে একবার নিউ মার্কেটে দেখেছিলেন, পুজোর বাজার করছে ছেলেমেয়ে নিয়ে, কি বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে গেছে। ভাবতে ভাল লেগেছিল, ওঁর জন্যেই, ওঁকে ভালবেসেছিল বলেই সুখী হতে পারেনি, তাই ওরকম চেহারা হয়ে গেছে।

এখন বোঝেন ওটা ওঁর নিজেরই পাগলামি। খুব বেঁচে গেছেন, ওই রকম একটা মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন? অসম্ভব। তার চেয়ে মুকুল অনেক ভাল। অনেক। তবু মেয়েটার জন্যে একটু মায়াও হয়। বেচারি। একটু সুখী সুখী চেহারা হলে ভালই লাগত। সুখীই হোক না। আহা, সুখী হোক।

বারান্দার দিকে আবার তাকালেন। সত্যি বড় ভয় করে। ঝুল্‌ বারান্দা তো, লোহাফোহা সব জং ধরে রুগ্‌ণ হয়ে গেছে। বাড়িটাও রুগ্‌ণ।

গত বছর একজন কন্ট্রাক্টরকে এনে দেখিয়েছিলেন।

সে সব দেখেটেখে বলেছিল, ষাট সত্তর হাজার খরচ করলে বাড়িটাকে বাসযোগ্য করে দেওয়া যাবে।

যেন বাড়িটা এখন বাসযোগ্য নেই! রেগে গিয়েছিলেন তার কথা শুনে।

জগদীশ ভেবেছিলেন, ওই টাকায় বাড়িটা একেবারে নতুন হয়ে যাবে। তা হলে পি এফ থেকে নিয়ে...পি এফ থেকে তো একবার নিতে হয়েছিল ফুটকির বিয়ের সময়।

সেটা তবু সৎকার্যে ব্যয়।

খুব খুশি ভাবে মুকুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা সুখবর আছে।

—সে পরে শুনব, তুমি সাবধানে ওঠো তো আগে, সারা সিঁড়ি বেয়ে জল। রেলিং ধরে ধরে ওঠো।

উনি যখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছেন, মুকুল তখন চলে গেছে ওপাশের রান্নাঘরে। মানুষটা জলকাদা ডিঙিয়ে এল, ছাতা থাকলেও আধভেজা, সুতরাং চটপট চা করে দিতে হবে। সেজন্যেই তো রাস্তায় দেখতে পেয়েই কেটলি চড়িয়ে দিয়ে এসেছে। গ্যাসের অপব্যয় সে-কারণেই। ছুটির দিন বা রবিবার হলে কেরোসিন স্টোভে। জগদীশ নাক টেনে টেনে কোনওদিন বলেন, গন্ধ লাগছে, তবু। জোড়াতালি দিয়ে এভাবেই তো সংসার চালিয়ে এসেছে। তিন তিনটি মেয়ের বিয়েও দিয়েছে।

ক্ষোভ শুধু সুশান্তকে নিয়ে। বি এস-সি পাশ করে অনেক চেষ্টার পর একটা ছোট কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ হয়েছিল। শিলচর গুয়াহাটি করতে করতে শরীরে পোষালো না, কিংবা তেমন কাজ দেখাতে পারেনি। তখন কি সব গোলমাল, মুকুলের ঘ্যানর ঘ্যানর, জগদীশও ভয় পেতেন. চলে আয়, চলে আয়। ট্রান্সফারও দিল না। সুশান্ত চাকরিটাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ভেবেছিল আরেকটা পেয়ে যাবে। কিন্তু পেল না।

শেষে কিছু টাকাকড়ি জুটিয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে, জগদীশের দু দুটো ফিক্সড ডিপোজিট বন্ধক রেখে একটা ক্যাসেটের দোকান করেছে। ভিডিও ক্যাসেট। দিব্যি চলে যায় ওর। খুব একটা লাভ হয় না, তবু চলে যায়। আশা, একদিন দাঁড়িয়ে যাবে।

ক্ষোভ একটাই, বি এস-সি পাশ করে ক্যাসেটের দোকান। যখন কলেজে ঢুকেছিল, ভর্তি হওয়ার সময়, কি ছোটাছুটি, কি দুর্ভাবনা। সায়েন্স না পেলে যেন জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। অনার্স না পেলেই অন্ধকার।

ডিগ্রিটার এখন আর কোনও দামই নেই। যে ছেলেটা ওকে এ লাইন বাতলে দিল, পশ্ এলাকায় বেশ বড়সড় দোকান তার, সুশান্তকে খুব হেল্প করে, কিন্তু যোগ্যতা ? শুধু মাধ্যমিক পাশ।

সুশান্ত বড় রাস্তায় একটা দোকানও পেল না। যা ভাড়া আর সেলামি, ছোঁয়া যায় না।

এই সব নিয়ে যার সংসার সে আর কি 'সুখবর' আশা করবে জগদীশের কাছ থেকে। সেজন্যেই মুকুল বলে উঠেছিল, সে সব পরে শুনব।

কথাটা বলতে না পেরে জগদীশের অস্বস্তি লাগছিল। বেশ বিরক্তির সঙ্গেই অফিসের জামাকাপড় বদলাচ্ছিলেন। জুতোজোড়া চৌকাঠের বাইরেই আছে, অনেক কষ্টে সামলে এনেছেন, কাল রোদ না উঠলে ভিজে জুতোতেই অফিস যেতে হত। আরেক জোড়া আছে। পুরনো জোড়া, কাজ চলে যায়, সোল ক্ষয়ে গেছে বলে স্লিপ করে।

কিন্তু মুকুল আসছে না কেন ?

কথাগুলো বলে ফেলার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন জগদীশ। অথচ মুকুলের কোনও কৌতূহলই নেই। হয়ত ভেবেছে সেবারের মতোই কোনও তুচ্ছ ব্যাপার, যার সম্বন্ধে মুকুলের কোনও আগ্রহই নেই, আনন্দের ব্যাপারই নয়, তেমনই কিছু।

এই এক দোষ মুকুলের, সঙ্গে সঙ্গে কোনও কথা শুনতে চায় না। বাসী হয়ে যাওয়ার পর কথাটা বলে কোনও আনন্দ হয় নাকি। অথচ সারা রাস্তা ওর বুকের মধ্যে কি মৃদু মৃদঙ্গ বেজেছে জগদীশই জানেন।

অপেক্ষা করতে পারলেন না, নিজেই রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তাই ?

গ্যাসের উনোনে কড়াই চাপিয়ে বেগুনি ভাজছে।

দারুণ। ব্রেন আছে। এমন বৃষ্টির দিনে মুড়ি আর গরম গরম বেগুনি। কোথায় লাগে ফাইভ স্টার হোটেল। ভেতরে ঢোকার কখনো সুযোগ হয়নি, কিন্তু ওইসব হোটেলের পাশ দিয়ে যেতে আসতে ঘাড় কাত করে দেখেছেন। যতক্ষণ দেখা যায়। ভেতরটা এখনো রহস্যই থেকে গেছে। বিশ্বাস হয় না, তবে অফিসের দু-চারজন বলে ভেতরটা নাকি রহস্যময়ই।

—চলো যাচ্ছি, চা হয়ে গেছে। তুমি আবার এই জলে জলে এলে কেন !

পুরনো দিনের বাড়ি, ঠাকুর্দার আমলের। তখনকার প্ল্যানগুলোও ছিল অদ্ভুত। উঠোনটা মাঝখানে, তিনদিকে ঘর, আলো আসবে না বলে মাঝখানে উঠোন ওপরে ছাদ নেই। আলো যেমন আসে তেমনই বৃষ্টিও, সব বারান্দাগুলো বৃষ্টির ছাট এসে জল থৈথৈ। পিছলে পড়লেই হল।

এখন আবার চটি সপ্‌সপ্ করে ফিরে যাওয়া। কথাটা না বলেই। বারান্দা ঘুরে ঘুরে শোবার ঘরে আসতে বেশ সময় লাগে, জল বা ভাতের ফ্যান পড়ে গ্যাস নিভে গেলে গন্ধও পাওয়া যায় না। ফুটকি সেজন্যেই সেবার এসে বলে গিয়েছিল, কোনওদিন একটা অঘটন ঘটাবে !

—সুখবরটা শুনবে তো ?

মুকুল বললে, চলো, গিয়ে শুনছি।

ব্যস্, এর ওপর আর কথা চলে না।

জগদীশ ফিরে এলেন, পায়ে পুরোদস্তুর শরীরের ওজন ছেড়ে, যাতে পিছলে না পড়েন। দুখানা ঘর পেরিয়ে বাঁদিকে বেঁকে আবার একখানা ঘর, তারপর বাঁদিকে আবার, ওঁর শোবার ঘরের দরজা। শোবার ঘর আবার কি। সব ঘরই শোবার, মেয়েরা কেউ এলে। বড়লোকদের মতো যারা বড়লোকি দেখায় তাদের মতো ড্রয়িংরুম-ফুম নেই। কেউ এলে তাকে যে কোনও ঘরে, শোবার ঘরেই নিয়ে গিয়ে বসায়। লোক বেশি হলে এ-ঘর ও-ঘর থেকে চেয়ার টেনে আনে। মোড়াও।

ঠিকাদার ব্যাটা বলেছিল, বাসযোগ্য করে তোলা যাবে। যেন এখন এটা বাসযোগ্য নয়।

নীচের তলার ঘর কখানা এখন অবশ্য ব্যবহার করা হয় না। ক'খানাই বা ঘর, নীচের দুটো ঘর তো মাঝখানে দরজা ফুটিয়ে শরিকি পার্টিশনে ওপাশের এক্তিয়ারে চলে গেছে। কি বিদঘুটে পার্টিশন। তারা না সারালে ওঁদের ওপর তলার ঘর দুখানা ভেঙে পড়বে।

বাকি দু খানা ঘর একবার ভাড়া দিয়েছিলেন, সে এক চরম অশান্তি। নিজেরাই জল পান না, কর্পোরেশনের জল, কোনদিন আসে কোনদিন আসে না, তবু জল দেয়ার দায়িত্ব যেন ওঁদেরই। তারা বিরক্ত হয়ে উঠে যাওয়ার পর আর দেননি। পরে দেবেন হয়ত, ওটাই হবে রিটায়ার করার পর পেনশন। ওঁদের তো পেনশন নেই, প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটি।

রেলিং ধরে ধরে ফিরে এলেন জগদীশ।

একটু পরেই মুকুল, ডান হাতে চায়ের কাপ, বাঁ হাতে কানা উঁচু মুড়ির থালা, থালায় গরম গরম বেগুনি। 'হাউ লাভলি'। ইংরেজি বড় একটা বলেন না, অফিসে দু-চারটে, কিন্তু রসিকতা করে মুকুলের কাছে দু-একটা ইংরিজি ছাড়েন।

বলতে যাচ্ছিলেন, হাউ লাভলি। বলা হল না।

তার আগেই মুকুলের মুখ ঝামটা। চটিটা ভেজালে তো !

মুখ কাঁচুমাচু জগদীশের। বৃষ্টি ভেজা বারান্দা ঘুরে ঘুরে রান্নাঘর অবধি যেতে গিয়ে, আবার ফিরে আসা, কত আর বাঁচাবেন গোড়ালি তুলে তুলে, পায়ের গোড়ালি উঠলেও চটির গোড়ালি তো ওঠে না, সুতরাং ভিজে তো যাবেই।

চায়ের কাপ মোড়ার ওপর নামিয়ে দিয়ে মুকুল মুড়ি-বেগুনির থালাটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, এখন ভিজে চটি পরে ঘোরো, সর্দিকাশি লাগিয়ে ঠ্যালা বুঝবে। বুঝবে আর কি, বুঝব তো আমি, সারারাত হ্যাঁচ্চো, হ্যাচ্চো, আমি ঘুমোতে পাব না।

জগদীশ হাসলেন।

বিছানার ওপর বসে একটা গরম বেগুনি দু আঙুলে ধরেছেন, কামড় দেবেন, সুখবর জানানোর উৎসাহ এখন অনেকটা কমে এসেছে, ভাবছেন কি ভাবে বলবেন, মুকুল হাতলহীন কাঠের চেয়ারটা টেনে নিয়ে দুপা গুটিয়ে বাবু হয়ে বসল। স্বামী তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে, দেখেও তৃপ্তি।

—বল, কি বলছিলে ?

ঘা খেয়ে খেয়ে উল্লাসটা চাপা পড়ে গেছে। তবু হেসে উঠলেন, বললেন, কাল ফুটকি আসছে, কিছুদিন থাকবে।

—কেন !

মুকুলের মুখে কোনও আনন্দ দেখা দিল না। বরং কপালে একটু উৎকণ্ঠার রেখা ফুটে উঠল।

জগদীশ অবাক হয়ে গেলেন। এই তো দুদিন আগে জগদীশকে বলেছে, সুকল্যাণকে একবার তার অফিসে ফোন করে জিগ্যেস করো, কে কেমন আছে।

এত দূর, যাতায়াত করাও যায় না, সুশান্তকে দিয়ে যে কোনও কাজ করাবে তার উপায়ও নেই, সদাই ব্যস্ত, ব্যবসা যে কি হচ্ছে সে তো জানা, কিছু একটা করতে বললেই, 'এক ঘণ্টা দোকান বন্ধ মানে ষোলটা টাকা লস্'।

—ঘণ্টায় ষোল টাকা পেলে তো তোর প্রচুর রোজগার রে। কিছু কিছু সংসারের জন্যে দিবি তো।

মুকুল হিসেবে চৌকোশ। মুদিখানার ফর্দ হাতে নিয়ে দাম ঠিক ঠিক বসিয়েছে কিনা দেখতে হলে জগদীশ হিমসিম খেয়ে যান, কিন্তু মুকুল এক নজরে চটপট যোগ-বিয়োগ সেরে, কোনটা হয়ত ফেরত ছিল সেজন্যেই বিয়োগ, বলে দিতে পারে হিসেব নির্ভুল কিনা।

তার কাছে সুশান্ত দেবে ফাঁকি ?

সুশান্তকে তাই বলতেই হয়, আহা ওই এক ঘণ্টায় একজন খদ্দের এসে দুটো ক্যাসেট তো নিতেও পারে।

অর্থাৎ রোজগার নয়, সম্ভাবনা।

সুতরাং জগদীশকেই মাঝেমধ্যে গিয়ে খবর নিয়ে আসতে হয়, দেখা করে আসতে হয় ফুটকির সঙ্গে। কিন্তু সেটা তো ফুটকির শ্বশুরবাড়ি। একে তো সময়ই নেই, সকাল ন'টায় অফিস, ফিরতে ফিরতে সন্ধে, অফিস-ফেরতা একদিন গিয়েছিলেন। বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরলেন রাত এগারোটায়। আর যত কাজ তো রবিবারে, ক্লান্তও লাগে, যাবেন কখন ! তার শ্বশুরবাড়িতে ঘন ঘন যেতেও সঙ্কোচ লাগে।

তাই শুধু খবরাখবরই নেওয়া হয় ; দু'বাড়িতেই টেলিফোন নেই, অগত্যা অফিস থেকেই সুকল্যাণের অফিসে। কিন্তু সে তো পরের মুখে ঝাল খাওয়া, ফুটকির সঙ্গে তো কথা হয় না, পিঙ্কুর সঙ্গেও না। গতবার যখন এসেছিল, পিঙ্কুর মুখে তখন আধো-আধো কথা, কি ভাল যে লাগত ! বাড়িতে টেলিফোন থাকলেই বা কি, রিসিভারটা শুধু খবরই

দেয়, তাও গলার স্বর পাল্টে দিয়ে, পিঙ্কুর হাতখানা মুঠোর মধ্যে ধরার যে স্পর্শসুখ, তা তো দিতে পারে না। চোখের সামনে ফুটকি ঘুরছে ফিরছে, কথা বলছে, হাসছে, সুশান্তর পিছনে লাগছে, কিংবা ধমক দিচ্ছে মাকে, এ-সব ভেবেই তো এতক্ষণ সুখবরটা বুকের মধ্যে ঢেউ তুলেছে।

অথচ বলার পর মুকুল অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, কেন ?

ওর অবাক হওয়া দেখে জগদীশও অবাক হলেন।

—কেন আবার কি, আসবে, থাকবে কিছুদিন।

মুকুল নিজেই তো একবার গিয়ে বলে এসেছিল, সেবার যখন এল তার আগে।

পরে আরেকবার, কিন্তু ফুটকি নিজেই বলে বসেছিল, কি করে যাব মা, সংসার ফেলে।

মুকুল হেসেছে, বোঝ তা হ'লে, একটা ছেলে নিয়েই..

অর্থাৎ তোর তো এই সংসার, আমার তিন তিনটে মেয়ে একটা ছেলে, সংসার যাকে বলে, বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কই প্রায় চুকে গেছে, কেন !

সেবার আসতে পারেনি, এখন আসছে, অথচ মুকুলের কোনও আনন্দ-উল্লাস নেই।

জগদীশ বললেন, বেয়াইমশাই ফোন করেছিলেন, বললেন, সুকল্যাণ দিল্লি যাচ্ছে, একমাসের জন্যে, তাই ফুটকি বায়না ধরেছে আসবে বলে।

—সেই কথাটা তো আগে বলবে

মুকুলের মুখ থেকে দুশ্চিন্তা নেমে গেল। বেশ প্রফুল্ল দেখাল এবার।

বললে, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, চলে আসছে। আমি তো ভেবে বসেছিলাম সুকল্যাণের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে বসেছে। আর নয়ত শাশুড়ি...

জগদীশ হেসে উঠলেন। —তোমার সবেতেই ভয়। ফুটকি শুনলে যা হাসবে !

—তা হলে তোমাকে তো আনতে যেতে হবে, সুশান্তকে দিয়ে তো হবে না। তা ছাড়া ও কি বলতে কি বলে বসবে, কাণ্ডজ্ঞান তো নেই।

জগদীশ বললেন, আরে বাবা সেকথা বললাম বেয়াইকে, যে আমিই যাব। ফুটকি কি তোমার পদ্মপুকুরের মেয়ে আছে ? বলেছে পিঙ্কুকে নিয়ে একা একাই চলে আসবে।

—একা ? অত জিনিসপত্র থাকবে, গতবারে তো ইয়াবড়ো একটা স্যুটকেশ এনেছিল। মুকুল বললে, না না, তবু তুমি যাও।

—তার পর যদি রাগারাগি করে। নির্মলেন্দুবাবু তো বললেন, উনি নিজেই পৌঁছে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, ফুটকি রাজি হয়নি। বলেছে, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসছে।

মুকুল বললে, তবে তাই আসুক।

তার পরই প্রশ্ন করল, কিন্তু সুকল্যাণ দিল্লি গেল কেন ? বদলি হয়ে গেল না তো ?

—হতেও পারে। হয়ত উন্নতি হয়েছে।

মুকুলের কথায় কিঞ্চিৎ উষ্মা। —তুমি জিগ্যেস করলে না ?

জগদীশ মাথা চুলকোলেন, 'মনে হয়নি'।

আসছে সেটাই বড় খবর, বড় সুখ। কেন আসছে, কেন যাচ্ছে এ-সব জিগ্যেস করা প্রয়োজন মনে করেননি। জিগ্যেস করা উচিত ছিল ঠিকই। শেষে এত দূরে চলে যাবে নাকি।

বড় মেয়ে তো কালেভদ্রে আসে। আসতে পায়। মেজ মেয়ে তবু উত্তরপাড়ায়। উপায়ও ছিল না। ছোটর বিয়ে দিলেন এখানেই। ভেবেছিলেন নিত্যদিন আসাযাওয়া থাকবে, দেখাসাক্ষাৎ হবে। অথচ সেও আসতে পায় না।

তার সংসারই এখন দূরত্ব গড়ে দিয়েছে। নাকি শ্বশুর-শাশুড়িই আসতে দেয় না, তাই

বা কে জানে।

তবে মনে হয় না, নির্মলেন্দুবাবু মানুষ খুব ভাল, কথাবার্তায়, ব্যবহারে। খারাপ যেটুকু লেগেছিল, সে বিয়ের আগে, দাবিদাওয়ার সময়। এখন মনে হয় অত্যন্ত সুজন। আর শাশুড়ি তো মাটির মানুষ। ফুটকিও বলেছে।

খটকা শুধু একটাই, দিল্লি যাচ্ছে কেন। ওর তো হিল্লিদিল্লি যাওয়ার চাকরি নয়। শুনেছিল ওদের কোনও ট্রান্সফার নেই, অফিস শুধু কলকাতাতেই। তা হ'লে ? বেড়াতে গেল কি ? ফুটকিকে না নিয়ে, পিঙ্কুকে না নিয়ে ?

সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে তা হলে। মুকুল তো রীতিমত কষ্ট পাবে, উনিই কি কম কষ্ট পাবেন নাকি।

কই, মনে তো পড়ে না কখনো মুকুলকে, ছেলেমেয়েকে রেখে বেড়াতে গেছেন অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে। ওরা তবু দল বেঁধে কখনো কখনো যায়। জগদীশ কোনওদিন যাননি। কোথায়ই বা গিয়েছেন। একসময় মুকুলের সেটাই ছিল আফশোস। তারপর ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেল, তাদের স্কুল-কলেজ, পরীক্ষা পরীক্ষা। টাকার অভাব ছিলই, সেই অভাবকে এই সব অজুহাত দিয়ে ঢাকা দিয়ে এসেছেন, এই অজুহাত দিয়ে চাপা দিয়েছেন ইচ্ছেটাকে।

—হ্যাঁ রে ফুটকি, দিল্লি গেল কেন ? দিল্লিতে ওর আবার কি ?

ওটাই তখন একমাত্র দুর্ভাবনা। বদলি নয় তো ? দু'দুটো মেয়ে দূরে দূরে, এই ফুটকিও আসতে পায় না, দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হয় না, তবু কাছেই আছে, গেলেই হবে, ইচ্ছে হ'লেই আসতে পারে, এও কি কম সান্ত্বনা। কাছে মানেই আছে।

অফিসের বিনোদ, তার মেয়ের বিয়ে দিল, ছেলে আমেরিকায় থাকে। খুশিতে টইটম্বুর। মেয়ে অবশ্য বেশ সুন্দরী, কেমিস্ট্রিতে অনার্স। ভাল বিয়ে তো হবেই। টাকাপয়সাও তেমন লাগেনি। ওর মতো ভাগ্যবান আর ক'জন হয়।

তবু জগদীশের একটু খুঁতখুঁতুনি ছিল। —দেবে ? অত দূরে ?

বিনোদ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। —কি যে বল, এমন পাত্র ছেড়ে দেয়। জীবনে তো যাওয়া হবে না, ম্যাগাজিনে আর সিনেমায় ছবি দেখে দেখেই কাটিয়ে দিলাম। মেয়ের কুষ্ঠির জোর ভাই, কুষ্ঠির জোর। তা না হলে এমন পাত্র ? আমেরিকায় ? আমার সাধ্যই ছিল না।

এখন বেশ সুখেই আছে। মনে তো হয়। বিনোদদের বাড়িতে ফোন আছে, মেয়ে মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলে, চিঠি দেয়, দু'তিন বছর অন্তর এসে একমাস থাকে। কত কি নিয়ে আসে, বাবাকে মাকে প্রেজেন্ট করে। দুঃখ একটাই, এখানে এসেও অর্ধেক দিন শ্বশুর-শাশুড়ির কাছেই কাটাতে হয়। বাপের বাড়ি শুধু দিনকয়েক।

কি করে যে লোকে পারে !

ট্যাক্সি থামতেই জগদীশ দেখতে পেয়ে ছুটে গেলেন। —ফুটকি এসে গেছে, ফুটকি এসে গেছে।

কখনো জানালায় কখনো ওই ভেঙে পড়া বারান্দায় গেছেন, কখন আসে, কখন আসে। জগদীশ অফিস যাননি, দেরি করে যাবেন ঠিক করেছিলেন। এটা একটা অভাবনীয় ব্যতিক্রম। কাঁটায় কাঁটায় দশটার মধ্যে অফিসে পৌঁছতে না পারলে জগদীশ নিজেকে অপরাধী ভেবে বসেন।

অন্য অনেকেই তো দেরি করে আসে, ওপরওয়ালা প্রশ্ন করলে চটে যায়, কিংবা শুধুই হাসে, উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বলেই মনে করে না। নিতান্তই যারা কেরানি, তারা বাঁধা বুলির মতো কিছু না কিছু অজুহাত দেখায়, সেটা বিশ্বাস্য কি অবিশ্বাস্য তা নিয়ে মাথা

ঘামায় না। ওদের আজকাল ইউনিয়ন হয়েছে, তার ক্ষমতাও বেড়েছে। তাই কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না।

জগদীশও সে ইউনিয়নের বাইরে নন, মিটিংফিটিং থাকলে তিনিও যান। কিন্তু অফিসে দেরি করে যাওয়া তাঁর অভ্যাসের বাইরে।

—খুব তো পাংচুয়ালিটি দেখিয়ে এলেন এতকাল, হ'ল কিছু ? কেউ কেউ ঠাট্টা করে, বিশেষ করে কমবয়েসীরা।

ওরা ধরে নিয়েছে পাংচুয়ালিটির দাম উন্নতি। প্রমোশন।

না, বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি জগদীশের, সেই প্রথম জীবনে যা দু'এক ধাপ উঠতে পেরেছিলেন, সেখানেই থমকে থেমে রয়ে গেলেন সারাজীবন। তার জন্যে কোনও অনুশোচনা বোধ করেন না। ধরে নিয়েছেন এটাই ওঁর ভাগ্য। অভাব তো চিরকালের সঙ্গী, সেটাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর কোনও হা-হুতাশ থাকে না।

আসলে মানুষটার কোনও উচ্চাশাই নেই। কিছু কিছু লোক এ ধরনের থাকে, বোধহয় বেশির ভাগ লোকই এই রকম। তা না হলে অফিসগুলো চলছে কি করে।

ঠাট্টা শুনে উত্তর দেন, ভাই, মাইনে যা পাই সে তো ওই পাংচুয়ালিটির জন্যে, উন্নতি করতে হলে তো কাজ দেখাতে হয়। কাজ জানলে তবে তো করে দেখাব।

কমবয়েসীরা হাসে।—কাজ দেখালে উন্নতি হয় ? ওই ধারণা নিয়েই থাকুন আপনি। তৈল জানেন ? তৈল কাকে বলে ? অয়েল ?

অন্য কেউ বলে বসে, ইনফ্লুয়েন্স করানোর মতো ভায়রাভাই থাকলেও হয়।

কি আর জবাব দেবেন জগদীশ, শুধু হাসেন।

সেই জগদীশও ভেবে রেখেছিলেন দেরি করে যাবেন। ফুটকি আসবে শ্বশুরবাড়ি থেকে, পিঙ্কু আসবে, তাদের না দেখে যেতে ইচ্ছে হয়নি।

ট্যাক্সিকে গলিতে ঢুকতে দেখেই ধরে নিলেন ফুটকি আসছে।

চেঁচিয়ে বলেও উঠলেন, ফুটকি এসেছে, ফুটকি এসেছে।

দ্রুত পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া পিছল হওয়া সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন চটি ফটফটিয়ে। পিছন পিছন মুকুলও।

এ গলিতে ট্যাক্সি বড় একটা ঢোকে না, এমনকি গাড়িও নেই কারো। ক্বচিৎকদাচিৎ বরং অটোরিকশা দেখা যায়। যা দেখা যায় প্রায়ই, তা ওই লরি কিংবা টেম্পো। কাঠগুদামের সামনে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মাল বোঝাই হয়, কিংবা মাল নামানো। মাল বলতে ইয়া লম্বা লম্বা শালবল্লী কিংবা চৌকোস করে কাটা কাঠের বিম।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, ফুটকিরই ট্যাক্সি।

মেয়ে ভাড়া মেটাচ্ছিল, জগদীশ বলে উঠলেন, আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি।

দেবেন কোত্থেকে, শার্টের পকেটে তো টাকা নেই। টাকা সবই মুকুলের জিম্মায়।

অফিস যাওয়ার সময় প্রতিদিন বাস ভাড়ার ওপর তিনটি টাকা নিয়ে বেরোন, সেও মুকুলের কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয় মনে করে। কারণ সে সময় মুকুল সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এ বাড়িতে কখনো ঠাকুর-চাকর ছিল না। রান্নাবান্না সব কাজই মুকুলের। যখন মেয়েরা ছিল, মেয়েরাও সাহায্য করত। একে একে তাদের সকলকেই পার করেছেন। মানে পর করেছেন।

এখন মুকুলই সব। বয়েস বেড়েছে, পেরে ওঠে না, তবু মুখ বুজে করে যায়।

শুধু একটা ঠিকের লোক আছে, সে সকালে এসে বাসন মেজে দিয়ে যায়। তার মাইনেও কম নয়। সে আধ ঘণ্টার মধ্যে সব সাফসুফ করে দিয়ে কেটে পড়ে।

সেজন্যেই জগদীশ ছুটতে ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন। ফুটকির সঙ্গে তো মালপত্র আছে, ক'দিন থাকবে যখন, জামাকাপড় আরো কত কি নিয়ে আসবে। কে নামাবে ?

—কি যে বোকামি করিস, এতসব মালপত্র, আমি তো গিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম। জগদীশ বললেন।

বড় স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে বেশ ভারী লাগল। নিজেরই সন্দেহ হ'ল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিয়ে যেতে পারবেন কি না। এতসব কি ভরেছে কে জানে।

মুকুলের ওসব দিকে দৃষ্টি নেই, ও এসে পিঙ্কুকে কোলে তুলে নিল, আয় আয়।

তারপরই প্রশ্ন, হ্যাঁ রে ফুটকি, দিল্লি গেল কেন ? দিল্লিতে ওর আবার কি ?

প্রশ্নটা জগদীশেরও। কিন্তু মুখ ফুটে জিগ্যেস করতে পারেননি। তবু একটা দুর্ভাবনা যে ছিল না তা নয়। দুর্ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছিল মুকুলই।

মেয়ে হঠাৎ আচমকা বাপের বাড়ি চলে এলে, আসতে চাইলে, তার মধ্যে যে কোনও ভয় থাকতে পারে, আশঙ্কা থাকতে পারে সে জ্ঞান জগদীশের ছিল না। মুকুল সন্দেহ করেছিল, ভয় পেয়েছিল, হয়ত সুকল্যাণের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেছে।

কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু।

ভয় যে সম্পূর্ণ উবে গেছে তাও নয়। তা না হলে ওই প্রশ্নটা করে বসবে কেন !

অবশ্য প্রশ্ন করারই কথা, কারণ সুকল্যাণের চাকরিতে কখনো কোথাও বাইরে যেতে হতে পারে এমন কথা তো শোনেনি বিয়ের আগে। এ ক' বছরে কখনো কোথাও যেতে হয়নি।

বড় মেয়েকে নিয়ে প্রথম প্রথম খুব ভুগেছেন।

বড় জামাইয়ের ছিল ট্যুরের চাকরি, আজ এখানে কাল সেখানে, বড় মেয়ে থাকত শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে। জামাই বাইরে গেলেই শাশুড়ি অন্য মূর্তি ধরত।

জয়া হাসল মা'র প্রশ্ন শুনে। বললে, সে কি ছাই আমিই জানি নাকি ? কি সব বললে, শুনিওনি। অফিসের কাজ।

—বদলি নয় তো ? তবু সন্দেহ যায় না মুকুলের। ভয়, মেয়ে না নাগালের বাইরে চলে যায়।

আসতে পায় না বড় একটা, দেখাসাক্ষাৎ হয় না, তবু কাছে আছে, এখানেই, সেও তো সান্ত্বনা।

জয়া বললে, না না। এমনি চলে এলাম। কতদিন তোমাদের দেখিনি বল তো।

ভারী স্যুটকেশটা কোনওরকমে দোতলায় তুলে দিয়ে জগদীশ একটু পিঙ্কুকে আদর করলেন।

তারপর বললেন, চলি ভাই, আমার আবার অফিস আছে।

আর তখনই, হয়ত জগদীশকেও শুনিয়ে শুনিয়ে, বেশ গর্বের সঙ্গে জয়া বললে, জানো মা ওকে তো অফিস থেকে দিল্লি পাঠাচ্ছে, প্লেনে যাচ্ছে কিন্তু, প্লেনে, ট্রেনে নয়।

॥ ৪ ॥

চৌকাঠ ডিঙিয়ে এবাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে জয়া এখন ফুটকি।

চার দেয়ালের ঘর নয়, ওর মনে হচ্ছে যেন একটা ছোট্ট সুন্দর দ্বীপে এসে পৌঁছেছে। চোখ শুধু সবুজ দেখছে, চোখ সমুদ্র দেখছে, সমুদ্রের ঢেউ। কোথাও কোনও দেয়াল নেই, শুধু ঝড়ো বাতাসের স্পর্শ। যেখানে শুধু গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে করে।

অনর্গল কথা বলে চলেছে ও, আর হাতের কাজ সারতে সারতে মা হাসি হাসি মুখে

শুনছে। যেন কতকালের কথা জমা হয়ে আছে। যেন কতকাল কথা বলতে পায়নি।

মা এক ফাঁকে বললে, যা তুই চান করে নে, পিঙ্কুকে আমি চান করিয়ে দিচ্ছি।

—হবে হবে।

অর্থাৎ স্নান-খাওয়ার জন্যে তাড়া নেই। ফুটকি বললে, আমি তো ওসব ওখানেই সেরে আসতে পারতাম, কিন্তু তা হলে আধবেলা ছুটি কমে যেত। আসতে আসতে দুটো তিনটে বেজে যেত।

সেজন্যেই শ্বশুরকে দিয়ে ফোন করানো, এসে খাব।

সুকল্যাণ চলে যাওয়ার পরও দুটো দিন কাটিয়ে আসতে হয়েছে, সেটুকুতেই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। তবু চক্ষুলজ্জা। সেই আগে যেমন সিনেমার টিকিট কাটার পরও বলে উঠতে পারত না শাশুড়িকে।

ছুটকু তো বলেই বসল, কেন, এতদিন যেতে পারনি, দাদা যখন ছিল! দাদা যেই গেল, ওমনি বাপের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। তাই না?

কথাটায় বেশ একটা ইঙ্গিত আছে।

বিয়ে হয়নি বলেই বিয়ে সম্পর্কে ওর একটা স্বপ্ন আছে। কল্পনায় কি দেখে কে জানে। হয়ত বিয়ের আগে জয়াও স্বপ্ন দেখত। দেখতই তো।

ছুটকু ঠিক কি বলতে চেয়েছিল? সুকল্যাণকে ছেড়ে জয়া এক মুহূর্তও থাকতে পারে না, নাকি ও থাকলে বাপের বাড়ির কথা ভুলেই থাকে? অথবা বলতে চাইল সুকল্যাণ না থাকলে ওদের বাড়িটাই ওর কাছে দুঃসহ? ছুটকুকে তাই ভাল লাগে না আজকাল। একটা কথাও সোজা ভাবে বলে না।

মেয়েটা তো প্রেমফ্রেম করে বিয়ে করলেই পারত। দেখে মনে হয় একসময় বেশ সুশ্রী ছিল, সুন্দরীই। এখনো আলগা শ্রী আছে। শ্রী ছিল বলেই শ্রীময়ী নাম। দূর, তা অবশ্য নয়, নাম রাখার সময় কি আর ভেবেচিন্তে কেউ রাখে নাকি। শুনতে ভাল লেগেছে, কোথাও পেয়ে গেছে নামটা, বইয়ে-টইয়ে কিংবা চেনাজানা কারো বাড়িতে শুনেছে, ব্যস, রেখে দাও ওই নাম।

প্রেম করে কাউকে বিয়ে করলে ওবাড়িতে কি আপত্তি করত? শাশুড়ি তো ভাব দেখায় কত মডার্ন, দেখা যেত তখন। কে জানে, হয়ত ভেবে বসত, যাক্ বাঁচা গেল। তবে টাকাপয়সার সমস্যা থেকেই যেত। ওদের সেই পিঙ্কুর স্কুলের সামনে রোয়াকে বসা ক্লাবে কত কি তো শুনেছে। আজকালকার ছেলেরা ওসব ব্যাপারে সেয়ানা কম নয়। মেয়েটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে তার বাপের কাছ থেকে পাওনাগণ্ডা আদায় করে নেয়। মীনা বলেছিল, ওর কোন আত্মীয়ের মেয়ে নাকি সেজন্যেই ক্ষোভে দুঃখে সুইসাইড করেছিল।

এখন আর প্রেমফ্রেম ছুটকুর পক্ষে সম্ভব নয়।

ছুটকুর প্রসঙ্গ টেনে এনে আবার কথা শুরু করেছিল জয়া।

মা বললে, তুই যা বাবা, চান করে খেয়ে নে, পরে শুনব।

জয়া একটু অসন্তুষ্ট হল। ভেতরে একটা চাপা ক্ষোভও যেন গুমরে উঠল। ও কি খেতে এসেছে নাকি এখানে। ও তো অনেক কথা নিয়ে এসেছে উজাড় করে দেবার জন্যে। কতদিনের জমা হওয়া কথা। তার মধ্যে হাসিও আছে, আনন্দও আছে, আবার কান্নাও। সব কথা অবশ্য বলবে না, বলা যায় না। তবু হাল্কা হওয়া তো যায়।

ও বললে, পিঙ্কুকে তুমি চান করিয়ে খাইয়ে দাও। ভাইয়া আসুক, আমি ওর সঙ্গে খাব।

বলে এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। যেন কিছুই এর আগে দেখেনি। কিংবা কতটা বদলেছে।

জয়ার কাছে এ বাড়িটার মতোই ভাইয়াও এক লজ্জা। লজ্জা শ্বশুরবাড়িতে।

দাদা বেকার, এ-কথা তবু বলতে পেরেছিল। বি এস সি অনার্স এই কথাটা তখন লজ্জা ঢেকে দিয়েছিল। সুপ্রভাতও বেকার ছিল সে-সময়, তাই বলতে সঙ্কোচ হয়নি। কিন্তু দাদা এখন ক্যাসেটের দোকান করে, বলা যায় কখনো!

—কি আর করবে, কি সব ব্যবসাট্যাবসা। আমি ভাল জানিও না।

শ্বশুর একদিন প্রশ্ন করায় এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিয়েছিল।

আর এক লজ্জা এই বাড়িটা।

—ওই ভাঙাবাড়িটায় কি আছে কি ? রেগে গিয়ে সুকল্যাণ বলেছিল।

রেগে ছিল বলেই বলেছিল। অথচ রাগ তো নিয়ে এসেছিল অফিস থেকে। ও কি করে জানবে।

ওর বুকের মধ্যে ক'দিন ধরেই এ বাড়িতে আসার ইচ্ছে হচ্ছিল। বাবা মাকে দেখার। কিংবা দু'চারদিন এসে থাকার। এক একসময় যে হাঁপিয়ে ওঠে!

বেশ কয়েকদিন ইচ্ছেটা চেপে রেখে শেষে একদিন বলেই ফেললে।

—এই শোনো, আমি ভাবছি দু'দিন ও বাড়িতে থেকে আসব।

তার উত্তরে ওই কথা। জয়া মেনে নিচ্ছে কিছু একটা ঘটেছিল অফিসে। রেগে ছিল, হয়ত নিজের ওপরই।

কিন্তু কথা একবার বলে ফেললে তো ফেরানো যায় না। যত আদর করে ভোলাবার চেষ্টা করো, স্লেটের দাগ নয় ভিজে কাপড় বুলিয়ে মুছে দেবে।

মনে পড়ে গেলেই আজও সারা শরীর জ্বলে ওঠে।

তবু বাড়িটা সত্যিই লজ্জা।

মেয়েদের কেন যে টাকা হয় না। ওরা করতে দেবে না, দিলে চাকরি করত জয়া। কিন্তু তাতেই বা ক'টাকা হবে। সত্যি সত্যি যদি ওর কোনওদিন অনেক টাকা হয়ে যেত, এই বাড়িটাকে একেবারে বদলে দিত ও।

ভেঙে ফেলে একেবারে নতুন না করে ফেলুক, ভেঙেচুরে সারিয়ে সুরিয়ে এমন করে দিত যে দেখে নতুন মনে হত। বারান্দা সিঁড়ি সব ঝকঝকে তকতকে। ঘরের লাল সিমেন্ট তুলে ফেলে মোজেক টাইলস্।

বাবাকে বলত, ওদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে এনে দেখিয়ে দাও। থাকে তো সব ভাড়াবাড়িতে. মোজেক তো বাড়িওয়ালার, জলের পাম্পও, তারা আবার খোঁটা দেয় বাড়ি নিয়ে। আগে একটা ফ্ল্যাট কিনুক, তারপর দেখা যাবে।

—কি রে ভাইয়া, কেমন আছিস। তোর তো টিকিও দেখা যায় না। একবার দেখা করতে গেলেও তো পারিস।

হন্তদন্ত হয়ে ফিরল সুশান্ত। ঘেমে নেয়ে। কথাটা ওরই উদ্দেশে। দাদাকে কোনওদিন দাদা বলেনি। মাত্র দু'বছরের বড় বলে নয়, ছেলেবেলায় কেউ ভাইয়া বলতে শিখিয়েছিল বলে।

—এসেছিস ?

সকালেই শুনেছিল সুশান্ত। মা বাজার যেতে বলেছিল, ভাল মাছ আনার জন্যে। ওর সময় নেই, তাই যায়নি। জগদীশই গিয়েছিলেন।

সুশান্তর কথা বলার ধরনধারণ সবই কাঠ-কাঠ। কিন্তু একবার জমে গেলে অন্যরকম।

ফুটকিকে দেখে, এতদিন পরে দেখে, যতখানি উচ্ছ্বাস হবার কথা তা দেখা গেল না। উচ্ছ্বাস আসবে কি করে, দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো অভিযোগ। 'একবার দেখা করতে

গেলেও তো পারিস।' কখন যাবে, ওর তো চাকরি নয় যে একটা ক্যাজুয়েল নিয়ে নিলেই একদিন ছুটি। তাছাড়া বোনের শ্বশুরবাড়ি, লোকজনও কেউ খারাপ নয়, বরং একটু বেশি বেশি আদর আপ্যায়ন করে, কিন্তু কেমন যেন নিজেকে খাপ খাওয়ানো যায় না। অস্বস্তি না সঙ্কোচ বুঝতেও পারে না।

—অ্যাই পিঙ্কে, এদিকে আয়।

বেশ গম্ভীর ভাবেই বললে সুশান্ত। এই ক'মাসেই অচেনা হয়ে গেল নাকি। মায়ের পা জড়িয়ে পিছন থেকে শুধু মুখটি বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল পিঙ্কু।

হাত ধরে কাছে টেনে আনল সুশান্ত। —সাবাশ, কত লম্বা হয়ে গেছিস! অ্যাঁ।

জয়া বললে, হবে না? এক বছর বাদে এলাম। বাবা তবু গিয়েছে, তুই তো যাসনি।

—তাই? ঈষৎ অবাক হ'ল সুশান্ত। একবছর?

পিঙ্কুকে প্রশ্ন করল, ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিস?

এতক্ষণে সহজ হয়েছে পিঙ্কু, গায়ে হাতে মাথায় আদরের স্পর্শ পেয়ে সাহস হয়েছে।

দুম্ করে বললে, স্কুল! স্কুল বলতে পারো না।

সবাই হেসে উঠল। অর্থাৎ উচ্চারণটা ইস্কুল নয়, স্কুল।

জয়া হেসে বললে, ওর কাছে ইংরিজি শিখতে শিখতে আমিই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। তাও এখন তো সবে কেজি।

চটপট স্নান সেরে এল ওরা। প্রথমে জয়া, তারপর সুশান্ত।

একফাঁকে পিঙ্কুকে স্নান করিয়ে খাইয়ে দিয়েছে মা।

সকলের খাওয়া হয়ে গেলে মুকুল খেতে বসে একা একা। এটাই চিরকালের অভ্যাস। এখনো সেই অভ্যাসই রয়ে গেছে।

আগে ওদের স্কুল ছিল, কলেজ ছিল। যে যার নিজের সময় মতো খেতে বসত, কখনো একসঙ্গে, কখনো পৃথক পৃথক। জগদীশ সেই সকাল নটায়।

তারপর একে একে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, এখন শুধু সুশান্ত। তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই, কখন আসবে হাঁ করে বসে থাকতে হয়।

তার খাওয়া হয়ে গেলে রান্নাঘর সাফসুফ করে, জল থাকলে থালাবাসন এক পোঁছ জলে ধুয়ে এক কোণে বাসন মাজার জায়গায় জমা করে রেখে দেয় মুকুল।

তার পর থালায় ভাত বেড়ে নিয়ে একা একা খেতে বসে। অনেক সময় বাটিতে ডালও নেয় না, ভাতের ওপরই দু'হাতা ঢেলে নেয়। বাসন বেশি হলে ঠিকের মেয়েটা গজগজ করে। তাই।

সুশান্তর এসব দিকে কখনো চোখ পড়ে না। চোখ পড়েনি। ছেলেবেলা থেকে দেখে দেখে ওটাই অভ্যস্ত দৃশ্য। ভাল করে কোনওদিন তাকিয়ে দেখেছে কিনা তাই বা কে জানে।

—ভাইয়া যা, তাড়াতাড়ি চান করে নে, একসঙ্গে খাব।

জয়া বাথরুম থেকে বেরিয়ে বললে।

এ বাড়িতে অবশ্য কেউ কখনো বাথরুম বলেনি। বাথরুম বলাও যায় না। জয়া রীতিমত পা টিপে টিপে ঢোকে, বেরোয়। পিছলে না পড়ে যায়। মুকুল যতই মাঝে-মাঝে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিক, অ্যাসিড ঢালুক, শ্যাওলা যায় না। একটা চৌবাচ্চা আছে, কলে জল তো সব সময় থাকে না, তাই। ইলেকট্রিক পাম্প কোনওদিনই করানো হয়নি, যা দাম, একটা হ্যান্ডপাম্প আছে, আধঘণ্টা হটর হটর করলে দোতলায় জল ওঠে। কল-চৌবাচ্চা নিয়ে সে কি আর বাথরুম, ওরা সেজন্যেই বলে কলঘর।

আলতো ভাবে সারা শরীরে শাড়ি জড়িয়ে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে জয়া

বললে, ভাইয়া যা, তাড়াতাড়ি চান করে নে, একসঙ্গে খাব।

সেই লোভেই এখানে আসার জন্যে ছটফটানি। একসঙ্গে খেতে বসব, গল্প করব।

শ্বশুরবাড়িতে যখন মাঝে মাঝে খুব নিঃসঙ্গ লাগে, ভেতরটা কেমন গুমরে গুমরে ওঠে। কিচ্ছু করার না থাকলে, পিঙ্কু হয়তো ঘুমোচ্ছে, জয়া বিছানায় শুয়ে শুয়ে এখানে চলে আসে। বাপের বাড়িতে। আর টুকরো টুকরো ছেলেবেলা, কিংবা বিয়ের আগের কোনও মুহূর্ত মনে পড়ে যায়।

তখন মাছ সস্তা ছিল, সব কিছুই, জয়ার মনে আছে, একবার একসঙ্গে খেতে বসে ভাইয়ার পাত থেকে মাছের মুড়ো কেড়ে নিয়েছিল। 'রোজ রোজ তুই মুড়ো খাবি কেন রে, ছেলে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছিস?'

কি ঝগড়া, মুকুলও রেগে গিয়েছিল।—দে ফেরত দে।

ফেরত দিতে হয়েছিল। চোখে জল এসে গিয়েছিল জয়ার। মার ওপর ভীষণ রাগ হয়েছিল। অন্যায় আব্দার। আমরা যেন কেউ নই।

সেদিন মাছের মুড়ো খাওয়ার লোভ হয়েছিল জয়ার। সেটা এমন কি দোষের। চোখের সামনে নিত্যদিন দেখতে দেখতে একদিন লোভ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই সেদিন একা শুয়ে শুয়ে ছেলেবেলার দৃশ্যটা মনে পড়তেই কি খারাপ লেগেছিল। প্রথমে হেসে উঠল নিজে নিজেই, তারপর মন খারাপ হয়ে গেল। ছি ছি, কেন যে ওরকম করে বসেছিল। একটা মাছের মুড়ো এমন কি লোভনীয় জিনিস। তার জন্যে এত ছোট হয়ে গিয়েছিল কেন। ভাইয়াকেই তো দিয়েছিল মা, অন্য কাউকে তো নয়। দিদি মেজদিদিকেও নয়।

মুকুল ওদের খাবার বেড়ে দিল। থালা বাটি সাজিয়ে।

ছেলেবেলায় মেঝেতেই বসত, আসন পেতে। তারপর এই চৌকো টেবিল। ডাইনিং টেবিল বলতে যা বোঝায় তা নয়। চৌকো মতো স্টিল-এর। স্টিল না ছাই। রঙ উঠে গিয়ে মরচে ধরেছে। চারটে ফোল্ডিং চেয়ারেও।

ওদের দু'জনকে ভাত দিয়ে মুকুল রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, জয়া বলে বসল, তোমার কই।

—সে হবে'খন, তোরা খা না।

জয়া রেগে উঠে পড়ল, চল তোমার ভাত নিয়ে আসছি। একসঙ্গে খাব বললাম।

মুকুলকে বাধ্য হয়ে একসঙ্গে খেতে বসতে হল। না বসে উপায় নেই, মেয়ে কি কম জেদি। বলেছে যখন বসতে বাধ্য করবেই।

নিজের থালা বাটির ওপর চোখ বুলিয়েই জয়া বলে উঠল, অসম্ভব।

ওর বাটিতে বেশ বড়োসড়ো আধখানা মাছের মুড়ো। সুশান্তকে এক পিস মাছ শুধু। বোধহয় বাকি আধখানা মুড়ো বাবাকে দিয়েছিল।

এক মুহূর্ত কি ভাবল জয়া, তারপর মুড়োটা তুলে মা'র পাতে দিয়ে দিল।

হৈ হৈ করে উঠল মুকুল।

সে এক রীতিমত কোলাহল। মা মেয়েকে দিতে চাইছে, মেয়ে হাত ধরে আটকাচ্ছে, মা ছেলেকে দিতে যাচ্ছে, ছেলে আটকাচ্ছে হাত দিয়ে, সবাই হাসাহাসি করছে।

শেষে সুশান্তই বললে, খাও না মা, তুমি তো কখনো খাও না।

মুকুল শেষ অবধি নিতে বাধ্য হ'ল, তবু বললে, আমার ল্যাজাই ভাল লাগে।

কেন ভাল লাগে তা যেন কেউ জানে না। ভাল মাছের টুকরোগুলো সকলকে খাইয়ে দাইয়ে ল্যাজাই তো থাকে। খেতে খেতে সেটাই অভ্যাসে দাঁড়ায়, উপাদেয় মনে হয়।

মাকে মাছের মুড়ো খেতে দেখে জয়ার ভাল লাগছিল। প্রথমে ও ভেবেছিল ভাইয়ার

পাতে তুলে দেবে, ভাগ্যিস দেয়নি।

—তোর বাবা নিজে গিয়ে মাছ নিয়ে এল। মুকুল বললে।

এ বাড়িতে এখন নিত্যদিন মাছ আসে কিনা জয়ার জানা নেই। ও তো আনন্দ করে এল ওখানে, ওর জন্যে আবার খরচখরচা বেশি না হয়ে যায়।

শ্বশুরবাড়িতেই এখন পিস হিসেব করে মাছ আসে। তাও তো ওখানে দু'জনের আয়। সুকল্যাণও সংসারে দেয় কিছু।

—হ্যাঁ রে ভাইয়া, তোর ব্যবসা কেমন চলছে ?

খেতে খেতে জিগ্যেস করল জয়া।

সুশান্ত হেসে উঠল।—ব্যবসা ! ভাল বলেছিস।

আসলে একটা ফালি মতো দোকানঘর, দোকানও বলা চলে না, ক্যাসেট ভাড়া দেওয়া। তাকে আবার কেউ ব্যবসা বলে ! জয়া শ্বশুরকে বলেছিল, কি সব ব্যবসাট্যাবসা, জানিও না ভাল করে। লজ্জা চাপা দেবার জন্যেই বলেছিল। তার পর থেকে নিজেও ব্যবসা ভাবতে শুরু করেছে।

একটু থেমে সুশান্ত বললে, চলত, ভালই চলত, ক্যাপিটেল থাকলে।

জয়া ঠিক বুঝতে পারল না, অবাক হয়ে তাকাল।—ক্যাপিটেল ?

—কম পুঁজিতে আজকাল কিছুই হয় না।

—কেন, হয় না কেন ! জয়া নির্বোধের মতো মুখ করল।

সুশান্ত হেসে বললে, আরে প্রচুর ক্যাসেট রাখতে পারলে তবেই তো কিছু আসবে। যা আছে সব দুমাসেই দেখে ফেললে আর খদ্দের আসবে কেন ?

একটু থেমে বললে, তাও ভাড়া নিয়ে এনে দিই, তাতে তেমন কিছু থাকে না।

মুকুল চুপচাপ শুনছিল, মেয়ে জিগ্যেস করল তাই দু'একটা কথা শুনতে পেল। ছেলের কাছ থেকে প্রশ্ন করে কিছু জানাই যায় না। জিগ্যেস করলে মুখভঙ্গি করে বলে, চলছে। কিংবা, 'ওই একরকম'। আরে ওতে কি কিছু বোঝা যায় নাকি।

নিজের মনেই যেন সুশান্ত বললে, টাকা পেলে দেখিয়ে দিতাম।

জয়া হেসে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই খারাপ লাগল। বেচারি।

মুকুল বলে বসল, কি যে চলছে, ওই জানে। একটা পয়সাও তো দেয় না।

সুশান্ত হেসে ফেলে বললে, যখন দেব তখন রাখার জায়গা পাবে না।

—ছাই ! মুকুল বললে।

জয়ার কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল। ওর ভেতরে ভেতরে একটা বাসনা ছিল, স্বপ্নও বলা যায়, যে এসে শুনবে ভাইয়ার ব্যবসা রমরম করে চলছে। অনেক লাভ। আরো বড় দোকানঘর। ভাল জায়গায়।

কেমন হতাশ হয়ে গেল ও। কি যেন মনে মনে ভাবল।

হঠাৎ বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললে, আমার কখনো যদি খুব টাকা হয়ে যায়, দেখিস ভাইয়া, তোর যত ক্যাপিটেল চাই...

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মুকুলও।

সুশান্ত বললে, লটারির টিকিটফিকিট কিনছিস বুঝি ?

মুকুল হাসতে হাসতে বললে, তা কেন। সুকল্যাণের টাকা হওয়া মানেই তো ফুটকির টাকা হওয়া। ওরা কি আলাদা নাকি।

একটু থেমে বললে, হতেও তো পারে।

জয়া প্রথমে কিছু বলল না। একমনে যেন খেয়েই যাচ্ছে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, তা কেন বলছ মা, ওর টাকা ওরই। আমি বলছিলাম,

আমার যদি কখনো টাকা হয়, অনেক টাকা...ব'লে মৃদু হাসল।

মুকুল বোধহয় একটু থমকে গেল। কপালে কোনও চিন্তার রেখা ফুটল কি!

ধীরে ধীরে বললে, কি জানি বাপু, আজকালকার কিছুই বুঝি না। আমরা তো সেকেলে, অত আমার তোমার বুঝতাম না। জানতাম, তোর বাবার টাকা মানে আমারই টাকা, আমার টাকা মানে তোর বাবারই।

একটু চুপ করে থেকে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, হাসতে হাসতে বললেন, বিয়ের পর যা মুখ-দেখানি টাকা পেয়েছিলাম, তোর বাবার হাতেই তুলে দিয়েছিলাম, কিচ্ছু মনে হয়নি।

সুশান্ত হেসে বললে, বোকা ছিলে তাই।

—হবে হয়তো। মুকুল হাসল।—কিন্তু ক্ষতি তো কিছু হয়নি।

জয়া কিছু বলল না। বরং একটু অবাকই হ'ল মা'র আত্মতৃপ্ত ভাব দেখে। এত অভাবের সংসারে থেকেও কোত্থেকে যে এই তৃপ্তি পায় বুঝে উঠতে পারে না। অথচ ভাল লাগে।

সেকেলে মানুষদের মধ্যে আর কিছু না থাক, বোধহয় এটাই ছিল। সব দুঃখ কষ্ট দুশ্চিন্তার ভিতর থেকে তৃপ্তি বের করে আনতে পারত। কি ধরনের তৃপ্তি কে জানে। তবু ভাল লাগে একটা কথা ভেবে, মা আর বাবা দু'জনেই সুখী। দু'জনে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

সকলের খাওয়া হয়ে যেতেই মুকুল থালা গ্লাসগুলো দু'হাতে তুলে নিয়ে উঠছিল, জয়াও সুশান্তর থালাটা তুলতে গেল। মুকুল না না করে উঠল।

আর সুশান্ত হেসে বললে, তুই আবার ওসব করতে যাচ্ছিস কেন, রেস্ট নে, রেস্ট নে। খাবিদাবি, আড্ডা দিবি, ঘুমোবি। মেয়েরা বাপের বাড়িতে আসে তো হেলথ্‌ রিকুপ করতে, খেটে খেটে...

জয়ার মুখেচোখে সঙ্গে সঙ্গে কপট রাগ।—দ্যাখ্‌ ভাইয়া, বাজে কথা বলিস না, শ্বশুরবাড়ির নামে দোষ দিতে পারব না, কেউ আমাকে খাটায় না।

সুশান্ত হেসে ফেললে।—বাব্বা, শ্বশুরবাড়ির নামে একটু কিছু বললেই যে তোর গায়ে ফোস্কা পড়বে তা কে জানত।

মুকুলও হাসল। যেটুকু কৌতূহল ছিল, দুর্ভাবনা কখনো কখনো উঁকি দিচ্ছিল, মুহূর্তে সব মুছে গেল।

থালা বাটি নিয়ে যেতে যেতে মুকুল বেশ খুশি খুশি ভাবে বললে, ফুটকি, তোর দৌলতে একটা কাজ কিন্তু হ'ল, সুশান্ত রয়েবসে আমাদের সঙ্গে তবু একটু গল্প করল।

একটু থেমে বললে, ও তো আজকাল কিছু জিগ্যেস করলে ভাল করে উত্তরও দেয় না। আর বাবার সঙ্গে তো বাক্যালাপ নেই বললেই হয়।

সত্যি তাই। সব দোষ যেন জগদীশের। শুনেছিলেন সায়েন্স না পড়লে আজকাল কোথাও কিছু হবার জো নেই। তাই পড়িয়েছিলেন। কি হ'ল?

একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে না পারাও যেন জগদীশেরই দোষ।

কি করে জুটিয়ে দেবেন। ওঁর চেনাজানার গণ্ডিটাই এত ছোট, তারা মাপেও ছোট, ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে চাকরি করে দিতে বড় মাপের আত্মীয়স্বজন দরকার। দু'একজন যা আছে, তারা এড়িয়ে যাবার জন্যে কথায় কথায় 'ইউনিয়ন' শোনায়। যেন সব চাকরি ইউনিয়নের মাতব্বররাই ঠিক করে দিচ্ছে। দু'চারটে হয়তো করে ঠিকই। কিন্তু আসল কথাটা কেউ বলে না। স্পষ্ট বললেই তো হয়, আমার ক্ষমতা নেই। কিংবা আমার ভাইপোর জন্য একদিন বলতে হবে, অন্যের জন্যে এখন বললে, তখন বলতে অসুবিধে।

তবে ভাইপো-ভাগ্নের জন্যে আজকাল কেউ বলে কিনা সন্দেহ।

জগদীশ কি আর করবেন। একটাই কাজ ছিল। রবিবারে একটা ইংরেজি কাগজ নিতেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে দাগ দিয়ে রাখতেন। দরখাস্তের বাঁধা গতের চিঠিটাও নিজেই ডিকটেশন দিয়ে লিখিয়েছিলেন। তারপর টাইপ করিয়ে সই করিয়ে নিজেই ডাকবাক্সে ফেলে দিতেন অফিস যাওয়ার পথে। কোনও কোনও দরখাস্তের সঙ্গে আবার পোস্টাল অর্ডার। কিচ্ছু হয়নি, শুধু কিছু টাকা গচ্চা গেছে। দু'চারটে ইন্টারভিউ এসেছে, চার ছ'মাস বাদে, ইন্টারভিউয়ের ফল আর জানা যায়নি।

শেষে এই ক্যাসেটের দোকান করার আইডিয়া। সুশান্তর নিজের মাথা থেকেই এসেছিল। ওর কোনও বন্ধুর কাছ থেকে শুনে।

জগদীশের বাড়িতে এখনো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টি ভি। হায়ার পারচেজে কিছু কিনতে ভয় পান, তাই কালার টি ভি কিনতে পারেননি। ওটাও কিনেছিলেন নেহাত বাধ্য হয়ে। বিয়ের আগে নিত্যদিন জয়ার বায়না তখন। সেটাই চলছে এখনো সারিয়ে-সুরিয়ে।

ভি সি পি কিংবা ভি সি আরের কোনও খবরই রাখতেন না।

সুশান্ত একদিন এসে বোঝাতে বসল। ক্যাসেটের দোকান। কিছু টাকা পেলেই করা যায়।

সুশান্ত তখন জগদীশের পিছনে পিছনে ঘুরছে। সুযোগ পেলেই বাবার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়, মা'র সঙ্গে কি ভাল ব্যবহার। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা এনে ফেলে ক্যাসেটের দোকানে।

জগদীশ জানেন, দিন ঘনিয়ে আসছে, টাকাই একমাত্র ভরসা। তাই হাতছাড়া করতে ভয়। মনেও বদ্ধমূল ধারণা, ও কি ব্যবসা করবে, টাকা স্রেফ উড়িয়ে দেবে দু'দিনে।

শেষ অবধি মুকুলই ছেলের পক্ষ নিল।—দাও না কিছু টাকা, কিছু একটা তো ওকে করতে হবে।

দিয়েছিলেন। যদিও ক্যাসেটের দোকান করা একেবারেই মনঃপূত হয়নি।

একদিন গিয়ে দেখেও এসেছেন।—এত ছোট!

দেখেশুনে একটাই মন্তব্য। টাকার যে আজকাল দাম নেই বুঝতে চান না।

কেমন চলছে না চলছে তাও ভাল করে জানেন না, জানতে চান না। জানতে চাইলেই হয়তো আরো টাকা চেয়ে বসবে, সেই ভয়ে।

এখন আর সুশান্ত কাছাকাছি আসে না। এড়িয়ে এড়িয়ে থাকে।

জগদীশ জানেন ছেলে বড় হয়ে গেলে আপনা থেকেই একটা দূরত্ব গড়ে ওঠে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্যে এমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলবে কেন।

ওঁর কি ইচ্ছে হয় না, এই সব টাকাপয়সার সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে ছেলের সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে।

দোষ সুশান্তর, না ওঁর নিজেরই, তা বুঝতে পারেন না। দু'একবার দেখেছেন, সুশান্ত যেসব কথা বলে, ওঁকে তা স্পর্শও করে না। যেন অন্য ভাষায় কথা বলছে। আর উনি যখন কথা বলেন, সুশান্ত কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আগের মতো তর্কও করে না। উনি যা বলছেন তা যেন শুনতেই পাচ্ছে না, শুধু হুঁ আর না। ভীষণ ছোট লাগে নিজেকে। মনে হয়, সুশান্ত ওঁকে তাচ্ছিল্য দেখাচ্ছে। মানুষই বলে গণ্য করছে না।

বড় অপমান লাগে।

এক একদিন চোখে জল এসে যেত।

এখন আর তাও আসে না। এখন আর ডাকেনও না।

শুধু মাঝে মাঝে বড় একা লাগে। বড় নিঃসঙ্গ। এক ছাদের তলায় থেকেও সবাই কেমন দূরে দূরে। সবারই মাতৃভাষা যেন আলাদা। মুকুলেরও। উনি উচ্ছল হয়ে বলতে এলেন, একটা সুখবর আছে। মুকুলের মুখচোখে ফুটে উঠল আতঙ্ক।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে হাসি পেল।

একদিন সুশান্তকে দেখতে পেলেন দরজার সামনে দিয়ে পাশের ঘরে গেল।

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। ডাকলেন, সুশান্ত, শুনে যা।

—যাচ্ছি।

ব্যস্। ওই সাড়া দেওয়া শুধু।

জগদীশ বসেই আছেন, অপেক্ষা করছেন, ছেলে কখন আসে।

অধৈর্য হয়ে আবার ডাকলেন।

সুশান্ত এল। —কি বল।

এরকম কেন যে হয়। কোথায় যেন একটা চাপা ঔদ্ধত্য। অথচ জগদীশের যখন ওই রকম বয়েস, বাবার ডাক শুনে কত বিনীত ভাবে 'আজ্ঞে' বলে ছুটে আসত। কতদিন বাবার গা হাত টিপে দিয়েছে।

সুশান্ত এসে দাঁড়াতেই, দাঁড়িয়েছে তো কপাটের কাছে, যেন সুযোগ পেলেই হ্যাঁ কিংবা না ব'লে পালাবে।

জগদীশ চেষ্টা করে মুখে হাসি আনলেন। —আয় না, বোস এখানে।

খাটের বিছানায় আধশোয়া ছিলেন, উঠে বসলেন।

—সামনে বোস।

বিরক্ত মুখে এসে বসল সুশান্ত।

হাসি হাসি মুখে জগদীশ বললেন, আয় তো, তোর সঙ্গে একটু পাঞ্জা লড়ি।

বিমূঢ় চোখে তাকাল সুশান্ত। —পাঞ্জা, আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আয় দেখি।

সুশান্তকে এ ঘরে ঢুকতে দেখেই মুকুলও এসে হাজির। ওর সব সময় ভয়, জগদীশ কিছু না বলে বসেন, সুশান্ত না কথা কাটাকাটি করে। সামলাতে হলে তো ওকেই হবে।

কিন্তু পাঞ্জা লড়ার কথা শুনে হেসে ফেলল।

—কি পাগলামি করছ?

জগদীশ হাসলেন, বললেন, তা নয়। বড্ড দুর্বল লাগছে কিছু দিন থেকে, দেখছি কতটা দুর্বল হয়েছি।

পাঞ্জা এগিয়ে দিলেন। —ধর না, দেখি।

বাধ্য হয়েই সুশান্ত পাঞ্জা বাড়াল।

জগদীশ শক্ত করে ধরেছেন, হাত সোজা রেখেছেন। —জোর দে, আরো জোর দে।

সুশান্ত জোর দিচ্ছে, জগদীশও দিচ্ছেন।

বেশ কিছুক্ষণ। তারপরই হেরে গেলেন।

হেসে ফেললেন জগদীশ। —সাবাশ।

বললেন, আছে রে, গায়ে জোর আছে রে এখনো আমার।

ব'লে সুশান্তর পিঠে হাত রাখলেন। হ্যা হ্যা করে হাসছেন মুকুলের দিকে তাকিয়ে। মুকুলও। তা দেখাদেখি সুশান্তও হাসল।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল।

নিজের মনেই তখনো হাসছেন জগদীশ। সারা শরীরে, মুখে কি আনন্দ। কি তৃপ্তি।

মুকুল হয়তো বুঝতে পারেনি। কি করে বুঝবে।

হাসতে হাসতে বললে, কি যে ছেলেমানুষি করো।

ছেলেমানুষিই তো। মুকুলের কাছেও লজ্জা। সত্যি কথাটা তাই মুখ ফুটে বলতে পারেননি।

হঠাৎ বড় ইচ্ছে হয়েছিল সুশান্ত এসে কাছে বসবে, ওকে ছোঁবেন, ওর ছোঁয়া পাবেন। এখন জগদীশ বুঝতে পারেন, বাবা আসলে গা-হাত-পা টেপাতে চাইত না, ছোঁয়া পেতে চাইত। সেই জাদুস্পর্শ!

জগদীশেরও সেই ইচ্ছে হয়েছিল। ওকে তো আর বলা যায় না সেকথা। ওরা তো এখন অন্য কালের মানুষ। হয়তো এড়িয়ে যাবার জনেই বলে বসবে, আমার সময় নেই।

সেইজন্যেই পাঞ্জা লড়া। হাতটা ছুঁতে পারবেন। অনেকক্ষণ ধরে। 'সাবাশ' 'সাবাশ' বলে পিঠেও হাত বুলিয়ে নিয়েছেন। আঃ, কি তৃপ্তি।

সেই দৃশ্য মনে পড়ে যেতে হেসেই ফেললেন।

কি ভাল লাগে সব কাছে কাছে থাকলে। এই যে ফুটকি এসেছে, কথা বলছে হাসছে, কি ভাল লাগছে।

আজ অফিস থেকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন তো সেজন্যেই।

'পাংচুয়েল'। ঠিক ন'টায় অফিস বেরিয়ে যান, দেরি করেন না, তাই ওঁর পাংচুয়ালিটি নিয়ে সবাই ঠাট্টা করে। কে জানে, ওটা ওঁর কর্তব্যপরায়ণতা, অভ্যাস, নাকি নিঃসঙ্গতা থেকে পালানোর চেষ্টা।

এখন আর একটুও নিঃসঙ্গ লাগছে না।

সন্ধেবেলায় এ সময়ে টি ভি দেখা জগদীশেরও অভ্যাস। ঠিক যে দেখেন তাও নয়, টি ভি খোলাই থাকে, ভাল লাগলে দেখেন, না লাগলে ফাঁকে ফাঁকে দেখেন, মুকুলের সঙ্গ গল্প জুড়ে দিয়ে।

আজ টি ভি ফুটকিই খুলেছে, কি একটা সিরিয়াল দেখা ওর অভ্যাস, সেটা না বাদ পড়ে যায়।

ও-বাড়িতে কালার টি ভি। এ ব্যাপারে শাশুড়ি রীতিমত মডার্ন। ফ্রীজ, টি ভি, আরো কত কি, সব আগে আগে পাওয়া চাই। পাড়ার অন্য কারো চেয়ে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। অথচ শ্বশুর তো এমন কিছু ভাল চাকরি করেন না। হয়তো সুকল্যাণের টাকায়। জয়া জানেও না, ও এসে থেকেই দেখছে ও-সব আছে।

জয়া হেসে বললে, বাবা, এবার একটা কালার কেনো।

—কার জন্যে কিনব রে। তোরাও চলে গেছিস, সুশান্ত তো বাড়িতেই থাকে না।

—কেন, মা ? একা একা থাকে, তুমিও তো দেখছ।

জগদীশ হাসলেন।—ঠিক ঠিক। তোর মায়ের কথাটা মনেই থাকে না। আমার কথা ছেড়ে দে, আমার ওতেই চলে যায়।

জয়া শুধু হাসল। মনে মনে ভাবল, বাবা সেই এক রকমই রয়ে গেছেন। কোনও স্বপ্ন নেই, উচ্চাশা নেই, বাঁচার মতো করে বাঁচার ইচ্ছেও নেই। চলে গেলেই সন্তুষ্ট, জীবন যেন শুধু চলে যাওয়া। অথচ তার মধ্যেই কি এক তৃপ্তি। তখনকার মানুষগুলোই কি এইরকম ছিল নাকি।

এখন আমাদের সব চাই। হয়তো সব আছেও। পিঙ্কুর স্কুলের সামনে রকে বসে অপেক্ষা করার সময় যাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে, তাদের অনেকের তো অনেক কিছু আছে। বাড়ি গাড়ি, কত সব দামি দামি শাড়ি পরে আসে। কিন্তু অতৃপ্তি যায় না। দু'দশ মিনিট আড্ডা দিলেই ঠিক ফুটে বেরিয়ে আসে। জয়া নিজেও বুঝতে পারে না ও সুখী না অসুখী। ওদের সময়টাই বোধ হয় অন্যরকম।

—জানো মা, আমার শাশুড়ি নাকি কম বয়েসে, মানে বিয়ের পরে, একবার বব করে চুল রেখেছিল। মানে ঘাড় পর্যন্ত।

জগদীশ টি ভি দেখার নাম করে পিঙ্কুকে কোলে বসিয়ে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন।

তিনিও হেসে উঠলেন।

মুকুল বললেন, বলিস কি ? মুখে অবিশ্বাসের হাসি।

জয়া বললে, আমিও বিশ্বাস করিনি। শাশুড়ি নিজে বলেছিল তাও। হাসতে হাসতে বললে, শ্বশুরকে জিগ্যেস করেছিলাম, বললেন সত্যি।

মুকুল যেন একটু বিচলিত হ'ল। —তুই আবার যেন ওইসব করতে যাস না।

—পাগল হয়েছ। জয়া গম্ভীর হ'ল। বললে, যত মডার্ন ওই চুলে, তোমার জামাই সঙ্গে নিয়ে সিনেমা যাবে, তাও আগে থেকে বলতে হবে।

প্রসঙ্গ বদলে গেল। দু'জনে ডুবে গেল জয়ার শ্বশুরবাড়ির গল্পে।

জগদীশ পিঙ্কুকে নিয়ে যেন মাতাল হয়ে গেছেন। কোনও কথাই ওঁর কানে যাচ্ছে না। টি ভি এখন শুধু শব্দ। চলছে কিন্তু চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য।

শ্বশুরবাড়িটাও যে এই দু'সপ্তাহে ওই টি ভি-র মতোই হয়ে গিয়েছিল। শব্দ আছে, কথা কানে যাচ্ছে না, ছবি আছে, চোখ দেখছে না। তেমনই। শুধু আছে এটুকুই মনে আছে। ফাঁকে ফাঁকে সুকল্যাণের কথা হয়তো মনে পড়ছে, মনে পড়ছে না। একেবারে অন্য জগতে চলে গিয়েছিল জয়া।

পিঙ্কুকে তার স্কুলে কোনওদিন নিয়ে গেছে, কোনওদিন যায়নি। ভারী তো স্কুল। কে জি।

খবর পেয়ে মাসিমা একদিন ঘুরে গেছে, সুশান্ত ওকে সঙ্গে নিয়ে একদিন মেজদির বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে।

জামাইবাবু অনেক বার থাকতে বলেছে, একটা দিন, তাও থাকেনি জয়া।

ক'দিনের মাত্র ছুটি। বাবা-মা'র কাছে না থেকে একটা দিনও নষ্ট করতে ইচ্ছে হয়নি জয়ার।

কিন্তু এভাবে যে হঠাৎ ছুটি ফুরিয়ে যাবে ভাবতে পারেনি।

বিষণ্ণ মুখে ফিরলেন জগদীশ।

অফিস থেকে ফিরে জুতো খুলতে খুলতে ডাকলেন, ফুটকি।

হেসে বললেন, দুঃসংবাদ আছে।

দুঃসংবাদ হয়তো জগদীশের জন্যে। না, জয়ার জন্যেও।

—কি হয়েছে ? মুকুলের মুখেচোখে আতঙ্ক।

মুকুল সারাজীবন ধরে শুধু ভয় পেতেই শিখে এসেছে। সেজন্যেই 'দুঃসংবাদ' শুনে ওর চোখ ভয় পেল।

তা দেখে জগদীশ হেসে ফেললেন।

হাসতে হাসতে বললেন, বেয়াই ফোন করেছিল।

একটু থেমে বিষণ্ণ ভাবে বললেন, সুকল্যাণ পরশু ফিরছে। কালই ওকে যেতে বললেন।

মুকুলের মুখ থেকে আতঙ্ক উবে গেল। ধমকের সুরে বললে, দুঃসংবাদ বললে কেন। জামাই ফিরে আসছে, ফুটকি যাবে, সেটা কি দুঃসংবাদ নাকি।

জগদীশ লজ্জা পেলেন। ভেবেচিন্তে তো বলেননি, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আসলে এ ক'দিন বেশ কাটছিল। কেমন একটা সুখ-সুখ ভাব। সেটা ফুরিয়ে গেল

বলেই বলে ফেলেছেন।

কি আর উত্তর দেবেন মুকুলের কথায়। শুধু মুখে খানিকটা নির্বোধের হাসি মাখিয়ে লজ্জিত ভাবে তাকালেন জয়ার মুখের দিকে।

জয়ার মুখ থেকেও তো সব সুখ উবে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন।

॥ ৫ ॥

'একটা দুঃসংবাদ আছে।' জগদীশের মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল। অত ভেবেচিন্তে কিছু বলেননি।

জয়া ছিল, তাই বাড়িটা, যার বাইরে রঙ পড়েনি বহুকাল, ঘরের ভিতরের দেয়ালে চুনকাম হয়েছে বছর পাঁচেক আগে, সেই বাড়িটা হঠাৎ ক'দিনের জন্যে রঙ-ঝলমল হয়ে উঠেছিল। সন্ধেবেলাটা আগের মতো নিস্তব্ধ ছিল না। পিঙ্কু তো সারা বাড়ি মাতিয়ে রেখেছিল ; মনে পড়িয়ে দিয়েছিল ওঁর যৌবনের দিনগুলো। সত্যি, বাড়িতে একটা বাচ্চা ছেলে দিনরাত কলকল কথা না বললে, এটা ওটা ভাঙচুর না করলে, সমস্ত কিছু কেমন প্রাণহীন মনে হয়। সংসার যে নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিল পিঙ্কু আসার আগে বুঝতেই পারেননি।

বাচ্চা বয়েসে সুশান্ত কি দস্যিপনা করে বেড়াত।

জগদীশের বৃদ্ধ বাবা উপভোগ করতেন, আরামকেদারায় শুয়ে-বসে।

জগদীশ রেগে গিয়ে কি জন্যে যেন ধমক দিয়েছিলেন সুশান্তকে। নিজের বাবাকেও। —আপনি আর নাম খুঁজে পেলেন না ; সুশান্ত।

বাবা হেসেছিলেন। —ধমকাচ্ছিস কেন ওকে। ওরকম সকলেই করে।

একটু থেমে বলেছিলেন, সুখ সুখ করে সকলে, সংসারে সুখ ওরাই নিয়ে আসে রে। টাকা পয়সা আনে না।

সস্তগণ্ডার দিন ছিল, তাই কথায় কথায় টাকাপয়সাকে তাচ্ছিল্য দেখাতে পারতেন ওঁরা। বাবার কথার পিঠে জগদীশ কিছু বলেননি।

মুকুল কিন্তু দিব্যি বলে বসেছে, আপনাকে তো আর সামলাতে হয় না। অর্থাৎ ছেলেকে সামলানো।

ওট অভিযোগ নয়, চাপা গর্ব আরো চেপে দেওয়া।

তখন বাবার কথাগুলো ভাল বুঝতেন না জগদীশ। এখন বুঝতে পারছেন। সংসারে সুখ ওরাই নিয়ে আসে।

আলো-উজ্জ্বল একটা গোটা পাড়া হঠাৎ লোডশেডিংয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার মতো জগদীশের বুকের ভেতরটা যেন নিভে গিয়েছিল নির্মলেন্দুবাবুর ফোন পেয়ে।

ভেবেছিলেন একটা মাস থাকবে। সে-রকমই শুনেছিলেন।

মাত্র দিন পনেরো কেটেছে তার মাথাতেই এই খবর।

—সুকু ফিরছে পরশু। পাঠিয়ে দিন জয়াকে।

সুতরাং দুঃসংবাদ তো মনে হবেই। টালবাহানা করে কোনও অজুহাতে আরো কিছুদিন ফুটকিকে রেখে দেওয়ার কথা বলতেও পারেননি। আচমকা এ ধরনের কথা শুনে কোনও অজুহাত দেখানোর কথাও মাথায় আসেনি।

বাড়ি ফিরে তাই বলে ফেলেছিলেন, একটা দুঃসংবাদ আছে।

মুখ ফসকে বেরোনো কোনও কোনও কথা কি জীবনে সত্যি হয়ে যায়।

জগদীশ জানেন না। বিশ্বাস করেন না। আসলে এ সব বোধহয় আমরা অন্ধবিশ্বাস

থেকে টেনে মিলিয়ে নিই।

তবু জগদীশের নিজেকে এখন অপরাধী মনে হয়।

অথচ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি।

জয়ার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। সুকল্যাণ ফিরে আসছে বলে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ, নাকি বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে বিষণ্ণ। ও তো আশা করেছিল আরো দু' সপ্তাহ থাকতে পাবে।

জগদীশই পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন। অফিস থেকে ফিরে পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল।

নির্মলেন্দু হৈ হৈ করে উঠলেন, বেয়াই এসেছেন, বেয়াই।

অমিতাও ছুটে এলেন। ছুটকুও।

—এত রাতে? হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন নির্মলেন্দু। জগদীশ হাসলেন। —আপনার বেয়ান যে না খাইয়ে মেয়েকে পাঠাতে চাইল না।

নির্মলেন্দু রসিকতা করলেন, কেন, জয়াকে আমরা খেতে দেব না ভেবেছিলেন নাকি?

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

জগদীশকে চা-মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়লেন না অমিতা।

খুশি মনে ফিরে এলেন জগদীশ।

আর জয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘর গোছাতে। মাত্র পনেরো দিন ছিল না, এরই মধ্যে ঘরখানা দেখে মনে হয় যেন পনেরো মাস ছিল না। ধুলো জমেছে আসবাবপত্রে, জানালায় দরজায়। মেঝে পরিষ্কার হয়নি কতদিন।

ঠিকের মেয়েটা ঘর মুছছে কিনা তাও লক্ষ রাখেনি ছুটকু। অমিতা ওসব দেখেনও না।

অমিতা পিঙ্কুকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। ও না থাকায় জয়ার সুবিধেই হয়েছে। ও তো একটা দস্যি ছেলে, সারাক্ষণ এটা ওটা টানছে, অকারণে কিছু একটা বের করছে, কিংবা ছুড়ে ফেলছে। কিছু না পেল তা শখের টাইমপিস ঘড়িতে অকারণ দম দিয়ে দিল, কিংবা কাঁটা ঘুরিয়ে দিল। ঘড়িটাকে সেজন্যে আর বিশ্বাসই করে না জয়া। বিশ্বাস ক'রে দু'দিন স্কুলে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

টি ভি শ্বশুরশাশুড়ির ঘরে, সবদিন সময় মেলানোও হয়ে ওঠে না। কাজের ফাঁকে ভুলে যায়।

ওই একটা ব্যাপার বড় বিরক্তিকর, এক ঘরে বসে শ্বশুরশাশুড়ির সঙ্গে টি ভি দেখা। ছুটকুরও। বলেছিল একদিন।

আজকাল যা সব সিনেমা টিনেমা হয় শ্বশুরশাশুড়ির ঘবে বসে দেখা যায় না। সুকল্যাণ থাকলে আরো অস্বস্তি। কাজের অছিলা করে বেরিয়ে আসতে হয় জয়াকে। শব্দ শুনে যখন বুঝতে পারে দৃশ্যটা পার হয়ে গেছে তখন ব্যস্ততা দেখিয়ে গিয়ে বসে। যেন কত কাজ করে এলাম।

অথচ ওই দৃশ্যগুলো দেখতে ইচ্ছেও হয়, ভাল লাগে।

একই বাড়িতে আরেকটা টি ভি কেনার কথা বলাও যায় না, সম্ভবও নয়। বুড়োবুড়িরা কি যে দেখে, কেন যে দেখে এসব। ওদের ভাল লাগবার কথা নয়। তবু।

জয়া রিস্টওয়াচ খুলে ব্যাগে ঢুকিয়েছিল, বের করে সময় দেখল। এক মুহূর্ত ভাবল টি ভির সঙ্গে মেলাবে কিনা। না।

পিঙ্কুর বকবকানি শুনতে পাচ্ছে পাশের ঘর থেকে। অমিতার গলা, কখনো ছুটকুর গলা। প্রশ্নই বোধ হয়।

জয়া সব জানে। জেরার পর জেরা চলবে এখন দু'দিন ধরে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পেটের কথা সব বের করে আনবে। আর ওই শয়তানকে বেশি খোঁচাতেও হয় না, গড়গড় করে এই পনেরো দিনের সব হিসেব না বলে ওর শান্তি নেই। কোনও কথা বলতে বারণ করলে সেটাই প্রথম বলবে।

বলুক। উপায় তো নেই। জানতে আর বাকিই বা কি আছে।

লুকোনোর মধ্যে একটাই জিনিস। অভাব। দারিদ্র্য। বাপের বাড়ির অভাব অনটনই বেশি লাগে, বেশি লজ্জা।

আরেকটা ব্যাপার লুকোনোর আছে, ভাইয়ার ক্যাসেটের দোকান। খুব বড় দোকান হয়ে গেলে তখন আর লজ্জা হবে না।

সুশান্ত একদিন একটা ভি সি পি কার কাছ থেকে ভাড়া কিংবা ধার নিয়ে এসে তিন তিনটে ছবি দেখিয়েছিল। পরপর তিনটে ছবি। দেখে সে কি মাথায় যন্ত্রণা।

তবু, দেখেছে সেটুকুই গর্ব। পিঙ্কু যদি বলে বলুক না।

ব্যাগ থেকে রিস্টওয়াচ বের করে এক মুহূর্ত ভাবল, টি ভি-র সঙ্গে ঘড়িটা মিলিয়ে নিতে যাবে কিনা।

না যাবে না। পিঙ্কু কি বলছে, কি কি বলেছে, ওকে সামনে পেলেই ওরা কে কি প্রশ্ন করে বসবে, তার ঠিক কি। দরকার হলেও পিঙ্কুর সামনে মিথ্যে কথা বলা যাবে না। যা ছেলে, মুখের ওপরই বলে বসবে, এই মা, মিথ্যে কথা বলছ!

নিজের মনেই হেসে ফেললে জয়া।

বরং সকালে রেডিওর সঙ্গে মিলিয়ে নেবে। একটা ট্র্যানজিসটার রেডিও আছে। নির্মলেন্দু রোজ সকালবেলায় খবর শোনেন। সেই সময় মেলানো যাবে। ওই খবরের সময় ছাড়া রেডিওর আর কোনও সময় অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না।

ঘর সাফসুফ করা শেষ করে, স্যুটকেশ থেকে জামাকাপড় বের করে আলমারিতে গুছিয়ে রেখে জয়া ডাক ছাড়ল, পিঙ্কু, রাত হয়েছে, ঘুমোবি আয়।

পিঙ্কুর হয়তো ঘুম পাচ্ছিল, ও এক ডাকেই চলে এল।

চাপা রাগ ছিলই, জয়া ধমক দিল, কাল স্কুলে যেতে হবে না?

নির্মলেন্দুর চটির শব্দ শোনা গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জয়া, দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বললেন, কাল ভোরবেলাই এসে পৌঁছবে।

জয়া ঘাড় নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, তা হলে বোধহয় পিঙ্কুর কাল স্কুলে যাওয়াই হবে না।

ভোরবেলাতেই ঘুম ভাঙল জয়ার। ভোরবেলাতেই ঘুম ভাঙে। তবু দরজা খুলে রেখেছিল, খিল দেয়নি।

কি জানি কখন ফিরবে, যদি ঘুমিয়ে পড়ে, দরজায় টোকা দিলেও শুনতে না পায় জয়া। সে এক বিশ্রী কাণ্ড। সুকল্যাণ তো ফিরে এসেছে, নির্মলেন্দু তো খুব ভোরে ওঠেন, রেডিও শোনেন, হয়তো আর সকলকে ডেকে তুলেছেন, সুকু এসেছে, সুকু এসেছে, আর জয়া তখনো ওঠেনি। দরজায় ধাক্কা দিতে হচ্ছে, সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে। সবাই কি ভাববে!

কারণ, জেগে থাকাই জয়ার কর্তব্য।

বরং খিল খোলা থাকলে সুকল্যাণ এসে ওকে ডেকে তুলতে পারবে। কিংবা গায়ে হাত দিয়ে। এরা কেউ জানতে পারবে না জয়া জেগে ছিল, না ঘুমিয়ে ছিল।

বিয়ের পর সুকল্যাণকে ছেড়ে কখনো থাকেনি। দু'একবার যা থেকেছে সে এ বাড়িতে নয়। বাবা-মার কাছে গিয়েছিল বলে।

এই প্রথম এ বাড়িতে। দুটো সপ্তাহ ছিল না সুকল্যাণ। না থাকলে আদর বাড়ে। মীনা আর ইরা বলেছিল।

মীনা চোখ টিপে ইঙ্গিত করেছিল।—দেখিস, দেখিস, ফিরে এলে কি করে।

হেসে ফেলেছে সবাই।

মীনার স্বামীর বেশ ভাল চাকরি, কি চাকরি ঠিক জানে না জয়া। তবে মাঝেমধ্যে দু'এক সপ্তাহ বাইরে যায়।

ওইটুকুই ওর ঈর্ষা ছিল। বেশ মজা। জয়ার ওরকম হলে বাপের বাড়ি যাওয়া কত সুবিধে হত।

ইরা ঠাট্টা করল মীনাকে, তাই বল্, মাঝে মাঝে তাই এত খুশি-খুশি দেখায় তোকে।

শুনে শুনে জয়ারও একটু ইচ্ছে হয়েছে, স্বপ্ন দেখার। দরজার খিল খুলে রেখেছিল সে কারণেই নাকি!

সুকল্যাণ আসবে, এসে নিঃশব্দে জয়ার ঘুমন্ত শরীরের পাশে বসবে, কাঁধে কিংবা গালে হাত ঠেকিয়ে ডাকবে ফিসফিস করে।

—দেখিস, দেখিস, ফিরে এলে কি করে?

ইরাও সায় দিয়েছিল।

আদর বাড়ে! আদর। শব্দটার উচ্চারণেই কি যেন অর্থ ছিল।

জয়া তখন শুধু হেসেছে।

তেমন কিছুই কিন্তু ঘটল না। শুধুই ঘুম ভেঙে গেল।

বাথরুমে মুখেচোখে জল দিতে গিয়ে রেডিওর শব্দ কানে এল। নির্মলেন্দু যথারীতি খবর শুনছেন।

ও ঘরের ওয়ালক্লক দেখে উনি বলে দেন ক' মিনিট ফাস্ট আছে। ফাস্ট যাওয়াই ঘড়িটার ধর্ম।

রিস্টওয়াচ নিয়ে ঘড়ি মেলাবার জন্যে ও ঘরে গেল জয়া।

—বাবা, ঘড়িটা মেলাব।

খবর শেষ হয়ে গেছে তখন। রেডিও বন্ধ করেছেন, কিন্তু রেডিও হাতেই রয়েছে।

—বাবা। আবার ডাকল জয়া।

নির্মলেন্দু ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকালেন জয়ার মুখের দিকে, কিন্তু জয়ার মনে হল তার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন না। কোনও কথাও শুনতে পাননি।

একটু অস্বস্তি লাগল জয়ার। উনি তো জানেন, এ-সময় জয়া প্রায়ই কেন আসে। ওই একটাই কাজ; ঘড়ি মেলানো। রাত্রে টি ভিতে না মেলাতে পারলেই, সকালে রেডিওতে।

নির্মলেন্দু কোনও জবাব দিলেন না, ধীরে ধীরে মাথা নিচু করলেন। কি যেন ভাবছেন।

রেডিওটা আবার চালালেন। গান হচ্ছে। বন্ধ করে দিলেন।

—বাবা। আবার ডাকল জয়া।

এরকম তো কোনওদিন দেখেনি। একটু অবাক-অবাক লাগছে জয়ার।

তাকিয়েই এই প্রথম যেন জয়াকে দেখলেন।—ও হ্যাঁ। সুকু আসেনি এখনো?

—কখন আসবে বলেছে?

—ঘাড় মেলাইনি।

জয়ার প্রশ্ন শুনতেই পেলেন না, প্রায়ই এসে জয়া সময় মেলায় জানেন, তাই অভ্যাসবশত ভাবলেন, সময় জানতে চাইছে।

কিন্তু ঘড়ি মেলাননি কেন ! ওটা তো ওঁর অভ্যাস।

জয়া আর কোনও প্রশ্ন করল না, চলে এল। মনের মধ্যে ও কিন্তু অপেক্ষাই করছিল।

মানুষটার কাছ থেকে সব খবর আদায় করাও কঠিন। প্রত্যেকটি কথা প্রশ্ন করে করে জেনে নিতে হবে। এ ভাবে কি প্রশ্ন করা যায় নাকি। হাজার হোক শ্বশুর। প্রতিপক্ষের উকিল নয় যে, জেরা করে করে জেনে নেবে।

'সক্কালবেলাতেই এসে পৌঁছবে জানিয়েছে।' কে জানিয়েছে, সুকল্যাণ নিজেই ! চিঠি না টেলিগ্রাম ? নাকি অফিস থেকে কেউ ওঁকে ওঁর অফিসে ফোন করে বলেছে !

সুকল্যাণ এসে পৌঁছে গেলে জয়া একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারত। পিঙ্কুকে নিয়ে আজ স্কুলে যাবে কি যাবে না। এক মাস থাকবে বলে গিয়েছিল, দিন পনেরোর মধ্যে ফিরছেই বা কেন। অসুখ বিসুখ নয় তো। না, বোধহয় কাজ মিটে গেছে।

কিন্তু শ্বশুর আজ এ রকম করলেন কেন। কেমন যেন অন্যমনস্ক, কি যেন ভাবছেন। কিংবা ভাবছেন না, কেমন যেন। ওঁকে এ রকম কখনো দেখেনি জয়া।

জিগ্যেস করল, কখন আসবে বলেছে ?

আসলে জানতে চাইছিল, সক্কালবেলা মানে ক'টার সময়।

উত্তর দিলেন, ঘড়ি মেলাইনি।

মুখের ভাব এমন যে হাসিও পেল না।

ছুটকুও উঠেছে ঘুম থেকে, দাঁতে ব্রাশ ঘষছে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে ফেনা। দাঁত মাজার সময় আয়নায় কি দেখার আছে কে জানে। হয়তো নিজেকেই দেখে।

আয়নাতেই হয়তো জয়াকে দেখতে পেল। মুখ না ফিরিয়েই, হাসল কিনা বোঝার উপায় নেই, ফ্যানা মুখে হাসি বোঝা যায় না, ছুটকু বললে...

মুখ ভর্তি ফ্যানায় কথা বোঝা গেল না।

—কি বললে ? সাদামাটা ভাবেই জিগ্যেস করল জয়া।

ছুটকু মুখের ফ্যানা বেসিনে ফেলে দিয়ে হাসি মাখিয়ে বললে, অ্যাদ্দিন বাদে দাদা ফিরছে, একটু সাজগোজ করবে তো।

কি কথা।

সত্যি যদি একটু ছিমছাম হত, ভয়েল শাড়িটা পরত, তা হলে নির্ঘাত বলে বসত, বাব্বা এত সাজ ? দাদা আসছে বলে ?

এখন আর ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠে না, স্রেফ উপেক্ষা করে।

এখন ও ছুটকুকে বুঝতে পারে। বেচারিকে বড় অসহায় মনে হয়।

ভাবে, কি জানি, বিয়ে না হলে আমি নিজেও হয়তো ওর মতো হয়ে যেতাম।

আসলে চার পাশে সকলের মধ্যে ও শুধু সুখ দেখতে পায়। দাম্পত্য সুখ। দেখতে পায় বলেই ওর বুকের মধ্যে কোথাও একটু জ্বালা ধরে। কারণ, বিয়ে ছাড়া ও তো আর কোনও গন্তব্যের কথা ভাবতেই পারে না। অথচ কত মেয়ে বিয়ে না করেও দিব্যি সুখে থাকছে। কেন থাকবে না।

তার জন্যে অবশ্য ছুটকু দায়ী নয়, দায়ী এই বাড়িটা। চাকরি কিংবা কিছু পড়া বা শেখা, অথবা প্রেম...কোনও রাস্তাই দেখায়নি ওকে। বরং বাধা দিয়েছে। শ্বশুরবাড়িকে দোষ দিয়ে কি হবে, ওর নিজের বাড়িটাও, মানে বাপের বাড়িও তো ছিল এই রকমই।

ও ছুটকুর টিপ্পনী গায়ে মাখল না। পিঙ্কুকে ঘুম থেকে ওঠাতে চলে গেল। ভাবল, ওকে তৈরি করে রাখি স্কুলের জন্যে, তারপর সুকল্যাণ এলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

বারান্দা দিয়ে নিজের শোয়ার ঘরে যাবার সময় এ ঘরে উঁকি দিল। শ্বশুরের হাবভাব মনের মধ্যে তখনো একটা প্রশ্ন হয়েই আছে।

এক পলক দেখতে পেয়েছে, তাতেই কেমন আশ্চর্য লাগল।

শ্বশুর থমথমে মুখে শাশুড়িকে কি বলছেন শুনতে পেল না।

কিন্তু শাশুড়ির কথা কানে গেল।—আঃ, আজেবাজে কথা ভেব না তো।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা জয়াকে দেখতে পেল, আর কেমন দু'জন দু'দিকে ছিটকে গেল।

জয়ার মনে হল, ওরা জয়ার কাছে কি যেন চেপে যাচ্ছে। কি?

মন খারাপ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আশ্চর্য কাণ্ড, জয়া এবাড়ির জন্যে সমস্ত জীবনটাই ঢেলে দিয়েছে, এটাই এখন ওর নিজের বাড়ি। এই সংসারটা ওরই সংসার, অথচ এরা এখনো ওকে বাড়ির লোক ভাবতে পারছে না। বিশ্বাস করতে পারছে না। কিছু লুকোতে চাইছে।

পিঙ্কুকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে জয়া রান্নাঘরে চলে গেল। রান্নার লোক আসার সময় হয়নি। একটু পরেই এসে যাবে।

সকালের চা জয়াই করে। পিঙ্কুকে নিয়ে স্কুলে যাবার আগে, দু' দুবার চা বানিয়ে দিতে হয় জয়াকেই।

পাঁউরুটি আগের দিন সন্ধেতেই কেনা থাকে। সকালে চায়ের সঙ্গে রুটি সেঁকে রুটিতে নামমাত্র মাখন লাগিয়ে হাতে হাতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয় জয়াকেই।

সুকল্যাণের জন্যে ওসব পাট নেই, ওর শুধু এক কাপ চা পেলেই খুশি। ব্রেকফাস্ট করার সময় কোথায়, নটার মধ্যে ওকে ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।

কিন্তু আজ বাইরে থেকে আসছে, হয়তো ক্ষিদে নিয়েই আসবে। তা ছাড়া আজ নিশ্চয়ই অফিস যেতে হবে না। সুতরাং এসেই কিছু খেতে চাইবে হয়তো।

চায়ের কেটলি চাপিয়ে দিয়ে একটু দ্বিধার মধ্যে ছিল, সুকল্যাণের জন্যে কি বানিয়ে রাখবে। রান্নার লোক এখানে ঢোকার আগেই বলে নিয়েছিল চা-জলখাবার সে করতে পারবে না। তাই জয়াকেই করতে হবে।

—কই, সুকু তো এখনো এল না।

নির্মলেন্দু আবার বলে উঠলেন।

অমিতা ধমক দিল, আঃ, তুমি একটু স্থির হয়ে বসো তো! আসবে যখন বলেছে ঠিক আসবে।

পাঁউরুটি দিতে এসে জয়া তাকাল শাশুড়ির মুখের দিকে। মুখ থমথমে।

হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেল জয়া। ওর বিরুদ্ধেই কিছু নাকি। এ ক'দিন ছিল না, কি হয়েছে কিছুই জানে না। কাল রাত্তিরে পিঙ্কু কি সব অনর্গল বলে যাচ্ছিল, এমন কিছু কি বলেছে, যাতে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। ঘোর অন্যায় কোনও। নাকি বাবাই কাণ্ডটা করে গেছে। কি বলতে কি বলেছে কে জানে। কিন্তু তেমন কোনও অন্যায় করেছে বলে তো মনে পড়ছে না।

সকালে যখন ঘড়ি মেলাতে গেল তখন কি সেজন্যই শ্বশুরের অমন ব্যবহার! ভিতরে ভিতরে চটে ছিলেন বলে। কিন্তু উনি তো কখনো জয়ার ওপর চটেননি। একটু কড়া কথাও বলেননি। বরং সুকল্যাণ কোনও কারণে রাগারাগি করলে তাকে ধমকেছেন।

সেজন্যেই কি 'সুকু এল না', সুকু এল না,' এলেই জয়ার নামে কি কিছু বলবেন?

হঠাৎ জয়ার মনে হল মেজদির বাড়ি যাওয়ার জন্যে নয় তো।

একদিকে আতঙ্ক, আরেকদিকে রাগ। আমি কি কখনো 'আমি' হতে পারব না ?

মেজদির সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি। বিন্নি মেয়েটা ওকে ছোম্মাসি ছোম্মাসি করে অস্থির করত। সে এখন ক্লাস সেভেনে। দেখতে ইচ্ছে হয় না ? জামাইবাবুও ওর বিয়েতে কি খাটান খেটেছে, হায়ার সেকেন্ডারির সময় সাজেশন এনে দিয়েছিল। দিদি বাইরে থাকে, তার কথা অন্য। মেজদি তো উত্তরপাড়ায়, এমন কি দূর ! যাবে না দেখা করতে ? তাও দাদা রাজি হয়েছিল নিয়ে যেতে, তাই।

মেজদি-জামাইবাবু একটা দিন থাকতে বলেছিল, থাকেনি। থাকেনি যে, তার জন্যে কি জয়ারই কম কষ্ট হয়েছে।

জয়ার হঠাৎ মনে হল, ছি ছি এরা এত ছোট ? এত ছোট মন !

—কাগজ এসেছে ! ছুটে চলে গেলেন নির্মলেন্দু।

খবরের কাগজ। এবার ওটা ওঁদের হাতে হাতেই ঘুরবে। ঘুরুক। জয়ার কোনও আগ্রহ নেই, ও দুপুরের আগে হাতেই পায় না।

কৌতূহল এখন অন্যত্র। ব্যাপার কি, জানার জন্যে।

বন্ধু বলতে এখন ছুটকুই। শত্রু বলতেও ও-ই। এক একদিন ছুটকুর মেজাজ ভাল থাকে, জমাটি আড্ডা দেয় দু'জনে। যত মনের দুঃখকষ্ট, কিংবা গোপন বাসনা জয়ার কাছেই বলে ফেলে। মা কিংবা বাবার বিরুদ্ধে কোনও অভিমান। তাও। হাসাহাসিও।

ওদের এ বাড়িতে একটা জিনিসের বড় অভাব। ছাদ। ছাদ আছে, ছাদে একটা ঘরও আছে। কিন্তু ওদের এক্তিয়ারের বাইরে। শুনেছে বাড়িওয়ালা কিসব জিনিসপত্র রেখেছে, তাই সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। ওরা উঠতে পায় না।

কি স্বার্থপর, নিজে তো এখানে থাকেও না। অথচ এইটুকু বাড়তি সুখও ভোগ করতে দেবে না।

অগত্যা গোপন কোনও কথা বলতে চাইলে ছুটকু ওকে ডেকে নিয়ে আসে সিঁড়িতে। ছাদে ওঠার সিঁড়ির ধাপিতে পাশাপাশি বসে কথা বলে, গল্প করে।

এই একটা বিষয়ে ছুটকু ওদের বাড়ির প্রশংসা করেছিল।

—তোমাদের কি মজা বৌদিভাই। তোমাদের ছাদ আছে।

হেসে বলেছিল, কত কি দেখতে পাও।

এবাড়িতে এসে জয়ার প্রথম প্রথম মনে হত যাদের ছাদ নেই, তাদের কিছুই নেই।

স্কুলের বন্ধুরা এলে জয়া সটান ছাদে চলে যেত। বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ওখানেই। একবার এদিকের আলসে ঘেঁষে, একবার ওদিকের আলসে ঘেঁষে। অনেক দূর অবধি দেখা যেত। ছাদের পর ছাদ, রাস্তা, আলো-জ্বলা জানালা, জানালায় মানুষ। জানালায় কমবয়েসী স্বামী-স্ত্রী থাকল একটি দুর্লভ দৃশ্যের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা।

—ছুটকু। কথা আছে।

জয়া চোখের ইশারায় সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল। ছুটকু সপ্রশ্ন চোখে তাকাল জয়ার দিকে, তারপর ঈষৎ ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। অর্থাৎ যাচ্ছি, চল।

এ বড় বিচিত্র সম্পর্ক দু'জনের। দু'জনেরই পরস্পরের বিরুদ্ধে অগুন্তি অভিযোগ। রাগ আছে, ক্ষোভ আছে, বিরক্তি আছে। আবার প্রয়োজনে কখনো কখনো দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু। একান্ত সঙ্গী। পরামর্শ দিতে হলে, সান্ত্বনা দিতে হলে, ওরা একান্ত হয়ে যায়। অথচ তখনই আবার তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে রাগ কিংবা অভিমান।

গোপন হাসাহাসির কথা থাকলে, কিংবা লুকোনো শলা-পরামর্শের জন্যে ওই একটাই

জায়গা। ছাদে ওঠার সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপিতে।

বসে গল্প করার জন্যে ডাকেনি জয়া। শুধু একটা প্রশ্ন। ছুটকু বলবে কিনা জানে না। তবু একবার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হল। যদি জানা যায়। পিঙ্কু কিছু বলে ফেলেছে, কিংবা বাবা পৌঁছে দিতে এসে কিছু বলেছে...

সিঁড়ির শেষ ধাপ অবধি যেতে হল না, মাঝপথেই দাঁড়িয়ে পড়ল জয়া।

—ছুটুক, কি হয়েছে বল তো ? মা-বাবার মুখ কেমন থমথম।

ছুটকু বললে, বিশ্বাস করো বৌদিভাই, কিচ্ছু জানি না। আমাকেও তখন কথার উত্তর দিল না মা।

—জিগ্যেস করে দেখো না। আমাকে নিয়ে ?

ছুটকু একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, একটা কথা কিন্তু শুনেছি। ফিসফিস করে বললে, কি সব বলাবলি করছিল, আমি ঢুকতেই থেমে গেল। শুধু একটা কথা কানে এসেছিল। বাবা মাকে বলল, জয়াকে এখন কিছু বোলো না।

জয়া হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। তা হলে ওকে নিয়েই।

তরতর করে দু'জনেই নেমে এল।

জয়ার বুকের মধ্যে একটা ভারী পাথর। 'এখন জয়াকে কিছু বোলো না।' অর্থাৎ যা বলার তা সুকল্যাণকে বলবে। মানুষটা বাইরে থেকে আসছে, ক্লান্ত হয়ে ফিরবে, যে অভিযোগই থাক, তা কি এখন বলার সময়।

বলুক, জয়া তো কোনও অন্যায় করেনি।

—তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ ? অমিতার গলা।

নির্মলেন্দুর চটির শব্দ শোনা যাচ্ছিল সিঁড়িতে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলেন।

তাঁর গলাও শোনা গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, দেখি, সুকু তো এখনো এল না।

জয়া বারান্দা থেকে দেখতে পেল উনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। কেমন অন্যমনস্ক ভাবে।

জয়ার হাসি পেল। মানুষটার সব সময় সবেতেই উদ্বেগ। সকালে ফিরবে বলেছে সুকল্যাণ, কিন্তু ক'টার সময় তা সম্ভবত বলেনি। দেরি তো হতেই পারে। তার জন্যে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ। তা হলে কি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ?

অবশ্য জয়ারও একটু ভাবনা হচ্ছে। সুকল্যাণ ফিরে এলে বুঝতে পারত পিঙ্কুকে নিয়ে স্কুলে যাওয়া হবে কিনা।

—কি করি বলুন তো মা, পিঙ্কুকে স্কুলে নিয়ে যাব ? আপনার ছেলে তো এখনো এল না। জয়া অমিতার কাছে গিয়ে বললে।

আর অমিতা সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুতভাবে জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলে উঠল, না।

শুধু একটা শব্দ। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল জয়া। মনে হল যেন দৃষ্টি কেমন উদ্ভ্রান্ত। আর চোখের আড়ালে বোধহয় কান্না থমকে আছে। এক্ষুনি চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে।

এ ক'দিন একবার আয়নার দিকে তাকায়নি জয়া। কারো দিকেই তাকায়নি, এমনকি নিজের দিকেও না। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে দিনগুলো।

এই প্রথম এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা যেন চমকে উঠল।

এ কে ? একে তো জয়া চেনে না, কখনো দেখেনি। সম্পূর্ণ একজন অচেনা মানুষ যেন ওর চোখে চোখ রেখে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। নিজেকে হারিয়ে ফেলার জন্যে হাহাকার।

এ ক'দিন ওর শুধু মনে হচ্ছিল ওর সব কিছু হারিয়ে গেছে। কিন্তু সে ভাবনা কেমন অস্পষ্ট। এক একসময় বিশ্বাসই হচ্ছিল না। যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে, এখনি ঘুম ভেঙে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হেসে উঠবে।

কিন্তু আয়নায় নিজেকে দেখে ওর চোখ ঠেলে জল এল।

এ কাকে দেখছে ও ?

সর্বাঙ্গে একটা সাদা থান কাপড়, মাথা অবধি টেনে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সদ্য বৈধব্যের একটা মূর্তি। এ তো জয়া নয়, এ অন্য কেউ।

এ ক'টা দিন ও নিছক একটা যন্ত্রের পুতুল হয়ে গিয়েছিল। যে যা বলেছে করে গেছে। কেউ এনে বসিয়ে দিয়ে গেলে বসেই থেকেছে। শুধু একটা অস্পষ্ট ধারণা, কি যেন চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে।

কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও চমকে উঠল। ওর মুখোমুখি যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ও চেনে না, কোনওদিন দেখেনি। তার মুখ প্রথমে চোখে পড়েনি। শুধু একটা সাদা থান, মাথা অবধি ঘোমটা টেনে দেওয়া। ক্রমশ তার মুখ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। নিস্তেজ প্রাণহীন ধসে পড়া জীবনের একটা মুখ। চোখের নীচে কালি। একটা নিঃস্ব সিঁথি, কপালের শূন্যতা। গলায় চোখ পড়ল, দুটি হাতে। সর্বাঙ্গ জুড়ে শুধুই নিঃস্ব নিস্তব্ধতা।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জয়া।

ওর কিছুই স্পষ্ট মনে পড়ছে না। ও কি নিজেই একে একে সব খুলে রেখেছে! নিজেই এই সাদা থান কাপড়খানা শরীরে জড়িয়ে নিয়েছিল! কিছুই মনে পড়ে না। ও তো একটা যন্ত্রের পুতুল হয়ে গিয়েছিল।

না, একটু একটু করে মনে পড়ছে এখন।

এখন সাবা বাড়ি আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

জয়ার শুধু মনে পড়ছে সারা বাড়ি লোকজনে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। আর ঘরের মধ্যে দেয়ালে পিঠ দিয়ে মেঝেতে বসেছিল জয়া। ও চোখে কিছুই দেখছিল না, কানে কিছুই শুনছিল না। উঠে দাঁড়াতেও ওর কষ্ট হচ্ছিল। শরীরে কোনও শক্তি নেই।

নির্মলেন্দু বারান্দার ডেকচেয়ারে দু' হাতে চিবুক রেখে বসে আছেন ; গুম হয়ে।

অমিতা লুটিয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। মাঝে মাঝে ডুকরে কেঁদে উঠছে। ছুটকুর বৃদ্ধা পিসি এসেছেন, মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিচ্ছেন অমিতাকে, গায়ে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন।

সুপ্রভাত আর ছুটকুর গলা শোনা যাচ্ছে।

সামনের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে বসে ছিল জয়া।

দেখল অমিতা উঠে বসল। ছুটকুর পিসির হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছিল অমিতা, জয়ার সামনে দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়াল একবার।

তারপর ঝুঁকে পড়ে থান কাপড়ের ঘোমটা টেনে দিল জয়ার মাথায়।

ছুটকুর পিসির অস্ফুট কথা শোনা গেল। —তাও কি বলে দিতে হয়!

ব্যস্। ওইটুকুই মনে পড়ছে জয়ার। তার পর থেকে তো ও সেই যন্ত্রের পুতুল।

আয়নার সামনে থেকে সরে এল জয়া। কেউ দেখতে পেলে কে কি বলে বসবে ও কিছুই জানে না। এখন ওর চারপাশ জুড়ে শুধু কি করতে আছে আর কি করতে নেই।

এ ক'দিন ধরে ও শুধু একটা যন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। এখন ও শুধুই একটা কর্তব্য।

ক্ষীণভাবে মনে পড়ছে স্নান করে এসে, ওর শরীরে তখন একটুও জোর নেই, কাকে যেন একটা চিরুনি চাইল। অভ্যাসবশেই হয়তো। হয়তো ছুটকুকে।

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলেছিল, চিরুনি নিতে নেই, আয়না দেখতে নেই।

শুধু ওইটুকুই মনে আছে। কে বলেছিল তাও মনে নেই। ওর কাছে তখন বাড়ির সমস্ত মানুষগুলোই অর্থহীন।

এখন ওকে শুধুই কর্তব্য হতে হবে।

অমিতা পুত্রশোকের মধ্যেও এসে ওর মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছে।

—না না, তোমাকে আর ঘোমটা দিতে হবে না, আমি সেকেল শাশুড়ি হতে পারব না।

এখন কথাটা মনে পড়ে গেল জয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটকুর পিসির কথাটাও। —তাও কি বলে দিতে হয়।

অর্থাৎ ও এখন শুধুই একজন বিধবা। বিধবার কর্তব্য করে যেতে হবে সারা জীবন ধরে। এই থান কাপড়খানা চিরসঙ্গী। এখন থেকে মাথায় ঘোমটা দাও। যখন সধবা ছিলে তখন অনেক স্বাধীনতা ভোগ করেছ। আধুনিক হতে হবে বলে তোমাকে ঘোমটা দিতে হবে না বলেছিলাম। এখন তুমি বিধবা, এখন কি তোমাকে সে-কথাও মনে পড়িয়ে দিতে হবে।

পিঙ্কু! পিঙ্কু কোথায় কে জানে। ওর গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সেই অনর্গল কথা বলে যাওয়া কবে থেকে যে থেমে গেছে জয়া জানেও না। হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেছে। কোনও প্রশ্ন করে না। হয়তো প্রশ্ন করে কোনও উত্তর পায়নি বলে আপনা থেকেই থেমে গেছে। আত্মীয়স্বজন যারা ভিড় করে এসেছিল, পিঙ্কুকে হয়তো তারাই দেখেছে, স্নান করিয়েছে, খাইয়েছে।

শুধু মনে পড়ছে এক একবার এসে কোলের কাছে বসত, চোখ মেলে মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত, কাউকে কাঁদতে দেখলে তার চোখেও জল আসত, কখনো শব্দ করে কেঁদে উঠত। কেন তা ও স্পষ্ট করে জানেও না। মৃত্যু কি তা তো ওর ধারণার বাইরে। চিরকালের জন্যে ওর কি হারিয়ে গেছে তাও জানে না।

একটা কথা মনে পড়তেই ঠোঁটের ফাঁকে একটা বিষণ্ণ হাসি উঁকি দিয়ে গেল জয়ার।

ও কত কি ভেবেছিল, কত কি ভয় পেয়েছিল। ভেবেছে, হয়তো বাপের বাড়িতে গিয়ে এমন কিছু করেছে যা এদের কাছে অন্যায় মনে হয়। কিংবা বাবার কোনও কথাকে ভুল বুঝেছে, অসন্তুষ্ট হয়েছে।

—আমার জন্যেই হল বোধহয়, আমি যে শুনেই ভয় পেয়ে গেলাম।

নির্মলেন্দুর দু'চোখ ছাপিয়ে জল, বলছেন আর হাউ হাউ করে কাঁদছেন।

—আমার তো শেষ জীবনে ওই একটাই ভরসা ছিল। চোখের সামনে একটা সুখের সংসার দেখতে পাওয়া, তার চেয়ে আর সুখের কি আছে।

ছেলের শোকে কাঁদছেন নির্মলেন্দু। কারা যেন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

ছুটকু চোখ মুছতে মুছতে একটা গ্লাস নিয়ে আসছিল, জল না সরবত না দুধ জয়া দেখেইনি।

ছুটকুর বৃদ্ধা পিসি বললেন, বৌমাকে দে, বৌমাকে দে।

জয়াকে বললেন, যাও তুমি খাইয়ে এসো। ছেলে না থাক, ছেলের বৌ আছে, একটু সান্ত্বনা পাবে।

পিঙ্কুকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন নির্মলেন্দুর কাছে।

জয়া গেল। সবে হাতটা বাড়িয়েছে গ্লাসটা এগিয়ে দিতে।

নির্মলেন্দু ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, তুমি এসো না, এসো না আমার সামনে। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, তোমার দুঃখ আমি দেখতে পারব না।

কি আশ্চর্য। জয়ার তো তখন কোনও অনুভূতিই ছিল না। ও তখন সব দুঃখকষ্টের বাইরে চলে গেছে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে।

নির্মলেন্দুর কান্না দেখে ওর শুধু মনে হচ্ছিল, এই বৃদ্ধ মানুষটার বড় কষ্ট।

'তুমি এসো না, এসো না আমার সামনে।'

শুনে আহত হয়ে দু' পা সরে এসেছিল জয়া, মনে হয়েছিল, ওকেই যেন দায়ী করছেন।

কিন্তু তারপরই বলে উঠলেন, তোমার দুঃখ আমি দেখতে পারব না।

আর সঙ্গে সঙ্গে জয়ার শরীরে মনে কি এক অদ্ভুত ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়ল। সারা শরীর জুড়িয়ে গেল।

ও আবার এগিয়ে গেল, গ্লাসটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, বাবা, কিছু খান। পিঙ্কুর জন্যে, আমার জন্যে আপনাকে যে থাকতেই হবে।

নির্মলেন্দু চোখ তুলে তাকালেন জয়ার মুখের দিকে, সজল চোখ। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বললেন, তোমাকে জানাতে বারণ করেছিলাম, মিথ্যে ভয় পাবে মনে করে।

একটু থামলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—আমার জন্যেই হল, কেন যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

ধীরে ধীরে বললেন, রেডিওয় খবর শুনছিলাম, ভাল করে শুনিওনি, কোথায় কি কিছুই না, শুধু কানে গেল একটা প্লেন-ক্র্যাশ। সুকু যে ওই প্লেনেই আসবে, আমি তাও জানতাম না। তবু, কেন যে ভয় পেয়ে গেলাম। হয়তো সেজন্যেই—

জয়া ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। পালিয়ে এসেছিল।

এখন সব একটু একটু করে মনে পড়ে যাচ্ছে।

ছুটকু এসে বললে, পিঙ্কুকে খাইয়ে দিয়েছি, বৌদিভাই, তুমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

পিঙ্কু কিন্তু আগের মতো জয়ার পা দুটো জড়িয়ে ধরল না। শুধু ওর একটা হাত জয়ার হাঁটু ছুঁল। ও হয়তো ভাবছে মা দূরে সরে গেছে। সত্যিই তো, ও দূরে সরে গিয়েছিল।

ছুটকুর বুদ্ধি নয়, হয়তো ছুটকুর পিসিই বলেছেন। জয়াকে আবার কাজের মধ্যে ভুলিয়ে দিতে চাইছে। পিঙ্কুর মধ্যে।

এখন আর ওর সামনে কোনও কাজ নেই, শুধু কর্তব্য। যা করা উচিত, যা সকলে চায়, যা সকলের মনঃপূত। এখন আর ওর নিজস্ব বলে কিছু নেই, ওর কোনও ইচ্ছে এখন আর ইচ্ছে নয়।

জয়ার ইচ্ছে হয়ও না। এই কর্তব্যগুলোই ওর ইচ্ছে হয়ে গেছে।

ও তো তখন একটা যন্ত্রের পুতুল হয়ে গেছে।

মনে পড়ছে, কে ওকে হাত ধরে তুলে বললে, যাও স্নান করে এসো।

বাথরুমের দরজা অবধি পৌঁছে দিল।

আর ছুটকুর পিসি এসে বললেন, খিল দিও না। আমি আছি এখানে। কখন হঠাৎ মাথা ঘুরে যাবে।

ধীরে ধীরে বাথরুমে ঢুকেছে স্নান করবে বলে, পায়ে জোর নেই, বেসিনে হাত দিয়ে নিজেকে সামলাচ্ছে, শুনতে পেল ছুটকুর পিসি দরজার বাইরে থেকে বলছেন, চুলে তেল

দিও না, দিতে নেই। আবার বললেন, সাবান মেখো না যেন মাখতে নেই।

এখন আর বলতে হয় না। ও জানে এখন জীবন শুধু 'নেই'। তাতে ওর কিছুই যায় আসে না, ওর যে ইচ্ছে বলেই কিছু আর নেই।

॥ ৬ ॥

পিঙ্কু তার পর থেকে আর স্কুলে যায়নি। যেতে পারেনি। কেউ ওর কথা ভাবেওনি। এমনকি জয়াও নয়।

সমস্ত বাড়ি জুড়ে তখন শুধু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের ভিড়। অনবরত মানুষ আসছে, মানুষ যাচ্ছে। তাদের চাপা গলার আওয়াজ, পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ, কখনো একটা চিৎকার করে কেউ কিছু হুকুম দিচ্ছে, আর তার ফাঁকে ফাঁকে দু'একবার অমিতার ডুকরে ওঠা কান্না।

জয়া একটা দর্শনীয় জড়পদার্থ হয়ে গিয়েছিল। সকলেই একে একে আসছে, ওর কাছে দু'দণ্ড দাঁড়াচ্ছে, কেউ গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু কারো কোনও কথা ওর কানে গিয়েছিল কিনা ও নিজেও জানে না।

গিয়েছিল নিশ্চয়ই, তা না হলে এই সাদা থান কাপড়খানা, যা ওকে ওর নিজের কাছেই অচেনা করে দিয়েছে, জয়ার গায়ে উঠল কি করে। আজ সকালেও স্নান করতে গিয়ে আপনা থেকেই ওর হাত চলে গিয়েছিল সাবানের কৌটোর দিকে। নিজেকে সামলে নিয়েছে।

ছুটকুর পিসির কথাটা কানে বেজেছে। চুলে তেল দিও না, দিতে নেই। সাবান মেখো না, মাখতে নেই।

এ ক'দিন এই দুঃসহ গরম তেমন বুঝতে পারেনি। এ সবের অনুভূতিই চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন নিজেকেই নিজের ঘেন্না করতে ইচ্ছে করছে। সারা গা ঘামে ভিজেছে, গায়ে গায়েই তা শুকিয়ে গেছে। সাদা থান কাপড় বারবার কেচে পরেছে, এখন কি বিশ্রী নোংরা। অথচ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করারও উপায় নেই। সাবান দিতে নেই।

যেন এসব করলেই মানুষটার জন্যে শোক দেখানো হয়। অর্থাৎ শুধু শোক দেখাতে হবে, তোমার বুকের মধ্যে কোথায় কতখানি শূন্যতার সৃষ্টি হল তার খবর কেউ রাখতে চায় না। তোমার দুঃখকষ্টের হদিস কেউ পেতে চায় না। তোমার চোখের আড়ালে কতখানি অশ্রু স্তব্ধ হয়ে আছে তা জানতে চায় না।

তোমার বুকফাটা কান্না শুনতে পেলাম না কেন!

তা যদি না পেয়েও থাকি, তুমি যদি সব নিয়মগুলো ঠিকঠাক মেনে চলো তা হ'লেই বুঝব তোমার শোক কতখানি।

সুতরাং কর্তব্য করে যাও, তুমি এখন শুধুই একটা কর্তব্য।

সেদিনের সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। আর সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে উঠল জয়া।

এখন সব মনে পড়ছে একটু একটু করে।

নির্মলেন্দু দেরিতে অফিস যান। সেই দিনও উনি দেরিতেই যাবেন ভেবেছিল জয়া।

সুকল্যাণের জন্যে অপেক্ষা করছে ও, কখন ফিরবে। সেজন্যেই পিঙ্কুকে নিয়ে স্কুলে যায়নি।

হঠাৎ দেখলে নির্মলেন্দু তাড়াতাড়ি স্নান করে খেতে বসেছেন। অনেকক্ষণ ধরে খান

উনি, বেশ রসিয়ে রসিয়ে, গল্প করতে করতে।

হয়তো না খেয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

ছুটকু বললে, বাবা খেয়ে যাও, খেয়ে যাও।

জোর করে খেতে বসাল। জয়া নিজেই পরিবেশন করল। ও তখনো বিন্দুমাত্র জানে না, নির্মলেন্দু কেন এত তাড়াতাড়ি অফিস যাচ্ছেন। যেতেই পারেন, কোনওদিন কি আর কাজ থাকতে পারে না।

নির্মলেন্দু ভাল করে খেলেনও না। কোনওরকম নাকেমুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

আর তখনই ছুটকু বললে, বৌদিভাই, শোনো।

ব'লে সেই ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে ইশারা করল।

যেতেই বলল, বাবা দাদার অফিসে গেল, খোঁজ নিতে। কেন এল না এখনো।

সঙ্গে সঙ্গে জয়া বিস্মিত হল, একটুও খারাপও লাগল। সুকল্যাণ কেন ফিরল না ভেবে ও নিজেও একটু চিন্তিত হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তার অফিসে ছুটে যাওয়ার কি আছে। জয়া তো ভেবেছে, কোনও কারণে হয়তো আসতে পারেনি, বিকেলে আসবে, কিংবা পরের দিন।

এখন বুঝতে পারছে। উনি যে সকালে রেডিওর খবরেই জানতে পেরেছিলেন, প্লেনক্র্যাশের খবর। ভয় পেয়েছিলেন, আশঙ্কা হয়েছিল হয়তো ওই প্লেনেই আসছিল সুকল্যাণ। কিন্তু জয়াকে অকারণ দুর্ভাবনায় ফেলতে চাননি। তাই চেপে গিয়েছিলেন।

'ভাল করে শুনিওনি, কানে গেল একটা প্লেন-ক্র্যাশ।' কান্নামাখা উদ্ভ্রান্তের গলায় বলে উঠেছিলেন নির্মলেন্দু।

অথচ কত কি ভেবে বসেছিল জয়া। কত কি মিথ্যে সন্দেহ, অকারণ ভয়।

দুপুরে উদ্ভ্রান্তের মতো ফিরে এলেন নির্মলেন্দু।

শুধু এসে বসলেন, ওরা খবর নিচ্ছে, খবর পেলেই এসে জানিয়ে যাবে।

সেই প্রথম জয়ার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। কেন তাও জানে না। সুকল্যাণের দেরি হচ্ছে দেখেও ও তো একটুও ভয় পায়নি। কোনও দুর্ভাবনা হয়নি। নাকি বেলা যত বেড়েছে ততই একটু একটু দুর্ভাবনা বেড়েছে। তবু ও তো তখনো প্লেন ক্র্যাশের খবরটাই জানে না। জানতে দেননি নির্মলেন্দু।

তবু জয়া সেদিন ঘুমোতেও পারেনি সারা রাত।

তারপর সেই অদ্ভুত দৃশ্য। মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে একটাই ছবি।

সদর দরজায় কলিং বেল বাজল।

ছুটকু দ্রুতপায়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। নির্মলেন্দু ছুটে গেলেন, বোধহয় ছুটকুর ডাক শুনে। নাকি কলিং বেল বাজার অপেক্ষায় ছিলেন। আতঙ্ক নিয়ে কিংবা আশা নিয়ে।

জয়া ওপর থেকে ঝুঁকে দেখল।

একজন। তার পিছনে পিছনে আরো দু'তিনজন। তার পিছনে পিছনে আরো। দু'একজনকে চিনতে পারল, সুকল্যাণের অফিসের লোক। সকলেই চুপচাপ।

তারপর চিৎকার করে সারা বাড়িটা কেঁদে উঠল।

সেই দুঃসংবাদটা জয়াও শুনল। ছুটকু ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে কাঁদছে।

অথচ জয়া যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, ভাবতে পারছে না। কিংবা বিশ্বাসই হচ্ছে না। ও শুধু স্তব্ধ হয়ে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে।

তারপর আর কিচ্ছু মনে পড়ে না। মনে পড়লেও বড় অস্পষ্ট। ও তখন একটা যন্ত্রের পুতুল হয়ে গেছে, সকলের নির্দেশ মেনে চলছে। আর কিছুই জানে না।

শুধু পরিচিত অপরিচিত মানুষের ভিড় ওর চারপাশে, বাড়িটায়।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেতে বসেছিল ও।

একটু দূরে সুপ্রভাতের গলা শুনে চোখ তুলে তাকাল হঠাৎ। চোখোচোখি হল, চোখ নামিয়ে সুপ্রভাত। জয়ার দিকে তাকাতেও পারছে না।

বাবা পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, আর কাঁদছেন। বলছেন, সবই আমার ভাগ্য। সর্বনাশ তো আমিই করলাম, কেন যে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা। 'একটা দুঃসংবাদ আছে!'

কি আশ্চর্য। সবাই নিজেকে দোষী ভাবছে। শ্বশুর ভাবছেন কেন অকারণ ভয় পেয়েছিলাম, প্লেন-ক্র্যাশ তো কতই হয়। বাবার মুখে একটাই অনুশোচনা: কেন দুঃসংবাদ বলেছিলাম।

তারপর দিনগুলো কি ভাবে যেন কেটে গেছে।

জয়া ধীরে ধীরে বললেন, মা, ভাবছি কাল থেকে পিঙ্কুকে স্কুলে নিয়ে যাব।

অমিতা শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

ছুটকুর পিসি এসে বললেন, তোমার রান্না চড়িয়েছ?

জয়া কোনও জবাব দিল না।

ওই মাটির হাঁড়ি, ধোঁয়ার উনোন দেখলেই ওর গা গুলিয়ে ওঠে। ওর ক্ষিদে নেই, খেতে ইচ্ছে করে না। তবু রাঁধতে হয়, খেতে হয়।

এভাবেই নাকি সুকল্যাণকে স্মৃতির মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বাঁচিয়ে রাখবে জয়া। ওর এই সাদা থান পরা চেহারাটা, এই মাটির হাঁড়ি, সাবান না মাখা, এসবের মধ্যেই তো নির্মলেন্দু আর অমিতা তাঁদের ছেলেকে দেখতে চান। এসবের মধ্যেই ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে চান।

—কি বৌমা বৌমা করছ, জয়া বলতে পার না। অমিতা ধমক দিচ্ছে নির্মলেন্দুকে।

—তুই কি ভাগ্যবান রে, তোর মতো মডার্ন শাশুড়ি পেলে বর্তে যেতাম। মীনা বলছে।

অমিতা বলছে, তোমাকে আর এ বাড়িতে ঘোমটা দিতে হবে না, আমি সেকেলে শাশুড়ি হতে পারব না।

সব মনে পড়ছে, একটা পরিহাসের মতো মনে হচ্ছে এখন।

তা হোক, এভাবেই ও বাঁচবে। পিঙ্কুর জন্যে বাঁচতে হবে ওকে।

—মা, কাল থেকে আমি পিঙ্কুকে স্কুলে নিয়ে যাব ভাবছি। অমিতা ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

আর তখনই নিজের ঘরটিতে এসে হঠাৎ আয়নার সামনে দাঁড়াল জয়া। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। এ কে? একে তো ও চেনে না।

বুকের ভেতর থেকে একটা চাপা কান্না যেন গুমরে উঠতে চাইল।

এই সাদা থানের নিঃস্ব চেহারা নিয়ে ও কি করে দাঁড়াবে সকলের সামনে। কেমন যেন বেমানান লাগবে। হাতে গলায় কোথাও কিচ্ছু নেই, নিরাভরণ। এই দৈন্য নিয়ে লোকের চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না।

ওরা এসেছিল, এখন মনে পড়ছে। মীনা, ইরা, বিল্লুর মা, আরো কে কে।

সান্ত্বনা দিয়েছিল। —আমরাও আছি, তুই কিচ্ছু ভাবিস না।

কে আছে, কে নেই, সে ভাবনা তখন ছিল না জয়ার। ওর তখন সমস্ত মন জুড়ে একটাই কথা—একজনই নেই। বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় না, যেন এখনই যে কোনও মুহূর্তে এসে 'জয়া' বলে ডাকবে।

নিজের হাতের কব্জিটা দেখল জয়া। ও শাঁখা পরে বলে মীনারা ঠাট্টা করেছিল

একদিন। —আজকাল আর ওসব কেউ পরে নাকি রে।

ইরা বলেছিল, শাঁখা ভেঙে গেলে ভাই বড় ভয় করে, তার চেয়ে না পরাই ভাল।

ওরা তো মডার্ন, ওরা পারে। জয়া পারেনি। বিল্লুর মা তো পলার বালা, শাঁখা, নোয়া, তার ওপর একরাশ চুড়িও পরে।

—চল, গঙ্গার ঘাটে গিয়েই ও-সব হবে।

কে বলেছিল কে জানে। ছুটকুর পিসিই হয়তো। আরো কত লোক তো ছিল। গঙ্গার ঘাটে হঠাৎ কে বললে, বৌমা, এবার শাঁখাটা ভেঙে ফেল। শাঁখা ভেঙে গঙ্গায় স্নান করে এসো।

জয়া জানতই না। অবাক হয়ে তাকাল। যেন ওদের কথা ও বুঝতে পারছে না। কি বলছে ওরা ?

কে এসে হাত দুটো ঘাটের পাথরে ঠুকে দিল। বললে, ওগুলো গঙ্গায় ছুড়ে দাও।

যন্ত্রের মতোই সাদা শাঁখার টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গঙ্গায় ছুড়ে দিল জয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, সুকল্যাণ নেই, সুকল্যাণ নেই।

একটা সাদা শাঁখা যেন গর্ব করে বলেছিল, সুকল্যাণ বেঁচে আছে, একটা সাদা থান কাপড় এখন বলছে, সুকল্যাণ নেই।

আয়নার সামনে তাই দাঁড়াতে পারল না জয়া। একটা দ্বিধার মধ্যে পড়ল ও। এখন ওকে উঠে দাঁড়াতেই হবে, পিঙ্কুকে আবার স্কুলে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই পোশাকে এই চেহারায়! অসম্ভব, এভাবে জয়া ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এমন রিক্ত নিঃস্ব চেহারা নিয়ে। বুকের ভেতরটাই শুধু রিক্ত হয়ে থাক।

—ছুটকু, ভাই একবার শুনবে! এ ঘরে এসো।

এখন আর ছাদে ওঠার সিঁড়ির সেই গোপন আস্তানার দরকার নেই। এখন ওকে একটু সাহস দেখাতেই হবে।

ছুটকু এল, তাকাল সপ্রশ্ন চোখে।

জয়া বললে, কাল পিঙ্কুকে স্কুলে নিয়ে যাব। কিন্তু এই নোংরা পোশাকে আমি যেতে পারব না।

ঠিক তখনই সুপ্রভাতও ঢুকেছে, হাতে দু'খানা খাম নিয়ে। এগিয়ে দিয়ে বললে, যত্ন করে রেখে দাও।

জয়া চোখ বুলিয়ে দেখলও না। শুধু হাতেই নিল।

সুপ্রভাত বললে, যেদিন এসেছিল, তোমাকে আর বিরক্ত করিনি। দুটোই যত্ন করে রেখে দাও। একটা ডেথ সার্টিফিকেট।

যত্ন করেই নিজের আলমারিতে তুলে রেখে দিল জয়া। অন্য খামটায় কি আছে জানতেও চাইল না। খুলে দেখল না।

ওর কানের কাছে তখন বাজছে, ডেথ সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট।

মানুষটা চলে গেছে, এখন এটাই সবচেয়ে মূল্যবান।

সুপ্রভাত দাঁড়িয়েই ছিল, তার সামনেই ছুটকু প্রায় কান্নার গলায় বলে উঠল, না না বৌদিভাই, এত তাড়াতাড়ি রঙিন শাড়ি পরো না।

ছুটকু অনুনয়ে জয়ার হাতখানা ধরে ফেলেছিল।

এত দুঃখের মধ্যেও একটা স্মিত হাসি খেলে গেল জয়ার মুখে। ছুটকু এঁকে এত ভুল বুঝল কি করে। কোনওদিনই কি ও আর রঙিন শাড়ি পরবে। ও নিজেই তো পরতে পারবে না। ও তো শুধু বলেছে, এই নোংরা পোশাকে আমি যেতে পারব না।

জয়া দুঃখের হাসি হেসে বললে, পাগল মেয়ে, তাই কি পারি নাকি। আমি বলছিলাম, একটা সাদা শাড়িই, পাড় থাকবে না। লোকের সামনে তো গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

সুপ্রভাত কোনও কথা বলল না, ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

ও আজই চলে যাবে, কতদিন আর ছুটি নিয়ে বসে থাকবে। বেচারা। খবর পেয়েই সেই যে ছুটে চলে এসেছিল তার পর থেকে তো থেকেই গেছে।

ওকে কে খবর দিয়েছিল, কবে এসেছে কিছুই মনে নেই জয়ার।

শুধু এইটুকুই মনে আছে, মৃতদেহ এসে পৌঁছেছে, বাড়ির সামনে রাখা আছে। একরাশ লোক।

তার অনেক আগেই, বোধহয় আগের দিনই, ওরা সব জেনে গিয়েছিল। এ বাড়িটা তখন শুধুই একটা কান্নার রোল। সকলেই কাঁদছে। নির্মলেন্দু, অমিতা, ছুটকু। সুপ্রভাতও। কাঁদেনি শুধু জয়া, ও তখনো বুঝতেই পারছে না, সত্যি না মিথ্যে। বুঝতেই পারছে না ওর কি হারিয়ে গেছে।

কে একজন চিৎকার করে বলে উঠল, ডেড বডি এসে গেছে, ডেড বডি এসে গেছে।

নির্মলেন্দু একটা ভেঙে পড়া মূর্তি, অমিতা চিৎকার করে আর্তনাদ করে উঠল।

কে একজন নির্মলেন্দুকে বললে, আপনি চলুন একবার, শেষ দেখা!

নির্মলেন্দু বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে যেন বাধা দিচ্ছেন ওই কথাটাকেই।

অস্ফুটে বললেন, না, আমি দেখব না, আমাকে ওসব কথা আর বোলো না।

চাপা গলায় কারা যেন নিজেদের মধ্যে কানাকানি করল, দেখার মতো নেইও, না দেখলেই ভাল।

অমিতা কিন্তু ততক্ষণে ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে সেই শবদেহের ওপর।

জয়া এসব জানেও না, দেখেওনি। নাকি ছুটে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

শুধু মনে পড়ছে কে নিষ্ঠুরের মতো চিৎকার করল, কে মুখাগ্নি করবে?

পাশ থেকে কেউ বললে, আস্তে, আস্তে। অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

চেঁচিয়ে বলা লোকটা এবার একটু গলা নামাল। বললে, তাড়াতাড়ি না গেলে, ইলেকট্রিক চুল্লি তো বুক হয়ে যাবে। এক একটা পৌনে এক ঘণ্টা।

আরেকজন বললে, তা ঠিক। বেশি রাত হয়ে গেলে, লোক চলে যাবে সব। ফিরতে হবে তো সকলকে।

এখন মনে পড়তেই সমস্ত লোকগুলোকে জয়ার ভীষণ নিষ্ঠুর লাগছে। ওরা এসেছিল বলে একসময় কৃতজ্ঞ বোধ করেছে। এখন কথাগুলো মনে পড়তেই বিতৃষ্ণায় ভরে যাচ্ছে বুক।

চুল্লি বুক্‌ড় হয়ে যাবে, ফিরতে রাত হবে, লোক চলে যাবে। লোকটাই চলে গেল, সেটা কারো কাছে কোনও বড় কথা নয়। সেটা শুধু এই বাড়িটার শোক, আর কারো নয়। আর সকলের মনে হচ্ছে এই মৃতদেহটা এদের সকলকে আটকে রেখেছে, দেরি করিয়ে দিচ্ছে। ওরা বাড়ি ফিরতে পাচ্ছে না। ওদের যে সবারই ফেরার জায়গা আছে, ওদের যে কিছুই হারায়নি।

কি আশ্চর্য, জয়া তো কোনওদিন বুঝতেই পারেনি, ওর সমস্ত বুক জুড়ে মানুষটা ছিল, নেই বলেই তো এখন এমন শূন্যতা। সত্যি কি এত ভালবাসত সুকল্যাণকে? কই কোনওদিন তো মনে হয়নি।

—কে মুখাগ্নি করবে? কে মুখাগ্নি করবে?

কে একজন বললে, কেন পুত্রসন্তান তো রয়েছে, পিঙ্কু, পিঙ্কু।

জয়ার মনে আছে ওর কোলের কাছেই পিঙ্কু বসেছিল, সকলের কান্না দেখে পিঙ্কুও কাঁদছিল। একবার বোধহয় প্রশ্ন করেছিল, কি হয়েছে মা ? জয়া উত্তর দেয়নি।

পিঙ্কুর নাম শুনেই ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিল জয়া। বলে উঠেছিল, না না। ও করবে না।

সকলেই চুপ করে গেল।

কে একজন বলে, এত বাচ্চা ছেলে কি করে মুখাগ্নি করবে, জানি না।

আরেকজন বললে, ছুঁয়ে দিলেই হবে, ছুঁয়ে দিলেই হবে।

একজন বৃদ্ধ, বোধহয় প্রতিবেশী, বললেন, পুত্র, পুত্র। পুত্র না করলে পুত্রযুক্তা পত্নী।

—না না। জয়া বলে উঠল, আমি না। কেঁদে উঠে বললে, আমি পারব না, পারব না।

—আহা কোনও একজনকে তো করতে হবে। কন্যা দৌহিত্র যখন নেই, কনিষ্ঠ সহোদর। সুপ্রভাত, তা হলে তুমিই।

কে একজন বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, কেউ যদি না করে, শেষে বাবাকেই টেনে নিয়ে যেতে হবে নাকি।

জয়ার কিচ্ছু মনে নেই, হয়তো সুপ্রভাতই মুখাগ্নি করেছিল। নাকি এক ফাঁকে পিঙ্কুকেই নিয়ে চলে গিয়েছিল ওরা।

কে যেন বলেছিল, পিঙ্কুই চলুক না, শুধু ছুঁয়ে দেবে।

শুধু মনে পড়ছে, সুপ্রভাত ওকে নিয়ে গিয়ে একটা গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছিল। গিয়েছিল নাকি ! তা না হলে গঙ্গার ঘাটে শাঁখা ভাঙল কি করে।

তখন ভেঙেছে, এখন কি ও আবার জোড়া লাগাতে বসেছে নাকি। ছুটকু ভাবল কি করে যে, ও রঙিন শাড়ি পরতে চাইছে।

জয়া বললে, আমি বলছিলাম একটা সাদা শাড়িই...

জয়ার কথা শুনে ছুটকু বিষণ্ণভাবে বললে, তোমার যা ইচ্ছে। এখন অন্তত এমন কিছু কোরো না বৌদিভাই, যে বাবা কষ্ট পায়, মা কষ্ট পায়।

কি কথা ! সেই ভাবনাই তো ওর সবচেয়ে বেশি। শুধু এবাড়ির বাবা মা নয়, ওর নিজের বাবা মার কথাও মনে পড়ছে। দুঃখের হাসি হাসল জয়া, রঙিন শাড়ি পরলে ওর নিজের বাবা মাও ওকে ক্ষমা করবে না। ওদেরও মানসম্মান আছে। পাড়াপড়শির কাছে, আত্মীয়স্বজনের কাছে। নিয়ম না মানা মানেই তো সে খারাপ, খারাপ। বৈধব্যের ওই শ্বেতশুভ্র পোশাক যেন চেঁচিয়ে বলে, আমি পবিত্র, আমি বিশুদ্ধ, আমি শোকার্ত। লোকে তা বিশ্বাসও করে। জয়ার বুকের ভেতরে কি হাহাকার তা তো কেউ দেখতে চায় না। এরা কেউ জানে না ওর নিজেরও ইচ্ছে করছে এই সাদা থান কাপড়কেই আঁকড়ে ধরে থাকতে।

যখন সুকল্যাণ ছিল, জয়া তো নিজেকে পুরোপুরি সুখী ভাবতে পারেনি। বরং কেমন একটা বন্ধন মনে হত এক একসময়। অথচ তখন ছুটকু কল্পনা করত ওরা প্রচণ্ড সুখী, ওদের সব আছে, ছুটকুর কিছুই নেই। আর সেজন্যে একটা চাপা ঈর্ষাও। এখন জয়ার মনের মধ্যে হাহাকার, কিন্তু একটা সাদা থানের বদলে একটা সাদা শাড়ি পরতে চেয়েছে বলে ভুল বুঝছে।

ছুটকু তাই কেমন একটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, তোমার যা ইচ্ছে।

—কিন্তু কে কিনে আনবে ? আমি যাব ? জয়া বললে।

'তোমার যা ইচ্ছে' এই কথাটার মধ্যে তাচ্ছিল্য কিংবা বিদ্রূপ ছিল। কিন্তু জয়া সেটা গায়ে মাখল না।

ছুটকু বললে, কেন, তুমি কেন যাবে। এই পোশাকে তো বাইরে বেরোনো যায় না বলছ। তার চেয়ে ছোটদাকে বল।

কথাগুলো একটুও ভাল লাগল না জয়ার। কি নির্মম ছুটকুটা, এ সময়েও এরকম একটা ধারালো শ্লেষ ওর কথায়। কিন্তু সুপ্রভাতকে বলতেও লজ্জা। ও হয়তো ভেবে বসবে দাদার জন্যে কোনও শোক নেই জয়ার।

তবু বলতেই হল।—আমার একটা কাজ করে দেবে ? একটা সাদা শাড়ি এনে দেবে ? পাড় থাকবে না। কাল থেকে তো পিঙ্কুকে স্কুলে নিয়ে যেতে হবে। অনেক কামাই হয়ে গেছে ওর।

সুপ্রভাত ঘাড় নাড়ল, এনে দেব।

প্যাকেট খুলে শাড়িটা দেখেই চমকে উঠল জয়া।—এ কি করলে ?

ছুটকুও দেখল।

তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে বললে, তোর কি কোনও বুদ্ধি নেই ছোটদা !

সুপ্রভাত রেগে গেল, কেন, কি দোষ হয়েছে। রেগে গেলে ওর আর কোনও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এক একসময় জয়ার পক্ষ নিয়ে ও তো বাবা মার সঙ্গেও ঝগড়া করত। রাগারাগি করত। সুকল্যাণ সেসব পারত না। তার সবেতেই লজ্জা, সবেতেই চুপচাপ। নিজের বৌয়ের হয়ে কোনও কথা কি বলা যায় নাকি !

সুপ্রভাত রেগে গিয়ে ছুটকুকে বললে, তার চেয়ে বৌদির পিঠের ওপর একটা লেবেল এঁটে দে, 'আমি বিধবা'।

মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করল জয়ার। এত সব শুধু ওকে নিয়ে। অথচ ও নিজেও তো আতঙ্কের চোখ নিয়ে শাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল।

ছুটকু চলে গেল ঘর থেকে। সুপ্রভাতও। দু'জনেরই চোখে-মুখে রাগ। কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছে না।

জয়া মনে মনে ভেবে নিয়েছিল ও পরবে না, পরবে না। কেন কষ্ট দেবে সকলকে। তাতে তো ওর নিজের কষ্ট কমবে না একটুও।

কিন্তু অনেকক্ষণ পরে ছুটকু ফিরে এল।—বৌদিভাই, কিছু মনে করো না। পরো, তুমি ওই শাড়িটাই পরো, পিসি যা বলে বলুক। ওরা তো শুধু কষ্ট দিতে ভালবাসে, কষ্ট দিচ্ছে তাও ভাবতে পারে না।

ছুটকু নিজেই শাড়ির ভাঁজ খুলল, ভাল করে দেখল। একটা সাদা শাড়িই, একেবারে সাদা, পাড় নেই। শুধু আঁচলের কাছে হাতখানেক একটা কালো ডিজাইন। এমন কিছু নয়, খুবই সাদাসিধে। অ্যাপ্লিকের কাজ। শুধু কোনাকুনি এক টুকরো কালো কাপড় বসানো।

ছুটকুর ভাবতে খারাপ লাগল যে সামান্য এইটুকুর জন্যে একটু আগে ওর দাদার ওপর চটে গিয়েছিল। হয়তো বা বৌদিভাইয়ের ওপরও। সে কি শুধু ওই গোঁড়া পিসিটার জন্যে ? নাকি লোকে কি বলবে এই কথা ভেবে ? অথবা ও নিজেও কষ্ট দিতে চাইছে। অনেক তো সুখ ভোগ করেছ, এবার একটু কষ্ট পাও।

ছুটকু নিজেও বুঝতে পারে না। ও শুধু জানে বৌদিভাই সম্পর্কে কেউ কিছু খারাপ ভাবলে সেটা ওর নিজেরও অপমান। এই বাড়িটার অপমান। ওর মৃত দাদার অসম্মান।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ওর ইচ্ছে করছে বৌদিভাই সাদা শাড়ির, নিছক একটা সাদা শাড়ির নিরাভরণ নিঃস্বতার মধ্যে থেকে দাদার স্মৃতিটাকে বাঁচিয়ে রাখুক। দাদা এ ভাবেই ওদের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে। বাবার কাছে, মার কাছে।

অথচ ওর হঠাৎ কেমন ভয় করতে শুরু করেছে, এই গোঁড়ামির মধ্যে, এই বাধানিষেধের মধ্যে ঠেলে দিতে গেলে বৌদিভাইকেই হারাতে হবে না তো। কে জানে, হয়তো সুপ্রভাতই ওকে বুঝিয়েছে।

সেজন্যেই ও আবার ফিরে এসে বলছে, বৌদিভাই, পরো, তুমি ওই শাড়িটাই পরো।

সাদা শাড়ির আঁচলের প্রান্তে কালো কাপড়ের অ্যাপ্লিকে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, কালোও তো শোকেরই রঙ !

জয়ার মনের ভিতরটা বিষণ্ণতায় হাসল। 'কালোও তো শোকেরই রঙ।' সারা শরীর রি রি করে উঠল ওর। কি চায়, কি চায় এরা সবাই। জয়া শুধু একটা শোকের প্রতীক হয়ে থাকুক বাড়িতে ? একজন বিধবার কর্তব্য করে যাক। আর কিছু নয় ? ওর ভেতরটা যে শূন্যতায় কেঁদে উঠতে চাইছে, পিক্কুর দিকে তাকালেই যে হাহাকার বুক ফেটে বেরোতে চাইছে, তার কোনও দাম নেই ? এরা কি শোক চায় না, শুধু শোকের বিজ্ঞাপন চায় ?

ছুটকুর পিসি এসে দাঁড়ালেন দরজার বাইরে।—তোমার রান্না চড়াবে কখন বৌমা ? খেতে হবে না ?

খাবার কথা উঠলেই সারা শরীর গুলিয়ে ওঠে।

জয়া নিজেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে সারা জীবন ও বিধবার কর্তব্য করে যাবে। কর্তব্য। তার মধ্যে বেঁচে থাকবে ওর বিবাহিত জীবনের এই কটা বছরের স্মৃতি।

এখন আর মনেও পড়ে না ওই মাটির হাঁড়িটা কে কবে এনে দিয়েছিল। ওই উনোন।

—স্বপাক সিদ্ধান্ন খেতে হয় বৌমা, তুমি উনোনটা ধরিয়ে নাও।

কে বলেছিল ? হয়তো এই ছুটকুর পিসি।

বলেছিলেন, আঁশ হেঁসেলে তো আর তোমার রান্না হবে না। উনোনটা ধরিয়ে নাও।

রান্নাঘরের দিকে তাকাতেও ভয় হয়, মনের মধ্যে না লোভ জেগে ওঠে। এখন ওর স্থান হয়েছে বারান্দার এক কোণে। রান্নাঘরে তো আমিষ রান্না, বাড়ির অন্য সকলের জন্যে : তার ছোঁয়া না লাগে।

আসলে ওর যে ক্ষিদেই চলে গেছে সেই খবরটা কেউ জানে না।

ও তো এখন শুধুই একটা কর্তব্য। এই যে শাড়িটা নিয়ে এসেছে সুপ্রভাত, ওটা পরতেও ওর সঙ্কোচ। যেন কর্তব্যের সঙ্গে প্রতারণা করছে ও।

জয়ার হঠাৎ মনে হল আমাদের সমস্ত জীবনই তো শুধু কর্তব্য করে যাওয়া। বিয়ের আগে কুমারী জীবনের একটাই কর্তব্য, বাধনিষেধের মধ্যে কন্যার কর্তব্য, তারপর কারো বধূ কারো পুত্রবধূ হয়ে কর্তব্য করে যাওয়া। মা হয়ে সন্তানের প্রতি কর্তব্য। এখন একজন মৃত মানুষের বিধবা পত্নীর কর্তব্য। এত এত কর্তব্যে আমি মানুষটাই তো হারিয়ে যাচ্ছি, কোনও সময়েই আমি আর 'আমি' হয়ে উঠতে পারলাম না।

জয়া নিজেকেই বললে, অথচ দ্যাখো, আমি তো গান শিখেছিলাম, গানের মধ্যে নিজেকে খুঁজে নিতে পারতাম। আমি তো ছবি আঁকতাম, স্কুলের ড্রয়িং দিদিমণি কত প্রশংসা করতেন। কলেজে পড়ার সময় প্রেম কি জানার কত ইচ্ছে হয়েছিল। কিছুই না পারি আমি তো 'আমি' হতে পারতাম।

না রে পিক্কু, আমি কিছু হব না। আমি শুধু তোর জন্যে বেঁচে থাকব।

পরের দিন পিক্কুকে স্নান করিয়ে খাইয়ে নিয়ে ও নিজের ঘরে ঢুকল। সুপ্রভাতের শাড়িটা নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একটা দ্বিধা। ও কি অন্যায় করছে !

শেষে শাড়িটা পরেই ফেলল। একটা সাদা ব্লাউজ। আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে চিরুনিটা দিয়ে বারকয়েক চুল আঁচড়ে নিল।

তারপর পিঙ্কুকে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। ছুটকুর পিসি না দেখতে পায়। ওঁর ভয়েই তো একটু এলো খোঁপাও বাঁধতে পারেনি।

সিঁড়ি দিয়ে ও দ্রুত নেমে আসছিল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

সুপ্রভাত উঠে আসছে।

বোধহয় বাইরে কোথাও গিয়েছিল, কোনও কেনাকাটা, আজকেই তো ও চলে যাবে।

জয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর শরীর জড়িয়ে সুপ্রভাতের কেনা সেই কালো অ্যাপ্লিকের কাজ করা সাদা শাড়ি।

সিঁড়িটা তেমন চওড়া নয় বলেই জয়া আর পিঙ্কু দাঁড়াল, সুপ্রভাত ওকে পাশ কাটিয়ে উঠে যাবে তার অপেক্ষায়।

কিন্তু সুপ্রভাতও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জয়া দেখল ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে গেল সুপ্রভাত, মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল তার।

সুপ্রভাত ওর চোখে চোখ রাখল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল জয়া। শাড়িটা পরার জন্যে সঙ্কোচ। নাকি স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে বলে।

মৃদু হেসে সুপ্রভাত তার আগেই বলে উঠেছে, বাঃ, এখন তবু মানুষ মনে হচ্ছে।

পাশ কাটিয়ে তরতর করে নেমে গেল জয়া।

বাস থেকে নেমে খানিকটা পথ হকার্স কর্নারের পাশ দিয়ে। চলার পথ শীর্ণ, গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়, ধাক্কা না লাগে, ছায়ায় ছায়ায়, ছোট ছোট নানান জিনিসের রঙবাহারি দোকানগুলো দেখতে দেখতে যাওয়া যায়।

পিঙ্কু হঠাৎ এক একদিন দোকানে কোনও একটা জিনিস দেখতে পেয়ে বায়না ধরেছে এর আগে। আজ আর কিছু বলছে না, চুপচাপ। ও হঠাৎ কেমন যেন চুপ করে গেছে। কেউ কি কিছু বুঝিয়েছে ওকে। ও কি বুঝতে পারছে, কি হয়ে গেছে ওর। মৃত্যু কি জিনিস ?

কিন্তু জয়ার মনের ভিতরটা কেমন করছে যেন। কেন।

সুপ্রভাত যখন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক ওর শরীরের ওপর চোখ বুলিয়ে গেল তখনই বড় অস্বস্তি লেগেছিল জয়ার। সুপ্রভাতের মুখের হাসিতে চাপা কৌতুক ছাড়া আর তো কিছু ছিল না। কৌতুক না আনন্দ ! দৃষ্টিতেও আপত্তিকর কিছু খুঁজে পায়নি। শরীর, না শরীরে জড়ানো শাড়িটা দেখছিল ও, কে জানে। তবু অস্বস্তি লেগেছিল।

অথচ সুপ্রভাতের দৃষ্টিতে আগে তো কখনো অস্বস্তি লাগেনি, সঙ্কোচ বোধ করেনি। বিধবার বেশ পরলেই কি তা হ'লে মনও গুটিয়ে আসে, সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়।

বিয়ের পর সুপ্রভাতের সঙ্গেই ছিল ওর গাঢ় বন্ধুত্ব, কাছে থাকত, হুকুম শুনত, যে কোনও কাজ করে দিত বলা মাত্র। নিজের ভাইয়ের মতো।

যাঃ, মিথ্যে কথা। নিজের ভাই তো সবচেয়ে দূরে চলে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত বাড়িতে থাকত না, একটা কিছু আনতে বললে, 'আমার সময় হবে না।' সুপ্রভাতের সঙ্গে, ছুটকুর সঙ্গে প্রথম প্রথম যেভাবে খাটে বিছানায় বসে চাইনিজ চেকার খেলেছে, সুশান্তর সঙ্গে সেসব কল্পনাও করা যায় না। এক কথায় বলে দেবে, ওসব মেয়েলি খেলা ! এই তো সেদিন বাপের বাড়ি গিয়ে প্রথম দেখল, সুশান্ত বসে বসে ওর সঙ্গে গল্প করল, ভি সি পি চেয়ে নিয়ে এসে ক্যাসেটে পরপর কয়েকটা ছবি দেখাল। সঙ্গে করে মেজদির বাড়ি নিয়ে যেতে রাজি হল। যেন জয়াকে খুশি করতে পারলে ও নিজেও খুশি। বাবা-মা এমনকি সুশান্তও জয়ার সুখ দেখতে চাইছিল। এখন আর জয়াকে সুখী দেখার কোনও

উপায় নেই।

কিন্তু সুপ্রভাতের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল আরো মধুর। ওর সঙ্গ বেশ ভাল লাগত জয়ার। কত রকম মজা করত। হাসাত, এখন শুধু জয়ার মুখ থেকেই হাসি চলে যায়নি, সুপ্রভাতের মুখ থেকেও।

—অ্যাই ছোটদা, তুমি নাকি...

ছুটকু ছোটদা বলত বলে জয়াও সুপ্রভাতকে ছোটদা বলতে শুরু করেছিল। 'ঠাকুরপো' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রথম দিন হেসে ফেলেছিল, বোধহয় অভ্যস্ত ছিল না বলেই। অত বড় একটা ছেলেকে, ছেলে আবার কি, মানুষ ; তাকে নাম ধরে ডাকতেও পারেনি।

অমিতা তখন দারুণ খুশি। বউ তো বেশ সুন্দরী, তোরা তো বলিসনি রীতিমতো ফর্সা।

সেজন্যেই জয়া হঠাৎ একটা থিন অ্যারারুট বিস্কুট নিয়ে এসে সুপ্রভাতকে সবার সামনেই বলল, অ্যাই ছোটদা। তুমি নাকি বলেছিলে আমার গায়ের রঙ থিন অ্যারারুটের মতো ? এই দ্যাখো। বলে বিস্কুটটা দেখাল।

সুপ্রভাত হাসছে, সবাই হাসছে।

সুপ্রভাত বললে, কি করে জানব বলো এ রকম রঙ হয়ে গেছে আজকাল। বিস্কুট তো খেয়েছি সেই ছেলেবেলায়।

জয়া হাসতে হাসতে বললে, সত্যি কথাটাই বলো না। মেয়ে দেখতে গিয়ে আমার পাশে দাঁড়ানো মেয়েটাকে দেখছিলে, ও পাশের বাড়ির। বলো তো ওদের খবর দিয়ে দিই।

বিয়ের পর সুপ্রভাতই ছিল ওর সহায়। সঙ্গীও। সুকল্যাণ ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ হ'লে কি হবে, কাছে পেত কখন। তাব অফিস, আড্ডা, বাবা-মার কাছে সঙ্কোচ তাকে জয়ার কাছ থেকে দূরেই সরিয়ে রেখেছিল।

সুপ্রভাতের মন ছিল একেবারে নির্মল। ওর কোনও সঙ্কোচ ছিল না।

সুকল্যাণ ক্যামেরা এনে ছবি তুলছে জয়ার। আসলে উদ্দেশ্য জয়ারই ছবি তোলার, তবু কখনো ছুটকুকে ডাকছে, কখনো মাকে।

ওদের সামনেই সুপ্রভাত এসে বললে, সরো মা, সরো। তোল তো দাদা, আমার আর বৌদির একটা ছবি। বলে পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে জয়ার কাঁধে হাত রেখে, বেশ কাছে টেনে নিয়ে বললে, তোল না. তোল।

সুকল্যাণও হাসতে হাসতে খচাং করে ছবিটা তুলে ফেলল।

অ্যালবামে সে ছবিটাও আছে।

খেলতে খেলতে উঠে যাচ্ছে জয়া, পিঙ্কুর জন্যে দুধ গরম করতে হবে, ও ঘুম থেকে উঠলেই খাওয়াতে হবে, সুপ্রভাত খপ্ করে হাতটা ধরে টেনে বসিয়েছে, এই দান। এই দানটা খেলে উঠবে।

কই তখন তো ওর কিছু মনে হয়নি। কোনও অস্বস্তি লাগেনি। আজ কেন লাগল।

একদিন, কার যেন বিয়ে, বিয়েবাড়িতে যেতে হবে, নতুন বউ তখন, খুব সেজেছে, লাল বেনারসী, গলায় হাতে সব সেটিংয়ের গয়না, আয়নায় নিজেকে খুবই সুন্দরী লাগছিল।

এসে দাঁড়াল সুপ্রভাতের কাছে। যেন ওর মতটার দাম অনেক বেশি, সুকল্যাণের চেয়েও।

—এই ছোটদা, কেমন দেখাচ্ছে বলো, তোমাদের প্রেস্টিজ থাকবে তো।

সেদিনও সুপ্রভাত ওর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে গিয়েছিল। চোখ বড় বড় করে দেখেছিল,

ওর সাজ, নাকি সাজানো শরীরটা। তারপর বলে উঠেছিল, আঃ, একেবারে গডরেজ। গডরেজের মতো।

ওটা এই গোঁড়া পিসিকে ঠাট্টা।

বউভাতের দিন তো এসেছিল, কে বুঝি জয়াকে দেখে তারিফ করে বলেছিল, গর্জাস। দারুণ সুন্দর।

পিসির দোষ কি, ক্লাস এইট অবধি বিদ্যে, ও কানে একটা কথাই শুনেছে, গডরেজ।

এসে অমিতাকে বলেছে, তোমার ছেলের বউকে একজন গডরেজ বলল।

ওটা এখন এ বাড়ির বাঁধা রসিকতা।

কিন্তু কই, সেদিন তো সুপ্রভাত ওর সাজ কিংবা সাজানো শরীর দেখেছিল বলে অস্বস্তি হয়নি।

—বাঃ, এখন তোমাকে মানুষ মনে হচ্ছে।

কথাটা কানে লেগে রয়েছে জয়ার।

পিঙ্কুর হাত ধরে হকার্স কর্নারের দোকানগুলোয় চোখ ফেলতে ফেলতে হাঁটছিল জয়া, হয়তো একটু দ্রুতই, পিঙ্কুর স্কুলের না দেরি হয়ে যায়। হঠাৎ একটা দোকানে চোখ আটকে গেল।

ছোট্ট একটা ইমিটেশন গয়নার দোকান। নানা রকম ইমিটেশন পাথরের গলার হার, কানের দুল। চোখ আটকে গেল দেয়ালে। একটা সাদা বোর্ডের ওপর আঁটা ছোট ছোট কালো রঙের পাথর।

—ওগুলো কি ?

ও দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে জিগ্যেস করল।

—কানের। দোকানি উত্তর দিল।

স্কুল থেকে ফেরার পথে ওই দোকানটার সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ল জয়া।

—দেখি, দেখি। দেখান তো একটু।

দোকানি এনে হাতে দিল।

দুটো কানের ট্যাপ। শুধু কালো পাথর, পিছনে প্যাঁচ লাগানো। পাথর ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না। সিকি ইঞ্চি মতো, চৌকো। খুব সুন্দর দেখতে।

এখনই যে পরবে তা তো নয়। কিনে রেখে দিল। যদি কোনওদিন পরে। এই শাড়িটার সঙ্গে খুব সুন্দর ম্যাচ করবে। কালোও তো শোকেরই রঙ।

এখন যদি ওকে মানুষ মনে হয় দোষ কি। ও তো আর সুকল্যাণকে ভুলে যাচ্ছে না।

পিঙ্কুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল জয়া।

এইবার ওর সামনে সেই নিত্যদিনের পরীক্ষা।

বারান্দার এক কোণে মাটির হাঁড়িতে এটা ওটা সেদ্ধ আর আতপ চাল, মুখে রোচে না, তবু খেতে হয়। ও ভাবছিল, এত দুঃখকষ্ট বলেই ক্ষিদে চলে গেছে। অমিতা বলেছে, কয়লার উনোনেই করো। যেন কাঠ, কয়লার বেশি আর এগোতে পারল না, যেন গ্যাসে করলেই সুকল্যাণের আত্মা অভিমানে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

ওর রান্না, রান্না আবার কি শুধু ফুটিয়ে নেওয়া, হয়ে যাবার পর বারান্দার এক কোণে বসল জয়া। খেতে হবে। সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। প্রতিদিনের পরীক্ষা।

কলেজে পড়ার সময় শহরতলিতে ওদের এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে। গ্রীষ্মের দুপুরে তেতেপুড়ে গিয়ে পৌঁছেছে, সর্বাঙ্গে ঘাম, গলায় প্রচণ্ড তেষ্টা। জলের।

—আগে এক গ্লাস জল দে তুই। বন্ধুকে বললে।

সে পাখাটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দিয়ে এক গ্লাস জল এনে দিল।

গ্লাসটা হাতে নিয়ে জয়া বললে, পর পর চার গ্লাস জল খাব, রেডি থাক তুই।

হাসতে হাসতে জলের গ্লাস মুখে তুলল। কিন্তু খেতে পারল না। এমন বিস্বাদ। জল ঠিকই, কিন্তু মুখে দিতে পারছে না। কেমন তেল-তেল।

—এ কি রকম জল ভাই!

বন্ধু বলছে, আমাদের তো এই রকমই, খুব আয়রন। একটু নোনতা নোনতাও। প্রথম প্রথম এসে তো খেতে পারতাম না।

জয়া ঠাট্টা করে বললে, তেষ্টায় বুক জ্বলে যাচ্ছে, আয়রন খাব কি রে এখন?

তেষ্টা পুষে রাখতে হয়েছিল, জল খেতে পারেনি সেদিন।

এখন ক্ষিদে পুষে রাখতে হয়, নিজেরই মুখে রোচে না। একটাই ভরসা, সেই বন্ধু বলেছিল, প্রথম প্রথম এসে তো খেতে পারতাম না, এখন পারি। হয়তো জয়ারও একদিন সয়ে যাবে। খেতে পারবে। খেতে তো হবেই, ও যে এখন শুধুই একটা কর্তব্য।

একটা খাবার টেবিল আছে এ বাড়িতে।

একটু আগে সেই টেবিলে বসে সকলে খেয়ে গেছে। কিন্তু ওটা তো আমিষের ছোঁয়া লাগা টেবিল। থালা বাসন এখনো পড়ে আছে।

তাই বারান্দার এক কোণে খেতে বসেছে জয়া। নিজেরই স্বপাক রান্না। হাঁড়িটাও সামনে রাখা আছে।

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ।

ছুটকু ছুটে এসে বললে, বৌদিভাই, তোমার বাবা।

হাতের গ্রাসটা হাতেই আটকে রইল।

জগদীশ ঢুকে পড়েছেন। এসময়ে কারো আসার কথা নয় বলেই খাবার টেবিলে এঁটো থালাবাসন পড়ে আছে। তোলা হয়নি। আগে এগুলো অমিতা কিংবা জয়াই তুলে নিয়ে গিয়ে বাথরুমে রেখে দিয়ে আসত, বিকেলে ঠেকে ঝি এসে মেজে দিয়ে যেত।

অমিতার এসব দিকে এখন আর কোনও দৃষ্টি নেই, পুত্রশোকে এখনো মুহ্যমান। সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকে, কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। কিংবা কানে যায় না, মাঝে মাঝে শব্দ করে কেঁদে ওঠে।

জগদীশ ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

একটা ভেঙে পড়া চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাকালেন জয়ার দিকে। কোনও কথা বলতে পারলেন না। আগের মতো 'কেমন আছিস' এ প্রশ্নও আর করা যায় না।

তবু যে দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখলেন তা বোধহয় আশঙ্কা করেননি। তাঁর আদরের মেয়ে একটা আধময়লা থান কাপড়ে হতদরিদ্র চেহারা নিয়ে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে থমকে আছে। বারান্দার এককোণে মেঝেতে খেতে বসেছে।

চোখে জল এসে গেল জগদীশের। একবার টেবিলের থালাবাসনের দিকে তাকালেন। আবার মেয়ের দিকে। অদূরে মাটির হাঁড়ি আর উনোনও চোখে পড়ল।

ছুটকু বললে, আসুন।

জগদীশ তার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে গেলেন।

নির্মলেন্দু চুপচাপ বসে ছিলেন, তাঁর কাছে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ছুটকু।

জগদীশ বসলেন।

নির্মলেন্দু একবার চোখ তুলে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন।

দু'জনেই চুপচাপ। জগদীশকে দেখেই ওদিকে অমিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

জগদীশ কিছু বলতে পারলেন না।

সান্ত্বনা দেবার শক্তিও ওঁর চলে গেছে। এর আগেও দু'তিনদিন এসে ঘুরে গেছেন।

দুঃসংবাদ শুনে প্রথম যেদিন জগদীশ আর মুকুল ঝড়ে-ভাঙা খুঁটি-উপড়ে-পড়া চালা ঘরের চেহারা নিয়ে ছুটে এসেছিলেন, সেদিনও কোনও কথা বলতে পারেননি। শবদেহ নিয়ে যাওয়ার সময়েও মুখে কোনও কথা ছিল না, সকলের পিছনে পিছনে হেঁটে গিয়েছিলেন নিঃশব্দে।

আজও কথা বলতে পারছিলেন না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে অনেক কষ্টে বললেন, দিন কয়েকের জন্যে ফুটকিকে নিয়ে যেতে এসেছি। দিনকয়েক ঘুরে এলে মনটা একটু যদি হালকা হয়।

অমিতা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হয়তো ক্ষীণ আপত্তি। মুখচোখে এমন একটা ভাব ফুটল যেন বড় অসহায়, বলতে চাইছে, তা হ'লে আমরা কি নিয়ে থাকব।

জয়ার মধ্যেই তো এখন সুকল্যাণকে দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু নির্মলেন্দু বিতৃষ্ণার মুখ নিয়ে তাকালেন জগদীশের দিকে, মাথা নিচু করলেন, তারপর অমিতাকেই হয়তো বললেন, বাঁ হাতখানা বিদায়ের ভঙ্গিতে নেড়ে বললেন, যাক, যাক।

অর্থাৎ যেতে দাও।

জগদীশ একটু অপেক্ষা করলেন, নির্মলেন্দুর ভঙ্গিটা ওঁর ভাল লাগেনি। তাই উঠে পড়ে বললেন, যাই, ফুটকিকে বলি।

ছুটকুরও খারাপ লেগেছে বাবার এই 'যাক, যাক' কথাটা।

ও জগদীশকে বললে, আপনি বসুন, আমি বলে আসছি।

ছুটকু এসে দেখলে জয়া কিছুই খায়নি, ঠায় বসে আছে।

—খেলে না ?

—ভাল লাগছে না, ক্ষিদে নেই।

ছুটকু বললে, তবু খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। তৈরি হয়ে নাও, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

জয়ার মুখ কি ঈষৎ উজ্জ্বল হল ? ও কি ভিতরে ভিতরে পালাতে চাইছিল! একটু খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে, একটু মুক্তির আলোবাতাস।

তৈরি হয়ে নাও।

খাটের তলা থেকে স্যুটকেশ বের করে দ্রুত হাতে সব গুছিয়ে নিল জয়া। এখন আর গুছিয়ে নেবার কিই বা আছে। শুধু পিঙ্কুর জামাকাপড়। নিজের জন্যে প্রায় কিছুই না।

আগের বার যখন গিয়েছিল বড় স্যুটকেশটাতেও সব ধরেনি। বেছে বেছে শাড়ি নিয়েছিল, আরো কত কি। কোনটা নিয়ে যাবে আর কোনটা রেখে যাবে ভেবে ঠিক করতেই কত সময় লেগে গিয়েছিল। দু চারখানা গয়নাও। ফিরে এসে আবার রেখে দিয়ে এসেছে ব্যাঙ্কের লকারে।

একবার কি ভাবল জয়া। তারপর লকারের চাবিটা বের করে স্যুটকেশে রাখল।

আলমারি খুলে থাকে থাকে সাজানো শাড়ি, ব্লাউজ জামাকাপড়ের ওপর চোখ বোলাল। কিছুই নেবার নেই। সবই আজ অর্থহীন, মূল্যহীন।

এক মুহূর্তের দ্বিধা, তারপরই সেই সাদা শাড়িটা, পাড় নেই, কিন্তু আঁচলে একটা অ্যাপ্লিকের টুকরো কালো। সুপ্রভাত কিনে এনেছিল।

কি রেগে গিয়েছিল ছুটকুর আপত্তিতে। বেচারি নিশ্চয় অনেক ঘোরাঘুরি করে ওই রকম একটা শাড়িও পেয়েছিল, যে শাড়িটা বৈধব্যকেও মানায়, আবার মানুষটাকেও। বাঃ, এখন তোমাকে মানুষ মনে হচ্ছে।

সুপ্রভাতের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা উঁকি দিচ্ছে। সত্যি, ওর জন্যে জয়া কিই বা করেছে। যখন বেকার ছিল, মাঝে মাঝে দশটা বিশটা টাকা দিয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। তাও সুকল্যাণের ব্যাগ থেকে সরিয়ে, সুকল্যাণকে না জানিয়ে।

তার বদলে এই শাড়ি। এটা সামান্য একটা শাড়ি নয়, একটা বিরাট মুক্তি। সাদা থান কাপড়ের বন্দিত্ব থেকে। তাই পিঙ্কুকে নিয়ে যখন স্কুলে যাবার জন্যে বেরিয়েছে, কত সাবধানে, প্রায় লুকিয়ে, পিসি না দেখে ফেলেন। পিসিই বলে, আসলে পিসশাশুড়ি।

পিঙ্কুকে নিয়ে যখন ফিরেছে তখনো প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি ঢুকেছে। নিজের ঘরে ঢুকেই হাঁপাচ্ছে তখনো, এটা বদলে ফেলেছে। বদলে ফেলে আবার সেই সাদা থানের বৈধব্য।

নিজের কাছেই কিন্তু জয়ার লজ্জা করছিল। কেমন অপরাধী অপরাধী। ও কি সুকল্যাণের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছে। তার মৃত আত্মার সঙ্গে।

আলমারিতে থাকে থাকে সাজানো দামি আর রঙিন শাড়িগুলোর সঙ্গে কতদিনের কামনাবাসনা জড়িয়ে আছে, কত ছোট ছোট লোভ। আজ আর এসবের কোনও দাম নেই।

জয়া মনে মনে ভাবল, থাক, আবার যখন ফিরে আসব দিয়ে দেব। ছুটকুকে। দেয়া যাবে তো? শাশুড়ি না বলে বসে, দিও না দিও না, ওর তো বিয়ে দেব একদিন, এখন থেকে ও একজন বিধবার শাড়ি পরতে যাবে কেন।

হঠাৎ চোখ পড়ে গেল ড্রেসিং টেবলের ওপর।

সাজতে খুব ভাল লাগত জয়ার। সখ ছিল, একটু শৌখিনও। তাই একে একে ওই টেবিলে এসে জড়ো হয়েছে সেগুলো। স্নো, পাউডার, ক্রীম। নেল পালিশের শিশিটা তুলে দেখল, নামিয়ে রাখল। একটা দামি সেণ্টের শিশি।

এক ঝটকায় সেই সাদা-কালো শাড়িটা টেনে নিয়ে স্যুটকেশে রাখল জয়া। এতক্ষণ যেন মনঃস্থির করতে পারছিল না। বাবা পরতে দেবে তো? একবার ভাবল। ওদেরও পাড়াপড়শিকে ভয়, আত্মীয়স্বজনকে, কে জানে, নিজেরাও ওই পিসশাশুড়ির মতোই কি না। বিয়ের আগে তো বাবা আর মা পদে পদে বাধা দিয়েছে, কোথাও কখনো এতটুকু ডানা মেলতে পায়নি। কি গোঁড়া কি গোঁড়া! ভেবেছিল বিয়ের পরই মুক্তি পাবে। ভাবলেও হাসি পায়।

ছুটকু বারান্দাতেই ছিল, জগদীশ ওকে কি যেন বলছেন। পিঙ্কুর সঙ্গে কথা বলছেন।

জয়া ডাকল, ছুটকু, শোনো।

ওর মনে পড়ে গেল বিয়ের বাজার করতে গিয়ে সেই নিউ মার্কেট থেকে কেনা দামি বিলিতি সেণ্টের শিশিটা দু'দিনে ছুটকু শেষ করে দিয়েছিল বলে ও কি রেগে গিয়েছিল। ছুটকুকে ওর অসহ্য লাগতে শুরু করেছিল। একটা তুচ্ছ ব্যাপার, এখন ভাবলেও হাসি পায়। একটি মাত্র ঘটনা, দামি মনে করা জিনিসগুলো সস্তা আর মূল্যহীন হয়ে যায়।

ছুটকু আসতেই জয়া বললে, এগুলো সব নিয়ে নিও। আমার তো আর লাগবে না। এসবই এখন তোমার।

ছুটকু ঘাড় নেড়ে সায়ও দিল না ওর কথায়। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

জয়া এখন যাবার জন্যে প্রস্তুত, বাবা অপেক্ষা করছেন, বারান্দায়।

—মা, আমি আসছি। বাবা...

অমিতা বলল, এসো।

নির্মলেন্দু শুধু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালেন।

জগদীশ চলে গেলেন ট্যাক্সি ডাকতে।

আর হঠাৎ সেই খাম দুটোর কথা মনে পড়ে গেল জয়ার।

সুপ্রভাত বলেছিল, যত্ন করে রেখে দাও।

একটা খামের মধ্যে ডেথ সার্টিফিকেট, অন্যটার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখেওনি। তখন তো ও শোকে আচ্ছন্ন, স্তব্ধতায় বিহ্বল। কোনও আগ্রহও হয়নি।

দ্রুত হাতে আলমারি খুলে ও খাম দুটো বের করল, আর একটার ওপর চোখ পড়তেই ওর সারা শরীর কেঁপে উঠল। আশ্চর্য, খামের ওপর জয়ার নাম ঠিকানা, সুকল্যাণের হাতে লেখা। ও একটু অবাক হল, ওর হাত থরথর করে কাঁপছে। দুর্বোধ্য লাগছে।

একজন মৃত মানুষের চিঠি। মৃত স্বামীর। এই প্রথম দেখছে জয়া।

কে যেন খুলেছিল, হয়তো সুপ্রভাত। কৌতূহল, কিংবা কোনও খবর জানার আগ্রহে।

চিঠিটা কাঁপা কাঁপা হাতে বের করল জয়া। ছোট্ট একটা চিঠি। তিন লাইনের। সঙ্গে এটা কি ? ছাপা রসিদের মতো। বুঝতে পারল না জয়া।

চিঠিটা পড়ল।

'জয়া,

আজ ফিরছি, কাজ আগেই শেষ হয়ে গেল। এখনই প্লেনে উঠব। যদি মরে যাই, ইনসিওরেন্সের টাকাটা দিয়ে গেলাম। রেগে যেও না। মরব না, মরব না।

সুকল্যাণ'

সঙ্গে সঙ্গে জয়ার বুকের ভেতর কেমন করে উঠল। ও এতদিন কাঁদেনি, এত কষ্ট হয়েছে তবু কাঁদেনি। কাঁদতে পারেনি। সেই শোকের মুহূর্তেও কে যেন ফিসফিস করে বলেছিল, কি পাষাণ মেয়ে বাবা, কাঁদছে না। এখন ওর দু' চোখ ছাপিয়ে কান্না এল। দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গের রসিদটা ও দেখলও না। চিঠিটা খামে ভরে ফেলল।

তারপর দ্রুত হাতে খাম দু'খানা স্যুটকেশের সাইড পকেটে রেখে দিল।

—ট্যাক্সি এসে গেছে। ফুটকি। বাবার গলার স্বর।

জয়া চোখ গাল মুছে নিল তাড়াতাড়ি। কান্নাটা তখনো মনের গভীরে গুমরে মরছে।

জয়া সবে স্যুটকেশটা হাতে তুলে নিয়েছে।

ছুটকু এসে ঢুকল। ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরছে। জয়ার মনে হল, ও যেন কি বলতে চায়।

—কিছু বলবে ?

ছুটকু চুপ করে রইল, তারপর দুম করে বললে, বৌদিভাই, তুমি আবার ফিরবে তো ?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জয়া। —কি বলছ ? এটাই তো আমার বাড়ি।

ছুটকুর কিসের যেন দ্বিধা।

হঠাৎ বললে, বৌদিভাই, তুমি একদিন বলেছিলে, মনে আছে। বলেছিলে তোমার যদি কখনো অনেক টাকা হয়, আমার বিয়ের জন্যে যা লাগবে সব দেবে তুমি।

অবাক হয়ে ছুটকুর মুখের দিকে তাকাল জয়া। কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। ভাবতেই পারছে না।

ছুটকুর সামনে একজন সদ্যবিধবা দাঁড়িয়ে আছে। আর যে মারা গেছে সে তো ওরই ভাই। নিজের দাদা। এ সময় ছুটকু ওর বিয়ের কথা ভাবতে পারছে!

আশ্চর্য মানুষের মন। যার দুঃখ যেখানে সে বোধহয় সেই দুঃখটুকুই দেখতে পায়। আর কিছুই তার কাছে সত্য নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়া, কি উত্তর দেবে খুঁজে পেল না।

আর তখনই ছুটকু বললে, ছোটদা বলছিল তুমি নাকি অনেক টাকা পাবে। তখন দেবে তো ?

॥ ৭ ॥

ট্যাক্সিতে জগদীশ জানালার ধারে বসেছিলেন, মাঝখানে পিঙ্কু, আরেক ধারে জয়া। জগদীশ কোনও কথা বলতে পারছিলেন না, জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন, যেন রাস্তাঘাট চলন্ত বাস ট্যাক্সি কিংবা নানারঙের প্রাইভেট কার এর আগে কখনো দেখেননি। কিংবা চলমান মানুষগুলোকে। অথবা এপাশের বাড়ির সারি।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

সামনের দিকে তাকাতেও ভয় জগদীশের। পাছে মেয়ের দিকে চোখ পড়ে যায়, পাছে তার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়।

জয়ার দিকে তাকাতে পারছেন না জগদীশ। মুখে কোনও কথা আসছে না। সবাই চুপচাপ। পিঙ্কুও কি বুঝেছে কে জানে, সেও কোনও কথা বলছে না। যে ছেলেটা অনর্গল কথা বলে বিরক্ত করত সকলকে, সে এখন কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে।

জয়াও তার বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। ওর নিজেকেই কেমন অপরাধী অপরাধী লাগছিল। এই অসহায় বৃদ্ধ মানুষটা ঝড়ে ভেঙে পড়েছে, কি অসহ্য দুঃখকষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছে, সে তো এই জয়ার জন্যেই।

কেন এমন হয়। একজন মানুষের দুঃখকষ্ট কেন শুধু তারই দুঃখকষ্ট হয় না। যা হারিয়েছে তা তো জয়ারই। অথচ তার জন্যে দু'দুটো পরিবার কেন এভাবে ধসে পড়বে। হয়তো মানুষ বলেই।

শ্বশুরবাড়ি থেকে আসার সময় জয়ার সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্যে। শাশুড়ি তো সর্বক্ষণ বিছানায় লুটিয়ে আছে ছেলের শোকে, হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে ওঠে, শ্রাদ্ধের সময়ে যে ছবিটা মালা পরিয়ে রাখা হয়েছিল, এখন দেয়ালে, ছুটকু প্রতিদিন কি মমতার সঙ্গে সেটা মুছে নতুন মালা পরায়। সুপ্রভাত খুঁজে খুঁজে অ্যালবাম থেকে সেই ছবিটা বের করে নিয়েছে, ছেলেবেলার, যেটায় ওরা দু'ভাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। বলেছে এ ছবিটা আমি নিচ্ছি বৌদি।

এই লোকগুলোকে ছেড়ে চলে আসতে জয়ার কি কম কষ্ট হয়েছে। কিন্তু ওকে তো উঠে দাঁড়াতে হবে, নিজের জন্যে না হোক, পিঙ্কুর জন্যে। ওই বাড়িটার বদ্ধ আবহাওয়ায় ও হাঁপিয়ে উঠছিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। শোক তো ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী, কিন্তু সে তো হৃদয়ের মধ্যে। ওর শরীর না মন, কোনটা একটু ফাঁকা হাওয়ার মুক্তি চাইছে ও নিজেই বুঝতে পারছে না।

চারপাশে একটা শোকের আবহাওয়া, সে আরো অসহ্য। তা থেকে পালিয়ে আসার জন্যেই জয়া উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, ছুটকু যখন এসে বললে, বৌদিভাই, তৈরি হয়ে নাও।

কথাটা শুনে ওর মনে হয়েছিল ও যেন মুক্তবাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পেল। মনে হল এবার ও শোকের পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবে।

বাবা কথা বলছে না, বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, জয়া অনুভবেই তা বুঝতে পারছে, তাই মনে মনে বললে, বাবা, আমার শোক নিয়ে শুধু আমাকেই থাকতে দাও, তোমরা কষ্ট পেও না।

আসলে দোষ বোধহয় জয়ারই। এই শোকের আবহাওয়া ও নিজেই ছড়িয়ে দিচ্ছে। যেখানেই যায়, ওর উপস্থিতিই চারপাশের পরিবেশটা বদলে দেয়। কোথাও ও স্বাভাবিক

হয়ে উঠতে পারে না। পারে না বলেই তো ওর চারপাশের লোকগুলো বদলে যায়। এর নাম নাকি সমবেদনা। এর নাম সহানুভূতি। তা থেকে কি পায় জয়া ? কিছুই না।

অথচ ও নিজেও বদলে যেতে পারছে না, চাইছে না। এখন ও তো শুধু একটা কর্তব্য। কর্তব্যের মধ্যে শোক কোথায় ! বরং রাত্রে বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে, এক একদিন তো ঘুম আসতে চায় না, ঘুমন্ত পিঙ্কুর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা পেতে গিয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে, নিঃশব্দে, পাছে কেউ শুনতে পায়, পাছে কারো ঘুম ভেঙে যায়।

সেসব সময়ে সুকল্যাণকে যেন দেখতে পায়, স্পর্শ করতে পারে, তার সঙ্গে কথা বলতে পারে, সেই স্মৃতির সুকল্যাণের সঙ্গে।

অনেক কষ্টে কথা বলতে চাইল জয়া। —বাবা।

জগদীশ মুখ ফেরালেন না। বললেন, বল।

—বাবা, আমাকে একটা মাটির হাঁড়ি এনে দিও, ছোট দেখে। যেমন ও বাড়িতে দেখলে। একটা বালতি-উনোন।

—হুঁ।

ব্যস, আর কথা নয়। যেন গ্রাহ্যই করলেন না ওর কথা।

এই চুপচাপ, এই নিঃশব্দতা জয়ার একটুও ভাল লাগছে না।

পিঙ্কুকে নিয়ে গতকাল ও স্কুলে গিয়েছিল, স্বাভাবিক হবে বলে। কিন্তু অন্য সকলে স্বাভাবিক না হলে ও স্বাভাবিক হবে কি করে ! ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন একটা গুমোট আবহাওয়া নামিয়ে নিয়ে এল। কেউ যেন ওকে চারপাশ থেকে কেবলই শোকের মধ্যে ঘিরে রাখছে।

পৌঁছতে জয়ার হয়তো একটু দেরি হয়েছিল।

দূর থেকেই দেখতে পেল। মীনা ইরা আরো সকলে সামনের বাড়ির রকে বসে আছে সারি দিয়ে। কোথাও জোর তর্ক চলছিল, কেউ বা মেয়ের খাতার ভুলভ্রান্তি আলোচনা করছিল, উচ্ছল আনন্দে হাসাহাসি করছিল কেউ কেউ।

এদের অনেকের মুখ দেখে মনে পড়ে গেল জয়ার। সহানুভূতি জানাতে কিংবা সান্ত্বনা দিতে এরা দল বেঁধে গিয়েছিল। কি করে খবর পেয়েছিল ওরাই জানে।

—তোর ভয় কি, আমরা তো আছি। এদেরই কেউ একজন বলেছিল।

মনে পড়তেই জয়ার হাসি পেল। ওই দুঃসহ শোকের মধ্যে কোনও ভয় পেয়েছিল কি ও। অসহায় বোধ করেছিল ? কই, মনে তো পড়ে না। তখন ও কিছু ভাবতেই পারছে না, সুকল্যাণ নেই, এক একবার বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। অথচ তখন কিনা ওরা ওকে ভরসা দিতে চাইছিল। যেন ভবিষ্যৎ ভেবে ও মুষড়ে পড়েছে, যেন নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছে, কিংবা পিঙ্কুর দায়িত্বের কথা।

দূর থেকেই দেখতে পেল ও মীনা আর ইরাকে, বিল্লুর মাকে। আরো যারা বসে গল্প করছিল, হাসছিল।

জয়াকে দেখতে পেয়েই ওরা উঠে দাঁড়াল, একে একে প্রায় সবাই। ওদের গল্প থেমে গেছে, তর্ক থেমে গেছে, হাসি থেমে গেছে।

ভীষণ অস্বস্তি লাগল জয়ার। ওরা কি ওর শোকের প্রতি সম্মান জানাচ্ছে, নাকি এটাও এক ধরনের হিপোক্রিসি। শোকাহত একজন মানুষকে দেখে নিজেদের মুখেও শোকের এই ছায়া বিছিয়ে দেয়া।

মীনা উঠে এল। —আয়।

জয়ার সঙ্গে সঙ্গে গেল পিঙ্কুকে স্কুলগেট অবধি পৌঁছে দেয়ার জন্যে।

সবারই মুখে কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

ইরা ওর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পাশে বসাল।

তারপর শুধুই বসে থাকা, চুপচাপ বসে থাকা, দু'চারটে চাপা গলার প্রশ্ন, দুচারটে সংক্ষিপ্ত উত্তর।

অসহ্য, অসহ্য, অসহ্য।

অথচ জয়া কথা বলতে চাইছিল, হাসতে চাইছিল।

ট্যাক্সিতে বসে বাবার সঙ্গে যেতে যেতে জয়ার সেই দৃশ্যটাই মনে পড়ছিল।

বাবাও কথা বলছে না, বাবাও হাসছে না।

ওর মনের ভেতর থেকে জয়া যেন বলে উঠতে চাইল, বাবা কথা বলো, বাবা তুমি হেসে ওঠো, বাবা তুমি আমাকে আমার শোক ভুলতে দাও।

কিন্তু এসবের কিছুই ও বলল না। বরং বলে উঠল অন্য কথা।

বললে, বাবা আমাকে একটা মাটির হাঁড়ি এনে দিও, ছোট দেখে।

জগদীশ মুখ না ফিরিয়েই বললেন, হুঁ।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ বললেন, ফুটকি, তোর সামনে তো গোটা জীবনটাই পড়ে আছে। তুই কি এভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাস নাকি ?

জয়া ধীরে ধীরে বললে, আমার তো একটা কর্তব্য আছে।

জগদীশ বললেন, কর্তব্য আমারও, সেজন্যে তোকে নিয়ে এলাম। কে কি বলবে না বলবে তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি ওসব মানি না, মানি না। তোর এই মাটির হাঁড়িতে...আমি তোকে এই থান কাপড়ে থাকতে দেব না।

মুখ না ফিরিয়েই জগদীশ বলছিলেন।

জয়াও বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু বাবার কথাগুলো শুনে ও চমকে চোখ ফেরাল, বিস্মিত ভাবে বাবার মুখের দিকে তাকাল।

আশ্চর্য, বাবাকে ও ছোটবেলা থেকেই একজন গোঁড়া প্রাচীনপন্থী হিসেবেই জেনে এসেছে। মাকেও। ওর সেজন্যেই ভয় ছিল সুপ্রভাতের কিনে দেয়া ওই কালো অ্যাপ্লিকের টুকরো জোড়া সাদা শাড়িটা পরতে দেখলে বাবা-মা আপত্তি করবে কি না। হয়তো বলে বসবে, এ কি পরেছিস ফুটকি, তোর কি একটু লাজলজ্জাও নেই। এই ক'টা দিন আগে তুই বিধবা হয়েছিস, এর মধ্যেই তুই এই ফ্যাশনওলা শাড়িটা পরতে পারলি।

ভেবেছিল বাবা হয়তো রেগে গিয়ে বলবে, তোর জন্যে আমি পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না।

তার বদলে বাবা বলছে, তোর এই মাটির হাঁড়িতে...তোকে আমি থান কাপড়ে থাকতে দেব না।

জয়ার গলার স্বরে রুক্ষ ভর্ৎসনা ফুটে উঠল।—বাবা!

পরক্ষণেই লজ্জা পেল জয়া, বাবাকে এভাবে ধমক দিয়েছে বলে।

তাই শান্ত গলায় বললে, আমাকে ওসব বোলো না বাবা, আমি পারব না, পারব না। গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল ওর, যেন এখনই চোখেও জল এসে যাবে।

জগদীশের বুকের ভেতরটা কি মোচড় দিয়ে উঠল!

সেই প্রথম যেদিন খবরটা শুনেছিলেন সেদিন শুধু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বাসই হয়নি। একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন খবরটা শুনে। কে খবর দিতে এসেছিল ? হয়তো পাড়াপড়শি কেউ। কিংবা সুকল্যাণের অফিসের কেউ হতে পারে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এসেছিল। নির্মলেন্দুর বাড়িরই কেউ হয়তো ঠিকানা দিয়েছিল।

মেয়ের মুখখানা ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। এই তো দুটো দিন আগে কত

আনন্দ ফূর্তিতে কাটিয়ে গেল। যাবার সময়ের চেহারাটা মনে আছে। কি সুন্দর লাগছিল, একটা ঝলমলে সিল্কের শাড়ি পরেছে, হাতে-গলায় ওঁরই দেয়া হাল্কা সেটিংয়ের অলঙ্কার, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, কপালে বড় একটা সিঁদুরের টিপ। একটা উজ্জ্বল সুখী মুখ। জয়ার দোহারা লম্বা শরীর, সুকল্যাণের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছিল, কোনওদিন কি ভেবেছিলেন ওই মুখে কোনও শোকের ছায়া নামতে পারে।

মুকুল ডুকরে কেঁদে উঠেছে খবর শুনেই। সুশান্ত থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জগদীশের চোখে ভেসে উঠছে সেদিনের দৃশ্যটা। জয়া চলে যাবে, তাই মুকুল আলতার শিশি এনে জয়ার পায়ে আলতা পরিয়ে দিচ্ছে। আঙুলের ডগায় সিঁদুর নিয়ে নোয়ায় ঠেকিয়ে সিঁথিতে দিয়ে দিল, যেন দেখতে পাচ্ছেন জগদীশ।

আর তার পরই এই দুঃসংবাদ।

ওঁরা সকলেই ছুটে গিয়েছিলেন। সে কি উদ্বেগ, হতাশা, অথচ মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা, হয়তো ভুল খবর, পাড়াপড়শি কেউ নিছক রসিকতা করেনি তো। পরক্ষণেই মনে হয়েছে এমন রসিকতা মানুষ করতে পারে না।

তার পর থেকে মাঝে মাঝেই অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন জগদীশ। মাঝে মাঝেই বলেছেন, আমার জন্যেই জয়ার এই সর্বনাশ। মুখ ফসকে কেন যে সেদিন বলে বসলাম, একটা দুঃসংবাদ আছে।

সুশান্ত শেষ অবধি ধমক দিয়েছে, কেন তুমি বারবার ওই একই কথা বলছ। তোমার ওই কথাটা বলার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে নাকি ? থাকতে পারে ?

মুকুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠেছে, কি ভাগ্য নিয়ে এসেছিলি রে, পিঙ্কু ! বলেই ডুকরে কেঁদে উঠেছে।

আজও তেমনি কেঁদে উঠল জয়াকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখেই। পিঙ্কুকে জয়াকে কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরল।

পাড়ার দু'চারজন এসে জড়ো হয়েছে, ওরা তো আগেই জেনে গেছে সব কথা। জগদীশের কাছে শুনেছে সকলে।

পাশের বাড়ির মেয়েরাও এসেছে। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। একজন কেউ এগিয়ে এল মুকুলকে সান্ত্বনা দিতে, কিংবা জয়াকে।

জগদীশ বাড়িতে থাকতে পারলেন না, বেরিয়ে গেলেন। এখন একটু ফাঁকা হাওয়া চাই, ফাঁকা হাওয়ায় একটু নিঃশ্বাস নিতে হবে।

—বাবা, আমাকে একটা মাটির হাঁড়ি এনে দিও, ছোট দেখে। একটা বালতি উনোন।

পরের দিন বাজারে বেরোচ্ছেন, আবার বলল জয়া।

জগদীশ বুঝতে পারলেন, বোঝাতে পারবেন না জয়াকে।

মুকুল ফিসফিস করে বললে, এখন ছেড়ে দাও, কটা দিন যাক। বলছে যখন এনেই দাও।

কিন্তু জগদীশ জানেন, অভ্যাসের মতো শত্রু আর নেই। একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেটাই হয়ে যায় জীবন। তখন কি আর বদলানো যাবে। কিন্তু এই বয়েসের একটা মেয়েকে, তাঁর নিজের মেয়ে, কি করে তাকে সেই জীবনের দিকে ঠেলে দেবেন।

ওই সব কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষগুলোকে উনি মনে মনে ঘৃণা করে এসেছেন। অনেকেই হয়তো ওঁকে গোঁড়া প্রাচীনপন্থী ভেবে এসেছে, তাঁর ছেলেমেয়েরাও। ওরা বোঝে না, আসলে উনি একটু বেশি সাবধানী, বেড়া দিয়ে দিয়ে ছেলেমেয়েদের শুধু বাঁচাতে চেয়েছেন। হয়তো ভুল, কে জানে। কিন্তু পৃথিবীটাকে বড় বেশি চেনেন বলেই এত ভয়।

এখন আর ওঁর কোনও ভয় নেই। পাড়াপড়শির তোয়াক্কা করেন না, আত্মীয়স্বজনকেও নয়। যে যা বলে বলুক। এই বয়সেও একটা মেয়েকে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যেতে দেবেন না।

অথচ জয়াই রাজি নয়। সে নিঃস্ব হয়ে থাকতেই চাইছে।

কি করবেন জগদীশ, কিছুই তো করার নেই।

মুকুল তো এতকাল পুজোআর্চা নিয়েই কাটিয়ে এসেছে। কুসংস্কার বলে কিছুই উড়িয়ে দিতে পারেন না, 'একটা দুঃসংবাদ আছে' একথাটা শুনেই চটে গিয়েছিল, সুশান্তর একবার অসুখ হ'ল, বায়না ধরেছিল তারকেশ্বর যাবার।

সেই মুকুলও বলে বসল, মাটির হাঁড়ি মাটির হাঁড়ি করছিস কেন, আজকাল কি আর ওসব আছে নাকি। কেউ আর মানে না। নিরিমিষ খেতে হয় খা, কিন্তু...

—না না। আমি পারব না।

একটু থেমে বললে, ওখানে গিয়ে তো করতেই হবে। তাছাড়া, ওই আমিষের ছোঁয়া, তোমাদের ওই রান্নাঘরে...

মুকুল কিছু বলতে পারল না। তবু ওর মুখে একটা বিদ্রূপ ঝলকে উঠল, তোর শাশুড়ি তো খুব মডার্ন!

মুকুল আর জোর করল না। মেয়েটা এসব ক'রে যদি শান্তি পায়, পাক না।

জগদীশকে বলল, কটা দিন যাক।

সেজন্যেই জগদীশ একটা হাঁড়ি কিনে আনতে বাধ্য হলেন। একটা বালতি-উনোন।

এক হাতে উনোনটা ঝুলিয়ে আনছেন, অন্য হাতে একটা মাটির হাঁড়ি। খুব সাবধানে আনতে হচ্ছে। ঠোকা লেগে না ভেঙে যায়।

জয়া ছুটতে ছুটতে এল।—এ কি আনলে, তোমাকে যে বারবার বলে দিলাম, ছোট দেখে, খুব ছোট।

একটু থেমে বললে, কতটুকুই বা খাই। এখন তো ক্ষিদেও চলে গেছে।

নিঃশব্দে উঠে এলেন জগদীশ। কোনও উত্তর দিলেন না।

মুকুল আর সুশান্ত দাঁড়িয়ে দেখছে।

জয়া বললে, বদলে নিয়ে এসো, বদলে নিয়ে এসো।

জগদীশ মুকুলের দিকে তাকালেন, সুশান্তর মুখের দিকে।

তারপর মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বললেন, ইচ্ছে করেই আনলাম, ফুটকি। তোর সঙ্গে আমারও চারটি ফুটিয়ে দিবি। বাপ-বেটিতে না-হয় আমরা একই খেলাম। মাছ আমারও ভালও লাগে না আজকাল।

জয়া অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখে জল এসে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটাই সুশান্তর কাছে খারাপ লাগল। ছোট্ট একটা কুসংস্কার নিয়ে এরা যেন বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে।

তাই ঠাট্টার ছলে বললে, মা, তা হলে তুমিও ওদের সঙ্গে...

মুকুল ধমক দিয়ে উঠল।—ইয়ার্কি করিস না। সধবার কাছে মাছ কি জানিস? স্বামীর আয়ু।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর মুকুল বললে, আমিই তোর চাল কটা ফুটিয়ে দেব ফুটকি, তোকে কিছু করতে হবে না।

জয়া শুধু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল।—না না, মা, তা হয় না। যেন নিজেকেই শাস্তি দিয়ে চায়।

জগদীশ আবার বললেন, আমি কিন্তু তোর সঙ্গেই খাব। তুই যা খাবি তাই।

এমন কঠোর স্বরে বললেন যেন তা আর নড়চড় হবার নয়।

জয়ার জীবন এখন বাঁধা ছক।

ছক বদলে গেছে শুধু জগদীশের। উনিও এখন দেরি করে অফিসে যান। কাজ, দায়িত্ব, অফিস ওঁর জীবন থেকে মুছে গেছে।

ওঁর পাংচুয়ালিটি নিয়ে এখন আর কেউ ঠাট্টা করে না। পাংচুয়ালিটি ভুলে কেন দেরি করে আসেন সে প্রশ্নও কেউ করে না। বরং সকলেরই যেন ওঁর জন্যে একটু সহানুভূতি আছে। কিন্তু কেন দেরি করে আসেন কেউই জানে না, ভাবে মানুষটা ভেঙে পড়েছে বলেই অফিসের ওপর আর কোনও টান নেই। হয়তো সবই মায়া, সবই মিথ্যে মনে হচ্ছে, তাই।

আসলে কারণ অন্য।

জয়া ভেবেছিল বাবাকে তার একগুঁয়েমি থেকে বিরত করাতে পারবে। বুঝিয়েসুঝিয়ে না হোক, ব্যাপারটাকে অসম্ভব করে তুলে।

বাবার তো কাঁটায় কাঁটায় অফিসে পৌঁছনো চাই। কিন্তু জয়ার পক্ষে আতপ চাল ক'টা ফুটিয়ে দেওয়া তো সম্ভব নয় ওই সময়ে।

পিঙ্কুকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিতে হয়। এখান থেকে আরো একটু দূর, আরো একটু বেশি সময় লাগে। স্কুল তো দেড় ঘণ্টা কি দু' ঘণ্টার, তাই বসে থাকতে হয়। ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে। কে জি, মানে নিতান্তই ছেলেভোলানো স্কুল। শুধু স্কুলে যাওয়া অভ্যাস করানোর জন্যেই।

তারপর ফিরে এসে স্নান এবং রান্না। যদি এটাকে রান্না বলা হয়।

—আমার অফিস নিয়ে তুই ভাবিস না, তুই যখন খাবি তোর সঙ্গেই খেয়ে নেব, তারপর অফিস। জগদীশ বললেন।

একটু থেমে বললেন, সারাজীবন তো অফিস-অফিসই করে গেলাম। কি দিল আমাকে ভগবান।

জয়া কোনও কথা বলল না। বলতে পারল না। নিজের দুঃখকষ্টের চেয়ে বাবার দুঃখকষ্টই যেন ওর কাছে অসহ্য লাগছে। তার ওপর আবার এই একটা অর্থহীন প্রতিজ্ঞা। 'তুই যা খাবি, আমিও তাই খাব।'

পিঙ্কুকে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরে দেখল বাবা তখনো অফিস যায়নি। মা বললে, কিছুই খায়নি তোর বাবা।

ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে জয়া, বাবা কিছু একটা প্রতিজ্ঞা করে বসলে কিছুতেই নড়ানো যায় না। তাই নিজেকে বড় অসহায় লাগল। মানুষটা কেন যে এ ভাবে নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে!

এই দলা-পাকানো ভাত, ডাল সেদ্ধ আলু সেদ্ধ—ক'দিন খেতে পারবে বাবা। সে কথা জয়ার চেয়ে কে ভাল জানে? প্রথম দিন কয়েক তেমন মনে হয়নি। তখন অশৌচ চলছে, বুকের মধ্যে দুঃসহ শোক, জিভে কোনও স্বাদ নেই। খেতে হয়, খেয়েছে। কিন্তু এখন আর খেতেও ইচ্ছে করে না। খাওয়ার কথা ভাবলেই বিস্বাদ লাগে সব কিছু, গা গুলিয়ে উঠে। ক্ষিদে নেই বলে উঠে পড়ে। কর্তব্য করতে হবে এ যুক্তিটাও জিভ মানতে চায় না।

তবু উপায় নেই বুঝতে পেরেই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে হাঁড়িটা উনোনে দিল জয়া। স্নানে যাওয়ার আগেই উনোন ধরিয়ে নিয়েছিল।

মুকুলের এই বাড়াবাড়ি কিছুতেই ভাল লাগছিল না।

মুকুলই উনোন ধরিয়ে দিতে গিয়েছিল, জয়া জোর করে সরিয়ে দিয়েছে।

—তুমি সরো তো, ও সবই পারব। জীবন তো আমাকেই চালাতে হবে, তোমরা কি সারাজীবন চালিয়ে দেবে ?

বাধ্য হয়ে মুকুল বলেছিল, আমাদের আমিষ হেঁসেলে না ঢুকতে চাস, কাল একটা জনতা স্টোভ আনিয়ে দেব।

ওর চোখে জল, ধোঁয়া লেগে না কান্নার, জয়া বুঝতে পারেনি।

এ ভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

কর্তব্য চাপিয়ে দেবার নিয়মগুলো যারা করেছিল তারা মানুষকে মানুষ ভাবেনি কেন।

জয়া নিজের কষ্ট ভুলে গিয়েছিল। ওর কষ্ট শুধু বাবার জন্যে। মানুষটা মাছ এত ভালবাসত, না খেয়ে আছে কি করে। ভাজাভুজি আর দু'তিনরকম তরকারি না করলে মাকে বলে বসত, কিছুই তো করোনি, খাব কি দিয়ে।

মা হাসত। পরের দিন থালা ভরে যেত পঞ্চব্যঞ্জনে।

এ বাড়িতে কখনো রান্নার লোক ছিল না। মা নিজেই রান্না করত, রান্না করতে ভালবাসত।

রান্না ছাড়া মা'র জীবনে আর ছিল কি ? রান্না আর পুজোআর্চা। এই নিয়েই জীবনটাকে সুখী মনে করত। স্বামী বেঁচে থাকা মানেই মা'র কাছে একমাত্র সুখ।

সেজন্যেই সুশান্তর ঠাট্টা শুনে রেগে গিয়েছিল মা। মাছ ছেড়ে দেয়ার কথায়। মা'র কাছে মাছ মানে স্বামীর আয়ু। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। একাদশীর দিন কিছু না পায় তো পুঁটি মাছই সই। মাছ তো !

খাবার সময় সেজন্যেই জয়া আড়চোখে বাবার খাওয়া দেখত।

মানুষটা ভাতগুলো নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করছে, খেতে পারছে না। তবু স্বীকার করবে না খাওয়া যায় না। যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসেছে, ভাঙা যাবে না।

জয়া তো জানে ও নিজেও এ ভাবেই খায়। খেতে ইচ্ছে হয় না তবু।

কিন্তু কষ্টটা বাবার জন্যেই বেশি। এক একদিন চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে, রেগে যেতে ইচ্ছে হয়, কিংবা ভেতরে ভেতরে রেগেও যায়, কিন্তু কি বলতে ইচ্ছে করে নিজেই জানে না।

এরই ফাঁকে এক একদিন একটা কথা বলতে ইচ্ছে করে। একটু সঙ্কোচ হয়। বাবা না তার বিধবা মেয়েকে লোভী মনে করে। না, তা নয়। আসলে ওই কথাটা তুলতে গেলেই জয়া নিজেই নিজেকে লোভী ভেবে বসবে। টাকার লোভ।

পিঙ্কুর জন্যেও তো ওর দায়িত্ব আছে। পিঙ্কুই তো এখন একমাত্র দায়িত্ব।

—বাবা, দ্যাখো তো এই কাগজটা। আমার দেওর যত্ন করে রাখতে বলেছিল।

জগদীশ হাত বাড়িয়ে নিলেন, প্রথমবার পড়ে বোধহয় ভাল বুঝতে পারলেন না। আরেকবার পড়ে বেশ উল্লাসের সঙ্গে বললেন, এ তো ইনসিওরেন্স। ক্লেম পাঠাতে হবে, অ্যাদ্দিন বলিসনি ?

নিয়ে রেখে দিলেন। —ঠিক আছে, যা করার আমি করে দেব। চিঠিটায় তুই একটা সই করে দিবি।

জয়া ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর বললে, ডেথ সার্টিফিকেটও আছে আমার কাছেই।

জগদীশ একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুই শ্বশুরবাড়িতে কিছু সই করে দিয়ে আসিসনি তো ?

—না। কেউ বলেওনি।

জগদীশ যেন নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, জানি, ওরা সে রকম মানুষই নয়।

নির্মলেন্দু যেভাবে হাত বাড়িয়ে হাতের তালু উল্টে 'যাক যাক' বলেছিলেন, জগদীশের কিন্তু সেটা ভাল লাগেনি। ভাল লাগেনি জয়াকে বারান্দার একপ্রান্তে মেঝেতে বসে খেতে দেখে, পাশাপাশি খাওয়ার টেবিলে তখনো আমিষ থালাবাসন পড়ে আছে।

মেয়েটার চোখের সামনে কি ওসব না খেলেই নয়। আর ওই থান কাপড়ে মোড়া নিজের মেয়েকে দেখেও বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠেছিল।

প্রথমে ভেবেছিলেন মেয়েরই জেদ। ওদের দোষ নেই।

কিন্তু পরের দিন পিঙ্কুকে যখন স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে তখন জয়াকে দেখে বুকের ভেতরটা শান্তি পেয়েছিল।

সেই সাদা শাড়িটা পরেছিল জয়া। আঁচলে এক টুকরো সাদাসিধে অ্যাপ্লিকের কাজ। কালো রঙ।

ভালই লাগল। একটু একটু করে যদি ভাঙে, একটু একটু করে যদি বদলায়।

আর তখনই চোখ পড়েছিল জয়ার কানের দিকে।

দু'কানে দুটো কালো! চৌকো পাথরের ট্যাপ।

জগদীশের মনের মধ্যে একটা আনন্দ গুনগুন করে উঠেছিল। এবার বোধহয় শোক ভুলে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।

টাকার টানাটানি চলছিল, টাকার টানাটানি আর কবে ছিল না। তবু কিছু টাকা বের করে জয়ার হাতে দিয়েছিলেন।

—বাড়িতে ওই থান কাপড় পরা তোর চলবে না। নে নিজের পছন্দমতো কিনে নিবি।

এক মুহূর্ত বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বাবার হাত থেকে টাকাগুলো নিয়েছিল।

দু'খানা শাড়িও কিনে নিয়েছে।

সাদা শাড়ি। সরু ফিতে মতো খুব হাল্কা রঙের পাড় আছে। একটায় সামান্য সাদা সাদা বুটি। পরলে বিধবাই মনে হবে। যদি না কেউ ভেবে বসে কোনও কুমারী মেয়ে ফ্যাশন করে পরেছে। আজকাল তো সে রকমও পরে।

কিন্তু ওই সরু কালো পাড় ধুতির মতো শাড়ি পরা জয়ার কাছে দু'চোখের বিষ। ও পারবে না।

ওর তো একটা নিজস্ব রুচি আছে। এই রুচির নামই 'আমি' হওয়া।

বাবাকে কোনওদিনই বুঝতে পারেনি জয়া। আজ একটু একটু করে বুঝতে পারছে।

বিয়ের আগে বাবাকে অন্যরকম মনে হত। বাবারা কেন যে এ রকম হয়। জয়ার কি কোনও জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না। কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় তা কি ও বুঝত না।

তবু সবসময় শাসনে রাখত। মা-বাবা দু'জনেই। এমন কি ভাইয়াও।

—তোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল রাস্তায় ওরা কারা ?

জয়াকে ভয়ে ভয়ে বলতে হয়েছে, ওরা তো সুস্মি আর ইলা, একসঙ্গে পড়ে।

পরের প্রশ্ন, ইয়ার্কি করিস না, ছেলেটা কে ?

ছেলেটা আসলে সুস্মির বন্ধু। বয়ফ্রেন্ডও বলা চলে।

মা'র কাছে এসে ও কেঁদে পড়েছে, কি করব বল, আমরা আসছি, সুস্মি ওকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল, আলাপ করিয়ে দিল !

মা শুনে বললে, তুই তো চলে এলেই পারতিস। মিশিস না ওই সব বন্ধুর সঙ্গে।

ব্যস্।

সারাজীবনই শুধু কর্তব্য করে গেছে জয়া। কখনো 'আমি' হয়ে উঠতে পারেনি। ওরে

ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও দাম নেই যেন।

ও শুধু বাবা-মা'র মেয়ে হয়ে থেকেছে ঘেরাটোপের মধ্যে, ভাইয়ার বোন হয়ে কর্তব্য করে গেছে, ওর বন্ধুরা কেউ না জয়াকে ঠাট্টা করতে পায়, বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে ঘরের বউ হয়ে থেকেছে, সুকল্যাণের কাছে শুধুই স্ত্রী। এখন বিধবার কর্তব্য করে যাওয়া। এরপরও একটা পরিচয়কে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, পিঙ্কুর মা। বিধবা মা।

সমাজে তাদের কত গুণগান।

শুধু একটা পরিচয়ই কখনো পাবে না। আমি শুধু 'আমি'।

দুপুরটা জয়ার নিঃসঙ্গ লাগে। পিঙ্কু ঘুমিয়ে পড়ে, মাও ঘুমোয় কিংবা চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকে, ভাইয়ার তো ব্যবসা, ক্যাসেটের দোকানে খদ্দেরের আশায় বসে থাকা, বাবা অফিসে। জয়া কি করবে খুঁজে পায় না।

নিজের মনেই হাসল জয়া। নিঃসঙ্গ তো ও সব সময়েই।

মার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে দেখেছে দুচার কথার পরই গল্প থেমে যায়। অতীতের কোনও প্রসঙ্গ টেনে কোনও গল্প শুরু করেই একটা কিছু এসে যায়, যা মাকে মনে পড়িয়ে দেয় জয়ার বৈধব্যের কথা।

মা আফশোস করে বলে, কে জানত এমন হবে।

শুনে শুনে জয়ার মনে হয় ও পাগল হয়ে যাবে। ও ভুলে থাকতে চায়, কিন্তু কেউ ভুলে থাকতে দেবে না।

একদিন সন্ধেবেলা, বোধহয় ছুটির দিন, কিংবা সুশান্তর দোকান বন্ধের দিন, জয়া শুনতে পেল পাশের ঘরে মা আর ভাইয়া কি গল্প করছে।

ও যাবে কি যাবে না ভাবছিল। ওরও ইচ্ছে করছিল গিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করতে।

ভাইয়া বোধহয় কোনও হাসির কথা বলেছে।

মা শব্দ করে হেসে উঠল, হাসি থামাতে পারছে না।

যে কোনও হাসির গল্প শুনলেই সেটা বাড়িতে এসে বলা চাই ভাইয়ার। ছেলেবেলা থেকেই ভাইয়ার এই রোগটা দেখে আসছে। তখন খুব মজা হত, আনন্দ পেত। জয়া শুনে গিয়ে আবার বন্ধুদের বলত, তারাও খুব হাসত।

এখন আর ভাইয়া সেসব গল্প জয়ার সামনে বলে না।

মা শব্দ করে হেসে উঠতেই জয়া দ্রুত পায়ে ও ঘরে গিয়ে পৌঁছল। নিশ্চয়ই ভাইয়া কোনও হাসির কথা বলেছে।

জয়ার শুনতে ইচ্ছে হল। একটা কৌতূহল।

—কি হয়েছে রে ভাইয়া ? হাসছিস কেন ?

না, এই কথাগুলো ও মুখ ফুটে বলেনি। মনের মধ্যেই ছিল।

কিন্তু দরজার কাছে জয়াকে দেখেই মার মুখ থেকে হাসি দপ্ করে নিভে গেল। সুশান্ত উচ্ছলভাবে কি বলতে বলতে মাঝপথেই থেমে গেল।

ওরা দুজনেই চুপচাপ। কেউ কোনও কথা বলছে না।

মা কেমন ঠাণ্ডা গলায় বললে, বোস।

বিছানার এক প্রান্তে বসল জয়া। অপেক্ষা করল। ওরা নিশ্চয় আবার কথা শুরু করবে।

কিন্তু কেউই কিছু বলছে না দেখে জয়া প্রশ্ন করল, কি বলছিলি রে ভাইয়া ?

—কিছু না।

—তোরা তো হাসছিলি।

সুশান্ত এড়িয়ে যেতে চাইল। বললে, এমনি।

মার মুখ দেখে মনে হল শব্দ করে হেসে উঠে যেন কোনও অপরাধ করে ফেলেছে।

জয়া হঠাৎ ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠল। দু'চোখে জল এসে গেল ওর। উঠে দাঁড়িয়ে চলে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল একবার।

বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, কেন, কেন তোরা আমাকে দেখলেই চুপ করে যাস, কেন কথা বলিস না, হাসিস না।

কাঁদো কাঁদো গলায় জয়া বললে, আমি কি শুধুই একটা বিধবা, শুধুই দুঃখ।

একটু থেমে বললে, মা, আমিও তো একটা মানুষ।

মুকুল অবাক হয়ে গিয়েছিল, সুশান্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল।

মুকুল উঠে জয়াকে হাত ধরে পাশে বসাল। পিঠে হাত বোলাল।

বলল, তোর ভাল লাগবে না মনে করেই তো তোকে ডাকিনি।

কি আশ্চর্য। জয়ার কি ভাল লাগবে আর কি ভাল লাগবে না, তা যেন এরা জেনে গেছে।

সারা জীবন ধরে সকলেই এই একটা কথাই জেনে এসেছে। বাবা মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, এমন কি সুকল্যাণও। যেন জয়ার কি ভাল লাগবে ওরাই জানে।

জগদীশ অবশ্য মাঝে মধ্যে কথাবার্তা বলেন, কিন্তু সে সবই কাজের কথা। জয়া বেশ বুঝতে পারে জয়ার জন্যেই উনি এখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

উনি জানেন শুধু শোক নিয়ে বসে থাকলে চলে না। বেঁচে থাকার নিজস্ব একটা দাবি আছে।

ইনসিওরেন্সের ক্লেম ফর্ম আসতেই দেরি না করে জয়াকে দিয়ে সই করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আরো যা যা করার।

ইতিমধ্যেই অফিসের এক ভদ্রলোক একদিন এসে হাজির। জয়ার সঙ্গে দেখা করতে চান।

জয়া দেখে চিনতে পারল। সুকল্যাণের সঙ্গে দু'একবার অফিস থেকে সটান চলে এসেছে, গল্পগুজব করেছে, চা খেয়ে চলে গেছে, কথাবার্তা যেটুকু না বললে নয় বলেছে জয়া।

মনে পড়ল শ্রাদ্ধের দিনেও দুতিনজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ইনিও ছিলেন। তখন জয়া একদিকে ব্যস্ত, তখন তো ও যন্ত্রের মতো অপরের নির্দেশ মেনে চলেছে শুধু, অন্যদিকে শোকে বিহ্বল।

এখন নামটা মনে পড়ল। দেবজ্যোতি। একটু জোরে কথা বলে, চরিত্রে একটু হৈহৈ ভাব আছে।

জগদীশও বসে ছিলেন। এটা ওঁর চারিত্রিক সংস্কার। মেয়ের সঙ্গে বিশেষ করে সদ্যবিধবা মেয়ের সঙ্গে স্বামীর অফিসের বন্ধু দেখা করতে এসেছে। সেক্ষেত্রে জয়াকে ডেকে নিজের পক্ষে চলে যাওয়ার মতো উদার আধুনিকতা তাঁর কখনোই ছিল না। তার মানে নয় যে জয়াকে বিশ্বাস করেন না, বা লোকটিকে বিশ্বাস করছেন না। এখন জয়ার যা মনের অবস্থা, ওসব প্রশ্নই ওঠে না। আসলে ওঁর নিজেরও বসে থাকাটাকেই ভদ্রতা বলে মনে করেন।

জয়া আসতেই দেবজ্যোতি উঠে দাঁড়াল। মুখে যে হাসিটা জগদীশ দেখেছিলেন, সৌজন্যের হাসি, সেটা মুছে গেল।

—আমি আপনার শ্বশুরবাড়িতেই গিয়েছিলাম। ওঁরাই ঠিকানা দিলেন।

চোখ তুলে তাকিয়ে চোখ নামাল জয়া।

দেবজ্যোতি বললে, একবার আপনাকে আমাদের অফিসে যেতে হবে।

—কেন ? আমাকে কেন ?

—খোদ জি এম নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

জয়াকে কেমন বিভ্রান্ত দেখাল।

জগদীশও বলে বসলেন, ও বেচারিকে আবার কেন ?

দেবজ্যোতি বললে, পি এফের টাকাকড়ি সে বাড়িতে বসে সই করে দিলেও চলবে। কিন্তু সুকল্যাণের তো বেশি দিনের চাকরি নয়, কতই বা হবে। আইনত বিশেষ কিছু প্রাপ্য হবে না।

একটু ভেঙে বললে, কিন্তু ও তো অফিসের কাজেই গিয়েছিল, অন ডিউটি। একটা মোটা টাকার কমপেনসেশন প্রাপ্য। তাছাড়া...

এতক্ষণে জগদীশ একটু উৎসাহ বোধ করলেন। বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমিই না হয় নিয়ে যাব।

দেবজ্যোতি বললে, আমাদের দুটো ইন্টারেস্ট, প্রথমত চাপ দিয়ে ম্যাক্সিমাম ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেওয়া। এটা তো একটা প্রিসিডেন্ট হয়ে থাকবে। হুটহাট করে পাঠিয়ে দেয়, কি সিকিউরিটি আছে বলুন আমাদের।

একটু পরে বললে, তাছাড়া আমরা দেখতে চাই, ওঁর টাকাটা যেন ওঁরই থাকে। কেউ ঠকিয়ে না নিয়ে যেতে পারে। আজকালকার বাজারে কাউকে বিশ্বাস নেই।

কথাটা জগদীশকে যেন একটু ধাক্কা দিল।

লোকটা কি ওঁকে উদ্দেশ করেই বলছে নাকি ? কথাগুলো বিস্বাদ লাগল জগদীশের। মনে মনে ভাবলেন, এ ছোকরা, বয়েস তো কম, ও কি করে বুঝবে একটা বিধবা মেয়ের বাবার বুকে কি যন্ত্রণা। কি দুর্ভাবনা নিয়ে সে বেঁচে থাকে। ঠকিয়ে নেবে ? জগদীশের তেমন কিছু থাকলে তো উনিই বরং এ মেয়েকে সব উজাড় করে দিয়ে যেতেন।

তবে কথাটা মিথ্যে বলেনি। জয়ার দুঃখের মধ্যে নিজেকে এমন ডুবিয়ে রেখেছিলেন, এদিকটা ভাবেননি একেবারেই। ওঁরই তো নিজে থেকে অফিসে গিয়ে খোঁজখবর করা উচিত ছিল। কেন করেননি ?

একবার বোধহয় মনে হয়েছিল। মনের মধ্যেই চেপে গিয়েছিলেন। একটু ভয়ও হয়েছিল। জয়ার মন তো বুঝতে পারছেন না। ওর মন যদি সেই বাড়িতেই পড়ে থাকে, সুকল্যাণের জন্যে হা-হুতাশ যদি মুছে ফেলতে না পারে, ও তো আবার ওখানেই ফিরে যেতে চাইবে। এখনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সেক্ষেত্রে উনি যদি আগ বাড়িয়ে সুকল্যাণের অফিসে যেতেন, টাকাপত্র আদায় করতেন, আর নির্মলেন্দুর কানে যেত, তা হলে নিশ্চয় রেগে যেতেন ওঁরা। ভাবতেন আমরা অবিশ্বাস করছি। যাদের কাছে সারাজীবন থাকতে হবে তাদের অবিশ্বাস করা যায় না।

দেবজ্যোতির কথা শুনে মনে হচ্ছে অতখানি বিশ্বাস না করাই ভাল।

—ছুটকুর বিয়ে যদি ঠিক হয়ে যায়, তোমার দু' চারখানা গয়না কিন্তু নেব আমি। অমিতা বলেছিল জয়াকে। যেবার ওর বিয়ে হতে হতে ভেঙে গেল, জয়া সেই প্রথমবার এ বাড়িতে এসে মুকুলের কাছে
গল্প করে বলেছিল।

—দিয়েই দেব, কি বল মা ? বেচারির বিয়েটা তো হয়ে যাবে।

মুকুলের ভাল লাগেনি।—কখনা গয়নাই বা তোকে দিতে পেরেছি, তার ওপরও ওদের লোভ। দিবি কেন, ওটাই তো তোর ভবিষ্যৎ।

জয়া হেসে ফেলেছে মার রাগ দেখে। আব্দারের ভঙ্গিতে বলেছে, চাইলে না দিয়ে

পারা যায়।

মুকুল রেগে গিয়ে বলেছে, তাই দিস, আপদ বিদেয় হলেও ভাল।

অর্থাৎ ছুটকুর বিয়েটা আপদ বিদেয়।

মুকুল একদিন জগদীশকে সেসব কথা শুনিয়েছিল।

এখন মনে পড়তে সেজন্যেই ভয় হল। সত্যি অবিশ্বাস করারই তো কথা। দেবজ্যোতি ঠিকই বলেছে, আজকালকার বাজারে কাউকে বিশ্বাস নেই।

ওর সঙ্গেই তাই দিন ঠিক করে নিয়েছেন, কবে জয়াকে নিয়ে যাবেন, জি এম জিগ্যেস করলে কি বলতে হবে।

এখন আর সঙ্কোচ নেই। নির্মলেন্দুরা কেউ কিছু বললে জগদীশ স্রেফ বলতে পারবেন, আপনারাই তো অফিসের লোককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেতে বললেন, তাই নিয়ে গিয়েছিলাম।

যে যা ভাবে ভাবুক, ইনসিওরেন্সের টাকা আর অফিসের কাছে যা পাওয়া যাবে সব জয়ার নামে বিলিব্যবস্থা করে দেবেন এমনভাবে, যাতে কেউ না ঠকাতে পারে। সবই তো গেছে, বাকি জীবন চালাবার জন্যে, পিঙ্কুর জন্যে ওই টাকাটা যেন থাকে।

বেশ খুশি খুশি মনে ফিরলেন।

অনেক কষ্টে একটা ট্যাক্সি ধরে ঘেমেনেয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

যাবার আগে জয়া মুকুলকে জিগ্যেস করেছিল, কি পরে যাব মা?

সাদা থান কাপড়টা আর গায়ে ওঠেনি একদিনও। জগদীশ ওটা সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু যে দুখানা জয়া কিনে এনেছিল তাও এমন কিছু ভাল নয়।

সুশান্ত তো বলেই বসল, ওসব পরে গেলে ভিখিরির মতো লাগবে, তখন দেখিস ভিখিরির মতো টাকা দেবে।

জয়া কড়া চোখে তাকিয়ে বলেছিল, ভাইয়া! অর্থাৎ ধমক।

আসলে জয়া তো ভিতরে ভিতরে জানে ও ভিখিরিই হয়ে গেছে।

মুকুল আলমারি থেকে বছর কয়েক আগে পুজোয় কেনা ঢাকাই শাড়িটা বের করে বলেছিল, এটাই পর।

ইদানীং মুকুল রঙিন শাড়ি পরে না। বয়েস হয়ে গেছে বলে একটু সাদার দিকে ঝোঁক বেড়েছে। শাড়িটার সাদা জমিতে সাদা আর হাল্কা স্লেট রঙের কাজ আছে। নিপাড়।

—পরব? একটু দ্বিধা ছিল জয়ার।

মুকুল বললে, কেন পরবি না? আজকাল সবাই রঙিন পরে।

একটু হয়তো পরতে লোভও হল জয়ার।

যখন পরে এসে দাঁড়াল, সুশান্ত বলে উঠল, তোকে বিউটিফুল লাগছে ফুটকি।

সকলেই হেসে ফেলল। জয়াও।

ওকে যে বেশ সুন্দর লাগছিল তা আয়নায় দেখে ওর নিজেরও মনে হয়েছে। নিজেকে সুন্দর দেখালে কার না ভাল লাগে। বিধবা হলেই কিছু নিজেকে ভালবাসা কমে যায় না।

কিন্তু টাকাপয়সা সম্পর্কে জয়ার কোনও কৌতূহল বা আগ্রহ ছিল না। নিতান্ত বাবা বলছে বলেই যাওয়া। ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটুও চিন্তিত নয়। বর্তমানই ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

ফেরার সময় জি এম লিফট অবধি এলেন, সান্ত্বনার মতো করে কত কি বললেন, বাড়ি ফেরার জন্যে অফিসের গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন।

ওঁর ভদ্রতায় জয়া অভিভূত বোধ করছিল।

কিন্তু ওই কমপেনসেশন কথাটা ওর একটুও ভাল লাগেনি। টাকার অঙ্ক ভাল করে শোনেওনি, ওর একটুও কৌতূহল ছিল না। ক্ষতিপূরণ কথাটাই ওর কানে লাগছিল।

এই ক্ষতি কি কেউ পূরণ করতে পারে ? যার হারায় শুধু সে-ই বোঝে। তুমি ভাবছ শুধু টাকা দিয়েই একটা জীবনের দাম মিটিয়ে দেয়া যায়। তা না হলে ওই বিশ্রী নোংরা শব্দটা ব্যবহার করছ কেন। ওই টাকা তো আমার ছুঁতেও ঘেন্না।

কিন্তু জগদীশ ফেরার পথে বললেন, একেবারে পারফেক্ট জেন্টলম্যান, না রে জয়া ? আমি তো ভাবিনি এত টাকা...

জয়ার ভাল লাগল না। বাবা যেন কি। লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে, অফিসের গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েছে, অনেক টাকা দিতে চেয়েছে বলেই সে জেন্টলম্যান হয়ে যাবে !

জগদীশ বললেন, ওঁর কি দোষ বল। উনি তো তোকে চাকরিও দিতে চাইলেন।

একটু পরে স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, তোর কোনও ভয় নেই ফুটকি, উনি তো বললেন প্লেন অ্যাকসিডেন্টের টাকাও আদায় করে দেবেন তাড়াতাড়ি। কে করে বল !

টাকা, টাকা, টাকা। কে চায় এসব। ওর বদলে কেউ যদি ওর পুরনো জীবনটা ফিরিয়ে দিতে পারত।

তার জায়গায় সবাই বলছে ভয় নেই, ভয় নেই। যেন জয়া শুধু ভবিষ্যৎ ভাবছে।

বাবা বোধহয় ফিরে এসে বাড়িতে ওই টাকাপয়সা নিয়ে আলোচনা করেছিল। কি বিচিত্র জিনিস এই টাকা। সবাইকে কেমন খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। দুটো দিন আগেও বাবা মা ভাইয়া সকলে কেমন বিমর্ষ ছিল। অথচ বাবা ফিরে এসে মুখে কি একটা হিসেব শুনিয়ে মাকে বললে, জয়ার জীবনটা দিব্যি কেটে যাবে, ভাবনার কিছু নেই, তখন চিৎকার করে উঠে ওদের থামিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল।

আর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সুশান্তর কথায়।

হঠাৎ একদিন ভাইয়া বলে বসল, এখন তো তোর অনেক টাকা হবে রে ফুটকি, দোকানটার জন্যে কিছু ছাড়বি তো ? তোকে না হয় পার্টনার করে নেব।

বিরক্তি আর বিস্বাদে মন ভরে গিয়েছিল জয়ার। ও কোনও উত্তর না দিয়ে সরে গিয়েছিল সেখান থেকে।

ছি ছি করে উঠেছিল সারা মন। ওর পরিচয় হয়ে গিয়েছিল শুধু একজন সাদা থান পরা বিধবা। যার সঙ্গে কথা বলতে নেই, যার সামনে হাসা চলে না, মুখে শুধু বিষণ্ণ ভাব আনতে হয়। আর এখন জয়ার পরিচয় ও অনেক টাকা পাবে।

ভাইয়া, তোর কাছ থেকে আমি কিন্তু ওরকমটা আশঙ্কা করিনি।

তার পরই এক সময় ওর মনে হল ওদেরই বা কি দোষ। সত্যি তো, ভবিষ্যৎটাও ভাবতে হবে, ওর জন্যে না হলেও পিঙ্কুর জন্যে !

বাবাকে খুশি খুশি দেখাচ্ছিল বলে জয়া আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। ও তো দেখেছে ওর জন্যে বাবার কি কষ্ট। কি বুক চাপা ব্যথা। তা হলে বাবা কেন এত খুশি হয়ে উঠবে !

কিন্তু পরের দিনই বাবাকে খেতে দেবার সময় ওর মনে হল বাবার ওপর কি অবিচার করেছে।

বাবা, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি ভুল বুঝেছিলাম।

—তা হলে তোর সঙ্গে আমারও চারটি ফুটিয়ে দিবি। তুই যা খাবি আমিও তাই খাব।

জয়ার অনুনয়ে কোনও কাজ হয়নি। জগদীশ তাঁর প্রতিজ্ঞায় অনড় থেকেছেন। বাধ্য হয়ে জয়াকে রাজি হতে হয়েছে।

জয়া বুঝতে পেরেছে বাবা ওর দুঃখের ভাগ নিতে চাইছে। কষ্টের ভাগ নিতে চাইছে।

—এই বয়েসে কে তোকে এসব মানতে বলেছে।

বাবার কথাগুলো মনে পড়ল।

কিন্তু জয়া যে আর পারছে না। এই আতপ চাল আর সেদ্ধ জয়ারই গলা দিয়ে নামতে চায় না। সেই শোকে বিহ্বল দিনগুলোয় একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে বলেই এখন আর ফেরাব পথও নেই। বাবারও নিশ্চয় এসব গলা দিয়ে নামতে চায় না। বাবার খাওয়া দেখলেই তো জয়া বুঝতে পারে। নেহাত একটা নিয়মরক্ষা। মুখ দেখেই বোঝা যায় বাবা খেতে পারছে না। অথচ এই বিস্বাদ খাবারটাই বাবার সামনে এগিয়ে দিতে হয়।

বাবা, তুমি আমার মাথায় পাপের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছ। আমি জানি মাছ না হলে তুমি খেতে পার না। মার রান্নার তুমি কত সুখ্যাতি করতে। তিন চারটে তরকারি ছাড়া তোমার চলত না। খেতে ভালবাসতে তুমি। আমি জানি, জানি।

কিন্তু এরকম যে ঘটবে জয়া ভাবেনি।

সেদিন জয়াকে একই সঙ্গে খেতে বসতে হল।

জগদীশ বললেন, আয় ফুটকি, আজ আমরা একসঙ্গে বসে খাই।

হয়তো জয়ার খেতে দেরি হত বলেই। ওঁকে খাইয়ে থালাবাসন তুলে তবেই জয়া নিজে খেতে বসতে পেত।

জগদীশ বসলেন, জয়াকেও কাছেই বসতে হল। জয়া দেখেই বুঝতে পারল বাবা খেতে পারছে না।

ওর বুকের ভেতর থেকে একটা কান্না ঠেলে উঠতে চাইছিল।

নিজে খেতে পারছে না বলে তত কষ্ট নয়। বাবা খেতে পারছে না বলে আরো কষ্ট।

খেতে পারছে না বাবা, খেতে পারছে না।

জয়া দেখল ভাতগুলো নিয়ে বাবা নাড়াচাড়া করছে, দু'এক গ্রাস খেয়েই থেমে পড়েছে।

ভাবল বলে, বাবা তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভাঙো। আমি জানি মাছ না হলে তুমি খেতে পার না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

খেতে খেতে জগদীশ হড়হড় করে বমি করে ফেললেন।

আর জয়া তা দেখে স্থির চোখে বাবার মুখের দিকে তাকাল। কেঁদে উঠে চিৎকার করে বললে, বাবা আমি মাছ খাব, আমি মাছ খাব।

বলে ফেলে নিজেই অবাক হয়ে গেল জয়া। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

॥ ৮ ॥

জয়া বললে, মা আমি একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসব।

মুকুল জগদীশের সার্টে বোতাম বসাচ্ছিল, সুতো পরানো ছুঁচটা টেনে নিয়েই ফিরে তাকাল।

—যাবি?

—হ্যাঁ মা, কয়েকটা জামাকাপড় আনব, আর একবার দেখাও করে আসব। তা না হলে কি ভাববে বল।

মুকুল হেসে ফেলল, বললে, তা যাস।

বলেই জয়ার দিকে ভাল করে তাকাল।

এর আগে আরো একদিন জয়া গিয়েছিল। বেশ কয়েকখানা শাড়ি ব্লাউজ নি'

এসেছিল বেছে বেছে। সবই একটু ফিকে রঙের। রঙিন, কিন্তু রঙটা চাপা।

পিঙ্কুকে নিয়ে স্কুলে যাবার সময় তারই একটা দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিল, মা এটা পরব ?

—কেন পরবি না।

জয়া খুশি হয়েছিল মার কথা শুনে।

সেই রকমই একটা শাড়ি, বেশ সোবার কালার, জয়া পরেছে। রঙটা মোলায়েম, জয়াকে দেখাচ্ছেও ভাল।

কিন্তু জয়ার এই শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটা মুকুলের আজকাল তেমন পছন্দ নয়।

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল জয়া একটু বাড়াবাড়ি করছে। স্বামী মারা গেলে শোক কার না হয়, শোক হবারই কথা। কিছু কিছু নিয়মনিষেধ মেনে চলাও উচিত। আমিষ খাবে না সে ঠিক আছে, তা বলে আমিষ হেঁসেলে রান্নাও চলবে না এটাই বাড়াবাড়ি। স্বপাক খেতে হবে কে বলেছে তোকে। আর ওই আতপ সেদ্ধই বা কেন। আজকাল কেউ ওসব করে না। পিসশাশুড়ির পাল্লায় পড়ে করতে হয়েছে তা বুঝি, কিন্তু এবাড়িতে কেন।

একদিন বলেছিল, যা করতে হয় ও বাড়িতে করবি, এখানে কেন। এখানে তো আর কেউ দেখতে আসছে না।

জয়া তখন বলেছিল, সে হয় না মা, যা করব জানিয়ে শুনিয়েই করব।

মুকুল চুপ করে গিয়েছিল।

এই বয়েসের একটা মেয়ে, সে কেন এতসব মানতে যাবে, মানতে গিয়ে কষ্ট পাবে। কিন্তু একদিক থেকে একটু শান্তিও পেয়েছিল মুকুল।

এই বাড়িটার ওপাশের অংশ শরিকদের। শরিক মানে জগদীশের খুড়তুতো ভাইদের। এমনিতে ওদের সঙ্গে কোনও বাক্যালাপ নেই। একতলার পাঁচিল নিয়ে একবার ঝগড়াবিবাদ হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে বা শ্রাদ্ধতে যাতায়াত আছে। আপদে-বিপদে দু'একটা কাজও করে দিয়েছে পরস্পরের। কিন্তু এ বাড়ির ভাল দেখতে পারে না ওরা। সুযোগ পেলে দু'একটা টীকা-টিপ্পনীও ছাড়ে, কিংবা মেয়েদের নিয়ে হাসাহাসি। সেগুলো ঠিকের লোক কিংবা পাড়াপড়শি মারফত কানে এসে পৌঁছয়।

দুঃসংবাদ শুনে ওরা কেউ কেউ এসেছিল, দুঃখ করে গেছে। বাড়ির মেয়েরাও তারপর দু'একবার।

পাড়াপড়শিদেরও কেউ কেউ এসেছিল।

মুখে ওরা যতই সমবেদনা এঁকে আনুক, মুকুল জানে ওরা কেন মাঝে মাঝে আসতে শুরু করেছে।

জয়ার বাড়াবাড়ি তাই একদিক থেকে ভালও লেগেছিল। পাড়ার কে কোথায় কি বলল এ নিয়ে একটা ভয় তো আছেই। আর এত দুঃখের মধ্যে পান থেকে চুন খসা নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি শুনতেও ভাল লাগে না। জ্ঞাতির মতো শত্রু তো হয় না, তাছাড়া এই হাসাহাসি বলাবলিকে ভয় করে করেই মুকুল এ বাড়ির নতুন বউ থেকে বয়স্ক গিন্নি হয়ে উঠেছে।

তাই কেউ দুঃখী দুঃখী মুখ করে সহানুভূতি জানাতে এলেই মুকুল তাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছে একটা পৃথক উনোনে জয়া তার নিরামিষের হাঁড়ি চাপিয়েছে।

স্বামীকে মনে রেখেছে কিনা, তার জন্যে দুঃখ পাচ্ছে কিনা, তা কেউ জানতে চায় না। সাদা থান কাপড় পরলেই, নিরামিষ দেখলেই সে সতীসাধ্বী।

প্রথম প্রথম তাই খুব খুশি ছিল।

কিন্তু ও বাড়ির একজন এসে হঠাৎ একদিন বলে বসল, ফুটকি রঙিন শাড়িটা না

পরলেই পারত।

মুকুল বলতে গেল, ওটা আবার রঙিন কোথায় ?

মন্তব্য এল, ওটা সধবাদেরই মানায়।

আসলে জয়ার চেহারায় এমন একটা শ্রী আছে, যা পরে তাতেই ওকে সুন্দর লাগে। খুব ফিকে রঙের বুটিদার একটা সাদা শাড়ি পরেই জয়া পিঙ্কুকে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল।

টিপ্পনী সেই শাড়ির জন্যে।

সুশান্ত শুনছিল । রেগে যাচ্ছিল। মা ওটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিংবা যুক্তি দেবার চেষ্টা করছে দেখে দুম করে বলে বসল, ও তো মাছও খায়।

জগদীশও ওদের মন্তব্য শুনে রেগে যাচ্ছিলেন। ছেলের কথার পিঠে সায় দিয়ে বলে বসলেন, হ্যাঁ খায়। অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি।

জয়ার সামনেই কথাগুলো হচ্ছিল। সেও সমান রেগে ছিল।

বললে, হ্যাঁ মাছ খাই, রঙিন শাড়িও পরব।

তারপর থেকে পাশের জ্ঞাতিদের কেউ আসেনি। পাড়াপড়শিও নয়।

জয়া পরের দিনই চলে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে। বেশ কয়েকখানা ফিকে রঙের শাড়ি নিয়ে এসেছিল। পরতে শুরু করেছিল।

মুকুলের তখন আর কোনও সঙ্কোচ ছিল না। দেখেছে ভয় পেলে ভয় তাকে পেয়ে বসে। মেয়ের জীবনটা আগে, না লজ্জাসংকোচ ?

তবু একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, জয়া একদিন শ্বশুরবাড়িতেই ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে কী করবে না করবে সে জয়ার ব্যাপার। এখানে অন্তত একটু সুখে থাকুক।

কিন্তু জয়ার কথাটা মুকুলের কানে লাগল।

জয়া বললে, মা আমি একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসব।

বাড়ি। অর্থাৎ জয়া এখনো ওটাকেই বাড়ি মনে করছে।

বিয়ের পর জয়ার মুখে শুনলে ভালই লাগত। এখন লাগছে না, যদিও জানে ওটাই জয়ার বাড়ি। কিন্তু ইদানীং একটা ভয় ঢুকেছে মনে। শুধু মুকুলের নয়, জগদীশেরও।

যেখানে যা পাওনা ছিল আদায় হয়ে গেছে। জয়ার শ্বশুর নির্মলেন্দু কোনও বাধা দেননি। বরং কিছুটা সহযোগিতাই করেছেন। বাধা দিয়েও কিছু করতে পারতেন না, তবু দেরি তো করে দিতে পারতেন।

অফিস থেকেও নেহাত কম পায়নি জয়া, পি এফেও কিছু ছিল, তার ওপর ইনসিওরেন্স-এর টাকা। প্লেনে ওঠার আগে যেটা সুকল্যাণ করেছিল। আবার প্লেন অ্যাকসিডেন্টের জন্যেও।

একে একে সব টাকা জয়ার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। তারপর হিসেবনিকেশ করে, অফিসের পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে এমনভাবে ইনভেস্ট করিয়ে দিয়েছেন জগদীশ যাতে সুদের টাকায় ওর জীবন কেটে যায়, পিঙ্কুর পড়াশোনা কিংবা দায়দায়িত্ব তা থেকে মিটে যায়।

তবে যাই করুন না কেন, টাকা তো জয়ার নামে। ইচ্ছে করলে ও তুলতেও পারে, ভাঙাতেও পারে। কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে নিতেও পারে। সেটাই ভয় মুকুলের, সেটাই ভয় জগদীশের।

মুকুল আগে ভাবেনি, ভয়ও পায়নি। জয়া যদি শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে চায়, ওখানেই ওর মন বসে, থাকবে, অনেকেই তো থাকে । যদি মানিয়ে নিতে পারে সে তো ভালই।

কিন্তু এখনো ওটাকেই 'বাড়ি' বলছে সেটাই ভয়।

—তুই তো কয়েক লাখ টাকা পেয়ে গেলি রে ফুটকি, তুই এখন বড়লোক। সুশান্ত

বলেছিল।

জয়া রেগে গিয়েছিল। —দ্যাখ ভাইয়া, বড়লোক বড়লোক করবি না। আমার কাছে খুব নোংরা শোনায়। কেন পেয়েছি সেটা তো ভাববি।

সুশান্ত চুপ করে গিয়েছিল। সত্যি ওর বলা উচিত হয়নি। ওই টাকাগুলোর সঙ্গে তো ওর একটা বিশাল দুঃখ জড়িয়ে আছে। রঙিন শাড়ি পরছে, কানে কিছু পরেও, হাতে ঘড়ি নেয়, অন্য হাতে একটা মকরমুখী রুপোর মোটা বালা। মাছও খায়। কিন্তু ওসবই তো বাইরের চেহারা। রাস্তায় ঘাটে পথের ভিড়ে কেউ যাতে বিধবা বুঝতে পেরে বিশেষ দৃষ্টিতে না তাকায়। সকলের সঙ্গে মিশে গেলে তাদের চোখ একরকম, বিধবা কিংবা ডিভোর্সি বুঝলে আরেকরকম। সাদা-থান-বিধবার কোথাও কোনও সাজসজ্জা থাকে না বলে তার শরীরই হয়ে দাঁড়ায় আসল সাজ।

জয়া অবশ্য অতশত ভাবেনি। ও শুধু বুঝেছে রঙিন শাড়ি পরলে, অল্প-স্বল্প কানে হাতে, ও দিব্যি ভিড়ের সঙ্গে মিশে যেতে পারবে।

কিন্তু মন এখনো মাঝে মাঝে ও বাড়ির কথা ভাবে।

মুকুল বললে, যাবি ! তা যাস্ !

একবার তো কিছু শাড়ি জামা এনেছিল, হয়তো এবার আরো কিছু আনবে। কিন্তু এখনো বাড়ি বলছে কেন, ভয় তো সেজন্যেই।

এই টাকাগুলো পাওয়ার পর থেকেই ভয়।

সেবার জয়া এসে বলেছিল, মা ওরা আবার ছুটকুর বিয়ের চেষ্টা করছে। ভাল পাত্র। একবার দেখেও গেছে।

একটা মেয়ের এতদিন বিয়ে দিতে পারেনি, এখন যদি পারে তো ভাগ্যের কথা। আহা মেয়েটা বড্ড মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে থাকে। জয়ার সঙ্গে যেটুকু খারাপ ব্যবহার করত সে ওই বিয়ে না হওয়ার জন্যেই। ভিতরে ভিতরে যারা বিয়ের জন্যে ছটফট করছে, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে চোখের কোলে কালি পড়ছে, বয়েস বাড়ছে, তারা সবাইকে সুখী ভাবে, সুখ সহ্য করতে পারে না। সেটাই স্বাভাবিক। জয়ার আবার ওর জন্যে একটু মায়া মমতাও আছে। ভয় সেজন্যেই।

এখন খুব আদর দেখিয়ে আপ্যায়ন করে জয়াকে না বশ করে ফেলে। নির্মলেন্দু তো জানেন জয়ার এখন অনেক টাকা। সেই টাকার যে আজকের বাজারে কোনও দামই নেই, জিনিসের দাম যা বাড়ছে দিনকে দিন, ভবিষ্যৎ কি তা তো জানে না মুকুল। ওই টাকাই ওর সম্বল, আর বিয়েতে দেয়া সামান্য কিছু গয়না।

জগদীশের বয়েস হয়েছে, এখনও কোনও রকমে টানতে পারছেন, কিন্তু হঠাৎ কিছু হলে, একবার তো হার্টের অসুখে তিনমাস পড়ে ছিলেন, তখন কি হবে। সুশান্ত তো এখনো দাঁড়াতেই পারল না।

বাবা মার কেউ একজন মারা গেলে কে দেখবে জয়াকে। ওই টাকাটাই দেখবে।

কিন্তু ওর শ্বশুরবাড়িকে বিশ্বাস নেই। এরকম তো কতই শুনেছে। বিধবাদের ঠকিয়ে টাকা আত্মসাৎ করে রাস্তার ভিখিরি করে দিয়েছে কত লোক। নিজের বাবা কিংবা ভাইও। শ্বশুরবাড়ির লোকদের কথাই নেই।

জগদীশ এসে শুনলেন, জয়া আরো কিছু জামাকাপড় জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্যে ও বাড়ি গিয়েছিল।

শুনে বললেন, কেন যে যায়।

আসলে সেই দৃশ্যটা উনি ভুলতে পারছেন না। থান কাপড় পরে মাটির হাঁড়িতে রান্না, মেঝেতে খেতে বসা, আর যখন নির্মলেন্দুকে বললেন, 'ফুটকিকে দিনকয়েকের জন্যে নিয়ে

যেতে চাই, মনটা ভাল থাকবে,' তখন যাকে ভদ্র সজ্জন মানুষ বলে মনে করেছিলেন সেই লোকটা মাথা না তুলে বিদেয় করার ভঙ্গিতে বাঁহাত বাড়িয়ে হাতটা নেড়েছিল। মুখে বলেছিল, যাক যাক।

যেন বলতে চেয়েছিল, বিদেয় হলে বাঁচি।

যেন জয়ার কপালদোষেই উনি ছেলেকে হারিয়েছেন।

যেন বিধবাকে কষ্ট দিয়ে চোখের সামনে তা দেখতে পেলে ছেলের শোকে কিছুটা শান্তি পাওয়া যায়।

মনের ভেতরের এসব কথা তো মেয়েকে শোনানো যায় না। তাই মনের মধ্যেই চেপে রেখেছিলেন। মুকুলকেও বলেননি।

সন্ধেবেলায় জয়া ফিরে এল। হাতে ব্যাগ, ব্যাগে কিছু কাপড়চোপড়।

ওর ও বাড়ি যাওয়াটা ভাল লাগেনি, মনের মধ্যে সেজন্যে একটা চাপা আক্ষেপও ছিল। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা চলে না। হাজার হোক ওটা তো ওর শ্বশুরবাড়ি। কদিন আগে ওটাই ছিল বাড়ি।

তাই মুখে বললেন, কে কেমন আছে রে ? কিছু বললে ?

জয়া হাসল।—কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না বাবা। পিঙ্কুকে একবারও কোলছাড়া করেনি শ্বশুর।

—আর শাশুড়ি ?

জয়া বললে, শাশুড়ি তো এমনিতেই একটু মডার্ন। পিসশাশুড়ির জন্যেই যা কিছু করতে হয়েছিল। বলছিল...

মুকুল আর জগদীশের মুখ চাওয়াচাওয়ি জয়া দেখতে পেল না।

উদ্ভাসিত হয়ে ও তখন বলছে, শাশুড়ি তো বললে, রঙিন পরেছ ? ভালই করেছ। ওসব আর আজকাল কেউ করে না। এই তো বয়েস তোমার, কেন পরবে না।

জয়ার মনে পড়ল না প্রথম প্রথম ও নিজেও কতখানি গোঁয়ার্তুমি করেছে। শোকে বিহ্বল হয়ে বাবাকেও কষ্ট দিয়েছে।

এখন সেই দিনগুলো যেন শুধুই দুঃস্বপ্ন। সুকল্যাণের মুখটাই তো এখন স্মৃতিতে আবছা হয়ে গেছে। রাত্রে কোনও কোনওদিন ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগে, মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে দুঃসহ শূন্যতায় স্মৃতির খেলনা নিয়ে খেলা করে। এখন যন্ত্রণা নিঃসঙ্গতা, শোক নয়। শোক তো মুছে গেছেই, সুকল্যাণের মুখখানা এত তাড়াতাড়ি মুছে যাবে ভাবতে পারেনি। এখন সুকল্যাণ শুধু ওর ড্রেসিং টেবিলে রাখা শুকনো মালা জড়ানো স্টিলের ফ্রেমে আটকা পড়ে আছে।

—মা, শাশুড়ি বললে, 'এখানেও তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।' বললে, মাছ খেয়ো, মাছ না খেয়ে থাকা যায় নাকি !

মুকুল চোখ কপালে তুলল। শাশুড়ি নিজে থেকে এরকম কথা বলতে পারে ভাবতেই পারেনি। মনে মনে ভাবল তাহলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকলেও মেয়েটা কষ্ট পাবে না। শাশুড়ি সত্যি মডার্ন !

কিন্তু জগদীশ দুম করে বলে বসলেন, ছুটকুর বিয়ে ঠিক হয়েছে বুঝি ?

—না না। কথা চলছে।

জগদীশ আর কিছু বললেন না।

তবু জয়ার শুনতে খারাপ লাগল। শ্বশুরকে এত খারাপ ভাবছে কেন বাবা। মানুষ কি এত স্বার্থপর হতে পারে।

স্বার্থপর ! কে স্বার্থপর ? জয়া নিজেই নয় তো ?

ক্ষতিপূরণ শব্দটা একদিন অসহ্য লেগেছিল। ওই জি এম ভদ্রলোক। বারবার কমপেনসেশন কমপেনসেশন বলছিলেন। যেন একটা মানুষের জীবনের দাম টাকা দিলেই শোধ হয়ে যায়। গভর্নমেন্টও সেই একই কথা বলে।

কিন্তু টাকাগুলো পেয়ে যাওয়ার পর জয়ারও কি মনে হয়নি, অনেকখানি ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে। ও তো টাকাগুলোকে ভালবেসে ফেলেছে, সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। মনে মনে অবশ্য বলেছে, টাকা আমার চাই, নিজের জন্যে নয়, পিঙ্কুর ভবিষ্যতের জন্যে। ওটা নিজের মনকে স্তোক দেওয়া।

আরো কিছু শাড়ি-জামা আনার জন্যেই গিয়েছিল। কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্রও। কিন্তু তসর রঙের শাড়িটা পরে গিয়েছিল কেন ?

একটু আঘাত দিতে, নাকি আঘাত পায় কিনা জানতে। এখনো কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছে না জয়া। মাকে বলেছে, একবার বাড়ি যাব, অথচ ওটা এখনো বাড়ি কিনা জানে না।

ওরা কি সব মেনে নেবে ? যদি মেনে নেয় তবেই ফিরে যাবে, মনে মনে ভেবেছিল।

কিন্তু একটা আশঙ্কা ছিলই। নির্মলেন্দু জেনে গেছেন জয়া অনেক টাকা পেয়েছে। এমন কি ভাইয়াও বলেছে, তুই তো এখন বড়লোক হয়ে গেছিস। এই টাকাতেই বড়লোক হওয়া যায় কিনা জয়া জানে না। কিন্তু টাকাটাই যে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বুঝতে অসুবিধে হয় না।

এখন দেখছে ওর জন্যে আর কারো কোনও দুঃখ নেই, সমবেদনা নেই। সবারই একটাই চিন্তা জয়া যেন টাকাগুলো উড়িয়ে না দেয়। অথচ জয়া তো নিজেই এখন ওই টাকাকে আগলে আগলে রাখতে চাইছে।

একটু ভয় অস্বস্তি হয়েছিল সেজন্যেই।

ছুটকু আবার না বলে বসে, তুমি তো অনেক টাকা পেয়েছ, আমার বিয়ের জন্যে দেবে বলেছিলে, দেবে তো ?

কেন যে তখন ওর ওপর এত মায়া হয়েছিল, এত উদার হয়ে উঠেছিল জয়া এখন বুঝতে পারে না। বলে বসেছিল, আমার যদি কখনো অনেক টাকা হয়...

কিন্তু এভাবে তো চায়নি জয়া। এর প্রতিটি টাকার মধ্যে তো একটা করে কাঁটা আছে। বুকে বাজে। এটা দুঃখের টাকা, শোকের টাকা।

কমপেনসেশন কমপেনসেশন। তখন শুনতে সত্যি খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু জি এম ভদ্রলোক মানুষ ভালই। সুকল্যাণ তো অফিসের কাজে গিয়েছিল, যেতে হয়েছিল তাকে। দুর্ঘটনার সঙ্গে তার কি যোগাযোগ। অ্যাকসিডেন্ট যে কোনও সময়েই হতে পারে, ওর অফিস তো আর সেটা ঘটায়নি। দায়ীও নয়। ওরা তো ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু নাও দিতে পারত।

আইনকানুন অবশ্য ও জানেও না। এটাকে নেহাতই বদান্যতা ভেবে নিয়েছে। হয়তো সত্যিই তাই।

এই টাকাটা নিয়েই ওর এখন দুশ্চিন্তা।

ওর ভয় ছিল, শ্বশুর কিংবা শাশুড়িও না চেয়ে বসে।

চাইলে কি উত্তর দেবে, উত্তর দেবে কিনা তাও ভেবে রেখেছিল।

অনেকদিন আগে একবার অমিতা বলেছিল। ছুটকুর বিয়ের প্রসঙ্গেই।

বিয়ের কথা উঠলেই ছুটকু অস্বস্তি বোধ করত, কখনো কখনো রেগে যেত। ওর ধারণা ছিল শুধু টাকার জন্যেই ওর বিয়ে আটকে আছে। ওকে যে পছন্দও করেনি অনেকে, সেটা জানতই না, কিংবা বিশ্বাস করত না। অপছন্দের কথা তো বাবারা মেয়েকে

বলে না, বলতে চায় না। ওই সব অজুহাত দেয়। বলে অত টাকা আমি পাব কোথায়।

একদিন তাই রেগে গিয়ে বলেছিল, কেন বিয়ে বিয়ে করছ মা, কে তোমাকে টাকা দেবে।

সুকল্যাণের মুখের দিকেই তো তখন তাকিয়ে ছিল অমিতা। হেসে বলেছিল, ছেলে থাকতে আবার কার কাছে হাত পাততে যাব রে।

আসলে কথাটা জয়াকেই শোনানো।

সুকল্যাণ তখন ভাল চাকরি করছে ঠিকই, কিন্তু সুকল্যাণেরই বা টাকা কোথায়।

জয়া ভেবে দেখেছে, ওর কাছে ওদের টাকা চাওয়া এমন কিছু অন্যায় নয়। ছেলে বেঁচে থাকলে সে হয়তো কিছু অন্তত জোগাড় করে দিত। বাবা-মা ছেলের ওপর ভরসা না করে কার ওপর করবে।

আইনত জয়ারই প্রাপ্য তাই পেয়েছে। কিন্তু উচিত অনুচিত ভাবলে ওদেরও অধিকার আছে।

অথচ এখন টাকাটার ওপর ওর ভীষণ মায়া। এতদিনে ওর যেন মনে হচ্ছে একটু একটু করে ও আমি হয়ে উঠছে। পিঙ্কুকে খুব ভাল স্কুলে পড়াবে, এতটুকু অযত্ন যেন ওকে ছুঁতে না পারে।

ও কত কি ভেবেছিল, ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ওরা কেউ সেদিকেই গেল না।

শ্বশুর উল্লসিত হয়ে উঠলেন।—এসো এসো তোমার কথা পিঙ্কুর কথা এত মনে পড়ে, তোমরা তো আসই না।

উঠে এসে পিঙ্কুকে কোলে তুলে নিলেন। তার চুলে হাত বোলালেন।

বললেন, এত মন খারাপ লাগে, তোমরা কাছে থাকলেও শান্তি।

অমিতা বলল, তোমাদের দেখলেও তবু বুকটা ঠাণ্ডা হয়। চলে এসো এবার। আমি বলছি তোমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না।

জয়ার নিজেরই অস্বস্তি লাগল।

ওঁদের ব্যবহারে কোথায় একটা তোষামুদে ভাব দেখতে পেয়েছিল কি!

ভেবেছিল, জয়া না থাকাতেই ওঁরা বুঝি একেবারে একা হয়ে গেছেন। জয়ার জন্যে না হোক, পিঙ্কুর জন্যে।

অমিতা নিজেই চা বানিয়ে দিয়েছিল।

ছুটকু বলেছিল, চলে এসো না বৌদিভাই, তোমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। পিসি তো আর নেই, চলে গেছে।

যেন ওই প্রাচীনপন্থী পিসির জন্যেই জয়া চলে গিয়েছিল।

—আজকাল সবাই তো রঙিন পরে। অমিতা বলেছিল।

জয়ার ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল ওদের ব্যবহার। যদিও মনের ভেতর একটু খিচখিচ করছিল। তোমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। যেন অসুবিধের জন্যেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু ও তো ভেবেছিল ওর রঙিন শাড়ি দেখেই ওরা চটে যাবে।

ফিরে এসে তাই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতে গিয়েছিল বাবাকে।

অথচ জগদীশ বললেন, ছুটকুর বিয়ের কথা হচ্ছে বুঝি!

ব্যস। সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে গেল।

প্রথমে বাবার ওপরই রেগে গিয়েছিল জয়া। ওদের এত স্বার্থপর ভাবছে কেন! জয়ার জন্যে পিঙ্কুর জন্যে ওদের কি সত্যি সত্যি কষ্ট হতে নেই। জয়ার নিজেরও কি এক একসময় যেতে ইচ্ছে করে না? কেন করে, ওর তো কোনও স্বার্থ নেই। যাকে নিয়ে স্বার্থ সে-ই তো নেই।

কিন্তু মনের মধ্যে খটকা রয়েই গেল। হয়তো বাবাই ঠিক। তা না হলে এত আদর আপ্যায়ন কেন ? বারবার বলেছে কোনও অসুবিধে হবে না। অর্থাৎ ও যদি রঙিন শাড়ি ব্লাউজ পরে, সাজগোজ করে, আপত্তি হবে না। অমিতা তো বলেই বসল, মাছ আজকাল সবাই খায়।

কেন বলল ? জয়ার সাদা থান আর নিরামিষ খাওয়ার মধ্যেই ওদর মৃত পুত্রকে দেখতে পাওয়ার কথা। জয়া যদি সেভাবেই সুকল্যাণকে বাঁচিয়ে রাখত তা হলে ওদের কাছে সেটাই হত মৃতপুত্রের প্রতি সম্মান।

সুকল্যাণকে সেভাবেই তো ও বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। পারল না কেন ৷

তুচ্ছ দু'একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু তার মধ্যে এখন আর কোনও উত্তাপ খুঁজে পায় না, উত্তেজনা নেই।

সেজন্যেই বোধহয় এত নিঃসঙ্গ লাগে। আগে তবু স্মৃতি ওর সঙ্গী ছিল, এখন তাও নেই। স্মৃতিই ক্ষীণ হয়ে আসছে, স্বামীর মুখটাও এখন ঝাপসা।

পিঙ্কুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে সামনের বাড়ির রকে এসে বসল জয়া, মীনার পাশ ঘেঁষে। মীনা আর ইরার মাঝখানে।

রক তো নয়, আসলে লম্বা সিঁড়ির ধাপ, দু'তিনটি। বাড়িটায় শরিকি ভাগ হয়েছে, কিংবা প্রথম থেকেই জয়েন্ট প্ল্যানে তৈরি। বাইরে বেরোনোর তিন তিনখানা দরজা হয়তো তিন শরিকের। সিঁড়ির ধাপগুলো সেজন্যেই একটানা।

বাচ্চাদের দিয়ে এসে মায়ের দল এখানেই ঠেসাঠেসি করে। গল্পগুজবে মেতে ওঠে, কিংবা বাচ্চার পরীক্ষা আর আন্টির আচরণ নিয়ে। কারো বা সাংসারিক বিপদ-আপদ।

প্রথম দিন যখন সেই সাদা শাড়িটা, সুপ্রভাতের কিনে দেওয়া আঁচলে কালো অ্যাপ্লিক সাঁটা শাড়িটা পরে এসেছিল, মীনা আর ইরা উঠে দাঁড়িয়েছিল ওকে দেখে। ওদের দেখাদেখি আরো অনেকে।

এখন আর কেউ উঠে দাঁড়ায় না। সেভাবে ওর দিকে কারো চোখ পড়ে না। ওদের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে জয়া। মিশে যেতে পারলেই স্বস্তি। এখন অচেনা কেউ ওকে দেখলে চট করে বুঝতেই পারবে না যে ও বিধবা। কিন্তু মন বদলানো যায় না, সেটা স্বামীহারা বিধবাই হয়ে আছে।

—এক একদিন বড় একা লাগে রে! জয়ার কথায় একটু বেদনাও ছিল, কিংবা দীর্ঘশ্বাস।

মীনা তাকাল ওর মুখের দিকে, জয়ার হাঁটুতে হাত রাখল, বললে, ওরা চাকরি দিতে চেয়েছিল, তুই নিলি না কেন ?

জয়ার নিজেরও সেকথা মনে হয়েছে। এখন মনে হয়েও লাভ নেই। এতদিন বাদে গেলে কি আর এখন চাকরি দেবে, কি চাকরিই বা করবে ও।

তাছাড়া সমস্যা সময় কাটানো নিয়ে নয়। এই যে এতলোকের ভিড়ের মধ্যে রয়েছে, তবু ভেতরটা তো একাই থেকে যাচ্ছে। সঙ্গী থাকলেই কি নিঃসঙ্গতা যায়।

মীনা বললে, তোর যখনই একা লাগবে আমার কাছে চলে আসিস।

ইরা বলে বসল, তুই বরং আবার বিয়ে কর জয়া।

জয়া হেসে ফেলল। —কি যে বলিস।

বিয়ে দূরের কথা, চাকরিও করা সম্ভব নয়। ওর একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে না! পিঙ্কু। পিঙ্কুকে মানুষ করে তুলতে হবে। চাকরি করলে কি পিঙ্কুর দিকে সেভাবে দৃষ্টি দিতে পারবে ও। সব সময়টুকু ওই চাকরিই নিয়ে নেবে। আর ওকে যদি বড় করতে তুলতে না পারে তা হ'লে এই এত এত টাকা নিয়ে কি হবে। ওই টাকাও এখন ওর কাছে

এক বড় দায়িত্ব।

মাসে মাসে বেশ কিছু সুদের টাকা ওর অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। বাবাই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেই টাকা থেকেই পিক্কুর স্কুলের মাইনে, নিজের যাতায়াতের খরচ, টুকিটাকি কিছু কিনলেও। তসর রঙের শাড়িটাও ওই টাকা থেকেই কিনেছে। তসর নয়, সুতির ওপরই প্রিন্টেড। যৎসামান্য নক্সাও আছে।

কিন্তু বাবাকে কি সংসার খরচের জন্যে কিছু দেওয়া উচিত? এমনিতেই ওদের টানাটানির সংসার। ভাইয়ার ক্যাসেটের দোকানে তেমন কিছু প্রফিট হচ্ছে না। বলছিল, ক্যাসেট না বাড়ালে লাভ হয় না, ক্যাসেট বাড়াতে গেলে লাভের টাকা সেইখানেই চলে যায়। তবু কিছু কিছু জমাচ্ছে, আরো ভাল জায়গায় বড় দোকানঘর ভাড়া নেবে বলে।

ক্ষণিকের জন্যে উদার হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে জয়ার। ভাবে, বিশ পঁচিশ হাজার যা চায় দিয়ে দিই। দাঁড়িয়ে গেলে তখন তো শোধ দিয়ে দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা কৃপণতা ওকে পেয়ে বসে। কিংবা পিক্কুর জন্যে দায়িত্ববোধ। ও টাকা তো পিক্কুর নয়, আমার নয়। ক্ষতিপূরণের টাকা। ক্ষতি তো আসলে পিক্কুর হয়েছে।

টাকা যখন ছিল না সবাইকে কত আপন মনে হত। কত কাছের মানুষ। এখন ভাইয়াকেও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। একদিন তো বলতে পেরেছিল, আমার অনেক টাকা হলে তোর যা ক্যাপিটেল লাগে দিয়ে দেব।

এখন ভাইয়াও হয়তো ওকে খুব ছোট ভাবছে।

ছোট তো হয়েই গেছে জয়া। অনেক টাকা হলেও অনেকের অভাব মেটানো যায় না বলেই। ক'জনের অভাব মেটাতে পারবে ও? মেটাতে গেলেই নিঃস্ব হয়ে যেতে হবে।

বাবাকে সংসার-খরচের টাকা দিতে গেলেও বাবা নেবে না, ও জানে। হয়তো বলে বসবে, দুটো তো মুখ, তার জন্যে তুই আমায় টাকা দিচ্ছিস! হ্যাঁ রে ফুটকি, আমি কি রাস্তার ভিখিরি হয়ে গেছি?

খুব ব্যথা পাবে, হয়তো অপমানও লাগবে।

শ্বশুরবাড়িতে থাকলে অন্য ব্যাপার। অমিতা হয়তো নিজেই চেয়ে বসবে। বলবে, সুকল্যাণ দিত, এখন তুমি দাও। তুমি তো অনেক টাকা পেয়েছ।

অথচ ও জানে ও দিতে পারবে না। দিতে চাইবে না।

এই টাকাটাই সকলকে ওর শত্রু করে দিচ্ছে। দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। জয়া কি নিজেও ছোট হয়ে যাচ্ছে না!

জগদীশ ঘুরে ঘুরে কি দেখছিলেন। এক একটা ঘরে ঢুকছেন, সীলিং-এর দিকে তাকাচ্ছেন। দেয়ালের দিকে।

জয়ার কৌতূহল হল। এসে জিগ্যেস করল, কি দেখছ বাবা?

—কিছু না।

তারপরই আবার আরেকটা ঘরে।

শেষে রাস্তার দিকের বারান্দায়।

ফিরে এসে আবার ঢুকলেন জয়া যে ঘরে শোয় সেই ঘরে।

তারপর হাসতে হাসতে বললেন, এবার না সারালেই নয়। বর্ষায় তোর ঘরে না চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ে।

আগে তো এর জন্যেই জয়া শ্বশুরবাড়ির কাছে হীনম্মন্যতায় ভুগত। সীলিং-এর কাছে দেয়ালে ড্যাম্প ধরেছে। এক এক জায়গা জরাজীর্ণ। বারান্দা কবে ভেঙে পড়ে তার ঠিক নেই।

জয়া পালিয়ে এল। কোনও কথা বলল না।

বাবা তো এরকম মাঝে মাঝেই বলে, মাকে স্তোক দেয়। এবারও হয়তো সেই রকমই। শেষ অবধি কিছুই হবে না।

কিন্তু জয়া ভয় পেয়ে সরে গেল কেন।

ছিঃ, কি ভাবছে ও। বাবা ওর টাকা ছোঁবেও না। বাবাই তো ছোটাছুটি করে সব পাওনাগণ্ডা আদায় করে দিয়েছে। কোথায় কি ভাবে রাখলে ভাল হয় তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কি করেনি !

তবু এ-রকম একটা সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল বলে নিজের কাছেই খারাপ লাগল।

বাবা চাইবে না ঠিকই, কিন্তু যদি কোনওদিন চেয়ে বসে তখন কি করবে ! ও ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল।

ওর বাপের বাড়ি আছে, শ্বশুরবাড়ি আছে। যে কোনও বিধবা মেয়ে ওর একটাকে নিজের বাড়ি ভেবে নিতে পারে। কোথাও সংসারে খাটাখাটুনি, কোথাও বাধা নিষেধ, কষ্ট পেতে হয় ঠিকই, তবু সেটাকেই নিজের বাড়ি ভাবতে পারে।

কিন্তু জয়ার কেন মনে হচ্ছে ওর পায়ের তলায় মাটি নেই। মাথার ওপর ছাদ নেই। কোনওটাকেই কেন ও নিজের বাড়ি ভাবতে পারছে না। আগে তো ভাবত। হয়তো দুটোকেই। তা না হ'লে মনের ভেতরটা সবসময় বাপের বাড়িতে ছুটে আসতে চাইত কেন !

ও মানুষটা এখন স্বাধীন। চাইলে কারো তোয়াক্কা না করে ইচ্ছেমতো জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। পিঙ্কুর জন্যে ভয়ভাবনা আছে। ভালবাসা আছে, দায়দায়িত্বও। কিন্তু ওর অফুরন্ত সময়ের ওপর কতটুকুই বা ভাগ বসাতে পারে পিঙ্কু। যদি পারত তা হ'লে আর নিজেকে এত একা লাগত না।

ওর মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা ক্ষোভ ছিল সেই স্কুল কলেজের দিন থেকে। কখনো স্বাধীন হতে পারলাম না। ছেলেরা কি ভাগ্যবান। ভাইয়া রাত দশটায় ফিরলেও কোনও কৈফিয়ত দিতে হয় না। মা শুধু ধমক দেয়, ব'লে যাবি তো ফিরতে দেরি হবে, আমার যে কি দুর্ভাবনা হয়।

সুকল্যাণের মৃত্যুর পর থেকে মা সবসময় সব জায়গায় দুর্ঘটনার ভয়ে তটস্থ। কিন্তু সে তো ইদানীং। তার আগেও ভাইয়াকে কখনো তেমন কৈফিয়ত দিতে হয়নি।

অথচ যত বাধানিষেধ ছিল জয়ার ওপর। ইলা সুস্মিতার সঙ্গে মেতে উঠে ইচ্ছেমতো কোনও নির্দোষ আনন্দ করতে গিয়েও টের পেয়েছে, পায়ে বেড়ি। সুস্মিরা বাড়ির তোয়াক্কা করত না, কিংবা মিথ্যে কথা বলে পার পেয়ে যেত। ওদের বাড়ি গিয়েও দেখেছে, খুব খোলামেলা, মেয়েকে নিয়ে ওদের বাবা-মা'র তেমন কোনও দুশ্চিন্তা নেই। 'মাকে জিগ্যেস করে বলব' এই কথাটা বলায় ওদের কি ঠাট্টা বিদ্রূপ। চোখে জল এসে গিয়েছিল।

তখন ভেবেছিল, একবার বিয়েটা হতে দাও। একেবারে স্বাধীন।

হল কই ? স্ত্রী, পুত্রবধূ, মা হতে হতেই সব স্বাধীনতা চলে গেল। তারপর বৈধব্য, সে তো আরো বড় বেড়ি। সেখান থেকে ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে আসতে পারে। স্বাধীন হতে পারে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের টাকাটা ওর পায়ের তলা থেকে মাটি, মাথার ওপর থেকে ছাদ সরিয়ে নিতে চাইছে।

এখন মনে হচ্ছে ওর কেউ কোথাও নেই, ও বড্ড একা। অথচ একা হতেই তো চেয়েছিল। একজন না একজনের মন জুগিয়ে চলা তখন মনে হ'ত কি কষ্টকর।

এখন টাকার অভাব নেই। সবাই বলে টাকার অভাব না থাকলে তবেই স্বাধীন হয়ে

ওঠা যায়।

অথচ ও কি ভাবে 'আমি' হয়ে উঠবে ভেবে পাচ্ছে না। চেষ্টা করলে হয়তো একটা চাকরি এখনো জুটে যাবে। জি এম লোকটিকে খুবই ভদ্রলোক মনে হয়েছিল। নিজেও সুকল্যাণের জন্যে দুঃখ করছিলেন। সেখানে না হ'লে কোনও একটা স্কুলে পেয়ে যাবে। কিন্তু শুধু কাজই কি ওর একাকিত্ব ভুলিয়ে দিতে পারবে। পিঙ্কুই তো পারছে না।

কিছুই করার ছিল না, ওর হঠাৎ মনে হ'ল যাই মীনাদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। মীনা বলেছিল, যখনই একা লাগবে আমার ওখানে চলে আসিস।

সুকল্যাণ মারা যাওয়ার আগে বিকেল হলেই ও খুব সাজগোজ করতে ভালবাসত। নিজেকে সুন্দর করে তুলতে কার না ভাল লাগে। এখন তো সাজগোজের পাট উঠেই গেছে। ইচ্ছেও হয় না। একটা রঙিন শাড়ি পরা মানে তো সাজগোজ করা নয়।

মা পিঙ্কুর সঙ্গে গল্প করছে। মাকে আজেবাজে প্রশ্ন করে করে অতিষ্ঠ করে তোলে ছেলেটা। শ্বশুরকে করত, এখন বাবাকে মাকে। মা কিন্তু একটুও বিরক্ত হয় না, বেশ মজা পায়। পিঙ্কুকে মা'র কাছে রেখেই যাবে, তা না হ'লে গিয়ে মীনার সঙ্গে গল্প করতেই পাবে না। মাঝে মাঝেই এসে বিরক্ত করবে।

কলঘরে ঢুকে গেল ও। স্নান করতে করতে ভাবল, মীনাকে জিজ্ঞেস করবে কোথাও ছবি আঁকতে শেখা যায় কিনা, কিংবা গান শেখার বড়দের স্কুল কোথায় আছে। ও একটু আধটু আঁকতে পারত, স্কুলে ড্রয়িং দিদিমণি প্রশংসা করতেন। গানও শিখেছিল, ওই একটু আধটু।

গায়ে সাবান ঘষতে ঘষতে সাবানটা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। কোনও গন্ধই নেই। সাবানে ভাল একটা গন্ধ থাকলে মনটা খুশি হত। স্নান করে এসেও তাই তেমন তৃপ্তি হ'ল না।

এসে হাল্কা স্লেট রঙের শাড়িটা পরল। এবার গিয়ে নিয়ে এসেছে। এই শাড়িটা পরলে ওকে খুব সুন্দর দেখায়। সুন্দর দেখানো পাপ না অপরাধ! কেন পরবে না। অনেক দিন আগে এর সঙ্গে রঙ ম্যাচ করিয়ে কানের রিং কিনেছিল, পাথরের, গলার মালাহার, হাতের বালা। কিসের তৈরি কে জানে। গালার হয়তো। বেশ হাল্কা।

ওগুলো পরলে ওকে বেশ সুন্দর দেখায়, কিন্তু অমিতা পরতে দেয়নি। ওসব ওর পছন্দ নয়। বলত, পরতে হ'লে সোনা পরো, সেটিং পরো।

ছেলের বউকে সুন্দর বানিয়ে রাখায় ওর আগ্রহ ছিল না, দামি বানিয়ে রাখতে চাইত।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একে একে ওগুলোই পরল জয়া।

সাজতে পাওয়াই কি কম আনন্দের। ওকে এ চেহারায় দেখলে মা কি রাগ কববে।

মুকুল শুয়ে শুয়ে তখনো পিঙ্কুর সঙ্গে অনর্গল কথা বলে চলেছে।

—মা, আমি একবার বেরোচ্ছি। পিঙ্কু তোমার কাছেই থাক।

মুকুল উঠে বসল। তাকাল জয়ার দিকে। মুখে এক টুকরো স্মিত হাসি ফুটে উঠল। হয়তো জয়াকে সিল্কের শাড়িটায় সুন্দর দেখাচ্ছে বলেই। মেয়েকে সুন্দর দেখালে মায়েরই তো ভাল লাগার কথা।

পিঙ্কু ততক্ষণে লাফিয়ে নেমে এসেছে, বায়না ধরেছে। মা, আমিও যাব।

—না, না, আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি।

মুকুল প্রশ্ন করল, কোথায় যাবি ?

—মীনার কাছে। ওদের বাড়ি।

মুকুল বললে, পিঙ্কুকেও নিয়ে যা তা হ'লে। ওর তো বন্ধু আছে, ওখানে খেলবে তার সঙ্গে।

জয়ার ভিতর থেকে যেন একটা বিদ্রোহ ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল। পিঙ্কুকে নিয়ে যেতে বলছে কেন মা ? মা কি কিছু সন্দেহ করছে। এত খারাপ ভাবছে আমাকে। শুধু একটা সিল্কের শাড়ি পরেছি, একটু সাজগোজ করেছি বলে। নাকি, কে কি বলবে সেই ভয়। এখনো মা'র লোকভয় গেল না। এত কিছুর পরেও।

পিঙ্কুর ওপরও একটু রেগে গেল জয়া।

হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাল সার্টপ্যান্ট পরাল।—চল।

ভিড়ের বাসে এখন ওকে নিয়ে যাওয়া কি হাঙ্গামা তা তো মা বোঝে না।

মা'র ধারণা ছেলেটা সঙ্গে থাকলেই তেমন কোনও ভয় নেই। কিংবা পাড়াপড়শি কেউ দেখলে সাতখুন মাপ। যেন তাদের আর তোয়াক্কা করে জয়া। নাকি মা ভাবছে, শ্বশুরবাড়ির কেউ যদি দেখে ফেলে, ওই ছেলেটাই সিল্কের শাড়ি পরার দোষটা ঢেকে দেবে। মা'র হয়তো তাই ধারণা।

বাস থেকে নেমে মীনাদের বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে মুখে একটু হাসি এসে গিয়েছিল।

মীনা আজ আবার কি বলবে কে জানে।

পিঙ্কুদের স্কুলের সামনে ওই রোয়াক না সিঁড়ির ধাপিতে বসা ওদের ক্লাবে সবাই ঠেসাঠেসি করে বসে বটে, কিন্তু ওরা ছোট ছোট দল হয়ে গেছে। তবে স্কুল কিংবা আন্টি নিয়ে আলোচনা সব দলেই ঘুরেফিরে গিয়ে পৌঁছয় পরনিন্দা অথবা পরচর্চায়।

জয়া জানত ওকে নিয়ে আড়ালে কিছু টীকাটিপ্পনী চলে। প্রথম দিন সুপ্রভাতের কিনে দেওয়া সাদা শাড়িটা, আঁচলে কালো অ্যাপ্লিকের কাজ, পরে গিয়েছিল।

পরে সেই শাড়িটাই। কানে হকার্স কর্নার থেকে কেনা সেই চৌকো কালো পাথর বসানো ট্যাপ।

সেটার দিকে চোখ যেতেই মীনা বলে উঠেছিল, তোকে আজ কি দারুণ লাগছে জয়শ্রী।

জয়া হেসেছে, হাসি চেপেছে। তারপর জিগ্যেস করেছে, কেউ কিছু বলাবলি করে নাকি রে ?

মীনা রেগে গেছে, কিংবা কেউ কিছু মন্তব্য করেছিল, তাই উত্তেজিত ভাবে বলেছে, বলুক না, তুই পরোয়া করবি কেন।

পরোয়া করেওনি জয়া। ওর যদি ইচ্ছে হয়, ভাল লাগে, অপরের কথায় কি যায় আসে। ওরা একদিন না একদিন চুপ করে যাবে।

একটু একটু করে ও কি ভাবে বদলে গেছে, নিজেই অবাক হয়ে ভাবে। কই, কেউ তো ওকে শুনিয়ে কিছু বলতে পারে না। কারো ভুরু কুঁচকে ওঠে না। উঠলেই বা কি।

জয়া তো দেখছে সাহস থাকলেই সকলে ভয় পেয়ে যায়। চুপ করে যায়। আমার সাহস আছে, কারণ আমার মধ্যে হিপোক্রিসি নেই। যখন সত্যি দুঃখ ছিল, শোকে অভিভূত, তখন নিয়মকানুন মেনে শোক পালন করেছি। এখন আর শোক নেই, এমনকি দুঃখও ভুলে গেছি, নিকেল ফ্রেমে আঁটা ছবিটা দেখি মাঝে মাঝে, কিন্তু সেই জীবন্ত মুখখানা ঝাপসা হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে এখন আর কোনও মোচড় দেয় না। এটাই হয়তো নিয়ম, সকলেরই হয়। পুত্রশোকও তো মানুষ ভোলে। খায় দায়, গল্প করে, প্রাণ খুলে হাসে। ভুলে যাওয়াই হয়তো জীবন।

ভুলে কি আর যায় ! জয়াও ভোলেনি। স্মৃতি হয়ে একটা গোপন কৌটোর মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে। রাতের শূন্যতায় কখনো কখনো সেই কৌটো খুলে দু'এক টুকরো স্মৃতি

বের করে আনত। নাড়াচাড়া করে আবার রেখে দিত। এখন সেটুকু করতেও ভুলে যায়।

দুঃখের সেই জ্বালা নেই, শোকের সেই বিহ্বলতা নেই, তবু শরীরে মনে বৈধব্য জড়িয়ে রাখা তো হিপোক্রিসি।

কিন্তু কিছুই যদি নেই তবে মনের মধ্যে এই শূন্যতা কেন। এক এক সময় এত একা লাগে, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়. কেন ? অথচ ওর মন তো সুকল্যাণকে খোঁজে না।

এই একা মনে হওয়াও বড় দুঃসহ।

সেজন্যেই ও বেরিয়ে পড়েছে।

মীনা বলেছিল, যখনই একা লাগবে চলে আসিস আমার ওখানে।

ইরা বলতে পারেনি। ওর বাড়ির পরিবেশ হয়তো জয়াকে মেনে নিতে পারবে না, জয়ার এই নিয়ম না মানার ঔদ্ধত্য। তাতে জয়ার কিছু যায় আসে না।

মীনার কাছে কিংবা ইরার কাছে গেলেই কি ওর নিঃসঙ্গতা ঘুচে যাবে! শুধু সময় কাটবে হয়তো। সময়ই তো ওর কাছে এখন সবচেয়ে বড় বিভীষিকা। সেজন্যেই চাকরির কথা ভেবেছে। ছবি আঁকা কিংবা গান শেখার কথা ভাবছে।

কিভাবে একজন মানুষ শুধুই মানুষ হয়ে ওঠে ওর জানা নেই। স্বাধীন হওয়া কাকে বলে তাও বুঝতে পারছে না। হতে চায় কিনা, তাও না।

মীনা অবাক হয়ে গেল, একমুখ আপ্লুত হাসি নিয়ে বললে, তুই ? এসেছিস ? আয় বোস।

জয়া সবে বসেছে, সঙ্গে সঙ্গে, এই উঠে দাঁড়া। দেখি তোকে।

'উঠে দাঁড়া' বলতেই হকচকিয়ে গিয়ে ও সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়িয়েছে।

মীনার চোখ আপাদমস্তক জয়াকে দেখে বলে উঠেছে, বাসে কতজন তোর দিকে তাকিয়েছে বল তো ?

জয়া হেসে ফেলে বলেছে, একজন অসভ্যের মতো ধাক্কা দিয়েছে।

ব'লেই পিঙ্কু সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। কোথায় পিঙ্কু, ও তার বন্ধুর কাছে চলে গেছে ইতিমধ্যে। এ বাড়ির সব ঘাঁতঘোঁত ওর জানা। বন্ধুর জন্মদিনে ছাড়াও আরো একবার এসেছিল। জয়ার সঙ্গেই।

মীনাদের অবস্থা খুবই সচ্ছল। কোথাও কোনও অনটন আছে বলে মনেই হয় না। ওদের কিসের যেন ব্যবসা। শ্বশুর নেই। মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। শাশুড়ি আছে।

ওই একটা ভয় কিংবা সঙ্কোচ ছিল জয়ার।

জিগ্যেস করল, শাশুড়ি কোথায় ?

মীনা হাসল।—গুরুর কাছে। ওঁর একটা গুরু আছে না ? আমাদের তো দীক্ষা নেয়ার জন্যে জ্বালিয়ে খান। ব'লে হাসল।

স্বস্তি পেল এবার জয়া।

জমিয়ে গল্প করা যাবে। গল্পের দৌড় তো সেই সিনেমা অবধি। মীনা কি কি সিনেমা দেখল তারই বৃত্তান্ত। তারপরই একটা নতুন ছবির কথা।

বললে, চল দু'জনে দেখে আসি একদিন।

জয়া বললে, ঠিক আছে, যাব।

বলেই একটু অবাক হয়ে গেল ভিতরে ভিতরে।

মনে পড়ে গেল সেই স্কুল কলেজের দিনগুলো। সুস্মি ঠাট্টা করে বলেছিল, তুই প্রেম

করতে গিয়েও বলে বসবি মাকে জিগ্যেস করে আসি।

ও কি তাহলে সত্যি সত্যি আমি হয়ে উঠছে। কই একবারও তো মনে হ'ল না মা কিছু মনে করবে কিনা ? বাবা কিছু বলবে কিনা ? শ্বশুরবাড়ির কেউ দেখে ফেলবে কিনা, কিংবা দেখে ফেললে কি হবে ! তা হ'লে কি ওর পায়ের বেড়িটা খুলে যাচ্ছে ?

কিন্তু কেন ? ওর সাহস ওকে স্বাধীন করে দিল নাকি ? কিন্তু সাহসটা দিল কে ? সুকল্যাণই দিয়ে গেছে বোধহয়। নিজের জীবন দিয়ে।

জি এম ভদ্রলোক বারবার বলছিলেন, কমপেনসেশন কমপেনসেশন।

ক্ষতিপূরণের ওই টাকাটাই হয়তো।

সবাই বলেছে, অনেক টাকা। অথচ সেই টাকা ওকে কেবলই ভয় দেখায়। মনে হয় পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথার ওপর ছাদ নেই। কারণ ও এখন আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। কেবলই মনে হচ্ছে সকলেই হাত বাড়িয়ে আছে।

—ছুটকুর বিয়ের কথা হচ্ছে বুঝি ? বাবা জিগ্যেস করেছিলেন।

—তোর তো এখন অনেক টাকা। তুই তো বলেছিলি যা ক্যাপিটেল লাগে দিবি, অনেক টাকা হ'লে। ভাইয়া হাসতে হাসতে বলছে।

জয়া শুনতে পাচ্ছে, শাশুড়ি বলছে, সুকু তো মাসে মাসে সংসারখরচে মাইনের টাকাটা দিত।

জয়া দেখতে পাচ্ছে বাবা একটা একটা ঘরে ঢুকছে আর সীলিং দেখছে, দেয়াল দেখছে। —এবার না সারালেই নয়।

এত সাহস দেখিয়েও ওর বুকের মধ্যে একটা অনন্ত ভয়। এই যে এত একা মনে হয়, এই শূন্যতা, তবে কি ও নিজেকে ভীষণ নিরাশ্রয় ভাবছে ? এত টাকা থেকেও ?

হঠাৎ কলিং বেল বাজতেই তন্ময়তা ঘুচে গেল।

মীনা কি সব অনর্গল বলে যাচ্ছিল ওর কানেই যায়নি। আসলে ও এখানে ছিলই না, অন্য কোথায় চলে গিয়েছিল।

কলিং বেল-এর আওয়াজ শুনেই মীনা ডাক দিল, পার্বতী।

পার্বতী কাজের লোক, ওকে একটু আগে চা বানাতে বলেছে মীনা।

সে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দারুণ চটপটে চেহারার একজন সহাস্য ভদ্রলোক যেন ছুটতে ছুটতে, প্রায় লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল।

—এই যে মীনুমাসি !

বলেই জয়াকে দেখে থমকে গেল। কিন্তু একটুও অপ্রতিভ হ'ল না।

মীনা তার দিকে তাকিয়ে বললে, চুপ করে বোসো নান্টুদা।

বাঁ হাতে ঝট করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। সে বললে, পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, পেয়েছ ? তোমার হরিণঘাটা ?

মীনা বললে, পেয়েছি।

তারপর জয়ার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মীনা বললে, শোন্ জয়া, ভাবিস না বয়সে লুকিয়েছি। বরং ও-ই মীনুমাসি ব'লে বয়েস লুকোচ্ছে।

ওরা দু'জনেই হেসে উঠল। জয়া তখনো সঙ্কোচে লজ্জায় একটু জড়োসড়ো। ভাল করে ভদ্রলোককে তাকিয়ে দেখতেও পারছে না।

মীনা বললে, আমি সম্পর্কে ওর মাসি সত্যি, কিন্তু ও বয়েসে বড়ো ব'লে নান্টুদা বলি।

ভদ্রলোক দারুণ স্মার্ট, নাক টিকলো, চোখ ধূর্ত না বুদ্ধিদীপ্ত বোঝা দায়।

ভদ্রলোক চট করে উঠে দাঁড়াল। —লেট মি ইনট্রোডিউস মাইসেল্ফ। আমি অনিমেষ চ্যাটার্জি, পাঁচ ফুট নয়, ওজন পঁচাত্তর কিলো, চশমার লেন্স মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ,

বয়েস তেত্রিশ, অফিসে বস্-এর কাছে গুড ফর নাথিং, মীনামাসির কাছে মুশকিল আসান, হরিণঘাটার কার্ড, স্কুলে ভর্তি করানোর ইনফ্লুয়েন্স জোগাড় করা, গ্যাস সিলিন্ডার তাড়াতাড়ি পাইয়ে দেওয়া অ্যান্ড এটসেটরা এটসেটরা এটসেটরা।

মীনা আর জয়া অনিমেষের ভাবভঙ্গি দেখে তখন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। মীনা হাসতে হাসতে বললে, এ আমার বন্ধু জয়শ্রী।

জয়া একটু সঙ্কুচিত ভাবে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নমস্কার করল।

অনিমেষ হাত দুটো নেড়ে বলে উঠল, ও নো নো। ওই সব নমস্কার করা, স্যালিউট করা, স্যার কিংবা ম্যাডাম বলা এসব আমার ধাতে নেই। উই আর জাস্ট ফ্রেন্ডস।

মীনা তখনো হাসছে। জয়াও।

জয়ার বেশ ভাল লাগছিল অনিমেষকে। টিকলো নাক, আর চঞ্চল চোখ দুটোতেই কি একটা টান আছে। তার ওপর এই চটপটে ভাব, কথাবার্তায় হাসি ছিটোনো প্রগলভতা।

কিন্তু অনিমেষ ওকে অবিবাহিত কুমারী মেয়ে ভেবে বসেনি তো ? ওর তো সিঁথিতে সিঁদুর নেই, বেশবাস দেখেও কিছু বুঝবে না। তেমন কিছু ভেবে বসলে বিপদ। জয়াকে কখন কি অস্বস্তিতে ফেলে দেবে কে জানে।

সেজন্যেই জয়া হঠাৎ ডাক দিল, পিঙ্কু!

আর মীনা মনে পড়ে যেতেই বললে, নান্টুদা, তোমাকে বলেছি বোধহয়, আমার এই বন্ধুর ছেলেকেও একটা ভাল স্কুলে...বেচারির স্বামী...

অনিমেষ বলে উঠল, ও আপনি ? বলেই থমকে গিয়ে উচ্চারণ করল, সো স্যাড।

ব'লে একটা বিষণ্ণতা দেখাল।

পিঙ্কু ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।—মা আরেকটু থাকো।

আর অনিমেষ বললে, এ লাভলি চাইলড। বলেই পিঙ্কুকে ডাকল, এসো, একটা ম্যাজিক দেখাব।

ব'লে হাত ধরে ওকে কাছে টানল।

পিঙ্কু কাছে গেলও। নতুন লোক দেখলে বড় একটা যায় না।

মীনা বললে, পিঙ্কুর স্কুলের ব্যবস্থাও কিন্তু নান্টুদা তোমাকেই করতে হবে।

অনিমেষ বললে, সিওর। তোমার ছেলের যদি বা না হয়...

মীনা চিৎকার করে উঠল, এই না। দু'জনেরই চাই।

অনিমেষ তখন নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে।

—যাক্ উঠি। ব'লেই অনিমেষ উঠে দাঁড়াল একটু পরেই।

জয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, আবার কবে দেখা হচ্ছে বলুন।

জয়া অপ্রতিভ হ'ল। আবার দেখা হওয়ার কথা কেন। জয়া কি বলবে, কি উত্তর দেবে ঠিক করতে পারল না।

একটু হাসার চেষ্টা করে বললে, এখানেই হবে হয়তো।

ব'লে উঠে দাঁড়াল। অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার ভঙ্গি করেছে, উঠে দাঁড়ানোই শোভনতা। মীনাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

—এখানে ? এই মীনুমাসির মতো একজন গার্জেন সামনে রেখে গল্প ? জমবে না।

মীনা শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, নান্টুদা, একা পেলেও লাভ নেই। জয়শ্রী ভীষণ স্ট্রিক্ট প্রিনসিপলের মেয়ে। আর তোমাকেও চিনতে বাকি নেই, কোনও মেয়ের সঙ্গে একা হ'লেই তোমার মুখে কথা ফোটে না।

অনিমেষ লজ্জা পেয়ে গেল। এই এতক্ষণে। বোধহয় কথাটা সত্যি।

—বলুন। অনিমেষ আবার বললে।—কবে দেখা হচ্ছে ?

এত খোলামেলা কথায় জয়ার অপ্রতিভ ভাবটাও কেটে গেছে। ও হেসে মাথা নেড়ে বললে, হবে।

যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমন দ্রুত চলে গেল অনিমেষ। একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে।

জয়ার মনে হ'ল একবার পিছন ফিরে তাকাল না কেন ? ও তো আশা করেছিল। কেন আবার, শুধু ওর সপ্রতিভ ভাবভঙ্গির জন্যে। কথাবার্তার জন্যে। নাকি পিঙ্কুকে ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার একটা আশা দিয়ে গেছে বলে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল হয়তো।

—ম্যাজিক দেখাল না। আ ব্যাড বয়।

পিঙ্কুর কথায় মীনা আর জয়াও হেসে ফেলল। জয়া ভাবল, হয়তো ভুলে গেছে, কিংবা জানেই না। ম্যাজিক।

ফেরার পথে বারবার ওই শব্দটা জয়ার মাথায় ঘুরতে লাগল। ম্যাজিক।

সত্যিই ম্যাজিক দেখিয়ে গেছে নাকি অনিমেষ। জয়া যেদিকে তাকাচ্ছে সব ভাল লাগছে কেন। বাসের ভিড়কে অসহ্য মনে হচ্ছে না। রাস্তাঘাট, দু'পাশের বাড়ি এমন কি রিকশার ঠুং ঠাং আওয়াজটাও কি মিষ্টি লাগছে।

অথচ জয়া তো আর প্রেমে পড়ে যায়নি। প্রেম এত সস্তা নয়। আর অনিমেষও সে ধরনের মানুষ নয় বলেই মনে হ'ল। ধীরে সুস্থে বসে একটা মেয়ের মুখ মনে করার মতো সময়ই ওর নেই। প্রাণবন্ত একটা মানুষ, ওই প্রাণই ওকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

বাস থেকে নেমে বাড়ির দিকে যেতে যেতে সুকল্যাণকে মনে পড়ে গেল। মুখখানা এক ঝলক ভেসে উঠল যেন। সুপ্রভাতের মুখটাও একবার দেখতে পেল। তারপর আবার অনিমেষের মুখ।

এমন তো কখনো হয় না। সারা পৃথিবীটাই কেমন সুন্দর লাগছে। বুকের ভেতরে কোনও শূন্যতা আছে বলে মনে হ'ল না। একা লাগছে না।

সত্যি ম্যাজিক। ম্যাজিক দেখিয়ে গেছে অনিমেষ।

॥ ৯ ॥

জয়া একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। এই দৃশ্যটা ও বারবার দেখেছে। এই ক'মাসে কতবার দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই।

মেজদিকে নিয়ে মেজজামাইবাবুও সেই একবার এসেছিলেন সুকল্যাণ মারা যাওয়ার পর। জয়া তখন শ্বশুরবাড়িতে, শোকে বিহ্বল, সাদা থান কাপড়ে বিধবার সাজে।

স্পষ্ট মনেও নেই জয়ার। শুধু একটা অস্পষ্ট ছবি মনে পড়ে। মেজদি ওর পিঠে হাত রেখে নিথর নির্বাক বসে আছে। বোধহয় সান্ত্বনা দিতে চাইছে। অথচ জয়ার কাছে তখন কোনও সান্ত্বনা নেই। ও তখন একটা প্রাণহীন জড়পদার্থ।

তার পর আরো একবার এসেছিল ওরা। জয়া তখন পদ্মপুকুরের এই বাড়িতে। বাবার কাছে। একটু একটু উঠে দাঁড়াচ্ছে তখন। নিজেকে বদলে ফেলার চেষ্টা করছে।

মেজদি আর জামাইবাবুর মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

—আসতে পারলি তোরা ? জামাইবাবু তো আমাকে ভুলেই গেছেন। এত অবাক হয়ে কি দেখছেন ?

মেজদি হাসল, জয়ার হাতখানা ধরে বললে, ভাল ভাল লাগছে রে ফুটকি, বড় ভাল লাগছে।

আসলে জামাইবাবু অবাক হয়ে কেন দেখছিলেন জয়া বুঝতে পারেনি। মেজদির কথায় বুঝতে পারল। ও নিজেই যে ভুলে গিয়েছিল, বুঝবে কি করে।

ওরা মুখে দুঃখ-দুঃখ ভাব করে আসছিল, চোখে-মুখে বিষণ্ণতা। ভেবেছিল, একটা শ্বেতশুভ্র শূন্যতার মূর্তি দেখতে পাবে। একটা শোকাহত স্থিরবিদ্যুতের ছবি। যা ওদের মুহূর্তে বিমর্ষ করে দেবে।

তার বদলে একটা হাসি-হাসি মুখ অভ্যর্থনা জানাল ওদের।

এই চেহারাখানা ওদের কাছে অচেনা। একেবারেই অচেনা। নিজেকে যতখানি সম্ভব ম্লান করে রাখার মতো রঙে জয়া নিজের শরীর জড়িয়েছে। কানে সোনা না থাক সস্তা সবুজ পাথরে, হাতে গালার সাদা-সবুজ বালায়, গলার নীচের শঙ্খসাদা নিরাভরণ তটে কি যে ছিল। ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

জামাইবাবু অবাক হয়েছিলেন ঠিকই, পরমুহূর্তে বিস্ময় চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, দারুণ ভাল লাগছে। এই তো চাই, উঠে দাঁড়াও, তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে।

উৎসাহ দেবার জন্যেই কথাগুলো, কিন্তু শুনে বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল জয়া।

আজ এতদিন বাদে আবার মেজদি আর জামাইবাবু এসেছেন।

দ্বিধাদ্বন্দ্বের একটা খাদের ধারে ও দাঁড়িয়ে আছে। ভেবেছিল ও খুব সাহসী। ও তো এখন আর কারো পরোয়া করে না। কে কি বলল কিচ্ছু যায় আসে না।

জয়ার মনে পড়ল ও 'আমি' হয়ে উঠতে চেয়েছিল। যেন তা হ'লেই জীবন পূর্ণ হয়ে যাবে। তার জন্যে পথ খুঁজেছে। চাকরি করবে কিনা ভেবেছে। জি এম ভদ্রলোক হয়তো এখনো সহানুভূতি দেখাবেন। একবার ভেবেছে আবার নতুন করে ছবি আঁকা শিখবে। কিংবা গান। ও তো ভালই গাইতে পারত।

এখন মনে হচ্ছে ওসব দিয়ে শুধু সময় কাটানো যায়। নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখা যায়, তার বেশি কিছু নয়। ও শুধু ভুলে থাকা।

অনিমেষ প্রথম দিনেই এমন একটা ম্যাজিক দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, যে জয়া বুঝতে পেরেছিল ও রাতারাতি বদলে গেছে। ওর কাছে পৃথিবী আবার সুন্দর হয়ে উঠেছে।

এখন জানে একা একা 'আমি' হওয়া যায় না। অনেক অনেক টাকা থাকলেও। যে টাকা অনেকের অভাব মেটাতে পারে না সে টাকা নিয়ে বেশি দূর যাওয়া যায় না, সে টাকা শুধু শুধু নিজেকেই ভয় পাওয়ায়, অপরকে বিশ্বাস করতে দেয় না। স্বার্থপর করে তোলে।

জয়া একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। এই দৃশ্যটা ও বারবার দেখেছে। এই ক'মাসে কতবার দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই।

বাস থেকে পেট্রোল পাম্পের পাশের রাস্তা ধরে এসে ডান দিকের সরু গলিটায় ঢুকেও বারান্দাটা দেখা যায় না। কাঠগুদামটা বেআইনিভাবে খানিকটা এগিয়ে এসেছে বলেই আড়াল পড়ে যায়।

আরো একটু এগিয়ে এল জয়া। এবার বারান্দা দেখা যাচ্ছে, বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। আজকাল বারান্দায় কেউ দাঁড়ায় না। কখন ভেঙে পড়বে তার ঠিক নেই।

বাড়ি ফিরেই মেজদির গলা শুনতে পেল। জামাইবাবুরও।

দ্রুতপায়ে ভেতরে ঢুকল জয়া। বাবা-মা'র সঙ্গে ওরা গল্প জুড়ে দিয়েছে। এ বাড়িতে এখন আর কোথাও শোকের ছায়া নেই। জয়ার নিজের মধ্যেই তো আর শোক নেই।

ওটা যেন শুধুই একটা দুঃস্বপ্ন!

—এতদিন কেন বিয়ে করেননি মশাই? অনেক তো বয়েস হ'ল। অনেক মেয়েকেই জিগ্যেস করেছেন, আবার কবে দেখা হবে। কেন করেননি, উঁ?

জয়া প্রশ্ন করেই হাসতে শুরু করেছে। মীনাও হাসছে।

আর অনিমেষ বলছে, বিলিভ মি, স্রেফ একটা কারণেই বিয়েটা হয়ে ওঠেনি। দেয়ার্স ওনলি ওয়ান রিজন। কারণ, আপনার সঙ্গে আগে দেখাই হয়নি।

মীনা বলছে, সাবধান, ও খবু ফ্ল্যাটারি করতে জানে, বিশ্বাস করিস না।

অনিমেষ বললে, আমি ফ্ল্যাটারিতে বিশ্বাস করি না, লটারিতে করি। এতদিনে টিকিট উঠল।

ফেরার সময় জয়ার মনে হয়েছিল, ইস্, আরেকটা চটকদার কথা বলা যেত। বলা যেত, মশাই, টিকিটটাই যে জাল।

বলা হয়নি।

জয়ার বুকের ভেতরটা কি যেন চাইছে। কি সেটা ? ঠিক ধরাছোঁয়া যাচ্ছে না। এর নাম কি কখনো প্রেম হতে পারে ? কখনো না। এ একটা রঙ, যে রঙ কোথাও দেখা যায় না। অথচ সাদা সাদা বাড়িগুলোকে কেমন রঙিন করে দেয়, কালো কালো রাস্তাগুলো রঙিন হয়ে ওঠে, সব মানুষের মুখ, জয়ার বুকের ভেতরটা, ওকে যে সাদা থান কাপড়টা অদৃশ্য হয়েও জড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে, তাকেও রাঙিয়ে দেয়।

সুকল্যাণের মুখ ভেসে উঠেছে এক একবার। এমন কি সুপ্রভাতের, সেই গোবেচারির মুখ, যা দু'খানা দশ টাকার নোটে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, কিংবা জয়ার পক্ষ নিয়ে তার নিজেরই বাবা-মা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠত। এমনকি ওই মেজজামাইবাবু। এখন অনিমেষ।

এরা কারা ?

কেউ বুঝবে না, কেউ বুঝবে না।

কেউ ভাববে ও নিরাপত্তা খুঁজছে। ওই অনেক টাকা আর যাই দিক, নিরাপত্তা দিতে পারে না ব'লেই। কেউ ভাববে ওই ফাঁকা ফাঁকা বিছানায় শুয়ে ওর হাত বুঝি কাউকে হাতড়ে বেড়ায়।

আসলে ওর সমস্ত মন একজন সঙ্গী খুঁজছে। যে সঙ্গ মীনা কিংবা ইরা দিতে পারে না। মা নয়, ছুটকু নয়। এমন একজন যার মধ্যে সুকল্যাণ আছে। সুপ্রভাত আছে, বাবা কিংবা ভাইয়া, এমনকি ওই বৃদ্ধ শ্বশুর।

ওদের সকলকেই হারিয়েছে জয়া। ওই অনেক অনেক টাকার জন্যে। সুকল্যাণ যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে গেছে, তা আসলে ক্ষতিই। একটা বিশাল বড় ক্ষতি।

এখন মনে হচ্ছে ওদের সকলকেই ফিরে পেতে পারে, একজনের মধ্যে।

জয়া বললে, মেজদি শোন। তোর সঙ্গে কথা আছে।

ওরা দু'বোনে পাশের ঘরে এল।

দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে জয়া। বহুবার দেখেছে।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মেজদি। —তুই কি পাগল হয়ে গেছিস নাকি ? কি বলছিস তুই ?

স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে মেজদি।

বলছে, তোর জন্যে আমি যে শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাতে পারব না।

জয়া হেসে উঠল। —আমি যে মাছ খাই তোর শ্বশুরবাড়িতে সেকথা জানাতেও তো তোর লজ্জা।

মেজদি রেগে উঠে চলে গেল। এখন গিয়ে হয়তো জামাইবাবুকে বলবে, কিংবা তাও পারবে না। বাবাকে মাকে গিয়ে সাবধান করবে। কিংবা...

জানার আগ্রহও নেই জয়ার।

একটা দামি রেস্তরাঁয় এসে বসেছে জয়া। জয়া আর অনিমেষ।

জয়ার ঠোঁটে স্মিত হাসি, কিন্তু ভিতরটা থিরথির করে কাঁপছে।

—এই তো দিব্যি আসতে পারলেন। এত ভয় পাচ্ছিলেন কেন, আমি বাঘ না ভালুক। ভয় দেখানো, তাও মেয়েদের! ইটস নট মাই প্রফেশন।

জয়া কৌতুকে হাসল। —প্রফেশনটা কি? আরো গুরুতর কিছু?

অনিমেষ হাসল। বললে, আসলে আমি তো কথা বিক্রি করি।

—কথা বিক্রি? হেসে উঠল জয়া।

—হ্যাঁ। সেল্‌সে ছিলাম, এখন সেলস্‌ ম্যানেজার। তবে যে যাই বিক্রি করুক, আসলে জানবেন সেটা কথা বিক্রি। তাই ইট হ্যাজ বিকাম এ হ্যাবিট উইথ মি। আমি তো জানতাম না আমার কথাকেও কেউ ভয় পেয়ে বসবে।

জয়া লজ্জা পেল। বললে, ভয় আপনাকে নয়। ভয় চারপাশের লোকদের।

চারপাশের লোক বলতে কাদের কথা বলতে চেয়েছিল জয়া? বাবা মা? মেজদি? নাকি শ্বশুরশাশুড়ি, সুপ্রভাত? ছুটকুও?

জয়া এখন একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। এই দৃশ্যটা ও বারবার দেখেছে। এই ক'মাসে কতবার দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই।

বাবা প্রচণ্ড রেগে গেছে। বোধহয় মেজদির কাছেই শুনেছে সব।

—তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কি বলছিস তুই? তোর একবারও পিঙ্কুর কথা মনে হ'ল না! বাবা থরথর করে কাঁপছে।

জয়া বিদ্রূপের হাসি হাসল। এখন আর কারো কথা ওকে স্পর্শ করছে না।

ও এতকাল পৃথিবীটাকে যেভাবে দেখে এসেছে, এখন তার চেহারা গেছে একেবারে বদলে। এ পৃথিবী বড় সুন্দর। এ পৃথিবীতে নিজেকে একা মনে হয় না। জয়া ধীরে ধীরে বললে, সারাজীবন তো সকলের কথা ভেবে এলাম বাবা, এবার একটু নিজের কথা ভাবতে দাও।

মনে মনে বললে, বিয়ের আগে শুধু তোমাদের কথা ভেবেছি। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির কথা। বিধবা হয়ে কে কি ভাববে তার কথা। আমাকে অনেক কষ্টে সাহস পেতে হয়েছে।

বাবাকে ভীষণ অসহায় লাগছে। —লোকে কি বলবে সেকথা ভেবেছিস? চার বছরের একটা ছেলে তোর, তুই শেষে...

বাগে ফেটে পড়তে চাইল জয়া। তবু নিজেকে সংযত করে ধীরে ধীরে বললে, কেন বাবা, এখন তাদের কথা ভাবছ কেন! তুমি তো তাদের কথা ভাবনি, যখন জোর করে মাছ খাইয়েছিলে, নাটক করেছিলে।

বাবার চোখে অবাক আহত দৃষ্টি। —নাটক করেছিলাম, তুই বলতে পারলি?

—নাটকই তো? তোমরা একটুও বদলাওনি। তোমরা সবাই একরকম। শাশুড়ি বলেছিল, ঘোমটা দিতে হবে না। তাহলেই যেন কত মডার্ন। তুমি ভেবেছিলে মাছ খাওয়াতে পারলেই সব দুঃখ ঘুচে যাবে। কিন্তু কেউ তোমরা আমার কথা ভাবনি।

জয়া মনে মনে ভাবল, আমি আবার বেঁচে উঠতে চাই। আমার কাছে এখন আর পুরনো পরিচয়গুলোর কোনও দামই নেই। আমি কারো মেয়ে হব না, কারো পুত্রবধূ নই, আমি কারো বিধবা স্ত্রী নই, কারো মা নই। আমার জীবন শুধু কর্তব্য নয়। আমি ভালবাসা দেখতে পেয়েছি। তাই কর্তব্য নিয়ে নয়, ভালবাসা দিয়ে ওদের ভালবাসতে চাই। পিঙ্কুকেও।

অনিমেষ ওর হাতখানা ধরেছে, চাপ দিচ্ছে। —আস্ক ইওর মাইন্ড। তোমাকে মনঃস্থির

করতে হবে। হ্যাঁ কিংবা না। ইয়েস অর নো। অন্যে কি কি বলছে, বলবে, তার কোনও দাম নেই। তোমার নিজের কথা তোমাকেই বলতে হবে।

অনিমেষ অপেক্ষা করছে। জয়াকে তার নিজের কথা নিজেকেই গিয়ে বলে আসতে হবে। অথচ কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছে না ও। নাকি ওর নিজের কথা কেউই ওকে বলতে দিতে চাইছে না।

মা'র চোখে জল। বলছে, তুই স্বার্থপর, স্বার্থপর। কারো কথা ভাবছিস না।

হ্যাঁ মা, আমি সত্যি স্বার্থপর। আমি সমাজের কথা ভাবি না, আমি লোকলজ্জার কথা ভাবি না। আমি নিজের কথা ভাবছি।

কারণ একজন মানুষ এই শূন্যতার মধ্যে, এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমার বুকের ভেতরটা ভরিয়ে দিয়েছে। লোকটা ম্যাজিক জানে। তখনই একটা খালি কৌটো, তখনই তা থেকে একটা রুমাল, রুমাল নিমেষে একটা জীবন্ত পায়রা, অনিমেষও তেমনি মুহূর্তে জয়ার বুকের ভেতরের শ্বেতবৈধব্যকে রঙে রঙে বদলে দিয়েছে, ওকে একটা উড়ন্ত পায়রা বানিয়ে দিয়েছে, জয়াকেই বদলে দিয়েছে।

—না জয়া, ম্যাজিসিয়ান আমি নই, তুমিই আমাকে বদলে দিয়েছ। কাউকে সত্যি সত্যি ভালবাসা বড় কঠিন কাজ, ইটস্ সো ডিফিকাল্ট। সকলে শুধু চাইতে জানে, ভালবাসতে পারে ক'জন। আমি তো পিঙ্কুকেও ভালবেসে ফেলেছি। সে এখন আমার মনে হয়।

জয়া হাসছে।—আমি এতদিনে আমাকেই ভালবাসতে শুরু করেছি।

কিন্তু সেই দৃশ্যটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না জয়া।

—তুই আমাকে বোঝাতে আসিস না। চার বছরের একটা ছেলে তোর, তাকে নিয়ে কেউ তোকে বিয়ে করতে পারে ? ও তোকে তোর টাকার জন্যে বিয়ে করছে। শুধু ওই টাকা!

জয়া ভেঙে পড়ে বলছে, মা, পায়ে পড়ি তোমার, ওই টাকা টাকা টাকা বলো না, ওটা আমার হাতের হাতকড়ি। পায়ের বেড়ি।

মা বলছে, না, ওটা তোর ভবিষ্যৎ, পিঙ্কুর ভবিষ্যৎ।

জয়া কেঁদে উঠল। বললে, আমার মধ্যে আর সন্দেহ ঢুকিয়ে দিও না মা। ওই টাকার জন্যে তোমরা জানো না, আমি বাবাকেও সন্দেহ করেছি, ভাইয়াকে ভয় পেয়েছি। ছুটকুর ওপর নির্মম হতে পেরেছি। ওটা এখন আমার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ওই টাকার জন্যেই আমি অনিমেষকেও ভয় পেতাম।

জয়া মনে মনে ভাবল, সত্যিই তো তাই। অনিমেষ বারবার প্রশ্ন করত, আমাকে এত ভয় কিসের আপনার ?

জয়া বলতে পারেনি। বলতে পারবে না কোনদিন।

আসলে ও নিজেও হয়তো জানত না। কখনো ভেবেছে মীনা কিংবা ইরা কী বলাবলি করবে, ওদের সেই রোয়াকে বসা আড্ডায়, কখনো বাবা-মা কিংবা ভাইয়া, কখনো ছুটকুরা বা মেজদি জামাইবাবু।

এখন আর একটুও ভয় নেই।

মেজদি এসে বোঝাচ্ছে। মা বোধহয় ওকে ডেকে আনিয়েছে। এই পাগল মেয়েটার মাথা থেকে ওসব দূর করে দেবার জন্যে। ওরা তো পারেনি, মেজদি যদি পারে।

মেজদি বলছে, মেয়েদের যৌবন আর কটা বছর রে ফুটকি, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। পিঙ্কু বড় হয়ে যাবে। তখন তোর নিজেরই অনুশোচনা হবে।

জয়ার চোখের দৃষ্টিতে তীব্রতা।—তোরা কি ভাবছিস জানি না। আমি ওসব

ভাবিনি। ভাবি না।

মনে মনে বললে, আমি শুধু জানি, আমার মধ্যেও ম্যাজিক আছে, আমিও একজনকে বদলে দিতে পারি, সে যে-ভাবে আমাকে বদলে দিয়েছে। আমাকে এতকাল পরে 'আমি' বানিয়ে দিয়েছে।

জয়া একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। এই দৃশ্যটা ও বারবার দেখেছে। এই ক'মাসে কতবার দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই।

নির্মলেন্দুর মুখখানা একেবারে বিবর্ণ ফ্যাকাশে। জয়ার সামনে জোড়হাত করে বলছেন, আমাদের এর চেয়ে বড় অপমান আর হয় না বৌমা।

জয়া না বলে বৌমা বললেন।

—তোমার সঙ্গে সুকুর সম্মান জড়িয়ে আছে, আমাদের সকলের। অমিতা বলছে।

'কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, তুমি এখানে এসে থাকো।' জয়ার মনে পড়ছে এরাই তো বলেছিল। এরা শুধু এই রঙিন শাড়ি আর মাছ খাওয়াইটাই দেখে। গর্ব করে ভাব দেখায় আমরা কত মডার্ন।

জয়া নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। বড় মায়া হচ্ছে এই লোকগুলির জন্যে, বাবা-মার জন্যেও। একজন মানুষের জন্যে এতগুলো লোক কষ্ট পাবে, মাথা নোয়াবে। ভাবলেও কষ্ট হয়। কিন্তু সেই একজন মানুষ যে জয়া নিজেই।

ছুটকুর দু'চোখে জল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জয়াকে জড়িয়ে ধরে বলছে, বৌদিভাই, তুমি তো বলেছিলে অনেক অনেক টাকা পেলে আমার বিয়েতে যা লাগে দেবে।

একটু থেমে বললে, দিতে হবে না, দিতে হবে না বৌদিভাই। কিন্তু আমার সর্বনাশ ক'রো না। তা হলে আমার আর বিয়ে হবে না। কে দেবে এ বাড়িতে বিয়ে!

ধীরে ধীরে জয়া বেরিয়ে আসছে ও-বাড়ি থেকে। এখন আর 'বাড়ি' নয়, এখন ও-বাড়ি। কোনওটাই যেন ওর বাড়ি নয়।

জয়ার মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা। অসহ্য একটা কষ্ট। ভয় হচ্ছে ও হয়তো নিজেই ভেঙে পড়বে।

চলে আসার মুহূর্তে অমিতা রেগে গিয়ে বলেছে, তা হ'লে পিঙ্কুকে আমাদের কাছেই দিয়ে যেও। ও আমাদের ছেলে।

বাবাও রেগে গিয়ে বলেছিল, পিঙ্কুকে এখানেই রেখে যাস্, ওর অযত্ন আমি সহ্য করতে পারব না।

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছে জয়ার। পরক্ষণেই হাসি পেয়েছে।

কি ভেবেছে এরা? পিঙ্কুকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে? নাকি ভয় দেখাতে চাইছে, ভাবছে পিঙ্কুকে ছিনিয়ে নেবে এই ভয়েই জয়া পিছিয়ে আসবে!

অনিমেষ অপেক্ষা করছে। বলেছিল অপেক্ষা করবে।

হ্যাঁ কিংবা না, ইয়েস অর নো। অন্যে কে কি বলছে, বলবে, তার কোনও দাম নেই। তোমার নিজের কথা তোমাকেই বলতে হবে।

জয়ার মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। এত চাপ কি একটা মানুষ সহ্য করতে পারে। তবু জয়া সহ্য করছে।

বাবার অসহায় মুখখানা ভেসে উঠল, চোখের কোণে জল। মা'র মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে। ভাইয়ার মুখখানা যেন কালো হয়ে গেছে। লজ্জায়। ওর বন্ধুরা কে কি বলবে সেই ভয়ে।

পাশাপাশি অনিমেষকে দেখতে পাচ্ছে। মুখে একটা উচ্ছ্বল হাসি। পিঙ্কুকে ম্যাজিক

দেখাচ্ছে একটা রুমাল নিয়ে। শিখে নাও বন্ধুদের দেখাবে।

জয়াকে বলছে, ম্যাজিক তো তুমিই দেখালে। আমাকেই বদলে দিলে।

অনিমেষ অপেক্ষা করছে।

হ্যাঁ কিংবা না।

বলেছে, তোমার নিজের কথা তোমাকেই বলতে হবে।

জয়া মনে মনে ভাবল, কি আশ্চর্য দ্যাখো, একটা মানুষ শুধু তার নিজের কথা বলতে চায়, অথচ এই সমাজ, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে, যেন কিছুতেই সে তার নিজের কথা না বলে।

একটা মানুষকে কেউই বুঝি তার নিজের কথা বলতে দিতে চায় না। 'আমি' হয়ে উঠতে দিতে চায় না।

বাবা দেখাতে চেয়েছিল, আমি খুব উদার, আমি আধুনিক, বিধবা মেয়ের কষ্ট দেখে নিজেই কষ্ট পাই।

ইরা বলেছিল, তোর মতো মডার্ন শাশুড়ি পেলে তো বর্তে যেতাম।

অমিতা বলেছিল, এখানে তোমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না।

এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর সহ্য হচ্ছে না জয়ার।

ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনঃস্থির করে ফেলল জয়া।

ও বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

কাঠগুদাম পার হয়ে রাস্তাটা, একটু গিয়েই পেট্রোল পাম্প, বড় রাস্তা। বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে জয়া।

বাস স্টপে দাঁড়াল। অপেক্ষা করল। অপেক্ষা করছে।

অনিমেষ অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করবে।

হ্যাঁ কিংবা না। আস্ক ইওর ইনার মাইন্ড। যেন জিগ্যেস করা এতই সহজ। যেন জিগ্যেস করলেই জানা যায়।

কিন্তু জয়া তো জানতে পেরেছে। ওর মনে হচ্ছে ও জানতে পেরেছে।

তোমার নিজের কথা তোমাকেই বলতে হবে।

ওই তো বাস আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। হাত তুললেই এসে দাঁড়াবে। আর তখনই উঠে পড়বে জয়া।

সেই প্রথম দিন, মীনার ওখানে, কয়েকটা মিনিট শুধু, নাকি আরো কিছুক্ষণ, পিঙ্কুকে কাছে টেনে নিয়ে অনিমেষ হাসতে হাসতে বলেছিল, এসো ম্যাজিক দেখাব তোমাকে।

সত্যি ম্যাজিক। সমস্ত পৃথিবী কেমন বদলে গেল। জয়া নিজেও। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, সব বিষণ্ণতা, জয়ার নিজের একা হয়ে যাওয়া যেন সুকল্যাণের মুখের মতো আবছা আর অস্পষ্ট হয়ে গেল। সারা রাস্তা জুড়ে যেন শুধুই কৃষ্ণচূড়া, মাথাভর্তি কৃষ্ণচূড়া নিয়ে গাছগুলো সব আড়াল করে দিয়েছে। সাদা থান কাপড়ের স্মৃতি এখন রঙে রঙে রঙিন।

জয়াকে এবার, শেষবারের মতো মনঃস্থির করতেই হবে।

বাসটা এসে দাঁড়াল। উঠে পড়ল জয়া।

হ্যাঁ কিংবা না। এক্ষুনি গিয়ে বলতে হবে।

অনিমেষ অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করবে।



# সাদা দেয়াল



বয়েস হয়েছে বলেই কিনা কে জানে, ইদানীং ভোরসকালেই কালীসাধনের ঘুম ভেঙে যায়। এ বাড়িতে বিনোদিনী নামটা কদাচিৎ উচ্চারিত হয়েছে, কারণ বড় ছেলে একটু বড় হওয়ার পর থেকেই ওঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়পক্ষ পরস্পরকে 'ওগো' এবং 'শুনছ' বলেই সম্বোধন করে এসেছেন। এ বাড়িতে, অর্থাৎ এই পরিবারে। আসলে এই বাড়িটাই তো তখন ছিল না। এত ভোরে ঘুমও ভাঙত না। এখন ভাঙে, হয়তো বার্ধক্যের জন্যেই।

বিনোদিনী অবশ্য এটাকে ভোরসকাল বলেন না। কাজের মেয়েটা বাসন মেজে দিতে কাপড় কেচে দিতে আসে সাতটার সময়। এক একদিন সেই সময় অবধি বিনোদিনী দিব্যি ঘুমিয়ে থাকেন, অথবা কে জানে হয়তো নিথর আবেশে বিছানায় পড়ে থাকেন। ওরও তো বয়েস হয়েছে। এত ঘুম ও পায় কোথায়! এক একদিন চিরতা গেলা মুখ করে বলে ওঠে, রাত চারটে থেকে উঠে ঘরের মধ্যে কি যে চটি ফটাস ফটাস করে ঘুরে বেড়াও, নিজেও ঘুমোবে না অন্যকেও ঘুমোতে দেবে না। রাগভারী পা ফেলে ফেলে রান্নাঘরে চলে যায়, তারপর একসময় ঠকাস করে এক কাপ চা নামিয়ে দিয়ে যায় কালীসাধনের সামনে। ঠকাস শব্দেই তার রাগ আর বিরক্তি টের পান কালীসাধন। ঠোঁটের সকৌতুক হাসি বেবাক চেপে যেতে হয়, চোখে পড়লে আরও রেগে যাবে।

ভোর চারটের সময় মোটেই ঘুম ভাঙে না কালীসাধনের, চটি ফটাস ফটাসও করেন না, ববং পা চেপে চেপেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। মেয়েদের কথাবার্তায় ওটুকু অতিশয়োক্তি মেনে নিতেই হয়, না মানলেই অশান্তি।

ইদানীং চায়ের জন্যে অপেক্ষা করেন না, নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে রেলিং ধরে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসেন। এসে বসার ঘরের বার-দরজা খুলে দিয়ে এই আরামকেদারায় বসেন।

হাতলওয়ালা বেতবোনা আরামকেদারাটা অনেককালের। বেত ছিঁড়ে গিয়েছিল, নতুন করে বুনিয়ে নিয়েছেন। সে-ব্যাটা প্লাস্টিক বেত চালাতে চাইছিল, উনি বিরক্তিতে গলা চড়িয়ে ফেলেছিলেন, না না, বেত আনতে পার তো বলো, তা না হ'লে...

শেষ অবধি বেত এনেই বুনে দিয়েছে, কিন্তু নতুন বেত আর পুরনো পালিশ, কেমন বেখাপ্পা লাগে, ঠিক ওঁর নিজের পবিবারের মতোই। নিজের পরিবার! হাসি পেয়ে গেল। নিজের বলতে এখন আর আছে কি?

এই বাড়িটা। আর ওই বুড়ি সহধর্ম্মিনী জীবনসঙ্গিনী।

বসার ঘরের সদর দরজা খুলে দিয়ে আরামকেদারাটায় এসে বসলেন।

কাজের মেয়েটা এসে সব জানলা দরজা খুলে দেবে। এখন এই একটা দরজাই। ফলে ঘরখানা কেমন আলো-আঁধারি ঠেকে। অনন্তলাল তো এক একদিন বাইরে থেকে এসে দেখতেই পায় না ওঁকে। —অন্ধকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছ কালী, বাইরে গিয়ে একটু পায়চারি কবলেও তো পার।

—সারাদিন তো পায়চারিই করতে হয় হে, এখন একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।

অনন্তলাল একদিন হেসে বলেছিল, আর তো দু' চার বছর, তারপর তো আমাদের অনন্তবিশ্রাম। যত জিরোতে চাও জিরিয়ে নিয়ো, এখন থেকে ছুটি ফুরিয়ে দেয়ার কি দরকার বাবা।

কালীসাধন হো হো করে হেসে উঠেছিলেন, ঠিক বলেছ।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভাল লাগেনি। সংসারের ওপর এত বীতশ্রদ্ধ, এত অভিযোগ, শরীরে এক একদিন এক একরকম বেলাইন ব্যাপার, তবু মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাল লাগে না। ক্রমাগত ঠেলে ঠেলে পিছিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় এখনও অনেক কাজ বাকি আছে।

নিজের সংসারকে এখন আর সংসার বলতেই ইচ্ছে করে না, তবু।

অনন্তলাল অনেক কম বয়েসের বন্ধু, এখনও যোগাযোগ আছে, কারণ এক পাড়াতেই থাকে। এই জমিটার খবর ও-ই এনে দিয়েছিল। কালীসাধনের নাড়িনক্ষত্র সব ওর জানা, কিন্তু অন্য সকলের মতোই দেখে যে বাইরে থেকে।

বলে, তোমার মতো ফরচুনেট ক'জন আছে, কালী!

ফরচুনেট! কথাটা শুনে কখনও দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাসি বেরিয়ে আসে, কখনও তেতো বিরক্তি গায়ে হুল ফোটায়। তবু অনন্ত মাঝে মাঝে আসে বলেই রক্ষে। আর তো কেউ বড় একটা আসেই না।

না, যদি আসে এই আশা নিয়ে এখানে বসেন না।

এই আরামকেদারায় বসা ওঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। যদিও আরাম বলে কিছু নেই, তুলোর পাতলা গদি পেতে দেওয়ার পরেও।

উনি নিজেও জানতেন না, শুনেছিলেন অন্য কার কাছে যেন! —বাঙালিরা পারেও বাবা, আর্ম চেয়ারকে করে দিল কিনা আরামকেদারা। ওই এক বিঘত চওড়া হাতল আছে বলেই হয়তো আর্ম। ওটা ঘুরিয়ে সামনে ঠেলে দিলে দিব্যি ঠ্যাং তুলে দিয়ে দিবানিদ্রা দেওয়া যায়। আরাম তখনই। না আর্ম থেকে নয়, ইজিচেয়ারই হয়ে গেছে আরামকেদারা।

কালীসাধন এসে বসলেন চেয়ারে।

শুধু দরজা দিয়ে আলো, ভেতরটা আধো অন্ধকার। কিন্তু আলো-আঁধারি ঘর পেরিয়ে খোলা দরজার ওপারে দোতলার বারান্দা এগিয়ে আছে বলে কিছুটা ছায়ামাখানো ধোঁয়াটে আলো, কিন্তু তার পরই লোহার ফটক অবধি ঝকমকে ভোরের রোদ্দুরে। সোজাসুজি তাকালেই লোহার ফটকে চোখ চলে যায়। তার দু' পাল্লাতেই ঢালাই লোহার মুখোমুখি দুটি ময়ূরের নকশা। চেয়ে চেয়ে দেখেন।

তখন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, 'সাহেববাড়ি ভাঙা হইতেছে' বিজ্ঞাপন দেখে সটান চলে গিয়েছিলেন। গ্যেটটা দেখে খুব পছন্দ হয়, জলের দরে কিনে এনেছিলেন নিজের বাড়িতে লাগাবেন বলে।

কেন যে এনেছিলেন। হাসি পায় এখন, দুঃখের হাসি।

কত কি ভেবেছিলেন, সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

লোহার গ্যেটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, চোখ চলে গিয়েছিল বসার ঘরের নোংরা সোফা কৌচের দিকে। আজকাল কেউ আর এ সব দেখেও না, বিনোদিনী তো কদাচিৎ নীচে নামেন। ছেলেরা কেউ এখন একা বা সপরিবারে দু' দিনের জন্যে এসে ফিরে যায়। সেই তখনই, অথবা মেয়ে-জামাইকে গ্যেট অবধি গিয়ে বিদায় জানাতে হ'লে। সোফা-কৌচের কাপড়ের ঢাকনিটা কতকাল যে সাবান দেওয়া হয়নি, পুরনোও হয়ে গেছে, বেশি কাচাকাচি করতে গেলে হয়তো ছিড়েই যাবে। আর কি নোংরা, কি নোংরা। আগে এতটুকু ময়লা হ'লে চিৎকার করতেন বিনোদিনীর অথবা গৃহভৃত্যটির ওপর। এখন দেখেও দেখেন না। ওসবের প্রয়োজনই তো ফুরিয়ে গেছে।

অন্যমনস্ক কেন ছিলেন, ওই চিঠিটা কি ! চিঠিটা নামানো আছে ওপরের শোয়ার ঘরের টেব্‌ল ল্যাম্প রাখার টুলের ওপর। কিন্তু চিঠির প্রত্যেকটি শব্দ ওঁর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সংসারই নেই, অথচ এই বৃদ্ধ বয়েসে সংসারই ওঁকে বিভ্রান্ত করে তুলছে থেকে থেকে। ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। কিসের ভয় তাও জানেন না। এখন আর ওঁর আছে কে, আছে কি। শুধু এই শরীরটা, মাঝেমাঝে ব্যতিব্যস্ত করে, প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছেও যেতে হয়। আর ওই বিনোদিনী, হঠাৎ হঠাৎ ভয় হয়, পট করে না একদিন ছেড়ে চলে যায়। একেবারে ওপারে। যদি অবশ্য ওপার বলে কিছু থাকে।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন বলেই চোখে পড়েনি। খোলা দরজার সামনের মেঝেতে ঈষৎ আলোয় একটা ছায়া পড়তেই চমকে উঠেছিলেন।

দরজার দিকে তাকিয়ে প্রথমটা ঠাওর পেলেন না। একটা মানুষের ছায়া। দরজার ওপারে ঝকঝকে রোদ্দুর, ঘরের ভেতর আধো-অন্ধকার। ভিতরের দিকে মুখ করে ঢুকছে, তাই শুধু একটা ছায়া ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আরেকটু ঢুকতে তবে স্পষ্ট হল। কাজের মেয়েটা।

অন্যদিন ওকে লোহার ফটক খুলে ঢুকতে দেখেন, সঙ্গে সঙ্গে মনে একটু উল্লাস হয়। গিয়ে গ্যাসের উনোনে কেটলি চাপিয়ে বিনোদিনীকে ডেকে দেয়। অর্থাৎ চা পাওয়া যাবে এবার।

কাজের মেয়েটাকে দেখেও আজ আর উল্লাস হল না। চা খাওয়ার ইচ্ছেও যেন নেই। গতকাল ওই চিঠিখানা পাওয়ার পর থেকেই সব যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে।

—আঙুর !

ঠিকের মেয়েটা পরনের শাড়িতে ভিজে হাত মুছতে মুছতে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছিল।

কালীসাধন ডাকলেন।

নামের বাহার আছে মেয়েটার— আঙুর। পাড়ার আরও দু' ঘরে কাজ করে, নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই তার। যেন সদাই ছুটছে। কাছাকাছি একটা বস্তিতে থাকে। তিন তিনটে ছেলেমেয়ে। 'চাল ফুটিয়ে তাদের মুখে এক মুঠো এক মুঠো ভাত তো দিতি হবে মা, নিজের পেট নয় তোমাদের কুড়োনি খেয়ে ভরে।' সেজন্যেই তিন তিনটে ঘরে কাজ করতে হয়। ওসব বাড়িতে ওকে আংরি বলে ডাকে। হয়তো ওদের বস্তিতেও।

—আঙুর নাম যখন, আংরি বলে ডেকো না। কি যে নোংরা স্বভাব মানুষগুলোর। একটা ভাল নামকে বিতিকিচ্ছিরি না করে ছাড়বে না।

বিনোদিনীকে বলেছিলেন। তার পর থেকে এ বাড়িতে ও আঙুর। কিন্তু প্রথম প্রথম আঙুর বলে ডাকলে ও নিজেই অস্বস্তি বোধ করত, হেসে ফেলত।

একবার হয়েছে কি, পরপর টানা তিনদিন আসেনি। কালীসাধন বস্তিটাও চেনেন না, খুঁজে বের করলেও ঘর কোনটা খুঁজে পাবেন কিনা সন্দেহ।

বিনোদিনী বললেন, মিত্তিরদের বাড়িতে বোধহয় এখনও কাজ করে। গিয়ে একটু জিগ্যেস করে দেখো না। কাজ ছেড়ে দিল কিনা কে জানে।

আরেকজনকে যে পাঠাবেন তার উপায়ও নেই। নিজেকেই যেতে হবে। পুরনো কাজের মেয়েটা কোথায় যেন চাকরি পেয়ে না বিয়ে করে চলে গেল। তাই একটা নতুন বাচ্চাকে এনেছিলেন। সে সদ্য কেনা পামশুজোড়া নিয়ে পালাল।

তারপর এসেছিল বিশ-বাইশ বছরের এক জোয়ান ছেলে।

বড় ছেলে সুমন্ত সেবারই এল বউ বাচ্চা নিয়ে। আমেরিকা থেকে। ক'টা মাত্র সুখের দিন। মাঝে মাঝে সেই দিন ক'টার গল্পও হয় বিনোদিনীর সঙ্গে। 'ছেলেটা কি ম্যাচিওর

হয়ে গেছে, দশ বছর তো মাত্র বয়েস।' বলেছিলেন হাসতে হাসতে। আর বিনোদিনী, ম্যাচিওর কথাটার পুরো মানে বুঝুক আর না বুঝুক, ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন, 'তা ঠিক। কিন্তু মেয়েটা দেখেছ, সাগো ? সাত বছর বয়েসেই একেবারে মেমসাহেব।'

আসলে নাম রেখেছে সাগরিকা। সাগরপারে জন্মেছে বলেই। কিন্তু ওদেশে কেউ তো ও নাম উচ্চারণ করতে পারে না, তাই সাগো বলে। তা থেকে ওর বাবা মা, এমনকি এপারের দাদু-ঠাকুমাও 'সাগো' বলেন। একবারও কালীসাধনের মনে হয় না এও এক ধরনের নামকে বিকৃত করা। ভালই লাগে, কেমন সাহেব-সাহেব গন্ধ আছে।

অথচ আঙুরকে আংরি বলাতেই আপত্তি। বিপত্তিও।

ছেলেমেয়েরা সব বড় হয়েছে, তারা বলে দিয়েই খালাস, দূরে থেকেও চিঠিতে কিংবা টেলিফোনে গার্জেনি করতে ছাড়ে না। টেলিফোন বা চিঠি আজকাল অবশ্য কমই আসে। সশরীরে এসে হাজির হয় চার পাঁচ বছর অন্তর, হপ্তা দু' তিন কাটিয়ে যায়। কিন্তু নামেই থাকা, টিকি দেখা যায় না। সব সময় এ বাড়ি সে বাড়ি এখান সেখান। যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। বেয়াই-বেয়ানরাও অভিযোগ করে। হয়তো কালীসাধনের ওপরই চটে যায়, 'মেয়ে-নাতি-নাতনি এল অ্যাদ্দিন বাদে। আমাদের বাড়িতে দুটো দিনও থাকতে দিলেন না।'

সেই বড় ছেলে সুমন্ত বললে, তোমার কি কোনওদিন আক্কিল হবে না বাবা ?

আক্কেল কথাটাকে বলে বসল আক্কিল। তবু ভাল—বাংলা। মাঝে মাঝে যা ইংরিজি ছোটায়। বিনোদিনী তো হেসে ফেলে একদিন বলেই ফেলেছিল, কি যে বলিস ছাই, বুঝতেই পারি না।

—কেন ? কেন ? ছেলের ধমক শুনতে কোনওকালেই অভ্যস্ত ছিলেন না, বরং নিজেই সারাজীবন ছেলেকে ধমক দিয়ে এসেছেন। তবু এখন ধমক খেতেও মন্দ লাগে না।

সুমন্ত বললে, 'স্যাক দ্যাট রাফিয়ান জাস্ট নাও।'

অর্থাৎ সেই ধেড়ে চাকরটাকে।

'ও তো কোন্‌দিন তোমাদের গলা টিপে মেরে যথাসর্বস্ব নিয়ে পালাবে।' 'ওকে রাখা কিন্তু উচিত হয়নি, বাবা', বড় বউমা সায় দিয়ে বললে। সবাই ভয় দেখাতে শুরু করল।

তবে তাই। তারপর থেকে আর চাকরবাকর ঢোকাননি, এমন কি কাজের মেয়েদেরও বিশ্বাস নেই, রাতে বাড়িতে শুতে দেননি কাউকে। নিজেও খানিকটা ভয় পেয়েছিলেন হয়তো।

সুতরাং আঙুরের খোঁজে নিজেকেই যেতে হ'ল।

মিত্তিরগিন্নি দোতলার বারান্দায় দাঁড়াতেই বললেন, আঙুর এসেছিল ? কাজ করে গেছে ?

—আঙুর ? কে আঙুর ? চোখ কপালে তুললে মিত্তিরগিন্নি।

পাশে দাঁড়ানো ফ্রকপরা মেয়েটা বাঁচাল। —আংরি ? আংরির কথা বলছেন ?

মিত্তিরগিন্নি বুঝতে পেরে বললে, না, ও তো ক'দিন আসছে না। খবর পাঠিয়েছে কাল আসবে।

বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন কালীসাধন। 'একটা গুণ্ডাকে নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়েছ!' তোরা তো বলেই খালাস। বুড়োবুড়ি রাতে মরে পড়ে থাকলেও তো খবর পাবি না। একটা ডাক্তার ডাকতে হ'লে...

বৃদ্ধ বয়েসের নানান ঝামেলা, টাকার কোনও দামই থাকে না তখন।

আঙুর তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল। কালীসাধনের ডাক শুনে মাঝ

সিঁড়িতে থমকে দাঁড়াল।

বললেন, পার তো চা-টা তুমিই করে দিয়ো। ওকে আর ডেকে তুলো না।

আঙুর ঘাড় কাত করে সায় দিয়ে আবার তরতর করে উঠে গেল।

বেচারা ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। কাল অনেক রাত অবধি জেগে ছিল, কালীসাধন নিজেও ঘুমোতে পারেননি।

ঘুম না আসার ওই একটাই কারণ, ওই চিঠিখানা।

লালনীল পাড় দেওয়া লম্বা খামটা পেয়ে প্রথমে বুঝতেই পারেননি কার চিঠি। শুধু একটাই বিস্ময় জেগেছিল, এত ভারী কেন? এত বড় চিঠি কে লিখে বসল? ছেলেরা কেউ তো দশ লাইনের বেশি লেখে না, বউমা দু'জন আরও কম। খোঁটা দিয়ে একবার বিনোদিনী বলেছিল। উত্তর এল, সবসময় কি বিজি থাকতে হয়, বুঝবেন না মা। সংসার, ছেলেমেয়ে যেন বিনোদিনীর কোনওদিন ছিল না। তোরা সব এমনি এমনি বড় হয়েছিস।

দুপুরে দোতলা থেকেই দেখলেন পোস্টম্যান ঢুকল লোহার গেট খুলে। বুঝতেও পারলেন একটা চিঠি লেটার বক্সে দিয়ে গেল। কিন্তু তক্কে তক্কে ছিলেন পোস্টম্যান যাবার সময় গেটটা বন্ধ করে যায় কিনা লক্ষ করার জন্যে।

চিঠি সম্পর্কে এখন আর তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। ভাবলেন, থাক, বিকেলে যখন অনন্তলাল আসবে তখন তো নামবই নীচে।

চিঠি আর আজকাল আসে কই! কর্পোরেশন ট্যাক্সের বিল। আর নয়তো টেলিফোন বা ইলেকট্রিকের। তাও নিজেকে গিয়েই জমা দিয়ে আসতে হয়। বুড়োবয়েসে বোধহয় রোদের তাতটাও বেশি লাগে। আর এক ঝামেলা বাসে-মিনিবাসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাতায়াত করা। যা ঝাঁকানি, পায়ের ব্যালেন্স রাখাই দায়। একটু লম্বা বলে মিনিবাসে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়াতে হয়।

শরীর এখনও মজবুত কালীসাধনের, কিন্তু মাঝে মাঝে কি যে এক ধরনের ক্লান্তি বোধ করেন। এই যে আঙুরকে চা বানাতে বলে দিলেন, হয়তো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, কিন্তু বেটি হাতের কাজ না সেরে আসবে না। ততক্ষণে চা একেবারে ঠাণ্ডা জল। এক একবার ভাবছিলেন উঠে যাই, তারপরেই কেমন এক ক্লান্তি।

—বাবা, আপনার চা।

পাশের টুলে চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়েই আঙুর আবার তর তর করে চলে যাচ্ছিল ওপরে, সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, মা একবার ওপরে যেতে বললেন।

আঙুর প্রথম থেকেই ওঁকে বাবা বলে, বিনোদিনীকে মা। কথাবার্তা একটু বেশি বলে, অকারণেই বলে, কিন্তু বেশ চটপটে। কথার জন্যে হাত থামে না, আধঘণ্টার মধ্যে সব কাজ সেরে দিয়ে তর তর করে চলে যায়, ভিজে হাত শাড়ির গায়ে মুছতে মুছতে।

—তা হ'লে তো ডেকে দিলেই পারতে। চা-টা আবার নামিয়ে আনলে কেন!

আঙুর কথা শুনল কি শুনল না বোঝা গেল না, নিমেষে অদৃশ্য। থেমে থিতিয়ে কথা শোনার সময় নেই। ছুটে না বেড়ালে তিন তিনটে মুখে ভাত তুলে দেবে কি করে। স্বামী নেয় না। মানে ওকে নেয় না। কিন্তু ওর টাকা নেয়। এক একদিন কান্নাকাটি করে আঙুর, হঠাৎ হঠাৎ স্বামী এসে টাকা চায়, টাকা আদায় করে ওর কাছ থেকে।

বিনোদিনী বলেছিল, দিস কেন?

—কি করব বলো, চেঁচিয়ে যা-তা বলবে, বস্তিতে ইজ্জত থাকবে না। বলবে খারাপ টাকা, ওজগারের টাকা।

রোজগার বলতে অবশ্য বোঝায় অন্য রোজগার। তাই যে স্বামী ওকে নেয় না,

তাকেও ভয় আঙুরের।

যেদিন শুনেছিলেন, শুনে হেসে ফেলেছিলেন। ওদের দুঃখ দুর্দশা ঠিক ঠিক বোঝাও যায় না, হেসে ফেলতে হয়। যারা ওদের জন্য কিছু করতে চায়, তারা শুধু যুক্তি দিয়ে করতে চায়, ওদের দুঃখ কখনও বুকে এসে বেঁধে বলে মনে হয় না। অন্তত কালীসাধনের তো নয়ই।

তলানিতে পড়ে থাকা চা পাতা দুটোকে কায়দা করে সরিয়ে দিয়ে শেষ চুমুক অবধি কাপটা শেষ করলেন।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে উঠে গেলেন। বাধ্য হয়েই।

বিনোদিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হতেও কেমন সঙ্কোচ, ভয়। সারারাত ঘুমিয়ে ছিল, না জেগে ছিল তাও জানেন না।

অনন্তলাল বলেছিল, ফরচুনেট।

ওর আর দোষ কি, উনি নিজেও তো নিজেকে একসময় ফরচুনেট ভাবতেন।

এই বাড়িটায় শূন্যতা নিয়ে বসে আছেন, দুটিতে, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহও যেন চলে গেছে। এ যে কি কষ্ট কেউ বুঝবে না। সবচেয়ে বড় কষ্ট, কেউ এলে-গেলে, আত্মীয়স্বজন কেউ, তাকেও বলা যায় না। কাউকে বোঝানো যাবে না, কেউ বুঝবে না, তার চেয়ে বড় কষ্ট, কষ্টটা গোপন করতে হয়। হাত ধরে অনুনয় করলেও কেউ কি ঘন ঘন আসবে নাকি ! ওরা তো দেখতে আসে বেঁচে আছে কিনা।

বিনোদিনীর তিক্ততা আরও বেশি। বলে, ওরা তো আমাদের সহ্য করতেই পারেনি কখনও, তাই দেখতে আসে হাঁড়ির হাল হয়েছে কিনা।

আসেই বা কে ক'বার।

আরেক অস্বস্তি এই বাড়িটা।

চিনি-মুখ করে গায়েপড়া গায়েপড়া ভাব নিয়ে কথা বলতে বলতে এক ফাঁকে বলে বসবে, মেসো, নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে দাও না, তবু তো একটা লোক পাবে, বিপদে আপদে সাহায্য।

শুনলেই রেগে যান কালীসাধন, কেমন একটা ভয় হয়। ভয় নিজেকে।

টাকা পয়সার এমনিতে অভাব কিছু নেই। তবু টাকা তো টাকাই। পেলে আরও দুটো বাড়তি টেলিফোন করা যায়, শরীর ভাল না থাকলে ট্যাক্সিতে ওঠা যায়।

দুই ছেলেই অবশ্য বলে রেখেছে, দরকার পড়লেই কল-কালেক্ট করে দিয়ো।

এ-সব আগেকার কালে ছিলও না, জানেনও না। আভাসে বুঝেছেন টাকাটা ওঁকে দিতে হবে না, যাকে ফোন করবেন সে-ই দেবে।

প্রথম প্রথম বড় বেশি উদ্বেগ হত, উদ্বেগ এখনও। কিন্তু বিনোদিনী ফোন করতে শুরু করলে ছেলেদের জন্যে আর উদ্বেগ থাকে না, টেলিফোনের মিটারটাই আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। যেন খাটে বসে পা ছড়িয়ে বউমা কিংবা নাতির সঙ্গে গল্প করছে, 'বউমা, সুক্তোর জন্যে বড়ি পাও, কাঁচকলা পাও ? খোকা সুক্তো ভালবাসে।'

একদিন রেগে গিয়ে নিজেই ফোনটা কেটে দিয়েছিলেন। তখন এ-সব কল-কালেক্ট ফালেক্ট ছিল না। আর থেকেই বা কি, ছেলের টাকাও তো টাকা। ওরা তো বলে ডলারও যা, টাকাও তাই। শুনতেই ডলার। দুটো কল-কালেক্ট কল ওদের ঘাড়ে চাপিযে দিলে শেষে ওদের পাঁউরুটি চিবিয়ে থাকতে হবে কিনা, কে জানে।

ভাল আছে, ভাল থাকুক এই বিশ্বাসটুকু নিয়েই ছিলেন। এ বাড়ির শূন্যতায় একরকম অভ্যস্ত হয়েই গিয়েছেন। তবু যক্ষের মতো আগলে রাখতে চান বাড়িটা।

একটাই ভয়, কখন মন নরম হয়ে গিয়ে না-ভেবেচিন্তে কাউকে ভাড়া দিয়ে বসেন।

ওঁর তো এখনও বিশ্বাস ছেলেরা টাকা জমিয়ে নিয়ে একদিন দেশে ফিরবে। আবার জমজমাট হয়ে উঠবে তাঁর সংসার।

—বাবা, ওপরে আসেন একবার, মা ডাকছেন।

সিঁড়ির মাথা থেকে আঙুরের গলা এল। ওই ছ' ছটা শব্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলারও সময় নেই। মনে হল যেন বলতে বলতেই এল, আর বলতে বলতেই চলে গেল, শেষ শব্দ দুটো অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল।

কালীসাধন উঠে দাঁড়ালেন আরামকেদারা ছেড়ে।

বেশ ছিলেন, সবই সহ্য হয়ে গিয়েছিল। এই শূন্যতা, এই একাকিত্বও।

মাঝ থেকে একটা চিঠি এসে সব তোলপাড় করে দিয়ে গেছে।

ডাকপিওনকে দোতলার বারান্দা থেকেই দেখেছিলেন, লোহার ফটক খুলে ভেতরে ঢুকল। দোতলার বারান্দা থেকে চিঠির বাক্সটা দেখা যায় না। ছেলেদের চিঠি ভেবে এমন অনেকবার দুদ্দাড় করে নেমে এসেছেন। এসে লেটার বক্স খুলে হয় ইলেকট্রিকের বিল, নয়তো ব্যাঙ্ক-স্টেটমেন্ট।

তাই তেমন আগ্রহ হয়নি। উনি শুধু লক্ষ রাখছিলেন ডাকপিওন লোহার গ্যেট বন্ধ করে কড়াটা ঠিকমত লাগিয়ে দিয়ে যায় কিনা।

দু'একবার বকাঝকাও করেছেন।

ডাকপিওন একবার ওপরের দিকে তাকিয়ে ঠিক-ঠিক লাগিয়ে দিল। উনি দাঁড়িয়ে না থাকলে হয়তো বন্ধ করত না।

গ্যেট খোলা থাকলে একটাই ঝামেলা। রাস্তার কুকুর ঢুকে যায়। বর্ষাকাল হ'লে তো রক্ষা নেই। শুধু কুকুর নয়, রাস্তার ভিখিরিগুলো ঢুকে পড়ে, এসে সংসার পেতে বসে গাড়িবারান্দার নীচে। গাড়ি অবশ্য ওঁর ছিল না, গাড়িবারান্দাও ওটা নয়। শুধু দোতলার বারান্দা খানিকটা এগিয়ে এসেছে বলে গাড়িবারান্দা মনে হয়।

কি চিঠি দিয়ে গেল সে সম্পর্কে ওঁর কোনও কৌতূহল হল না।

কিন্তু দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ মনে হল কি চিঠি যাই দেখেই আসি।

চাবি নিয়ে নীচে নামছেন। বিনোদিনী বললে, কোথায় চললে?

—একটা চিঠি দিয়ে গেল তখন।

—পারও বাপু।

কালীসাধন চটি ফটাস ফটাস করে নেমে এলেন।

অন্যসময় হ'লে বিনোদিনী দু' দণ্ড তিষ্ঠোতে দিত না। বলত, যাও না, গিয়ে নিয়ে এসো, ডাকপিওন কি চিঠি দিয়ে গেল।

কিন্তু সেই বিনোদিনীও কোনও উৎসাহই দেখাল না। কারণ সুমন্ত আর নান্টু দু'জনেই হপ্তা দুই আগেই চিঠি দিয়েছে। দুটোই দায়সারা ছোট চিঠি। তবু চিঠি তো।

আসলে পিওনের ডান হাতে কি চিঠি ছিল তা লক্ষ করেননি, কিন্তু বাঁ হাতের বান্ডিলের ওপরেই লাল-নীল পাড় দেওয়া একটা লম্বা খাম ছিল। সেটাই হঠাৎ মনে পড়ে গেছে।

বিনোদিনীর চিঠি।

খামের ওপর ঠিকানা কার হাতের তাও চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু অবাক হয়েছিলেন ওজন দেখে। অনেক পাতা জুড়ে লেখা।

বিনোদিনীর নামে চিঠি, তবু কেমন একটা সংশয় হল। নিজেই খুলে পড়লেন।

দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি, আরামকেদারটায় বসে পড়তে হয়েছিল।

সমস্ত বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে উঠল। হতবাক্। যা কোনওদিন স্বপ্নেও

ভাবেননি। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। হাত চলে গেল চোখের কোণায়।

কি করবেন কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ মুখ থেকে একটা শব্দ বের হল—ভগবান!

অনেকক্ষণ চুপচাপ গুম হয়ে বসে রইলেন। চিঠির ওপর ঝাপসা চোখ মেলে বসে ছিলেন, চিঠির পাতায় দু ফোঁটা জল পড়ল।

কি করবেন এখন, নিয়ে গিয়ে বিনোদিনীকে দেবেন চিঠিটা? বলবেন তাকে, কি আছে চিঠির মধ্যে? বলতে পারবেন?

বলতে গেলেই তো ডুকরে কেঁদে উঠবেন এই বৃদ্ধ বয়েসে। বিনোদিনীই কি সহ্য করতে পারবে এই রকম ভয়ঙ্কর একটা দুঃসংবাদ। ওর তো আবার বুকে একটা ব্যথা হয় মাঝে মাঝে। কিসের ব্যথা জানাও যায়নি।

সেদিন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে কালীসাধনের মনে হয়েছিল সারা শরীরে যেন কোথাও কোনও শক্তি নেই। মেরুদণ্ড যেন রবারের নল হয়ে গেছে।

কোনও কথা বলতে পারেননি। কথা বলতে গেলেই তো গলার স্বর কান্নায় কেঁপে যাবে।

উঠে এসে হাত বাড়িয়ে বিনোদিনীর দিকে খামসুদ্ধ চিঠিটা এগিয়ে দিলেন, মুখোমুখি তাকাতেও পারলেন না।

কালীসাধনের থমথমে মুখের দিকে তাকাননি বিনোদিনী, তাই স্বাভাবিক কণ্ঠে, জিগ্যেস করলেন, কার চিঠি?

উত্তর দিতে পারলেন না কালীসাধন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পড়ে দেখো।

যে সদাসর্বদা পাশে থাকে, সঙ্গে থাকে, তার মুখের দিকে তাকানোই হয়ে ওঠে না। কিংবা দু'জনেরই বেশ বয়েস হয়ে গেছে বলে কেউ কারও মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন না। দৃষ্টিতে শুধু একটা ঝাপসা অস্তিত্বই ধরা পড়ে, সেটুকু নিয়েই ওঁরা খুশি।

দু' চারটে কথা হয়েছিল, কখনও দীর্ঘশ্বাস, কখনও হতাশায় ভেঙে পড়া। উভয় পক্ষেই। যা কিছু চিন্তাভাবনা, শলাপরামর্শ তা রাতের বিছানায় শুয়ে শুয়ে, আলো নেভানো অন্ধকারে। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না বলেই অন্ধকারের আড়ালে যা-কিছু কথাবার্তা।

—কি করা যায় বলো তো! প্রায় কান্নার গলায় বলে উঠেছিলেন কালীসাধন। অন্ধকারে চিত হয়ে শুয়ে অন্ধকার সিলিং-এর দিকে চেয়ে থেকে বলেছিলেন।

বিনোদিনীর গলা কাঁপেনি। স্পষ্ট করে বলেছিলেন, এখন ঘুমোও।

নিজে ঘুমিয়েছিল কিনা কে জানে, কালীসাধন কিন্তু একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

উনি বেশ বুঝতে পেরেছেন শান্ত স্থির গলায় ওঁকে ঘুমোতে বললেও বিনোদিনী নিজে ঘুমোতে পারেনি।

সেজন্যেই আঙুরকে বললেন, পার তো চা-টা তুমি নিজেই করে দাও, ওকে আর ডেকে তুলো না।

কিন্তু বিনোদিনী ঠিক সময়েই উঠে পড়েছেন। ঘড়ির কাঁটা ধরে ওঠা বোধহয় ওঁর অভ্যাস, ঘুম হোক আর না হোক।

চায়ের কাপটা তলানি অবধি নিঃশেষ করলেন, চায়ের নেশায় নয়, আসলে ওভাবে যেন বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নিলেন।

তারপর সিঁড়ি ভেঙে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনী হাতের কাজ ফেলে এগিয়ে এসে আধা ইশারায় ঘরে ঢুকে বললেন, এদিকে এসো।

কিছু একটা বলবে ও, তা বুঝতেই পেরেছিলেন কালীসাধন, তা না হ'লে আঙুরকে দিয়ে ডেকে পাঠাবে কেন।

বিনোদিনী একবার দেখে নিল আঙুর কাছেপিঠে ঘোরাঘুরি করছে কিনা।

কালীসাধন একসময় ভাবতেন অনেক ওপরে উঠে গেছেন, ওঁর সারা পরিবারটাই।

যতই ওপরে উঠে যাও, সবসময় কয়েকটা অদৃশ্য দড়ি যেন টেনে নীচে নামাতে চায়। কারও তোয়াক্কা রাখি না বলেও ফিসফিস করে কথা বলতে হয়।

বিনোদিনী ফিসফিস করে বললেন, অনন্ত আসেনি তো ?

অনন্তলালের সামনে তাকে বিনোদিনী অনন্তবাবু বলেই সম্বোধন করে, তবে নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা আলাপআলোচনায় স্রেফ অনন্ত।

—না।

বিনোদিনী নিশ্চিন্ত হলেন, যদিও অনন্তলাল আসেনি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। এলে তো সঙ্গে সঙ্গে তার চায়ের জন্যে হাঁক পাড়তেন কালীসাধন। আর সে তো রোজ আসে না, হঠাৎ হঠাৎ এসে হাজির হয়।

বিনোদিনী এবার ফিসফিস করে বললেন, বলে ফেলো না যেন। কাউকে বোলো না।

—নান্না, বলা যায় নাকি ! দুঃখের হাসি এসে গেল মুখে।

একটু চুপ করে থেকে কালীসাধন বললেন, কি যে করা যায় কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছি না।

সবই তো এখন নাগালের বাইরে।

এর নাম সাকশেস। অনন্তলালের ভাষায় ফরচুনেট হওয়া।

সুমন্তকে একটা ফোন করা ছাড়া আর তো কোনও উপায়ই চোখে পড়ছে না।

—খোকাকেই একটা ফোন করি, কি বলো।

—এখন না, এখন না। বিনোদিনী বলে উঠলেন।

এখন আঙুর বাড়িতে রয়েছে, কাজ করছে। টেলিফোন করলে সব শুনতে পাবে।

যত বড়ই তুমি হও, বিপদেআপদে কাজের লোকের সামনে একটা টেলিফোন করে ছেলের সঙ্গেও কথা বলতে পারবে না। একটা ঠিকে ঝিকেও ভয় করে চলতে হবে।

অথচ ফোন করা এখন ভীষণ জরুরি। কেবলই মনে হচ্ছে সময় চলে যাচ্ছে। হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কিছু একটা ঘটে না যায়। কিছু একটা করে না বসে।

কিন্তু টেলিফোনেও কি সুমন্তকে অত সব কথা বোঝানো যাবে। যা বলবেন কালীসাধন, ঠিক ঠিক তা করতে পারবে সে ? এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে তো। ওর কাছে কোনও সমস্যাই যেন সমস্যা নয়, সবই নো-প্রবলেম। সব ব্যাপারকে ওরা কি করে যে এত হাল্কা করে দেখে। গুরুত্বটা হয়তো বুঝতেই পারবে না, হেসে উড়িয়ে দেবে।

টেলিফোনে এত সব বোঝাতে গেলেও প্রচুর সময় লাগবে। সে অনেক টাকা। তা হোক, টাকা তো বিপদআপদের জন্যেই। না, কল-কালেক্ট করতে পারবেন না, তাঁর নিজের সমস্যার দায় ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারবেন না। টাকা যা লাগে লাগুক, ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা যেন না ঘটে যায়। এছাড়া এখান থেকে উনি করবেনই বা কি।

একটা কথা মনে পড়তেই দুঃখের হাসি এসে গেল ঠোঁটের কোণে।

সে অনেক কম বয়েসের কথা। তখন কালীসাধন একেবারেই সামান্য চাকরি করেন। সুমন্ত, মানে খোকা, তখন কোলের শিশু। ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তখন। মা তখনও বেঁচে।

মা'র কাছে খোকাকে রেখে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বিয়ে বাড়িতে যেতে হবে, বিনোদিনীকে সঙ্গে নিয়ে। নিকট আত্মীয়ের বাড়ি। না গেলেই নয়।

বিনোদিনী সেদিন খুব সেজেছিল, বিয়ের পর বোধহয় সেই প্রথম বিয়েবাড়ি যাওয়া। দিনকাল ভাল ছিল, রাস্তাঘাটে এত ভয় ছিল না। রাত বারোটাতেও বাড়ি ফেরা যেত।

খিল খুলে বিনোদিনী যখন বেরিয়ে এল ঘর থেকে কালীসাধন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল বিনোদিনীকে।

মা বলে দিয়েছিল, সব গয়না পরে যেয়ো বউমা, বেনারসী পোরো।

সব গয়না বলতে যে কি বোঝায় কালীসাধন জানতেন না।

বিয়ের সময় তো মেয়েটিকেই দেখেছিলেন, বিনোদিনীকে। গয়নাটয়না চোখেই পড়েনি।

খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই কালীসাধন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, চোখে একটু অবাক দৃষ্টিও হয়তো ছিল।

বিনোদিনী সেই দৃষ্টি দেখে মৃদু হেসে বললেন, অমন করে দেখছ কেন? খারাপ লাগছে?

উত্তরই দিতে পারেননি কালীসাধন, শুধু বলেছেন, রাজমহিষী।

কথাটা মিথ্যে নয়। বিনোদিনী এমনিতেই যথেষ্ট সুন্দরী ছিল, এখন এই বয়েসে দেখলেও অনেকে তরুণী বয়েসটা কল্পনায় দেখতে পায়। কিন্তু গহনা যে মানুষকে এত সুন্দর করে তোলে ধারণাই ছিল না।

কপালে একটা জড়োয়া টায়রা পরেছিলেন বিনোদিনী, গলায় জড়োয়া নেকলেস। আর কি কি ছিল লক্ষই করেননি। চোখ ঝলসে যাচ্ছিল।

মধ্যবিত্ত বিয়ের বাজারে সুন্দর মেয়েরা চিরকালই সুলভ। পৈতৃক আর নিজস্ব মিলিয়ে সোনাদানা পাথরটাথর সব বউয়েরই থাকত। এমনকি কালীসাধনের মতো সামান্য চাকুরের ঘরেও ছিল। শুধু কালীসাধন নিজেই জানতেন না; সুন্দরী বউটিকে নিয়েই তিনি তখন বিভোর।

বয়েস কালীসাধনকে কত কি শেখাল।

ছাত্রাবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, যারা গয়নাটয়না পরত তাদের সম্পর্কে কত ঠাট্টাবিদ্রূপ উপহাসই না করে এসেছেন। আসলে জানতেন না, সব উপহাসের পিছনে একটা জিনিসই আছে—ঈর্ষা। যাদের নেই তারা চিরকালই যাদের আছে তাদের বিদ্রূপ করে এসেছে।

কালে কালে কত পরিবর্তনই দেখলেন কালীসাধন। এখন ছেলেরাও তো গলায় হার পরছে, সোনার হারও। দেশেবিদেশে সর্বত্র। অথচ এককালে এসব নিয়ে কত ঠাট্টাবিদ্রূপ। জাতের নামেই অপবাদ। এখন বুঝতে পারেন সবকিছুর মূলে এই ঈর্ষা।

—টাকা নিয়েছ তো? বিনোদিনী বেনারসীর পাট ঠিক করতে করতে বললেন।

—টাকা?

জড়োয়ায় ঝকমকে মুখ বলে উঠল, এ সব পরে কি বাসেট্রামে যাব নাকি, ট্যাক্সিতে যাব, ট্যাক্সিতে।

ভিতরে ভিতরে টাকার হিসেব করতে করতে কালীসাধন সায় দিয়ে ঘাড় নেড়েছিলেন।

তারপর শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়ার সমস্ত সময়টুকু কেটে গিয়েছিল ট্যাক্সির মিটারের দিকে চোখ রেখে। চোখের সামনে তিড়িং তিড়িং করে মিটার লাফাচ্ছিল, আর কালীসাধনের ব্লাডপ্রেসারও যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। একবারও

বিনোদিনীর রাজমহিষী রূপের দিকে চোখ ফেরাতে পারেননি।

এখন আর ট্যাক্সির মিটার ওঁকে ভয় দেখায় না। কিন্তু বিপদেআপদে নিউ জার্সিতে ছেলের কাছে একটা ফোন করতে হ'লে ওই টেলিফোনের মিটার এখনও আতঙ্ক। তা হোক্। সুমন্তকে একবার বলা দরকার, ও যদি কিছু করতে পারে।

অন্যমনস্কভাবে কখন রিসিভারের কাছে চলে গিয়েছিলেন, হয়তো ডায়ালে আঙুলও ঠেকিয়েছিলেন।

বিনোদিনী কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, আঙুর চলে যাক, আঙুর চলে যাক।

২

—খোকার ঘরের চাবিটা দাও তো।

বিনোদিনী কানা উঁচু অ্যালুমিনিয়মের থালায় মুগের ডাল নিয়ে বাছতে বসেছিলেন। চোখে চশমা উঠেছে, তবু ভাল দেখতে পান না বলে জানালার পাশটিতে গিয়ে মোড়া নিয়ে বসেন। চাল বাছেন, ডাল বাছেন। এটা ওঁর নিত্যদিনের কাজ। কারণ কালীসাধন খাওয়ার ব্যাপারে একটু বেশি খুঁতখুঁতে।

ছেলে খোকা ওরফে সুমন্ত একবার এসে মাকে সমবেদনা বা সান্ত্বনা দেবার জন্যেই হয়তো বলেছিল, বাবার সামনেই, খাওয়া নিয়ে ইউ আর অ্যফুলি ফ্যাস্টিডিয়াস।

বাবাকে এ সব কথা সুমন্ত আগে কখনও বলত না। সামনে দাঁড়িয়ে মুখের ওপর কোনও কথা বলতেই পারত না। এখন দু'দশ দিনের জন্যে এসে কত কি বলে যায়। দিব্যি হাসিমুখে শোনেন উনি, শুনতে ভালও লাগে। নিজের ছেলেই তো বলছে, অপর কেউ তো নয়।

ওই কথাটা প্রথম প্রথম বিনোদিনীও বলতেন, অন্য ভাষায়। বলতেন, খাওয়ার ব্যাপারে তোমার হাজার রকম বায়নাক্কা।

কথাটা মিথ্যে নয়। থালার ভাত থেকে একটা লম্বা চুল বেরিয়ে এলে সেদিন আর ভাল করে খাওয়াই হয় না ওঁর। ভাতে বা ডালে কালোকুলো কিছু থাকলেই আরেক বিরক্তি।

বাজারের এক চালওয়ালা বাড়িতে চাল দিয়ে যেত।

এক মুঠো চাল তার বস্তা থেকে তুলে নিয়ে বললেন, উঁহু, এ চাল চলবে না, এত মাছি কেন ?

বিনোদিনী কথাটার মানেই বুঝতে পারেননি। উনি যে বাড়ি থেকে এসেছেন সে বাড়িতে মেয়েদের রান্নাঘরেই বড় একটা ঢুকতে হ'ত না। কালো কালো চালগুলোকে যে মাছি বলে তা-ই জানতেন না।

চাল ডাল বেছে দেওয়ার অভ্যাস সেই তখন থেকে। একটু সচ্ছল হওয়ার পর, ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয়ে উঠছে, তখন রান্নার লোক ছিল। এখনও যে আবার রাখতে পারেন না তা নয়। কিন্তু ওই এক ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে ছেলেরা, রাত্তিরে বাড়িতে শুতে দিলে গলা টিপে মেরে রেখে যাবে। মেয়েছেলে রাখলেও নিস্তার নেই, কোনও গুণ্ডোবদমাশের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে কে জানে, রাত্তিরে হয়তো সদরদরজার খিল খুলে রেখে দেবে। আগে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে রাখতেন, একটা চব্বিশ ঘণ্টার লোক ছিল তখন। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে, চাবি সেই কাজের লোকের হাতেই দিতে হ'ত কেউ এসে বেল বাজালে। যারা এলে খুশি হতেন তারা কেউই অবশ্য আসে না। আসে যত ঝুটঝামেলার লোক, পাড়ার কেউ, পুজোর চাঁদা, ধূপকাঠি বা সাবান, কিংবা

কোনও কোম্পানির সার্ভে করতে ইয়াব্বড়ো ফর্ম নিয়ে। বিরক্তির একশেষ।

মাঝে রান্নার জন্যে ঠিকের লোক একজনকে পেয়েছিলেন, সে হপ্তায় তিন্‌দিন না ব'লে কামাই করত, পরের দিন হাসিমুখে একটা না একটা অজুহাত। রেগে গিয়ে একদিন ওসব পাট চুকিয়ে দিয়ে বিনোদিনী নিজেই রান্না করতে শুরু করেছেন।

—আমার দু দু'টো ছেলে আমেরিকায়, জামাইও। রাগে গজগজ করতে করতে বিনোদিনী একদিন বলেছিলেন, আমি রান্না করব না তো কে করবে। ঢেঁকি সগ্গে গেলেও ধান ভানে।

রেগে রেগেই বলেছিলেন, কিন্তু কাকে বলবেন, ওই কালীসাধনকে ছাড়া!

—খোকার ঘরের চাবিটা দাও তো।

বিনোদিনী নিচু মোড়াটায় বসে জানালার আলোয় ডাল বাছছিলেন। বসতে আরাম, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে বেশ কষ্ট হয়। বয়েস তো কম হ'ল না।

বিনোদিনী আঙুল দেখালেন টেবিলের দেরাজটার দিকে, বললেন, দেখো না, ওখানেই আছে। তারপর।—কি হবে?

কালীসাধন কোনও উত্তর দিলেন না, দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলেন চাবির থোকাটা।

অনেকগুলো চাবি। অনেকগুলো ঘর। এখন সব যক্ষপুরী হয়ে আছে, যখ হয়ে আগলাচ্ছেন।

এই ঘরের চাবি অবশ্য ওঁকে খুঁজে বের করতে হয় না। যখনই নিজেকে নিঃস্ব মনে হয়, শূন্যতা বুকের ওপর চেপে বসে, তখন এক একদিন চাবি নিয়ে এসে এ ঘরটা খোলেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এক একদিন আঙুরকে দিয়ে ঘরখানা পরিষ্কার করান। বন্ধ থাকলেও ধুলো জমে।

বলে রাখলে আঙুর দুপুরে একসময় এসে ঝাঁট দিয়ে দেয়, ন্যাতা-জল নিয়ে এসে মুছে দেয়।

খোকার জন্যেও নয়। প্রয়োজনেও লাগে না। তবু এই ঘরটার প্রতি ওঁর একটা অদ্ভুত মায়া। এখানে এলে দু'দণ্ডের জন্যে কি যে শান্তি পান! ঘুরে ঘুরে দেয়ালগুলো দেখেন। আর ভারী মনটা দু'খানা ডানা হয়ে দূর বিদেশে উড়ে যায়।

সাকশেস মানে যে পরম শূন্যতা, আগে জানতেন না।

আঙুর চলে যাবার পর সুমন্তকে নিউ জার্সিতে টেলিফোন করেছিলেন। বিনোদিনী তখন উদগ্রীব উৎকর্ণ হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

না, কল-কালেক্ট নয়। হাত পেতে ছেলেদের কাছে কখনও কিছু নেননি, নেবার প্রয়োজনও নেই। তবে ঘটে একটু বুদ্ধি তো থাকবে তোর। যত আজেবাজে ধানাই-পানাই। সাগো কোন গ্রেডে কি পেয়েছে সেই সব উল্লাসের কথা। অন্যসময় চিঠিতে এ সব খবর জানলে মন ভাল হয়ে যায়। গর্বও হয়। তা বলে এই সময়?

ব্যাপারটার সিরিয়াসনেস বুঝতেই পারল না।

'কি বলছে ও, কি বলছে?' বলতে বলতে ঝট করে হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিলেন বিনোদিনী, কান্না গলায় কি-সব বলতে শুরু করলেন।

কালীসাধনের সে সব শোনার আর ইচ্ছে নেই, ওঁর কানে বাজছে খোকার নির্লিপ্ত কেজো ঢঙের কথাগুলো। ওকে, ওকে, আ'ল টক ইট ওভার।

বলতে পারলি না, আমি নিজেই গিয়ে দেখছি।

উড়ে গেলে দু' ঘণ্টাও তোর লাগবে না।

বিনোদিনী ততক্ষণে রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন। কিংবা সুমন্তই হয়তো রাখতে

বলেছে। ওর তো এখন ঘুমোতে যাওয়ার সময়। না কি ঘুম থেকেই তুললেন, কে জানে। আগে যখনই ফোন করেছেন, অনেক হিসেব কষে তবেই। আজ এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন, যে হিসেব নিকেশ করতেও ইচ্ছে হয়নি। মনে হয়েছিল এক্ষুনি এক্ষুনি না করলে কিছু একটা ঘটে যাবে।

টেলিফোন করে আরও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

'আ'ল টক ইট ওভার।' যেন একজন উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল অফিসার বলছেন যে বিষয়টা নিয়ে অধস্তনের সঙ্গে কথা বলবেন। কোনও ব্যাপারই যেন এদের নাড়া দেয় না, সবসময় পাল্স্‌-রেট নরম্যাল। শরীরে আরও কিছু অদৃশ্য তন্ত্রী থাকে, মায়ামমতা, উদ্বেগ, আশঙ্কা—এসব বোধহয় এদের কিছুই নেই।

আসলে বড় ছেলেকেই একমাত্র ভরসা ভেবেছিলেন, কিছু একটা উপায় বের করতে পারবে, বাবার দুশ্চিন্তা ঘাড়ের ওপর নিয়ে নেবে। তার বদলে শুনলেন, আই উইল টক ইট ওভার।

এটা কি শুধু কথা বলার ব্যাপার। টেলিফোনেই সুরাহা হতে পারে কখনও ? তা হলে তো উনি নিজেই ফোন করতেন।

কোনও কাণ্ডজ্ঞানও যদি থাকত। দেখছিস কল-কালেক্ট করিনি, চচ্চড় করে মিটার উঠছে, ছেলেমেয়ের কথা, তোদের কথা, সে সব তো চিঠি লিখে জানালেই হয়। যে-জন্যে ফোন করা, আসল কথাটা তো মন দিয়ে শুনবি ! এতক্ষণ ধরে ফর নাথিং—

ছেলের ওপর ক্ষোভ, সে ভাবে দায়িত্ব ঘাড়ে নিল না বলে, নাকি ওই দশ মিনিট ধরে ফোন আটকে রাখার জন্যে, নিজেই বুঝতে পারলেন না।

একদিকে গর্ব করে কত ডলার পায় তাও বলে, আবার ধমক দেয় ডলার ডলার ভাব কেন, ডলার যা টাকাও তাই।

তা হলে আমার টাকার হিসেবটাই বা রাখবি না কেন ! এই যদি এখন আমাকেই টিকিট কেটে যেতে হয় !

একসময় কালীসাধনের এক বড়লোক বন্ধু জুটেছিল, ওঁর নিজের অবস্থা তখনও তেমন সচ্ছল হয়ে ওঠেনি, তার সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে গিয়ে হিমসিম। এখন ছেলের সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারছেন না। কি এক ধরনের আত্মসম্মানে লাগে বলেই কল-কালেক্ট করতে পারেন না, আবার মিটার উঠছে বলে আরেক আতঙ্ক। কত বিল আসবে কে জানে।

জড়োয়া গয়নায় বেনারসীতে বিনোদিনী রাজমহিষী সেজেছে, অথচ ওঁর একবার ফিরে তাকিয়ে দেখার ফুরসত নেই। ট্যাক্সির মিটারে চোখ আঁটা।

সেই অবস্থা থেকে এই অবস্থা।

সাধে কি আর অনন্তলাল কালীসাধনকে ফরচুনেট বলে।

এই নির্জনপুরীতে বুকের মধ্যে শূন্যতা নিয়েও দু' দিন আগে ফরচুনেট কথাটা শুনতে ভালই লেগেছিল। দুঃখ গোপন করেই হেসেছিলেন।

এখন কানের কাছে ওটা উপহাস হয়ে গেছে।

চাবি নিয়ে সুমন্তর ঘরের দরজাটা খুললেন। ঘুরে ঘুরে দেয়ালগুলো দেখতে শুরু করলেন। হঠাৎ মুখ থেকে অস্ফুটে বলে উঠলেন, কি কপাল করে যে এসেছিলি !

তারপর তিন তিনবার সারা বাড়ি রং করা হয়েছে। শুধু এই ঘরখানা বাদে।

সেই একবার বিনোদিনীর ওপর প্রচণ্ড চটে গিয়েছিলেন।

বাড়ি রং করা মানে তো সে এক তুলকালাম কাণ্ড। বিশেষ করে এত বড় বাড়ি। তাড়াতাড়ি সেরে দেবে মনে করে একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা লোক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

বাড়িতে হাঁটাচলাই দুষ্কর। এঘরে ভারা বাঁধছে তো ওঘরে ভারা ঝুলছে। সর্বত্র জল শপশপ, তার সঙ্গে মেঝেতে ব্রাশ থেকে ছিটিয়ে পড়া রং কিংবা প্রাইমার। নারকেলদড়ি জটলা করা এখানে ওখানে। আধপোড়া বিড়ি মিস্ত্রিদের।

এই বিরক্তিকর পরিবেশ থেকে পালানোর জন্যেই মিস্ত্রিদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে পুরনো দিনের অফিসে গিয়েছিলেন। বহুকাল রিটায়ার করে গেলেও ওঁর সময়কার কিছু লোক তো আছে। তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে দিনটা কাটিয়ে আসবেন ভেবে চলে গিয়েছিলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার, যতদিন চাকরি করেছেন, ধাপে ধাপে বেশ ওপরেই উঠেছিলেন, কোনওদিন টের পাননি লোকগুলো ওঁকে পছন্দই করে না। দিব্যি হেসেখেলে গল্প করে সারাটা জীবন কাটিয়ে এসেছেন যেখানে, রিটায়ারমেন্টের পর যার কাছেই যান, প্রথমটা বেশ উল্লাস, আরে কালীসাধনবাবু যে, কেমন আছেন, তারপর বেয়ারাকে, চা নিয়ে এসো। চা নিয়ে এসো। কে এসেছেন দেখছ না! তারপর চা এল কি না এল খোঁজ নেই। চুপচাপ কাজ কিংবা অন্যের সঙ্গে গল্প, কালীসাধনবাবু বসেই আছেন। একসময় : উঠি, আবার বাসে ভিড় শুরু হয়ে যাবে। সেজন্যে আর বড় একটা যেতেনই না। যে লোকগুলো বিপদে-আপদে এত কাছে ছিল তারা কি করে যে এত দূরে সরে যায়!

ছেলেরাই সরে গেছে, ওদের কি দোষ।

তবু বাড়ি রং করার ঘিনঘিনে পরিবেশ থেকে পালানোর জন্যে সেই পুরনো অফিসে না গিয়ে পারেননি। ফিরেও এসেছিলেন তাড়াতাড়ি। ভাগ্যিস এসেছিলেন।

যে ঘর আর বারান্দা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, এসে দেখেন মিস্ত্রিরা কাজ শেষ করে ওই খোকার ঘরের দরজা খুলে ফেলেছে, ভারা ঢোকাচ্ছে।

প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন কালীসাধন। বিনোদিনীর ওপর, মিস্ত্রিদের ওপর।

—নিকালো, নিকালো সব, এক্ষুনি নিকালো।

চেঁচিয়ে বলে উঠলেন মিস্ত্রিদের। আর বিনোদিনীর ওপর প্রায় খেপে গিয়েছিলেন। —পই পই করে বলে গেলাম, আজ ওই পর্যন্তই থাকবে, তুমি খোকার ঘরখানা খুলে দিলে?

বিনোদিনী হয়তো বুঝতেই পারেননি ব্যাপারটা।

মিনমিন করে বললেন, ভাবলাম খোকা যদি হঠাৎ একদিন আসে...

খোকা, খোকা, খোকা!

সুমন্তর ওপর তখন কালীসাধনের প্রচণ্ড অভিমান। ওঁর এই একাকিত্বের জন্যে সুমন্তই যেন দায়ী। এই শূন্যতার জন্যে।

বেশ জোরের সঙ্গে উনি বলে উঠলেন, ও ঘর আমি রং করতে দেব না, যেমন আছে তেমনি থাকবে। কোনওদিন না।

তেমনই আছে।

বিনোদিনী সেদিন বুঝতে পারেননি। অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, ধমক খেয়ে চোখে জল এসে গিয়েছিল তাঁর। নিজের ঘর রং হল কি না হল তা নিয়ে এতটুকু মাথাব্যথা ছিল না বিনোদিনীর। কিন্তু খোকা কিংবা নান্টু, যদি কেউ আসে, চার পাঁচ বছর অন্তর একবার তো আসে, আসবেই। তখন যাতে ওদের অসুবিধে না হয়, নোংরা না লাগে, সেজন্যেই আগেভাগে ঘরটা রং করাতে গিয়েছিলেন। ছেলেরা যত দূরেই থাক, তারা তো ওঁর বুকের কাছটিতেই আছে!

বিনোদিনীর চোখে জল দেখে কালীসাধন ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন। কান্নার স্বরে বলে উঠলেন, আমার কে আছে, কেউ তো নেই। রাস্তায় রাস্তায় ওই খ্যাপা

ভিখিরিটার মতো ঘুরে বেড়াই।

লোকটার বুকের মধ্যে যে এতখানি লুকোনো কষ্ট, বিনোদিনী কোনওদিন জানতে পারেননি।

কালীসাধন ততক্ষণে নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন। মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বললেন, আমার তো এখন ওই একটাই সঙ্গী, ওই ঘরখানা, ওর দেয়ালগুলো।

বিনোদিনী হেসে ফেললেন, বুঝতে পারলেন। কার কাছে কোনও জিনিসের যে কি দাম কেউই কোনওদিন বোঝে না। বিনোদিনীও বুঝতে পারেননি। উল্টে তিনি ভেবেছেন দেয়ালগুলো নোংরা অপরিষ্কার করে দিয়ে গেছে, খোকা এসে ও সব দেখলে বিরক্ত হবে। সেজন্যেই ও ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

কালীসাধন হাসতে হাসতে বললেন, কার সঙ্গে আর কথা বলব, আপিসে গেলেও তো কেউ আর কথাই বলে না, সমীহ করা তো দূরের কথা। আমি ওই ঘরের দেয়ালগুলোর সঙ্গে কথা বলি।

একটু থেমে বলেছিলেন, তুমি যেগুলোকে দেয়াল নোংরা করা ভাবছ, ওরা আমার সঙ্গে কথা বলে।

কথা বলার জন্যেই চাবির থোকাটা নিলেন দেরাজ থেকে। বিনোদিনী চাল বাছছেন মোড়ায় বসে। চাল ডাল বাছা, রান্না করা, আঙুরকে ফরমাস করা, সময় পেলে খোকা বা নাণ্টুর সংসার নিয়ে কথা বলা। ওর অনেক কিছু আছে।

মনে মনে ভাবলেন, আমার যে কিছুই নেই।

এখন চোখের সামনে একটা বিপর্যয়, তাই দেয়ালগুলো আরও দামি হয়ে উঠেছে।

মানুষ সাফল্য চায়, কিন্তু সাফল্য কাকে বলে তা হয়তো জানেই না।

অন্তত কালীসাধন নিজে জানতেন না।

ওঁর পৃথিবী তো চিরকাল এই সংসারকে ঘিরে। কত কি স্বপ্ন তখন, স্বপ্ন সফল হয়ে যাওয়াও যে এত কষ্টের জানতেন না।

খোকা এল, একটু একটু করে বড় হচ্ছে, কি উদ্বেগ তাকে নিয়ে।

উনি নিজে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠেছেন, ছেলেকে যেন ক্রাচে ভর দিতে না হয়। কি ছোটাছুটি একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করার জন্যে। ছেলের স্কুলের খরচ জোগাতে গিয়ে নিজেদের জন্যে যা কিছু ব্যয় সবই মনে হয়েছে অপব্যয়। কৃপণের মতো সাদামাটা জীবন কাটিয়ে এসেছেন। তবু নিজেদের অসুখী মনে হয়নি কোনওদিন।

আপিস থেকে ফিরে বই খাতা নিয়ে বসে পড়তেন ছেলেকে পড়াতে। হোম টাস্ক করে দিতেন, দেখে দিতেন।

এই অনন্তলাল একজন ভাল টিউটর দেখে দিয়েছিল খোকা যখন ক্লাস নাইনে। বাড়িতে এসে পড়াতে বলবেন এত টাকা কোথায়। দু'বার বাস বদলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পড়ে আসতে হবে, আরও দুটি ছাত্রের সঙ্গে। নাণ্টুকেও ঠিক ওভাবেই পড়িয়েছেন।

হাসতে হাসতে গর্ব করে বলেছেন, ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে গেলে আর আমার ভাবনা কি।

নিজের পায়ে দাঁড়ানোকেই ভাবতেন অনেকখানি। তার বেশি কোনও উচ্চাশা ছিল না।

খোকা এমনিতেই বেশ ইনটেলিজেন্ট। ভাল রেজাল্ট করেছিল। তিন তিনটে লেটার। স্কুলের মাস্টারমশাইরা আশা করেছিলেন আরও বেশি।

সবাই বললে, জয়েন্ট পরীক্ষার জন্যে তৈরি করুন।

প্রথমবার পারেনি। দ্বিতীয়বারে উতরে গেল। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়ে গেল।

তাও কি কম উদ্বেগ গেছে। ইন্টারভিউয়ে ডাকই এল না, ভাল নম্বর থাকা সত্ত্বেও।

কেরানিদের কারসাজি চেপে দিয়েছিল। চেপে দিতে পারলেই তার চেনা কাউকে ঢোকানো সহজ। কিংবা টাকা খেয়ে।

আপিসের একজন পরামর্শ দিল। গিয়ে খোঁজ করুন, ডাকে হারাতেও পারে।

খোকাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সটান কলেজে। গিয়ে দেখলেন লিস্টে নাম নেই, অথচ মিনিমাম নম্বরের চেয়ে খোকার নম্বর অনেক বেশি।

সে যে কি উদ্বেগের দিন গেছে।

এক প্রফেসরকে গিয়ে ধরলেন। স্যার স্যার। যেন কালীসাধন নিজেই ছাত্র।

জয়েন্টে খোকার নম্বর শুনে ভদ্রলোকের কপাল কুঁচকে উঠল। বললেন, আসুন তো দেখি।

আপিসের কেরানি পানের ছোপ লাগানো দাঁত বের করে হাসল। —কপি করার সময় কি করে যেন বাদ পড়ে গেছে।

ইন্টারভিউয়ের দিনে ভাগ্যিস কালীসাধন সঙ্গে এসেছিলেন, সবারই ডাক এল, ওরই ডাক এল না। অথচ টাঙানো লিস্টে নাম আছে।

কালীসাধন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই প্রফেসর ভদ্রলোককে, পান চিবোনো দাঁত সেদিন আসেইনি।

পেয়ে গেলেন, প্রফেসর ভদ্রলোক রেগেমেগে ঢুকে গেলেন ইন্টারভিউয়ের ঘরে।

তিনি বেরিয়ে আসার পর ডাক এল। ভর্তি হয়ে গেল।

সেই ছেলে এখন নিউ জার্সিতে। একটা কেরানির দুর্নীতি তার জীবনকে শেষ করে দিতে পারত। এদেশে দুর্নীতি যতদিন আছে ততদিন ভাগ্য না মেনে উপায় নেই।

খোকা পাশ করে একটা চাকরিও পেয়েছিল, এখানেই। কিন্তু ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিল। আসলে ও বরাবরই খুব অ্যাম্বিশাস।

নান্টু তখন ফিজিকস অনার্স নিয়ে পড়ছে। সোমলতা তখনও কলেজে ঢোকেনি। সোমলতা নাম রেখেছিলেন তার দাদু। বিনোদিনীর বাবা। ওঁর কাছে অবশ্য বেলু।

বেলুকে উনি ভালবাসতেন, আদর করতেন একটু বেশি বেশি। সব সময় কাছে কাছে।

বেলু যখন সেই ছোট্টটি, বিনোদিনীর বাবা এসে কালীসাধনকে সর্বক্ষণ 'বেলু' 'বেলু' করে ডাকতে দেখে হেসে বলেছিলেন, এমন মেয়েঅন্ত প্রাণ কালীসাধনের, মদভাঙ তো খায় না, বেলুই ওর নেশা।

সেজন্যেই কিনা কে জানে, সোমলতা নাম দিয়েছিলেন। ওঁরা ফেলে দিতে পারেননি।

সেই বেলুকে নিয়েই এতদিন বাদে এই দুর্যোগ।

খোকার এই ঘরের দেয়ালে দেয়ালে নানা রঙের এই যে সব আঁকিবুকি এ সবই বেলুর মেয়ের। কালীসাধনের ছোট্ট নাতনি মিঙ্কুর।

সে অনেককাল আগের কথা, ছ'সাত বছর তো হবেই, মিঙ্কু তখন মাত্র চার বছরের ; বেলু মানে সোম, সোমলতা একবার এসে মাসখানেক ছিল। জামাই অবশ্য আসেনি, এত লম্বা ছুটি পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্তত বেলু তাই বলেছিল।

ওঃ, সে যে আনন্দের দিন গেছে কালীসাধনের—কালীসাধনের এবং বিনোদিনীর।

যেন কতকাল পরে ওঁরা বেলুর হাসিমুখ দেখলেন। আর চার বছরের ছোট্ট মিঙ্কু কালীসাধনের শূন্য হৃৎপিণ্ডের ওপর পিঁড়ি পেতে বসে পড়ল।

তার অনেক আগে থেকেই ওঁকে একেবারে একা করে দিয়ে সকলেই চলে গেছে। একজন ফরচুনেট মানুষের সব দিক থেকে সাফল্য বলতে যা বোঝায় উনি তখন ঠিক

তাই। নিঃসঙ্গ, একা, নিঃস্ব। বিনোদিনী পাশে থাকতেও। একটা বাড়ি, ওঁর চোখে বিশাল, কিন্তু জনহীন—সেই বাড়িটার যেন পাহারাদার উনি।

সেই শূন্যতায় হঠাৎ যেন কেউ সুন্দর নকশা কাটা পোর্সিলেনের টবে একটা সজীব লিলি ফুলের গাছ রেখে দিয়ে গেছে, গাছে একটা উল্লসিত লিলি ফুল ফুটে আছে। মোহময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে কালীসাধনের সারা শরীর মন শুধু মুগ্ধতা আর মুগ্ধতা।

বিনোদিনী বললেন, খোকার ঘরটাতেই তুই থাক।

কারণ সুমন্তর ঘরখানা ছিল ওঁদের ঘরের পাশেই।

বেলুর বিয়ে দেওয়ার আগেই বাড়ি তৈরির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন কালীসাধন। তখন উনি অনেকটা ঝাড়া হাত-পা। আর কোনওদিকে কোনও পিছটান নেই। ওঁর তখন চাকরিতে অনেক উন্নতিও হয়েছে। টাকার টানাটানি থেকে প্রায় মুক্ত। নানা দিক থেকে জড়িয়ে জুটিয়ে একটা বাড়ি করে ফেলা যায়।

বিনোদিনীই চিন্তাটা মাথায় ঢুকিয়েছিলেন, মাঝে মাঝেই বলতেন।

ভব ভরাট সংসার, বড় ছেলে সুমন্তর বিয়ে দেবার কথা ভাবছেন, সেই সময়েই বিনোদিনী বললেন, নাকি কালীসাধন নিজেই বলেছিলেন, মনে নেই।

—ছেলের বউ নিয়ে আসার আগে ওরা শোবে কোথায় সেটা ভেবেছ।

সেই সময় থেকেই জমি খোঁজাখুঁজি।

অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক চিঠি চালাচালি, দালালদের কাছে ঠকে ঠকে যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিচ্ছেন, এই অনন্তলাল একদিন বলে বসল, আমাদেব পাড়ায় জমি আছে, গলিটা সরু, কিন্তু দক্ষিণে রাস্তা। যদি বলো খোঁজ নিয়ে দেখি।

কালীসাধন আর বিনোদিনী ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

প্রথমে একতলা, পরে দোতলায় একখানা ঘর, দু'খানা ঘর—এটা খোকার, তিনখানা—নান্টুর জন্যে, আরে মেয়ে-জামাইও তো আসবে মাঝে মাঝে—ওদিকেরটা ওদের জন্যেই থাকবে, খোকাব ছেলের জন্যে ওটা পড়ার ঘরও হবে। আর ওই ছাদটুকু থাক, কাপড় শুকোবার জন্যে, পরে যদি পারে, নান্টুর ছেলে...

কত কি স্বপ্ন, আর ফরচুনেট লোকদের সব স্বপ্নই কেমনভাবে পূরণ হয়ে যায়।

—এ যে পেল্লায় বাড়ি হে। প্রথমে তো বুঝতেই পাবিনি, টুকটুক করে করছিলে যখন, ভেবেছিলাম মাথা গোঁজার আশ্রয়। এ যে রাজপ্রাসাদ।

বিনোদিনীর বাবা তখনও বেঁচে, একদিন এসে বলেছিলেন।

বিনোদিনী হেসে বলেছিলেন, বাবা, বাড়িটাই দেখছ, আমার কি হাল হয়েছে সেটা চোখে পড়ছে না। মিস্ত্রি খাটিয়েছি তো আমি, রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে...

কালীসাধন বলেছেন, আর কোথায় সস্তা ইট সুরকি, কোথায় পুরনো দরজা, সেসব জোগাড় করতে আমার যে কালঘাম ছুটে যেত...

বিনোদিনীর বাবা হেসে বলেছেন, তবে তোমার ওই লোহার গেটটা বড় সুন্দর হয়েছে কালী। ময়ূর-ময়ূরী—খাসা।

'সাহেববাড়ি ভাঙা হইতেছে' বিজ্ঞাপন দেখলেই ছুটতেন কালীসাধন। কখনও কখনও বাসে যেতে যেতে দেখলেন ভাঙা বাড়ির সামনে স্তূপীকৃত হয়ে আছে পেল্লায় পেল্লায় দরজা-জানালা, কড়ি-বরগা, ইটের স্তূপ। অমনি নেমে পড়লেন, কোনটা সস্তায় পাওয়া যায়। বিশাল মাপের দরজার দিকে তাকিয়ে হিসেব করেছেন কাঠমিস্ত্রিকে দিয়ে নতুন করে ওই কাঠ থেকে বানিয়ে নিলে সস্তা পড়বে কিনা। তারপর আচমকা একদিন পেয়ে গেলেন এই লোহার গেট। দু' পাল্লার মাঝখানে দুটি ময়ূর, মুখোমুখি। ঢালাই লোহার হলেও ময়ূব।

এখনও আরামকেদারায় বসে বসে তাকিয়ে দেখেন।

পুরনো দিনের কথা আর ভাবতে ইচ্ছে করে না।

রক্ত জল করা এই বাড়ি এখন শুধুই শূন্যতা।

কেন যে এমন হয়!

সারা বুক গর্বে ভরে উঠেছিল।

সমস্ত পৃথিবীটা কত বড় কখনও জানবার চেষ্টা করেননি, সংসারই ছিল একটা গোটা পৃথিবী। আর কোথাও যেন কিছু নেই। কিছু থাকার প্রয়োজনও নেই। আমার সংসারই আমি।

ছেলেমেয়েকে মানুষ করা, তাদের বড় হওয়া, মেয়ের বিয়ে, তার সুখী হওয়া, নাতিনাতনি হবে, ঘর কল-কোলাহলে উপছে পড়বে—দরকার হলে খোকা আর নান্টু তে তলাটা করে নেবে। কি আনন্দ, কি সুখ।

একতলাটা হওয়ার পরই সুমন্তর বিয়ে দিলেন। খুঁজেপেতে নম্রস্বভাব একটা সুন্দর মেয়ে। সর্বক্ষণ বাবা বাবা, মা মা। সুমন্ত কেমন মাথা নিচু করে কথা শুনত।

কিন্তু ওর মধ্যে কি একটা জেদ ছিল বড় হবার। উনি নিজেও তা মনে মনে চাইতেন। ছেলে বড় হলে, উঁচুতে উঠলে, কার না গর্ব হয়।

—একটা মানুষের অ্যাম্বিশন না থাকলে তার বেঁচে থাকারই মানে হয় না।

একদিন নান্টুকে বোঝাচ্ছিল খোকা। কারণ নান্টুর মধ্যে কেমন একটা তৃপ্ত ভাব ছিল সবসময়। যা আছি, ভাল আছি।

ওই সব কথা শুনলে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত সুমন্ত। তাঁর খোকা।

—একটাই কথা, আরও ভাল থাকব না কেন। খোকা বলেছিল।

কথাগুলো একটু বোধহয় বুকে গিয়ে বিঁধেছিল কালীসাধনের। একটু বোঝার চেষ্টা করেছিলেন, কথাগুলো ওঁকেই বলছে কিনা!

নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন, আমার কি অ্যাম্বিশন ছিল না? তোরাই তো আমার অ্যাম্বিশন, তোদের বড় হওয়া, নিজের পায়ে দাঁড় করানো, তোদের জন্যে এই বাড়ি। আর কি চাই আমার!

তারপরেই মনে হয়েছে, না না, ভুল ভুল। কথাগুলো নিশ্চয় ওঁকে উদ্দেশ করে নয়।

সেই ছেলে এখন অ্যাম্বিশনের চূড়ায় পৌঁছতে চাইছে।

ওর আর দোষ কি, ওঁর নিজেরও কি কম গর্ব হয়েছিল। আপিসে সহকর্মীদের, এই অনন্তলালকে, যেচে যেচে গিয়ে আত্মীয়স্বজনের কাছে কপট দুঃখ জানিয়ে বলেছেন, আর বোলো না, বড় ছেলে ভাল চাকরির লোভে ড্যাং ড্যাং করে আমেরিকা চলে যাচ্ছে। স্টেটসে।

খোকার মুখেই শুনেছিলেন, স্টেটস।

বাড়ি করার পর যেমন একে-ওকে নেমন্তন্ন করছিলেন, এসো একদিন, আমার ওখানেই খাবে, আড্ডা দেওয়া যাবে...

উদ্দেশ্য সেই একটাই, বাড়িটা দেখে যাক। লোকে আজকাল ফ্ল্যাট কিনলেও ডেকে ডেকে দেখাতে চায়। সেখানে এটা তো একটা গোটা বাড়ি, লোহার গেট, সামনে এক চিলতে মাটি, গাছ লাগানো যায়। শুধু একটাই প্রশ্ন, কার জন্যে লাগাবেন।

সেই গাছ, একজনই লাগিয়ে দিয়ে গেছে। সেই ফুল একজনই ফুটিয়ে দিয়ে গেছে। মিঙ্কু, চার বছরের ফুটফুটে সেই মেয়েটা। খোকার ঘরের চার দেয়ালে।

মন খারাপ হলে বুকের মধ্যে কেমন একটা শূন্যতা চেপে বসে। বড় কষ্ট হয়। সে কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যায় না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলতে পারলেও সে কষ্ট

কমত। কিন্তু চোখে ছাই জলও আসে না।

তখন নিঃশব্দে খোকার ঘরের চাবিটা চেয়ে নিয়ে এসে দরজা খোলেন। ভিতরে ঢুকে ঘুরে ঘুরে দেয়ালগুলো দেখেন, দেয়ালের রঙ-বেরঙের আঁকিবুকি, সদ্য শেখা অক্ষরে কয়েকটা শব্দ। ইংরেজি অক্ষরে।

সেবার এসে একটা মাস ছিল বেলু। সোম—সোমলতা। ওই ঘরেই শুতে দেওয়া হয়েছিল, ওঁদের ঘরের পাশেই বলে।

রাতের শোয়াটুকু শুধু, সারাটা দিন বেলু মা'র কাছে কাছে, পাশে পাশে। কখনও হয়তো গল্প করছে চাপা গলায়। কালীসাধন এলেই সব চুপ।

কখনও সন্দেহ করেননি, কারণ ওঁর কাছে যখনই আসত বেলু দিব্যি হাসিখুশি।

আর কালীসাধনের যত বন্ধুত্ব ওই মিঙ্কুর সঙ্গে। সুমন্তর ছেলেমেয়ে—মেয়ে সাগো, সাগরিকা, দু'চারদিনের জন্যে হলেও তারাও তো এসেছে। কিন্তু এত কাছে আসেনি। আনতে পারেননি।

—দাদু, আমাকে একটা জিনিস এনে দেবে ?

মিঙ্কু বলল একদিন।

কালীসাধন মিঙ্কুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি চাইলে দেব না এমন জিনিস আছে নাকি।

মিঙ্কু কি বুঝল কে জানে, বেশ হুকুমের স্বরে বললে. আমাকে একটা প্যাস্টেল বক্স এনে দিয়ো তো !

—এইটুকু ! কালীসাধন হেসে বলেছেন, আজই এনে দেব।

মিঙ্কুর ছবি আঁকার শখ। তা কেন, আজকালকার সব ছেলেমেয়েরই। মুখে 'মা' ফুটতে না ফুটতে হাতে কাগজ-পেন্সিল জুগিয়ে দেওয়া হয়। রং পেন্সিলের বাক্স আর ড্রয়িং খাতা।

কালীসাধন লক্ষ করেছিলেন, যেখান থেকে পায় কাগজ কিংবা খাতা টেনে নিয়ে গিয়ে পেন্সিল দিয়ে সদাসর্বদা ছবি আঁকে মিঙ্কু। সব ছেলেরাই যেমন আঁকে। দু' একটা আঁকার পর দেখিয়েছে ওঁকে, জিগ্যেস করেছে, কেমন হয়েছে ? ওঁকে বলতে হয়েছে, বাঃ, চমৎকার।

তা শুনে মিঙ্কুর মন্তব্য, চমৎকার আবার কি, নাইস বলতে পারো না।

হো হো করে হেসে উঠেছেন কালীসাধন। মনে মনে ভেবেছেন, এও হয়তো সাগোর মতো হয়ে যাবে। আমরা তো আত্মীয়স্বজনদের রিলেটিভ বলি, রিলেশনস। সাগো বলত, ফোক্‌স্।

উনি রং-পেন্সিলের বাক্স বলেন, মিঙ্কুর মুখে এখনই বক্স।

এতদিন বাদে বেলু বাপের বাড়ি এসেছে, একমাস থাকবে। ঘরগুলো একেবারে ফাঁকা মাঠ হয়ে ছিল, কবরখানার মতো নিঃশব্দ, বেলু আর মিঙ্কু আসার পর, অনেকদিন পর, হাল্কা ভল্যুমে গান বাজছে। বেলুই চালিয়েছে হয়তো। টু ইন ওয়ান আছে, ক্যাসেট আছে অগুন্তি। বড় বউমা, এই বেলু, এরাই কিনেছিল, কে কোনটা তা মনেও নেই। দু'চারটে বেছে বেছে নিয়ে গেছে, বাদবাকি সবই পড়ে আছে এখানে। ওদের এখন আর ওসবে কোনও আগ্রহই নেই। কি সব হল্লাবাজির গান শুরু হয়েছে, চেঁচামেচির। সাগো তো কি একটা ক্যাসেট এনেছিল, দিনে বিশবার বাজাচ্ছে, এমন জোরে যে কড়িবরগা খসে পড়ার জোগাড়। বিনোদিনীর দু'একটা পছন্দসই গান ছিল, আগে বাজাত মিহি সুরে। কালীসাধনও শুনতেন। আজকাল শোনেন না, বিনোদিনীরও ইচ্ছে হয় না।

এ বাড়ি থেকে গান লুপ্ত হয়ে গেছে। যার বুকে ভীষণ কষ্ট, তার কষ্টের গান ভাল

লাগে না, আর যার মনে আনন্দ নেই আনন্দের গানও তার কাছে অসহ্য। যারা বলে ভাল লাগে, তৃপ্তি দেয়, তারা মিথ্যে কথা বলে। তারা কষ্ট কি, আনন্দহীনতা কি তা জানেই না। তারা সব শখের কষ্টে পাগল।

এ বাড়িতে আনন্দের সব উপকরণই আছে, নেই শুধু আনন্দ। গান বাজালে কবরের ওপর বসে ব্যাঞ্জো বাজানোর মতো লাগবে। রাস্তার লোকের কানে মিষ্টি শোনাবে ঠিকই, যে বাজায় তার তো বুক জ্বলে যায়।

আগে সন্ধের পর টি ভি খুলে দিয়ে দু'জনে তার সামনে বসে থাকতেন চুপচাপ। আজকাল তাও ভাল লাগে না। লাগবেই বা কেন। এ বয়েসে হিন্দি ছবির অসভ্য রমণনৃত্য, আর নয়তো মন্ত্রীর-প্রধানমন্ত্রীর বক্তিমে। যে চ্যানেলেই যাও শ্রীমুখ দেখতে হবে।

টি ভি আজকাল আর দেখা হয়ে ওঠে না।

সুমন্তর মেয়ে সাগরিকা—সাগো, একদিন টি ভি খুলে তো হেসেই বাঁচে না। এপার ওপার কারও পছন্দ নয়, কারা এসব পছন্দ করে কে জানে।

তারই ফাঁকে হঠাৎ এই শূন্য বাড়িটায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বেজে উঠেছে। বুক নিংড়ে উঠে আসা গানের কলি, ব্যথার, কষ্টের, তবু কি ভাল যে লাগত।

বেলু চালিয়েছে।

বেলু আর মিঙ্কু এসে পড়ায় পায়রার বকম বকম ডানার ঝটপটানি শোনা যাচ্ছে।

আর বুক জুড়ে বসে আছে মিঙ্কু।

বলেছে, একটা প্যাস্টেল বক্স এনে দিয়ো।

পামশুতে কালি পড়েনি, পালিশ হয়নি কতদিন। চটি পরেই আজকাল চালিয়ে দেন। কোথায়ই বা যাবার আছে। বাজার মাছ শাকসবজি অবধি দৌড়।

পামশু ব্রাশ করে রেখেছিলেন, রোদ পড়ে আসতেই জামাটা গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়লেন।

—তুমি আবার এখন কোথায় চললে ? বেলু জিগ্যেস করল।

বিনোদিনীর চোখেও প্রশ্ন।

কালীসাধন বললেন, আসছি।

কাছাকাছি পাড়ার দোকানে যে পাওয়া যাবে না তা নয়। কিন্তু থালার খাবারটাই গৌণ, কিভাবে পরিবেশন করা হ'ল সেটাই আসল। মিঙ্কুর জন্যে শরীরকে একটু কষ্ট দিতে ইচ্ছে হ'ল। ভাবলেন, ধর্মতলা কিংবা নিউ মার্কেটের কোনও দোকান থেকে কিনে আনবেন। ওখানে কত রকমের সব পাওয়া যায়, দামি দামি।

একটা বড় পুতুল কেনারও ইচ্ছে, বারবি ডল না কি যেন। সোনালি চুল, চোখ ওলোটপালোট হয়।

আঁকাআঁকির কিছুই তো জানেন না ; বেশ দামি দেখে এক বাক্স প্যাস্টেল কিনলেন। একটা ডল পুতুলও।

যেন দিগ্বিজয় করে ফিরছেন এমনি আনন্দ নিয়ে ফিরে এলেন।

মিঙ্কুভাই, এই নাও তোমার প্যাস্টেল বক্স।

খুশি মুখে নিল মিঙ্কু, ছোট্ট করে : থ্যাঙ্কিউ।

কি আঁকছে না আঁকছে কেউই কোনও খোঁজ রাখেনি। বেলু তো সব সময় মা'র কাছে কাছে। আর বিনোদিনী মাঝে মাঝেই গিয়ে দেখছেন রান্নার লোক ঠিকঠাক পারছে কিনা। তখন রান্নার লোক ছিল, তবু নিজেই হাত লাগাচ্ছেন। এতদিন বাদে মেয়ে এসেছে, সে কি খেতে ভালবাসে না বাসে সব তাঁর জানা।

মেয়েজামাইয়ের জন্যেও একটা ঘর তুলেছিলেন কালীসাধন, দোতলায়। উদ্দেশ্য ছিল পরে সুমন্তর ছেলে থাকবে ; বড় হ'লে।

সুমন্তর ঘরের মেঝেতে নিজে পছন্দ করে ভাল মোজেক টাইলস এনে বসিয়েছিলেন। সুন্দর নকশা। আর নিজেদের ঘরখানার মতোই ওই ঘরের দেয়ালেও প্লাস্টার অফ প্যারিস। ঘরে আলো বেশি ঢুকবে বলে অফ হোয়াইট। বিয়েতে যৌতুক পাওয়া খোকার যাবতীয় ফার্নিচার ওই ঘরেই।

বেলু-মিঙ্কুর থাকার ব্যবস্থা হল ওইখানেই।

মিঙ্কুকে ওঘরে শুইয়ে রেখে বেলু শুয়েছিল মা'র কাছে।

বিকেলবেলায় হইচই চিৎকার।

কালীসাধন বিনোদিনী দু'জনেই ছুটে গেলেন খোকার ঘরের দিকে। ওখান থেকেই বেলুর চিৎকার ভেসে আসছে।

গিয়ে দেখেন, বেলু বেদম পেটাচ্ছে মিঙ্কুকে, আর মিঙ্কু ভেউ ভেউ করে কাঁদছে।

বিনোদিনী ছুটে গিয়ে মিঙ্কুকে টেনে নিয়ে আড়াল করলেন।

—তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! রাগের স্বরে কালীসাধনও চিৎকার করে উঠলেন।

ওইটুকু বাচ্চা মেয়েকে ওভাবে মারতে দেখে রক্ত চড়ে গিয়েছিল মাথায়।

এমন কি বিনোদিনীও বলে বসলেন, তোর কি একটুও মায়াদয়া নেই মিঙ্কুর ওপর।

বেলু তখনও থরথর করে কাঁপছে রাগে। রাগের স্বরেই বললে, কি কাণ্ড করেছে দেখো। স্বগত স্বরে কার উদ্দেশে কে জানে, বললে, মেয়েকে এটিকেট শেখাচ্ছে।

একটু থেমে : ছি ছি, ঘরখানা কি করে দিল বলো তো।

কালীসাধন ততক্ষণে দেখেছেন। বললেন, এর জন্যে তুই ওকে এত মারলি. ও তো রং করালেই আবার যা-কে-তাই হয়ে যাবে।

বেলু বাবার ওপরই রেগে গেল।—টাকা লাগবে না, না ? বিনাপয়সায় হবে। তোমার আদরের নাতনি, যাও গিয়ে মিস্ত্রি খোঁজো।

রাগ আর থামছে না। —তোমার জন্যেই তো হল, আদর করে নিউ মার্কেট থেকে রং প্যাস্টেল এনে দেওয়া হল।

কালীসাধন হেসে ফেললেন। —আমি কি ছাই জানতাম দেয়ালে আঁকবে।

চার দেয়ালে চোখ বুলিয়ে নিলেন। ওর হাত যদ্দূর যায় চার দেয়ালই রং-বেরঙের ছবি এঁকে ভরিয়ে দিয়েছে।

হয়তো বেলু ওকে শুইয়ে দিয়ে যাওয়ার পরই উঠে পড়েছিল। নতুন পাওয়া প্যাস্টেল বক্সের উল্লাসে সারা দুপুর ধরে ছবি এঁকে গেছে।

নিজের মনেই বলেছিলেন, বেশ করেছে, ফ্রেস্কো এঁকে দিয়েছে সারা ঘরে।

বলে হেসেছিলেন। সেটা মিঙ্কুর প্রতি স্নেহ বা প্রশ্রয়। বেলুর রাগ থামাবার জন্যে। বাবা কিছু মনে করেনি জানলে ওর রাগও পড়ে যাবে।

কিন্তু মনে মনে ভেবেছিলেন, একটা রং মিস্ত্রি এনে ও ঘরটা রং করিয়ে নেবেন। অফ-হোয়াইট। যেমন ছিল তেমনই। সুমন্ত কবে আসবে না আসবে ঠিক নেই, এলেও জানতে পারবে না। বেলুর মেয়েটা আমেরিকায় থেকেও ম্যানার্স শেখেনি বলে অনুযোগ করতে পারবে না। আসলে ওর তো ধারণা বেলুই ম্যানার্স শেখেনি। আমেরিকায় গিয়ে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। নিজেকে বিসর্জন দেওয়াটাই কেন যে গর্বের তা কালীসাধন বুঝতে পারেন না। আমাদের চোখ বা মুখের ভাব যে কৃতজ্ঞতা জানায় তার চেয়ে বড় হল একটা শুকনো 'থ্যাঙ্কিউ' আর 'প্লিজ' ? উপকারী বন্ধুর হাতে হাত দিয়ে যখন

বলি 'কি যে বলব তোমায় ...' তারপর আর কিছু বলতেই হয় না।

আশ্চর্য এই, বেলু চলে যাওয়ার পর বাড়িটা যেই আবার শূন্যতায় ভরে গেল, রং মিস্ত্রির কথা আর ভাবতেই পারলেন না। খোকা যা মনে করে করবে, চায় তো ওদিকের কোন ঘরে ওর আসবাবপত্র নিয়ে যাবে। এ ঘরে আর কাউকে হাত দিতে দেবেন না, রংমিস্ত্রিকে তো নয়ই।

মাঝে মাঝেই চাবি নিয়ে এসে ঘরটা খুলতেন, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন। মনে হত যেন মিঙ্কু রয়েছে কাছেই, কথা বলছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি ছবি দেখেছেন, মেয়েটা কি ভেবেছে, কি এঁকেছে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ একদিন এক জায়গায় চোখ আটকে গেছে। আড়াআড়ি করে এক পাশে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা Dad is bad.

বুকে এসে ধাক্কা লেগেছে। দাদু লিখতে চেয়েছিল কি? তা হ'লে লিখুক, ঠিক আছে। কিন্তু সত্যি যদি 'Dad' লিখে থাকে, কেন লিখল!

বিনোদিনীকে আর সে কথা বলেননি, গোপন করে গেছেন।

কিন্তু ছবিগুলো ওঁকে এখনও টানে। আসেন মাঝে মাঝে। শান্তি পান।

সেজন্যেই বিনোদিনীর ওপর রেগে গিয়েছিলেন, ঘর রং করার সময় ওই ঘরটার দরজা খুলে দিয়েছিলেন বলে।

চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, ও ঘর আমি রং করতে দেব না, দেব না। কোনওদিন না। ওই চিৎকারের মধ্যে মিঙ্কুকে শুধু বুকের মধ্যে জড়িয়েই ধরলেন না, প্রচণ্ড একটা ক্ষোভের সঙ্গে যেন সুমন্তর প্রতি একটা তীব্র ভর্ৎসনা ছুড়ে দিলেন। অথচ দু'জনই তখন হাজার হাজার মাইল দূরে। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। দু'জনই হয়তো তখন কালীসাধনের কথা বিস্মৃত হয়ে আছে।

দেরাজ থেকে চাবিটা নিয়ে এসে সেই ঘরখানার—এখন আর খোকার ঘর ভাবতে ইচ্ছে করছে না. এখন ওটা মিঙ্কুর ঘর, ও যেন এখনও চলে ফিরে বেড়াচ্ছে— দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। লাল নীল সবুজ আর কালো প্যাস্টেল রঙে আঁকা একটি শিশুহাতের আঁকাবাঁকা ছবি ফুটে আছে প্লাস্টার অফ প্যারিসের মসৃণ অফ হোয়াইট রঙের দেয়ালে। গাছ ফুল পাখি উদ্ভট চেহারার মানুষ, গরু কুকুর ঘরবাড়ি, একটা নৌকো, মোটরকার, রিকশা, একটা আকাশছোঁয়া উঁচু বাড়ি, গোল গোল চোখের মানুষ, আরও কত কি। সব ছবি ভাল বোঝাও যায় না, অপটু হাতে আঁকা, যেখানে যা খুশি রং। যতদূর তার হাত নাগাল পেয়েছে, কোথাও কোনও ফাঁক নেই। তারই এক ফাঁকে গাঢ় খয়েরি রঙে লেখা 'ড্যাড ইজ ব্যাড'।

মিঙ্কুকে প্রশ্রয় দেবার জন্যে, কিংবা বেলুর ওই প্রচণ্ড রাগের তাপ কমানোর আশায় হাসতে হাসতে বলে উঠেছিলেন, ও তো দিব্যি চার দেয়ালে ফ্রেসকো ছবি এঁকে দিয়েছে, রাগছিস কেন।

এখন সত্যি মনে হয় ফ্রেসকো। তাকিয়ে থাকলে বুক জুড়িয়ে যায়। মিঙ্কু আর কিছু না হোক, কয়েকটা দিনের সুন্দর একটা স্মৃতি দিয়ে গেছে। শূন্য একাকিত্বের জীবনে কয়েকটা সুন্দর দিনের স্মৃতি।

শুধু খিচখিচ করে বুকে এসে লাগছে তিনটি নির্মম শব্দ।

কেন লিখেছে কে জানে, হয়তো বেলুর দীর্ঘশ্বাসে ভরা ওই সুদীর্ঘ চিঠির মধ্যে তার হদিস লুকিয়ে আছে।

বুকের ভেতরে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কানে বাজল খোকার কথাটা। এখন সে আর খোকা নয়, সুমন্ত। ওয়েল ওয়েল, আ'ল টক ইট ওভার।

৩

বিনোদিনী বলেছিলেন, এবার বেলুর বিয়েটা দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। তারপর খোকার বিয়ে দিয়ে আমি বউ নিয়ে আসব। তখন আর আমাকে পায় কে।

শুনে হেসেছিলেন কালীসাধন। সে সময় এ বাড়িতে হাসি শোনা যেত। হাসি-আনন্দেরই দিন।

বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ভাল চাকরি করে। সদ্য তার একটা প্রোমোশন হয়েছে শুনেই বিনোদিনী বলেছিলেন। বেলু তখনও কলেজে, তবু ও বয়েসের মেয়ে বাড়িতে থাকলে কেউ ছেলের বিয়ের কথা আগে ভাবে না।

নান্টুকে নিয়েও কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। ওকে ইঞ্জিনিয়ার কি ডাক্তার করাতে পারেননি কালীসাধন। দু'দুবার জয়েন্টের পরীক্ষা দিয়েও তলানি হয়ে পড়ে রইল বলে সায়েন্স পড়িয়ে শেষে ধরাধরি করে একটা ফারমাসিউটিক্যাল কোম্পানির কেমিস্টের প্রফেসরি জুটিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

বলতে গেলে কালীসাধন আর বিনোদিনীর সব স্বপ্নই সফল হয়ে এসেছে, শুধু বেলুর বিয়েটাই বাকি।

বেলুর বিয়ের কথা উঠলেই কালীসাধনের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠত।

একটা মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ, কত দিক সামলাতে পারে। ভোগ কাকে বলে কখনও জানতে চাননি, শুধু শেষ জীবনটা নিশ্চিন্তে উপভোগ করবেন বলেই। ছেলেরা মানুষ হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। আর এই শেষ জীবনের আশ্রয়—বাড়িটা।

বেলুর বিয়ের কথা কি একেবারে ভাবেননি!

বিনোদিনীর বাবা একবার এসে বলে গিয়েছিলেন, বিনু, যখন যেমন পারবি দু'এক ভরি সোনা কিনে কিনে রাখ। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো।

সোনা শস্তা ছিল, বাবার কথা শুনে কিছু কিছু কিনেও রেখেছিলেন। বাড়ি করতে গিয়ে তার বেশির ভাগটাই বেচে দিতে হয়েছিল।

বিনোদিনী বুঝতে পেরেছিলেন স্বামীর কপালে দুশ্চিন্তার রেখা কেন ফুটে উঠেছে।

হেসে বললেন, অত দুর্ভাবনার কিছু নেই। রাজমহিষী হবার মতো চেহারা তো আর নেই, রাজমহিষীর গয়নাগুলো কি কাজে লাগবে। একটা হার আর হাতের কঙ্কণজোড়া রেখে দেব খোকা আর নান্টুর বউয়ের জন্যে। বাকি সবই বেলুর।

খারাপ লেগেছিল, তবু খুশিও হয়েছিলেন।

ভাল লেগেছিল, সেই কোন যুবকদিনের 'রাজমহিষী' কথাটা বিনোদিনী মনে রেখেছেন বলে। নিজে তো ভুলেই গিয়েছিলেন।

কিন্তু বেলুর বিয়ের জন্যে ওঁকে একটুও চেষ্টা করতে হয়নি। বিনোদিনী মাঝে মাঝে মনে পড়িয়ে দিলেও উনি কোনও চেষ্টাই করেননি।

বোধহয় কালীসাধন বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন, মানুষ নিজের চেষ্টায় কিছুই করতে পারে না। জীবনে যারা সাফল্যে পৌঁছতে পারে তাদের অনেকেই মনে করে, আমি যোগ্যতা দিয়ে নিজের চেষ্টায় এখানে এসেছি। আরেক ধরনের মানুষ হয়তো যোগ্যতা দিয়ে নিজের চেষ্টাতেই পৌঁছয়, কিন্তু মনে মনে তারা ভাবে আমার কি এমন যোগ্যতা ছিল, চেষ্টাই বা কতটুকু করেছি। কালীসাধন এই দলের।

সেজন্যেই অনন্তলাল যখন ওঁকে ফরচুনেট বলেছিল, তখন উনি রেগে যাননি, মিটিমিটি হেসেছেন। অনেকে কিন্তু রেগে যায়, ভাবে লোকটা তার যোগ্যতাকে দাম দিচ্ছে না। তার নিষ্ঠা, এবং হাড়ভাঙা চেষ্টা দেখতে পাচ্ছে না। এরা বোধহয় একটু

অহঙ্কারী প্রকৃতির মানুষ। সাফল্যই তো আসল, তার পিছনে ভাগ্যের জাদুকাঠি আছে কি নেই, জেনে কি লাভ।

অনন্তলালের কথা শুনে শুনেই হয়তো উনি নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। তা না হলে ওঁর পক্ষে এ রকম একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে ফেলা সম্ভব হত না। হোক না সরু গলি। একটু পড়ন্ত পাড়ায়। তাতেই বা কি যায় আসে।

ছোট শালা ছিল একটু ফাজিল টাইপের, ঈষৎ বখাটে। গৃহপ্রবেশের দিন, খুব ছোট করেই করেছিলেন, বলে বসল, জাম্মাইবাবু, করেছেন কি, এ যে রীতিমতো একঠো মাকান।

পনেরো বছরের বড় জামাইবাবুকে বিকাশ একটুও সমীহ করত না। তা না করুক, শালা তো, ওদের ওরকম অনেক লাইসেন্স আছে।

কিন্তু বাড়িটার জন্যে কোনওদিনই উনি নিজেকে ভাগ্যবান ভাবেননি। ফরচুনেট অবশ্যই, তবে ছেলেদুটির জন্যে। বিশেষ করে সুমন্তর জন্যে। সুশান্ত, মানে নান্টু, তার গায়েও এখন আর কোনও ধুলোময়লা লেগে নেই। জয়েন্টে দু'বার তলিয়ে যাওয়া, সে এখন আর কেউ মনে রাখেনি। কেউ প্রশ্ন করলে উনি বেশ গর্ব করেই বলেছেন, ছোট ছেলে ? সে তো এখন কেমিস্ট। কোম্পানির নামটায় কি যায় আসে, মাইনে তো কম পায় না।

নান্টুকে বেশি ভাল লাগত ওঁর। ওর মধ্যে বেশ একটা তৃপ্ত ভাব আছে বলে। প্রায় কালীসাধনের মতোই।

কিন্তু সুমন্ত একেবারে অন্যরকম। সবসময় খুঁতখুঁতুনি, কোন কিছুতেই যেন সন্তুষ্ট নয়। ছেলেবেলা থেকেই ভীষণ অ্যাম্বিশাস।

সেটা এমন কিছু দোষের নয়, কিন্তু যা পেয়েছি, পাচ্ছি, তার জন্যে এত অতৃপ্তিই বা থাকবে কেন।

তার আগের দিনই একটা প্রোমোশন হয়েছে, খবরটা শুনে বাড়িতে সবাই বেশ উৎফুল্ল। অনন্তলাল এসেছে বলে উনি নীচে বসার ঘরে বসে গল্প জুড়ে দিয়েছেন, ওই আরামকেদারায় বসে, তখন গদি আঁটা শোফা-কৌচ ছিল না, স্রেফ একটা তক্তপোশের ওপর তোশক। তোশকের ওপর ধোপদুরস্ত সাদা চাদর বিছোনো, সেকালে ফরাস বলত, তার ওপর অনন্তলাল ঠ্যাং ছড়িয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছে, হঠাৎ সুমন্তকে বাইরে থেকে ঢুকতে দেখে খাড়া হয়ে বসল।

কোট প্যান্ট গলার টাইয়ে সুমন্তকে দিব্যি স্মার্ট দেখায়। হাঁটাচলাতেও কেমন একটা চটপটে ভাব আছে। ওসবের জন্যে ওঁর সঙ্গে একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে যেন, তবু কালীসাধনের ভালই লাগে।

প্যান্ট পরলেও কোট শুধু শীতের দিনে, টাই বস্তুটা কোনওদিন তাঁর গলা চেপে ধরতে পায়নি। প্রথম দিন সুমন্তকে টাই পরতে দেখে হেসে বিনোদিনীকে বলেছিলেন, টাই তো কখনও পরিনি, ও বাঁধতে শিখল কার কাছে!

—তুমি তো কিছুই জানতে না, ওরা আজকাল সবই জানে।

খোঁটা কিনা বুঝতে পারেননি। যুবক বয়েসে গলায় একটা টাই আঁটলে বিনোদিনীর হয়তো ভালই লাগত, বাপের বাড়ির কাছে হয়তো একটু গর্ব হত, কিন্তু মুখ ফুটে কোনওদিন তা বলেনি।

—এই যে সুমন্ত, তোমার সঙ্গে তো দেখাই হয় না, কেমন আছ কেমন ?

দেয়াল থেকে পিঠ ছাড়িয়ে পা দুটো টেনে নিয়ে খাড়া হয়ে বসে অনন্তলাল কথা ছুড়ে দিল। কারণ সুমন্ত ওদের প্রায় উপেক্ষা করেই সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল।

নিতান্ত অনিচ্ছাতেই থেমে পড়ল।

উপেক্ষা তো করবেই, এই অনন্তলালই যে শিবপুরে গিয়ে আগেভাগে ওর জয়েন্ট পরীক্ষার র‍্যাঙ্ক নম্বরটা এক আত্মীয়ের কাছ থেকে জেনে এসেছিল, তা এখন আর ওর মনে থাকবে কেন। কেউই মনে রাখে না।

—কেমন আছ কেমন?

ও যে তার আগের দিনই একটা প্রোমোশন পেয়েছে, সে খবরটা কালীসাধন তখনও অনন্তলালকে জানাতে পারেননি। ওই ফরচুনেট কথাটা শুনতে হবে এই আশঙ্কায় নয়। আসলে অনন্তলালের ছেলে সরকারি আপিসে একজন সাদামাটা কেরানি হয়ে আছে বলেই আনন্দের খবরটা জানাতে ইচ্ছে করেনি।

উনি চাইছিলেন খবরটা সুমন্ত নিজেই জানিয়ে দিক।

কিন্তু সুমন্ত সেদিকেই গেল না, কুণ্ঠার সঙ্গে বলে বসল, থাকব আর কেমন, ঘানি টানছি আর কি। এ দেশে এ ছাড়া গতি কি।

অনন্তলাল বোধহয় বছরে দু'বার চুল কাটে, ঘাড় অবধি লম্বা লম্বা চুল, ঘাড় ঝাঁকালে সেগুলোও নাচে। ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিল, তা ঠিক, ঘানি টানাই সার।

কথার মধ্যে নিশ্চয় ওর লুকোনো ক্ষোভ কিছুটা ছিল, নিজের ছেলে বিশেষ কিছু হয়ে উঠতে পারল না বলে। নিজের ছেলেকে কে আর অযোগ্য ভাবতে পারে।

কালীসাধন বোধহয় সুমন্তর কথাগুলো অত ভাল করে শোনেননি। খোকা তখন সুমন্ত হয়ে গেছে, কথাবার্তাও ওই ধরনের। তাই হঠাৎ চমকে উঠতে হল একদিন।

বেশ কয়েক মাস পরের কথা।

বাবাকে মাকে উদ্দেশ করে বললে, এদিকে এসো, বোসো তোমরা।

সুমন্তর মুখ দেখে ওঁরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সাংঘাতিক কিছু কি!

ওঁরা নিঃশব্দে ভয়ে ভয়ে খাটে পা ঝুলিয়ে বসলেন।

সুমন্ত কোনও কথাই বলছে না, ওঁরা দু'জনেই উৎকণ্ঠ। আপিসে গোলমাল!

সুমন্ত হঠাৎ বললে, শোনো।

একটু থেমে, যেন প্রতিবাদ আসবেই এই আশঙ্কায়, বললে, শুনেই তোমরা যেন কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ো না।

আবার থেমে, দেড় বছর ধরে চেষ্টা করে...

দুম্ করে বলে বসল, আমি আমেরিকায় চাকরি পেয়েছি।

বিনোদিনী হতাশ গলায় বলে উঠলেন, কোথায়!

কালীসাধন শুধু বললেন, সে কি রে!

ভাঙন শুরু সেদিন থেকেই। সেদিন থেকেই কালীসাধনের বুকের ভেতরটা ভাঙতে শুরু করেছে। বিনোদিনী সেদিন থেকেই চুপচাপ। রাজমহিষী যেন এক ধাক্কায় পথের ভিখারিণী।

সাতটা দিন কিভাবে যে কেটেছিল বিনোদিনীর। স্নান-খাওয়া সব ভুলে গিয়েছিলেন, চোখে ঘুম ছিল না।

কালীসাধনের কিছুই ভাল লাগছিল না। সংসারে থেকেও যেন নেই। এ রকম একটা দুঃসংবাদ খোকার মুখ থেকে শুনতে হবে কোনওদিন ভাবেননি। তখন যে বিলেত-আমেরিকা অনেক, অনেক দূরে ছিল। ঘরের কোণে এসে হাজির হয়নি।

আনন্দে ডগমগ করছে সুমন্ত, বাবা-মা'র বিশুষ্ক দুশ্চিন্তার মুখ দেখে হাসিও পাচ্ছিল, কষ্টও।

বিনোদিনী মেঝেতে বসে রান্নার লোককে কুটনো কুটে দিচ্ছিলেন।

সুমন্ত হঠাৎ পিছন থেকে এসে মা'র কাঁধে হাত রেখে পাশে বসে বেশ আদর-আদর করে কি বলতে যাচ্ছিল।

বিনোদিনী ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, বঁটি, বঁটি। সরে যা।

থতমত খেয়ে গিয়েছিল সুমন্ত। মা'র কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সামনে মুখোমুখি বসল। —এত মুখ গোমড়া করে আছ কেন বল তো! আমি কি একেবারে চলে যাচ্ছি?

একটু থেমে বললে, মাঝে মাঝেই তো আসব। ওখানেও ছুটি আছে, নাকি নেই? প্লেনের টিকিট কাটব আর চলে আসব।

বিনোদিনী 'হুঁ' বলতে গিয়েও চোখ মুছেছিলেন।

কালীসাধনকে সুমন্ত বলেছিল, এই বাড়ি ছেড়ে কলকাতা ছেড়ে কোথায় যাব বল তো। পাঁচটা বছর শুধু, বেশ কিছু কামিয়ে নিয়ে চলে আসব। ওদেশে কি কেউ সারা জীবন থাকতে পারে নাকি।

বলেছিল, এখানে কাজের কোনও দাম নেই বাবা, যোগ্যতা এখানে ওয়ার্থলেস। আছে শুধু পলিটিক্স, সে অফিস পলিটিক্সই বলো আর পার্টি পলিটিক্সই বলো। সবই জেলাসির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

কালীসাধন হাসতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, বাঙালি শব্দের সিনোনিমই তো জেলাসি।

সুমন্তর আপিসে কোথাও কিছু অস্বস্তি আছে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওঁর। এমন কোনও অস্বস্তি, যা একটা কি দুটো প্রোমোশনের চাদর দিয়ে ঢাকা যায় না।

তা বলে একেবারে বিদেশে?

'ঘানি টানছি, এ ছাড়া এদেশে আর গতি কি!'

অনন্তলালের দিকে ছুড়ে দেয়া সুমন্তর সেই অসন্তোষ মনে পড়ে গেল। উচ্চাশা না অতৃপ্তি কোনটা যে ওকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ঠিক বুঝতেও পারেননি।

—শুধু একটা বছর। একটা বছর যেতে দাও। ঠিক চলে আসব। এসে এক মাস থেকে যাব।

ওইটুকুই ছিল কালীসাধনের সান্ত্বনা। মনে মনে ভেবেছিলেন, ছেলে অন্যায় কিছু বলছে না। দিনকাল যেমন পড়েছে, জিনিসপত্রের দাম, পাঁচটা বছরে যদি বেশ কিছু জমিয়ে তুলতে পারে, মন্দ কি।

বিনোদিনীর দাদার সে কি উল্লাস। —বিনু তুই কি রে, চোখে বান ডাকিয়ে দিচ্ছিস এ কথা শুনে? এখন তো গর্ব করে লোককে বলে বেড়াবি।

আধা-বখাটে ছোট শালা বললে, মাইরি জাম্মাইবাবু, আপনি একটা রিয়েল ফাদার। ভাগ্নে আমেরিকায় চাকরি করে এবার ফ্রেন্ডদের বলতে পারব।

ওদের কথা আলাদা, ওরা তো খুশি হবেই।

আটকানো যাবে না কালীসাধন বুঝে গিয়েছিলেন। তাই নিজের মনকেও সুমন্তর যুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন ভিতরে ভিতরে।

বেশ সঙ্কোচের সঙ্গে অনন্তলালের কাছে একদিন কথাটা পাড়লেন।

বসার ঘরে তক্তপোশের ওপরই অনন্তলাল লাফিয়ে ওঠে আর কি। চোখ বড় বড়।

—ইউ আর রিয়েলি ফরচুনেট।

সকলে মিলে এমন শুরু করে দিল, কালীসাধনের মনে হল উনি নিজেই ভুল করছিলেন। বয়েস হয়েছে বলে মনটাও পিছিয়ে পড়েছে। একালের ছেলেদের মত অত শার্প বুদ্ধিবিবেচনাই ওঁদের ছিল না।

যাবার দিন যত এগিয়ে আসছে, সুমন্তর দেখা পাওয়াই ভার। সারাটা দিন ছুটে বেড়ানো। কালীসাধন নিজে তো কিছুই জানতেন না, বুঝতেন না। শুধু মাথার ওপর দিয়ে এরোপ্লেন চলে যাবার সময় শব্দ শুনতেন, গোঁ গোঁ। কিংবা চোখে দেখেছেন কেমন মেঘ ছিঁড়ে দিয়ে একটা দুধেল সাদা লাইন টেনে দিয়ে যায়। রাতের আকাশে শব্দ শুনে তাকালে লাল সাদা তারার মতো, জ্বলছে নিভছে। কোনওদিন দমদম এয়ারপোর্টেও যাননি। দাঁড়িয়ে থাকা একটা গোটা প্লেন দেখেননি। আগ্রহই ছিল না ওঁর।

বিনোদিনী রান্নার লোককে সরিয়ে দিয়ে দু' বেলা নিজেই রাঁধছেন। ছেলেবেলা থেকে কোনটা খেয়ে কত খুশি হয়েছে খোকা, মনে করে করে সব রাঁধছেন এক এক বেলা। কিন্তু সুমন্তর নাওয়া-খাওয়ার সময়ই নেই।

বিদেশ যেতে হলে যে এত জটিলতা জানতেনই না কালীসাধন। মন্ত্রীরা তো হামেশাই যাচ্ছে আসছে। আপিসে কে যেন বলেছিল, শালা আমাদের টাকায়। ওই যে ইনকাম ট্যাক্স কাটে মাসে মাসে।

কত খরচ তাও জানতেন না।

পুলিশ এনকোয়ারি, পাসপোর্ট-ভিসা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পারমিশন, কি ছিল না। পায়েসের বাটি পরখ করার সময় কোথায় সুমন্তর।

বাড়িতে সুশান্ত, মানে নান্টু, আর বেলুর সে কি নাচানাচি।

—যখন আসবি, একটা ক্যামেরা আনিস আমার জন্যে। নান্টুর আব্দার।

—আমার জন্যে হেয়ারড্রায়ার। বেলু ফুর্তিতে কাল্পনিক হেয়ারড্রায়ার ঘোরাল তার মাথার চারপাশে।

ওর চেয়ে বেশি কিছু আব্দার বা ফরমাশ করার কথা কেউ ভাবতেই পারেনি।

শুধু বিনোদিনী, তখন হাসতে পারছেন, বললেন, দেখিস বাপু। আমার জন্যে যেন মেম বউ নিয়ে আসিস না।

একটু থেমে বলেছিলেন, বিয়েটা করে গেলেই পারতিস।

বাড়িসুদ্ধ সবাই গিয়েছিল এয়ারপোর্টে সী-অফ করতে। দেখেশুনে তাক লেগে গিয়েছিল। জীবনে শুধুই হাওড়া-শেয়ালদা দেখেছেন, এয়ারপোর্ট দেখেনইনি তার আগে।

প্লেন উড়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে, কালীসাধন হাত নাড়লেন, ফিরে তাকিয়ে দেখলেন বিনোদিনীর দু' হাত বুকের সামনে জড়ো করা। কাকে নমস্কার করছেন, তা জানেন।

ফেরার সময় নান্টু আর বেলুও বিশেষ কথাবার্তা বলছিল না। মন ভার হয়ে ছিল বোধহয় ওদের দু'জনেরও।

বেলু একদিন বললে, দূর ছাই কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

রাত্তিরে একদিন খেতে বসে নান্টু বললে, ওদের বোধহয় এখন সকাল, তাই না ?

বেশ বোঝা যাচ্ছিল সুমন্ত চলে যাওয়ার পর ওদেরও মন জুড়ে বসে আছে।

এখন ভাবলেও অবাক লাগে কালীসাধনের। সব কষ্ট চাপা দিয়ে সেই প্রথম বোধহয় একটা অহঙ্কার বুকের মধ্যে দানা বাঁধছিল।

যে সব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না, যেচে যেচে তাদের বাড়ি গেলেন।

—খোকা চলে গেছে শুনেছ বোধহয় ?

—কোথায় ?

হাসতে হাসতে বলেছেন, শোননি ? আমেরিকায়, ভাল চাকরি পেয়ে।

কেউ উল্লাস প্রকাশ করেছে, কেউ শুধু : তাই বুঝি।

যারা পছন্দ করে না, করেনি কোনওদিন, ওই বাড়ির জন্যেই হোক, বা ছেলে উন্নতি করেছে বলে, তাদের শুনিয়েই আনন্দ।

আপিসে যখনই সুযোগ পেয়েছেন গল্প করে বলেছেন। ছেলের কৃতিত্ব আসলে নিজেরই কৃতিত্ব। নিজে তেমন বড় কিছু হতে পারিনি বলে তোমরা আমাকে সমীহ করছ না, করনি কোনওদিন, বাড়ি করার খবর শুনে আড়ালে কৃপণ বলেছ, তাও জানি, কিন্তু ছেলে আমার আমেরিকায় চাকরি করছে, ওটা তো এক ধরনের স্ট্যাটাস সিম্বল, উড়িয়ে দিতে পারছ কি।

একজন কমবয়েসী বলেই ফেলল, আরে ব্বাস, আমেরিকায় ? ওখানে শুনেছি হাজার হাজার ডলার সব মাইনে পায়।

একটু থেমে : কত পায় কালীবাবু ?

কত পায় সেই খবরই কালীসাধন জানতেন না, কোনওদিন সুমন্তকে প্রশ্নও করেননি। ধরেই নিয়েছেন, অনেক। এখনও কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই।

পাড়ার কারও জানতে বাকি ছিল না। হয়তো নান্টু কিংবা বেলু ফুর্তির চোটে সবাইকে বলে বেড়িয়েছিল। বেলুর কলেজের বন্ধুরা জানতই।

পাড়ার লোক যে শুনেছে জানা গেল দু'দিন বাদেই।

মিত্তিরবাড়ির ছোট ছেলেটা রাস্তায় দেখা হতে কালীসাধনকে বলে বসল, কাকাবাবু, সুমন্তদা যখন আসবে একটা টেপরেকর্ডার আনতে বলবেন।

তখন এদেশে চোরাগোপ্তা কিনতে হত, পাওয়া যেত না। পাওয়া যেত না বলেই লোকে ফরেন জিনিসের জন্যে হন্যে হয়ে থাকত।

কালীসাধনের একসময় মনে হয়েছিল, চতুর্দিকে চেনাজানা সকলেই যেন দু'হাত বাড়িয়ে আছে। কেউ টাকা দিতে চায় কিছু কিনে আনার জন্যে, কেউ বিনে পয়সায় উপহার চায়, সুমন্ত যেন সেখানে মার্কেটিং করতেই গেছে। সব দাও, দাও। দেবে না কেন, তুমি তো হাজার হাজার ডলার রোজগার করছ। সবাই সুমন্তর খরচের হিসেবটা ধরত টাকায়, মাইনের হিসেবটা ডলারে। অন্যকে দোষ দিয়ে কি লাভ, কালীসাধন নিজেও একসময় তাই ভাবতেন।

মিত্তিরবাড়ির ছোট ছেলের কথায় নয়, আরেকটা ঘটনায় বুঝে গেলেন পাড়ার সকলেই জেনে গেছে।

রান্নার লোকটা হঠাৎ বললে, এ মাস থেকে দশ টাকা মাইনে বাড়াতে হবে।

বিনোদিনী অবাক হয়ে বললেন, কেন, এই তো সেদিন বাড়িয়ে দিলাম।

রান্নার লোক রাগ দেখিয়ে বলল, আমাদের দিতে হলেই আপনাদের হাত ওঠে না, কি এমন বেশি চেয়েছি। ঘোষালবাবু তো বলছিলেন, বিলেতে গিয়ে দাদাবাবু অনেক টাকা কামাচ্ছে। 'অনেক' বোঝাতে দুটো হাত গোল করে এক বস্তা তুলোর মতো দেখাল।

কালীসাধনের খুব অপমান লেগেছিল। এই একটা কাজ উনি জীবনে করেননি, করবেন না। ছেলের কাছে হাত পাতা।

বিনোদিনী লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু নিতেন কিনা জানেন না। নান্টুর কাছেও হয়তো নেন, কিন্তু সেটা সংসার খরচ নয়। ওই এক জায়গায় কালীসাধনের অহঙ্কার আছে। দিনে চাকরি করে বেশ কয়েক বছর রাতে কয়েকটা কোম্পানির হিসেবনিকেশ তৈরি করে দিয়ে এসেছেন ব্যালান্স শিট তৈরির জন্যে, এবং সেজন্যেই আজ এই আরামকেদারায় বসে আছেন। নিজেরটা নিজেই চালিয়ে নিতে পারছেন।

ভেবেছিলেন চলে যাবে, দিব্যি চলে যাবে।

কিন্তু এখন এক বিরাট দুশ্চিন্তার ভারে কুঁজো হয়ে পড়তে হচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম

বাড়ছে দিনে দিনে। ওরা কেউ আসে না, কিন্তু এসে পড়লে একটু হাতে টান ধরে। আমেরিকা থেকে সেই সেবার সুমন্তরা যখন সকলেই এল...

হাসতে হাসতে সাগোকে বলেছিলেন, একটু আস্তে বাজা রে বাপু, একটু আস্তে বাজা।

সাগো অবাক হয়ে বলেছিল, বব ডিলান, আস্তে! হাউ ফানি।

কালীসাধন বুঝে গেছেন ওদের সঙ্গে আর খাপ খাওয়াতে পারবেন না।

কিন্তু বাড়িসুদ্ধ সকলে যে যতই মডার্ন হয়ে উঠুক না কেন, লোকলজ্জা যাবে কোথায়। তাছাড়া, বেলুর এই চিঠি এমন এক বিশাল বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে তাঁর ঘাড়ে যে ভিতরে ভিতরে কুঁজো হয়ে গেছেন।

এমন হবে, হতে পারে, কোনওদিন ভাবতেই পারেননি।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে, কেউ জিগ্যেস করলে বলেছেন, ভাল আছে, বেশ ভাল। বেলু নিজেও কি একটা চাকরি করে।

বেলুর বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর কাকে যেন মুক্তি পাওয়ার উল্লাসে বলে ফেলেছিলেন, ব্যস, আমার আর কোনও সমস্যা রইল না। সব সমস্যা শেষ।

সে বোধহয় ভুক্তভোগী, মধ্যবিত্ত পরিবারে কে নয়, বললে, শেষ কি বলছেন, এই তো শুরু।

তখন বুঝতে পারেননি, খারাপ লেগেছিল। ভুলেও গিয়েছিলেন।

আজ মনে পড়ছে।

একটাই আশা ভরসা ছিল—সুমন্ত। ভেবেছিলেন ও কিছু একটা সুরাহা করতে পারবে। সব দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বৃদ্ধ বাপের সব দুশ্চিন্তা দূর করে দেবে।

নিউ জার্সি থেকে ফিলাডেলফিয়া কত মাইলের দূরত্ব ঠিক মনে পড়ছে না। একবার ম্যাপ দেখেছিলেন, ম্যাপ দেখে বুঝতে পারেননি। অঙ্ক কষে জানার পরও বদ্ধমূল ধারণাটাই বড় হয়ে ওঠে। আমেরিকায় আছে মানে সব পাশাপাশি কাছাকাছি।

সুমন্ত যেবার নাণ্টুকে নিয়ে গেল, গর্ব করেছিল, দাঁড়াও না, ওখানে আমাদের পরিবারের একটা কলোনি গড়ে তুলব।

সেই তখন থেকেই ওঁর ধারণা সব কাছে-কাছেই থাকে। আর দূর হলেই বা কি যায় আসে, ওখানে তো মিনিটে মিনিটে প্লেন উড়ছে, খোকাই বলেছিল। কালীসাধনের মনে হয়েছিল হাওড়া স্টেশনের লোকাল ট্রেনের মতো। চড়ে বসলেই হল।

সেই ছেলে, কোথায় বলবে, আমি আজই যাচ্ছি—বুঝিয়ে বলব, তা নয়, নিজের ছেলের রেজাল্ট শোনাচ্ছে। টেলিফোনে কত বিল উঠল কে জানে।

বিনোদিনী আর কালীসাধন মুখোমুখি বসেছিলেন, সামনে পড়ে আছে বেলুর সাত পাতার চিঠিখানা, চারপাশে লাল-নীল পাড় দেওয়া, এই রকম বিলিতি খাম যখনই এ বাড়িতে এসেছে সে কি আনন্দ। বেলু নিজেই একসময় দাদার চিঠি পেয়ে ফুর্তিতে নেচে উঠত। মার চিঠি হলে শুধু নেড়ে নেড়ে দেখাবে, দেবে না কিছুতেই, মা শুধু বলছে, দে বেলু দে। ওরকম করিস না, আমার বুক ধড়ফড় করছে।

আর সেই বিয়ের পর বড়বউমার নামে চিঠি এল, সুমন্তর চিঠি, বেলুটা এমন পাজি, ওঁর চোখের সামনেই শর্মিলাকে চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, এ লেটার ফ্রম ডাডা, তোমার নামে...

বড়বউমা বলতেও পারছে না, চিঠিটা দাও।

বেলু নিজেই বলছে, দশ ডলার দাও, তবে দেব।

বেলুর জীবনের এই বিপর্যয়ের সময় সেই দাদা গুচ্ছের টাকা খরচ করিয়ে দিল টেলিফোনের, জবাবে বললে, ওয়েল ওয়েল আ'ল টক ইট ওভার।

ওয়েল ওয়েল, না ওকে ওকে ঠিক মনে নেই।

বিনোদিনী শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আর কালীসাধন দীর্ঘশ্বাসের স্বরেই বলে উঠলেন, কি যে করি।

কিছুক্ষণ চুপচাপের পর বললেন, তোমার দাদাকে গিয়ে বলব ? যদি কোনও পরামর্শ দিতে পারে। বুঝলে, এখন আমার নিজের ওপরই আর কোনও বিশ্বাস নেই।

বিনোদিনী বললেন, এখনই বলবে !

অর্থাৎ লোকলজ্জা। যতদিন পারা যায় চেপে রাখা যাক। দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা।

বিনোদিনীর ভয় দাদাকে নয়, দাদার বউটিকে। দাদা নিশ্চয় বউদিকে জানাবে, তার কাছ থেকে চলে যাবে বউদির বাপের বাড়ির লোকদের কাছে। তার বিয়ে হয়েছে আজ বিশ বছর, কিন্তু বাঙালি ঘরের বউ বোধহয় কোনওদিনই বাড়ির লোক হয়ে যেতে পারে না। অন্তত গোপনতা রাখার ব্যাপারে। তাকে কেউ চট করে বিশ্বাস করতে চায় না।

অথচ বিনোদিনীর দাদা ছাড়া শলাপরামর্শ করার মতো বিশ্বস্ত লোকই বা কে আছে। অনন্তলাল আছে, কিন্তু তার কাছে সব খুলে বলতেও লজ্জা। কি করে বলবে। যার কাছে দু'দিন আগে বড়মুখ করে বলে এসেছে, বেলু খুব সুখে আছে, তার কাছে এমন অ-সুখের কথা বলা যায় নাকি।

সেই বিয়ের দিন থেকেই খুশি খুশি ভাব দেখিয়ে এসেছেন তার কাছে।

সত্যি কথা বলতে কি, জামাইয়ের জন্যে গর্বও ছিল। ছেলের জন্যে চিরকাল গর্ব চেপে রাখার চেষ্টা করে এসেছেন, পাছে আড়ালে কেউ কিছু বলে বসে, টিপ্পনী কাটে। কিন্তু জামাইয়ের জন্যে গর্ব চেপে রাখতে পারেননি।

গর্ব হবারও কথা। উনি তো ভিতরের কথা কোনও দিনই জানতে পারেননি। ওঁকে জানতে দেয়ওনি বেলু। হয়তো ভেবেছে, বাবা জানলে শুধুই কষ্ট পাবে।

একেবারে যে সন্দেহ হয়নি তাও নয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে শুধুই মনের ভুল। আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর ভেবেছিলেন ওরা সুখেই আছে। সুখে থাকবারই কথা।

এই সেদিনও অনন্তলালের কাছে গর্ব করে বলেছেন, ছেলেরা ওখানে ভাল চাকরি করে ঠিকই, কিন্তু জামাইয়ের মতো কেউ নয়। ফিলাডেলফিয়ায় প্রফেসর, সাদা চামড়ার ছেলেমেয়েদের পড়ায়, তার একটা আলাদা সম্মান আছে। না কি হে।

অনন্তলাল সায় দিয়েছে, তা আর বলতে !

বিপদে পড়ে সেই লোককে কোন মুখে বলবেন, আমি শেষ হয়ে গেলাম হে, শেষ হয়ে গেলাম। বেলুর জীবনটাই নষ্ট করে দিলাম।

জীবনে নিজেকে কখনও এত অসহায় মনে হয়নি। চারপাশে তাকিয়ে এমন কাউকেই পাচ্ছেন না, যার কাঁধে মাথা রাখতে পারেন। নিজেকে বড় নিঃস্ব লাগছে, যেন কেউ কোথাও নেই। অথচ ওঁর তো সবই ছিল, সবই আছে।

সুমন্তকেও এখন ভয় পাচ্ছেন, ওর কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান আছে নাকি, কি বলে বসবে, কি করে বসবে, কিছুই বুঝতে পারছেন না; শেষে ব্যাপারটাকে আরও জটিল না করে তোলে।

বেলুর জীবনটা নষ্ট হয়েছে, বেশ বুঝতে পারছেন, চিঠির ফাঁকে ফাঁকে সেই অভিযোগও যেন চাপা পড়ে আছে। কিন্তু আরও কষ্ট মিক্কুর জন্যে। সে জন্যেই খোকার ঘরের দেয়ালগুলো দেখতে দেখতে বলে উঠেছিলেন, কি কপাল করে এসেছিস রে।

সেই তিনটি শব্দ, আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, মনে পড়ে গেল।

ড্যাড ইজ ব্যাড।

এই তিনটি শব্দের মধ্যে একটা গোটা সংসারের ছবি যেন দেখতে পাচ্ছেন।

মনে মনে অঙ্ক কষে ভাবতে চেষ্টা করলেন মিঙ্কুর এখন বয়েস কত, দেখতে কেমন হয়েছে, কত বড় ? বেলু একবার ছবি পাঠিয়েছিল, রঙিন ছবি। তার পরও তো কতদিন কেটে গেছে। এ বয়েসে মেয়েরা কত তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। তাছাড়া কে জানে ইতিমধ্যে মিঙ্কুও সাগোর মতো হয়ে গেছে কিনা। বেদম জোরে ক্যাসেট চালায় কিনা।

যাই করুক, যত বদলেই যাক্, ওঁর স্মৃতিতে কিন্তু সেই ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটিই আছে। স্থির হয়ে, সেই বয়েসে। আমাকে একটা প্যাস্টেল বক্স এনে দিয়ো তো।

ছবি এঁকে এঁকে সব দেয়ালগুলো নষ্ট করেছে বলে কি প্রচণ্ড মার মেরেছিল বেলু। মিঙ্কুর কান্না দেখেও রাগ থামাতে পারেনি।

এখন মনে পড়লে মনে হয় সেই চড় থাপ্পড়গুলো যেন ওঁর পিঠেই পড়ছে। ওঁরই গালে।

বুঝতে পারছেন, ওই রাগ আসলে বেলুর নিজের ওপর রাগ। নিজের ভাগ্যের ওপর।

যতই ভাবছিলেন, ততই অস্থির হয়ে পড়ছিলেন।

বেলুর চিঠিখানা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বিনোদিনী সাবধান করে দিলেন, বউদিকে বলতে বারণ কোরো।

বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বারণ করব।

মেয়েদের বুদ্ধি। তুমি তোমার বউদিকে আজও তেমন আপন ভাবতে পার না। ও এখনও তোমার কাছে পরের ঘরের মেয়ে। কিন্তু তোমার দাদার কাছে যে সবচেয়ে আপন, সে কথাটা ভুলে যাও কেন। বারণ করলেই কি সে গোপন রাখবে।

গোপন রেখেই বা কি লাভ। আর ক'টা দিন গোপন রাখতে পারবে।

কালীসাধন বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে কেমন উদ্ভ্রান্ত লাগল। ঠিক মতো পা পড়ছে না। বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হ'লে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন তো। হঠাৎ হঠাৎ ব্রেক কষে যেভাবে চালায়, টাল সামলাতে পারলে হয়।

ফ্ল্যাগ তুলে একটা ট্যাক্সি আসছে দেখে হাত তুলে দাঁড়াতে বললেন।

দাঁড়িয়ে পড়ল।

একসময় ট্যাক্সি চড়াকে অপব্যয় মনে করতেন। কি দরকার, একটু কষ্ট স্বীকার করলেই বাসে মিনিবাসে দিব্যি পৌঁছে যাওয়া যায়।

আজ আর তা মনে হচ্ছে না। জীবনটাই এখন অর্থহীন হয়ে গেছে। টাকাপয়সার আর কোনও মূল্যই নেই ওঁর কাছে। অর্থও আজ অর্থহীন।

একটাই খড়কুটো ধরবার চেষ্টা। বিনোদিনীর দাদা জগদীশ। বিষয়ী মানুষ, বিষয়বুদ্ধি আছে। হয়তো কোন সুপরামর্শ দিতে পারবে।

আজকাল কোথাও যান না, যেতে ইচ্ছে করে না। একা একাই নিজের একাকিত্বের যন্ত্রণা সহ্য করেন।

হঠাৎ আজ গিয়ে পড়লে কি ভাববে কে জানে।

বলতে গিয়ে গলা গাঢ় হয়ে গেল। জগদীশদা, আই অ্যাম এ ফিনিশড ম্যান। চোখ ভিজে এল কিনা বুঝতে পারলেন না।

জগদীশ অবাক হয়ে তাকাল।

কথা বলতে পারলেন না, পকেট থেকে চিঠিটা বের করে এগিয়ে দিলেন।

—কি করি বলো তো।

জগদীশ চিঠিটা পড়ছে, পড়ছে।

তারপর চোখ তুলে তাকাল। হেসে উঠল।—তুমি কি পাগল হলে নাকি কালীসাধন। এই চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছ ?

হাসতে হাসতে বলল, এমন চিঠি মেয়েরা লিখেই থাকে। এত ওরিড হবার কিছু নেই, সান্ত্বনা দিয়ে একটা উত্তর দিয়ে দাও।

—তাই বলছ ? দুশ্চিন্তার কিছু নেই ?

জগদীশ হেসে উঠল। বললে, তুমি এই প্রথম পেলে, তাই ভয় পেয়ে গেছ। ও সব কিছু না কালীসাধন, দু'দিন পরেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। সকলেই এ কথা বলে। ঠিক হওয়া মানে যে কি তা কিন্তু কেউ ভেবে দেখে না। কীসের বিনিময়ে ঠিক হয় ? একটা জীবনের।

একসময়, কালীসাধন যদিও তেমন সন্দেহ করেননি, তবু যেটুকু খটকা লেগেছিল, ভেবেছিলেন ঠিক হয়ে যাবে।

তবু জগদীশের কথায় কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন, কিছুটা আশা।

ওদের বাড়ির আর সকলের সঙ্গে দেখা করলেন, কথাবার্তা।

জগদীশের বউ, রসিকতা করে এককালে বউঠান বলতেন, কুলকুল করে হেসে বললে, কি দেখছি ? যা দেখছি সত্যি ? সাহেববাড়ির লোক আমাদের এখানে ?

না, ওটার মধ্যে কোনও খোঁটা নেই। নেহাতই রসিকতা। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে রসিকতাও কমে গেছে। দু'পক্ষেরই বয়েস হয়েছে, পরিহাসের মৌতাত এখন আর দু'জনেরই নেই।

জগদীশের মনে পড়ল, বিয়ের পর একদা এই সুশ্রী শালাজটি কথায় কথায় রসিকতা করে কেমন সারা বাড়ি মাতিয়ে তুলত। কালীসাধনকেও। শালাজ-নন্দাই সম্পর্ক সেকালে বড় মধুর ছিল। তার একটু রেশ তো থেকে যাবেই। তাই সাহেববাড়ি বলে ঠাট্টা করা।

রসিকতা করতে কালীসাধনও জানতেন। কথা ঘুরিয়ে তাকে বিব্রত করতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু এই রসিক মানুষটির মুখে কোনও আড় ছিল না, প্রায় অশ্লীলতার সীমারেখার গা ঘেঁষে এমন উত্তর দিয়ে বসত যে কালীসাধনেরই কান লাল হবার জোগাড়। ওঁর মনে হত স্বামী-স্ত্রী ওরা দুটিতে খুব সুখী। সুখী না হলে কেউ এত হাসতে পারে, হাসাতে পারে।

এই শালাজ বউঠানের হাঁটাটি বেশ সুন্দর লাগত তখন কালীসাধনের। মনে হত চলার পথে যেন শিউলি ঝরিয়ে ঝরিয়ে হাঁটছে।

জগদীশের কথাগুলো খানিকটা ভয় সরিয়ে দিয়েছে, তবু কোনও উৎসাহ পাচ্ছিলেন না কালীসাধন। রসিকতা করার মেজাজই ছিল না।

তবু ভান করতে হবে, যেন সব ঠিকঠাক আছে, ওঁর মনের ভিতরে কোনও দুশ্চিন্তা গুমরে উঠছে না। বিপদে পড়ে ছুটে আসেননি।

তাই হাসতে হল, হেসে বলতে হল, বউঠানের ব্যাপারটা কি, যত বয়েস বাড়ছে ততই দেখি সুন্দর হচ্ছেন। আবার বিয়ে দেওয়া যায়।

হেসে উঠল সে। কাকে করব বিয়ে, আপনি তো মশাই আগেই করে বসে আছেন। আর কম্পিটিশনে আপনার বউটার সঙ্গে পারতাম না।

বয়েসে বড় শালা হলেও কালীসাধন জগদীশের সমবয়স্ক বলেই তাকে তুমি বলত। জগদীশও তাই। কিন্তু শালাজটির সঙ্গে 'আপনি আপনি' সম্পর্ক।

সঙ্গে সঙ্গে লুচি ভেজে না খাইয়ে ছাড়ল না।

ছেলেমেয়েগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বিদায় নিলেন।

রক্ষা এই, ছোট শালা বাড়িতে নেই। থাকলে বলে বসত, সবই বেশ এক এক করে এক্সপোর্ট করে দিলেন, আমিই শুধু রিজেক্ট মাল, ফেরত পাঠিয়ে দেবে !

এর আগেও একবার বলেছিল। অভিযোগ করেছিল, ভাগ্নে আমার জন্যে কিছুই করল না।

অর্থাৎ সুমন্ত।

ফিরে আসতে আসতে দুশ্চিন্তা আবার চেপে বসল। বাধ্য হয়ে একটু কপট আনন্দ দেখাতে হয়েছে, দেখাতে গিয়ে বউঠানের হাসি আর রসিকতায় সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের জন্যে সব ভুলে গিয়েছিলেন। এখন আবার দুর্ভাবনা।

আসার সময় জগদীশকে বলে এসেছেন, চিঠির কথা কাউকে যেন বোলো না, বউঠানকেও না।

জগদীশ শুধু হেসেছে। উনি নিজেও জানেন, অন্তত বউঠানের কাছে গোপন করতে পারবে না।

বউঠান শুনলে নিশ্চয় খুব দুঃখ পাবে। আসলে মানুষটা ভাল, সেই বিয়ের পর থেকে কালীসাধনদের ভালমন্দর সঙ্গে নিজেকে অনেকখানি জড়িয়ে ফেলেছে।

দুঃখ পাবে হয়তো আরও একটা কারণে। সমবেদনায়, বেলুর প্রতি সমবেদনায়। আজকাল এ সব নিয়ে ভাবেন না, একসময় ভাবতেন। কখনও কখনও মনে হয়েছে, বউঠানের এই যে এত হাসিঠাট্টা, পরিহাসে বারবার সীমারেখা ছুঁয়ে যাওয়া, এসবের আড়ালে একটা দৈন্য লুকিয়ে রাখার চেষ্টা আছে। কোথাও কোনও একটা গরমিল। কারণ জগদীশ একজন বিষয়ী মানুষ, বিষয়বুদ্ধি নিয়েই তৃপ্ত। বউঠান একটা সুন্দর টিপ পরলে সেদিকে তাকিয়ে দেখার ফুরসত পেত না, ইচ্ছেও ছিল না।

তবু দু'জনেই বেশ সুখী।

এইরকমই হয় হয়তো। উনিই কি কখনও বিনোদিনীর ভিতরটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছেন। কি আছে সেখানে কি করে জানবেন।

দু'জন মানুষ তো আসলে পৃথক দু'জন। একসঙ্গে থাকে বলেই এক হয়ে যায় না। এক হয়ে যেতে পারে না, শুধু মানিয়ে নেয়। এই মানিয়ে নেওয়ার নামই সুখ।

বিনোদিনীকে এসে বললেন।

বিনোদিনী বলে উঠল, আমি জানতাম দাদা এই সবই বলবে। তুমি তো কিছুই জান না, দাদাও জানে না। সেজন্যেই সান্ত্বনা দিয়েছে।

কিছুই জান না।

সত্যি হযতো জানেন না কালীসাধন। কিন্তু কিছুই কি সন্দেহ করেননি।

তা না করলে সুমন্তকে ওভাবে বলবেন কেন, দ্বিতীয়বার যখন এল। না, দ্বিতীয়বার নয়, তৃতীয়বার।

হাসতে হাসতে সুমন্ত বলেছিল, নান্টুর জন্যে ব্যবস্থা করছি, সুযোগ পেলেই....

উনি বলেছিলেন, নান্টুর কথা পরে হবে, তুই অমূল্যকে নিয়ে যা।

তখন বেলুর বিয়ে হয়ে গেছে।

এখন এই বাড়িটা শুধুই শূন্যতার বাড়ি। ওঁর বুকের ভেতরটার মতোই।

সুমন্ত এই বাড়িটাকে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে গেছে।

এমন অনেক নিঃস্ব বাড়ি ছেলেবেলায় দেখেছেন, প্রাসাদের মতো বাড়ি, ধনী বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা, কিন্তু ঘরগুলো গমগম করছে কাজের লোকে। তাদের বোধহয় এতখানি একা মনে হত না নিজেদের। কারণ সেকালে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করত, বিশ্বাস রাখত।

সেই বিশ্বাসও নিয়ে চলে গেছে সুমন্ত। অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

বলেছিল, একটা অচেনা লোককে ঘরে রাখবে ? সে তো গলা টিপে মেরে রেখে সর্বস্ব নিয়ে চলে যাবে।

মনে মনে হেসেছেন কালীসাধন। সর্বস্ব ! একটা নিঃস্ব মানুষের সর্বস্ব নিয়ে গেলেই বা কি। এ বাড়িতে এখন আর আছে কি।

শুধু একটা ঘরের দেয়ালে দেয়ালে আঁকিবুঁকি। প্যাস্টেলের রঙে। একটা বাচ্চা মেয়ের এক দুপুরে আঁকা ছোট্ট জীবনের যত স্বপ্ন, ভাল লাগা, খারাপ লাগা, আনন্দ, উল্লাস, অদ্ভুত অদ্ভুত মুখ, রাগী চোখ, কান্নার চোখ, মজা।

ওইটুকুই এখন ওঁর সর্বস্ব। কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

এক একসময় এই বাড়িটাকে শুধু বিয়েবাড়ি মনে হয়।

এমন অনেক বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে যেতে হয়েছে। আলো, আলো, সানাই। নানা রঙে টুনিবাল্‌বে সাজান, আম্রশাখা, কলাগাছ, ফুল, হাসি উল্লাস, গুঞ্জন, পোশাকে সেন্টের গন্ধ, বিরিয়ানি কিংবা পোলাওয়ের।

তারপর সেই ভাড়া-নেওয়া বিয়েবাড়ি দেখেছেন বাসে যেতে যেতে। কোথাও কিছু নেই, খাঁ খাঁ, ম্লান জীর্ণ নির্জন নিরালোক। শুধুই শূন্যতা।

এ বাড়িতেও শুধু একটার পর একটা বিয়ে দিয়েছেন।

আর কিছুই মনে পড়ে না। শুধু দু'দিনের উচ্ছলতা।

বছর খানেক পরে সুমন্ত চিঠি লিখেছিল, এখানে সব আছে, কিন্তু একা থাকা বড় কষ্টের। খরচও বেশি হয়ে যায়।

এত ফাঁকা ফাঁকা লাগত না। নান্টু ছিল, বেলু ছিল।

সুমন্তর জন্যে সকলের কাছে বেশ একটা মর্যাদা পাচ্ছেন। নিজেরও গর্ব।

বাজারে গেছেন, পাড়ার একজন আরেকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এঁর ছেলে আমেরিকায় থাকে।

স্ট্যাটাস—ছেলে আমেরিকায় চাকরি করে, একটা স্ট্যাটাস।

সুমন্তর চিঠি পড়তে পড়তে মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বিনোদিনী বলে উঠলেন, কি ব্যাপার, এত হাসছ ?

কালীসাধন বললেন, এই নাও, পড়ো।

বিনোদিনী চিঠি পড়ে বললেন, উঃ বাঁচলাম।

শুধু বিয়ে ব্যাপারটাকে এত চটপট সেরে ফেলা ওঁর মনঃপূত ছিল না।

'তোমরা চার-পাঁচটা পছন্দসই মেয়ে দেখে রেখো, আমি গিয়ে সিলেক্ট করে নেব। বলে রেখো দিন দশেকের মধ্যে বিয়ে। বেশি ছুটি পাব না।'

কালীসাধন বিয়ে বলতে অন্য কিছু বুঝতেন, বিশেষ করে ছেলের বিয়ে। এমন কিছু তড়িঘড়ি করার কথা নয়। একের পর এক দেখবেন, সেরা মেয়েটিকে যতক্ষণ না পাচ্ছেন। তারপর ধীরেসুস্থে বিয়ের দিন ঠিক করা।

বিনোদিনী বললেন, মেম বিয়ে করে বসেনি, সেই আমার ভাগ্য।

কালীসাধন ছুটলেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকেও বলতে হবে।

শেষ অবধি চার পাঁচটি মেয়ে বেছে রেখেছিলেন।

যেটিকে সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, মেয়ে দেখার পর জানা গেল সে অরাজি। কলকাতা ছেড়ে যাবে না। বিদেশে তো নয়ই।

একটু আঘাত পেয়েছিলেন।—ও তো ওখানে চিরকাল থাকবে না।

মেয়ের বাবা বললেন, সে কথা সবাই বলে।

সবাইকে আগে থেকে জানিয়ে রাখা হয়েছিল। সুমন্ত এসে হাজির হল।

বিয়ে যেন তেমন কোনও সিরিয়স ব্যাপারই নয়। এক একবেলায় এক একটা মেয়ে দেখে আসছে সুমন্ত।

দুটি মেয়েকে দুদিক থেকে পছন্দ। ঘরে ফিরে আলোচনা। একটির দিকে ভোট দিল বেলু। আরেকটির দিকে নান্টু।

সুমন্তর আইডিয়া। দু'জনকেই এক একদিন বলো গ্র্যান্ডে গিয়ে ডিনার খেতে হবে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একটু বেড়াতে হবে।

অর্থাৎ আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার মতো স্মার্টনেস আছে কিনা।

যেমনটি চেয়েছিল তেমন নয়, তবু পছন্দ হয়ে গেল। শর্মিলাকে।

দিন কয়েকের মধ্যেই বিয়ে করে চলে গেল সুমন্ত। ভিসার ব্যবস্থা করে শর্মিলাকে নিয়ে যেতে মাস ছয়েক লাগবে। উপস্থিত তিন মাস এখানে, তিন মাস বাপের বাড়ি।

এমন চট জলদি বিয়েতে কারও মন ভরেনি। সুমন্তর বিয়ের কথা শুনে বেলু যতখানি নেচে উঠেছিল দশ দিনের ছুটি নিয়ে মেয়ে দেখা থেকে বউভাত সব চুকেবুকে যাবে শুনে একেবারে মুষড়ে পড়েছিল।

মেয়ের বাড়ি অনুনয় বিনয় করে ছুটি আরও দিনকয়েক এক্সটেন্ড করাতে বাধ্য করল সুমন্তকে। অন্তত অষ্টমঙ্গলা তো পার করতে হবে।

বিনোদিনী বললেন, মঙ্গল-অমঙ্গল বলে একটা কথা আছে।

বিয়েতে যত ঝক্কি মেয়ের বাড়িতে, শুভাশুভ চিন্তা তাদেরই বেশি। সেজন্যে কাতর অনুরোধ-উপরোধ এল তাদের দিক থেকেই। বিনোদিনী তাদের পক্ষেই ভোট দিলেন, কারণ তাঁর ঘরেও একটা মেয়ে রয়েছে না, অবিবাহিতা।

কালীসাধনও বলেছিলেন, এত তাড়াহুড়ো করে কি বিয়ে হয় নাকি।

সুমন্তর জবাব, ন্যাস্টি ফরম্যালিটিজ।

পাঁজি দেখে আগেই দু'তিনটি দিন ঠিক করে রেখেছিলেন উনি।

সুমন্ত নিজেই ডেকরেটর ডেকে নির্দেশ দিয়ে দিল। কেটারারকে বলে এল মেনু কি হবে, প্লেটের সংখ্যা কত।

বউয়ের সঙ্গে আলাপ জমাতে, ক্লোজ হতে, সুমন্তর একটা দিনও লাগল না। ওর মোটেই লাজুক-লাজুক স্বভাব নয়, দিব্যি স্মার্ট, সকলের সামনেই কারণে-অকারণে 'শর্মিলা' 'শর্মিলা' বলে ডাকছে, বাবার সামনে বউয়ের পিঠে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে বললে, তুমি তো আর গেস্ট নও, বাড়ির লোক, যাও গিয়ে একটু মার কাছে বোসো।

বেলু ঠোঁট টিপে হেসেছে, পাশের কাকে বলেছে, ধন্যি।

ফুলশয্যার সন্ধেবেলা বিউটি পার্লারের লোক এসে সাজিয়ে দিয়ে গেল। সারা গায়ের গয়নাগাঁটি চাপা পড়ে গেছে ফুলের গয়নায়, শর্মিলাকে নিয়ে গিয়ে বসানো হল লাল মখমলের থ্রোনে : সেদিকে তাকিয়ে খুশি-খুশি সুমন্ত নান্টুকে বললে, নট আ ব্যাড সিলেকশন, কি বলিস!

প্লেনের টিকিটের ডেট বদলানো ছিল, সুমন্ত চলে গেল।

নতুন বউ শর্মিলাকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এয়ারপোর্টে। এবার বাড়তি লোক সী অফ করতে এল শর্মিলার বাবা-মা ভাই বোন সকলেই।

কালীসাধন আর আগের মতো আনাড়ি নন, সুমন্ত সিকিউরিটি লাউঞ্জে ঢুকে যেতেই বেয়াই-বেয়ান এবং শর্মিলাকে বললেন, চলো চলো, ওপরে একটা জায়গা আছে, রেলিঙের ধারে দাঁড়ালে সব দেখা যাবে।

দৌড়তে দৌড়তে সবাই ওঁর পিছনে পিছনে ছুটল। আগে থেকেই অনেকে এসে ভিড়

করে দাঁড়িয়েছে।

একজনকে অনুনয় করে পিছিয়ে আসতে বলে উনি শর্মিলাকে একেবারে সামনে ঠেলে দিলেন।—যাও, তোমারই আজ অগ্রাধিকার। বলে হাসলেন বেয়াইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

শর্মিলা বললে, না না, মাকে বলুন।

মা মানে বিনোদিনী।

বিনোদিনীর এগিয়ে আসার ইচ্ছে হচ্ছিল, তবু বললেন, না না তুমি।

বেলু তখনই বলে উঠল, ওই তো, ওই তো।

সবাই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল। লোকভর্তি একটা বাস দ্রুত ছুটে গেল লোক নিয়ে। ভাগ্যিস সুমন্ত সেই বাসে যায়নি, ভিড় করে যারা হেঁটে চলেছে, তাদের ফাঁকেই ওকে দেখা গেল—হাঁটছে।

ইস্, বলে দিলে হত, আমরা ওপরে এসে দাঁড়াব।

শর্মিলার জন্যে খারাপ লাগছিল। সুমন্ত ফিরে তাকাবে কিনা ঠিক নেই, তবু সকলেই হাত নাড়ছে, যদি তাকায়, ফিরে তাকালেও কি এই ভিড়ের মধ্যে ওদের চিনতে পারবে, তবু।

বেচারি শর্মিলা লজ্জায় হাত নাড়তেও পারছে না। বোকা ছেলে, একবার তো ফিরে তাকাবি, আমাদের দেখতে পাস বা না পাস, শর্মিলা অন্তত ভাবতে পারবে যে ফিরে তাকিয়ে ওকেই দেখল।

প্লেনে ঢুকে গেল, প্লেন উড়ে গেল।

সেদিন থেকে শর্মিলা এ বাড়ির বউমা। এই ঘর—খোকা আর শার্মিলার ঘর।

সেই তিনটি মাস কালীসাধন আর বিনোদিনীর কাছে এখনও সুখের স্মৃতি হয়ে আছে। তখন এ ঘরে মিহি সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজত।

সুমন্ত বলেছিল, গয়নাফয়না দিতে চায় মেয়েকে, দিক। খাট আলমারি ড্রেসিং টেবল নিয়ে শুধু ঘর জোড়া করে কি লাভ।

শর্মিলার বাবা কিন্তু রাজি হননি। বলেছেন, একদিন তো ফিরে আসবে। তাছাড়া ছুটিছাটায় এলে....

কালীসাধনও সেরকমই আশা করেছিলেন। বাধা দেননি।

একটা সিঙ্গল বেড খাট ছিল, পড়ার টেবিল-চেয়ার, আলনা—সব সরিয়ে দিয়ে ডবল বেড খাট গদি, স্টিলের আলমারি, ড্রেসিং টেবিল এল। তখনই নীচের বসার ঘরের তক্তপোশ সরিয়ে গদি-আঁটা শোফা কৌচ, শর্মিলার বাবার দেওয়া।

তিন তিনটে মাস ওই ঘরেই বাস করে গেছে শর্মিলা। বড়বউমা।

সে যে কি আনন্দের দিন গেছে।

বেলু ছিল, শর্মিলা ছিল। নান্টুও।

শর্মিলার সঙ্গে নান্টু ফাজলামি করছে শুনতে পেতেন।

বেলু লাল-নীল পাড়ওয়ালা বিদেশি খাম এলেই নাচতে নাচতে দেখাচ্ছে আর বলছে, দশ ডলার দিলে তবেই দেব।

কালীসাধন বলছেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে খেতে বসলে তবেই খাব।

সেই শর্মিলাকে এখন চেনাই যায় না গালে রঙ মেখে কি এক উগ্র সাজ, চুল এগিয়ে পিছিয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে কি যে করেছে।

এক ছেলে, এক মেয়ে। দু'জনেই জন্মেছে ওখানে।

ছেলেটা, সন্দীপ, ওখানে সবাই স্যান্ডি বলে, শান্তশিষ্ট, লেখাপড়ায় বেশ ভাল, কিন্তু

কেমন যেন বোকা-বোকা। আর মেয়ে সাগো—সাগরিকা, জীনস টি-শার্ট, ক্যাসেট তারস্বরে না বাজালে গান শুনে ওর আনন্দ হয় না।

তবু আশায় আশায় ছিলেন কোনদিন ওরা ফিরে আসবে। টাকাই কি সব। নিজে আরও ভাল করে বুঝতে পারছেন। বিদেশ-বিভুঁই কোথাও সারাজীবন পড়ে থাকতে কি কারও ভাল লাগে। কে জানে।

ওই আশাটুকু ছিল বলেই সুমন্তর ঘরখানা তালা বন্ধ করে রেখেছিলেন।

বেলু একবার মিঙ্কুকে নিয়ে মাঝে এসেছিল, একমাসের জন্যে। তাই ওঘরের তালা খুলে দিয়েছিলেন।

ভাগ্যিস খুলে দিয়েছিলেন।

তা না হলে ওঁর এই শূন্য জীবনে কিই বা থাকত। সারা বাড়ি খাঁ খাঁ, আঙুর আর রান্নার ঠিকের লোক চলে গেলে ঘটি-বাটির শব্দও হয় না। টি ভি খুলেই বন্ধ করে দিতে হয়।

ঘরের কোথাও বিনোদিনী একা বসে থাকেন, উনি অন্য কোথাও। একা।

একটাই শুধু স্মৃতি আর সুখ। খোকার ঘরের চার দেয়ালে প্যাস্টেল রঙে মিঙ্কুর আঁকা ছবি।

কেউ এলে দেখিয়ে বলেন, আমার মা-মণির আঁকা ফ্রেস্কো পেন্টিং।

৪

'ফ্ল্যাট পেয়েছি, শর্মিলাকে পাঠিয়ে দাও।'

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন, কেউ যেন হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল।

জানতেন শর্মিলা একদিন চলে যাবে, যাওয়াই উচিত, তবু সত্যি সত্যি এত তাড়াতাড়ি ডাক আসবে ভাবেননি।

আর কেমন কথা, শর্মিলাকে পাঠিয়ে দাও।

যেন একটা চিঠি লিখে খামে এঁটে বেয়ারাকে বলা : যাও গিয়ে পোস্ট করে দিয়ে এসো।

দীর্ঘ চিঠি, তার সঙ্গে কি সব কাগজপত্র।

কালীসাধনের নিজেকে ভীষণ বিভ্রান্ত লাগল। বড় ছেলে নিউ জার্সিতে ভাল চাকরি করে, সবই ঠিক। কিন্তু ইনি নিজে ছাপোষা মানুষ, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওপরে উঠেছেন। কিন্তু পাসপোর্ট, ভিসা, প্লেনের টিকিট— ওসবের খবর যে কিছুই রাখেননি। সুমন্তর বেলায় সে নিজেই ছোটাছুটি করেছে। কোথায় কি করতে হয় কিছুই জানেন না।

বিব্রতভাবে চিঠিটা নান্টুর দিকে এগিয়ে দিলেন। —দ্যাখ পড়ে। কি সব করতে হবে বলেছে।

বিনোদিনীর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বললেন, একা যাবে! সুমন্তর উদ্দেশে বললেন, তোর নিয়ে যাবারও সময় নেই!

বিনোদিনীর চোখে জল এসে গেল। বললেন, বউমা ছিল বলে মনে হত খোকাও আছে।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, এবার ফাঁকা ফাঁকা লাগবে :

বাড়িটা এখন আর ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় না, বুকের ভেতরটাই খাঁ খাঁ করে।

সেদিন বড় অসহায় লেগেছিল নিজেকে।

শর্মিলার মুখ দেখে বোঝা গেল না, ভয় পাচ্ছে কিনা।

ক'টা দিন নান্টু ছুটে বেড়াল। ট্র্যাভেল এজেন্ট, পাসপোর্ট অফিস, ভিসার জন্যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, পুলিশ।

সে সময় বড় বেশি জটিল ছিল ব্যাপারটা।

বিনোদিনী বললেন, একা যেতে পারবে, বউমা ?

শর্মিলা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। বললে, এখানে প্লেনে তুলে দিলে ওখানে তো ও এয়ারপোর্টে থাকবে লিখেছে।

ওটা মুখের কথা কিনা কে জানে, হয়তো ভিতরে ভিতরে ভয় পাচ্ছে।

আবার প্লেন বদলাতে হবে।

পুলিশ থেকে লোক এল একদিন।

জানতেন না, নান্টু শর্মিলার নামে একটা র‍্যাশন কার্ড করিয়েছিল কেন, এত তড়িঘড়ি। র‍্যাশন কার্ডই আছে ওঁদের, কিছুই নেন না। সামান্য দু' মুঠো চিনি, তার জন্যে আঙুরের হাতে পায়ে ধরা। কার্ডটা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।

নান্টু প্রতিদিন খ্যাপাচ্ছে শর্মিলাকে। —তোষামোদ করো দিনরাত, তোমার যাওয়া এখন আমার হাতে।

কি ভয়ই না পেয়েছিলেন, এখন আর তেমন ভয় করে না।

কিন্তু এখন অন্য একটা ভয় ওঁকে গ্রাস করে বসে আছে। বেলুর চিঠি।

বিনোদিনীকে বললেন, কি করা যায় বলো তো।

গলার স্বরটা কেমন হতাশ শোনাল।

উনি তো ভেবেছিলেন, ওরা সুখেই আছে। হঠাৎ এত বছর বাদে এ কি দুঃসংবাদ নিয়ে এল চিঠিটা।

কয়েকটা লাইন মনে পড়ল, 'শুধু মিঙ্কুর মুখ চেয়ে এতদিন অপেক্ষা করেছি। কষ্ট পাবে বলে বাবাকে এতদিন কিছু জানাইনি। মা, তুমি তো সবই জানো। আর নয়, আমি এবার মুক্তি চাই।'

বিনোদিনী কি জানেন তা আর জিগ্যেস করতেও সাহস হয়নি।

বিনোদিনী বললেন, এখানে বসে কিই বা করব আমরা।

কালীসাধন অভিযোগের স্বরে বললেন, ছেলে তো ঘাড় থেকে নামিয়ে দিল।

'ওয়েল, ওয়েল, আ'ল টক ইট ওভার।'

বিনোদিনীর মায়া হল স্বামীকে এত অসহায় দেখে। বললেন, এত দূর থেকে কিছুই করার নেই। দাদা যেমন বলেছে, বুঝিয়ে সুজিয়ে একটা চিঠিই লিখে দাও।

একটু থেমে বললেন, তারপর যা হবার হবে।

চমকে উঠলেন কালীসাধন। —কি বলছ ? ডিভোর্স ?

বিনোদিনী ধীরে ধীরে বললেন, বিয়ে মানে কি শুধু এক বাড়িতে থাকা ?

অবাক হয়ে তাকালেন কালীসাধন। এ ধরনের কথা বিনোদিনীর মুখে শুনবেন ভাবতেই পারেননি।

ওর দাদা জগদীশের কাছে যখন যাচ্ছিলেন, বার বার বলে দিয়েছিল, এখন কাউকে কিছু বলতে দাদাকে বারণ কোরো। বউদিকেও নয়।

লোকলজ্জা ? নাকি একটা ক্ষীণ আশা জাগিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

কিন্তু সেই মানুষই ভিতরে ভিতরে এত শক্ত হয়ে গেল কী করে।

অথচ উনি নিজে হতে শক্ত পারছেন না কেন, এত অসহায় বোধ করছেন কেন।

একবারও ভাবতে পারছেন না এটা বেলুর ব্যক্তিগত ব্যাপার। একটা বিয়ে হওয়া, একটা বিয়ে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে সেই দুটি মানুষই হয়ে ওঠে অপ্রধান। কোথায় চিড়

খেয়েছে, কেন, এ সব প্রশ্নের জবাব কেউ শুনতে চায় না। সকলেই শুধু নিজের নিজের স্বার্থ ভাবে।

কালীসাধনের সামনেও আজ ঠিক সেই সমস্যাই। উনি নিজের দিকটাই ভাবছেন শুধু। কেন যে ভাবছেন তাও জানেন না। এখন ওঁর তো সমাজ বলেই কিছু নেই, তবে আর লোকলজ্জা কিসের। রিটায়ারমেন্টের পর কদাচিৎ দেখা হয় আপিসের কারও সঙ্গে। এখন আর যানও না, কেমন অনাহূত রবাহূত মনে হয়। রাস্তায় দেখা হলে তিন মিনিট সময়ও কেউ নষ্ট করে না। আর আত্মীয়স্বজন ? এই যে বুড়োবুড়ি একা-একা পড়ে আছে এই নির্জন যক্ষপুরীর মধ্যে, কে আসে দেখা করতে। শুধু ভেবে বসে আছে, আমেরিকায় একটা কলোনি গড়ে তুলেছে বলে গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। আমাদের বাড়িতে আসবে কেন। অথচ গেলে মনে হয় মাঝখানে কোথায় একটা পাঁচিল বাধা দিচ্ছে।

এদের নিয়েই সমাজ। পাড়াপড়শির সঙ্গে কারও কোনও সম্পর্কই নেই। ওরা শুধু ওইটুকু পারে। রান্নার লোককে উসকে দেওয়া, বাবুর ছেলেরা হাজার হাজার টাকা রোজগার করছে আমেরিকায়, তোমাকে কত দেয় ?

তবু এদেরই ভয়ে ভাঙা বিয়েকে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করে সকলে। শ্বশুরবাড়িতে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

কালীসাধনও নিশ্চয় সে কথাই ভাবছেন। তাই এত অসহায় লাগছে নিজেকে।

'মা, তুমি তো সব জানো।'

বিনোদিনী কি জানেন তা জিগ্যেস করার মত সাহসও নেই। কি শুনবেন কে জানে।

সেবার যখন এসেছিল মিঙ্কুকে সঙ্গে নিয়ে, কিছু কি সন্দেহ করেননি ?

—হ্যাঁ রে, অমূল্য এল না কেন ? হাসি হাসি মুখ করে প্রশ্ন করেছিলেন।

বেলুও হেসেছিল। —ও পরের বছর আসবে, এখন খুব কাজ। তাছাড়া তিনজনের আসা যাওয়া, প্লেনের যা ভাড়া আজকাল।

কালীসাধন কিছুই সন্দেহ করেননি। কখনও কখনও খটকা অবশ্য একটু লাগত।

মা-মেয়ে সবসময় কাছাকাছি বসে চাপা গলায় কি-সব বলাবলি করত। কালীসাধন কাছে এসে গেলেই চুপচাপ। কি এমন কথা যা বাবার সামনে বলা চলে না।

মিঙ্কুকে যে ভাবে মারছিল দেয়াল নষ্ট করার জন্যে, তা দেখে পরে মনে হয়েছে ওর ভেতরে কোথাও একটা ক্ষোভ, একটা প্রচণ্ড রাগ চাপা আছে। কার বিরুদ্ধে বুঝতে পারেননি তখন। কার বিরুদ্ধে আর, ওই অমূল্যর বিরুদ্ধে। কিংবা ওঁদের বিরুদ্ধেও হতে পারে।

ওঁদেরই বা কি দোষ। মানুষের ভেতর পর্যন্ত কে-ই বা দেখতে পায়।

হঠাৎ একটা যোগাযোগ হয়ে গেল, লোভ সামলাতে পারলেন না।

শর্মিলা, মানে বড় বউমাকে, প্লেনে তুলে দিতে গিয়েছিলেন। যাবার আগে দিন কয়েকের জন্যে বড় বউমা বাপের বাড়ি ঘুরে এল।

সুমন্ত বারবার ফোন করছে, ভয়ের কিছু নেই, ভয়ের কিছু নেই।

কখনও নান্টুকে, কখনও শর্মিলাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কোথায় কি করতে হবে।

তবু ভয় যাচ্ছে না। কোথায় কি ভুল করে বসবে।

কালীসাধন বারবার বলছেন, পাসপোর্ট সামলে রাখবে বউমা, যেন হারিয়ে না যায়।

নান্টু ভয় দেখাচ্ছে, দাদা যদি এয়ারপোর্টে না আসে...

বেলু ধমক দিল, এই ছোড়দা, কি হচ্ছে কি। এমনিতেই মুখ শুকিয়ে আছে, তুই আবার ভয় দেখাচ্ছিস।

কালীসাধনও রেগে যাচ্ছিলেন, ওর বাঁদরামিতে।

যদি না আসে, যদি দেখা না হয়। ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সবই আছে।

কিন্তু ওখানে কিভাবে টেলিফোন করতে হয় এয়ারপোর্ট থেকে তাও জানেন না। 'কার্ড-সিসটেম' এটুকুই শুনেছেন, তা যে কি বস্তু তাও জানেন না। যৎসামান্য ডলার নিয়ে যেতে দিয়েছে, ট্যাক্সি ড্রাইভার যদি বদমায়েসি করে অকারণ ঘুরিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা হোটেলে উঠতে হয়, সব ডলার ফুরিয়ে যাবে। আর হোটেল কথাটাই ওঁর কাছে বিপজ্জনক, বিশেষ করে একা একটি মেয়ের কাছে।

বউমার মুখে কিন্তু কোনও ভাবান্তর নেই। নার্ভাসনেস বোধহয় চেপে রেখেছে, মুখে চাপা আনন্দ। বিয়ের ছ' মাস পরে এই প্রথম স্বামীর কাছে যাচ্ছে, আনন্দ হবারই কথা। বিয়ের পর সুমন্ত যে-কদিন ছিল, বলতে গেলে, ভাল করে আলাপ-পরিচয়ই হয়নি।

নান্টু বললে, হানিমুনে যাচ্ছ, মুখ ভার করে আছ কেন।

শর্মিলা কোনও কথাই বলছিল না। উদ্বেগ ? হতেও পারে। কিংবা বাবা-মাকে ছেড়ে এত দূরে যেতে হচ্ছে বলে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখলেন হরিদাসবাবু আগেই এসে গেছেন। শর্মিলার মাও। আসারই কথা, উৎকণ্ঠা ওঁদেরই বেশি।

নান্টু ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছে সিকিউরিটি লাউঞ্জে ঢুকে কোনটার পর কি করতে হবে। বোর্ডিং কার্ড, মাল ওজন, আরও কত কি। নিউ ইয়র্কে ট্র্যান্সিট লাউঞ্জে গিয়ে...

বাবা-মাকে দেখতে পেয়েই হাসি ফুটল শর্মিলার মুখে। সাহস দেখানো মুখে নাণ্টুকে বললে, এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন কতবার ঘুরে এসেছ।

—আহা, সেজন্যেই তো এত খোঁজখবর নিয়েছি। যাতে গিয়েই দাদাকে দিনরাত খোঁচাতে পার, আমাকেও কিছু একটা জুটিয়ে দিতে।

শুনে হেসেছিলেন কালীসাধন। ভাবতেই পারেননি সত্যি সত্যি নাণ্টুও একদিন চলে যাবে। চলে যাওয়া যে কত কষ্টের তা জানতেন না। শুধুই গর্ব হত।

বউমা ভিতরে ঢুকে গেল।

উনি হরিদাসবাবুকে বললেন, চলুন চলুন, ওপর থেকে দেখা যাবে।

ওপরে উঠতে উঠতে বেলু বললে, এয়ারপোর্ট আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে গেল, না রে দাদা।

নান্টু হেসে বললে, আমাকে যেতে দে না, আমেরিকাই আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে যাবে।

কালীসাধন শুধু হেসেছিলেন। একটুও খটকা লাগেনি, খারাপ লাগেনি।

'ছোট ছেলেও আমেরিকায়।' বলতে তো গর্ব হবারই কথা।

ওই অহঙ্কারই এখন ওঁর সামনে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোন মুখে অনন্তলালকে বলবেন বেলুর এই চিঠির কথা। যদি চলে আসে, কেন এল। কেন ফিরে যাচ্ছে না।

কেউ আসে না, কেউ খোঁজ নেয় না। তখন একে একে সকলেই আসবে। সমবেদনা জানাবে। হয়তো হরিদাসবাবুও।

এক এক সময় হরিদাসবাবুকেই দায়ী মনে হয়।

রেলিঙের সামনে রীতিমত ভিড়। ভিড় ঠেলে এগোনোর কোনও উপায় নেই। তাই পিছনের সিঁড়ির ধাপির ওপর উঠে গেলেন। হরিদাসবাবু আর শর্মিলার মাকে ডাকলেন। —এখানে আসুন, এখানে।

সামনে দাঁড়াতে পেলে সবটুকু দেখা যেত, ভিতর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে।

—ওই যে, ওই যে। চিৎকার করে উঠল বেলু।

সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। ভিড় করে হেঁটে চলেছে যাত্রীরা। তারই মধ্যে শর্মিলাও। সেও এগিয়ে চলেছে প্লেনের সিঁড়ির দিকে। কাঁধ থেকে বড় ব্যাগটা ঝুলছে।

পাসপোর্ট, বোর্ডিং কার্ড, টিকিট, সব ঠিক ঠিক রেখেছে তো।

সকলেই হাত নাড়ছে রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু যারা যাচ্ছে তারা প্রায় কেউই পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না, হাত নাড়ছে না।

শর্মিলা তো তাকাবেই না, যতক্ষণ না প্লেনে গিয়ে নিজের সিটটিতে বসতে পাচ্ছে, উদ্বেগ যাবে না ওর।

হরিদাসবাবু আর তাঁর স্ত্রী একেবারে চুপচাপ। ওঁদের দুশ্চিন্তা নিশ্চয় সবচেয়ে বেশি। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি, কিন্তু যখন খবরটা দিতে গিয়েছিলেন, খুব ভয় পেয়েছিলেন ওঁরা।

উদ্বেগ কালীসাধনেরও ছিল। ঠিক ঠিক পৌঁছতে পারবে তো। মাঝপথে যদি কোথাও কিছু গোলমাল হয়। নিউইয়র্কে কেনেডি এয়ারপোর্টে নেমে ট্র্যান্সিট লাউঞ্জে যেতে হবে, তারপর প্লেন পাল্টানো।

হরিদাসবাবু সব শুনে কেমন বসে পড়েছিলেন। —ও পারবে তো ?

ওঁদের বাড়ি গিয়ে তো দেখেছেন। সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার। হয়তো ভাল পাত্র খুঁজছিলেন, বিজ্ঞাপন দেখে লোভে পড়ে গিয়েছিলেন হরিদাসবাবু। ছেলে আমেরিকায় চাকরি করে, ভাল চাকরি।

দূরে বিয়ে দেওয়ায় ওঁর আপত্তি ছিল না, দিল্লি বোম্বাই যেখানেই হোক। তা বলে একেবারে আমেরিকায়। বিপদে-আপদে যেতে আসতেও পারবেন না।

কিন্তু চারপাশের সবাই বললে, চিঠি তো দিয়ে দিন, ভাববেন পরে।

স্ত্রী রেগে গেল। ওদের বিয়ে হচ্ছে না ?

শর্মিলা আমেরিকা শুনে ভেতরে ভেতরে উল্লসিত হয়েছিল। ভয় ছিল শুধু বাবাকেই। তাই মাকে বললে, আমার কলেজের বন্ধু মাধুরীর তো ওখানেই বিয়ে হয়েছে, সেও এখন আমেরিকায়।

আমেরিকা সম্বন্ধে ধারণাটা অস্পষ্ট ছিল শর্মিলার। যেন ছোট্ট জায়গা, গেলেই মাধুরীর সঙ্গে দেখা হবে, দিনরাত আড্ডা দেওয়া যাবে। সামনাসামনি না হোক টেলিফোনে।

মেয়ের অনিচ্ছা নেই দেখেই, কিংবা লোভে পড়ে এগিয়েছিলেন।

এখন উদ্বেগ। মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন কালীসাধন। নিজের উদ্বেগ চেপে সান্ত্বনা দিলেন হরিদাসবাবুকে। —কিচ্ছু ভাববেন না, ঠিক পৌঁছে যাবে।

একটু থেমে বললেন, সভ্য দেশ তো, এখানে হলে বাস পাল্টে একা মেয়ের বেহালা কিংবা সিঁথি যেতেও ভয়।

হরিদাসবাবু হাসতে গিয়েও থমকে গেলেন। কালীসাধনেরও চোখ পড়ল।

শর্মিলা প্লেনের সিঁড়ির দিকে হেঁটে যেতে যেতে এক পলকের জন্যে বোধহয় ওপরের দিকে, ওঁদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে প্লেনের ভেতরে ঢুকে গেল।

সেবার সুমন্ত ফিরে তাকায়নি, কিন্তু শর্মিলা ফিরে তাকাল। হাত নাড়ল।

ও যে জানে, সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে। সুমন্তকে সী-অফ করার সময় শর্মিলাও তো এসেছিল।

নতুন বউ, শ্বশুর শাশুড়ি রয়েছেন, সেজন্যে মাথায় ঘোমটা দিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল।

নান্টু বলেছে ভাল, হানিমুনে যাচ্ছ।

ফেরার সময় সবারই মুখ ভার। বউমাও চলে গেল বলে কালীসাধন বিনোদিনী

চুপচাপ। উদ্বেগের চেয়ে ছেড়ে চলে যাওয়ার কষ্টটাই ওঁদের বেশি।

হরিদাসবাবু ও তাঁর স্ত্রীর মুখেচোখে উদ্বেগের সঙ্গে আনন্দও। মেয়ে তার স্বামীর ঘরে চলে যাচ্ছে। এর চেয়ে আনন্দের কি আছে।

আইনকানুন অত বুঝতেন না ওঁরা। জামাই বিয়ে করে চলে গেল, তাঁর মেয়ে পড়ে রইল এখানে। যার সঙ্গে দেখা হয় তারই প্রশ্ন, সে কি, মেয়ে এখনও এখানেই, শ্বশুরবাড়িতে? নিয়ে যায়নি?

. শুধু লোকের মুখে প্রশ্ন নয়, নিজেরও এক এক সময় খটকা লাগত। কেউ কেউ বিয়ের আগেই তো ভয় দেখাত। ওদের কি কোনও বিশ্বাস আছে? হয়তো মেম বিয়ে করে বসে আছে আগে থেকেই, কাজের জন্যে ঝি নিয়ে যেতে চায়।

কি আতঙ্ক চেপে যে বিয়ে দিয়েছিলেন।

যাক্, এতদিনে স্বামীর ঘরে গেল। এখন একটা চিঠি দিয়ে মেয়ে যদি ওঁদের নিশ্চিন্ত করে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন ওঁরা।

বেলু হাসতে হাসতে বললে, দাদাকে ধরে আমিও একবার ঘুরে আসব।

একটু থেমে বললে, এখন অবধি প্লেনেই চড়লাম না।

নান্টু বললে, একা যেতে হলে তুই তো ফেন্ট হয়ে পড়তিস, স্ট্রেচারে করে নিয়ে তুলত।

বেলু চিমটি কাটল নান্টুকে। —উঃ।

হরিদাসবাবু হাসছিলেন ওদের কাণ্ড দেখে।

হঠাৎ কালীসাধনকে বললেন, আর কি, এবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন।

বিনোদিনীও হেসে বললেন, বেয়াই-বেয়ানের দায়িত্ব এখন, চেনাজানা থাকে তো দেখুন। পরীক্ষাটা হয়ে গেলে এবারই দিয়ে দেব।

—এখন কি আর এখানকার ছেলে পছন্দ হবে! হরিদাসবাবু রসিকতা করেই বলেছিলেন হয়তো।

কালীসাধন বললেন, আমি ভাল ছেলে চাই, ভাল মাইনে নয়।

ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে।

এই বাড়িটা যখন একটু একটু করে গড়ে তুলছিলেন, তখন বেশ গর্বের সঙ্গে বিনোদিনীকে এনে দেখাতেন। পলেস্তারা পড়েনি, দরজা খুলে দিয়ে বলতেন, তেরো বাই এগারো, খোকার ঘর। আর পাশেরটা নান্টুর।

সবশেষে আরেকখানা। বলেছিলেন, মেয়ে-জামাই আসবে মাঝেমাঝে, তাদের জন্যেও তো চাই।

সেই বাড়িটায় এখন শুধুই শূন্যতা। সারা বাড়ি খাঁ খাঁ।

একে একে সবাই চলে গেছে। কদাচিৎ কেউ দু'চারদিনের জন্যে আসে, চলে যায়।

অথচ এ ভাবে কেউ চলে যাক তা চাননি কালীসাধন। চেয়েছিলেন ওরা একে একে আবার ফিরে আসুক।

সুমন্ত বলেছিল, পাঁচটা বছর চুটিয়ে টাকা করে নিয়ে ফিরে আসব।

সে কথা ভুলেই গেছে হয়তো। সাগোই এবার পনেরোয় পড়ল।

সুমন্ত বলেছিল, ওখানে আমাদের একটা কলোনি করে তুলব, দেখো না।

নিউ জার্সি, ফিলাডেলফিয়া, লস এঞ্জেলেস।

স্টেটসের একটা বড় ম্যাপ দিয়ে গিয়েছিল সুমন্ত, মাঝে মাঝে খুলে দেখেন। এই তো,

এখানে খোকা, এখানে নান্টু। এখানে অমূল্য আর বেলু। ম্যাপ দেখিয়ে বিনোদিনীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

অথচ এই শূন্যতার মাঝে উনি নিজে বন্দি হয়ে আছেন। দুই বুড়োবুড়ি, মুখোমুখি, বন্দিজীবন।

একবার মনে হয়েছিল কোথাও বেড়াতে গেলে হয়। ভারতবর্ষই দেখা হল না, কত কি দেখার আছে এখানে। একবার বেরিয়ে পড়লে হয়। কুণ্ডু স্পেশালে।

বিনোদিনী 'না' 'না' করে উঠেছেন।

ওরা কে কখন ফোন করে বসবে। চিঠি দিলে পড়ে থাকবে লেটার বক্সে। কার কখন কি বিপদ হয় কে বলতে পারে। আমি কোথাও যাব না, কোথাও না।

এই একাকিত্বের জন্যেই মাঝে মাঝে মনে হত কেউ একজন ফিরে এলে হয়।

ফেরার কথা দূরে, ওঁদের নিয়ে যাবার জন্যে সুমন্তর কি ঝোলাঝুলি। চলো না একমাস থাকবে গিয়ে, দেশটা দেখতেও ইচ্ছে হয় না তোমার।

কালীসাধন মাথা নেড়েছেন, না, না।

উনি চেয়েছিলেন, বরং একজন কেউ ফিরে আসুক।

এখন একজন ফিরতে চাইছে। উনি বিভ্রান্ত বোধ করছেন। মনে মনে প্রার্থনা করছেন, ও যেন ফিরে না আসে।

সেজন্যেই দু'দিন ধরে চিঠিটা লিখেছেন আর ছিঁড়েছেন। একবারও মনঃপূত হয়নি। বোঝাবার চেষ্টা করেছেন বেলুকে, চিঠির ভাষায় যতখানি মমতা ঢেলে দিয়ে পারা যায়।

আবার লিখলেন, পড়ে শোনালেন বিনোদিনীকে। বিনোদিনী নিজেও একটা লিখেছেন।

—যাও, পোস্ট করে দিয়ে এসো। শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে, কিছু যদি করে বসে।

চিঠিটা খামে ভরে নীচে নেমে এলেন কালীসাধন।

যাবার আগে একবার আরামকেদারায় বসলেন।

কই, সুমন্ত তো কিছুই জানাল না আর। ও অমূল্যকে যা-তা বলে বসেনি তো। বুদ্ধি বিবেচনা ওদের আছে নাকি। হয়তো আরও জটিল করে তুলবে অবস্থাটা।

শুধু বড় বড় কথা। ওয়েল, ওয়েল, আ'ল টক ইট ওভার।

খামটা পকেটে নিয়ে উঠে পড়লেন।

সদর দরজার নীচে একটা বাড়তি খিল লাগানো আছে, মেঝেতে একটা ছোট্ট গর্ত। এটা মাথা খাটিয়ে বের করতে হয়েছিল। একা একা একটা বাড়িতে থাকা যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা।

এটা না থাকলে যখনই বাইরে বেরোবেন, বিনোদিনীকে নীচে নেমে আসতে হবে দরজা বন্ধ করার জন্যে। আবার ফিরে এলে ওঁকেই নামতে হবে দরজা খোলার জন্যে। এই খিলটা লাগানোর ফলে অন্তত বেরোনোর সময় বিনোদিনীকে ডাকতে হয় না, খিলটা ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে টেনে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়।

রাস্তায় বেরিয়ে বেলুর বিয়ের দিনটা বারবার মনে পড়ছিল।

হরিদাসবাবুই সম্বন্ধটা নিয়ে এসেছিলেন। সত্যি সত্যি যে উনি কোনওদিন বিয়ের প্রস্তাব আনবেন, কালীসাধন ভাবেননি। ভেবেছিলেন কথার কথা।

শর্মিলাকে বলে দিয়েছিলেন, বউমা, পৌঁছে এয়ারপোর্ট থেকেই একটা ফোন করে দিয়ো, খোকার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা জানিয়ে। বড় দুর্ভাবনায় থাকব।

সুমন্তই ফোন করেছিল। —দেখা হয়েছে, নিয়ে যাচ্ছি। হাসতে হাসতে বললে, শর্মিলা বলছে তোমরা নাকি ভীষণ ভয় পাচ্ছিলে।

বোধহয় রিসিভার কেড়ে নিয়ে বউমা বললে, না বাবা, বানিয়ে বানিয়ে বলছে।

তারপর। —ও বাড়িতে একটা খবর দিয়ে দেবেন ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওঁরাও দুর্ভাবনায় আছেন।

সব কথা শুনতেও পায়নি হয়তো, তার আগেই লাইন কেটে গেল।

প্রথমে ভেবেছিলেন নান্টুকে দিয়েই খবর পাঠিয়ে দেবেন, পরে কি ভেবে নিজেই গেলেন।

রসিকতা করে বেয়াইকে বললেন, মেয়ে আপনার হারিয়ে যায়নি, ঠিক ঠিক পৌঁছে গেছে।

বেয়ানের দুশ্চিন্তা আরও বেশি, শুনেই বললেন, বাঁচালেন।

তারপর বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলেন, মিষ্টিফিস্টি খাওয়া, কিন্তু ওঁরা একবারও আর বেলুর বিয়ে-সংক্রান্ত কোনও কথাই তোলেননি।

সেজন্যেই ভেবেছিলেন, ওটা কথার কথা।

ঘুম কেড়ে নেওয়ার মতো বয়েস তখনও হয়নি বেলুর, তাই খুব যে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন তাও নয়। তবে একটা ভরসা ছিল, সুমন্তর ওপর নির্ভর করতে পারবেন। বোনের বিয়ের দায়িত্ব, অন্তত একটা ভাল পাত্র জোগাড় করার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

কিন্তু সুমন্ত চলে গেল, শর্মিলাও। আর কি ওদের ওপর ভরসা করা চলে !

হরিদাসবাবুর কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

শর্মিলা চলে যাওয়ার ছ'মাস কি আট মাস পরের কথা।

হঠাৎ এক রবিবার দুপুরে হরিদাসবাবু সস্ত্রীক এসে হাজির। রোদে গরমে গলদঘর্ম হয়ে।

বেল বাজছিল। তবু উঠে বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখার ইচ্ছে হয়নি। সে সময় এমন একা হয়ে যাননি। নান্টু ছিল, বেলু ছিল। তাছাড়া, দু'দুটো কাজের লোক ছিল। একটা বাচ্চা ভৃত্য, আর একজন রান্নার।

রান্নার লোক দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললে, আপনার বেয়াইবাবু এসেছেন। সঙ্গে গিন্নিমা।

হুটপাট করে উঠে পড়লেন কালীসাধন আর বিনোদিনী।

সিঁড়ির মাথা থেকে চিৎকার করে বললেন, উঠে আসুন, উঠে আসুন।

ওঁরা সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন, কালীসাধন বললেন, আহাম্মকটা জানেই না কাকে নীচে বসাতে হয়, কাকে ওপরে নিয়ে আসতে হয়।

বিনোদিনী ভেবেছিলেন, মেয়ের খবরাখবর অনেকদিন পাননি হয়তো, সেজন্যেই বিব্রত হয়ে এসেছেন।

তাই বলে উঠলেন, আপনাদের চিঠি দেয়নি ? আমাদের তো দিয়েছে।

তখন মাসে দুটো চিঠি আসত।

হরিদাসবাবু বললেন, পেয়েছি পেয়েছি।

তারপর হেসে বললেন, সে এখন আপনাদের মেয়ে, আপনারা ভাববেন।

কেন এসেছেন তা জানা গেল। খুব ভাল পাত্র, প্রোফেসর কলেজে। দেখতে শুনতে ভাল।

হরিদাসবাবুকে সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিলেন কালীসাধন। বেলুকেও ওদের পছন্দ হয়ে গেল।

সুমন্তকে সেদিনই ফোন করলেন বিনোদিনী। —বেলুর বিয়ে ঠিক হয়েছে, ওঁরা চাইছেন এই ফাল্গুনে, আসতে পারবি তো তোরা ?

সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, ফাল্গুন মানে কোন মাস ?

বিনোদিনী জিগ্যেস করলেন কালীসাধনকে। 'ফাল্গুন মানে কোন মাস ?'

—ফেব্রুয়ারি কিংবা মার্চ। দিন ঠিক হয়নি।

কালীসাধন পাশ থেকে বলে দিলেন, তারপর রিসিভার নিজের হাতে নিলেন। প্রায় অনুনয়ের স্বরে বললেন, বেলুর বিয়েতে তুই না থাকলে হবে না।

ছেলেটি কি করে জাতীয় কয়েকটা প্রশ্ন করল সুমন্ত।

তারপর বললে, চেষ্টা তো করব, দেখা যাক। ডেট ফিক্সড হলে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিয়ো।

মাত্র দিনকয়েকের জন্যে হলেও সুমন্ত এসেছিল। বউমাকে নিয়েই।

তখন আর ঘোমটাফোমটার বালাই নেই। মুখে মেক-আপ, সিঁথির ডগডগে সিঁদুর ঠোঁটে নেমে এসেছে, গালে লালের ছোপ, আর চুল ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে কেমন যেন উদ্ভট লাগছে।

ভাল লাগেনি, যেন আগের মতো থাকলেই ভাল ছিল।

এমন যে দেখবেন খানিকটা আঁচ করেছিলেন। ডাকে নিজেদের কয়েকটি ছবি পাঠিয়েছিল সুমন্ত, তার একটাতে বউমার শরীরে আঁট লাল রঙের গেঞ্জি, তার ওপর কি-সব লেখা। পরনে টাইট প্যান্ট।

চিনতেই পারেননি। 'এটা আবার কার ছবি।'

বেলু হেসে বলে উঠেছে, ওমা চিনতে পারলে না ? বউদি, বউদি।

কালীসাধন হাসতে পারলেন না। ছবিটা গুঁজে দিলেন ঝাঁকের মধ্যে, তাকিয়ে দেখতেও সঙ্কোচ। ছেলেটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, বউমা অন্তত বলতে পারত, এ ছবি বাড়িতে পাঠিয়ো না।

বেলুও বলল, দু'দিনেই একেবারে মেমসাহেব হয়ে গেছে।

বিনোদিনী শুধু বললেন, তোরা পাগল হয়েছিস। ওসব খোকা ওকে শখ করে পরিয়েছে, ওখানকার মতো।

এই মেয়েকে একা-একা প্লেনে তুলে দিতে গিয়ে কি ভয়ই না পেয়েছিলেন।

আগে থেকে কিছু জানায়নি, হুট্ করে চলে এল। একরাশ মালপত্র নিয়ে। পুরো একটা দুপুর লেগে গেল সে-সব দেখতে। বেশির ভাগই বেলুর জন্যে।

কালীসাধন বউমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন, শাড়ি পরেই এসেছে।

ওঁরা ঘোমটা পছন্দ করেন না, ঘোমটা দেয়ওনি। তবে বউমাকে সঙ্গে নিয়ে যখন সুমন্তকে সী অফ করতে গিয়েছিলেন, ওর বাবা-মা অর্থাৎ হরিদাসবাবু আর তাঁর গিন্নি ছিলেন বলে বউমা ঘোমটা দিয়েছিল। ভারী সুন্দর লাগছিল সেদিন।

গালে রুজ, ফাঁপানো চুলে একটু উৎকট লাগল ওঁর চোখে, কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাল লাগল সটান এসে ওঁকে আর বিনোদিনীকে প্রণাম করল দেখে।

কালীসাধন বললেন, যাক্ এসে গেছিস, ভালই হল।

একটু থেমে বললেন, খবর দিলে পারতিস, এয়ারপোর্টে যেতাম।

সুমন্ত বললে, বারবার আসা-যাওয়া, যা খরচ, নাণ্টুর বিয়েটাও লাগিয়ে দিলে পারতে।

বিনোদিনী হেসে বললেন, বেলুরটা হয়ে যাক, এবার দেব।

'বারবার আসা-যাওয়া, যা খরচ' কথাটা কানে বাজল কালীসাধনের। যদিও টাকায় হিসেব করে দেখেছেন সত্যি অনেক খরচ।

তবু কথাটা শুনতে ভাল লাগল না। বোনের বিয়েতে আসতে হলেও যদি খরচের কথা ভাবতে হয়, তা হলে আর কি লাভ হল বিদেশে গিয়ে। হাজার হাজার ডলার

উপার্জন করেও যদি হিসেব কষে চলতে হয় তা হলে আমেরিকায় যাওয়া কেন। বউকে গেঞ্জি পরানোর জন্যে!

সুমন্তর বিয়েতেই হালুইকর ডাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ডেকরেটর ডেকে বড় ছাদটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোত্থেকে কোথা অবধি প্যাণ্ডেল হবে। এবার আলো আর টুনি বাল্‌ব বাড়িয়ে দিতে বলেছেন, রোশনচৌকি হবে গেটে। একটাই তো মেয়ে, কোথাও কোনও কার্পণ্য করেননি।

সুমন্তকে বললেন, সেই একই কেটারার, ভালই খাইয়েছিল সেবার।

সুমন্ত বললে, একটা বিয়েবাড়ি ভাড়া নিলেই পারতে। এত ঘর নোংরা হয়, আঁশটে গন্ধ যেতে চায় না।

—ভাড়ার বিয়েবাড়ি? ছ্যাঃ। ওসব করে যারা ফ্ল্যাটে থাকে, আমার এত বড় ছাদ থাকতে...

সুমন্ত কথা বলল না। বাবার ধারণাগুলো কোনও কালেই পাল্টানো যাবে না, সে জানে।

আলো, সানাই, হইচই হট্টগোল, আনন্দ খুশি। সাজিয়ে দেওয়ার পর বেলুকে বেনারসী আর সোনার গয়নায়, কপালে টিকলি, অপূর্ব লাগছিল। ক্ষণিকের জন্যে বিনোদিনীর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। 'রাজমহিষী'।

বিয়ে হয়ে গেল, আলো নিভে গেল।

বেলু যখন চলে গেল কান্নায় দু' গাল ভাসিয়ে, তখন কালীসাধনের বুকের ভেতরটা মনে হল একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

এ বাড়িতে বেলুই ছিল লক্ষ্মীশ্রী, শব্দ, হাসি, গান। সর্বক্ষণ দেখতে পেতেন, কথা বলতে পেতেন। খোকা আর নান্টুকে পেতেন কতক্ষণ, সব সময়েই খেলা, টো টো করে বেড়ানো।

সুমন্ত বউমাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল অষ্টমঙ্গলার পরেই। বউমার সঙ্গে কথা বলতেই পেলেন না। এই কদিনের মধ্যেই আবার দুটো দিন সে বাপের বাড়িতে কাটিয়ে এল।

বউমা ইচ্ছে করলে আরও হপ্তা দুই থেকে যেতে পারত। একবার তো গিয়েছে, একা-একাই। এখন সব চিনে গেছে, জেনে গেছে। তবু থাকল না।

বাড়িটা খাঁ খাঁ করে উঠল আবার। বেলু চলে যেতেই আরও শূন্য হয়ে গেলেন।

অভিমান করে বিনোদিনীকে বললেন, কেন যে বাড়িটা করতে গিয়েছিলাম। এত বড় না করলেও চলত।

তারপর নিজের ওপর ক্ষোভ থেকেই বলে উঠলেন, বাড়িই বা বলছি কেন। এটা তো আসলে বিয়েবাড়ি, ভাড়ার বিয়েবাড়ি। এক একটা বিয়ে হয়, তারপর ফাঁকা পড়ে থাকে।

বেলুর ঘরে, খোকার ঘরে চাবি লাগিয়ে দিয়ে এসে চাবির থোকাটা দেরাজে রাখতে রাখতে ওঁর ভেতরটা কেঁদে উঠেছিল।

কেবলই গিয়ে বেলুকে দেখে আসতে ইচ্ছে হত। কেমন আছে! চোখে দেখে এলেও শান্তি। দু' একবার এসেছে অমূল্যর সঙ্গে, সে শুধু ঘণ্টাকয়েকের জন্যে। হাসি উল্লাসও দেখেছেন, কিন্তু একটা মানুষকে তার নিজস্ব ভূমিতে না দেখলে কিছু বোঝাই যায় না।

সারাজীবন কলকাতায়, না জানি উত্তরপাড়ায় গিয়ে কেমন আছে। মন বসছে কিনা।

অমূল্য অবশ্য এদিকে একটা ফ্ল্যাট কিনবে ভাবছে।

বিনোদিনী একদিন বললেন, যাও না একদিন, ওদের এখানে এসে দু'দিন থাকতে বলে এসো।

অনন্তলাল সেদিনই বলেছে, তোমার আর কি, তুমি তো এখন ঝাড়া হাত-পা।

উনি হেসে বলেছেন, নান্টুর বিয়েটা হোক। ওটাই আমার শেষ কর্তব্য।

—তুমি তোমার কর্তব্য নিয়েই জীবন কাটিয়ে গেলে। ফুর্তিফার্তাও করলে না, তীর্থভ্রমণও হল না। অনন্তলাল বলেছিল।

অনন্তলালকে উনি কি বোঝাবেন। এই যে সুমন্ত আমেরিকায় গিয়ে ভাল চাকরি করছে, তার বিয়ে দিলেন, রঙচঙ মাখুক চুল ফাঁপাক, কিন্তু বউমা দিব্যি সুখী, মানে সুমন্ত। আর বেলু তার স্বামীর ঘরে, এসবই তো ওঁর ফুর্তি।

কিন্তু কথাগুলো জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। কারণ বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা।

নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল। বিনোদিনী বলায় আরও উৎসাহ পেলেন।

পরের দিনই বেরিয়ে পড়লেন। ওদের টেলিফোনও নেই যে আগে থেকে জানিয়ে যাবেন।

এই এক অসুবিধে, সুমন্তর শ্বশুরবাড়িতেও ফোন নেই। মেয়ের খবর না পেলে বেচারা হরিদাসবাবুকে ছুটে ছুটে আসতে হয়।

বাড়িতে টেলিফোন আনার জন্য কালীসাধনেরও কোনও আগ্রহ ছিল না; বরং না আনার পক্ষেই ছিলেন উনি। মাসে মাসে একটা বাজে খরচের জন্যে নয়। তখনও রিটায়ার করেননি, নিত্য আপিস যান। বাড়িতে ওই যন্ত্রটা থাকলে জীবন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে এই ভয় ছিল। ভয় আপিসকে। বড়সাহেব কখন ডেকে বসেন তার ঠিক কি। ছুটির দিন কিংবা আপিস থেকে চলে আসার পর : এটা কোথায় কিংবা ওটা পাঠিয়েছেন কিনা ! রবিবারে : একবার চলে আসুন।

সুমন্তর 'টেলিফোন না থাকলে চলে,' আর বেলুর 'হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ বাবা,' তাই দরখাস্ত করতে হয়েছিল। যখন পেলেন তখন টেলিফোনের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছেন তার উপকারিতা। উপকার আর কতটুকু, আই এস ডি করে একগাদা টাকা খরচ হয়ে গেল, কোথায় বেলুর চিঠি পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে সুমন্ত কিছু করতে পারে কিনা জিগ্যেস করবেন, ও প্রান্ত থেকে সে সাগোর পরীক্ষার রেজাল্ট শোনাতে লাগল। শেষে : 'ওয়েল, ওয়েল, আ'ল টক ইট ওভার।'

'মা, তুমি তো সব জানো।' শব্দগুলি মাথার মধ্যে ঘুরছিল।

কালীসাধন কিছুই কি জানতেন না ? খটকা লাগেনি কখনও ?

বিনোদিনীর কথা শুনে অমূল্যদের বাড়ি রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। শ্বশুরশাশুড়ি ছিল, কিন্তু তিন ননদেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বেশ দূরে দূরে।

উত্তরপাড়া যাওয়া কম ধকল নয়। দু' দুবার এসেছেন আগে, তাই বাড়িটা চেনা।

বাড়িটা পছন্দ হয়নি, তা মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলেন হরিদাসবাবু। সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, বহুকাল আগের বাড়ি। দুই শরিক, অমূল্য কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনবে ওদের অংশ বেচে দিয়ে।

সেই স্বপ্নই দেখতেন মনে মনে।

কড়া নাড়লেন, কে যেন এসে দরজা খুলে দিল।

কালীসাধনের সঙ্গে চোখোচোখি হল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অমূল্যর বাবার সঙ্গে।

ওঁকে আসুন আসুন বলার বদলে বেয়াই ভদ্রলোক চিৎকার করলেন, বেলুমা, ও বেলুমা, দেখে যাও কে এসেছেন।

ডাক শুনে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল বেলু।

আর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল কালীসাধনের।

এ কি চেহারা দেখছেন ! বিবর্ণ শুষ্ক একখানা মুখ। কোথাও কোনও আনন্দের

ছিটেফোঁটাও নেই যেন। চেহারাটাও খারাপ হয়ে গেছে। পরনের সাদামাটা শাড়িটাতেও নিরানন্দের ছাপ।

ফিরে এসে বিনোদিনীকে এ সব কিছুই বলতে পারেননি।

শুধু বলেছেন, অমূল্য এখন পরীক্ষার খাতা দেখছে, আসতে পারবে না।

আর কিছু বলেননি। বিনোদিনীকে মিথ্যে কষ্ট দিয়ে কি লাভ।

বিনোদিনীও বোধহয় সেজন্যেই কোনও দিন কিছু বলেননি কালীসাধনকে।

এখন আর শুনতেও ভয়। ভয় বেলুর চিঠিতে লেখা ওই পাঁচটি শব্দ। 'মা, তুমি তো সব জানো।

৫

আঙুর বললে, না বাবা, ও ঘর মোছার সাধ্যি নাই। পারবনি।

—কেন পারবি না আঙুর, দে না একটু ন্যাতা বুলিয়ে। কালীসাধন বললেন।

বুঝতেই পারেননি ওটা আঙুরের অভিমান।

এতগুলো ঘর, রোজ তো আর মোছা যায় না। মোছার দরকারও হয় না। নীচের বসার ঘর ছাড়া সবই পড়ে আছে চাবিবন্ধ। সেগুলো মোছাও হয় না। কিন্তু রবিবারে আঙুরকে দিয়ে দোতলার এক একটা ঘর মুছিয়ে নেন। কখনও বেলুর ঘর, যেটা মেয়েজামাই এসে মাঝে মাঝে থাকবে মনে করে বাড়িয়ে নিয়েছিলেন, কখনও খোকা বা নান্টুর ঘর।

এত ধুলো কোত্থেকে যে আসে। তালাবন্ধ ঘর, জানলা-দরজাও, তবু যখনই খোলো, মেঝেতে ধুলো জমে আছে।

বিনোদিনীই এ সব করান আঙুরকে দিয়ে।

শুধু খোকার ঘরটা কালীসাধন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মোছান।

কালীসাধন তোষামুদে স্বরে আঙুরকে ঘরটা মুছে দিতে বললেন।

আঙুর তবু বললে, ও আমি পারবনি, কোথায় ছিটেফোঁটা লাগবে দেয়ালে...

অভিমান কেন বুঝতে পারলেন।

এই একটা মাত্র কাজ উনি আঙুরকে ফরমাশ করেন, দু'তিন সপ্তাহ বাদে-বাদে। বাকি ঘরগুলো সাফসুফ করানোর ভার বিনোদিনীর ওপরে। বিনোদিনীও একদিন রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তা হলে ও ঘর তুমিই করাও।

ওরা কেউ বুঝতে পারে না, কেউ বুঝতে পারে না।

দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে এসে দরজা খুলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন, যতক্ষণ না আঙুর ঘরের মেঝে মুছে দিয়ে যায়।

—ঘর কি এট্টুখান, কোমর ভেরিয়ে যায়। ন্যাতা বোলাতে বোলাতে আঙুর বলে।

ওর আবার সময় হিসেব করা. তিন বাড়ির কাজ, ময়লা জলের বালতিতে ঝপঝপ করে ন্যাতা ডোবাচ্ছে আর দ্রুত হাতে ন্যাতা টানছে।

জল ছিটকে গিয়ে দেয়ালে লাগছিল দু'চার ফোঁটা।

কালীসাধন হই হই করে উঠেছিলেন, কি করছ, কি করছ ! একটু আস্তে আস্তে করো।

কারণ জলের ছিটেগুলো গিয়ে পড়ছিল মিঙ্কুর আঁকা প্যাস্টেল রঙের ছবিগুলোর ওপর।

ওগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই ঘর মোছানো। মেঝের ধুলো গিয়ে ছবি না নষ্ট করে দেয়, অস্পষ্ট করে দেয়।

সেই যে বলেছিলেন, করছ কি, করছ কি, সেজন্যেই অভিমান।

আঙুর শেষ অবধি রাজি হল, একটু আস্তে আস্তেই মুছতে শুরু করল। ঘর মুছতে মুছতে বললে, নাতনির ওপর বাবার ভারী টান। বলে হাসল।

ও জানে। বিনোদিনীর কাছেই শুনেছে, কবে রং করানোর সময় ও ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন বলে স্ত্রীর ওপরই রেগে গিয়েছিলেন।

এখন আর এ ঘরকে খোকার ঘর মনেই হয় না।

সুমন্ত চলে গেছে, শর্মিলা চলে গেছে। বেলুও।

তখন থেকেই বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা। তখন থেকেই ভোরবেলায় নীচে নেমে এসে আরামকেদারায় গা এলিয়ে বসতেন। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, লোহার গেটের দিকে। দু পাল্লায় মুখোমুখি ঢালাই লোহার দুটি ময়ূর-ময়ূরী। জলের দরে কিনে এনেছিলেন।

কিন্তু ময়ূর-ময়ূরী দেখতেন না। তাকিয়ে থাকতেন; অনন্তলাল আসবে এই আশায়।

আসত। কখনও সকালে, কখনও সন্ধেবেলায়।

একসময়, কাছে একটা পার্ক আছে, দু'জনেই যেতেন। কয়েকটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসতেন বুড়োদের ভিড়ে। আলাপ-পরিচয়ও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে গপ্পগুজব করে আনন্দ পেতেন না। এক একজনের এক একরকম সমস্যা, রুচিও অন্যরকম।

শেষে একদিন বললেন, না হে, এখানে পোষায় না।

অনন্তলাল বললে, তোমার বৈঠকখানাই ভাল, তবু বসে বসে চা পাওয়া যায়।

ওর একটাই ক্ষোভ ছিল, তক্তপোশ সরে গিয়ে শোফা-কৌচ ঢুকেছিল বলে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসা যায় না, শোফায় বসলে মনে হয় গর্তে ঢুকে গিয়েছি।

কালীসাধন শুনে হাসতেন। —তোমাব স্বভাব আর বদলাল না।

আসলে ছোটবেলার বন্ধু, কাজও করত অন্য আপিসে, তবু কি করে যে এতকাল একসঙ্গে টিকে থাকল সেটাই বিস্ময়। অথচ অনন্তলাল ওঁকে ফরচুনেট মনে করে এসেছে, আর উনি জানেন, ও বেচারা সত্যি বড়ই দুর্ভাগা।

ফরচুনেট হওয়া যে কি দুঃখের, কষ্টের শুধু সেটুকুই জানে না।

—লোকের শুধু সন্তানভাগ্য থাকে, তোমার তো জামাইভাগ্যও ভাল। অনন্তলাল রসিকতা করে একদিন বলেছিল।

প্রকাশ করে কিছু বলতে পারেননি। শুধু হেসেছিলেন।

কিন্তু তখন ওঁর বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে একটা অজানা আশঙ্কা। বেলুর জন্যে। কোনওদিন এলে মার সঙ্গে বসে বসে চাপা গলায় এত কি কথা বলে। বলেই যদি, ওঁর সামনে নয় কেন।

সন্দেহ হয়েছে, বিনোদিনী কি কিছু লুকোচ্ছেন ওঁর কাছে!

জিগ্যেস করতেও সাহস হয়নি।

বেলু কখনও-সখনও চিঠি লিখলে ভয় হত, না জানি কি আছে ওর মধ্যে। ব্যগ্র হয়ে চিঠি খুলতেন।

একদিন বিনোদিনী চটে গিয়েছিল। —আমার নামে চিঠি, তুমি খোলো কেন?

বেলুর হাতের লেখা ঠিকানা দেখেই ব্যগ্র হয়ে খুলেছিলেন। তাছাড়া চিঠি খোলাখুলির ব্যাপারে ওঁদের কখনও আমার-তোমার ছিল না। ওসব আজকালকার স্বামী স্ত্রীদের মধ্যে হয়।

উনি অবাক হয়ে বললেন, এ তো বেলুর চিঠি।

বিনোদিনী বললেন, তা হলেও খুলবে না।

উনি বুঝতে পারেননি কেন আপত্তি, রসিকতা করে তাঁর মেজাজ ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করেছেন, বলেছেন, এ বয়েসে তোমাকে কেউ প্রেমপত্র লিখবে না।

কালীসাধন বেলুকে নিয়েই চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, তলে তলে কোথায় কি চলছে কোনও খবরই রাখতেন না।

আনন্দ বলতে তখন শুধুই লাল-নীল পাড় দেওয়া লম্বা খাম।

ওই খামেই এসেছিল নাতি হওয়ার খবর। তারও পরে সাগো। সাগরিকা।

এখন তাদের প্রগ্রেস রিপোর্টও জানায়। কখনও সুমন্ত। ব্যস্ত থাকলে বউমা শর্মিলা। চিঠির নীচে প্রথম দু' একবার 'আপনার বউমা' লিখেছিল। এখন শ্রেফ 'শর্মিলা'।

না, সাগো তখনও হয়নি।

হঠাৎ একদিন অমনি লাল-নীল পাড় দেওয়া লম্বা খাম নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল নান্টু। অফিসফেরতা।

হুররে। হুররে।

কি ব্যাপার!

'আমি আমেরিকা যাচ্ছি। নিউ ইয়র্ক।'

একটু থেমে বললে, 'নিউ ইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলেস।'

বাড়িতে ওঁরা জানতে পারবেন ব'লে দু' ভাইয়ে চিঠি লেখালিখি চলত নান্টুর অফিসের ঠিকানায়। রীতিমতো ষড়যন্ত্র। কোনওদিন টেরও পাননি।

এই যে পায়ের তলা থেকে দিনে দিনে মাটি সরে গেছে, যার ফলে বেলুর এই চিঠি, তা কি কোনওদিন টের পেয়েছিলেন।

তবু একটা খড়কুটো ছিল— এই নান্টু।

ওর উদ্দাম উল্লাস দেখে ভিতরে ভিতরে চুপসে গেলেন। বুঝতে পারলেন, বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই।

বিনোদিনীও কোনও কথা বললেন না। আড়ালে চোখ মুছলেন।

শুধু অভিযোগের স্বরে কালীসাধনের সামনে বললেন, বুড়োবুড়ি দু'জনে কবে মরে পড়ে থাকব, খবরও পাবি না।

নান্টুর সামনে কোনও কথাই না।

বিয়ের আগে বেলু বলেছিল, এয়ারপোর্ট আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে গেল রে।

ছোড়দা চলে যাবে শুনে বেলু আর অমূল্য একদিন এল।

আর বেলু আড়ালে মাকে বলল, ও কি বলছিল জানো?

ও অর্থাৎ অমূল্য।

বললে, নিজের ভাইকে তো দিব্যি ব্যবস্থা করে দিল, আমার কথা মনেই পড়ল না।

শুনতে ভাল লাগেনি। বুঝতেও পারেননি এটা সত্যি অমূল্যর অভিযোগ, নাকি বেলুর।

দাদার বিরুদ্ধে বেলুর অভিযোগ থাকার কথা নয়। সুমন্ত যখনই এসেছে, বেলুর বিয়ের সময়ও কত কি এনেছিল। ওখান থেকে কেউ এলে তার হাতেও কিছু না কিছু পাঠিয়েছে, বেলুকেও।

আমেরিকায় চাকরি কি সুমন্তর হাতের মোয়া? চেষ্টা করতে পারে এই অবধি। নান্টুকে নিয়ে যাবে বলেছিল সে কবে, এতদিনে পেল। কত কি আইনকানুন আছে না!

বিনোদিনী বললেন, নান্টুর বদলে ওদের নিয়ে গেলেই ভাল ছিল।

কালীসাধন প্রথমে ভেবেছিলেন, অন্তত একটা ছেলে কাছে থাকবে এই লোভে। মেয়ে এমনিতেই দূরে চলে গেছে, আরও দূরে চলে গেলে আপত্তি কি। উত্তরপাড়াও যা, আমেরিকাও তাই। ওঁদের দিক থেকে একই। বরং একটা ভাল জায়গায় থাকবে। সময়ে অসময়ে টেলিফোন করতে পারবে।

এখানে খবর পেতে হ'লে সশরীরে গিয়ে হাজির হওয়া ছাড়া গতি নেই।

না, বিনোদিনী তা ভাবেননি।

বললেন, তবু শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে সরে যেতে পারত।

কথাটা কালীসাধনেরও মনঃপূত হল। মেয়ে-জামাই আলাদা থাকে এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে।

বাঙালির ঘরে শাশুড়িরা সব সময়ে জলবিছুটি হয়েই থাকে।

অমূল্য চলে গেলে ওর বাবা-মা যে ওঁদের মতোই নিঃস্ব হয়ে যেতেন তা মনে হল না।

বেলুর মধ্যে যা-কিছু বিষণ্ণতা, তার জন্যে অমূল্য দায়ী হতে পারে সন্দেহ হয়নি কোনওদিন। বেশ শিক্ষিত ছেলে, প্রফেসর, বিনয়ী, হাসিখুশি। অচেনা লোকের সঙ্গেও চট করে মিশে যেতে পারে।

অমূল্য নান্টুর সঙ্গে বেশ জমিয়ে গল্প করছিল। বেলুকেও একটু হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। শাড়ির জন্যেও হতে পারে। বেশ ভাল একটা শাড়ি পরে এসেছিল বেলু। একটু সেজেওছে।

বুঝতে পারেননি, ওটুকু বাবার চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে।

কালীসাধন বললেন, ওকে তুলে দিতে যাওয়ার দিনে এখানেই চলে আসিস। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বেলু বললে, দেখি।

'দেখি' কেন! কেমন যেন খটকা লাগল। ছোড়দা বাইরে চলে যাচ্ছে, এয়ারপোর্টে যাবার ইচ্ছে না হবার নয়। তবে 'দেখি' কেন! শ্বশুর-শাশুড়ি যেতে দেবে না, নাকি অমূল্যই?

অমূল্য বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসব।

যাবার দিনে সব তৈরি, স্যুটকেস শেষবারের মতো গোছানো হয়ে গেছে নান্টুর। স্যুটকেসের গায়ে লেবেল মেরে নিয়েছে একটা, নিজের নামের। ওখানে নেমে নিজের মাল চিনে নিতে অসুবিধে না হয়।

অমূল্য আর বেলু এখানেই খাবে বলে দিয়েছিলেন বিনোদিনী। সেই মতো ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু অপেক্ষা করে করে কেউই এল না।

অথচ কেউই আশা ছাড়তেও পারছে না। অমূল্য বলেছে যখন, নিশ্চয় আসবে।

ট্যাক্সি বলা ছিল, হাতে সময় আছে দেখে তাকে পনেরো মিনিট ওয়েটিং-এ রাখা হল, হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে এই আশায়।

এল না।

নান্টুও বলে ফেলল, আশ্চর্য। কি হল বলো তো ওদের?

তারপর নিজেই বলল, হয়তো দেরি হয়ে গেছে বলে সোজা এয়ারপোর্টে চলে গেছে।

আর অপেক্ষা করা যায় না, সবাই বেরিয়ে পড়লেন।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে নান্টু এদিক-ওদিক একবার দেখে নিয়েই এগিয়ে গেল। দু' ঘণ্টা আগে রিপোর্টিং।

পাসপোর্ট, টিকিট, ডলার সব ঠিকঠাক নিয়েছিস তো?

নান্টু হেসে মা'র কাঁধে হাত রেখে বললে, আরে বাবা, চোখ ছলছলাচ্ছ কেন, এ জিনিস কি ওদেশ রেখে দিতে চাইবে ? ঠিক ফেরত পাঠিয়ে দেবে একদিন।

বিনোদিনী হেসে ফেললেন ছেলের কথায়। চোখ মুছলেন।

নান্টু দ্রুত পায়ে সিকিউরিটি পার হয়ে ঢুকে গেল, ওঁরা আর ওখানে যেতে পাবেন না।

বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাচের এদিক থেকে কর্মব্যস্ত নান্টুকে দেখতে লাগলেন।

এক ফাঁকে বাইরে যারা লাউঞ্জে বসে আছে তাদের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেন। ঢোকার সময় বাইরেটাও দেখে নিয়েছেন।

না, অমূল্য নেই, বেলু নেই। কেউ আসেনি।

নান্টুকে যাওয়ার সময় বেলু দেখতে পেল না। বড় কষ্ট পাবে মেয়েটা। অমূল্যই আসতে দেয়নি কিনা কে জানে। হাসি-হাসি মুখ দেখে কি কিছু বোঝা যায়।

'শালা বিয়ের নিকুচি করেছে', কালীসাধন অস্ফুটে বলে ফেললেন।

বিনোদিনী কিছুই বললেন না।

নান্টু ভিতরে কোথায় ঢুকে গেল, আর দেখতে পাচ্ছেন না, তাই বললেন, ওপরে যাবে না ? সেই রেলিঙের ধারে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো।

বেলু আসেনি বলে মনটা ভার হয়ে ছিল, তাই ভুলেই গিয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এসে রেলিঙের ধারে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালেন দু'জনে।

বিশাল প্লেনখানা দাঁড়িয়ে আছে। বড় সুদৃশ্য। সুন্দর লাগছে।

নান্টু হাঁটতে হাঁটতে হ্যান্ডব্যাগ সত্ত্বেও হঠাৎ একটা চক্কর দিয়ে নিল, হাত নাড়ল। বোধহয় হাসছিল।

এবার সিঁড়ি বেয়ে প্লেনের ভিতরে ঢুকে গেল।

এদিকের জানালার পাশে সিট পেয়েছে কি ? পেলেও অত দূর থেকে দেখতে পাবে ? চিনতে পারবে ? কে জানে।

ফেরার সময় ট্যাক্সিটা মনে হল ইচ্ছে করে ঘুরপথ দিয়ে যাচ্ছে। মিটার বাড়ানোর চেষ্টা। ট্যাক্সি-বুকিং কাউন্টার বলে দিল তাদের হাতে আর ট্যাক্সি নেই। অথচ দালাল গোছের একটা লোক এগিয়ে এসে বললে, ট্যাক্সি লাগবে বাবু ?

এর আগের বার ঠিক এমনি ঘটেছিল। কিন্তু ভুল রাস্তায় মোড় নিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালীসাধন বাধা দিয়েছিলেন। —ওদিকে কেন, ওদিকে কেন!

তারপর ড্রাইভার সোজা পথেই এগিয়েছিল।

আজ কিন্তু কালীসাধন কোনও বাধা দিলেন না। চলুক ও যত ঘুরতে পারে। মিটার উঠুক যত ইচ্ছে। কত আর উঠবে।

টাকার ওপর ওঁর আর কোনও মমতা নেই। কষ্টের দিনের টাকা আরও কষ্টের বিনিময়ে জমিয়ে জমিয়ে কি লাভ হল। কার জন্যে জমানো। সব টাকাই এখন অর্থহীন হয়ে গেল। অর্থহীন এবং তুচ্ছ। এই বাড়িটাকে এতদিন বিশাল মনে করতেন, ওদের কাছে ছোট্ট এতটুকু হয়ে গেছে। কারও এর প্রতি কোনও টান নেই, মমতা নেই, লোভ নেই। আর ওঁর সারা জীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চয় ওদের কাছে উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই কুড়োতে পারবে না। কারণ ওরা দু'জনই এখন সাকশেসফুল।

ওঁর মন বলছে ওরা কেউ ফিরবে না। ফিরে আসার কথা শুধু ওদের স্তোকবাক্য। সুমন্ত বলেছিল, নান্টু বলে গেল।

সেকথায় বিনোদিনী সান্ত্বনা পেতে পারেন, বিশ্বাস রাখতে পারেন। কালীসাধন বিশ্বাস

করেন না।

সেজন্যেই উনি আজ ভীষণ ছোট হয়ে গেছেন, নিজের কাছেই।

একসময় স্বপ্ন দেখতেন, ছেলেরা বড় হবে, আরও বড় হবে, জীবনে সাকশেসফুল হয়ে উঠবে। এর চেয়ে খুশি হবার মত আর কিই বা আছে। কিন্তু টের পাননি কিভাবে যেন নিজেই ছোট হয়ে গেছেন ওদের চোখে।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বয়ে আসা ঝড়ো হাওয়াটা বেশ লাগছিল। কারণ কালীসাধনের মনে হল উনি একেবারে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে গেছেন। শরীরে যেন এক বিন্দু শক্তি নেই।

অনন্তলাল কাল আবার আসবে, তার কাছে গর্ব করেই বলবেন, নান্টুকে কাল এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে এলাম।

আত্মীয়স্বজনদের কাছে, চেনাজানা কারও সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, ছোট ছেলেও আমেরিকায় চলে গেল।

বিনোদিনী এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, কেন যে এল না!

অর্থাৎ বেলু। বেলু আর অমূল্য।

—দেখি, কাল একবার যাই। এছাড়া আর কি বলবেন।

বাড়ি ফিরলেন।

প্রয়োজন ছিল না, তবু দেরাজ থেকে চাবির থোকাটা নিয়ে এসে নান্টুর ঘরটায় শব্দ করে তালা বন্ধ করলেন।

রাগ না ক্ষোভ না অভিমান, নিজেই জানেন না।

তালা, তালা, তালা। বুকের ভেতরের বন্ধ ঘরটাতেও কুলুপ দিয়ে রাখতে হবে। সেই শূন্যতা কারও কাছে প্রকাশ করা চলবে না। শুধু গোপন করতে হবে। মুখে কপট হাসি এনে সকলকে দেখাতে হবে আমি সুখী। আমি গর্বিত।

বলতে হবে, বড় ছেলে নিউ জার্সিতে, ছোট ছেলেও চলে গেল। লস এঞ্জেলেস।

—দাঁড়াও না, ওখানে আমরা একটা রীতিমত কলোনি গড়ে তুলব। সুমন্ত বলেছিল।

রঙিন ফটো দেখে চিনতে হয় নাতি নাতনিকে। কে কত বড় হল।

সেবার যখন এল সাগোকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। 'কত বড় হয়ে গেছ তুমি'। শুধু বড়ই হয়নি, কেমন যেন হয়ে গেছে। খারাপ লেগেছিল। পোশাক, চুল। এখন তো দেখছেন রাস্তাঘাটে এখানেও সব সাগো হয়ে যাচ্ছে।

মিঙ্কু? মিঙ্কুও কি বদলে যাবে? সাগোর মতোই?

কেমন আছে ও, কত বড় হয়েছে জানেন না। সুমন্তর মতো ওরা ঘন ঘন ছবি পাঠায় না, চিঠিও লেখে কম।

তারপর হঠাৎ এই দীর্ঘ চিঠিখানা। 'মা, তুমি তো সব জানো', 'মা, তুমি তো সব জানো'।

উনি এখান থেকে কি বা করতে পারেন। ভাঙা সম্পর্ক কিভাবে জোড়া লাগানো যায় তাও খুঁজে পাচ্ছেন না।

তবু যতটুকু সান্ত্বনা দেওয়া যায়, চিঠিতে ঢেলে দিয়েছেন, বুকফাটা সমবেদনাও। বেলুকে সবশেষে লিখেছেন : ভাগ্যের ওপরে কারও হাত নেই।

বিনোদিনীও সঙ্গে একটা চিঠি দিয়েছেন, ছোট চিঠি। 'যা করবি, ভেবেচিন্তে করিস। তোর নিজের জীবন তো নষ্ট হয়েছেই, মিঙ্কুর কথা ভেবে যা করার ইচ্ছে করবি। ও তোর মেয়ে। কিন্তু শেষ অবধি তুই যাই করিস না কেন, জানবি আমাদের সায় আছে। কারণ তুই যে আমাদের মেয়ে।'

চিঠিটা পোস্ট করে দিয়ে এসে ওই লাইনগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছে। উনি নিজেও

কেন এই কথাগুলো লিখতে পারলেন না। কেন শুধু ভাগ্যের দোহাই পাড়লেন।

কাকে ভয় পাচ্ছেন, কে আছে ওঁর। কেউ নেই, সম্পূর্ণ একা। বিনোদিনী আর কালীসাধন মুখোমুখি বসেন, কথা বলেন, কিন্তু ওঁরা দু'জনেই একা।

কেউ আসে না, এলেও কিছু যায় আসবে না।

লোকে পদে পদে সমাজকে ভয় পায়। পাড়াপড়শিকে, আত্মীয়স্বজনকে। কিন্তু সত্যি কি তাই? না, মিথ্যে মিথ্যে। মানুষ আসলে নিজেকেই ভয় পায়। নিজের সঙ্কীর্ণতাকে। ওই সঙ্কীর্ণতাকেই ভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব। ওই ব্যক্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে আরেকজনের জীবনটা নষ্ট করে দিতে বাধে না। সে যতই তার বুকের কাছের মানুষ হোক।

নান্টু চলে যাওয়ার পর এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এই বাড়িটা অসহ্য লেগেছিল। নিঃশব্দ পাতালপুরীর মতো।

একটা লোহার শিকল আর একটা তালা ভাঁড়ার ঘরের একটা খোপের মধ্যে রাখা ছিল। প্রথম প্রথম লাগাতেন, লোহার গ্যেটে, রাস্তার ভিখিরি ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কায়। কিংবা বোমা ফাটার শব্দ শুনলে বন্ধ করে দিতেন পাছে গুণ্ডাবাজি করতে করতে কেউ এখানে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয়।

তারপর কখন থেকে যেন গ্যেট খোলাই পড়ে থাকে।

নান্টু চলে যাওয়ার পর হঠাৎ মনে পড়ল। সেই শিকল আর তালা খুঁজে বের করলেন। গ্যেটে চাবি পড়ল।

কিন্তু ও পাট চুকে গেল একটা অসুবিধের জন্যে।

কেউ এলে বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক করে। পাড়ার ছেলেরা চাঁদা আদায় করতে এলে, ডাকপিওন, ঠিকের লোক। হরিদাসবাবু বা অনন্তলাল।

সেজন্যে একসময় তালা দেওয়া বন্ধও হয়ে গেল। বারবার নীচে নেমে এসে তালা খোলা। উনি নিজে বাজারে বা ব্যাঙ্কে গেছেন, কেউ এলে বিনোদিনীকেই নীচে নেমে আসতে হত। বাড়িতে একা, মাঝ দুপুরে কেউ কোথাও নেই, বাইরে বেরিয়ে এসে গ্যেট খুলতে যাওয়া। বিনোদিনী ভয় পেতেন। সবাই জানে এ বাড়িতে কেউ নেই, শূন্যপুরী।

অনন্তলাল একবার বলেছিল, নীচের তলাটা ভাড়া দিলে পারতে। একটা সেফটি।

ভাড়ার নামে কালীসাধনের আতঙ্ক। আজকাল যা দেখছেন, শুনছেন। আপিসের একজন সহকর্মী বলেছিল, আশি হাজার টাকা নগদ গুনে দিয়ে ভাড়াটে তুলেছি। পাড়ার একজন পুরনো বাড়িটা বিক্রি করবেন, কোন প্রোমোটার কিনবে ফ্ল্যাট তোলার জন্যে, ভাড়াটেদের চাহিদা এক একটা ফ্ল্যাট বিনিপয়সায়, তার ওপর নগদ টাকা। টাকাটাই বড় এদের কাছে, আত্মসম্মান বলে কিছু নেই।

ওঁদের সময়ে এ সব কথা কেউ ভাবতেই পারত না।

ভাড়াটে শব্দটাই এখন এক আতঙ্ক।

ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন, ফিকস্‌ড ডিপোজিট আছে বেশ কিছু। সেটা রিনিউ করতে।

গিয়ে আলাপ হয়ে গেল কমবয়েসি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। দিব্যি সুশ্রী চেহারা, স্মার্ট, গলায় টাই। উনিও ব্যাঙ্কে এসেছেন কি একটা কাজে। অনিমেষ দত্ত। নিজেই নাম বলল।

যেচে আলাপ জুড়ে দিল। কালীসাধনের ভালই লাগছিল। কথা বলার লোক পেলে বেঁচে যান। কিছুটা সময় কেটে যায়।

এই একা নিঃসঙ্গ জীবনে সময় কাটানোই সবচেয়ে বড় কষ্ট। আরও কষ্ট বুড়োদের

সঙ্গে কথা বলা। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, নিজের কথাই বলে। সেজন্যে সকালে পার্কের সেই বুড়োদের আড্ডায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ছেলেটি ঠিকানা চাইল। একদিন যাব আপনার বাড়ি।

কালীসাধন নামঠিকানা লিখে দিলেন, কিছুই সন্দেহ করেননি। ওঁর চোখে একেবারেই বাচ্চা বয়েস, ওকে ছেলেটি ভাববেন না তো কি ভাববেন।

অনিমেষ দত্ত পরের দিনই এসে হাজির, হাসি-হাসি মুখ।

দরজা খুলে নীচের বসার ঘরের শোফা দেখিয়ে বললেন, বসুন।

কালীসাধনও বেশ খুশি।

ছেলেটি বললে, আপনার ছেলেরা সব আমেরিকায়, তাই না। বলে হাসল।

কালীসাধন শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ছেলেরা আমেরিকায় তা তো উনি জানাননি ছেলেটিকে। ও জানল কি করে!

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে, আপনার নীচে-তলার ঘরগুলো একটু দেখব।

সন্দেহ ঢুকল এবার। নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইলেন। —ও আর দেখার কি আছে?

—তবু দেখি একটু। ছেলেটি হাসছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেখাতে হল। ঘুরে ঘুরে দেখল ছেলেটি।

তারপর হঠাৎ বললে, আমি এই রকমই খুঁজছি।

একটু থেমে বললে, একটা ক্যুরিয়ার সার্ভিস খুলছি।

বললে, আপনারও সুবিধে হবে, একা থাকেন এত বড় বাড়িতে। ভাল ভাড়া দেব।

—ভাড়া? অবাক হয়ে গেলেন কালীসাধন।

বেশ বুঝতে পারলেন ব্যাঙ্কের ওই চেনা ছেলেটির কীর্তি। ও-ই জানিয়ে দিয়েছে।

স্মার্ট, গলায় টাই, সুশ্রী চেহারার ছেলেটিকে আর এক মুহূর্ত ভাল লাগেনি।

বললেন, না, না, ভাড়া দেব না।

একটু থেমে বললেন, তাছাড়া ছেলেরা ফিরে আসবে, এসে নিজেরাই হয়তো কিছু করবে।

ছেলেটি অনেকক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করে তারপর বিদায় নিয়েছে।

কিন্তু ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে কালীসাধনের মনে।

ভয় হয় কখন কার হাসি-হাসি মুখ দেখে দুর্বল হয়ে পড়বেন, অথবা ছেলেদের ওপর অভিমান করে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ভাড়া দিয়ে ফেলবেন।

সব সময়ে সতর্ক হয়ে থাকতে হত। একবার একটা দালাল এসেছিল, তাকে প্রায় মেরে তাড়িয়েছেন।

ওপরে উঠে এসে বিনোদিনীকে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, ওদেরই বা দোষ কি। এটা তো একটা বিয়েবাড়ি। খালি পড়ে থাকে, কারও বিয়ে হলে দু'দিনের জন্যে আসে, চলে যায়। নান্টুও হয়তো বিয়ের সময়ে আসবে।

না, নান্টু বিয়ের সময়েও এল না।

বিনোদিনী বললেন, দেখলে তো, তখনই বলেছিলাম বিয়েটা দিয়ে দাও।

নান্টুর চিঠি এল, তার পরপরই সুমন্তর টেলিফোন।

'নান্টু বিয়ে করছে, আমরাও যাচ্ছি। কনের নাম দময়ন্তী, এখানে সকলে ওকে ডেমি বলে, ভাল চাকরি করে। দময়ন্তীর ডি আর এম অক্ষর থেকে ডেমি। মা বাঙালি, বাবা গুজরাতি। ভাঙা ভাঙা বাংলাও বলে। রিয়েলি হ্যান্ডসাম।'

নান্টুর চিঠিতেই সব খবর ছিল, রিসিভার নামিয়ে রেখে কালীসাধন বললেন, এটা আর

বিয়েবাড়িও রইল না।

নান্টু বিয়ের পর ফোন করল। 'এখন বউ দেখিয়ে আনা সম্ভব নয়, পরে নিয়ে যাব। তুমি দেখলে অ্যাডমায়ার না করে পারবে না। নাও, তোমার বউমার সঙ্গে কথা বলো।'

চার বছর পর এসেছিল নান্টু। বউ তখন পুরনো হয়ে গেছে। তবু নতুন বউয়ের মতোই তার আদর যত্ন করেছিলেন। তার ভাঙা ভাঙা বাংলা বেশ ভালই লাগছিল।

দিন দশেক মাত্র থাকবে।

কালীসাধন দু'দিন পরেই উত্তরপাড়ায় চলে গেলেন, নান্টুরা এসেছে খবরটা বেলুদের জানাতে।

ছোড়দার বিয়ের খবরটা তার চিঠিতেই জেনেছিল বেলু।

হঠাৎ বউ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে শুনে বেলুর বিষণ্ণ মুখ আলো হয়ে উঠল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই : ওকে একবার বলো।

অর্থাৎ অমূল্যকে।

কালীসাধনের বুঝতে অসুবিধে হল না। এ বাড়িতে বেলুর ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনও দাম নেই।

সেটা অনেক আগেই বুঝে গেছেন।

বিভ্রান্ত এবং বিব্রত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন, নান্টুকে সী-অফ করার দিনে অমূল্য যাবে বলেও কেন গেল না জানতে।

নান্টু সেদিন যাবার সময় বারবার বেলুর কথা বলছিল। —কেন এল না বলো তো ? কিছু হল নাকি !

নান্টুরা তো কিছুই জানত না, তাই ভেবেছে কোনও অসুখবিসুখ।

আর কালীসাধন সেদিন এসে অমূল্যকে প্রশ্ন করতেই কেমন দায় এড়ানো ভাবে অমূল্য বললে, যাওয়ারমুড ছিল না !

মুড !

দুঃখের হাসি হেসেছিলেন কালীসাধন। তার ছোড়দা চলে যাচ্ছে, তাকে সী-অফ করতে যাওয়ায় যে বেলুর ইচ্ছেটাই বড় তা ভেবে দেখার অবকাশও নেই। সেই মনই নেই যেন অমূল্যর।

বিরস মুখ নিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিলেন।

তবু আবার যেতে হবে। উপায় কি।

নান্টু তা না হলে বড় কষ্ট পাবে। তার বউয়ের কাছে লজ্জা পাবে।

প্রায় কান্নার গলায় অনুনয় করলেন, বেলুকে নিয়ে তুমি যেয়ো একবার, অমূল্য। নান্টুর বউ তা না হলে কি ভাববে। নান্টু বলছিল নিজেই আসবে, বউকে নিয়ে।

অমূল্য বললে, যাব যাব, আসতে হবে না।

কেন বললে তা কালীসাধন বুঝতে পারেন। নান্টু সবই দেখেছে, জানে, কিন্তু তার বিদেশি বউকে উত্তরপাড়ার এই বাড়িটা দেখাতে লজ্জা !

বেলু আর অমূল্য গিয়েছিল।

অমূল্যর সামনেই নান্টুকে বললেন, এবার অমূল্যকে নিয়ে যা, তোরও তো কত বছর হয়ে গেল। খোকাকেও বলেছি।

ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে। সুমন্ত চলে গেল, শর্মিলাও। তারপর নান্টু। অথচ এদের একজনেরও চলে যাওয়া ওঁদের মনঃপূত হয়নি। মনে মনে চেয়েছেন ফিরে আসুক। আর এখন নিজেই চাইছেন অমূল্য চলে যাক বেলুকে নিয়ে। ওখানে ওরা হয়তো সুখ খুঁজে পাবে।

বিনোদিনীর তাই ধারণা। শ্বশুর শাশুড়ি তো থাকবে না।

নান্টু আর দময়ন্তী চলে যাবার পর খোকাকে টেলিফোনে একদিন সব বুঝিয়ে বলেছিলেন। —ওর জন্যে কিছু একটা কর। তোরই তো বোন, কি কষ্টে যে আছে।

খোকা বলেছিল, দেখি।

তারপর সত্যি সত্যি অমূল্যও চলে গেল একদিন।

চলে যাওয়া এতদিন দেখেছেন দুঃখের এবং কষ্টের। সেই প্রথম দেখলেন চলে যাওয়া কত আনন্দের। কত সুখ।

মনে হল বেলু পরিত্রাণ পেয়ে গেল। এবার বাঁচবে।

৬

অনন্তকাল রসিকতা করে বলেছিল, তুমি তো একে একে সবাইকে চালান করে দিলে, শেষে আমাকেও না চালান করে দাও।

কালীসাধনের মন তখন আনন্দে ভরে আছে।

বড় ছেলে খোকা চলে গেল, বউমা চলে গেল, তারপর নান্টুও। ক্রমশ বাড়িটা একেবারেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে নিঃস্ব মনে হত, একা।

শূন্যতার মধ্যে থেকেও সেই প্রথম খুশি হয়ে উঠেছিলেন।

বিনোদিনী স্পষ্ট করে কোনওদিন কিছু বলেননি। বেলু চাপা মেয়ে, বাবা কষ্ট পাবে বলে কিছুই জানাবে না তাও জানতেন। তবু বুঝতে অসুবিধে হয়নি, জীবনে একটা বড় রকমের ভুল করে ফেলেছেন।

তাই খড়কুটো ধরে ভেসে ওঠার চেষ্টা।

তলে তলে ষড়যন্ত্র করে সুমন্ত নান্টুকেও নিয়ে চলে গিয়েছিল বলে রাগ আর ক্ষোভ নান্টুর বিরুদ্ধে যত না, তার চেয়ে বেশি ছিল সুমন্তর ওপর।

কিন্তু সেই সুমন্তর প্রতি উনি যেন একটা লুকোনো কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। শেষ অবধি অমূল্যকেও নিয়ে গেল বলে। আমেরিকান কলেজের প্রোফেসর, এ কি কম গর্বের কথা। এখানে অমূল্যর কলেজের নামটা উচ্চারণ করতেও সঙ্কোচ হত।

তবে ওসব গর্ব ওঁর ভেতর থেকে চলে গেছে।

উনি শুধু চাইছিলেন উত্তরপাড়ার ওই বাড়িটার সঙ্কীর্ণতা থেকে অমূল্য ও বেলুকে বের করে এনে একটু মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস নিতে দেওয়া। যেমন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল আমেরিকার একেবারে নতুন পরিবেশে গিয়ে ওরা সুখের মুখ দেখতে পাবে। তাছাড়া ওখানে সুমন্ত আছে, নান্টু আছে, বউমা শর্মিলা। বেলুর অন্তত মনে হবে, আমার দাদা-বউদিরা কাছেই আছে। যে কোনও আপদ-বিপদে শুধু একটা টেলিফোনের অপেক্ষা।

কালীসাধন পরিহাস করে বললেন, যাবার খুব ইচ্ছে নাকি অনন্ত ? বলো তো খোকাকে নান্টুকে বলি।

অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে হাসলেন কালীসাধন।

বললেন, ছেলেরা হাল ছেড়ে দিয়েছে। কেবল বলত, একবার এসে অন্তত দেশটা দেখে যাও। কি আর দেখব বল, নিজের দেশটাই তো দেখা হল না।

বিনোদিনীও খুব খুশি। —এবার বোধহয় মেয়েটা বাঁচবে।

অমূল্যর যাওয়ার দিন কয়েক আগে হরিদাসবাবু এসে হাজির হলেন।

খবর পেয়েই এসেছেন।

বললেন, কি বেয়াই, বলেছিলাম না, ছেলে ব্রিলিয়েন্ট, নেহাত ধরাধরির লোক নেই বলে বাজে কলেজে আছে।

চাকরি যে আসলে সুমন্তর চেষ্টাতেই হয়েছে, সে-কথা ভুলে যেতে চাইলেন। যোগ্যতা না থাকলে কি চেষ্টা করলেই হয়। ওঁর দুর্বল মুহূর্তে হঠাৎ এই রকম একটা সম্বন্ধ এনে বিয়েটা ঘটিয়ে দেওয়ার জন্যে হরিদাসবাবুর ওপর ওঁর যত ক্ষোভ ছিল সব ভুলে যেতে চাইলেন।

বুকের গোপন কষ্ট দু'হাতের কোমল মুঠোয় বের করে এনে একটা মুনিয়া পাখিকে যেন মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে উড়িয়ে দিতে পারছেন।

নান্টু বলেছে, কিচ্ছু ভেবো না, ডেমি—দময়ন্তীর অফিসের কাছে পড়বে। ও বলছে ড্রাইভ করে চলে যাবে এয়ারপোর্টে, অমূল্যকে রিসিভ করতে। কোনও ভয় নেই।

ভয় একবারই পেয়েছিলেন। যখন বউমাকে একা তুলে দিয়ে এসেছিলেন। এখন আর ভয় করে না। ভাবনাচিন্তা হয় না। রেজিস্ট্রি ডাকের চিঠির মতো একটা বিশ্বাস, পোস্ট করে দিলে ঠিক পৌঁছে যাবে।

অমূল্য বারবার ছুটে ছুটে আসছে, এটা কি করব, ওটা কি করব। ফোন করছে অবিরত, কখনও সুমন্তকে, কখনও নান্টুকে। আর যখনই আসছে, বেলুকে সঙ্গে নিয়ে।

যাবার তিনদিন আগে বেলুকে এনে রেখে গেল ওঁদের কাছে।

মিহি সুরে তখন ক্যাসেটে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

ওঁরাই অমূল্যকে প্লেনে তুলে দিতে গেলেন। তুলে দেওয়া মানে শুধু সঙ্গে যাওয়া, যতক্ষণ না সিকিউরিটি লাউঞ্জে ঢুকে যাচ্ছে।

অমূল্যর বাবা-মাও এলেন। দেখে মনে হল বেজায় খুশি। ছেলে আমেরিকায় চাকরি করতে যাচ্ছে, খুশি হবারই কথা। উত্তরপাড়ার ওই শরিকি বাড়িটার জন্যে তাঁর যা-কিছু গ্লানি, সব সরে গেছে। গর্ব করে বলতে পারবেন, ছেলে আমেরিকায়।

দুটো ট্যাক্সি ডাকা হল, একটায় অমূল্য আর বেলুকে বসিয়ে দিয়ে কালীসাধন বললেন, আসুন আসুন আমরা এটায় বসি।

অমূল্যর বাবা বললে, আহা, ওটায় তো আরও জায়গা রয়েছে। একটায় ঠাসাঠাসি করে—

বিনোদিনী বললেন, অমূল্য একটু আরামেই যাক, ওকে সারা রাস্তা বসে বসে যেতে হবে।

অর্থাৎ অমূল্য আর বেলু একটু একা হোক্।

বেলু তো এখানেই থাকবে এখন, কবে যেতে পাবে কে জানে।

অমূল্যদের ট্যাক্সির পিছনে যেতে যেতে হঠাৎ অনুশোচনা হল কালীসাধনের। সেই প্রথম যখন সুমন্তকে সী-অফ করতে এসেছিলেন, তখন একটা ট্যাক্সিতে সকলে একসঙ্গে। বউমার মাথায় ঘোমটা। সারা পথ বেচারি সুমন্তকে একটা কথাও বলতে পারেনি। নতুন বউ, লজ্জায় জড়সড়। ওপরে উঠে গিয়ে রেলিঙের ধার থেকে হাত নাড়তেও লজ্জা।

এখন মুখে রঙচঙ মাখে। চুল ফাঁপানো। আর সেই লাল টাইট গেঞ্জি পরা ফটো। শ্বশুর-শাশুড়িকে পাঠাতেও কোনও সঙ্কোচ নেই।

শর্মিলা অবশ্য একবার বলেছিল, শাড়ি পরে বেরোলে লোকে তাকিয়ে দেখে, কাছে এসে মেয়েরা জানতে চায় কিভাবে পৌঁচিয়েছি।

বলে কি হাসি।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলেন।

কালীসাধন অনেক কিছু জেনে গেছেন ততদিনে। নামঠিকানা লিখে লেবেলটা ট্যাগ করে নিতে ভুলো না। ডলার সব হ্যান্ডব্যাগে রেখেছ তো! বোর্ডিং কার্ড পেয়ে গেলে একবার হাত নেড়ে দিয়ো।

অমূল্য ঢুকে গেল, হাতও নাড়ল।

বেলু আগে আগে, ওর সব জানা। দু'দুবার এসেছে। যেবার খোকা গেল, তারপর বউমা। মানে শর্মিলা। শুধু নান্টুর বেলাই বেচারি যেতে পায়নি। ওই আহাম্মকটার জন্যে। এখন কেমন লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

ওপরে উঠতে উঠতে কালীসাধন বললেন, বেলু, বউমাকে তুলে দিতে এসে কি বলেছিলি মনে আছে?

বেলু লজ্জা পেল, হাসল শুধু। ঘোমটা টেনে দিল একটু।

—জানেন বেয়াইমশাই, বেলু বলেছিল, এয়ারপোর্ট আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে গেল।

রেলিঙের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

বেলু হাত নাড়ল না। কালীসাধন ভাবলেন, লজ্জায়।

কালীসাধন বা বিনোদিনী কেউই ভাবেননি। ফেরার সময় ট্যাক্সি খুঁজছেন, অমূল্যর বাবা বলে বসলেন, বউমা আমাদের সঙ্গেই চলুক। দু'দিন পরে তো চলেই যাবে।

ফেরার ট্যাক্সিতে কালীসাধন হঠাৎ বললেন, শালা।

চমকে উঠেছিলেন বিনোদিনী। কালীসাধনের মুখে এই বাক্য সচরাচর উচ্চারিত হতে শোনেননি।

হরিদাসবাবুও কি একদিন ঠিক এই শব্দটি উচ্চারণ করেছিল কালীসাধন সম্পর্কে? কে জানে।

রিসিভারে সুমন্তর গলা ভেসে এল। —ইট্স অল ফিউটাইল। ওরা পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে পৌঁছে গেছে। বেলু অ্যাডামেন্ট। ও তো আমেরিকাকেই ডিভোর্স করে দিতে চায়।

একটু থেমে বললে, বারো বছর আগে থেকে মন তৈরি করে রেখেছে।

রিসিভার বিনোদিনীকে এগিয়ে দিলেন। শুধু বললেন, খোকা।

আর কোন কথা জোগাল না ওঁর মুখে। ভীষণ অসহায় লাগল, একটা ভেঙে পড়া মানুষ। একটু আশা ছিল, ওঁর চিঠি পেয়ে অন্তত দু' বার ভাববে।

চিঠির কথাগুলো মনে পড়ল। আভাসে সে-কথাই ও লিখেছে। বুঝতে পারেননি। শুধু একটা কথাই মনে পড়ল। 'মা, তুমি তো সব জানো'।

কবে বলেছে, কবে! ওর চিঠিগুলোয় কখনও কিছু জানতে পারেননি।

সুমন্ত বলছে, ও যা ঠিক করেছে করতে দাও, ইটস ফার বেটার। এখানকার বাঙালিদের চেনো না, স্ক্যান্ডালের জন্যে মুখিয়ে আছে।

কথাটা মনে পড়তেই কালীসাধন হাসলেন। বাঙালিরা বাইরে গেলেই কি অন্যরকম হয়ে যায় নাকি? তোর যা বুদ্ধি।

নান্টুও বলেছিল। হামবাগ।

বেলু চলে যাওয়ার পরের বছর নান্টু এসেছিল। তার গুজরাতি বউকে নিয়ে।

কালীসাধন বলেছিলেন, খবর দিলি না কেন, আমি যেতাম এয়ারপোর্টে।

নান্টু হেসেছিল। —এয়ারপোর্ট কি হাজত নাকি যে ছাড়িয়ে আনতে হবে। ট্যাক্সি ধরব, চলে আসব। তার আবার রিসিভ করার কি আছে। হেসে উঠে বলেছিল, ডেমির সম্মানে!

বিনোদিনী বললেন, দ্যাখ বাবু, আমাদের সামনে ডেমি ডেমি করিস না। দময়ন্তী কি

সুন্দর নাম।

নান্টু হেসে বললে, ওর অফিসে আমেরিকানরা উচারণ করতে পারে না, তাই ডেমি বানিয়ে দিয়েছে। ওখানে দময়ন্তী বললে কেউ বুঝবেই না।

মেয়েটি ভাল। বেশ একটা আলগা শ্রী আছে। মুখের আদলে একটু অবাঙালি ভাব। তবে ফর্সা।

বাঃ, বেশ বউ হয়েছে।

বাঙালিদের মতো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল দময়ন্তী। নিশ্চয় নান্টু শিখিয়ে এনেছে।

—তুই শিখিয়েছিস ?

নান্টু হেসে বললে, না না। বেলু। ও যে এসেছিল দু'দিন।

নিউ জার্সি কোথায়, ফিলাডেলফিয়া কোথায়, লস এঞ্জেলেসই বা কোথায়। কিছুই জানেন না কালীসাধন। শুধু আমেরিকার ম্যাপে কয়েকটি বিন্দু দেখেছেন, আন্দাজে বুঝতে চেষ্টা করেছেন একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব কত।

সুমন্তকে একবার জিগ্যেস করেছিলেন।

ও হেসে বলেছিল, ডিসটান্স কিলোমিটারে মাপছ কেন, ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য প্লেন-ফেয়ার।

প্লেনের ভাড়াই বা উনি কি করে বুঝবেন, ওটাও ওরা ডলারে মাপে।

বিনোদিনী দুঃখ করে বললেন, হ্যাঁ রে নান্টু। বিয়েটা এখানে করলে কত ধুমধাম করা যেত।

নান্টু হেসে বললে, আসব বললেই কি আসা যায় !

ওই কটা দিনের জন্যে গুজরাতি পুত্রবধূটিকে নিয়ে একেবারে মেতে উঠেছিলেন। সব গয়না বেলুর বিয়েতে দিতে পারেননি। একজোড়া মুক্তো বসানো কঙ্কণ রেখে দিয়েছিলেন নান্টুর বউকে দেবেন বলে।

স্নানের পর দময়ন্তী বেরিয়ে এসেছে, ডাকলেন তাকে। এদিকে এসো তো মা।

দময়ন্তী এগিয়ে গেল তাঁর ঘরে।

কপাট বন্ধ করে দিলেন বিনোদিনী। মুখে হাসি।

ডেমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। বেচারি হকচকিয়ে গেছে।

বিনোদিনী আলমারি খুলে তাঁর বিয়ের বেনারসীটা বের করলেন, বেনারসীর ব্লাউজ পিস থেকে বানানো সেই ব্লাউজটাও।

ব্লাউজটা একটু ঢিলে হল, তা হোক্। শাড়িটা কুঁচি দিয়ে পরিয়ে দিলেন বাঙালিদের মতো করে। ঘোমটা তুলে দিলেন ওর মাথায়। তারপর দু'হাতে দুটো মুক্তো বসানো কঙ্কণ, সিঁথিতে সিঁদুর টেনে দিয়ে নিজের নোয়াতে ঠেকালেন।

বললেন, দেখো। আয়নায় দেখো নিজেকে।

আর কপাট খুলে ডাকলেন কালীসাধনকে। —এই শোনো, দেখে যাও শিগগির।

কালীসাধন এসে দাঁড়ালেন। কি বলছ ?

দময়ন্তী নিজেকে আয়নায় দেখছিল হাসি হাসি মুখে।

বিনোদিনী বললেন, দময়ন্তী এদিকে এসো একবার।

দময়ন্তী হাসি-হাসি মুখেই এগিয়ে এল।

আর কালীসাধন দময়ন্তীর দিকে তাকালেন। দেখলেন, দময়ন্তীর দু' চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। আনন্দে।

সেই ক'টা আনন্দের দিন আজও স্মৃতির মধ্যে জেগে আছে।

অথচ কতটুকু ওদের দেখতে পেয়েছিলেন। নান্টু দময়ন্তীকে তখন কলকাতা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। বাংলা সিনেমা, বাংলা থিয়েটার। একদিন যে ভাল করে রেঁধে খাওয়াবেন ওদের, তারও সুযোগ পেলেন না বিনোদিনী। এর মধ্যে আবার হরিদাসবাবু নেমন্তন্ন করলেন, একদিন অনন্তলাল।

এ ভাবেই ওরা আসে, চলে যায়। এয়ারপোর্টেও যেতে দেয় না। বলে, কেন মিছিমিছি যাবে কষ্ট করে। শুধু হাত নাড়ার জন্যে ? ওখান থেকে দেখতেও পাব না।

ওই যাওয়া, হাত নাড়া, ওর মধ্যে যে কি আছে, ওরা বুঝতেও পারে না। ওরা ভাবে ওটা শুধুই ফরম্যালিটি।

সুমন্ত যেবার এল, বউমা ছেলেমেয়ে সকলকে নিয়েই এসেছিল। কিন্তু নামেই আসা। ওঁরা আর কতটুকু কাছে পেয়েছেন তাদের। বউমা। মানে শর্মিলা দু'দিন বাদেই বাপের বাড়ি চলে গেল। সেটা অবশ্য কোনও অন্যায় নয়। মেয়ে এতদিন বাদে ফিরল, বাপের বাড়ি থাকবে না ক'দিন। ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। শুধু সাগো যেতে চায়নি।

দিনরাত উচ্চৈঃস্বরে ক্যাসেট বাজিয়েছে। ওর পোশাক-আশাকও এখন আর বেমানান লাগে না। সারা কলকাতাতেই এখন আকছার।

জোর করে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতে গিয়েছিলেন, হেসে বাঁচে না। —হাউ ফানি।

মনে মনে ভেবেছেন, এরা বাঙালিও থাকবে না, আমেরিকানও হতে পারবে না।

ওদের দেখে আমেরিকানরাও হয়তো বলবে, হাউ ফানি।

এখন হয়তো বলে ওদের বাবা মাকে দেখে।

সে রকমই ধারণা কালীসাধনের। উনি আর কতটুকুই বা জানেন।

বিনোদিনী শুধু জিগ্যেস করেছিলেন, হ্যাঁ রে খোকা, ওখানে দুগ্গা পুজো হয় শুনেছি, ভাল করে হয় ?

সুমন্ত হেসে উঠেছে। সব হয়, সব। নাটক, জলসা, গান-বাজনা।

তারপর একটু থেমে বলেছে, ও সব না হলে লোকের হাঁড়ির খবর বের করবে কি করে। স্ক্যান্ডাল রটানোর জন্যেও তো মেলমেশা দরকার।

—সে কি ! এইরকম ?

বউমা ছিল কাছেপিঠেই। কানে গিয়েছিল কথাটা, টিপ্পনী কেটে বললে, পাশের বাড়িতে কোনও বাঙালি বউ খুন হলে কোনও পড়শি বাঙালি একটা টেলিফোন করেও পুলিশকে খবর দেবে না।

সুমন্তকে বললে, লীনার কথাটা বলো।

সুমন্ত হাসল দেখে নিজেই বলল, দোকানে গিয়েছিল। মাতাল স্বামী কিছুতেই ঘরে ঢুকতে দেবে না। বেচারি অনেক চেষ্টা করে শেষে চেনাজানা দু'একজনের বাড়িতে গিয়ে রাতটার জন্যে আশ্রয় চেয়েছে। কেউ দেয়নি। সবাই গা বাঁচিয়েছে।

সুমন্ত বলেছে, আমরা দিয়েছিলাম।

—দিয়েছিলি ! খুব খুশি কালীসাধন।

উনি ভাবতেই পারেন না বিদেশ বিভুঁইয়ে কেউ এতখানি নির্দয় হতে পারে, অসহায় একটি মেয়ের মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিতে পারে।

শর্মিলা হাসতে হাসতে বললে, বন্ধুরা জানতে পেরে কি বলেছে জানেন ? এমন রিস্কি কাজ করা নাকি উচিত হয়নি।

শর্মিলা বলেছিল, ওখানে মেয়েরা যে কি অসহায় ভাবতে পারবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে বেলুর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল কালীসাধনের।

হয়তো বিনোদিনীরও। জিগ্যেস করে বসেছেন, বেলুর সঙ্গে দেখা হয় তোমাদের মাঝে মাঝে ? ওদের খবর ভাল তো।

সুমন্ত হেসে উঠেছিল। অমনি তোমাদের ভাবনা হয়ে গেল।

বললে, নাথিং টু ওরি অ্যাবাউট। দে আর ফাইন।

এখন বুঝতে পারছেন, ওরা কিছুই বুঝতে পারেনি।

উনি নিজেই কি ছাই কিছু সন্দেহ করেছিলেন। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।

—তোমাদের জন্যে ভীষণ মন খারাপ হচ্ছিল, তাই এসে পড়লাম। এক মাস থাকব, এক মাস।

বেলুকে দারুণ খুশি লাগছিল। মিঙ্কুকে সেই প্রথম দেখলেন। বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। কতই বা বয়েস তখন মিঙ্কুর। চার বছর।

ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বর্ন ইন দ্য স্টেটস। তুমি আমার আমেরিকান নাতনি।

—না বাবা, ওকথা বোলো না। আমি ওকে বাঙালি করেই মানুষ করব। বাড়িতে নিয়মিতো বাংলা শেখাই। বাবার ঠাট্টা শুনে প্রতিবাদ করেছিল বেলু।

হতাশ গলায় কালীসাধন বলেছিলেন, পারবি ?

ওদের ও ধরনের কথা বিনোদিনীর একটুও ভাল লাগছিল না। ওঁর মনে হয়তো কোনও আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল।

তাই বলে বসলেন, অমূল্য এল না ?

বেলু হেসে উঠে বললে, সে এ-সময়ে ছুটি পাবে না। তাই একাই চলে এলাম।

মিঙ্কু ধীরে ধীরে বললে, আমাদের যে তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল।

বিনোদিনী মিঙ্কুকে কেড়ে নিলেন কালীসাধনের কোল থেকে। বললেন, কাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করছিল মণি ? আমাকে, না দাদুকে।

মিঙ্কু মিটিমিটি হেসে বললে, তোমাকে, আর তোমাকে। অর্থাৎ কালীসাধনের দিকেও আঙুল দেখাল। তারপরই বললে, বোথ।

কালীসাধন মাস্টারির সুরে বললেন, বোথ নয়, বোথ নয়। বোথ অফ ইউ।

বেলু হেসে উঠে বললে, বাবা, তুমিও !

তারপর আস্তে আস্তে বললে, বাংলা বলতে না পাওয়া যে কি কষ্ট।

কালীসাধন সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন। বিনোদিনীকে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, চলো, চলো ওর ঘরটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে তো।

দেরাজ থেকে চাবির থোকাটা খুঁজে নিয়ে কি যে ভাল লাগল। এই চাবির থোকাটার সঙ্গে শুধু যেন বেদনাই মিশে আছে। এক একজন চলে গেছে। আর চাবি নিয়ে এসে ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করেছেন। দরজায় তালা লাগিয়ে চাবি দিয়েছেন। সুমন্ত কিংবা নান্টু এসেছে, কদাচিৎ, তাও দু' পাঁচদিনের জন্যে। আবার সেই চাবি লাগাতে হয়েছে।

সবচেয়ে কষ্ট হয় রবিবার। কেউ আসে না, আসবে না, তবু সেদিন আঙুরের সময় থাকে বলে এক একটা ঘর খুলে দিয়ে মেঝেটা ন্যাতা-জল দিয়ে মোছান। অথচ ভিতরে ভিতরে জানেন সবই অর্থহীন।

শূন্যতা ছাড়া এ বাড়িতে আর কিছুই ওঁর জন্যে অবশিষ্ট নেই। একা, একা, একা। বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসা কেমন একটা ব্যথা শুধু।

বেলু এসে পড়ায় একটু যে সন্দেহ জাগেনি তা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক আনন্দও যেন উপচে পড়তে চাইছিল। বিশেষ করে মিঙ্কুকে দেখে। ফুটফুটে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখতে ইচ্ছে করছে সর্বক্ষণ।

চাবি নিয়ে এসে খোকার ঘরটাই খুলে দিলেন। বিনোদিনী জানালাগুলো খুলতে

গেলেন। আর বেলু বললেন, দাদার ঘর কেন!

বিনোদিনী বললেন, তা হোক, তুই কি একটেরে পড়ে থাকবি নাকি?

কালীসাধন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন, আর খোকার ঘর।... সে তো ওখানে বাড়ি কিনেছে।

বাড়ি নয়। ফ্ল্যাট। ওরা বাড়িই বলে।

সে কি উল্লাসের গলায় খবরটা দিয়েছিল সুমন্ত। যেন একটা রাজ্য জয় করে ফেলেছে।

—বাবা, আই হ্যাভ গট্ আ হাউস নাও। তুমি আর মা একবার চলে এসো। কবে আসবে বলো, টিকিট পাঠিয়ে দেব।

ছেলের সেই উল্লাস সহ্য করতে পারছিলেন না কালীসাধন। একটি কথায় একেবারে চুপসে গেলেন। রিসিভারটা বিনোদিনীকে দিয়ে বললেন, শোনো কি বলছে। খোকা বাড়ি কিনেছে। আমেরিকায়।

মুমূর্ষু রোগীর মতো বসে পড়েছিলেন। যেন এর চেয়ে দুঃসংবাদ আর নেই। হতে পারে না। সামান্য একটা আশা। তাও ভেঙে গিয়েছিল।

তাই বেলুর কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। —আর খোকার ঘর!

সেই একটা মাস। সে যে কি আনন্দের মধ্যে কেটে গিয়েছিল!

—চলো মা, দুটো শাড়ি কিনব।

—চলো, সবাই মিলে একটা ছবি দেখে আসি।

—বাবা তুমিও চলো, নিউ মার্কেটে যাব একবার।

পুরনো বন্ধুদের টেলিফোন করছে। —চলে আয়। কিংবা : ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

গ্রীষ্মদিনের বিকেলে একটা দমকা হাওয়ার মতো। স্নিগ্ধ, শীতল।

যেটুকু সন্দেহ ছিল নিমেষে উবে গেল। বেলু সুখী, বেলু সুখী, ওঁর মন বলে উঠেছিল।

ওই একটা ধারণা ওঁদের দু'জনকেও সুখী করে তুলেছিল।

সেই সময়েই একদিন মিঙ্কু বলেছিল, আমাকে একটা প্যাস্টেল বক্স এনে দিয়ো তো।

এনে দিয়েছিলেন।

দোষ আসলে বেলুরই। খোকার ঘরের খাটে মিঙ্কুকে শুইয়ে দিয়ে ও চলে গিয়েছিল বিনোদিনীর কাছে, কালীসাধনের মনে আছে। মা-মেয়ে বসে বসে সারা দুপুর কি যে গল্প করছিল কে জানে।

তারপর সন্ধেবেলায় বেলুর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছিলেন।

সে কি রাগ। বেদম মারছে মিঙ্কুকে। বলছে, দাদার ঘরখানা নষ্ট করে দিলি!

ছুটে এসে মিঙ্কুকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন।

—তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

সেদিন ওঁর মনে হয়েছিল বেলুর চড়-থাপ্পড়গুলো যেন ওঁর গায়েই পড়ছে। উনিই তো প্যাস্টেল বক্সটা খুঁজে খুঁজে এনে দিয়েছিলেন মিঙ্কুকে।

বেলুকে শান্ত করার জন্যে বলেছিলেন, ও তো ঘর রঙ করালেই সব চাপা পড়ে যাবে।

এতদিন বাদে বেলুর দীর্ঘ চিঠিখানা পেয়ে মনে হচ্ছে, সেদিনের ওই রাগ, মিঙ্কুকে মারা চড়-থাপ্পড়গুলো হয়তো সত্যিই ওঁর উদ্দেশে ছিল। কিংবা অন্য কারও ওপর। অমূল্যর ওপরই কি!

‘ও তো ঘর রঙ করালেই সব চাপা পড়ে যাবে।’ বেলুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সেদিন বলেছিলেন।

কিন্তু লাল-নীল-সবুজ রঙে দেয়াল জুড়ে আঁকা মিঙ্কুর ছবিগুলো মুছে ফেলতে পারেননি। ওগুলোই তো ওঁর সঙ্গী হয়ে আছে।

মনে পড়ে যায়, ঘর রঙ করানোর সময় বিনোদিনী ওই ঘরের দরজাটা খুলে দিয়েছিলেন বলে কি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন।

—তোমাকে এত করে বলে গেলাম। শেষে খোকার ঘরের দরজাটাই খুলে দিলে রঙমিস্ত্রিদের।

বিনোদিনীর সেদিনের কাচুমাচু মুখটা যেন দেখতে পান আজও।

এখন আর ওটা খোকার ঘর নয়। ওঁর কাছে ও ঘরটা এখন মিঙ্কুর ঘর, বেলুর ঘর। তার চেয়েও বেশি। ওটা এখন কালীসাধনের নিজের ঘর।

বেলু আর মিঙ্কু চলে যাওয়ার পর থেকে ওই ঘরখানার দেয়ালগুলো নিয়েই উনি বেঁচে আছেন। এক একদিন চাবি খুলে এ ঘরে এসে বসেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চার দেয়ালের ছবিগুলো দেখেন। চার বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ের অপটু হাতে আঁকা আঁকাবাঁকা রঙিন ছবি। লাল-নীল-সবুজের গাছ, পাখি, নৌকো, রাগী চোখ, উদ্ভট চেহারার মানুষ। আরও কত কি। তারই এক ফাঁকে তিনটি শব্দ। ইংরেজিতে লেখা।

বেলুর ওই লাল-নীল পাড়ের সুদীর্ঘ চিঠিখানা যা বলতে পারেনি, সঙ্কোচ এসে তাকে যা বলতে দেয়নি, শুধু ওই তিনটি শব্দের মধ্যে ওই বাচ্চা মেয়েটা কতদিন আগে তা জানিয়ে দিয়ে গেছে।

উনি দেয়ালের লেখাটা পড়তে পারেননি।

এখন কালীসাধনের মনে হচ্ছে, পড়তে পারেননি বলে একটা জীবনই নষ্ট করে দিয়েছেন। বেলুর যাবার সময় কি মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওঁদের দু'জনেরই। যতই ওর ফিরে যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে ততই যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন কালীসাধন। আবার সেই শূন্যতাকে ভয় পাচ্ছেন।

বিনোদিনীকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন আরও মুষড়ে পড়েছেন। একাকিত্বে ফিরে যেতে হবে এই ভয়ে কি! নাকি অন্য কিছু।

একেবারে যে সন্দেহ কিছু জাগেনি তাও নয়। বেলুর উচ্ছল হাসি আনন্দ দেখে উনি নিজেও যেন উচ্ছল হয়ে উঠতে চাইছিলেন। মন বলছিল, বেলু সুখী, সুখী।

সুমন্তকে প্রায় অনুনয়ের স্বরে বলেছিলেন, যেমন করে হোক্ অমূল্যকে তুই নিয়ে যা। তুই তো বলেছিলি, ওখানে আমাদের একটা কলোনি গড়ে তুলবি। বলেছিলেন, তা না হলে বেলু বাঁচবে না রে।

ওই একমাসে বেলুর হাসি আনন্দ দেখে মনে হয়েছে, উনি ঠিকই করেছেন। ওখানে গিয়ে বেলু বেঁচে গেছে।

ওদের আরও খুশি করার জন্যে কি করবেন কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কি করলে মিঙ্কুকে আরও খুশি করা যাবে।

একদিন বড় দেখে একটা গোটা ইলিশ মাছ নিয়ে এলেন বাজার থেকে। রান্নাঘরের মেঝেতে ফেলে দিয়ে বললেন, কোলাঘাটের ইলিশ।

ডেকে বললেন, মিঙ্কুভাই দেখে যাও। ইলিশ দেখনি বোধহয়।

বেলুর দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁ রে, পাওয়া যায় ওখানে?

বিনোদিনী অবাক। এই এত বড় মাছ, খেয়ে পেট খারাপ করবে নাকি সকলে।

হেসে বললেন, ফ্রিজ তো আছে।

এই মাছ কেনাটাও ওঁর বুকের কোণে একটা দুঃখের বেদনার জায়গা।

আগে যখন ভর-ভরতি সংসার ছিল, রান্নার লোকও ছিল, তখন মাছওয়ালা বেশ খাতির করত, অনেকখানি মাছ নিতেন বলে। তখন সস্তাও ছিল। তারপর এক একজন চলে গেছে, আর ওজন কমতে কমতে মাত্র দু'শোয় গিয়ে ঠেকেছে। যে-লোকটা বঁটি পেতে মাছ কেটে কেটে দেয়, তার চোখ সব সময় অন্য খদ্দেরদের দিকে। যে মাত্র দুশো কিনছে তার টাকা যেন টাকাই নয়।

'দে না রে, দে না', কেমন সঙ্কোচের সঙ্গে বলতে হয়। নিজেকে বড় ছোট লাগে। আজেবাজে জায়গা থেকে দিলেও কিছু বলতে পারেন না। সকলের উপেক্ষিত অংশগুলো নিয়েই যেন ওঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

দোকানের মালিক থাকলে অবশ্য ওঁকে একটু খাতির করে। চৌকির ওপর বসে থেকেই হুকুম দেন, গাদা থেকে দু'শো দে ওঁকে।

জিগ্যেস করে, আছেন কেমন।

শুধু পুরনো দিনের ভাল খদ্দের বলে নয়। পাড়ার এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে কীভাবে জেনে গেছে, ছেলেরা, মেয়ে-জামাই সকলে আমেরিকায় থাকে, ভাল চাকরি করে সেখানে।

এই খাতিরটুকুই ওঁর লাভ হয়েছে, বাকি সবকিছুই লোকসান।

সুমন্ত যেবার এসেছিল ছেলেমেয়েদের নিয়ে, বউমাকে নিয়ে, মাছ বেশি নিতেই হেসে বলেছিল, কে এল, বড় ছেলে নাকি!

উনি ঘাড় নাড়লেন, কিন্তু চোখে পড়ে গেল পাশে দাঁড়ানো খদ্দেরটির মুখ। বৃদ্ধ। দেখে মনে হল কোঁচকানো মুখে সমবেদনা। ভেবে বসেছেন, বড়ছেলে সংসার নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে।

আলাদাই তো।

সেই ইলিশ দেখে বেলু দারুণ খুশি। মা, ভাজাও খাব, ভাপা ইলিশও।

একেবারে টাটকা কোলাঘাটের ইলিশ। মিঙ্কু কখনও দেখেনি। আঁশের ওপর আঙুল বুলিয়ে বললে, শিলভার। চকচকে আঁশগুলোকে রুপো ভেবে বসেছে।

ভয়ে ভয়ে একদিন বললেন, ডায়মণ্ডহারবার যাবি? নিক্কো পার্ক?

ভয় পাওয়ার একটা কারণ আছে।

সুমন্ত ওর ছেলেমেয়েদের নিয়ে যখন এসেছিল, একদিন বললে, বাবা, তুমি ওদের কলকাতা চিনিয়ে দাও না।

কালীসাধন দারুণ খুশি। বললেন, তা আর পারব না কেন!

দু'টিকে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু যা কিছু দেখান কোনওটাই ওদের ভাল লাগে না।

মিউজিয়াম দেখে বললে, এটাই নাকি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। এই বাড়িটাই তো মিউজিয়ামে রাখার মতো।

বলেই কোন একটা আমেরিকান মিউজিয়ামের বর্ণনা দিতে শুরু করল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে সাগো বললে, এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর টপে যদি ওঠো...

ওরা শুধু বড় দেখতে চায়। বাড়িটা দেখতে চায়। ভিতরে কি আছে জানতেও চায় না। ভাল করে দেখলই না।

ডায়মণ্ডহারবার দেখে সে কি হাসি। কোন্ একটা সি-বিচের কথা বলছিল।

নিক্কো পার্ককে একেবারে ফুঃ করে দিল।

কলকাতাকে ভালবাসাবার মতো কিছুই দেখাতে পারেননি। তোমাদের সিটিটা কি ডার্টি!

তিনদিন ঘোরাঘুরির পর শর্মিলা জিগ্যেস করল, কি কি ভাল লাগল তোদের?

দু' জনেই হাসতে হাসতে বললে, ট্র্যাম-কার।

ছেলে বললে, জাঙ্ক।

সাগো বললে, স্লো মোশন পিকচারের চেয়েও স্লো।

কালীসাধন আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, এখানে সবই শ্লো মোশন, কি করব দাদু।

সুমন্তর ছেলে স্যান্ডি তো বাকি ক'টা দিন এ-বাড়িতে থাকতেই চাইল না। বউমার সঙ্গে চলে গেল। হরিদাসবাবুর বাড়িতে। মামার বাড়ি।

সেজন্যেই বেলুকে মিঙ্কুকে সাহস করে বলতে পারছিলেন না। তবু ওঁর এত আনন্দ হচ্ছিল, ওদের এখানে-ওখানে ঘুরিয়ে আনতে ইচ্ছে করছিল।

ডায়মন্ডহারবার দেখে মিঙ্কু কি খুশি। বায়না ধরল নৌকোয় চড়বে। একটা নৌকো ভাড়া করে অনেকক্ষণ ঘুরেছিলেন। বিনোদিনীর প্রচণ্ড ভয়, নিজের জন্যে নয়, পাছে মিঙ্কু নৌকোর ধারে চলে যায়।

ফিরে এসে নৌকো চড়ার গল্প আর থামে না মিঙ্কুর। খোকার ঘরের দেয়ালে রঙিন আঁকাবাঁকা ছবিগুলোর মধ্যে একটা নৌকো আঁকারও চেষ্টা আছে। সেদিকে তাকালেই সেই স্বপ্নের দিন ক'টা মনে পড়ে যায়।

বেলু একদিন বললে, জানো বাবা, ওখানে যা কিছু দেখি, অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে দেখি, নিজের মনে হয় না। এমনকি ভিড়ের মধ্যেও আমরা বাইরের লোক। এখানে যা কিছু দেখি মনে হয় আমাদের।

ওই কথা ক'টিতেই বড় সান্ত্বনা পেয়েছিলেন কালীসাধন।

ওই ক'টা দিনই ওঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

যাবার দিনে বেলু আর মিঙ্কুকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন। ট্যাক্সিতে বিনোদিনী, বেলু আর মিঙ্কু পিছনে। উনি সামনের সিটে, ড্রাইভারের পাশে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলছিলেন।

বেলুর মুখ কেমন ম্লান দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ বললে, ঠিক মনে হচ্ছে, একমাস ছুটি কাটিয়ে গেলাম। কি ভাল যে লাগল। কতদিন থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল পালিয়ে আসি, পালিয়ে আসি।

'পালিয়ে আসি।' কথাটা শুনেও কোনও খটকা লাগেনি।

কিছুই জানতে দেয়নি এতদিন।

ওঁর কাজ সেই একটাই। একে একে সকলকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়া। দু'পাঁচদিনের জন্যে এলে কেউই জানায় না কোন ফ্লাইটে, কটার সময় এসে পৌঁছবার কথা। ভাবে, বাবা তো বুড়ো হয়ে গেছে, মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া কেন! বেলুও সেজন্যেই কিছু জানিয়ে আসেনি।

ওরা কি করে জানবে ওঁর কাছে এই পৌঁছে দেওয়াই কষ্টের। কেউ এলে রিসিভ করতে আসা, তার চেয়ে আনন্দের কিছু আছে নাকি।

অমূল্যর চিঠি পেয়ে বেলুকে যেদিন প্রথমবার পৌঁছতে এসেছিলেন, তখন উনি খুব খুশি। জামাইয়ের কাছে যাচ্ছে মেয়ে, খুশি না হবার তো কথা নয়। শ্বশুর-শাশুড়ির সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে আমেরিকায়, নিজের সংসারে।

কিন্তু সাংঘাতিক একটা উদ্বেগ বুকের মধ্যে চেপে রাখতে হচ্ছিল।

একা মেয়ে। মিঙ্কু হয়নি তখনও।

বলেছিলেন, হ্যাঁ রে, সিকিউরিটি লাউঞ্জে ঢুকে গিয়ে কোনটার পর কোনটা করতে হবে জানিস ? পাসপোর্ট, ডলার, টিকিট সব ঠিকঠাক নিয়েছিস ?

বেলুর চোখে জল, কেমন মুখ শুকনো শুকনো। উনি ভেবেছিলেন বাবা-মাকে ছেড়ে যাচ্ছে, তাই। হবে হয়তো।

—যাচ্ছি তো আমি, তুমি এত নার্ভাস হচ্ছ কেন !

হাসতে হাসতে বেলু বলেছিল। —লাউঞ্জের ভেতরে যারা আছে তারা তো সব মানুষ, আরও যারা যাচ্ছে। জিগ্যেস করলেই বলে দেবে।

থমকে গিয়েছিলেন কালীসাধন। না, তাই বলছি। তোর হাতে আবার বেশি ডলার নেই। যা দেশ আমাদের।

ওই একটাই ভয় ছিল কালীসাধনের। তাছাড়া ওকে প্লেন বদলাতে হবে কেনেডি এয়ারপোর্টে, ট্র্যান্সিট লাউঞ্জে যেতে গিয়ে গ্রিন চ্যানেলে চলে যাবে না তো। তারপর লস এঞ্জেলেসে অমূল্য রিসিভ করতে ঠিক ঠিক আসবে তো। যদি দেখা না হয়। ট্যাক্সি নিয়ে একা ঠিকানা খুঁজে বের করা। ঠিকানায় পৌঁছেও দেখল, ঘরে চাবি।

উদ্বেগের শেষ ছিল না কালীসাধনের, যদিও অমূল্য ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল ও এয়ারপোর্টে থাকবেই। আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না।

ট্রলি ঠেলে ঠেলে লাউঞ্জে ঢুকে গিয়েছিল বেলু, ওঁদের চোখের সামনে। হাত নেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনিশ্চিতের মধ্যে।

অমূল্যর বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। ছাদে, সেই রেলিঙের ধারে, ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

এখনই প্লেনের দিকে সবাই দল বেঁধে যাবে, ভিড় করে। সেই ভিড়ের মধ্যে শুধু একজনকে খুঁজে বের করতে হবে। ওই ভিড়ের লোকগুলোর আর কারও কোনও মূল্য নেই ওঁর কাছে। উনি শুধু একজনকেই খুঁজছেন। একজন। একা একটি মেয়ে। বেলু।

বহুকাল আগে, ঠিক এমনিভাবে, ভিড়ের মধ্যে এক্টা একটি মেয়েকে খুঁজেছিলেন। বউমা, মানে শর্মিলা। কই তখন তো এত বেশি উদ্বেগ হয়নি।

—ওই তো, ওই তো ! বিনোদিনী বলে উঠলেন।

কালীসাধনও দেখতে পেলেন।

না, সেই প্রথমবারের কথা নয়। এবার, এবারের যাওয়া।

মিঙ্কু পাশে পাশে হাঁটছে।

বেশ খানিকটা গিয়ে বেলু ঘুরে দাঁড়াল। ওঁদের দিকে আঙুল তুলে মিঙ্কুকে দেখাল, মিঙ্কু দেখছে। বেলু হাত নাড়ল, মিঙ্কুও। ওঁরাও হাত নাড়লেন। কিন্তু ওঁদের চারপাশে তো সকলেই হাত নাড়ছে। ওই ভিড়ের মধ্যে থেকে কি ওঁদের চিনে বের করতে পারবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্লেনের মধ্যে ঢুকে গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে প্লেনও উড়ে গেল, মিলিয়ে গেল। অনিশ্চিতের মধ্যে।

পরের দিন বাজার যাবার সময় বিনোদিনীর দিকে না তাকিয়ে ম্লান হেসে বললেন, আবার সেই দু'শো গ্রাম মাছ !

৭

আজ অন্যরকম। আজ বেশ উৎফুল্ল বোধ করছেন। কানা উপছে পড়া আনন্দ। আঃ, কতকাল এমন আনন্দ পাননি কালীসাধন।

বিনোদিনীর আনন্দ হয়তো আরও বেশি।

বেলুর কাছ থেকে যেদিন সেই লাল-নীল পাড়ের লম্বা খামটা পেয়েছিলেন সেদিন কালীসাধন একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। হয়তো বিনোদিনীও। ওঁকে বাইরে থেকে দেখে তো কিছু বোঝা যায় না। মুখ দেখে মনে হয়েছিল বিভ্রান্ত। ওঁর মতোই।

এখন ভাবলে হাসি পায়।

কোন জিনিসকে গুরুত্ব দিতে হয়, আর কোনটা একেবারেই তুচ্ছ তা হয়তো আমরা কেউই বুঝি না, কালীসাধন ভাবলেন। না, কোনও মানুষই বোঝে না। সেজন্যেই যত গণ্ডগোল।

ঘুম থেকে উঠে মনে হল, জীবনে কখনও এত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেননি। গভীর স্বস্তির ঘুম।

ফিরে তাকিয়ে দেখলেন বিনোদিনীও ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। বেলুর চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে ওঁর রাতের ঘুম চলে গিয়েছিল। কি দুশ্চিন্তা, কি দুশ্চিন্তা।

দুঃখের কথা, কষ্টের কথা কাউকে বলতে না পারা যে কি কষ্টের!

পরামর্শ চাওয়ার জন্যে কারও কাছে ছুটে যাওয়ারও উপায় ছিল না। কার কাছে যাবেন, চারপাশে কোথাও কেউ নেই। এই খাঁ খাঁ করা শূন্যতার বাড়ি আগলে শুধু ওঁরা দু'জন পড়ে আছেন। অসহ্য একাকিত্বের মাঝে। কেউ আসে না, কেউ আসে না। ওঁরাই কি ছাই কারও কাছে যেতে পারেন। দু'একবার চেষ্টা করে দেখেছেন। গেলেই বুঝতে পারেন কোথায় যেন একটা অদৃশ্য দূরত্ব গড়ে উঠেছে। অবাক হয়ে দেখেছেন কাছের লোকগুলোও কেমন দূরের হয়ে গেছে। কেউ বোধহয় ফরচুনেট লোকদের কাছে ঘেঁষতে চায় না।

ফরচুনেট! কথাটা মনে পড়লেই দুঃখের হাসি হাসতেন কালীসাধন।

অনন্তলাল বলেছিল, তুমি তো সবদিক থেকে ফরচুনেট, কালী।

সেই গোড়ার দিকে নিজেরও তাই মনে হত। তার জন্যে একটু গর্বও।

বুকের ভেতরটা যতই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল ততই সেটা গর্ব দিয়ে অহঙ্কার দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করেছেন। 'খোকা এখন আমেরিকায়, বউমাকেও নিয়ে গেছে।' কিংবা 'খোকার ছেলেমেয়েরা ওখানেই জন্মেছে।' তারপর 'নান্টু? সে আমেরিকাতেই বিয়ে করেছে, গুজরাতি বউমাকে চোখেই দেখিনি।' কিংবা 'নান্টু এসেছিল গুজরাতি বউ নিয়ে, সেও ভাল চাকরি করে।' শেষে একদিন : 'মেয়ে-জামাইও ওখানে, ছেলেদের কাছে। এই তো সেদিন বেলু গেল।' তারপর একদিন : 'নাতি-নাতনি সব আমার বর্ন ইন দ্য স্টেটস।' বলে হা হা হাসি।

আসলে হা হা হাসিটা ছিল ভেতরের হাহাকার।

বেলুর চিঠিটা পেয়ে তাই মুষড়ে পড়েছিলেন। যাত্রার আসরে রাজার গা থেকে ঝকমকে পোশাকটা কেউ যেন হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল। উলঙ্গ হয়ে যাওয়ার চেয়েও যেন নিদারুণ।

গোপন করার জন্যে সে কি অসহায় চেষ্টা। সবচেয়ে দুঃখের সময় মানুষকে হয়তো সশব্দে হাসতে হয়। বুক মোচড়ানো কষ্টের সময় মুখে প্রগাঢ় আনন্দ ফুটিয়ে তুলতে হয়।

নীচে আরামকেদারায় গা এলিয়ে বসে ছিলেন।

সিঁড়ির মাথা থেকে আঙুর বললে, বাবা, মা আপনারে একবার ডাকতিছেন।
উঠে এসেছিলেন।
কাছে যেতেই বিনোদিনী চাপা গলায় বললেন, অনন্তলালকে যেন বোলো না।
পাড়াপড়শি তা হলে জেনে যাবে এই ভয়।
এখন ভাবলে হাসি পায়। কি ভয়ই না পেয়েছিলেন।
নিজের কাছেই নিজেকে গুটিয়ে যেতে হয়েছিল।
মনে হয়েছিল কেউ ওঁর পাশে নেই। ছেলের কথা শুনে বিনোদিনীর মুখ থমথম।
টেলিফোনে খোকা নিজের ছেলের রেজাল্ট শোনাতেই ব্যস্ত। বেলুর চিঠির কথা শুনে একটুও বিব্রত বোধ করল না। 'ওয়েল, ওয়েল, আ'ল টক ইট ওভার।'
কি খারাপ যে লেগেছিল সেদিন, চোখ ঠেলে জল এসে গিয়েছিল।
আজ অন্যরকম। আজ বেশ উৎফুল্ল বোধ করছেন। কানা উপছে পড়া আনন্দ।
সেদিন হাত বাড়িয়ে কাউকে ধরতে পারলেই যেন বেঁচে যান। খড়কুটো ধরতে চাইছিলেন যেন। কার কাছে যাবেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নিজের বিচারবুদ্ধি যেন হারিয়ে বসে আছেন।
হরিদাসবাবুর কাছে যাওয়া চলবে না, ওঁর কাছেই তো বেশি লজ্জা।
বিনোদিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, একবার দাদার কাছেই যাও।
যাবার সময় ফিসফিস করে বললেন, বউদিকে বলতে বারণ কোরো। তা নইলে সবাই জেনে যাবে।
জগদীশের কাছেই গিয়েছিলেন। চিঠিটা পড়ে সব শুনে হো হো করে হেসে উঠল।
বললে, আরে এমন তো আকছার হয় বাঙালির ঘরে, বুঝিয়েসুজিয়ে ওকে একটা চিঠি লিখে দাও।
জগদীশের পরামর্শ মতোই একটা চিঠি লিখেছিলেন।
আজ অন্যরকম। আজ বেশ উৎফুল্ল বোধ করছেন। কানা উপছে পড়া আনন্দ।
কি নিশ্চিন্ত ঘুমে কাটিয়েছেন রাতটা। এমন গভীর স্বস্তিতে কতকাল যেন ঘুমোননি।
ফিরে তাকিয়ে দেখলেন বিনোদিনীও ঘুমোচ্ছে, গভীর ঘুম।
জাগাতে ইচ্ছে হল না। আঙুর আসুক, চা-টা সে-ই বানিয়ে দেবে।
পায়ের শব্দ না করে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। এসে বসার ঘরের সদর দরজা খুলে দিলেন।
এসে বসলেন আরামকেদারায়। এখানে বসলেই ভোরের রোদ্দুর-ভেজা লোহার ফটকটা দেখা যায়। জলের দরে কিনে এনেছিলেন, দু'পাল্লায় ঢালাই লোহার দুটো মুখোমুখি ময়ূর-ময়ূরী।
কি অসীম পরিশ্রম গেছে এই বাড়িটার পিছনে। কত অর্থব্যয়। যার প্রতিটি পয়সা সঞ্চয় করতে হয়েছে নিজেকে বঞ্চিত করে।
বিনোদিনী বলছেন, এত রাত অবধি তোমার কাজ করার কি দরকার, অফিসের চাকরিই যথেষ্ট।
কালীসাধন হাসছেন, ঘর্মাক্ত শরীর থেকে ভিজে জামাটা খুলতে খুলতে বলছেন, খোকা কি আবার আমার মতোই হবে নাকি। ওকে এবার ভাল স্কুলে দেব।
নান্টু তখন কতই বা বড়। তাকে ডেকে ঘরটা দেখাচ্ছেন, শুধুই ইট গাঁথা হয়েছে, দেয়াল উঠেছে দোতলায়। 'হ্যাঁ রে নান্টু, তোর ঘরটা দাদার চেয়ে একটু ছোট হল। তোর আবার রাগ হবে না তো!
বিনোদিনী আর কালীসাধন হো হো করে হাসছেন।

কি পরিশ্রম এর পিছনে।

অফিসের একজনকে বলছেন, আপনাদের ওদিকে ইটভাটা আছে, দরটা একটু জেনে আসবেন ? যদি দু' পয়সা বাঁচে।

'বেলু, এটা তোর ঘর, তোর আর দক্ষিণ-খোলা হল না।'

বেলু হেসে বলছে, 'আমার ঘরে কি হবে, বিয়ে দেবে না নাকি আমার !'

বিনোদিনীও হেসে লুটোপুটি, মেয়ের কথায়।

কালীসাধন বিব্রত ভাব চাপা দিয়ে বলছেন, মেয়ে-জামাই তো মাঝে মাঝে এসে থাকবে, তাদের জন্যেও তো ঘর চাই।

কত স্বপ্ন ছিল।

সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে একে একে সকলেই চলে গেল।

খোকা, বউমা, নান্টু।

বুকের মধ্যে শুধু জমা হয়েছে ক্ষোভ আর অভিমান।

সুমন্ত বলছে, দেখো না কি করি, আমেরিকায় আমাদের একটা কলোনি গড়ে তুলব।

শেষে কালীসাধনই একদিন অনুনয় করছেন, ওই সুমন্তর কাছেই। বলছেন, অমূল্যর ওখানে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দে খোকা, তা না হলে বেলু বাঁচবে না।

শেষে একদিন বেলুও চলে গেল।

টেলিফোনে সুমন্ত হাসতে হাসতে বলছে, বাবা, তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায় নেই ? নিউ জার্সি, ফিলাডেলফিয়া, লস এঞ্জেলেস।

বলছে, ইউ শুড বি আ প্রাউড ফাদার।

শুনে হেসেছিলেন কালীসাধন। দুঃখের হাসি। নিঃস্বতার গর্ত কি গর্ব দিয়ে ভরাট করা যায় রে।

আমি চেয়েছিলাম তোরা সবাই জীবনে সাকশেসফুল হবি। তোদের দাঁড়াবার মতো জায়গা পাবি বলে এই বাড়িটাও করেছিলাম। তোদের জন্যেই। তোরা জানিস না আমাদের সেই ভাড়ার বাড়িটায় অনেক বেশি সুখ ছিল। সেখানে একজন রাজমহিষী হয়ে সেজে এসেছিল। তার মুখে সব সময় হাসি। অভাবে, ক্লান্তিতেও। তোরা তার মুখের হাসিটাও চিরদিনের জন্যে কেড়ে নিয়েছিস।

কালীসাধন ভাবলেন, আমি সাফল্য চেয়েছিলাম। সাফল্য মানে যে এত বড় ট্র্যাজেডি কে জানত।

কে একজন প্রথম দেখে বলে উঠেছিল, বাড়ি বাড়ি করেন কেন, এ যে রীতিমত প্যালেস।

শুনে সেদিন ভাল লেগেছিল।

তারপর শুধুই শূন্যতা।

একটা ঘরের দরজা খুলতেও ক্লান্তি, জানালাগুলো বন্ধই থাকে। কেমন একটা গুমোট গন্ধ। মেঝেতে ধুলো। কোত্থেকে যে আসে এত ধুলো।

—আঙুর, আজ তোমার ঘর পরিষ্কার করার দিন।

—যাচ্ছি বাবা, এখুনি করে দেব।

মেঝের ওপর ভিজে ন্যাতা বোলাতে বোলাতে আঙুর বলছে, কেন যে এসব করা, কেউ আপনার আসবেনি।

কাজের মেয়ে আঙুর, সেও ওঁকে ঠাটা করে। নাকি সমবেদনা।

এই বিশাল বাড়িতে শুধু শূন্যতাকে সঙ্গী করে বেঁচে থাকা, সে যে কি কষ্ট। কেউ বুঝবে না।

—নান্টুকে বলেছি, হি মাস্ট হ্যাভ আ হাউস হেয়ার। এখানে থাকতে হলে ...

আর বলিস না, বলিস না খোকা। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তোদের সাকশেস আমাকে শুধু গর্ব দিয়েছে, কিন্তু ভেতরটা যে কুরে কুরে খেয়ে দিচ্ছে, তোরা বুঝতেও পারছিস না। আই অ্যাম জাস্ট এ প্রাউড ফাদার অ্যান্ড নাথিং এলস। আমি আর বাবা নই। তোর মা আর এখন মা নয়। ও এখন শুধুই রত্নগর্ভা।

আঙুর আজ এখনও আসছে না কেন ? আসবে না নাকি ! আজকেই তো ওকে বেশি দরকার।

আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কালীসাধন।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে এলেন।

বিনোদিনী এখনও ঘুমোচ্ছেন, মুখে কি গাঢ় প্রশান্তি।

নিঃশব্দে দেরাজ থেকে চাবির থোকাটা বের করলেন।

পা টিপে টিপে এসে খোকার ঘরের দরজার তালা খুললেন। নিঃশব্দে।

ভুরু কুঁচকে উঠল ওঁর, আলো জ্বালতেই।

একটার পর একটা জানালা খুলে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলেন।

অবাক হয়ে গেছেন মেঝের দিকে তাকিয়ে। কোথাও এতটুকু ধুলো নেই।

কালই হয়তো বিনোদিনী আঙুরকে দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছেন। কিংবা নিজেই করেছেন কিনা কে জানে। তর সয়নি।

মনে মনে হাসলেন কালীসাধন।

তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেয়ালের লাল-নীল-সবুজে আঁকা অপটু হাতের ছবিগুলো দেখতে শুরু করলেন। 'মারছিস কেন বেলু, ও তো ভালই করেছে, চার দেয়ালে ফ্রেসকো এঁকে দিয়েছে।'

গাছ ফুল পাখি নৌকো, রাণী মুখ, উদ্ভট মুখ, কুকুর, গোল গোল চোখ, আরও কত কি। এক কোণে শুধু লেখা : ড্যাড ইজ ব্যাড। ওইটুকু শুধু মুছে দিতে হবে।

এই শূন্যতার মধ্যে, এই নিঃস্বতার মধ্যে এই ছবিগুলোকেই বাঁচিয়ে রেখে এসেছেন। এরাই ওঁকে এতদিন সঙ্গ দিয়েছে, এই অসহ্য একাকিত্বের মধ্যে।

মিঙ্কু। সেই চার বছরের মেয়েটা আজ কত বড় হয়েছে কে জানে। ছবি দেখে কি বোঝা যায়। সুমন্তও তার ছেলে আর মেয়ের ছবি পাঠিয়েছিল। সাগোকে চেনাই যায় না। আমাদের বাড়ির কেউ বলে মনেই হয় না।

—চা নাও।

চমকে ফিরে তাকালেন কালীসাধন।

বিনোদিনী চায়ের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

বললেন, কোথায় থাকো। আমি নীচে নিয়ে গিয়ে ঘুরে এলাম।

ধরা পড়ে গেছেন বলে একটু লজ্জা পেলেন।

বিনোদিনীর মুখেও হাসি দেখা দিল। বললেন, ও ছবি দেখে আর কি হবে। মিঙ্কু এখন হয়তো আরও অনেক সুন্দর আঁকতে পারে।

কালীসাধন মুখে কিছু বললেন না। মনে মনে ভাবলেন, এরা কেউ কিচ্ছু বোঝে না। আরও সুন্দর ছবির কোনও দাম নেই ওঁর কাছে। থাকলে এ ছবিগুলোকে এতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন কেন। কবেই তো ঘর রঙ করিয়ে মুছে দিতে পারতেন। আরও ভাল ছবি এনে টাঙিয়ে দিতেন চার দেয়ালে।

অসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে মিঙ্কুর অপটু হাতে আঁকা এই ছবিগুলোই তো ওঁকে সঙ্গ দিয়েছে। বাঁচতে বলেছে।

বিনোদিনী বললেন, তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি। এয়ারপোর্টে যেতে হবে তো।

—তুমিও যাবে নাকি ? কালীসাধন প্রশ্ন করলেন।

বিনোদিনী অবাক হয়ে তাকালেন ওঁর মুখের দিকে। —যাব না ? তাই কখনও হয় নাকি।

কালীসাধন খুশি হলেন।

আজ অন্যরকম। আজ বেশ উৎফুল্ল বোধ করছেন। কানা উপছে পড়া আনন্দ।

ফ্লাইট নম্বর জানা আছে, পৌঁছনোর সময়টাও।

এয়ারপোর্টে একটা ফোন করে জেনে নিতে বলেছে, প্লেন ল্যেট আছে কিনা। তা না হ'লে মিছিমিছি বসে থাকতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে।

এর আগে কালীসাধন কখনও কাউকে রিসিভ করতে যাননি। কেউ ফ্লাইট নম্বর জানাত না, সময় জানাত না। বাবার বয়েস হয়েছে, কষ্ট করে আসার কি দরকার।

একে একে সকলেই চলে গেছে। উনি শুধু সী-অফ করতে এসেছেন। কোনও নিষেধ শোনেননি। তোরা চলে যাচ্ছিস, এয়ারপোর্ট অবধি আসব, সেটুকুও দিবি না।

সুমন্ত চলে যাচ্ছে, রেলিঙের ধারে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওঁরা হাত নাড়ছেন। বউটা লজ্জায় ভাল করে হাতটা তুলতেও পারছে না। বউমা চলে যাচ্ছে, কি উদ্বেগ, একা মেয়ে যেতে পারবে তো। নান্টু যাচ্ছে, ওঁরা হাত নাড়ছেন। প্লেন গোঁ গোঁ করে এগোতে শুরু করল, ওই তো আকাশে। নান্টু আর তার গুজরাতি বউ, দয়মন্তী চলে যাচ্ছে।

ওই তো লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্লেনের ভেতরে ঢুকে গেল। অমূল্য চলে যাচ্ছে, বেলু ভাল করে হাত নাড়তে পারছে না। শ্বশুর-শাশুড়ি কাছেই দাঁড়িয়ে। এবার বেলু। একা একা। ঠিক পৌঁছতে পারবে তো ! বেলু আর মিঙ্কু, বেলু মিঙ্কুকে দেখাচ্ছে, ওই দ্যাখ. রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু চলে যাওয়া।

বাড়িটা এতদিন খাঁ খাঁ করত, কালীসাধনের বুকের মতোই।

আজ এই প্রথম এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন রিসিভ করতে।

আজ অন্যরকম। আজ বেশ উৎফুল্ল বোধ করছেন। কানা উপছে পড়া আনন্দ।

ঘড়ি দেখলেন কালীসাধন, এবার তৈরি।

বিনোদিনী বললেন, এবার যাও, ট্যাক্সি ডেকে আনো। দেরি হয়ে যাবে।

কালীসাধনের মন বলছে, দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আজ এই প্রথম এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন, কাউকে সী-অফ করতে নয়। এই প্রথম রিসিভ করতে চলেছেন, এক বুক আনন্দ নিয়ে।

ট্যাক্সি ডেকে আনলেন কালীসাধন।

দু'জনে গিয়ে উঠলেন ট্যাক্সিতে। বললেন, এয়ারপোর্ট।

বাইপাস ধরে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। ছুটে চলেছে।

বিনোদিনী হঠাৎ বললেন, বেলু কোনওদিন আমাদের বুঝতে পারেনি। বোকা মেয়ে।

কালীসাধন বললেন, মিছিমিছি দেরি করল, বড্ড দেরি করে ফেলল।

'বেলু কোনওদিন আমাদের বুঝতে পারেনি।'

কালীসাধনের মনে হল উনিই কি বিনোদিনীকে বুঝতে পেরেছিলেন।

জানতেন না, সেও কতখানি কঠিন হয়ে উঠতে পারে। শুধু ভেবেছেন, ও সহ্য করতে পারবে না, পারবে না।

তাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বিনোদিনীর কথায়।

'এত সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখলাম, এত বুঝিয়ে-সুজিয়ে, ও তো কোনও উত্তরই দিল না।'

কালীসাধন বলেছিলেন।

আর বিনোদিনী বলে উঠলেন, বিয়ে মানে কি শুধু মন্ত্র, শুধু সিঁদুর!

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, তুমি তো কিছুই জানো না।

সঙ্গে সঙ্গে বেলুর চিঠির কয়েকটা শব্দ মনে পড়ে গিয়েছিল। 'মা, তুমি তো সব জানো'।

আশ্চর্য! বিনোদিনীও হয়তো ওই একই কথা ভেবেছেন। কালীসাধন সহ্য করতে পারবেন না। চারপাশের সমাজ। মানে ওই অনন্তলাল, হরিদাসবাবু, দাদা—যাকে জগদীশ বলে ডাকেন। এরা সামনে এসে দাঁড়িয়ে বেলুকে দেখতে দেয়নি। সেজন্যেই বেলুও বাবাকে দেখতে পায়নি, মাকে দেখতে পায়নি।

বিনোদিনী বলেছেন, একটা বাড়িতে একসঙ্গে থাকলেই সেটা বিয়ে নয়।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে এয়ারপোর্টের দিকে।

বিনোদিনী চুপচাপ।

কালীসাধন বললেন, একটা অন্যায় করে ফেলেছি। অন্যায় কিনা জানি না।

বলেই হেসে উঠলেন।

ধীরে ধীরে বললেন, অনন্তলালকে বলে ফেলেছি।

—ও তো আমাকে ফরচুনেট বলত।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, ওকে বললাম, অনন্ত, আমি সত্যি ফরচুনেট। মেয়েকে শেষ অবধি বাঁচাতে পারলাম, ওই অমানুষটার হাত থেকে।

কালীসাধন চুপ করে রইলেন। বেলুর চিঠির কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেল। 'বাবা কষ্ট পাবে বলে কোনওদিন জানতে দিইনি। আমি আর পারছি না, পারছি না। আমি এবার বাঁচতে চাই।'

হঠাৎ সেদিন ওঁর মাথার মধ্যে এই কথাগুলো ঘুরতে শুরু করেছিল। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা। ওঁর এই শূন্যতা আর একাকিত্বেব চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট।

হঠাৎ রিসিভারটা তুলে ডায়াল করতে শুরু করেছিলেন।

—কাকে ফোন করছ? বিনোদিনীর প্রশ্ন।

—বেলুকে।

তারপর . কে, বেলু? তুই চলে আয়, আর এক মুহূর্তও নয়। মিঙ্কুকে নিয়ে চলে আয়। খোকাকে বল, ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।

বিনোদিনী সব শুনলেন, তারপর বললেন, যাক্, তবে বলতে পারলে!

যেন এই কথাটার জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন বিনোদিনী।

আর কোনও শূন্যতা নেই। একাকিত্ব নেই। জীবনে কোনও লক্ষ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল না, শুধুই ফাঁকা ফাঁকা লাগত। বাড়িটার মতোই বুকের ভেতরটাও খাঁ খাঁ করত।

এয়ারপোর্টের গায়ে এসে থামল ট্যাক্সিটা। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লেন।

আজ অন্যরকম। আজ বেশ উৎফুল্ল বোধ করছেন। কানা উপছে পড়া আনন্দ।

হাতের ঘড়ি দেখলেন। হ্যাঁ, অনেক আগেই এসে পৌঁছেছেন। এখনও অনেক সময় আছে।

ভেবেছিলেন, দেবি হয়ে গেছে, দেরি হয়ে যাবে। এখনও সময় আছে। অনেক, অনেক।

একটা নতুন জীবন শুরু করার জন্যে সব সময়েই সময় থাকে।

বিনোদিনী বললেন, একটু খোঁজ নিলে পারতে।

কালীসাধন দেখলেন লোক ভিড় করে আছে। প্লেন আসবে তার অপেক্ষায়। ওখান

দিয়েই সকলে বেরোবে। তাই অপেক্ষা করছে।

এনকোয়ারি কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন। ফ্লাইট নম্বর বললেন, তারপর জিগ্যেস করলেন, প্লেন কি ল্যেট আছে?

কাউন্টারের মেয়েটি বোতাম টিপে কমপিউটর দেখল। বললে, রাইট টাইম।

রাইট টাইম, রাইট টাইম। কালীসাধনের কানের কাছে বাজল।

ফিরে এলেন। বিনোদিনীকে নিয়ে অপেক্ষমাণদের ভিড়ের মধ্যে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পাশের কাকে যেন বললেন, রাইট টাইম।

কে যেন বলে উঠল, প্লেন এসে গেছে, প্লেন এসে গেছে।

কালীসাধন আর বিনোদিনী দাঁড়িয়ে আছেন অপেক্ষা করে। চোখ নিবদ্ধ ওই দরজাটার দিকে। এক একবার খুলছে, বন্ধ হচ্ছে।

আঃ, কি মিছিমিছি দেরি করিয়ে দেয় এরা। উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দেয়।

একজন বললে, হয়তো মালপত্তর নামানো হয়নি এখনও।

আরেকজন বললে, দাঁড়ান তো, কাস্টমস কখন ছাড়ে।

সমস্ত মানুষজন উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একমাত্র কালীসাধন আর বিনোদিনীর কোনও উৎকণ্ঠা নেই।

এখনই ওই দরজাটা খুলে একে একে সকলে বেরিয়ে আসবে। বেলু আর মিঙ্কুও।

মিঙ্কু এতদিনে কত বড় হয়ে গেছে কে জানে।

হঠাৎ কালীসাধন আর বিনোদিনী দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, ওই তো, ওই তো!

দু'টো মুখই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আনন্দে।

বেলুও হাসছে ওদের দেখতে পেয়ে. এগিয়ে আসছে। মিঙ্কু হাসছে ওদের দেখতে পেয়ে, এগিয়ে আসছে।

এগিয়ে আসছে, নাকি বেরিয়ে আসছে, অনন্ত মুক্তির মধ্যে।

আয় মিঙ্কু, আয়। দেখে অবাক হয়ে যাবি, তোর ছবিগুলো কত যত্ন করে আমি রেখে দিয়েছি আজও। দেয়ালে আঁকা সেই প্যাস্টেল রঙের ছবি।

বেলু ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে এসে বললে, রাইট টাইমেই এসে গেছে।

—এসে গেছিস। বিনোদিনী বললেন।

কালীসাধন কিছুই বললেন না। শুধু হাসলেন। চলে যাওয়ার মধ্যে শুধুই গর্ব ছিল, আর কিছুই ছিল না। ফিরে আসার মধ্যে এত আনন্দ, কে জানত।



# পাওয়া



রিমির স্পষ্ট মনে আছে, মোটা মোটা বইখাতায় ঠাসা ক্যাম্বিসের ভারী ব্যাগটা বয়ে আনতে আনতে কাঁধের ওপর চওড়া স্ট্র্যাপের ভার যতই বিরক্তিকর লাগুক, মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি। কারণ ওর শরীরের ভিতরটাও ফুর্তিতে হাসছিল। এ সময় ভিতরটাও হাসে। তুচ্ছ কারণেও। ওরা ক্লাস এইট থেকে সদ্য নাইনে ওঠা তিন-চারটি মেয়ে একসঙ্গে বাসে ফেরার পথে গল্প করতে করতে এই যে অকারণ ভুবনভোলা হাসি হাসত, চেঁচিয়ে কথা বলত, টুপ করে বাস থেকে নামার পরেও এই উদ্দাম সুখটুকু রিমির শরীরে জড়িয়ে থাকত। মুখের হাসির সঙ্গে দু-চারটে কথা ছুড়ে দিত বাসের জানালায়, তারপর হাত তুলে 'বাই'। পরমুহূর্তেই বাসও ছিটকে বেরিয়ে যেত, রিমিও অ্যাবাউট টার্ন হয়ে দ্রুত বাড়ির পথে। কোনও রকমে বাড়ি পৌঁছে কাঁধের ব্যাগটা, বাপ্‌স কি ভারী, খাটের ওপর কাঁধ খসিয়ে ফেলে দিয়ে স্ট্র্যাপের জায়গায় বার দুই হাত ঘষে নেওয়া, অবশেষে মুক্তি। মা মাঝে মাঝে টিচারদের উদ্দেশে কটূক্তি করত, সেই ছেলেবেলা থেকেই · সব বই কেন যে নিয়ে যেতে বলে! রিমি কখনও হাসত, কখনও নিজেও অভিযোগ করত। একদিন তো কাঁধ থেকে ব্লাউজটা টেনে সরিয়ে মাকে দেখিয়েছিল। 'এখানটা কেমন হয়ে গেছে দেখেছ!' গায়ের রঙ বেশি বেশি ফরসা বলেই জায়গাটা তখনও লাল হয়ে আছে। 'সব্বোনাশ', বলেই মা নিভিয়া ক্রিম নিয়ে এসে লাগিয়ে দিয়েছিল। আঃ, মায়ের আঙুলের স্পর্শ, যে আঙুলে আদরেব ক্রিম লাগানো আছে, কি যে ভাল লাগে রিমির! একদিন তো কোন বন্ধুকে বলেই ফেলেছিল, যতই বলিস, মা মানে মা। কারও সঙ্গে তুলনাই হয় না। যে অভিযোগ করছিল তার ভাল নামও হিয়া, রিমির সবচেয়ে গাঢ় বন্ধু। সে বোধহয় এ বয়সে একটু এদিক-ওদিক ছটফট করতে চাইছিল, তাই তার মায়ের কড়া নজরদারির বিরুদ্ধে একটু অভিমান এবং অনেকখানি ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলেছিল বলেই হয়তো রিমির মুখে এসেছিল, 'মা মানে মা'। বলতে পেরেছিল ও, কারণ তখনও রিমি এদিক-ওদিক ছটফট করার কথা ভাবতেই পারত না। এখনও পারে নাকি।

ওর বাঁ চোখের ওপরে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল, নিমেষের জন্যে। এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

সেদিনকার কোন কথাটাই বা স্পষ্ট মনে নেই রিমির! ওর চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সের জীবনে এর চেয়ে বড় শক্ আর কখনও পায়নি।

ওর পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, তা হলেও এমন কিছু পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে ঘরে ঢোকেনি। অবাক লেগেছিল দরজা খোলা ছিল দেখে। তখনও মুখে যেটুকু হাসি লেগে ছিল, কেউ যেন ডাস্টার বুলিয়ে মুছে দিল। কপাট খোলা কেন!

ক্যাম্বিসের জুতো পরা ওদের স্কুলের নিয়ম। এমনকি গরমের দিনেও। কারণ ওই একটাই, এতগুলো মেয়ে স্কুলের মধ্যে জুতো খটখটিয়ে হাঁটলে পড়ায় কান পাতা দায় হবে। ডিস্টার্বেন্স হবে। কোনও একটা মেয়ের মা বুঝি বলতে গিয়েছিল: 'মেয়েদের বড্ড কষ্ট হয়।' বাঁধা গতের উত্তর পেয়েছিল, নিয়ম নেই। আসলে মান্ধাতা আমলের নিয়ম তো, যখন চামড়ার জুতোর সোলটাও চামড়ার হত। এখন কত রকমের সাইলেন্স-মার্কা সোল হয়েছে, নিয়ম তার খবরই রাখে না। জুতোর তলা তো দূরের কথা, ওপর থেকেও চামড়া উধাও হয়ে যাচ্ছে। বাগ্‌দা চিংড়ির মতো চামড়াও এখন এক্সপোর্ট

আইটেম।

মোজা আর ক্যাম্বিসের জুতো খুলে ফেলতে পারলেই হোম, সুইট হোম। তার আগে ছুটি-পাওয়া হাসি মুখেই থাকে, শরীরে নয়।

রিমি ভেবেছিল কাজের মেয়েটাকে, মানে বাসন্তীর মাকে দরজা খুলে দিয়ে দিদা চলে গেছে। অর্থাৎ বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

দিদাকে বেশ একটা কড়া ধমক দিতে পারবে ভেবে তখনও মন খুশি খুশি। দিদিমার বয়েস হয়েছে, চুল সিকিভাগও কালো নেই, দোতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামতে বেশ কষ্ট হয়। এর আগেও একবার আদরের নাতনির আদুরে ধমক শুনে বলেছেন, মা-মেয়ে দুজনেই সারাদিন বাইরে বাইরে, আমি কি ঘরদোরের পাহারাদার নাকি! দোতলা থেকে নামতে কষ্ট হয়, তা রিমিও জানে। কিন্তু কোনও কোনও দিন দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাওয়ার কারণ অন্য। বয়সের জন্যে ভুলো মন হয়ে গেছেন তাও নয়।

আসলে সারাদিন একা একা, বসে ঘুমিয়ে খবরের কাগজ পড়ে দিন আর কাটতে চায় না। তিনটে বাজার পর যদি বা একটু ঘুম আসে, ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতে সদর দরজায় করর্ করর্। বুঝতে পারেন বাসন্তীর মা এসেছে। এসে বেল্ বাজাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে, সিঁড়ি ভেঙে নামতে অসীম ক্লান্তি জড়িয়ে থাকে শরীরে, তবু বাসন্তীর মা এলে খুশিই হন।

ঠিকের লোক, দু বেলা এসে ঘরদোর মুছে, বাসন মেজে দিয়ে যায়। খাওয়ার পর সকালের বাসনগুলো, হাঁড়ি কড়াই পড়ে থাকে। চারটের সময় এসে সে বাসনপত্তর মেজে দিয়ে যায়। ঘুম ভাঙানোর জন্যে যেটুকু বিরক্তি, মুহূর্তে উবে যায় বাসন্তীর মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পাওয়ার আনন্দে। একটা মানুষ সারাদিন বাড়িতে একা একা, কথা বলার লোক নেই, সে যে কি কষ্ট! ঠিকের লোক বাসন্তীর মায়ের আঁচলে গল্পের ঝুড়ি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা না একটা ঘটন-অঘটনের খবর শুরু করে দেয়। দেয় বলেই কোনও কোনও দিন সদর দরজায় খিল দিতে ভুলে যান। আর ভুলে গেলেই রক্ষে নেই, স্কুল ছুটির পর ফিরে এসে রিমির যত চোটপাট।

তাই রিমি প্রথমে ভেবেছিল, দিদার কাণ্ড। তা না হলে দরজা খোলা থাকবে কেন।

ঢুকেই বাঁদিকে বসার ঘর, দরজায় একটা পরদাও আছে। কোনওদিন ও উঁকি দেয় না, দেবেই বা কেন। এ সময় কারও থাকার কথাই নয়। মা অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে সাড়ে ছটা সাতটা। কোনও কোনও দিন বৃষ্টিবাদলা বা বাসের গোলমাল থাকলে আটটাও হয়ে যায়। এ সময় ও ঘরে আর কে থাকবে!

জুতোটা ক্যাম্বিসের বলে হয়তো কোনও শব্দই হয়নি।

তা না হোক, কিন্তু কেন যে পরদাটা নিতান্ত অবহেলায় বাঁ হাত দিয়ে ঈষৎ সরিয়ে উঁকি মারতে গেল রিমি!

প্রথমে অবাক, মাকে দেখে। মা! এ সময়ে। চমকে উঠেছিল। পরমুহূর্তে, আরেকজন লোক।

মা হঠাৎ ওরকম করল কেন রিমিকে দেখে? যেন অপ্রতিভ হল। সামনে চেয়ারে বসা লোকটিকে রিমি ভাল করে দেখেওনি। উঁকি মেরেই আবার পরদা নামিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে নিজের পড়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বুকের মধ্যে তখন তোলপাড়, প্রশ্ন, কৌতূহল।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছে, বুঝতে পারল, মা এবং লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, সদর দরজার দিকে চলেছে। তবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল না, কিংবা ঘাড় ফেরাতে অস্বস্তি।

মার গলাটা কেমন করুণ শোনাল। 'আমি শান্তিতে আছি, শান্তিতে থাকতে দিন আমাকে।'

লোকটা কি কোনও অশান্তির খবর নিয়ে এসেছিল ? কোনও অশান্তি ঘটাতে চায় ? নাকি রিমিকে শোনাবার জন্যেই ওই কথাটা। অর্থাৎ আমি ডেকে আনিনি, লোকটাই যেচে এসেছে। বসার ঘরে ওকে এসে বসতে না বলে উপায় ছিল না।

বেশ হালকা মন নিয়েই ও স্কুল থেকে ফিরেছিল, মুখে হাসি নিয়েই। অথচ এই ছোট্ট একটা দৃশ্য রিমির বুকের ওপর যেন একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিল।

একটাই প্রশ্ন ওর মাথার মধ্যে ঘুরছিল। ওকে হঠাৎ উঁকি মারতে দেখে মার মুখখানা অমন অপ্রতিভ হয়ে গেল কেন। আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে বিদায়ই বা দিল কেন।

যদি চেনাজানা কেউ হয়, দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়স্বজন, তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গে রিমিকে ডেকে স্বাভাবিকভাবে পরিচয় দেওয়ার কথা, আমার মেয়ে !

রিমির বরং উল্টোটাই মনে হয়েছে। যেন রিমি সরে যাওয়াতে মা খুশিই, ঢুকে পড়লে হয়তো সরিয়ে দিত কোনও না কোনও অজুহাতে।

তবু অস্বস্তিকর কিছু ভাবতে ইচ্ছে হল না, কারণ রিমির কাছে মা মানে মা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মাকে নিয়েই ওর পৃথিবী। ওকে নিয়েই মার সমস্ত কিছু। সেখানে আর কেউ থাকতে পারে না। এমনকি দিদাও নয়।

অথচ একটা উটকো লোক এসে কেমন এক রহস্য রেখে দিয়ে গেল। লোক নয়, যেন একটা জলজ্যান্ত অশান্তি।

কিন্তু মা এ সময় কোনও দিনই অফিস থেকে বাড়ি ফেরে না। আজ ফিরল কেন ? জানত কি লোকটা আসবে ? নাকি অফিসই যায়নি আজ ?

কাঁধের ভারী ব্যাগটা নামিয়ে নিজের অজান্তেই কাঁধের কাছটা হাত ঘষল। তারপর পোশাক বদলাতে গেল।

না, মাকে ও কোনও প্রশ্নই করবে না। মা নিজেই বলুক না। যদি বলার মতো কিছু থাকে।

দিদার ঘরে চলে গেল পোশাক বদলে। —দিদা, কি আছে দাও, আছে কিছু ?

প্রচণ্ড খিদে নিয়েই আসে এ সময়। ভাল কিছু না থাকলে রাগারাগি করে। কিন্তু তখন ওর খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। তবু প্রাত্যহিক ব্যবহার থেকে যাতে এতটুকু এদিক-ওদিক না হয়, সে জন্যেই বলল। যদিও জানে, দিদা যা এগিয়ে দেবে, তা ওর মুখে রুচবে না।

ঠিক তখনই মা এসে ঢুকল দিদার ঘরে।

রিমির মনে হল দিদা যেন চোখে প্রশ্ন এনে তাকাল মার দিকে। ফলে মার মুখের দিকে তাকাব না তাকাব না ভেবেও ঘাড় ফেরাতে হল।

চোখে ভুরুতে কেমন একটা তাচ্ছিল্যের টুসকি দিল মা।

রহস্য আরও ঘনিয়ে উঠল রিমির মনে।

তা হলে দিদা জানে যে লোকটা এসেছিল। অশান্তিটা কি, তাও। অথচ রিমির সামনে ওরা কিছুই বলবে না।

মার ওপর ওর প্রচণ্ড রাগ হল। লোকটার সঙ্গে একান্তে বসে কথা বলতে দেখে ওর যে অস্বস্তি লেগেছিল তার জন্যে অনুশোচনাও হল।

মনে মনে বললে, আমার কি দোষ। মাকে কখনও এভাবে বসে কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। বিশেষ করে অপরিচিত কারও সঙ্গে।

দিদা আর রিমির সঙ্গে যত হাসাহাসি গল্পগুজব শলাপরামর্শ করে মা, সে এক অন্য

চরিত্র। বাইরে বের হলেই মা কেমন ঋজু কঠিন, গাম্ভীর্যের বর্ম পরা অন্য এক মানুষ।

তার সঙ্গে এই দৃশ্যটাকে কিছুতেই যেন খাপ খাওয়াতে পারছে না রিমি।

শেষ অবধি কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। মাথার মধ্যে এমন জট পাকাচ্ছিল যে হিয়াকে, ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিয়াকে হয়তো বলেই ফেলত। কিন্তু ভয় হল, ওরা না মা সম্পর্কে কিছু খারাপ ভেবে বসে। রিমি তো জানে ওদের ওই বয়সটা শুধুই সন্দেহ করে, শুধুই সন্দেহ করে।

রিমির উপস্থিতিতে ওরা কোনও আলোচনা করতে চায় না বলেই হয়তো মা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ডাক দিল, রিমি, খাবি আয়।

ওর বুঝতে অসুবিধে হল না, মা ওকে ও ঘরে খেতে বসিয়ে দিয়ে দিদার সঙ্গে কিছু বলা-কওয়া করবে।

কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না রিমি।

কনকনলিনীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, মা আজ আপিস যায়নি ?

চোখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিলেন। ছোট্ট করে উত্তর দিলেন, না।

কল্যাণী অফিস থেকে যে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে সে কথাটা চেপে গেলেন।

মা অফিস গেছে কি যায়নি রিমির তা জানার কথা নয়। ওকে বেরিয়ে পড়তে হয় অনেক আগেই। সকাল থেকেই ব্যস্ততা, মার শরীর ভাল কি মন্দ, অফিস গিয়েছিল কি যায়নি, তা জানতে পারে স্কুল থেকে ফেরার পর।

কিন্তু মাকে দেখে মনে হল না অফিস না-যাওয়ার মতো কোনও কারণ ঘটেছে। অন্তত সর্দি জ্বর পেটব্যথার মতো কোনও অসুস্থতার চিহ্নও নেই তার মুখে চোখে। তা হলে ? ওই লোকটার সঙ্গে কি এমন কথা থাকতে পারে যার জন্যে মা একটা দিন অফিস কামাই করল।

বুঝতে পারল দিদার মুখ থেকে আর একটা কথাও বের করতে পারবে না।

কনকনলিনী আবার খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে গেছেন। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, টিকলো নাক, সোনা রঙের চকচকে কপালে ঈষৎ প্রশস্ত হয়ে সাদা-কালোয় মিশ খাওয়া কোঁকড়া চুলের মানুষটার দিকে তাকালেই বিগত দিনের রূপটুকু ধরা যায়।

হিয়া একদিন বলেছিল, তোর দিদা খুব সুন্দরী ছিলেন, না রে !

রিমি হেসে উঠে বলেছে, কি করে জানব ? আমি তো তখন জন্মাইনি।

হিয়া প্রত্যয় দিয়ে বলেছে, ছিলেন। জিগ্যেস করে দেখিস।

দিদিমা, মানে দিদা, যৌবনে কেমন ছিলেন তা জানার আগ্রহ রিমির কোনও কালেই ছিল না। হয়তো সুন্দরীই ছিলেন, কিন্তু মাকেই ওর বেশি সুন্দর লাগে। মার কিছুটাও যদি পেত। নাঃ, পেয়েছে বোধহয়। কিছুটা নিশ্চয়ই। আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনে হয়।

দিদাকে ও দিদা হিসেবেই দেখে আসছে। ধীর পায়ে টুকটাক সংসারের এটা ওটা করে, বাসন্তীর মার সঙ্গে গল্পগুজব, রিমি স্কুল থেকে ফিরলে সদর দরজা খুলে দেওয়া, হাঁটুর ব্যথা নিয়ে গুটিগুটি সিঁড়ি ভেঙে ওঠা, আর সকাল থেকে সন্ধে অবধি চশমা চোখে দিয়ে খবরের কাগজ পড়া। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যে এত পড়ে ! দু-চার লাইনের যে-খবর কারও চোখে পড়ে না, দিদার কাছে সে-খবরও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সে কি কল্যাণী, পড়িসনি তুই ? আজকের কাগজেই তো আছে ..

রিমির মার নাম কল্যাণী।

মা হেসে ওঠে কোনও কোনও দিন। বলে, একেবারে বাচ্চা বয়েসের ছেলেমেয়েরা বড় জিনিস দেখতেই পায় না, মেঝেতে একটা পিঁপড়ে কিংবা চাল পড়ে থাকলে সেটাকেই

দেখতে পায়। তোমারও দেখি তাই।

কনকনলিনী হাসেন। বয়সী মুখে হাসিটা দেখতে রিমির ভালই লাগে।

বুড়ি দিদিমার মুখের দিকে তাকাল রিমি। কঠিন কঠোর। কাগজ পড়ছে না অন্য কিছু ভাবছে, কে জানে।

তবু প্রশ্ন না করে পারল না। বললে, লোকটা কে দিদা ?

লোকটা, অর্থাৎ ওই লোকটা, যে মা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, যার সঙ্গে বসে মা কথা বলছিল, এবং রিমিকে উঁকি মারতে দেখেই মা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছিল।

এই মাকে নিয়ে ও ছেলেবেলায় কম কষ্ট ভোগ করেনি। কি অসহ্য যন্ত্রণা, এরা তার কিছুই জানে না। রিমি সেই কষ্টের কথা, সেই মাথা-নিচু ভয়-ভয় চাপা কান্না কোনও দিন কাউকে দেখতে দেয়নি।

সরলভাবেই ও প্রশ্ন করল, লোকটা কে দিদা ?

উত্তর এল, সংসারের সবই কি তোমাকে জানতে হবে ? ও কেউ নয়।

ব্যস্।

বেশ রাগ রাগ মুখ করে রিমি চলে গেল, মা খেতে ডেকেছে। দিদার কাছ থেকে এই কড়া কথাটা শোনার পর কিছুই আর মুখে রুচবে না ও জানে, তবু।

ছেলেবেলা থেকে কতবার শুনেছে। মার কাছে, দিদার কাছে। একটাই কথা, তোর এত কৌতূহল কেন ! কিংবা বড়দের কথায় নাক গলানো স্বভাবটা ভাল নয়। অথবা, তোর জানার মতো হলে জানাতাম।

অথচ কোনও দিনই সরাসরি জানায়নি, হয়তো জানাতে পারেনি।

প্রথম শুনেছিল মামিমার কাছে। আসলে মা'র মামিমা। ছেলেবেলা থেকেই মা'র বড়মামা ছোটমামা ওরও মামা। কেউ শুধরে দেয়নি। বরং মজা পেয়েছে।

বলেছিল, তোর মা যে তোকে কিভাবে বুক দিয়ে আগলে আগলে বড় করেছে। দেখিস রিমি, মাকে যেন কোনও দিন কষ্ট দিস না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, মেয়েদের কাছে এ যে কি অপমান, কি কষ্ট, তা যদি জানতিস !

এইটুক শুনেই অবাক হয়ে গিয়েছিল ও।

কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মামিমার কাছ থেকে আর কোনও কথাই বের করতে পারেনি। শুধু বলেছে, তোর মাকে জিগ্যেস করিস। কিংবা দিদাকে।

## দুই

এই দিনটাকে ক্রমাগত পিছিয়ে দিয়ে এসেছিল কল্যাণী। জানত একদিন রিমির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবেই। তবু মনঃস্থির করে উঠতে পারেনি। নাকি সাহসই হয়নি ওর।

তখন রিমির বয়েস দুই কি তিন। একেবারে শিশু।

জেঠতুতো দিদি বেড়াতে এসে বলেছিল। বেড়াতে না মজা দেখতে কে জানে। সংসারে এ রকম কিছু ঘটলে আত্মীয়স্বজনদের কৌতূহলের শেষ থাকে না। শুধু কি কৌতূহল ! মুখে সমবেদনার থমথমে ভাবটুকু বজায় রেখে আসে ঠিকই, কিন্তু মনের গোপনে লুকোনো থাকে পোস্টমর্টেমের ছুরিকাঁচি। লাশটাকে কেটে ফালা ফালা করে শরীরের ভেতরটা তন্ন তন্ন করে দেখতে চায়। খুঁজে বের করতে চায় অজ্ঞাত রহস্যটুকু।

কল্যাণী সে-সময় শুধুই একটা লাশ। মনের দিক থেকে।

সুধাদি সমবেদনার মুখে রিমির বাচ্চা শরীরটা কোলে তুলে নিয়ে তাকে আদর করতে

করতে গালে গাল ঘষে দীর্ঘশ্বাস মেশানো গলায় বলেছিল, বেচারি !

কল্যাণী সে-সময় কাউকেই বিশ্বাস করতে পারত না। কেমন একটা দ্বিধা, একটু সন্দেহ। কারও মুখে ব্যথা আঁকা থাকলেও মনে হত ওটা কপট ব্যথা। ভাবত, সবাই বেশ মজা পাচ্ছে। কেউ কিছু বললে বা জিগ্যেস করলে বড় অপমান লাগত।

আবার এক একসময় কি যে হত, কেউ সমবেদনা দেখালে একেবারে ভেঙে পড়ত। ভরসা হিসেবে তাকেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করত। আসলে কোনও লোকজনই ও তখন সহ্য করতে পারত না। কেউ না এলেই যেন বাঁচে। ভেতর থেকে বলে উঠত, আমাকে একা থাকতে দাও, একা থাকতে দাও। অথচ একা থাকাও যে কি দুঃসহ ছিল, এখনও মনে পড়ে।

সুধাদি বললে, আরেকটু বড় হতে দে, তারপর একটু একটু করে বলে দিস।

কল্যাণী কি করবে, কোথায় দাঁড়াবে ঠিক নেই। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। নিজেকে নিয়েই ও তখন অস্থির। অত দূরের কথা ভাবতেও ইচ্ছে করেনি।

সুধাদি বললে, ছেলেবেলা থেকে জেনে গেলে ওর কাছে আর শকিং লাগবে না। বড় বেলায় যদি শোনে...

কনক চুপচাপ ছিলেন। ওঁর ভেতরটাও তখন খাঁ খাঁ হয়ে গেছে। চোখের পিছনে যেন জলও শুকিয়ে গেছে।

এইসব লোকজন আসা, উপদেশ-টুপদেশ একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাছাড়া, মনের কোণে তখনও একটা ক্ষীণ আশা। সব একদিন ঠিক হয়ে যাবে। যদিও মনের মধ্যে সদা সর্বদা চাপা রাগ গুমরে উঠত।

সুধার কথা কানে যেতেই বিরক্তির কণ্ঠে বললেন, ওসব রাখ তো, পরের কথা পরে ভাবলেই চলবে।

সুধা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না, তাই বলছিলাম।

কল্যাণী একটা কথাও বলেনি। হাঁটুতে কোমরে জোর নেই এমন অসহায় মানুষ ও তখন, আবার বিগত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেলেই ওর ভেতরটা ফুঁসে উঠতে চাইত।

মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে কল্যাণী আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াত। এই বাড়িটার মধ্যেই। এই চার দেয়ালের ঘেরাটোপে। চেহারাও যে ক্রমাগত খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, তা আয়না না দেখেও টের পেত। তার জন্যে কোনও দুর্ভাবনাও ছিল না।

মায়ের ছোটমামা এসে একদিন বললে, চেহারাখানা কি করছিস দিনকে দিন। এসব কি হয় না নাকি ? তোর জীবনেই প্রথম হল ?

এত দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলেছিল কল্যাণী। ফুঃ করে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করেছিল। —চেহারা ? চেহারা নিয়ে হবেটা কি, ছোটমামা।

ছোটমামা বললে, শরীরস্বাস্থ্য জিনিসটা ফ্যালনা নয়। চেহারা থাকলে তবেই বেঁচে থাকা যায়, নতুন করে বাঁচা যায়।

বিষণ্ণ হাসি এসেছিল কল্যাণীর মুখে। —আমার আবার বেঁচে থাকা।

এতসব কথা ও বলতে পেরেছিল, কারণ মানুষটা ছোটমামা। যে মানুষটাকে ওর খুবই আপন মনে হত। এখনও হয়। জানে, মুখে কোনও সমবেদনা বা দুঃখের ছাপ না থাকলেও কল্যাণীর কষ্ট ওই ছোটমামার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সে জন্যেই জোর করে এমন একটা ভাব দেখায় যেন কোথাও কিচ্ছু হয়নি, সব ঠিকঠাক আছে, সব ঠিকঠাক চলবে।

ছোটমামা স্কুল টিচার, তবে স্কুলমাস্টার বললেই যে ছবিটা ভেসে ওঠে তেমন নয়।

বেশ ফ্যাশানদার ফ্রেমের চশমা পরে, দামি কাপড়ের ট্রাউজার্স। দামি জুতো। স্কুলটা যদিও বাংলা মিডিয়াম। টিউশনি না করলে এত সব হয় না, কিন্তু ছোটমামা টিউশনিকে বড্ড ঘেন্না করে। এ সবের খরচ জোটে পৈতৃক সঞ্চয়ের এক-তৃতীয়াংশ ছোটমামাও পেয়েছে বলে, অবশ্যই দাদু মারা যাবার পর।

সঙ্কুচিত হয়ে থাকাই স্বভাব হয়ে গেছে কল্যাণীর, তবু ছোটমামা যেন এ বাড়িতে একটা খোলা জানালা। ও সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে। এই একজন এলে, ও সব ভুলে থাকতে পারে। আসলে কল্যাণীও চায় সবাই ভুলে থাকুক।

হাসবার চেষ্টা করে বললে, নিজের জন্যে ভাবি না, এই রিমিকে নিয়েই...

—গোলি মারো। ওসব ছাড় তো, আমরা আছি কেন ?

একটু থেমে বললে, আমি আছি।

তারপর বললে, চেহারাটা ভাল কর। আর বি. এডে ভর্তি হয়ে যা।

অন্যদের সঙ্গে ছোটমামার তফাত এখানেই। দুঃখ জানায় না, সমবেদনা জানায় না। হাতে একটা ঢিল তুলে দিয়ে বলে, গাছটার মাথা লক্ষ করে ছুড়ে দে। শুনলেই ছুড়তে ইচ্ছে করে।

বাবাও একদিন বললে, তুই একটু বাইরে গিয়ে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসিস না কেন, মনটা তো ভাল থাকবে।

কিন্তু কোথায় যাবে, কোথায় বেড়াবে। রিমিকে ইচ্ছে করলে মার কাছে রেখে দিয়ে যাওয়া যায়, সঙ্গে নিয়ে গেলেও অসুবিধে নেই। কিন্তু মন ? মন কার কাছে রেখে যাবে। যেখানেই যাক ও, সঙ্গ ছাড়বে না। পার্কে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে একা বসলেই কোত্থেকে যে প্রচণ্ড রাগ এসে ফেটে পড়তে চায় ! কিংবা তখন হতাশ লাগে নিজেকে।

পাড়ার কেউ অকারণে মুখের দিকে তাকালেও মনে হয়, সব জেনে গেছে ও, মনে মনে হাসছে।

জানত না তার চেয়েও বড় দুঃখ লুকিয়ে আছে। রিমিকে তা বলতে না পারার দুঃখ। নিজের মেয়ের কাছেই সঙ্কোচ। কি করে বলবে ভেবেই পেত না।

মনে পড়ে যেত সুধাদির কথা।

মা বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। 'সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে।'

কল্যাণীর মনে আছে বাবা কিন্তু একটা কথাও বলেনি। হয়তো সুধাদির কথাগুলো কানেও যায়নি। ঘরের এক কোণে জানালার আলোয় বসে মোটা একখানা বইয়ের পাতায় ডুবে ছিল। ওটা যে আইনের বই তাও জানত না।

বাবা একদিন খুশি-খুশি মুখে বললে, তুই ভাবিস না কল্যাণী। অক্ষয় বলেছে ডিভোর্সটা কোনও সমস্যাই নয়। কিন্তু বাছাধনকে এত টাকা...

একটু থেমে বলেছিল, এত টাকা দিতে হলে সুবিমল কত সুখে থাকে দেখব।

—টাকা ? কল্যাণী অস্ফুটে বলে ফেলেছিল।

কত টাকার কথা বাবা বলেছিল তাও ওর কানে যায়নি।

ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো প্রচণ্ড একটা চাপা রাগ কল্যাণীর মনেও। ইচ্ছে হত যে কোনও উপায়ে প্রতিশোধ নিতে। কিভাবে প্রতিশোধ নেবে খুঁজে পেত না বলেই বড় অসহায় লাগত। এত অসহায় লাগত যে, ভেতরে ভেতরে নির্জীব হয়ে গিয়ে স্বপ্ন দেখার মতো কখনও কখনও ভেবে বসত, ও আসলে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কিছুই ঘটেনি। আশা করত অলৌকিক কিছু ঘটে যাবে। সুবিমল হঠাৎ একদিন বিমর্ষ মুখ নিয়ে এসে হাজির হবে।

সত্যি যদি সেভাবে কোনওদিন এসে হাজির হয়, কল্যাণী কি করবে ভেবে পেত না।

ক্ষমা করার কথা মনে এলেও দপ্‌ করে জ্বলে উঠত। ওই মানুষটাকে ওর এখন ঘেন্না করে, ঘেন্না করে। এক ছাদের নীচে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সে তো তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার সমান।

বাবার ওপরই মনে মনে রেগে গিয়েছিল কল্যাণী। বাবা কি করে টাকার কথা বলল! বাবার উকিল বন্ধু অক্ষয়কাকার সঙ্গে শেষ অবধি বাবা কিনা লোকটাকে জব্দ করতে চাইছে এভাবে? অনেক টাকা আদায় করে। ওরা কি এটুকুও বুঝতে পারছে না, কল্যাণীকে এমন করে যে অপমান করেছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তার কাছ থেকে যত টাকাই আদায় করে দিক না কেন অক্ষয়কাকার আইন আদালত, সে টাকা ছুঁতেও ইচ্ছে হবে না ওর।

'ডিভোর্স পেতে কোনও সমস্যাই হবে না।' বাবার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অলৌকিক কিছু ঘটে যাবে এমন কিছু আশা করেছিল কি! না, আবার সেই পুরনো দিনগুলো ফিরে আসবে এমন কোনও স্বপ্ন ওর মনেও ছিল না। ফিরে যাওয়ার কথা ও ভাবতেও পারে না। সুবিমল এসে যদি ওর সামনে ছলছল চোখে দাঁড়ায়, তা হলেও না। অসীম ঘৃণা আর অনেকখানি ক্রোধ ছাড়া যার সম্পর্কে ওর মনের মধ্যে আর কিছুই নেই, তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতেও ইচ্ছে করবে না।

কিন্তু তা বলে ডিভোর্স? নিজে মুক্তি পাবে বলে ওই মানুষটাকে কল্যাণী মুক্তি দিয়ে দেবে? বাবা এ কথা ভাবল কি করে।

ওর সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল রাগে। ওই একটাই অস্ত্র ওর হাতে আছে। জব্দ করার। শাস্তি দেবার।

এই অমানুষ, এই বিশ্বাসঘাতক জানোয়ারগুলোকে ভগবান কোনও শাস্তি দেয় না। সমাজ শাস্তি দেবার জন্যে মুখিয়ে আছে শুধু কল্যাণীর মতো অসহায় মেয়েদের। কোলে দু বছরের একটা নিরপরাধ শিশুকে নিয়ে যাদের বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়।

প্রথম যখন চলে এসেছিল, চলে আসতে হল, শুধুই প্রচণ্ড এক অশান্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, সেদিন এই বাড়িটাও হয়ে উঠেছিল অশান্তির অগ্নিকুণ্ড। ও নিজের মুখটা তো দেখতে পায়নি, দেখতে পেত শুধু বাবা আর মার মুখ। সে মুখে নিজেরই ছায়া দেখতে পেত। কারও মুখে কোনও কথা নেই, হাসি নেই, কারও যেন কোনও কাজ নেই। শুধু নিশ্চুপ বসে থাকা, ব্যথার, বিমর্ষতার চাপা কান্না আটকে রাখা।

বাবা মার একটাই আশঙ্কা, ডিভোর্স করে দেবে না তো!

যেন ডিভোর্স না করলে একটা ক্ষীণ আশা থাকে, আবার হয়তো কোনওদিন সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আবার হাসি আনন্দ, সুবিমলের বিনয়-মাখানো মুখে মাথা নামিয়ে প্রণাম করা। কুশল জিগ্যেস করা, আপনজনের মতো। বাবার বুকের ভেতর তখন ওই একটাই আতঙ্ক।

সেজন্যেই হয়তো অক্ষয়কাকাকে একদিন বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন।

বর্ষাতি থেকে বৃষ্টির জল ঝরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন অক্ষয়কাকা।

বললেন, ডিভোর্স করবে? ডিভোর্স পাওয়া এত সহজ নাকি!

কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোমার বাবা পাগল হয়ে গেছেন।

সে-রকম একটু ভয় কল্যাণীরও ছিল। অক্ষয়কাকার কথায় অনেকখানি ভরসা পেল। অনেকখানি শান্তি।

মনে মনে ভাবলে, না, ডিভোর্স ও কিছুতেই দেবে না সুবিমলকে, কিছুতেই না।

ভেবেছিল, ডিভোর্স না দেওয়াই ওর হাতে একমাত্র অস্ত্র। এই অপমানের, এই সমাজের কাছে মুখ লুকিয়ে থাকার, রিমি বড় হওয়ার পর তাকে সব কথা বলতে না পারার,

অথবা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার লজ্জা—এ সবের প্রতিশোধ নেবার একটাই রাস্তা।

ডিভোর্স নিলেই তো সুবিমলের মুক্তি। হাসি হাসি মুখে দিব্যি গরদের পাঞ্জাবি পরে রঞ্জনাকে বিয়ে করে বসবে।

ডিভোর্স না পেলে সুবিমল যা খুশি করে বেড়াক, কিচ্ছু যায় আসে না কল্যাণীর। হঠাৎ কোথাও কোনওদিন দেখা হয়ে গেলে, সুবিমলের পাশে রঞ্জনাকে দেখলে, ও তর্জনী তুলে রঞ্জনাকে দেখিয়ে বলতে পারবে, ওই তো সুবিমলের রক্ষিতা। হয়তো সুবিমলের নামটাও উচ্চারণ করতে পারবে না। বলবে, জানোয়ারটা ওই রক্ষিতাকে নিয়ে আছে।

বাবার কথা শুনে ও তাই রাগে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। —কি বলছ তুমি বাবা, ডিভোর্স করব কেন ? আমি চাই ওরা দুজনই সারা জীবন জ্বলেপুড়ে মরবে। ওই নোংরা মেয়েটা দেখুক, রক্ষিতা হয়ে থেকে কত সুখ।

মনে মনে ভেবেছিল, আমার এই রিমিকে বড় হয়ে বলতে লজ্জা করবে যে, বাবা নেই, কিংবা বাবা চলে গেছে। তেমনই ওর ছেলেমেয়েদের দিকেও আঙুল দেখিয়ে সবাই বলবে, অবৈধ সন্তান। ইল্‌লেজিটিমেট চাইলড। সেটাই একমাত্র প্রতিশোধ।

রাগ মুখ ফসকে কখন যে কি বের করে দেয়। 'রক্ষিতা' শব্দটা কল্যাণী কোনও দিন বাবার সামনে উচ্চারণ করেনি। করে ফেলল।

বাবা বিষণ্ণ হাসি হাসল। বললে, ওকে শাস্তি দিতে গিয়ে যে তুই নিজেকেও শাস্তি দিচ্ছিস। তোরও তো একটা জীবন আছে, নতুন করে শুরু করতে পারবি। অক্ষয় বলছিল, একটা মোটা টাকা আদায় করে দিতে পারলে, তোর সুরাহা হবে কিছুটা, রিমিরও।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কল্যাণী বলেছিল, ও টাকায় আমি থুথু ফেলি। আমাকে নিয়ে তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না। আমি নিজের পায়েই দাঁড়াব, রিমিকে মানুষ করব।

ত্রিদিব বোধহয় একটা বড় ধাক্কা খেয়েছিলেন। সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। কল্যাণীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোরই বা চিন্তা কিসের। আমার কি কিছুই নেই নাকি ? তোর দাদারা বাইরে বাইরে আছে, সুখেই আছে, আমার কাছে ওরা কিছু আশাও করে না। তুই আর ওই একফোঁটা একটা নাতনি। সে টাকা আমার আছে, সে টাকা আমার আছে।

কল্যাণী বললে, তবে আর টাকার কথা তুলছ কেন ?

ত্রিদিব হাসলেন। বললেন, তুই ডিভোর্স না দিয়ে শাস্তি দিতে চাইছিস, আমি ভাবলাম একটা মোটা টাকা আদায় করলে আহাম্মকটা উচিত শাস্তি পাবে। নেশা তো ছেড়ে যাবে দুদিন বাদেই, তখন উঠতে বসতে ওই বজ্জাত মেয়েটাকে খোঁটা দেবে, তোমার জন্যেই এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেল।

দৃশ্যটা যেন উপভোগ করছিলেন কনকনলিনী। বাবা আর মেয়ের কথোপকথন শুনছিলেন। একটাও কথা বলেননি এতক্ষণ।

বিরক্তির সঙ্গে বললেন, তোরা শুধু স্বপ্নই দেখ। শাস্তি, শাস্তি। নিজের কথাটা কেউ আর ভাবছিস না। যা চুকেবুকে গেছে, তা মুছে ফ্যাল। পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন—আমি কারও পরোয়া করি না। যা ভাল মনে হয়, তাই কর।

কল্যাণীর মনে পড়ল, ছোটমামাও ঠিক এমনিভাবেই বলেছিল। তবে হালকা রসিকতা মিশিয়ে। বলেছিল, পিছনের জীবনটা কি জানিস ? ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর চকখড়ির লেখালিখি। ওটা ডাস্টার দিয়ে মুছে না ফেললে নতুন কিছু লেখা যায় না।

এত বিষণ্ণতার মধ্যেও হেসে ফেলেছিল কল্যাণী। আসলে ছোটমামা এলে ওর মধ্যে

যে আর বিষণ্ণতাই থাকে না। হেসে ফেলে বলেছিল, তোমার মধ্যে থেকে মাস্টারির গন্ধ আর যাবে না।

চেষ্টাচরিত্তির করে ছোটমামাই ওকে বি. এড ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিল। ভাগ্যিস এম. এ-টা আগেই করে রেখেছিল।

শেষ অবধি সে নিজেই রাজি হয়ে গিয়েছিল ডিভোর্সে। মুক্তি পাবার জন্যেই। পেয়েও গেল। কিন্তু কি থেকে মুক্তি ? শুধু পুরনো পদবিতে ফিরে এলেই কি সব মিটে যায় ! রিমির নামের সঙ্গে যে স্মৃতিটাও রেখে দিতে হয়েছে।

—বা রে, তোমার পদবি আর আমার পদবি এক নয় কেন ? আর কারও তো এ রকম নয়। রিমি যখন আরও ছোট, একদিন বলেছিল।

কল্যাণী বেশ বিব্রত বোধ করেছিল সেদিন। কোনও রকমে বলেছিল, তোমার বাবা নেই বলে।

আর কোনও অস্বস্তিকর প্রশ্ন করেনি রিমি। অত বুঝতও না তখন। মা যা বলত, তাই বিশ্বাস করত।

একটু একটু করে আভাসে ইঙ্গিতে কিছুই যে জানেনি তা নয়। কিন্তু সেগুলো কেমন যেন অস্বচ্ছ লাগত রিমির কাছে।

মামার বাড়িতে ওদের নেমন্তন্ন সেদিন। অকারণেই। মাঝে মাঝেই করত।

আর মামিমা, মানে বড়মামিমা, এক ফাঁকে বললে, মাকে যেন কোনওদিন কষ্ট দিস না।

বললে, তোর মা যে তোকে কিভাবে বুক দিয়ে আগলে আগলে বড় করেছে।

রিমিব মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মামিমা কিন্তু আর একটা কথাও বলেনি। শুধু বলেছে, তোর মাকে জিগ্যেস করিস। কিংবা দিদাকে।

'বাবা নেই' কথাটা যে বয়সে প্রথম শুনেছিল রিমি, সেই বয়সটার কথাই ওর মনে পড়ে না। তার পরও কয়েকবার শুনেছে। শুনেছে বটে, কিন্তু কথাটা ওর মনের ওপর দাগ রেখে যায়নি। অন্তত শৈশবের দিনগুলোতে নয়ই। বাবা কি তাই তো ও জানত না। বাবার অভাব বোধ করেনি কোনওদিন। মা সে অভাব কোনওদিন বুঝতে দেয়নি। ও সেই ছোট্টটি থেকে দেখে আসছে মাকে, দাদু আর দিদাকে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে একদিন হিয়া ওকে জোর করে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। জোর করে নিয়ে গিয়েছিল বললে ভুল হবে, ওর নিজেরও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। আসলে ওদের বাড়িতে লোকজন বড় একটা কেউ আসত না। ওরাও মামার বাড়ি ছাড়া কোথাও যেত না। রিমির মনে হত, মা শুধু নিজেকেই আটকে রাখেনি, রিমিকেও যেন চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রেখেছে। এক একসময় ওর বড় একা একা লাগত। স্কুলটাই যেন ওর একমাত্র মুক্তির জায়গা, খোলা আকাশ।

হিয়া ওর হাত ধরে ওদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। তার মাকে গিয়ে বললে, দ্যাখো, কাকে নিয়ে এসেছি। রিমি। আমার বন্ধু।

হিয়ার মা হাসলেন। —তাই বুঝি ! একসঙ্গে পড়ো ? এক ক্লাসে ?

পাশের ঘর থেকে একজন ভদ্রলোক বলতে বলতে এলেন, কে রে হিয়া ? কাকে এনেছিস ?

রিমিকে দেখেই হেসে ফেললেন। —ও তুমি ? হিয়ার বন্ধু বুঝি ?

ও একটু লজ্জা পাচ্ছিল, হিয়ার মাকে দেখে যদিও ওর একটুও লজ্জা লাগেনি, তাই কথা না বলে চোখ নামিয়ে শুধু ঘাড় নাড়ল।

আর হিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, বাপি বাপি, তোমাকে সেই যে রিমির কথা বলি, এই সে।

ছোট ছিল বলেই, নাকি রিমি একটু বোকা বোকা, ও কিছুই বুঝল না, শুধু অপরিচিত একটি লোকের উপস্থিতির জন্যে শরীরে এবং মনে আরও সঙ্কুচিত হল। শাড়ি তো পরত না তখন, তবু স্কার্টেই যেন পা জড়িয়ে যাচ্ছিল।

হিয়া যাকে 'বাপি' বলল, সেই মানুষটাকে কিন্তু রিমির খারাপ লাগেনি। এক একটা মুখে যেমন হাসি ছাড়া আর কিছুই মানায় না, সেই রকম।

বলে উঠলেন, আরে বাব্বা, তা হলে তো রীতিমতো ভি আই পি।

হিয়ার মার দিকে ফিরে বললেন, দেখো, ভাল করে আদরযত্ন কোরো যেন। তা না হলে হিয়া আমাকে আস্ত রাখবে না।

হিয়ার দিকে ফিরে বললেন, তোর বন্ধু তোরই মতো ক্যাডবেরি পাগল তো! দাঁড়া, নিয়ে আসছি।

'না, না' বলে যে আপত্তি করবে তাও পারেনি রিমি।

হিযার মা ওদের বসতে বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন। কি একটা চটপট বানিয়ে নিয়ে এসে দিলেন।

ক্যাডবেরিটা হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বাবা বললেন, জানো রিমি, এ বাড়িতে আমার বন্ধুদের কোনও দাম নেই। হিয়ার বন্ধু সব সময়েই ভি ভি আই পি। বলে হাসলেন।

বেশি দূর তো নয়, হেঁটেই যাওয়া যায়, রিমি একাও ফিরতে পারত, তবু হিয়া আর হিয়ার মা ওকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

হিয়ার মা তখনও বেরোননি, রিমি আর হিয়া অপেক্ষা করছে বাইরে, কি বোকা ছিল রিমি, বললে, বাপি কে রে?

হিয়া অবাক হয়ে বললে, কে আবার, বাবা! বাবাকে আমি তো 'বাপি' বলি।

বাবা কি বস্তু তা যে ও জানত না, তা নয়। কিন্তু খুব ভাল বুঝতে পারত না। 'বাবা' ডাক শুনেছে, মা দাদুকে 'বাবা' বলত। কিন্তু ওর বয়সী একটা মেয়ের, মানে হিয়ার বাবাকে দেখে, কেমন আদর আদর ভঙ্গিতে হিয়ার সঙ্গে কথা বলতে দেখে ওর ভেতরটা আনন্দে গলে গেল। একটুক্ষণের জন্যে মনে হল ওরও একজন বাপি থাকলে কি ভালই না হত।

বেশি দূর তো নয়, হেঁটেই যাওয়া যায়, রিমি একাও ফিরতে পারত, তবু হিয়া আর হিয়ার মা ওকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

রিমি ওদের, হিয়ার মাকে, বাড়ি অবধি আসতে দেয়নি। — ওই তো বাড়ি, আমি চলে যাব, চলে যাব।

আসলে ও হয়তো একটু ভয় পাচ্ছিল। ওরা রিমিকে এত আদরযত্ন করল, এখন মা যদি ওদের সেভাবে আপ্যায়ন না করে, ওর যে মাথা কাটা যাবে! একটা ছোট্ট প্রশ্ন ওর মনে যে উঁকি দেয়নি তাও নয়। হিয়া যদি প্রশ্ন করে বসে, তোর বাপি কোথায় রে!

স্কুলের সবাই যার যার বাবার কথা, মার কথা বলত।

ও বলত শুধু মার কথা, দাদু-দিদার কথা, এমনকি মামা-মামিমার কথাও।

হঠাৎ একদিন একটা মেয়ে বললে, তোর বাবার কথা কিছু বলিস না কেন রে!

একটু থমকে গিয়েছিল রিমি, তারপর হালকা সুরেই হেসে বলেছিল, বাবা তো নেই।

ও হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল, আর তা শুনে মেয়েটার মুখে কাতর বিষণ্ণ ভাব ফুটে উঠেছিল। কেন তা বুঝতেও পারেনি।

মেয়েটা বলে উঠেছে, ইস, মারা গেছেন?

কি উত্তর দেবে বুঝতে পারেনি। চুপ করে থেকেছে। ছেলেবেলায় কি বোকাই না ছিল, এখন মনে পড়ে। অথচ বাবার নামটা জানত। দাদু মুখস্থ করিয়েছিল। কেউ বাবার নাম জিগ্যেস করলে যাতে বলতে পারে।

মাকে এসে প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁ মা, আমার বাবা কি মরে গেছে ?

আসলে 'বাবা' শব্দটাই ওর মনে কোনও ধারণা গড়ে তোলেনি। বাড়িতে কেউই রিমির বাবার কথা তুলত না।

মা ওর প্রশ্ন শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে ছিল। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল, মরে গেছে বলতে নেই।

মরে গেছে না বলে মারা গেছেন বলতে হয় তা শেখানোর কথা মনেই পড়েনি কল্যাণীর। 'মরে গেছে' কথাটা যেন ওকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল। অথচ তখন ডিভোর্স হয়ে গেছে। ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর চকখড়ির সব লেখাজোকা ডাস্টার বুলিয়ে মুছে দিয়েছে। আছে শুধু একটা চাপা রাগ, একটা অদৃশ্য দাগ, যা ভিজে কাপড় দিয়ে বারবার মুছে ফেললেও আবার ফুটে ওঠে। অথচ যার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই নেই সে লোকটা সম্পর্কে 'মরে গেছে' কথাটা শুনতেও খারাপ লাগে। নিজের মনকে বোঝাল, মরে গেলেই তো নিস্তার পাবে। সেই মুক্তি দিতে রাজি নয় কল্যাণী। চরম অপমান করেছে ওকে, শাস্তি পেতে হবে না ! বেঁচে থেকে তার দুর্দশা দেখতে চায়, দেখে শান্তি পেতে চায়। যদিও তার কথা এখন আর সারাদিনে একবারও মনে পড়ে না। সারা মাসেও নয়। হঠাৎই তার কথা কেউ বললে, মনে কোনও দাগও কাটে না।

কল্যাণী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, না, মারা যাননি।

—তবে ? বাবা কোথায় গেছে ? রিমি প্রশ্ন করেছিল।

কল্যাণী অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, দূরে, অনেক দূরে। বলব, তোকে সব বলব, আরেকটু বড় হলে।

ইচ্ছে হয়েছিল, তবু সেদিন মাকে আর কোনও প্রশ্ন করেনি রিমি।

কিন্তু তখন ও ছোট ছিল।

মামিমা একদিন বললে, তোর মা যে তোকে কত কষ্ট করে বড় করেছে।

ও প্রশ্ন করতেই বলেছিল, তোর মাকে জিগ্যেস করিস।

সত্যি সত্যি জিগ্যেস করার সাহস হল ওর একদিন।

মাকে এ সব কথা জিগ্যেস করার সময় কোথায়। মা সব সময়েই ব্যস্ত।

রাত্তিরে মা আর রিমি একই ঘরে শোয়। আগে একই খাটে শুত, গায়ে মার হাতের ছোঁয়া না পেলে ওর ঘুম আসত না। তখন ঘুম আসার আগে কত গল্প হত ' কথা বলতে বলতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ত।

একটু বড় হওয়ার পর দাদু এ ঘরে একখানা রোগা খাট ঢুকিয়ে দিয়েছিল। রিমির জন্যেই। মাঝ থেকে রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে চোখ চেয়ে গল্প করার সুরটা কেটে গেল। কথা বলতে হলে দূরের খাট থেকে ছুড়ে ছুড়ে দিতে হত কথাগুলো। এভাবে কি গল্প করা যায় নাকি !

কিন্তু কৌতূহল কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না।

ও নিজের খাট থেকে মার খাটে উঠে এল।

— কি রে ? কিছু বলবি ? কল্যাণী রীতিমত অবাক হয়েছিল। কল্যাণীর হাত ওর গায়ে আদরের স্পর্শ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, একটা কথা জিগ্যেস করব, রাগ করবে না বলো।

কল্যাণী হাসিমুখে বললে, রাগ করব কেন ?

হাসিমুখ তো আর অন্ধকারে দেখা যায় না। তবু গলার স্বরে সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হল না রিমির। এবং সেই হাসিকে প্রশ্রয় বলেই মনে হল ওর।

দুম করে বলে বসল, আমার বাবা নেই কেন মা ?

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপব ধীরে ধীরে কল্যাণী কথায় একটা দীর্ঘশ্বাসের রেশ টেনে বললে, যার বাবা থেকেও নেই ...

থামল, তারপর বললে, তুই কোনওদিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবি না বল।

রিমির শরীরটা চেপে ধরল কল্যাণী।

—কি যে বলো। রিমি হেসে উঠল।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমাকে তুমি কিছুই বলনি। মামিমার কাছে শুনেছি, তুমি অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছ আমাকে। খুব কষ্ট পেয়েছ। কেন মা ?

গলার স্বরে কান্না এসে গেল যেন। বললে, কি যে কষ্ট পেয়েছি। তোর ওপরেও তোর বাবার এতটুকু মায়াদয়া ছিল না। সে একটা অমানুষ। তুই তখন সদ্য হয়েছিস, একটা বাজে মেয়ের নেশায় পড়ে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

—ইস। শব্দ করে দুঃখ প্রকাশ করল রিমি। কান্নার গলায় বললে, মা, এর চেয়ে বাবা না থাকা ভাল। মরে যাওয়া ভাল।

কল্যাণী বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, আমিই তার মৃত্যু কামনা করিনি, তুই কেন করবি।

কল্যাণী বলতে পারল না, সব জেনেও তারপর দুটো বছর ও শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে এসেছে। হয়তো আশায় আশায়, হয়তো বা বাবা-মা জানলে কষ্ট পাবে ভেবে। তারপর দু বছরের রিমিকে নিয়ে চলে আসতেই হল।

কল্যাণী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল, বলল : এরপর তোকে আমি কিই বা বলতাম ? বাবা আছে ?

মানুষ যে এমন হতে পারে ভাবতেই পারল না রিমি। এত ঘৃণ্য ? এত নোংরা স্বভাবের মানুষ ছিল তার বাবা !

—বাবা খারাপ, একথা ভাবতেও খারাপ লাগে, না মা ?

রিমির মনে পড়ে গেল যখন ছোট ছিল, ওর বন্ধুদের কারও কারও মা ওর দিকে খুব মায়ার চোখ নিয়ে তাকাত। আদর করত। দু-একজনের মা দূর থেকে দেখে হাসাহাসি করে কি যেন বলত। এ সবই ওর কাছে রহস্য ছিল, কেন মায়া, কেন হাসি, কিছুই বোঝেনি। হঠাৎ সব যেন ওর সামনে রহস্যের দরজা খুলে দিল। নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে গেল রিমি। ওর মনে হল আর ও বন্ধুদের সামনে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। সরল বিশ্বাসে আগের মতো 'বাবা নেই' কথাটা উচ্চারণও করতে পারবে না কোনওদিন।

অন্ধকারের মধ্যে মা আর মেয়ে দু'জনেই যেন পরস্পরের কাছে মুখ লুকোতে চাইছে। লজ্জা যেন দুজনেরই। অথচ যে লোকটা আসল অপরাধী, তার কোনও লজ্জা নেই। কোনও অনুতাপ নেই। শরীরকেই সে সর্বস্ব জেনেছে, জেনে সুখী হয়ে আছে। কল্যাণীর কাছে সেটাই চরম অপমান।

হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনল রিমি।

মার গলা—ভেবেছিলাম, একদিন অন্তত তোকে দেখতে আসবে। একদিনও আসেনি। তুই কি দোষ করেছিলি বল !

রিমি চুপ করে রইল।

কল্যাণী বললে, কোনওদিন যদি সে তোর কাছে 'বাবা' বলে পরিচয় নিয়ে আসে...

রিমি বিষণ্ণ হাসি হাসল। বললে, 'বাবা' বলে পরিচয় দিলেই কি সে বাবা হয়ে যায় নাকি ! আমি তাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।

শেষের কথাগুলো আক্রোশের মতো উচ্চকণ্ঠ শোনাল।

বিছানায় অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বললে, অথচ সারাটা জীবন তোকে নিয়ে আমি যে কি ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। ভয়, তোকেও না ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

রিমির হাতখানা চেপে ধরল কল্যাণী। বললে, তুই-ই তো আমার সব, তোর জন্যেই চাকরি। লেখাপড়া কর, বড় হ, তারপর তোর বিয়েটা দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব। তখন আর কোনও ভয় থাকবে না।

রিমি হঠাৎ বলে উঠল, এত সব জানার পরেও ভাবছ আমি বিয়ে করব ?

কল্যাণী ওর গায়ে স্নেহ বুলিয়ে দিল।— কেন করবি না। সবাই তো আর আমার কপাল নিয়ে আসে না। তুই তো হিয়ার বাবার কত প্রশংসা করছিলি। সব বাবা কি এক।

একটু থেমে বললে, হ্যাঁ রে, হঠাৎ যদি সে কোনওদিন এসে বলে, আমার মেয়ে আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমাকে ছেড়ে চলে যাবি না তো ?

দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠল রিমি। বললে, কি যে বলো মা, আমি তো তাকে চিনিও না, চিনতে চাইও না।

বলেই দু হাত বাড়িয়ে মার অসহায় শরীরটাকে চেপে জড়িয়ে ধরল। মার গায়ে গাল আর চিবুক ঘষতে ঘষতে অস্ফুটে বলতে লাগল, আমার মা, আমার মা, আমার মা।

আর তখনই ওর মনে পড়ে গেল, স্কুল থেকে ফিরে কেডস পায়ে বাড়িতে নিঃশব্দে ঢুকেই অকারণ বসার ঘরের দরজার পরদা সরিয়ে যে লোকটার সঙ্গে মাকে কথা বলতে দেখেছিল, মাকে বেশ অপ্রতিভ লেগেছিল মুহূর্তের জন্যে, সে লোকটা কে ? কেন এসেছিল। তার চলে যাবার সময় মা কেনই বা বলেছিল, আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন !

কিন্তু সে কথাটা ওর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল না। মনে হল, এ প্রশ্নটা করলে মাকে ছোট করা হবে। মনে মনে বললে, আর যাই হোক মাকে কোনওদিন ছোট করতে পারব না।

## তিন

রাগে দপ করে জ্বলে উঠেছিল সুবিমল। কিন্তু অক্ষম রাগ। ও জানে এখন আর কিছুই করার নেই। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার যৌবন, নাকি তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, তা ও আজও জানে না। কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। কখনও মনে হয় যৌবনের নেশায় ও ভুল করেছিল, কখনও মনে হয় সেই ভুলের স্মৃতিটাই ওকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে।

নিজেকে একবারও ওর অপরাধী মনে হয় না। অপরাধ যদি কেউ করে থাকে সে ওর যৌবন। যৌবনের উন্মত্ত আবেগ, এই কামনা বাসনা, এর কোনওটাই ওর নিজের সৃষ্টি নয়। এরকম পাগলা হাওয়া ওর মাথার মধ্যে, ওর বুকের গভীরে কে রোপণ করেছিল ? সুবিমল তার জন্যে দায়ী হবে কেন !

পরিতোষ এসে বললে, না সুবিমল, ওসব আশা ছেড়ে দে। রাজি হল না, একবারের জন্যেও রাজি নয়।

অথচ পরিতোষকে বাড়িতে দেখা করতে বলেছে এ খবর শুনে অনেকখানি আশা পেয়েছিল ও, স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল।

না, সুবিমলের কাছে কল্যাণীর আজ কানাকড়ি দামও নেই। তবু পুরনো দিনের কথা কোনও কোনওদিন মনে পড়ে গেলে বুকের মধ্যে কোথায় যেন খিচখিচ করে লাগে।

মনে মনে ভাবে, এত দম্ভ কল্যাণী পেল কোথা থেকে। সুবিমলের ধারণা ছিল, একবার ও কল্যাণীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই সে কেঁদে লুটিয়ে পড়বে।

পরিতোষ বললে, কি বলল জানিস ? আমি দিব্যি শান্তিতে আছি, অশান্তি চাই না।

রাগে দপ করে জ্বলে উঠেছিল সুবিমল। কল্যাণীর বিশুষ্ক উদভ্রান্ত মুখখানা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেই অসহায় মুখখানার আড়ালে যে এতখানি দম্ভ থাকতে পারে, ভাবেনি কোনওদিন।

—তুমি তো একটা দুশ্চরিত্র লম্পট। আমার জীবনটাই নষ্ট করে দিলে। উন্মত্ত আক্রোশে চিৎকার করে উঠেছিল কল্যাণী।

সেই কথাগুলোই যেন আবার কানের পাশে বেজে উঠল।

অথচ সেদিন ওর মনের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়াই হয়নি। কিংবা একটা চাপা ক্রোধ বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠেছিল।

সুবিমলের মনে হয়েছিল কোনও অন্যায়ই করেনি ও।

পরিতোষ ওকে বোঝাতে চাইত।—কল্যাণীকে তুই বিয়ে করেছিস, তারপরও এ সব কি করছিস তুই ?

নির্বিকার মুখে সুবিমল বলেছে, রঞ্জনাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। ভালবাসতাম।

পরিতোষ হেসে উঠে বলেছে, ভালবাসা ? তোর এই নেশাটাকে আর যাই বল, ভালবাসা বলিস না। এর নাম সেক্স। ওর শরীরটার ওপর তোর লোভ।

—হতেও পারে। বাট সেক্স ইজ নো ক্রাইম। মানুষের শরীরেই থাকে।

হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে গেছে পরিতোষ। যে মানুষটা নিজের ভুল বুঝতে পারে না, তাকে কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে না। তবু বন্ধুত্ব নষ্ট হয়নি। বন্ধু বন্ধুই থেকে যায়, সে দোষ করলে, অন্যায় করলেও। পরিতোষের মনে হয়েছে আমি তো বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করছি না। নাকি বিবেক হয়ে দাঁড়াতে চাইছি সুবিমলের ওপর গোপন ঈর্ষা আছে বলে। রঞ্জনার শরীরের ওই চটক, ওটাই হয়তো ঈর্ষা জাগিয়ে দিয়েছে।

সুবিমল বললে, তুই জানিস না পরিতোষ, আমি রঞ্জনাকে ভুলতেই চেয়েছিলাম।

তারপরই ও যেন নিজেকে প্রশ্ন করল, ভুলে যাবার জন্যে, নাকি প্রতিশোধ নেবার জন্যে ! ভাল করে মনেও পড়ে না। হয়তো ব্যর্থতার জ্বালা নেবাতে পারবে এই আশায়। বুকের শূন্যতা দূর করতে চেয়েছিল, হয়তো ভেবেছিল আরেকজনের ভালবাসা পেলেই ওর জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

কলেজে পড়ার সময়েই ওদের সম্পর্কটা গাঢ় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা ভালবাসার না বন্ধুত্বের সেটুকুই বুঝতে পারেনি। রঞ্জনার বন্ধুত্ব শুধু সুবিমলের সঙ্গেই ছিল না। ওরা তিন-চারজন বন্ধু সব সময়েই রঞ্জনাকে ঘিরে থাকত। ওদের হাসি হল্লা আড্ডার মধ্যে সকলের কথায় ব্যবহারে কোথায় যেন একটা লুকোনো স্তাবকতা থাকত। আর সেই স্তাবকতা রঞ্জনা যেন বেশ উপভোগ করত।

সুবিমল অরুণ নীলাদ্রি সকলেই তখন মোহগ্রস্ত। অথচ প্রত্যেকেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করত কোনও বিশেষ একজনের প্রতি রঞ্জনার কোনও আগ্রহ বা দুর্বলতা আছে কি না। নিঃসন্দেহ হতে পারেনি বলেই কেউ সাহস করে এগিয়ে যেতে পারেনি। রঞ্জনাও কাউকে প্রশ্রয় দিয়েছে বলে মনে হয়নি, কারণ হাবেভাবে কথাবার্তায় ও এক-একদিন এক-একজনকে প্রশ্রয় দিত। আর সে জন্যেই কেউ কারও প্রতি ঈর্ষা বোধ করত না।

বরং এক-একসময় মনে হত, ওদের যে কোনও একজনের সঙ্গে যদি রঞ্জনা জড়িয়ে

পড়ে, তা হলেই যেন শান্তি পায়। তখন বাকি কয়েকজন নিশ্চিন্তে স্বপ্নের ঘরে চাবি দিয়ে দিতে পারবে।

একদিন রঞ্জনা তখনও আসেনি। ওরা জনাচারেক বন্ধু শুকনো মুখ করে বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে, কথায় কার্পণ্য সকলেরই। রঞ্জনা সামনে না থাকলে ওদের কথাগুলোর কোনও দাম আছে বলে মনেই হত না।

নীলাদ্রি অরুণকে বললে, তুই সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়, দেখিস না তোর কথা শুনে কি দারুণ এনজয় করে।

সুবিমল হেসে উঠে নীলাদ্রিকে বললে, সেদিন চিড়িয়াখানার কথা উঠতে তোর দিকে তাকিয়েই বললে, যাবি ? কই আমাদের দিকে তো তাকায়নি।

ও হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু সেদিন সুবিমলের ভেতরটা কেঁদে উঠেছিল। তা না হলে কথাটা ওর মনে পড়ল কেন।

অরুণ বলে উঠল, দ্যাখ সুবিমল, আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করিস না। তুই-ই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস কি না কে জানে।

ঠিক সেই সময়েই রঞ্জনা ঢুকল, সাদা চামড়ার ব্যাগটা কাঁধের স্ট্র্যাপ থেকে কোমরের বেশ কিছুটা নীচে অবধি ঝুলছে।

সটান সামনে এসে বললে, আঃ, আমাকে দেখতে পেয়ে তোদের মুখগুলো কি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখলাম, কার মুখ সবচেয়ে উজ্জ্বল হল।

—কার ? কার ?

সকলেই প্রশ্ন করে উঠল।

নীলাদ্রি বললে, নিশ্চয় আমার।

অরুণ বললে, উঁহু, আমার। মানে আমার নয়, আসলে তোর মুখটাই আমাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছিল তো, তারই রিফ্লেকশন।

সুবিমল কোনও কথাই বলেনি। তা দেখে রঞ্জনা বললে, কিরে, অভিমান নাকি !

কলেজ শেষ হতেই সেই রঞ্জনা কোথায় যেন ছিটকে গিয়েছিল।

দু-একদিন ফোন করে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছিল। কোনও উৎসাহ দেখায়নি ও, কোনও প্রশ্রয় ছিল না তার কথায়।

সুবিমলের বুকের মধ্যে তখন অসীম শূন্যতা। যে কোনও একজনকে আঁকড়ে ধরার জন্যে ও তখন ব্যস্ত। ভেবেছিল তা হলেই শূন্যতা দূর হয়ে যাবে। কিংবা ভেবেছিল, বিয়ের চিঠিটা নিয়ে গিয়ে রঞ্জনাকে দিয়ে আসবে। চিঠিটা দেখে রঞ্জনার মুখের ভাব কেমন হয় দেখবে। কারণ সুবিমল সাহস করে কোনওদিন কিছু বলতে না পারলেও ভেতরে ভেতরে ওর কেমন একটা বিশ্বাস ছিল, রঞ্জনা ওকেই ভালবাসে।

সুবিমলের মনে হয়েছিল কল্যাণীকে বিয়ে করে ও আসলে রঞ্জনার ওপরই রিভেঞ্জ নিয়েছে। যদিও শেষ অবধি বিয়ের চিঠিটা পাঠাতেও ইচ্ছে হয়নি।

সেই রঞ্জনার সঙ্গে ওর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নিউ মার্কেটে। কি সব কেনাকাটা করে রঞ্জনা ঘর্মাক্ত, হাতে বড় একটা পেট-ফাঁপা প্লাস্টিকের ব্যাগ।

—আরে সুবিমল তুমি !

বলেই বাঁ হাতটা বাঁদিকের বুকে চেপে বললে, দাঁড়াও, প্যালপিটেশন সামলে নিই।

সুবিমল ঠিক বুঝতে পারল না। কিংবা সঙ্কোচ বোধ করছিল। রসিকতা উপভোগ করতে পারল না।

শান্ত গলায় বললে, আছ কেমন ?

উত্তর এল, ফাইন। অ্যাজ ফ্রি অ্যাজ আ ফ্লাইং বার্ড।

রঞ্জনার কথা শুনে ও প্রথমটা ধরতে পারেনি। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হয়েছিল, আমরা কি পরস্পরকে 'তুমি' বলতাম ? নাকি 'তুই' ! মনে পড়েছিল, তবু আজ আর 'তুই' বলতে পারল না। মনে হল, এই কটা বছরে ওদের মধ্যে যেন অনেকখানি দূরত্ব গড়ে উঠেছে। । আজ আর সেই পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

তবু রসিকতার স্বরে বললে, কই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন ? ফ্যাশন ?

কলেজ ছাড়ার পর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। সকলেই একে একে কেমন বদলেও গেছে। সেই উদ্দাম উত্তেজনা, উৎফুল্ল আনন্দ, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানোর দিন কারই বা আছে। সুবিমল নিজেও অনেক বদলে গেছে। এখন ধীরস্থির সংসারী মানুষ হবার চেষ্টা করছে। সেটাই স্বাভাবিক।

সুবিমল একাই নয়, নীলাদ্রি আর অরুণও ভাল চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। এক-এক জন এক-এক লাইনে, যার সঙ্গে ছাত্রদিনের রুচি কিংবা স্বপ্নের কোনও সম্পর্কই নেই। চাকরিটা পেয়ে সুবিমল যেমন খুশি হয়েছিল তেমনি মনমরাও। টাকার অঙ্কটা লোভনীয় ঠেকেছিল। কিন্তু ওই অবধি। মনকে বুঝিয়েছিল, আমরা যারা কলেজ থেকে বের হই, কেউ নাটও নই, বল্টুও নই। পরিমাণ মতো গলানো লোহা। যদি কেউ বলে কয়েকটা নাট দরকার, আমরা নিজেদের ঢালাই করে নিয়ে নাট বনে যাই। কেউ বল্টু চাইলে বল্টুও হয়ে যাই।

খোলাবাজারের চাহিদা কি সেটারই খোঁজ রাখি। নিজের চাহিদা শুধু টাকার অঙ্কে। যে টাকা রুচি বা স্বপ্ন দিতে পারে না।

নীলাদ্রি এবং অরুণও তাই। চাহিদামতো নিজেদের বদলে বাজারের চাহিদা মিটিয়েছে। তারপব বিয়ে, সংসার।

মাত্র কটা বছর, তারই মধ্যে মানুষ কত বদলে যায়।

তিন বন্ধু একবাব একত্র হয়েছিল এই সেদিনও। আড্ডা তেমনভাবে জমেনি। সকলের মুখেই অফিস আর অফিস পলিটিক্স, সংসার আর সংসারের বিরক্তি বা যন্ত্রণা, তারপর হঠাৎ একসময় দমকা হাওয়ার মতো রঞ্জনার কথা উঠেছিল। তিনজনই খুব হেসেছিল, কি বোকা ছিলাম রে আমরা, ভাবতাম আমাদের মধ্যে কাউকে ভালবাসে ও। নীলাদ্রি প্রতিবাদ করেছিল, ধুস, আমি তা কোনওদিন ভাবিনি। অরুণ বলেছে, ফ্রেন্ডের বেশি ভাববই বা কেন। সুবিমল বলেছে, তাই হবে, শরীরে চটক ছিল ওর, দেখতে কথা বলতে ভাল লাগত এই অবধি।

ওরা তিনজনই একই সিদ্ধান্তে এসেছিল, ওরা কেউ রঞ্জনার প্রেমে পড়েনি।

সেই রঞ্জনার সঙ্গে সুবিমলের দেখা হয়ে গেল নিউ মার্কেটে। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ, কি সব কেনাকাটা করেছে।

ইচ্ছে হচ্ছিল, তবু ঠিক আগের দিনে পৌঁছে যেতে পারছিল না। রঞ্জনা ইতিমধ্যে যেন একটু মোটা হয়েছে, তেমন স্লিম নেই। যার ফলে কিছুটা চাপল্য ঝরে গেছে, কিন্তু দেখতে আরও সুন্দর। অন্তত সুবিমলের তাই মনে হল।

কথার পিঠে কথা, হঠাৎ বললে, কই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন ? ফ্যাশন ?

কলেজ ছাড়ার পর ওরা তিন বন্ধু একদিন একমত হয়ে বলেছিল, মেয়েটা নির্ঘাত পাড়ায় কারও সঙ্গে প্রেম করত।

নীলাদ্রি বলেছিল, লাভার নিশ্চয় ছিল, কোনওদিন জানতে দেয়নি।

অরুণ বলেছে, আমরা শালা আঁটি চুষে ভেবেছি আম খাচ্ছি।

আসলে তিনজনের মনেই হয়তো একটা ঝাল ছিল। সেটা অশ্লীলতা হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

হো হো করে সারা শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠল না রঞ্জনা। এ ক'বছরে একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে বলেই, নাকি বয়েস বেড়েছে বলে, চোখে একটা রহস্য এনে স্মিত হাসি আঁকল ঠোঁটের কোণে। রঞ্জনা বললে, সাদা সিঁথিটা বিজ্ঞাপনও তো হতে পারে, তোমার জন্যে আজও অপেক্ষা করে আছি, তার বিজ্ঞাপন।

মনে পড়ছে, তখন 'তুই' বলত পরস্পরকে। রঞ্জনা 'তুমি' দিয়ে শুরু করেছিল বলেই কেমন দূরত্ব বোধ করেছিল। মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল, আমরা কি 'তুমি'ই বলতাম ?

কিন্তু সেই আগের দিনে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। এই দূরত্বটা যেন আরও মধুর, আরও মোহময়।

একটু রহস্য রয়ে গেল, রঞ্জনা সত্যিই এখনও বিয়ে করেনি, নাকি যারা চুলের ফাঁকে সিঁদুরটুকু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তাদের মতোই আধুনিকা !

ওরা কথা বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে আসছিল, দেখল বাইরে ঝকঝকে আলো মেশানো বৃষ্টি পড়ছে।

বৃষ্টি দেখে, নাকি চলে যেতে ইচ্ছে ছিল না বলে, কে জানে, রঞ্জনা বললে, চলো, ততক্ষণ বরং কোথাও বসে একটু কফি খাওয়া যাক।

রঞ্জনা এক্ষুনি চলে যাবে ভেবে সুবিমলের ভিতরটা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল, একান্ত গোপনে, রঞ্জনার কথায় ও যেন প্রাণ ফিরে পেল।

বললে, তাই চলো, আরও কিছুক্ষণ তো তোমাকে কাছে পাব।

বলে হাসল, যাতে রঞ্জনা কথাটাকে উপহাস বা রসিকতা ভেবে নিতে পারে। কারণ ওটা যে ওর বুকের ভেতরের কথা তা বুঝতে পারলে রঞ্জনা হয়তো ব্লাউজের হাতা থেকে টুসকি দিয়ে একটা নোংরা পোকাকে ছিটকে দেওয়ার ভঙ্গিতে হেসে উঠবে এই ভয়ে।

কতক্ষণ. কতক্ষণ যে কেটে গিয়েছিল সুবিমলের ধারণাই ছিল না।

কথা কথা কথা। নানা বিষয়ে কথা বলে গেল রঞ্জনা। আর সুবিমল মুগ্ধ শ্রোতার মতো মোহগ্রস্ত মন নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনে গেল।

ওর মনে হল পুরনো দিনের সেই গোপন ভালবাসা আবার যেন ডানা মেলতে চাইছে। ভালবাসা, না শরীরের প্রতি লোভ ও নিজেও বুঝতে পারছিল না। আর বুঝতে পারলেও দুটোর মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে বলে মনে হল না। দুটোই তো সমান নেশা জাগায়। দুটোই শেষ অবধি একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়। শুধু একটা জায়গায় ওর মনে হল, ও কপটতা করছে। অন্যায় করছে। কারণ শেষের দিকে ওর সন্দেহ হচ্ছিল, রঞ্জনাও ওর সঙ্গ চাইছে। সান্নিধ্য চাইছে।

স্বপ্ন ভেঙে যাবে এই ভয়ে ও কিছুতেই বলতে পারছিল না, যে ও বিবাহিত।

কল্যাণীর কথা ও একবারও বলতে পারল না। বলতে পারল না, দুদিন বাদেই ও সন্তানের পিতা হবে।

সেই শুরু।

বাড়ি ফিরে সেদিন ওর নিজেকে ভীষণ অস্থির লেগেছিল। ঝোড়ো হাওয়ায় দোলা ফুলবাগানের মতো অস্থির অথচ সুন্দর। একটা স্বপ্নময় সুগন্ধ যেন ওর সারা শরীর জুড়ে কুঁড়ি থেকে পটপট করে ফুল ফোটাচ্ছিল।

বাড়ি ফিরতেই কল্যাণী প্রচণ্ড রেগে গেল।— তোমার না আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ! আমি কখন থেকে তৈরি হয়ে আছি ...

সব আনন্দ মুহূর্তে উবে গেল। সমস্ত মন জুড়ে শুধুই বিতৃষ্ণা। কল্যাণীর দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছিল না। কি কদর্য দেখতে হয়েছে।

সুবিমল নিজেই অবাক হয়ে গেল, বুঝতে পারল ওর মধ্যে প্রচণ্ড কোনও পরিবর্তন ঘটে

গেছে। তা না হলে কল্যাণীকে এত কুৎসিত মনে হচ্ছে কেন।

মনে পড়ল, সকালে অফিসে বেরোনোর সময়েও ও কেমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখেছে কল্যাণীর এই শরীরটাই।

সন্তান-আসন্না স্ফীতোদর কল্যাণীর পেটে রসিকতা করে হাত বুলিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে কল্যাণী।

কল্যাণীর রাগ পড়ে গেল একসময়। কিন্তু রঞ্জনার সঙ্গে ওর হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে এ কথা বলতে পারল না। যে রঞ্জনার কথা ও কখনও কখনও বলেছে, কলেজ জীবনের বন্ধুদের কথা, তাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে।

তারপর কিভাবে যেন সুবিমল আর রঞ্জনা বিদ্যুতের গতিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পরম অন্তরঙ্গ।

তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, দ্বিতীয় দিনেই ও আর কল্যাণীর কথা লুকিয়ে রাখতে চায়নি।

—আমার একটা বউ আছে, তোমাকে বোধহয় সেদিন বলাই হয়নি। কফি খেতে খেতে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি সব ভুলেই গিয়েছিলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনা বলে উঠেছে, ওয়ানডারফুল। কবে বউকে দেখাবে বলো? আজই?

সুবিমল হেসে উঠল। — আরে না না, আজ নয়। আর একদিন।

পরিতোষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। পরিতোষের নিজেরই বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল রঞ্জনাকে দেখে, ওর কথাবার্তা শুনে।

পরের দিন বললে, দেখিস, ও তোর মাথা চিবিয়ে খাবে।

—বলছিস? সত্যি? তা হলে, আমি ভাবব, আয়াম দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান অন আর্থ।

তারপরই বলেছে, কোনওদিন যেন কল্যাণীকে বলে বসিস না।

পরিতোষ যত আদর্শবাদীই হোক, এ ব্যাপারে বন্ধুদের মধ্যে একটা অলিখিত আঁতাত আছেই। কেউ কারও সাময়িক পদস্খলনের কথা কারও সহধর্মিণীর কানে তোলে না। ঈর্ষা তাকে শত্রু করে না তুললে।

কপট বিষণ্ণ মুখ করে সুবিমল একদিন রঞ্জনাকে বললে, বড্ড লেট করে ফেললাম।

রঞ্জনা হাসল। বললে, একবার প্রোপোজ করে তো দেখলে পারতে। না হয় রিফিউজ করতাম, তাতে জীবন তো আর বরবাদ হয়ে যেত না।

একটু থেমে বললে, এখনও সময় আছে, বেটার লেট দ্যান নেভার।...প্রোপোজ করনি কেন?

—সাহসই হয়নি।

রঞ্জনার ঠোঁটে ওটা কি কৌতুকের হাসি?

বললে, আমার অত সব জেলাসি নেই। হেসে উঠে বললে, অবৈধ প্রেম, তার মতো গ্র্যান্ড কিছু আছে নাকি!

সেই দিনই রঞ্জনাকে ও বাড়িতে নিয়ে গেল। নিয়ে যেতে সাহস পেল হয়তো।

—কল্যাণী, এই সেই রঞ্জনা। কলেজের বন্ধু। নীলাদ্রি আর অরুণের কাছে আগেই শুনেছ।

কল্যাণী হেসে বললে, এসো ভাই। একটু থেমে বললে, ওর মুখেও তোমার কথা কম শুনিনি।

কল্যাণী খুব আদর আপ্যায়ন করল। একেবারে আপনজনের মতো। যেন কতদিনের

আলাপ পরিচয়। — তুমি তো বলতে গেলে ঘরের লোকের মতো।

সুবিমল খুব খুশি হয়েছিল। যাক, কল্যাণীর মনে কোনও হিংসে নেই। কি ভাল, কি ভাল।

রঞ্জনা চলে যাওয়ার পরই কল্যাণী হাসতে হাসতে বললে, একদিন বেড়াতে নিয়ে এসেছ, ঠিক আছে। ঘরে এনে তুলো না যেন কোনওদিন।

## চার

অন্ধকার রাতের বিছানায় শুয়ে শুয়ে মা আর মেয়ের মধ্যে আড়াল সরে গিয়েছিল। একে একে সব শুনেছে রিমি। আর পনেরো থেকে আঠারোয় পৌঁছতে পৌঁছতে কল্পনা দিয়ে সব ফাঁকা জায়গাগুলো ভরিয়ে নিয়েছে।

এখন রিমির মধ্যে শুধুই একটা চাপা আক্রোশ। বাবা সম্পর্কে তিক্ত বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই নেই। কিংবা তাও নয়। ওর জীবনে, ওর মনের মধ্যে বাবা নামক কোনও ব্যক্তির অস্তিত্বই ও বুঝতে পারে না।

মা বলেছিল, ও একটা উপদ্রব।

বলেছিল, আমি ওকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

রিমি তা জানে।

ছেলেবেলায় কে কোথায় রিমিকে দেখে উপহাস করেছে, কিংবা মায়া মাখানো চোখে দূর থেকে 'আহা আহা' করেছে, রিমি টেরও পায়নি। কারণ তখন ও কিছুই জানত না। কিন্তু মার কাছ থেকে শোনার পর অদ্ভুত এক লজ্জা আর সঙ্কোচ ওকে পেয়ে বসল। নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

রাস্তায় বের হলেই ওর মনে হত সকলেই ওকে তাকিয়ে দেখছে। ও বয়সের মেয়েরা রাস্তায় বের হলেই বুঝতে পারে রাজ্যের লোক তাকিয়ে দেখছে। কেন দেখছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কোনও কোনও দৃষ্টি হয়তো বিব্রত করে কিংবা অপমান করে। কিন্তু প্রথম প্রথম রিমি সেটুকু বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়ওনি। ওর কাছে সব দৃষ্টিই ছিল অবমাননার দৃষ্টি। সে অবমাননা ওর রূপ যৌবন বা শরীরের প্রতি নয়।

নাইন-টেনে পড়ার সময় কোনও কোনও সহপাঠী মেয়ে আবার দু-একজন কিশোর বা কৈশোর পার হওয়া যুবকের দৃষ্টিতে মজা পেয়েছে। কৌতুক বোধ করেছে, হাসাহাসি করেছে নিজেদের মধ্যে। কেউ কেউ তাদের চোখের চাউনির মধ্যে নিজের রূপের প্রতি নৈবেদ্য, স্তুতি কিংবা স্তবের ইঙ্গিত পেয়েছে। খুশি হয়েছে।

রিমির জীবনের সেই স্বর্ণময় দিনগুলোই আসেনি। ও যেন শৈশব থেকে একেবারে যৌবনে পৌঁছে গেছে।

—জানো মা, এত খারাপ লাগে। কেউ হাসলেই মনে হয়, বোধহয় সব জানে বলেই হাসছে। কেউ তাকালে মনে হয়, আরও কিছু জানতে চাইছে।

কল্যাণী বলেছে, তা হলে ভেবে দেখ, আমাকে কি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

বলেছে, যখন চলে এলাম এ বাড়িতে, পাড়ার লোক, এমনকি আত্মীয়স্বজনরাও ভেবেছে আমারই দোষ। সব দোষ তো চিরকাল মেয়েদেরই। আমারও মনে হত সবাই যেন আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছে।

চুপ করে থেকেছে রিমি। ওর ভিতরটাও নড়ে উঠেছে মার কথা শুনে। তবু অনুভবে বুঝতে পারেনি মার কষ্ট। ভাবতে চেষ্টা করেছে, মা কি আমার মতোই হাসি দেখলেই উপহাস ভাবত, কিংবা দৃষ্টিকে ভেবেছে কৌতূহল।

কল্যাণী বললে, এখন আর কাউকে ভয় পাস না, কে কি ভাবল, কে কি বলল, তার তোয়াক্কা করবি কেন !

একটু থেমে, এখন তো আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, মাথা তুলে হাঁটি। এখন আর কাকে ভয় !

কল্যাণী ধীরে ধীরে বলেছে, যখন ছোট ছিলি, তখন আমার কি ভয়, তোকে না শেষ অবধি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তা হলে কি নিয়ে যে বাঁচতাম।

এত দুঃখের কথার মধ্যেও হেসে উঠেছে রিমি। বাঃ রে, ছিনিয়ে নিয়ে যাবে মানে ? আমার নিজের কোনও মতো নেই ? নিয়ে যেতে চাইলেই আমি যেতাম ?

কল্যাণী হেসেছে। —তা তো জানি, জানতাম, তবু।

আসলে উত্তরটা দিতেই পারেনি কল্যাণী। বলতে পারেনি, রিমির নিজের মতটাকেই তো ভয় পেয়ে এসেছে। সেই মত যে মুহূর্তে বদলে যাবে না সেই বিশ্বাসই ছিল না।

'বাবা কোথায়' বা 'বাবা নেই কেন' এ-সব প্রশ্ন শুনে কল্যাণীর ভিতরটা অবধি থরথর করে কেঁপে উঠত। 'বাবা' শুধু একটা শব্দ। একটা নাম। তাকে কখনও চোখেও দেখেনি রিমি, একটা দিনের জন্যেও আদরের স্পর্শ পায়নি, তবু কি আশ্চর্য, শুধু ওই শব্দটা ওকে এত টানে। না জানি, হঠাৎ একদিন এসে যদি হাজির হয়, হাসি হাসি মুখ করে আদরে জড়িয়ে ধরে বলে বসে, 'আমি তোমার বাবা,' কল্যাণীর ভয় ছিল, তা হলে হয়তো ওর সমস্ত পৃথিবীটা তোলপাড় হয়ে যাবে। আরও একবার ওর পায়ের তলার মাটি সরে যাবে। মানুষটাকে তো কল্যাণী দেখেছে, ও সব পারে, অমন দক্ষ অভিনেতা জীবনে আর একজনকেও দেখেনি। শুধু কল্যাণীকে আরেকবার মাটিতে মিশিয়ে দেবার জন্যে সেটুকু অভিনয় ওই পাষণ্ডটা অনায়াসে করতে পারে।

কল্যাণী বললে, জীবনে কোনওদিন যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, কিংবা কথা বলে, বাবা বলে যেন স্বীকার করিস না। কথাও বলবি না।

—কি যে বল, ওই রকম একটা মানুষকে বাবা বলতে আমার ঘেন্না করবে।

শুনে কল্যাণীর মুখটা হেসে উঠল, আনন্দে।

একে একে প্রায় সব কথাই ও বলেছে রিমিকে। ওর যত কষ্ট, যত যন্ত্রণা, প্রতিটি দিনের কথা।

বলতে বলতে পুরনো দিনগুলোর কথা মনেও পড়ে যায়।

ছোটমামা বলছে, একটা লোককে জব্দ করার জন্যে তুই তো নিজেকে জব্দ করছিস। ওই নচ্ছার মেয়েটা কি বিয়ের তোয়াক্কা করে নাকি।

কৌতুকের ভঙ্গিতে বলেছে, কাকে 'রক্ষিতা' অপবাদ দিয়ে অপমান করতে চাস, ওই শব্দটাই তো ডিকশনারি থেকে উঠে যাচ্ছে। এখন লিভ টুগেদারের যুগ।

হাসতে হাসতে বলেছে, ওটা এখন দারুণ ফ্যাশন।

কল্যাণীকে কেমন হতাশ দেখিয়েছে। ওর হাতে একটাই অস্ত্র ছিল প্রতিশোধ নেবার। হঠাৎ হাতের মুঠোটা খুলে দেখেছে কোথাও কোনও অস্ত্র নেই। ছুড়ে মারবার মতো একটা পাথরের টুকরো ছিল, সেটুকুও কোন জাদুতে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দিনকয়েক পরে ছোটমামাকে বলেছে, তা হলে অক্ষয়কাকাকেই বলো। একটাই অনুশোচনা, বাবাও চেয়েছিল কল্যাণী ডিভোর্স করে নতুন জীবন শুরু করুক। সেই বাবাও তখন মারা গেছেন।

ডাক্তার, আত্মীয়স্বজন, সকলেই বলল, হার্ট অ্যাটাক।

হার্টের কোথায়, শুধু কল্যাণীই জানে। প্রথম, যেদিন দু বছরের রিমিকে কোলে নিয়ে এ বাড়িতে ফিরে এল। দ্বিতীয়, যেদিন বাবা অক্ষয়কাকাকে সঙ্গে নিয়ে এল, কিন্তু ও

ডিভোর্স নিতে চাইল না। — ডিভোর্স ? কি বলছ তুমি, এত সহজে আমি ওকে রেহাই দেব ! সুখের পায়রাকে পুষে ও কদিন সুখে থাকে দেখি না ! থার্ড কোনটা ? সেই টেলিফোনের কথা কি ?

রিমিকে সব বলেছে, ওই টেলিফোনের কথাটা বলতে পারেনি। বলতে চায়নি। রিমির সম্পর্কে যে ওর বাবার কোনওদিন কোনও আগ্রহ হয়েছে তা জানতে দিতে পারেনি, ভয় পেয়েছে। বিশ্বাস করেনি। ভেবেছে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার কৌশল।

বি এড পড়তে পড়তেই পড়া ছেড়ে দিতে হল।

অক্ষয়কাকা একদিন এসে বললে, কল্যাণীর একটা চাকরি হয়ে যেতে পারে। আমার এক মক্কেলকে বলেছি। বড় কোম্পানির জি এম। তার একটি মাত্র মেয়ে।

অক্ষয়কাকা বাবাকে সান্ত্বনা দেবার গলায় বললে, মেয়ের বাপ না হলে মেয়ের বাপের দুঃখ কে বুঝবে। সব শুনে বলেছে, আই উইল ফিক্স হার আপ সামহয়্যার।

অক্ষয়কাকা কল্যাণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছে, কি রে, পেলে করবি তো ?

সম্মতিতে ঘাড় নেড়েছে কল্যাণী। খুশি হয়ে উঠেছে। অক্ষয়কাকাকে মনে হয়েছে দেবতা।

বাবা বলেছে, ডিভোর্সটা এবার তা হলে করেই নে।

তখনও একগুঁয়েমি যায়নি। কেন দেব ডিভোর্স !

সেই দুশ্চিন্তাতেই বাবা মারা গেল কি না কে জানে। নাকি সেই টেলিফোন।

সুবিমলের কথা বেবাক ভুলেই গিয়েছিল কল্যাণী। রাগ স্তিমিত, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেও হয় না। মনে হয় যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি।

একদিন মিনিবাসে অফিস থেকে ফিরছে। হঠাৎ পরিতোষবাবুর সঙ্গে দেখা। দেখতে পেয়েই নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করেছিল। ও জানালার ধারে বসেছিল, রড ধরে ধরে পরিতোষবাবুকে এগিয়ে আসতে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল, যেন জানালার বাইরের দৃশ্য দেখছে।

পরিতোষ মাথাটা ঝুঁকিয়ে : আরে বউদি যে। কোত্থেকে ?

মুখ ফেরাতেই হল। হাসতে হল। মাঝখানে বারো-তেরোটা বছর পার হয়ে গেলেও অচেনার ভান করা গেল না।

—এদিকে কোত্থেকে ? আবার প্রশ্ন।

কল্যাণী হেসে বললে, অফিস থেকে।

পরিতোষবাবু বেশ অবাক। —কোন অফিস ?

মুখ ফসকে নামটা বেরিয়ে গেল। পর মুহূর্তেই মনে হল, নামটা না বললেই ভাল ছিল। একটা অন্য নামও তো বলতে পারত !

কল্যাণীর পাশের লোকটা তখনই উঠে গেল, আর ধপ করে ওর পাশেই বসে পড়ল পরিতোষবাবু।

—মেয়ে কত বড় হল, কি পড়ছে ?

কল্যাণী ততক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে। এড়িয়ে এড়িয়ে উত্তর দিল।

তবু লোকটা নাছোড়বান্দা। সুবিমলের খবর জানাতে যাচ্ছিল, কল্যাণী হঠাৎ উঠে পড়ল। টিকিটের পয়সাটা নষ্ট হয় তো হোক।

বললে, এখানেই নামব।

হুড়মুড় করে ঠেলেঠুলে বেরিয়ে এল, নেমে পড়ল পরের স্টপেই।

লোকটা কি ভাবে কি ! সুবিমলের কোনও খবর জানার জন্যে আগ্রহ আছে ওর এখনও ?

হপ্তাখানেক বাদেই, অফিসে বসে আছে, কে একজন বললে, কল্যাণীদি, আপনার ফোন।

ফোন ? ও একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওকে কে ফোন করবে ?

ও প্রান্ত বললে, আমি সুবিমল বলছি।

হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারল না কল্যাণী।

সুবিমল শুধু ওর নিশ্বাসের শব্দটা শুনতে পেল।

—শুনলাম পরিতোষের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল।

কল্যাণী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে, হতেই পারে।

সুবিমল একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, একদিন যাব ? মেয়েকে একবার দেখে আসব শুধু।

কোনও উত্তর না দিয়ে ঝপাং করে রিসিভারটা নামিয়ে দিল কল্যাণী। লাইন কেটে গেল।

ওর বুকের ভেতরটা তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। অসীম বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি যেন পেটের ভেতর থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে চাইল। একটা দুশ্চিন্তা, একটা আতঙ্ক, কল্যাণীকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল।

—হীরুদা, শরীরটা ভাল লাগছে না, বাড়ি চলে যাব ?

প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে বাস ধরল ও। বাড়ি ফিরে যেতে পারলে যেন নিশ্চিন্তি। যেন এক্ষুনি এসে ওই লোকটা রিমিকে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। সেদিন রিমি স্কুল থেকে ফিরে না আসা অবধি কি উদ্বেগ। কি দুশ্চিন্তা।

বাবা রিটায়ার্ড মানুষ, দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমোন। কনকনলিনী সোনা ফ্রেমের চমশা চোখে দিয়ে খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন।

কনক সদর দরজার খিল খুলে দিয়ে অবাক হলেন। — তুই, এ সময় ? শরীর খারাপ নাকি !

—না, এমনি চলে এলাম।

কনক বললেন, দেখিস, নতুন চাকরি।

বাবা ঘুম থেকে ওঠার পর কল্যাণী টেলিফোনের কথাটা বললে। বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলছিল।

বাবার মুখেও দুশ্চিন্তা নামল। বললেন, তখনই বলেছিলাম ডিভোর্সটা নিয়ে নে। এখন কি যে করি। মনে হচ্ছে জ্বালাবে।

কনক বললেন, হঠাৎ এত বছর বাদে মেয়ের জন্যে দরদ উথলে উঠছে।

বাবা বলল, স্কাউন্ড্রেল। দেখি অক্ষয়ের সঙ্গে কথা বলে।

পরের দিন থেকে অফিসে বসে কি অশান্তি। এই বুঝি আবার ফোন এল। আবার কথা না বলে কেটে দেওয়া। আশপাশের লোকরাও তো দেখবে। কি ভাববে তারা। ফোন বেজে ওঠার শব্দটা যেন আতঙ্ক। অন্যের টেবিলে ফোন, তবু রিং হলেই ওর কান উৎকর্ণ হয়ে থাকে, এই বুঝি ডাক এল, কল্যাণীদি আপনার। অন্য কেউ কথা বলতে শুরু করলে তবেই নিশ্চিন্ত হয়।

এ অফিসে ওর দুঃখী জীবনের কথা, লজ্জা আর অপমানের কথা একমাত্র জি এম জানেন। তাঁর সঙ্গে ওর একদিনই দেখা হয়েছিল। অক্ষয়বাবু যেদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সে সব পুরনো জীবনের কথা উনি কি আর অন্য কাউকে বলেছেন ! এত ওপরে তিনি, এরা কেউ তাঁর নাগালই পায় না। খোদ জি এম ওকে চাকরি দিয়েছেন এ কথাটাই কেউ জানে না। জানলে কেউ না কেউ বলত। আর এত তুচ্ছ একটা

অধস্তন চাকরি জি এম দিতে পারেন সে কথাই কেউ ভাবতে পারে না।

কল্যাণী যে বিবাহিত সে খবর কেউ জানে না। কারণ দু' বছরের রিমিকে কোলে নিয়ে যেদিন ও চলে আসে, তারপর একদিনও সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁয়ায়নি।

এখন এই স্কাউন্ড্রেলটা যদি সব রাষ্ট্র করে দেয় অফিসে, সেও এক আতঙ্ক।

সে আতঙ্ক বাবারও ছিল, মারও। যেদিন রিমিকে নিয়ে চলে আসে সেদিন থেকেই।

কনকনলিনী দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, পুরুষদের হাতে একটাই অস্ত্র, বউ ছেড়ে চলে গেছে, কিংবা বউকে তাড়িয়ে দিয়েছি, কারণ ওর স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। খারাপ, খারাপ। ওই একটা কথাই চিরকাল শুনে এসেছি, মেয়েদের মুখেও। মেয়েরা খারাপ।

অফিসে আবার টেলিফোন আসতে পারে, এই এক ভয়। আর এক ভয় রিমিকে নিয়ে। বড় হচ্ছে। এমনিতেই তো সব সময় একটা আশঙ্কা, ভুল পথে না চলে যায়। চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে বের হলে সে মেয়ে একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সরল শান্তশিষ্ট মুখ করে এমন ভাবে ফিরবে, দেখে এতটুকু সন্দেহ হবে না। হাঁসের গা দেখে কি বোঝা যায় একটু আগেই জলে সাঁতরে এল।

সে ভয় সব মায়েরই থাকে।

কিন্তু কল্যাণীর অন্য এক ভয়। বিশেষ করে ওই টেলিফোনটা আসার পর থেকে।

তা কেন, পরিতোষের সঙ্গে বাসে দেখা হওয়ার পর থেকে। অফিসের নামটা বলে ফেলে কি ভুল যে করেছিল। ঠিক খবর নিয়ে নিয়ে ডিপার্টমেন্ট বের করে ফেলেছে। হয়তো অপারেটরই বলে দিয়েছে।

কল্যাণী ছোটমামাকে বলেছিল, জানো ছোটমামা, ওর এক বন্ধু, পরিতোষ, সুবিমলের কথা বলতে যাচ্ছিল, আমি না শুনে সেই স্টপেই নেমে পড়লাম।

—ইস। ছোটমামা বলে উঠেছে।— সব শুনলি না কেন, সেই উইচ, মানে ডাইনিটার ক'টা ছেলেমেয়ে, কোথায় পড়ে।

—তাতে আমার কি যায় আসে। ওসব শোনার আগ্রহই নেই আমার। জাহান্নামে যাক না।

ছোটমামা হাসতে হাসতে বলেছে, একটু বুদ্ধি রাখবি তো। খোঁজ নিয়ে জানা যেত, আগেরটা না জানিয়ে আবার বিয়ে করেছে কি না। ডিভোর্স নিতে হলে কাজে লাগত।

কল্যাণীর তখনই মনে হয়েছে, ভুল হয়ে গেছে। জানলে তো দোষ ছিল না।

কিন্তু এখন প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবতেই পারছে না। এখন নিজে বাঁচতে চায়। রিমিকে বাঁচাতে চায়। সে জন্যেই অফিসে বসে বসেও দুশ্চিন্তা, রিমি বাড়ি ফিরল কি না।

টেলিফোনটা সেদিন আসার পরই রিমিকে সাবধান করে দিয়েছে। রাস্তায় ঘাটে কোনও লোক যেচে কথা বললেও উত্তর দিবি না। কেউ যদি এসে বাবা বলে পরিচয় দেয় ...

রিমি হেসে উঠে বলেছে, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেব।

নিশ্চিন্ত হয়েছে কল্যাণী। মনে মনে বলেছে, রিমি তেমন মেয়েই নয়।

—কল্যাণীদি, আপনার ফোন।

আবার কে একজন ডেকে দিল। যাবে কি যাবে না এক মুহূর্ত ভেবে নিল কল্যাণী, ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে, তবু না গিয়েও উপায় নেই। কি ভাববে সকলে।

ফোনটা ধরতে যাচ্ছিল, ও প্রান্তে বসা দুটি মেয়ের একজন বলে উঠল, বাবা, এত ফোন তো আমাদের কারও আসে না।

কথাটা গিলে ফেলার জন্যে মুখে হাসি আনতে হল।

—কে বলছেন ?

গলার স্বর একটু কঠিন করল।

উত্তর এল, আমি পরিতোষ বলছি, একবার যাব আপনার অফিসে, একটা কথা ছিল।

বিব্রত বোধ করল কল্যাণী।

বলে উঠল, অফিসে ? না, না, না। কি দরকার ?

পরিতোষ বললে, গিয়েই বলব।

উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করল কল্যাণী। বলে কি ! এই অফিসে এসে দেখা করবে ? সুবিমলের কথা বলবে হয়তো কিছু, আর অফিসসুদ্ধ লোক শুনবে। তারপর আর এ অফিসে কাজ করতে পারবে নাকি ও ! সেদিন বাসের মধ্যেই এমনভাবে জোরে জোরে বলছিল, বাসসুদ্ধ লোক তাকাচ্ছিল ওর দিকে।

কল্যাণী বলে উঠল, না না, অফিসে নয়।

—তবে ? বাড়িতে যাব ?

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে কল্যাণী বললে, হ্যাঁ তাই। কিন্তু কেন ?

—গিয়ে বলব, গিয়ে বলব।

কল্যাণী কি যেন ভাবল। বাসন্তীর মা কখন আসে। রিমি কখন ফেরে স্কুল থেকে।

বললে, বুধবার বিকেলে, চারটের আগে। তার পরে আসবেন না।

কারণ মা ঘুম থেকে উঠে পড়ে। কাজের মেয়েটা আসে। রিমি ফিরে আসে।

কি একটা অজুহাত দিয়ে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসেছিল।

বেশ বুঝতে পারছিল, সুবিমলই ওকে পাঠাচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই রাজি হতে হল। অন্তত অফিসের কেউ তো জানতে পারবে না। আর ছোটমামার কথামতো সুবিমলের খবরাখবরও নিতে পারবে।

এসেছিল পরিতোষ। কনকনলিনী আগেই শুনেছিলেন কল্যাণীর কাছে, বললেন, যা না, শুনেই আয় কি বলতে চায়।

দরজার পরদা ফেলাই ছিল, যাতে ঠিকে কাজের মেয়ে বাসন্তীর মা এলে দেখতে না পায়।

পরিতোষের সঙ্গে কথা বলছিল, সুবিমল কি বলেছে, একবার মেয়েকে দেখতে চায়, ওরও তো একটা কর্তব্য আছে মেয়ের প্রতি ...

ঠিক সেই সময়েই রিমি ফিরে এল, পরদা সরিয়ে উঁকি দিল, আর যেহেতু রিমিকে আড়ালে রাখতে চাইছিল, কিংবা সুবিমল সম্পর্কে কথা হচ্ছিল বলেই ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে গেল কল্যাণী।

কোনওক্রমে পরিতোষকে বিদায় দিয়ে যেন বাঁচে। বিদায় দেবার সময় বললে, শান্তিতে থাকতে দিন আমাকে, অশান্তি চাই না।

বাবা মারা গেল। ছোটমামা বললে, আর নয়, এখনও অক্ষয়বাবু আছেন, এরপর উকিলের জন্যে ছুটে বেড়াতে হবে।

কল্যাণীও সায় দিল, তবে তাই।

বিপক্ষের উকিল অক্ষয়বাবুকে বললে, মিউচুয়াল করে নিন, স্ক্যান্ডাল বাড়িয়ে আর কি হবে।

ডিভোর্স হয়ে গেল।

বাড়তি চাপ দেওয়ার জন্য অক্ষয়বাবু অ্যালিমনির অঙ্কটা এমনই বড়সড় করেছিলেন, যা দেখে সুবিমল ভয় পেয়ে যাবে।

কল্যাণী অবশ্য বলেছিল, ওর টাকা আমার ছুঁতেও ঘেন্না, নিজেও ছোঁব না, রিমিকেও

ছুঁতে দেব না।

অক্ষয়কাকা হেসে বললেন, সে তো পরের কথা, এখন ওকে একটু ভড়কে দেবার জন্যে এসব করা দরকার। তুমি অমত কোরো না, সই করে দাও।

সই করে দিয়েছিল কল্যাণী। ভেবে রেখেছিল, যদি দিতে আসে... মুখের ওপর ছুড়ে মারবে। বলেছিল, অমন একটা লোকের টাকা নিলে রিমির অমঙ্গল হবে।

দু'পক্ষের উকিল মিলে একটা মিউচুয়েল সেটেলমেন্টে এল।

টাকা তো নিতেই চায়নি কল্যাণী, অক্ষয়বাবু অ্যালিমনির দাবি ছেড়ে দিতেই ডিভোর্সটা সহজ হয়ে গেল। রিমিকে নিয়ে যেটুকু ভয় ছিল, শর্ত হিসেবে সে দাবি তুলতেই পারল না সুবিমল।

মনের মধ্যে যেটুকু আতঙ্ক ছিল তাও দূর হয়ে গেল। রিমি এখন আমার, আমার। কল্যাণীর বিরুদ্ধে মিথ্যে চারিত্রিক অপবাদ দিয়ে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টাও করতে পারবে না।

পুরুষদের হাতে ওই একটাই অস্ত্র। চরিত্র খারাপ বলেই তাড়িয়ে দিয়েছি। কিংবা চরিত্র খারাপ বলেই ছেড়ে চলে গেছে। এক দলা কাদা ছুড়ে দাও, কিছুটা লেগে থাকবেই। মেয়েরাই বলবে, সন্দেহ করবে।

কিন্তু তার পর থেকে রিমিকেই ভয় পেতে শুরু করেছিল কল্যাণী। 'একবারটি শুধু দেখতে চাই।'

ওই কথাটা শোনার পর ওর মনে হয়েছে এর মধ্যে সুবিমলের নিশ্চয় কোনও ছল-চাতুরি আছে। কল্যাণীকে নিঃস্ব করার চেষ্টা। যে কোনও উপায়ে রিমির ভালবাসা আদায় করতে পারলেই ওই লোকটা আবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। আইনের পথে যা পারবে না, কপট অভিনয় দিয়ে তা করতে চায়। কল্যাণীকে নিঃস্ব করে দিতে চায়।

ভয় শুধু সুবিমলকে নয়, ভয় নিজেকেও। কারণ, এখন আর তার ওপর কোনও রাগ বা বিদ্বেষ নেই। স্মৃতিই অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

তবু, এক এক সময় রিমিকে একটা পরম সম্পদ বলে মনে হয়। ও বিশ্বাস করে না, যে বাপ তার মেয়েকে দেখার জন্যে এত বছর কোনও আগ্রহ দেখায়নি, খোঁজ নেয়নি সে কেমন আছে, আজ হঠাৎ তার আগ্রহ হবে কেন। এটা নিশ্চয় ওব কোনও চাল।

অবশ্য এক এক সময় মনে হয়, হতেও তো পারে। হয়তো অনুশোচনা। যৌবনের সেই উত্তেজনা হারিয়ে গেলে কোনও কোনও মানুষ তো অনুতাপে দগ্ধ হয়। কেউ কেউ সাধুসন্ন্যাসীও হয়ে যায়।

বড় লোভ হয়, রিমির জন্যে অন্তত সুবিমল তার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ুক। তা হলে ক্ষমা করে দেবে ও। তার চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কি আছে।

লোকচক্ষে এই যে এতকাল হেয় হয়ে থাকা, তারা দেখুক, সেই মানুষটা তার কাছেই আজ কৃপাপ্রার্থী। শান্তি খুঁজতে তার কাছেই আসতে চায়।

সে জন্যেই বড় ভয় ওর নিজেকে।

পরিতোষ দেখা করতে এসে বলেছিল, সে এখন অন্য মানুষ ; মাঝে মাঝেই দুঃখ করে। ভুল স্বীকার করে।

পরিতোষ বলেছিল, আসলে রিমিকে দেখতে চায় বলেছে, কিন্তু শুধুই কি রিমিকে !

শুনে মুহূর্তের জন্যে ওর বুকের ভেতরটা কেমন নরম হয়ে গিয়েছিল।

আর তখনই পরদা সরিয়ে উঁকি দিল রিমি।

অপ্রতিভ ভাব কাটিয়ে নিমেষের মধ্যে কঠিন হয়ে গিয়েছিল কল্যাণী।

বলে উঠেছিল, আপনি এখন যান, এখন যান।

উঠে পড়েছিল।

আর পরিতোষকে বিদায় জানাবার সময় বলেছিল, আমি আর কোনও অশান্তি চাই না। আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন।

রিমি এখন কলেজে পড়ে, বেশ বড় হয়ে গেছে।

মা মেয়ে এখন অনেক কথাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। এখন তো আর কোনও ভয় নেই। দুদিন বাদেই রিমির বিয়ে দিতে হবে। ব্যস, তারপর কল্যাণী নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত এবং একা। কনকনলিনী আর ক'দিনই বা বাঁচবেন!

কল্যাণী হঠাৎ বলে ফেলল, আচ্ছা রিমি, তোর বাবা যদি হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয়!

রিমি ক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠল, 'বাবা' 'বাবা' বল কেন তুমি। যদি আসেও কোনওদিন, আমার কাছে সে শুধুই একটা লোক। একটা অচেনা লোক।

একটু থেমে বললে, একটা খারাপ লোক।

কল্যাণী কোনও কথা বলল না, চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কল্যাণী বললে, ঠিকই বলেছিস, একটা লোক।

আরও কিছুক্ষণ পরে বললে, আমার কাছেও।

## পাঁচ

নিউ মার্কেটের ভেতরে এই ছোট্ট রেস্তোরাঁটা বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। সবচেয়ে লোভনীয় এর নির্জনতা। প্রায় সময়ে কোনও খদ্দেরই থাকে না। শীতের দুপুরে এর চেয়ে উপাদেয় আর কি থাকতে পারে।

এই রেস্তোরাঁর খবর সুবিমল জানতই না। রঞ্জনাই ওকে নিয়ে এল।

বলেছিল, চলো কোথাও একটু বসে কফি খাওয়া যাক।

—চলো। মুখে বলল সুবিমল, কিন্তু ঠিক কোথায় যাওয়া যায় ভাবছিল। রাস্তার ওপারে কয়েকটা রেস্তোরাঁ আছে, কিন্তু সেগুলোয় সব সময়েই ভিড় উপচে পড়ছে।

অফিস থেকে একদিন পরিতোষকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। কেনাকাটা সেরে বললে, চল পরিতোষ, একটু চা খেয়ে নিই।

তারপর যেখানেই যায়, ভিড় ভিড়, একটাও চেয়ার খালি নেই। শেষ অবধি কি আর করে, দাঁড়িয়ে রইল। অপেক্ষা করল। চেয়ার দখল করতে হলে তক্কে তক্কে থাকতে হবে, যেই দু'জন বিল মিটিয়ে উঠবে অমনি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কারণ আরও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে।

সুবিমলের মুখের ভাব দেখলে তখন মনে হত বিরাট একটা সমস্যার সম্মুখীন।

এতকাল পরে হঠাৎ রঞ্জনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, গঙ্গার ধারে নয়, বোটানিকসে নয়। লেকের পাড়ে নয়। নিউ মার্কেটের জনস্রোতের মধ্যে। স্থির হয়ে দাঁড়াবারও উপায় নেই, কাউকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে, কখনও রঞ্জনার কথার জবাব দেবার জন্যে কাছে আসতে হচ্ছে।

অথচ জানে, ওপারে গিয়ে কোথাও কফি খাওয়ার জায়গাও পাবে না। ভিতরে ভিতরে যা, তার চেয়েও বেশি চাইছিল নির্জনতা। যা পাওয়ার উপায়ও নেই।

রঞ্জনাই সুরাহা করে দিল। বললে, এদিকে এদিকে।

বলে পা বাড়াল মার্কেটের ভিতরের দিকে।

মার্কেটের ভিতরে এমন যে একটা সুন্দর চা-কফি খাওয়ার জায়গা আছে জানতই না।

একটু আগে ঝিরঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাইরের বাতাস, সে জন্যেই মার্কেটের ভিতরটা বেশ সুস্বাদ। রেস্তোরাঁর ভিতরটায় রীতিমতো উষ্ণ আমেজ। তা না হলে মার্কেটে ঢোকাই দায়। ঘামতে ঘামতে কি করে যে লোকে জিনিসপত্তর কেনে।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে সুবিমল অভিভূতভাবে বললে, বাঃ, কি করে আবিষ্কার করলে এমন একটা সুন্দর জায়গা ?

দু'চোখে উজ্জ্বল হাসি ছিটিয়ে সুবিমলের চোখের দিকে তাকাল।— আবিষ্কার ? পেনিসিলিন না কলম্বাসের আমেরিকা ?

হাসতে হাসতে বললে, এ তো সবাই জানে।

যেভাবে পথ চিনে চিনে এল এখানে, যেভাবে ঢুকল এবং চেয়ার টেনে নিয়ে বসল অতি অবহেলায়, সুবিমলের মনে হল হয়তো প্রায়ই আসে। কার সঙ্গে আসে ? ঈষৎ সন্দেহের দোলা দিয়ে গেল মনের মধ্যে। আসুক না, যার সঙ্গে খুশি আসুক। আমি তো আর নতুন করে প্রেমে পড়তে যাচ্ছি না। কলেজের দিনগুলো চুকেবুকে গেছে, একটা ক্ষীণ স্মৃতি ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যা মুছে না গেলেও ক্ষতি নেই, মুছে গেলেই বা ক্ষতি কি।

কিন্তু এই যে হঠাৎ দেখা হওয়া, এই আকস্মিকতাই যেন আবার একটা উন্মাদনা জাগিয়ে তুলছে। একটা রোমাঞ্চ।

মনটা দারুণ খুশি হয়ে উঠল সুবিমলের, যা খুঁজছিল সেই নির্জনতা পেয়ে। এক কোণে এক জোড়া অল্পবয়েসী কিশোর-কিশোরী অনর্গল কথার মধ্যে ডুবে গেছে। ওদের দিকে তারা ফিরেও তাকাল না।

রঞ্জনা প্লাস্টিকের প্যাকেট পাশে রেখে বাঁ হাতের দুটো আঙুল দেখাল দূরে দাঁড়ানো বয়কে।—কফি। হট।

সুবিমল রেস্তোরাঁর চারপাশে চোখে বুলিয়ে বললে, দারুণ। চার্মিং।

রঞ্জনা স্মিতহাস হয়ে বললে, মোটেই না। আমি সঙ্গে আছি বলে তোমার এত সুন্দর লাগছে। চার্মড হবার মতো কেউ কাছে থাকলে, তবেই না চার্মিং !

একটা মৃদু সুগন্ধ অনেকক্ষণ থেকেই পাচ্ছিল সুবিমল, রঞ্জনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় থেকেই। কিন্তু এত বিমুগ্ধ হয়ে ছিল এতক্ষণ যে, খেয়ালই হয়নি ওটা কোনও সেন্টের গন্ধ, রঞ্জনা ব্যবহার করেছে।

বললে, তোমার সেন্টের গন্ধটা খুব মিষ্টি।

—আরে ধুস, ওটা তো আমার গায়ের গন্ধ।

দু'জনেই হেসে উঠল।

এ মেয়েকে যতই ভাল লাগুক, যতই প্রেমে পড়ে যাও, কিছুতেই তা বোঝাতে পারবে না। মুখ ফুটে বলতে পারবে না। কারণ সেটা একেবারেই বেমানান ঠেকবে।

এগোতে সাহসও হয় না, যেমন কলেজ-জীবনে ওরা তিন বন্ধু—নীলাদ্রি, অরুণ আর সুবিমল এক পা এগিয়েছে তো দু পা পিছিয়ে এসেছে। কখন কার কাছে একজনের ক্ষণিক দুর্বলতার কথা ফাঁস করে দেবে তার ঠিক নেই।

একদিন হো হো করে হাসতে হাসতে বললে, সেদিন নীলাদ্রি না ভিক্টোরিয়ায় ফুচকা খেতে গেলাম, খুব বৃষ্টি তোরা আসিসনি...

নীলাদ্রির দিকে ফিরে চোখে রহস্য নিয়ে বললে, কি রে রেগে যাবি না তো ?

নীলাদ্রি হেসে ফেলে বললে, স্বচ্ছন্দে। ওদেরটাও বলতে হবে কিন্তু।

রঞ্জনা হাসতে হাসতে বললে, দুজনে ফুচকা-টুচকা তো খেলাম, তারপর নীলাদ্রি কেবল

বলছে, প্ল্যানেটেরিয়াম তো দেখিনি কোনওদিন, চল না দেখে আসি।

আমি বললাম, ওই তো চোখের সামনেই, দেখ না যত খুশি।

—ও কি বলল জানিস ? 'না না, ভেতরে, ভেতরে গিয়ে।'

বলেই শব্দ করে হেসে উঠেছিল রঞ্জনা। ওরা দুজন তো বটেই, প্রথমে মুখ কাঁচুমাচু করে থেকে, শেষে নীলাদ্রিও।

সেই রঞ্জনাকে মুখ ফুটে বলা যায় নাকি, বলা যায় যে তোমার জন্যে আমার বুকের ভেতরটা কেমন কুরকুর করছে।

তাই সুবিমল অন্য পথে গেল। বললে, একটা দ্বীপ আবিষ্কার করেছ সত্যি, কিন্তু কাকে নিয়ে আসো এখানে !

—আরে ধুর, কত লোককে তো নিয়ে এসেছি, অফিসের কয়েকজনকেও। কিন্তু কেউ পোষ মানে না, ফুরুত ফুরুত করে উড়ে পালায়।

সুবিমল বললে, সেটা তোমার দোষ, তুমি সব সময়ে নিজেকে রহস্যময়ী করে রাখবে, কার এত বুকের পাটা যে বলে ফেলবে 'আই লাভ ইউ'।

অবাক হওয়ার ভান করে সুবিমলের চোখে চোখ রেখে তাকাল রঞ্জনা।

বললে, প্রেমে পড়তে বুকের পাটা লাগে নাকি ? ভাল লাগবে, তারপর স্রেফ প্রেমে পড়ে যাবে, দ্যাটস অল। অত ভাবনাচিন্তা করে, সাহস সঞ্চয় করে কি প্রেম হয় নাকি।

হাসতে হাসতে বললে, আসলে ব্যাপার কি জান, আজকাল কেউ প্রেমে পড়ে না। সবাই বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে, যে বাসে খালি সিট পায় সেটাতেই উঠে পড়ে।

সুবিমল হেসে ফেলেছিল ওর কথায়।

আর রঞ্জনা চটপট ওর ব্যাগ থেকে একটা চটি আকারের ডায়েরি কিংবা টেলিফোন-নম্বর লেখার বই বের করে বললে, তোমার অফিসের ঠিকানা বলো, ফোন নম্বর।

সুবিমল ভাবল, যাক বাবা, বাড়ির ঠিকানা চায়নি। কোনওদিন বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে কি বলবে কল্যাণীকে। কলেজে আমাদের এক বন্ধু ছিল, রঞ্জনা। আমার, নীলাদ্রির, অরুণের বন্ধু। এ কথা বলা সহজ ছিল বলেই হাসির ছলে কিছু কিছু পুরনো দিনের কথা বলেছে।

বিয়ের পরে পরেই, একদিন ওরা তিন বন্ধু বাড়িতে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, তখনও যোগাযোগ রাখত ওরা, এখন সব দূরে দূরে, মুড়ি তেলেভাজার আড্ডা, কল্যাণীও এসে বসেছে, রঞ্জনার কথা উঠল, কে তুলেছিল মনে নেই, তিনজনই বলেছিল, মেয়েটা খুব লাইভলি ছিল কিন্তু।

কি বলত সে, কি না বলত তার দু-চারটে নমুনাও পেশ করেছিল।

শুনতে শুনতে কল্যাণীও হাসছিল। হাসতে হাসতে বললে, কি আশ্চর্য, আপনারা তিন তিনটে বীরপুরুষ, একজনও গেঁথে তুলতে পারলেন না !

সুবিমল হেসে বললে, আমার কথা অন্য, ওদের বলো। ঈশ্বর তোমাকে আমার জন্য ঠিক করে রেখেছিল, তা না হলে কে পার করত তোমাকে।

কল্যাণী হেসে বলেছে, পাত্তা পাওনি সে কথাই বল। ও যা মেয়ে, শুনে যা বুঝছি, তোমাকে পাত্তা দিত না।

নীলাদ্রি বললে, সত্যি কথা বলব ? আমাদের মধ্যে ওকেই বরং একটু পাত্তা দিত।

সুবিমল বললে, উঁহু, অরুণকে। কি একটা বই চাইতে ওর বাড়ি চলে গিয়েছিল মনে নেই ?

কল্যাণী বলে উঠেছিল, বাপ রে, কি জেলাসি, আজও মনে রেখেছে !

অরুণ বলেছে, আসলে নীলাদ্রিকে একটু প্রশ্রয় দিত। ব্যাটার সাহসই হল না। কই বাবা, আমাদের তো কোনওদিন ভিক্টোরিয়ায় ফুচকা খেতে একা একা নিয়ে যায়নি।

ওরা চারজনই হেসে উঠেছিল অরুণের কথায়। এর সবই ছিল মুড়ি-তেলেভাজা খাওয়া আড্ডার নির্দোষ হাস্যপরিহাস। নিরাবয়ব একটি মেয়ে, যার নাম রঞ্জনা।

'তার সঙ্গে নিউ মার্কেটে হঠাৎ দেখা হয়ে-যাওয়া রঞ্জনার অনেক তফাত।

আজ কি বাড়ি ফিরে বলা যাবে নাকি, যে নিউ মার্কেটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রঞ্জনার সঙ্গে। বললেই বিপত্তি।

সেদিনের আড্ডা রঞ্জনা প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে মোড় নেবার আগে কল্যাণী বলেছিল, ইস্, মেয়েটাকে এত দেখতে ইচ্ছে করছে।

তারপর হেসে বলেছে, আপনারা সবাই অপদার্থ।

মুশকিল এই, আজ এতদিন বাদে দেখা হওয়ার পর ছবিটা একেবারে বদলে গেছে।

অনেক বছর বাদে দেখা হল বলেই কি রঞ্জনা ওকে আগের মতো 'তুই' না বলে 'তুমি' বলে ফেলল। কই, আর তো একবারও 'তুই' বলল না। হয়তো ভুলেই গেছে। এমন তো প্রায়ই হয়। কলেজের বন্ধুদের কোনও একজনকে হয়তো 'তুমি' বলত, অনেক বছর বাদে সমস্যায় পড়তে হয়, স্রেফ 'আপনি' হয়ে যায় সে। আবার যাকে 'আপনি' বলত, পরে দেখা হলে এতই চেনা লাগে যে 'তুমি' বলে ফেলে।

কিন্তু রঞ্জনার তো সবই মনে আছে, তা হলে ? হয়তো বয়েস। কলেজ ছাড়ার পর পাঁচটা বছরে কত পরিণত হয়ে যায় মানুষ, পনেরোটা বছর এগিয়ে যায়। অনেকের তখন আর সেই ছেলেমানুষি স্বভাব থাকে না।

সুবিমলের মনে হল ওর নিজের চেহারাই হয়তো তার জন্য দায়ী। বেশ খানিকটা মোটা হয়েছে, চুল কাটার সেলুনে গিয়ে চুল নিয়ে আর তেমন কায়দা করতে ইচ্ছে হয় না, সব চেয়ে বড় পরিবর্তন এনেছে বোধ করি চাকরি আর সংসার। সংসার মানে শুধুই কল্যাণী আর মা, ছোট বোন। বাবা মারা গিয়ে এখন সব দায়িত্ব ওর ঘাড়ে।

তখন ওর চেহারায় একটা স্টুডেন্ট ছাপ ছিল, এখন নগণ্য উচ্চ কেরানি।

এই চেহারাই ওকে 'তুমি' বলিয়েছে। ইচ্ছাকৃত নয়। এ নিয়ে স্বপ্ন গড়ে তোলা অর্থহীন। তবু বুঝতে পারছে ওর বুকের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ খেলা করছে।

লোভ কি ? শুধুই লোভ !

খুব সাবধানতার সঙ্গে কথা বলছিল সুবিমল, মুখ ফসকে না 'তুই' বেরিয়ে যায়।

মুহূর্তের জন্য মনে হল রঞ্জনা যদি আরও মোটা হয়ে যেত, দেখতে এত সুন্দর লাগত না, প্রায় অপরিচিত ঠেকত, আর তখন সুবিমল হয়তো 'আপনি' বলে বসত।

ওর সেই ক্ষুদে নোটবুক-এ অফিসের নাম ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লিখে নিল রঞ্জনা।

—আর তোমারটা ?

এদিক ওদিক তাকিয়ে কাগজ খুঁজল সুবিমল, পেল না। দূরে এককোণে একজোড়া কিশোর-কিশোরী গল্প করছে ! হাসছে, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে। দেখল মেয়েটির সামনে বই খাতা।

হেসে বললে, একটা কাগজ চেয়ে আনব ?

—এই না। ওরা প্রেমে মশগুল হয়ে আছে, ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ো না।

অপ্রতিভভাবে সুবিমল বললে, তা হলে কোথায় লিখে নেব ?

রঞ্জনার সুডোল সুন্দর হাতখানা, হাতের তর্জনী এগিয়ে এল ওর দিকে। ওর বুকে তর্জনী ঠেকিয়ে বললে, এইখানে। বুকের মধ্যে টুকে নাও।

আঙুলটা এসে বুকের যেখানটায় ছুঁয়েছিল, সারা রাস্তা সে জায়গাটা কেমন শিরশির করছিল। যেন এখনও ছুঁয়ে আছে। অথচ কলেজ জীবনে কত ধাক্কাধাক্কি কত ছোঁয়াছুঁয়ি, অথচ সেগুলো তেমন রোমাঞ্চ দেয়নি। কারণ তার অংশীদার ছিল নীলাদ্রি আর অরুণও। এই স্পর্শ কিন্তু সুবিমলের একার। একার এবং নিজস্ব।

পরিতোষ অফিসের বন্ধু। বুকের ভেতরটা গুনগুন করছিল। গতকালের ঘটনা ওর সারা শরীরে ময়ূরপেখম বুলিয়ে দিয়ে গেছে। অনেকখানি স্বপ্ন আর আশা। পরিতোষকে ডেকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু এ সব কথা গোপন রাখার মধ্যেই যেন আরও আনন্দ।

শুধু একটা অপরাধবোধ ফাঁকে ফাঁকে কাঁটার মতো বিঁধছিল বুকে। রঞ্জনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ও বিশ্বভুবন ভুলে গিয়েছিল। কি অন্যায়, কি অন্যায়। মনেই পড়েনি কল্যাণীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে চেক আপ করানোর জন্য ওর যাওয়ার কথা ছিল।

কল্যাণীও তো ওর সারা গায়ে রং মাখিয়ে দিয়েছিল একদিন। রামধনুর রং। ভরিয়ে দিয়েছিল ওর সকল শূন্যতা। কলেজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর রঞ্জনা হারিয়ে গিয়েছিল। ওর ধারণা, প্রেম ছিল না, ভালবাসা ছিল না। কিন্তু কি একটা অদ্ভুত টান ছিল, দুর্বোধ্য একটা নেশা। যত দূরে সরে এসেছে, ততই কাছে যাবার জন্য ছটফট করেছে মনে মনে। অথচ উপায় নেই।

চতুর্দিকে ছিটকে যাবার আগে ছোট্ট একটা গেট টুগেদার করেছিল ওরা।

একটা মেয়েদের হস্টেলে থাকত রঞ্জনা। বাবা আর দাদা জামশেদপুরে। মা নেই। এইটুকুই জানত।

—কোথায় যাবি এখন, ঠিকানাটা দে। সুবিমল বলেছিল।

রঞ্জনা হেসে উঠে বললে, দু-দুটো বছর সময় দিলাম, সেই যেখানে ছিলি সেখানেই রয়ে গেলি। এখন আর ঠিকানা নিয়ে কি হবে।

নীলাদ্রি বলেছিল, তবু দে না ঠিকানাটা, দুম্ করে একদিন চলে যাব জামশেদপুর।

অরুণ বলেছিল, চিঠি তো লিখতে পারব।

সুবিমল আর কিছু বলেনি, রঞ্জনাও ঠিকানা দেয়নি। ডেড লেটার অফিসের চিঠির মতো সুবিমল তারপর বেঠিকানা ঘুরেই বেড়িয়েছে। শেষে পৌঁছে গেছে কল্যাণীর কাছে। ভালবাসা, প্রেম না কর্তব্য, কিছুই জানে না। শুধু মনে হয়েছে একটা জ্বালা-জুড়োনো প্রলেপের মতো।

সেই কল্যাণীর গর্ভে ওর সন্তান, তিলে তিলে বড় হচ্ছে। তার মধ্যেও একটা অদ্ভুত মোহ আছে। একটা শিশু আর কয়েক মাস পরেই ওকে 'বাবা' বলবে। বাবা, বাবা। একটা রোমাঞ্চময় পরিচয়।

অথচ কল্যাণীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ও বেবাক ভুলে গেল। এক সপ্তাহ আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিল। সকালে অফিসে বেরোনোর সময় কল্যাণী মনে পড়িয়েও দিয়েছিল।

অফিসে বসে সে কথা ভাবতে ভাবতে একদিকে অনুশোচনা হচ্ছিল, আবার এক সময় নিজের ওপরই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে ভাবলে, জীবনটা কি শুধু কর্তব্য নাকি ? এই পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধও তো আমার প্রাপ্য।

কল্যাণীকে ডাক্তার দেখিয়ে আসার পর অপরাধবোধ চলে গিয়েছিল। প্রতিদিনই ইচ্ছে হত রঞ্জনার অফিসে একবার টেলিফোন করার। অফিসের নামটাই মনে আছে, ডিপার্টমেন্ট ভুলে গেছে। টেলিফোন নম্বর তখনই ভুলেছিল।

রঞ্জনা কি ওকে পরীক্ষা করতে চায়, মনে রেখেছে কি না। তা না হলে ওর ওই ছোট্ট নোটবুকের একটা পাতা ছিঁড়ে দিতে পারত।

সে কথা বলার সুযোগও পায়নি সুবিমল। তার আগেই ও বলে ফেলেছে, কতগুলো ফোন নম্বর লেখা আছে ওখানে ?

—অনেক। একটা লালবাজার।

আঁতকে ওঠার ভান করেছে সুবিমল। —পুলিশ ! বাপ রে।

ভেবেছিল, অফিসের নাম যখন মনে আছে, খুঁজে বের করা অসুবিধে হবে না। অপারেটর যদি বলতে নাও পারে, একদিন সটান চলে যাবে।

যেতে হল না।

সুবিমল মাথা নিচু করে একটা ফাইলের ওপর মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছিল। নোট দিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরত পাঠাতে হবে।

ঠক ঠক ঠক।

টেবিলের ওপর কেউ কাচের গ্লাসটা দিয়ে তিনবার ঠক ঠক ঠক করল।

চমকে চোখ তুলল সুবিমল। চোখ তুলতেই আরও বড় চমক।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল সুবিমল। —আরে তুমি !

অবাক হয়েছিল বলেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। যেন বড়সাহেব ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এত সমীহ করে উঠে দাঁড়ানোর কথা নয় বুঝতে পেরেই বসে পড়ল। বললে, বসো বসো।

তবু বসল না রঞ্জনা। মুখেচোখে কেমন কপট ক্রোধ।

এই শরীরটা চিরকাল সুবিমলকে লোভ দেখিয়ে এসেছে। ও চেয়ারে বসে পড়েছে, আর রঞ্জনার দীর্ঘ শরীর ও প্রান্তে। চোখের দৃষ্টি টেবিলের সমতল থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে রঞ্জনার মুখে এবং শেষে চোখে চোখ রাখার আগেই রঞ্জনার লোভনীয় শরীরটাকে চেখে নিল। ওর বুকের ভেতর থেকে যেন দুখানা অদৃশ্য হাত বেরিয়ে এসে রঞ্জনার সমস্ত লুব্ধতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে চাইল। মেদমাংসের দেহ নয়, এক-একজন নারীর ত্বকের মধ্যে এমন জাদু থাকে যে হাত বুলিয়ে স্বাদ নিতে ইচ্ছে করে।

মাথার ভিতর কেমন ঝিমঝিম করে উঠল, কোনও ক্রমে বললে, বসো বসো।

রঞ্জনা বোধহয় বুঝতেও পারেনি এই নিমেষের চোখ বোলানোয় কি ঘটে গেছে সুবিমলের মস্তিষ্কে।

তেমনই কপট ক্রোধের মুখে রঞ্জনা বললে, এর নাম নাকি প্রেম !

অর্থাৎ সুবিমল তারপর আর যোগাযোগ করেনি কেন। একটা ফোনও তো করতে পারত।

সুবিমল এতক্ষণে হাসতে পারল। পরমুহূর্তেই আশপাশে তাকিয়ে দেখে নিল কেউ ওদের লক্ষ করছে কি না, অথবা কথাটা শুনেছে কি না।

এ কারণেই রঞ্জনাকে রহস্য মনে হয়।

যে কথাটা চাপা গলায় ফিসফিস করে বললে সারা শরীরে, বুকের গভীরে তোলপাড় ঘটে যাবার কথা, সেটাই ও এত অকপটে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, কে শুনছে না শুনছে পরোয়া না ক'রে, যে উক্তিটাকে কপট মনে করা ছাড়া উপায় থাকে না।

সুবিমল মৃদু হাসল ওর কথায়। বললে, বসো বসো।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রঞ্জনা, তারপর বললে, চটপট কাজ সেরে নিয়ে কেটে পড়ো।

রাস্তায় বেরিয়ে বললে, চলো তোমায় আজ ভিক্টোরিয়ায় ফুচকা খাওয়াব। বেচারি নীলাদ্রির ওপর তা হলে আর জেলাসি থাকবে না।

সুবিমল ক্রমশই সাহসী হতে চাইছিল। বলে বসল, ধুস, ফুচকা ? অন্য কিছু খেতে চাই।

—কি ? চুমু ? বলেই হো হো করে হেসে উঠল রঞ্জনা।

ঝট করে হাসি থামিয়ে, এই, নীলাদ্রির খবর কিছু জানো ? কোথায় আছে ? অরুণ ?

—নীলাদ্রি রাঁচিতে। চিরতা খাওয়া মুখ করে অরুণের খবরও বলল।

এ জন্যই রঞ্জনাকে চিরকাল রহস্যময়ী মনে হয়েছে। একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে এসে নিজেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে বোঝার উপায় থাকে না।

অনেক আশা নিয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু শেষ অবধি ফুচকা-টুচকা খেয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাঁচিলে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করে কাটিয়ে দিল রঞ্জনা। তারপর প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনে একটা কম ভিড়ের বাস পেয়ে ঝট করে উঠে পড়ে হাত নেড়ে দিল।

ব্যস, পৃথিবী ব্ল্যাঙ্ক। সুবিমল একা একা একা। ও অনুভব করতে পারছিল যে, রঞ্জনা ওকে গ্রাস করে ফেলছে। ওর সারা দেহ-মন-প্রাণ। এ এক অদ্ভুত নেশা যেন।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সুবিমলের মনে হল, কল্যাণী যেন হারিয়ে গেছে ওর জীবন থেকে। ওর বুকের মধ্যে কল্যাণীর জন্য একটুও জায়গা নেই। যা আছে, যেটুকু আছে, তা শুধুই কর্তব্য। তার অতিরিক্ত কিছুই নেই।

পরের দিন ও যা আশঙ্কা করেছিল তাই।

অফিসসুদ্ধ লোকের সামনে দিয়ে রঞ্জনার সঙ্গে ও বেরিয়ে গিয়েছিল, অফিস ছুটির বেশ কিছুটা আগেই। সকলেই লক্ষ করেছিল, কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেনি মেয়েটি কে। লক্ষ না করে উপায়ও ছিল না, কারণ রঞ্জনার চেহারায় হাবেভাবে এমন একটা চটক আছে, যা সচরাচর দেখা যায় না।

অফিসে আসতেই পরিতোষ ওর টেবিলে উঠে এল। —কি ব্রাদার, সিঙ্কিং সিঙ্কিং মনে হচ্ছে। বাড়িতে খবরটা পৌঁছে দেব নাকি।

সুবিমল হাসল। ও যদিও কল্যাণীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তবু পরিতোষের মতো বন্ধু বিশ্বাসঘাতক হতে পারবে না।

কিন্তু কল্যাণী কিছু সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

কিছুটা অপরাধবোধ থেকেই বোধহয় ও বাড়ি ফিরে কল্যাণীর সঙ্গে মুখোমুখি হতে চায়নি। যেন ওর মুখ দেখলেই কল্যাণী ওর ভিতর অবধি পড়ে ফেলবে। চোখোচোখি হতে ভয় বলেই এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে।

পরিতোষ ভুরু কাঁপিয়ে প্রশ্ন করল, মেয়েটি কে ?

—কে আবার। এত সন্দেহই বা কেন তোমার।

পরিতোষ বললে, দ্যাখো গুরু, বলে বসো না ও তোমার মাসতুতো বোন। যখন চলে গেলে, মনে হচ্ছিল যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছ।

সুবিমল বললে, ও সব কিছুই নয়। কলেজে একসঙ্গে পড়তাম। হঠাৎ দেখা হল সেদিন, তারপর...

—তোমার যে একটা জলজ্যান্ত বউ আছে সে-কথা জানে ?

সুবিমল হেসে বললে, হ্যাঁ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে চুপসে গেল।

মনে মনে ভাবলে, এরা কি আমাকে একটা স্কাউন্ড্রেল মনে করে !

প্রথম দিন নিউ মার্কেটে দেখা হওয়ার সময় ও এমন একটা রোমাঞ্চময় জগতে চলে গিয়েছিল যে 'বিয়ে করে ফেলেছি' বলে ফেলে স্বপ্নময় সময়টুকুকে বিস্বাদ করে তুলতে চায়নি। কিন্তু তারপরই ওর মনে হয়েছে, কথাটা বলে ফেলা উচিত ছিল। কারণ ওর মনে হয়েছিল, রঞ্জনার মনে সত্যি সত্যি ওর সম্পর্কে একটা দুর্বলতা আছে। ও নিজেই শুধু এতকাল বুঝতে পারেনি।

তাই ভিক্টোরিয়ায় যেদিন এল, হালকা পায়ে দুজনে হেঁটে চলেছে, স্বপ্নের ডিঙি নৌকোয় যেন এক একটা ঢেউ পার হচ্ছে, গাড়ি ভিড়, হর্ন, লোক লোক লোক, রঞ্জনা বললে, কলকাতা শহরটা জঘন্য জঘন্য, নিরিবিলি কেউ বসবে, প্রেমে ডুবে থাকবে, তাই না সুবিমল, দুটি হৃদয় এক হওয়ার কোনও জায়গা নেই।

সুবিমল স্মার্ট হবার চেষ্টা করে সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। বললে, এমনিতেই তো আমার আর এক উপদ্রব, শ্বশুরবাড়ির কেউ না দেখে ফেলে। বউ নিজে দেখলে তো কুরুক্ষেত্র।

—বিয়ে করেছ ? মৃদু হাসি দেখা দিল রঞ্জনার মুখে।

সন্ধে হয়ে এসেছে, আলো জ্বলেছে। একটা অস্পষ্ট আলো-আঁধারে চারপাশ সুন্দর হয়ে উঠেছে সব কুশ্রীতা ঢাকা পড়ে গিয়ে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শুভ্রতা আর রঙিন আলোর ঝরনায় পৃথিবী হঠাৎ যেন অপরূপ হয়ে উঠল।

—বিয়ে করেছ ? মৃদু হাসল রঞ্জনা।

পরমুহূর্তেই বলে উঠল, গ্র্যান্ড। জমবে তোমার সঙ্গে। হাসতে হাসতে বললে, আরে, অবৈধ না হলে সে প্রেম প্রেমই নয়।

বুক থেকে একটা বিশাল পাথর নেমে গেল। সুবিমলের শরীরে মনে তখন একটা আনন্দের ফোয়ারা।

আশান্বিত হয়ে সুবিমল বললে, কথাটা সত্যি। অবৈধ না হলে, পৃথিবীর সব সাহিত্যেই দেখো না, অবৈধ প্রেমই গভীরতা পেয়েছে।

নিজের বাহু দিয়ে সুবিমলের বাহুতে একটা জোর ধাক্কা দিল রঞ্জনা।—আধাবুড়ো লোকরা টিনএজ মেয়েদের এই সব বলে ফুসলে নিয়ে যায়। দুজনেই হেসে উঠল।

সুবিমল হাসি থামিয়ে বললে, তা বলে তুমি আমাকে এভাবে ধাক্কা দিলে। আরেকটু হলে তো পড়ে যেতাম।

—দ্যাখো সুবিমল মিথ্যে বলো না। তুমি তো আমাকে ছোঁয়ার জন্য কখন থেকে অস্থির হচ্ছ। তাই তোমাকে একটু স্পর্শ পেতে দিলাম। 'স্পর্শ' শব্দটা পরিহাসের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল।

সাহস পেয়ে সুবিমল ওর হাতটা ধরল। —তা হলে ভাল করেই স্পর্শ করি। ছুঁয়ে দেখি বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে।

কিন্তু হাসতে হাসতে রঞ্জনা হাত ছাড়িয়ে নিল।—তোমার বউ দেখে ফেলবে, বউ দেখে ফেলবে।

—দেখে দেখবে, আমি কারও পরোয়া করি না। প্রত্যেকটা মানুষের সুখী হবার অধিকার আছে।

—সত্যি ? ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে রঞ্জনা মুখোমুখি হল সুবিমলের। বললে, এত সাহস ছিল কোথায় এতদিন। কে জোগাল এ সাহস ?

সুবিমল বললে, তুমি।

রঞ্জনা বলে উঠল, না বাবা, আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ো না। দোষ দিয়ো না। একটা নিরপরাধ মেয়ের অভিশাপ কুড়োতে পারব না।

সুবিমল অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। রঞ্জনাও চুপচাপ হেঁটে চলেছে ধীর পায়ে।

—কি ভাবছ ?

—কিছু না। তুমি পাশে থাকলে আর কিছুই ভাবতে ইচ্ছে করে না।

সুবিমল বললে, কিন্তু সত্যিই ওর বুকের মধ্যে তখন একটা বিতৃষ্ণা, বিতৃষ্ণা। কল্যাণী সম্পর্কে। যেন একটা ফুল ছড়ানো পথ বেয়ে ও হেঁটে চলেছে, আর তার ফাঁকে ফাঁকে কল্যাণী কখন নিঃশব্দে গোপনে কাঁটা ছড়িয়ে রেখে গেছে।

—এত দেরি করলে আজ ? আমার এমন ভয় ভয় করছিল। বাড়ি ফিরতেই কল্যাণী বলল।

আবার একটা মিথ্যে অজুহাত দিতে বাধ্য করছে কল্যাণী। সারা শরীর কাঁটা হয়ে গেল। একটা ক্ষিপ্ত শজারু তার সারা গায়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলে কাঁটা ফুলিয়ে রাগে ফুঁসছে যেন। জবাব দিতেও ইচ্ছে হল না।

বেশ শান্ত গলায় কল্যাণী বললে, তোমার আগে তো কখনও এত দেরি হত না। কখন থেকে যে কেবল ঘর আর বার করছি। আজকাল রাস্তাঘাটে এত অ্যাকসিডেন্ট, দেরি হলেই ভয় করে।

—অ্যাকসিডেন্ট ! ঠাট্টার স্বরে বললে সুবিমল।

মনে মনে বললে, অ্যাকসিডেন্টই তো। আজ নয়। তোমাকে বিয়ে করাই আমার জীবনে একটা অ্যাকসিডেন্ট।

মুখ ফুটে সে-কথা বলতে ইচ্ছে হল না।

ওর শরীরটাই তখন বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে। মন পড়ে আছে রঞ্জনার কাছে।

পরের দিন অফিসে পরিতোষকে ও বলেই ফেলল।

ইংরিজি করে বললে, আই লাভ হার।

—লাভ ? ঠাট্টার সুর পরিতোষের গলায়। ঠাট্টার ছলেই বললে, একেবারে লাভ ! এল ও ভি ই ! চার অক্ষরের শব্দ !

## ছয়

কল্যাণী চিঠিটা পড়ে বিপর্যস্ত বোধ করল। ওর মনে হল এর পিছনে নিশ্চয় কোনও ছলচাতুরি আছে। ভয়ঙ্কর কোনও ক্ষতি করতে চায় সুবিমল। তার বা রিমির। হয়তো দু'জনেরই।

রিমি সদ্য এম এ-র গণ্ডি পার হয়েছে। চোখের সামনে রিমিকে বড় হতে দেখতে দেখতে ও নিজেও যে বুড়িয়ে এসেছে সেটা খেয়ালই হয়নি। আগে নিজের ওপর যে ভরসা ছিল, যে আত্মবিশ্বাস, এখন আর তা নেই। নিজের বিচারবুদ্ধির ওপরও সন্দেহ জাগে।

শুধু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারে না। সুবিমল কেন বারবার ওকে বিরক্ত এবং বিভ্রান্ত করতে চাইছে। এও কি সম্ভব নাকি ! যে মানুষটার রিমির ওপর কোনও মায়া-মমতাই ছিল না, কল্যাণীর ওপর তো নয়ই, সে ওদের শান্তির সংসারে আবার অশান্তি বয়ে আনতে চাইছে কেন।

রিমি যখন ক্লাস নাইনে, তখন একবার চেষ্টা করেছিল। অফিসে ফোন পেয়ে সে কি ভয় ! তারপর পরিতোষ। পরিতোষ বাড়িতে এসেও দেখা করেছে। বোঝানোর চেষ্টা করেছে কল্যাণীকে। 'একবারটি যদি আসেই সে, রিমিকে দেখতে, কি এমন ক্ষতি।'

কল্যাণী বিদ্রূপের হাসি হেসেছে। বলেছে, এতকাল যার নিজের মেয়ে সম্পর্কে কোনও

মায়া ছিল না, তার জন্যে হঠাৎ আজ প্রাণ উথলে ওঠার কারণ তো দেখছি না।

আসলে মনে মনে ভেবেছে, এর পিছনে কোনও প্যাঁচ-পয়জার আছে। নিশ্চয় রিমির কোনও ক্ষতি করতে চায়।

একদিন তো ডিভোর্সই হয়ে গেল। রিমির ওপর সব দাবি ছেড়ে দেওয়ার শর্ত মেনে নিতে হয়েছে সুবিমলকে। অ্যালিমনির টাকা দিতে হল না, উপরন্তু রঞ্জনাকে বিয়ে করে বৈধ স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার পথ প্রশস্ত হল তার। একটা খারাপ মেয়ে, যে অপরের সুখের সংসার নষ্ট করতে পিছুপা হয় না, তার আবার বৈধ স্ত্রী আর অবৈধ স্ত্রী।

ছোটমামা বলেছিল, ওরা বিয়েটিয়ে নিয়ে অতসব মাথা ঘামায় না। লিভ টুগেদার, বুঝলি না। ঠেকাবি কি করে। বড় জোর ওই গ্রাউন্ডে ডিভোর্স নিতে পারিস। তাও প্রমাণ করার ঝামেলা আছে।

সুবিমলের বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন কোনও একটা দোকানে দেখা হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, কি ভুল করলে বৌদি। দাদা রঞ্জনাকে বাড়িতে এনে তুলেছে।

জানার কোনও আগ্রহ ছিল না, তবু বললে, মা আপত্তি করেননি ?

—মার কথা শোনে কে। বাতে পঙ্গু, চোখে দেখে না।

ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। যে দুটো বছর কেঁদে-ককিয়ে টিকে ছিল ও, সে-সময় সবটুকু সমবেদনা ছিল কল্যাণীর ওপরই। ছিল বলেই, কল্যাণী টিকে থাকতে পেরেছিল। দু'বছরের রিমিকে নিয়ে ওরা তখনও মশগুল হত। রিমিকে দেখার জন্যে ওর মা একবার আসতেও চেয়েছিলেন। বোন একদিন এসেছিল, কনকনলিনী অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, দেখতে দেননি।

তখন কল্যাণীরও প্রচণ্ড রাগ। ওদের সকলের ওপর।

মাকে বলেছে, ঠিক করেছ।

ওরা কেউ যদি আবার এতদিন বাদে দেখতে আসতে চাইত, বলা যায় না, এখন কল্যাণী অনেক নরম হয়ে গেছে, কুড়িটা বছর তো কম নয়, হয়তো আপত্তি করত না। কিন্তু সুবিমলকে ও একটা দিনের জন্যেও দেখতে দিতে চায় না, রিমিকে। ওটাই ওর প্রতিশোধ। 'আমার একটা মেয়ে আছে. কিন্তু জীবনে তাকে দেখতে পাইনি' বলতে হবে তাকে। সবাই জানবে। জানেই তো। পরিতোষ জানে যখন, অফিসসুদ্ধ লোক জানে। পাড়াপড়শিরা আরও। একটি ছেলে বা মেয়ের বাবার কাছে এর চেয়ে বড় অপমান আর কি আছে।

কিন্তু হঠাৎ এই রিমির কুড়ি বছর বয়সে সুবিমলের কাছ থেকে এমন একখানা চিঠি পেয়ে কল্যাণী বিভ্রান্ত বোধ করল। কোনও কৌশল নয় তো ? রিমির বা তার ক্ষতি করার।

আবার সেই একই কথা। একবার দেখা করতে চাই। একবার শুধু রিমিকে দেখতে চাই।

এই কুড়ি বছরে কল্যাণী এমনই বদলে গেছে, এমন ভাবেই সুবিমলকে জীবন থেকে মুছে ফেলেছে, যে খামের ওপর লেখা ঠিকানাটা দেখে সুবিমলের হাতের লেখাও চিনতে পারেনি। লেটার বক্স থেকে চিঠিটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে ভেবেছে, এ আবার কার চিঠি ?

মুখখানা গম্ভীর হয়েই ছিল। হাত বাড়িয়ে মাকে দিল।

—কার চিঠি ? মা চোখে সোনা রঙের চশমা আঁটল।

—পড়েই দেখো না।

সত্যি কথা বলতে গেলে, কল্যাণীর মধ্যে এখন কোনও রাগ বিদ্বেষ তিক্ততা নেই।

আসলে ওর জীবনে সুবিমলই নেই।

—হুঁ।

চিঠি পড়ে ভাঁজ করে আবার খামের মধ্যে ভরে কল্যাণীকে ফেরত দিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, একটু ভাবতে হচ্ছে।

বিরক্তিতে ভুরু উঁচিয়ে কল্যাণী বললে, ভাববার কি আছে।

—রাখ এখন। ভেবে দেখি।

মা'র কথা শুনে হাসল কল্যাণী। মা কি সব কথা ভুলে গেছে নাকি। এখন আবার নতুন করে একটা সমস্যা সৃষ্টি করতে চায়!

একটা দিনের কথা মনে পড়ল।

ছুটির দিনেও বাড়িতে থাকত না সুবিমল। থাকলেও, একেবারে নিঃশব্দে, জানতেও পারত না। বড়জোর তার মা বা বোনের সঙ্গে দু'চারটে কথা।

সুবিমলের মা একদিন প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে বলো তো সুবুর।

কল্যাণী বললে, রোগে ধরেছে।

ও সেজন্যে সুবিমলের খোঁজখবর রাখাই ছেড়ে দিয়েছিল। রিমিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত। হঠাৎ কলিং বেল।

দোতলার বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, একটি মেয়ে।

রঞ্জনাকে ওপর থেকে দেখে ঠিক চিনতে পারেনি।

লক্ষ করলো, একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে।

ততক্ষণে দ্রুত শার্ট প্যান্ট পরে নিয়ে নীচে নেমে গেল সুবিমল।

ওপর থেকে কল্যাণী দেখতে পেল, সেই রঞ্জনা, মুখে হাসি, কিছুটা অনিচ্ছুক সুবিমলকে ট্যাক্সির মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। নিজেও উঠে পড়ল।

সেই রাতটা আর ফিরলই না সুবিমল।

আসলে কিছু ঘটছে, ঘটে চলেছে, তা কল্যাণী বুঝতে পারত। মেয়েদের সব সময় সব কিছু চোখে দেখতে হয় না।

কল্যাণীর ওপর সুবিমলের যে কোনও আকর্ষণ নেই, মন সরে গেছে, তা বুঝতেই পারত। দু'-একটা কথা কানেও এসেছে। তবু সেটা সন্দেহের মধ্যে আটকে ছিল।

পরের দিন কল্যাণীও কোনও প্রশ্ন করেনি। সুবিমল নিজের থেকেও কিছু বলেনি।

সুবিমলের মা কল্যাণীকে জিগ্যেস করতেই ঝাঁঝিয়ে উঠেছে। বলেছে, আপনারই তো ছেলে, জিগ্যেস করুন না।

বুঝতে পারছিল, বুঝতে পারছিল বলেই বুকের মধ্যে দহনজ্বালা।

হঠাৎ একদিন ঠিক করে ফেলল, আর নয়। এভাবে অপমান সহ্য করে, ও এ বাড়িতে টিকে থেকেছে শুধু বাবা-মা'র কথা ভেবে। বাবা-মা কষ্ট পাবে ভেবে।

কি ভাবেই বা বলবে বাবা-মাকে।

সন্দেহ এক জিনিস, আর নিজের শরীর-মন দিয়ে বুঝতে পারা আরেক জিনিস। সেটা কল্যাণী অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে।

ভেবেছিল, বাবা হয়তো বলে বসবে, তোর মিথ্যে সন্দেহ।

মা বলবে, আরও দু'দিন থেকেই দেখ না।

ওরা সে-কথা কেউ বলল না। বলে বসল, বেশ করেছিস।

মাস কয়েক পরেই পরিতোষ এসেছিল, নিজেই। সুবিমলকে না জানিয়েই।

বললে, চলে এলেন? ও তো তা'হলে আরও জাহান্নামে যাবে!

আগে কিছু বলেনি লোকটা, অথচ সবই জানত। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ওর ওপরেও।

বলে দিয়েছে, আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আর কোনওদিন আসবেন না দয়া করে।

কিন্তু এখন এ আবার কি উপদ্রব! তবু ভাল যে চিঠি লিখেছে, অফিসে ফোন করেনি। করলে, সে আর এক যন্ত্রণা।

কল্যাণী এতখানি বিচলিত হল, তার কারণ ও আর কিছুদিন শান্তি চাইছিল। তারপরই ও একেবারে মুক্তি পেয়ে যাবে। মুক্তি। তখন আর কেউ ওর ক্ষতি করতে পারবে না। না ওর, না রিমির।

ছোটমামা দু-একটা পাত্রের সন্ধান এনেছে।

কল্যাণীকে বলেছে, তোর কিছু চিন্তা নেই।

তবু চিন্তা থেকেই গেছে কল্যাণীর। ওর জন্যে ওর মেয়ের না কোনও ক্ষতি হয়। 'বাবা নেই'। কথাটা ছেলেবেলায় রিমিকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। ও জানে। এখন ওকেই তাড়া করছে। হয়তো ওই একটা কারণেই ভাল পাত্র জোগাড় করতে পারবে না। সবাই পিছিয়ে যাবে।

কল্যাণী কিছু গোপন করবে না, করতে চায় না। সব জেনেশুনে কে-ই বা আসবে।

ছেলেবেলা থেকে, পাহারা দিয়ে দিয়ে বড় করেছে। এখন মনে হয়, এতটা না করলেও চলত। হিয়া তো প্রেম করেই বিয়ে করে ফেলল, বেশ ভাল ছেলে। কই, ভুল তো করেনি।

দু'বছরের রিমিকে নিয়ে যখন চলে এসেছিল, তখন দুঃখে অপমানে অসহায় লাগলেও বুকে সাহস ছিল অনেক বেশি। লোকে ওর নামে অপবাদ দেবে? দিক্ না, ও পরোয়াই করে না সে-সবের।

এখন মাঝে মাঝেই ভয় করে।

ছোটমামা পাত্রের খোঁজ আনলেও, কল্যাণীকেই তারা সন্দেহ করবে না তো! ওর নামেই অপবাদ দেবে না তো! ওর চরিত্র নিয়ে! কাদা ছুড়ে দিলে মেয়েদের গায়েই লেগে থাকে। ওর সম্পর্কে পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন কি বলে বেড়িয়েছে তখন, ও তো কিছুই জানে না। ওই সুবিমলই হয়তো ওর ওপরে দোষ চাপিয়েছে। পুরুষরা কি ভাগ্য নিয়ে যে জন্মায়, জল থেকে উঠে এলে হাঁসের মতো, শুকনো খটখটে। ওদের সবই শেষ অবধি বৈধ হয়ে যায়।

একসময় ডিভোর্স করতে চায়নি। ভেবেছিল, প্রতিশোধ নেবে। ওই রঞ্জনার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলবে, ও তো একটা রক্ষিতা।

এখন সে-ই সুবিমলের বৈধ স্ত্রী।

ওর পরিচয়, ও স্বামী-পরিত্যক্তা। স্বামীকে ও-ই যে পরিত্যাগ করে চলে এসেছে, লম্পট চরিত্রহীন স্বামীকে, সে-কথা কেউ বলবে না। বরং সন্দেহ করবে, ওর চরিত্রেই কোনও গলদ ছিল।

সেই সন্দেহ যদি রিমির ক্ষতি করে, তার চেয়ে সাংঘাতিক কিছু নেই।

মা সেজন্যেই বোধহয় হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে বললে, ভেবে দেখি।

কল্যাণীকেও ভেবে দেখতে হচ্ছে।

মেয়ে বড় হলে একসময় বন্ধু হয়ে যায়। রিমি এখন কল্যাণীর বন্ধু হয়ে গেছে। একে একে সব কথাই ও বলেছে রিমিকে। দিনে দিনে, টুকরো টুকরো করে সব শুনিয়েছে।

—আমি সব জানতাম, সব জানতাম। কল্যাণী বলেছে, মাঝে মাঝেই দু' চার দিনের জন্যে উধাও হয়ে যেত। দূরে কোনও ডাকবাংলো, কি হোটেল-ফোটেলে। নষ্ট মেয়েদের নিয়ে যেখানে যায়।

—ব'লো না মা, আর ব'লো না। প্রায় কেঁদে ফেলেছিল রিমি। বলেছে, 'আমার বাবা' এ-কথা ব'লো না। ওই দুশ্চরিত্র লম্পট লোকটা আমার বাবা, ভাবতেও ঘেন্না। বড় কষ্ট হয় মা, কষ্ট হয়।

সেজন্যেই মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে হয়েছে রিমিকে। স্কুলে, কলেজে, বন্ধুদের সামনে। ওর মনে হয়েছে, সকলেই যেন ওকে নিয়ে বলা-কওয়া করছে।

তারপর একদিন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এভাবে গোপন ব্যথা লুকিয়ে রেখে লাভ কি। এতে যন্ত্রণা আরও বাড়ে। ব্যথা পেলে চিৎকার করলে হয়তো স্বস্তি মেলে, তাই কষ্ট পেলে রোগীরা যন্ত্রণায় চিৎকার করে।

রিমি হঠাৎ একদিন কলেজের এক বন্ধুকে বললে, আমার কথা সব জানিস ?

—না তো, কি কথা ?

—কিছু জানিস না ?

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল।

রিমি হেসে বললে, আমার বাবা নেই। মানে, মা বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছিল। একটা পাজি লোক, আর একজনকে আবার বিয়ে করে।

কাউকে বলেছে, আমার মা যে কি কষ্ট করে আমাকে মানুষ করেছে। তোদের বাবা আছে তোরা বুঝবি না।

আসলে বাবা থাকা যে কি, রিমি তাই জানে না।

এইভাবে বলতে বলতে হঠাৎ যেদিন সুপ্রীতিকে বললে, সুপ্রীতি অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে। —বাবাকে কোনওদিন দেখিসনি তুই ? অথচ বেঁচে আছেন ?

ঠোঁট উল্টে রিমি বললে, না, দেখিনি, দেখার ইচ্ছেও হয় না।

—কেন ?

রিমি হেসে বললে, তাকে আমার বাবা মনে হয় না বলে, আবার কি ?

সুপ্রীতি অবাক হয়ে গিয়েছিল ওর কথায়।

তারপর বলেছে, একদিন না একটা লোক, ভদ্রলোক, সত্যি ভদ্র, আমাকে তোর নাম বলল। জিগ্যেস করল, চিনি কি না। বললাম, হ্যাঁ চিনি।

আমাকে বললে, কলেজ ছুটির সময় এসে দাঁড়াব এখানে। তুমি শুধু ভিড়ের মধ্যে যাবার সময় সেই মেয়েটির কাঁধে হাত রেখো।

সুপ্রীতি হেসে বললে, সেদিন তুই কলেজেই আসিসনি।

রিমি সপ্রশ্ন চোখ তুলে বললে, কে.সে ?

—তা তো জানি না।

—জানিস না, অথচ তোকে চিনিয়ে দিতে বলল, তুই রাজি হয়েছিলি। যদি খারাপ লোক হয় ! কি দরকার তার আমাকে চেনার।

সুপ্রীতি হেসে বললে, সত্যি কথা বলব ? আমি ভেবেছিলাম হয়তো তোর বিয়ের কথাবার্তা চলছে, পাত্রের বাবা কিংবা ওইরকম কেউ। সেজন্যেই দেখতে চাইছে তোকে।

—কনে দেখা ? রেগে গেল রিমি। বললে, সে তো বাড়ি গিয়ে দেখবে ?

সুপ্রীতি হেসে বললে, কি জানি বাবা, ভাবলাম, হয়তো তোকেও দেখবে, তোর হাঁটাচলাও দেখবে।

তারপর—বিয়ের কথাবার্তা চলছে, তাই না ?

একদিন ওর সব বন্ধুরা কলেজ ছুটির পর গল্প করতে করতে ফিরছে, সুপ্রীতি বোধহয় বেশ খানিকটা পিছনে ছিল, হঠাৎ ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে রিমিকে বললে, ওই যে, ওই যে, সেই ভদ্রলোক।

কাঁধে হাত রাখল না কিন্তু। রিমি রেগে গিয়েছিল বলেই হয়তো।

রিমি চট করে ফিরে তাকাল। দেখতে পেল। হ্যাঁ, বেশ ভদ্রলোকের মতোই চেহারা, পোশাক-আশাক। কেমন বিবর্ণ মুখে মেয়েগুলোর মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। হয়তো রিমিকে খুঁজছে।

রিমি হঠাৎ থেমে পড়ে সুপ্রীতিকে বললে, আয় তো।

মুখেচোখে বেশ রাগ। এক ভিড় ছেলেমেয়ে রয়েছে, ভয়ও হল না।

গট্‌গট্‌ করে এগিয়ে গেল সেই ভদ্রলোকের দিকে। ভয় পাবে কেন, তখন ও এম. এ পড়ছে। কচি খুকিটি নয়।

ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে রাগত স্বরে বললে, আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন? কেন? কে আপনি?

রিমি দেখল, লোকটা রীতিমতো থতমত খেয়ে গেল।

তারপর সামলে নিয়ে বললে, আমি তোমার বাবা।

রিমি প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারপর রাগের স্বরেই বললে, আমার বাবা নেই।

রিমির মনেও হল, সত্যি ওর বাবা নেই। এ লোকটা ওর বাবা? কই, ওর তো সেরকম কিছুই মনে হচ্ছে না। ওর কাছে এই ভদ্রলোক শুধুই একজন রাস্তার অচেনা লোক। তার বেশি কিছুই নয়। একে ও বাবা বলে স্বীকার করতেও পারবে না।

মা বলতে কি বোঝায়, ও জানে। মা মানে কুড়ি বছরের স্নেহ ভালবাসা, রাগ শাসন, আদরের হাত, রোগে সেবা; অপরিসীম কষ্ট, একঘেয়ে চাকরি। দায়িত্ব, আরও কত কি। একটা মানুষ হঠাৎ এসে একজনের বাবা হয়ে যেতে পারে না।

লোকটার মুখে করুণ মিনতি। বললে, তুমি আমাকে বাবা বলে স্বীকার করো বা না করো, আমি তো জেনে গেলাম তুমি আমার মেয়ে।

## সাত

পরিতোষ বলেছিল, এ কি করছিস সুবিমল, এ ঘোর অন্যায়। তোকে নিয়ে সকলেই আলোচনা করছে, তা জানিস।

সুবিমল হেসে বললে, দেন আই হ্যাভ বিকাম সামবডি। দ্যাখ পরিতোষ, আমাকে কেউ কোনওদিন কোনও ইমপর্ট্যান্স দেয়নি। এই বিরাট অফিসের গণ্ডা গণ্ডা জুনিয়ার অফিসারদের মধ্যে আমিও ছিলাম নগণ্য।

পরিতোষ বললে, আমিও তাই। কিন্তু তার জন্যে কোনও দুঃখ তো নেই।

পরিতোষ আর সুবিমল একই সঙ্গে ঢুকেছিল এ অফিসে। দু'জনেই একটু একটু করে উন্নতি করে এই স্বচ্ছন্দ অবস্থায় পৌঁছেছে। আর সেই ইন্টারভিউয়ের দিনেই আলাপ হয়েছিল, দু'জনেই চাকরি পেয়েছিল। তাই বন্ধুত্ব এতই গাঢ় হয়ে গিয়েছিল। অন্য অনেকে ওদের কথাবার্তা শুনে ভেবে বসত ওদের এই অন্তরঙ্গতা ছেলেবেলার।

সেজন্যে কেউ কেউ এসে পরিতোষকেই বলত, আপনার এত বন্ধু, এটা কি ভাল করছেন উনি?

শুনে রেগে যেত পরিতোষ। যারা অভিযোগ করত তাদের ওপরও, আবার সুবিমলের ওপরও। কিন্তু সত্যিকার বন্ধুত্ব এমনই জিনিস যে, তার শত অপরাধও ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করে। নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া যায় না।

মাঝে মাঝেই রঞ্জনা এসে হাজির হত, বেরিয়ে যেত একই সঙ্গে। ওদের দু'জনের মুখের ভাব দেখে, হাসাহাসি, ফিসফিস, হাস্যপরিহাস দেখে কারও বুঝতে অসুবিধে হত

না।

ওদের ওপরওয়ালাও একদিন পরিতোষকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, সুবিমলবাবুর সঙ্গে একটি উৎকৃষ্ট সুন্দরী মেয়ের নাকি অ্যাফেয়ার চলছে ? গাট্‌স আছে মশাই, আমরা তো একটা স্ত্রী নিয়েই সামাল দিতে পারি না।

কারও আলোচনায় একটু প্রশ্রয় থাকত, কারও কথায় মৃদু অভিযোগ।

সুবিমল বলেছিল, তা হলে, আই হ্যাভ বিকাম সামবডি, কি বল। কেন জানিস ? প্রত্যেকটি লোকের, মুখে যাই বলুক, একটা অবৈধ প্রণয়ের ইচ্ছে আছে। সেজন্যেই কোনও একজনকে প্রেম করতে দেখলে তাকে হিরো বানিয়ে ফেলে। যাদের ঈর্ষা হয় তারাই অপবাদ দেয়, উপদেশ দেয়।

হেসে বলেছিল, এ অফিসে আই অ্যাম এ হিরো।

পরিতোষ বুঝেছে, সুবিমল একটা নেশার মধ্যে পড়ে গেছে। ওকে ফেরানো দুঃসাধ্য। আশা ছেড়ে দিয়েছে। যাক, জাহান্নামের পথে ও কতদূর যেতে পারে দেখা যাক।

আর সুবিমল মনে মনে হেসেছে। কারণ তখনও রঞ্জনা ওর ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। কারণ কিছুতেই সাহস করে কিছু বলতে পারছিল না।

সারাক্ষণ ও অধীর হয়ে থাকত। কান যেন টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং ধ্বনির জন্যে অপেক্ষা করছে। যেদিন ফোন আসত না, মনে হ'ত পৃথিবীতে কোথাও কোনও আনন্দ নেই। হতাশায় ভেঙে পড়া মন নিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াত এখানে ওখানে, কখনও কোনও ভিড়ের রেস্তোরাঁয় এক কাপ চা নিয়ে বসে থাকত। মানুষজন, ভিড় কিছুই ওর চোখে পড়ত না। অথচ ফোন করতেও দ্বিধা।

একদিন অপেক্ষায় অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে শেষ অবধি রঞ্জনার অফিসেই ফোন করল।

কে একজন উত্তর দিলে, উনি আজ আসেননি।

আসেননি, আসেননি।

রিসিভারের অপর প্রান্তের উত্তরটা শুনেই মনে হয়েছিল ওর বুকের ভেতরটা যেন মুহূর্তে শূন্যতায় ভরে গেল।

নিজেই গিয়ে হাজির হয়েছে একদিন। ওর অফিসে। দূর থেকে রঞ্জনাকে দেখে এক ঝলক খুশি ওর চোখেমুখে উপচে পড়তে চাইল। কিন্তু পরমুহূর্তে মুখটা ম্লান হয়ে গেল ওর। পাশের টেবিলের একজনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে হাসতে হাসতে গল্প করছে।

সুবিমলকে দেখতে পেয়েই রঞ্জনা ওর নিজের টেবিলে এসে বসল। সামনের চেয়ারে সুবিমল।

রঞ্জনা মুখটা এগিযে নিয়ে গিয়ে সুবিমলকে চাপা স্বরে বললে, দুটো দিন আসিনি, তাতেই এত ছটফট করার কি আছে।

ছুটির পর দু'জনেই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে রঞ্জনা বললে, এত প্রেম আমি কি ছাই জানতাম। ব'লে হেসে উঠল।

সুবিমল কোনও কথা বলতে পারেনি। এ মেয়েকে কি মুখ ফুটে প্রেম জানানো যায়, নাকি কোনও অভিমান জানানো যায় ! অথচ ওর বুকের মধ্যে তখন কাঁটার মতো বিঁধছে ওই পাশের টেবিলের লোকটির সঙ্গে হাসাহাসি। মানুষের মন বড় অদ্ভুত। রঞ্জনার মুখে যে হাসিটা দেখে ও কৃতার্থ বোধ করে, সেটাই যখন অপরকে উপহার দেয়, বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে ওঠে সুবিমলের। ঈর্ষা। হবে হয়তো।

—আরে বাবা, ছটফট করব তো আমি। তুমি ওরকম করবে কেন ?

—তুমি ছটফট করবে আমার জন্যে ? সুবিমল হাসল।

রঞ্জনা বললে, প্রথম দিন কে এসেছিল, মনে আছে ? আমি। আর তুমি তো ঠিকানাটাই ভুলে মেরে দিয়েছিলে।

সুবিমল বলতে পারল না যে, অফিসের নামটা মনে ছিল, কিন্তু দ্বিধা এসে ওকে বাধা দেয়।

গলার স্বর হঠাৎ গাঢ় হয়ে এল রঞ্জনার। বললে, একজনের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে আছি। একখানা পুরো ঘর, ফিরে গিয়ে যেই খিল্ দিই ঘরে, সে যে কি দুঃসহ।

সুবিমল মুখ ফুটে বলতে পারল না ওর জীবনটাও কি দুঃসহ। বাড়িতে অনেকগুলো মানুষ, তবু কি একা, নিঃসঙ্গ। কারণ কল্যাণীর সঙ্গ এখন আর ওর একেবারেই ভাল লাগে না। যেন একটা যন্ত্রণা, একটা বন্ধন।

রঞ্জনা বললে, দুটো দিন জ্বর নিয়ে পড়েছিলাম, তোমার তো কপালে জলপটি দেবার জন্যে একটা বউ আছে। আমার ?

সুবিমল সাহস পেয়ে বললে, আমাকে একটা ফোন করে দিলেই পারতে, একা মনে হ'ত না।

রঞ্জনা হেসে বললে, মনে রাখব, পরখ করে দেখব পরে।

—কেন আজ ? সুবিমল সাহস করে বলে ফেলল।

আর রঞ্জনা হাসতে হাসতে বললে, না মশাই। এখন আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, চলো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি।

বাইরে দু'জনে বেরিয়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে একটা খালি ট্যাক্সি যেতে দেখে সুবিমল চিৎকার করে ডাকল, ট্যাক্সি !

কি আশ্চর্য, ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেল। সম্ভবত রঞ্জনাকে দেখে। ওরা বোধহয় সুন্দরী মেয়েদের খুব সমীহ করে।

ট্যাক্সি ডাকতে দেখেই রঞ্জনা বললে, ট্যাক্সি কেন, কোথায় যাবে ?

সুবিমল বললে, জাহান্নামে।

রঞ্জনা বললে, তোমার সঙ্গে আমি জাহান্নামে যেতেও রাজি।

—সত্যি ?

—সত্যি।

সুবিমল দারুণ খুশি হয়ে উঠল। তার চেয়ে বেশি সাহসী।

তখন সন্ধে হয়ে আসছে, আবছা অন্ধকার।

মাঝবয়সী বিহারি ট্যাক্সি ড্রাইভার জিগ্যেস করল—কোথায় যাবে।

দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে সুবিমল বললে, যিধার খুশি।

একটু আগে রেস্তোরাঁর বিল্টা রঞ্জনাই মিটিয়েছে। সুবিমলের পকেটে এখন অনেক টাকা।

'যিধার খুশি' কথাটা শুনেই রঞ্জনা সুবিমলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। তারপর বললে, তুমি যে বললে জাহান্নামে যাবে।

—যাব।

একটু পরেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যখন ট্যাক্সিটা স্পিডে ছুটছে, কাঁধে হাত রেখে রঞ্জনাকে কাছে টেনে নিল সুবিমল, তারপর রঞ্জনাকে চুমু খেল।

রঞ্জনা কোনও বাধা দিল না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বলে বসল, এটা কি হল ?

সুবিমল ওর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উষ্মা দেখতে পেয়ে একটু অবাক হল। কোনও প্রতিবাদ

করেনি বলেই ধরে নিয়েছিল রঞ্জনার সম্মতি আছে।

সুবিমল অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। অন্ধকারের জন্যে রাগটা স্পষ্ট দেখতে পেল না।

রঞ্জনা বলে বসল, তুমি আমার পারমিশন নিলে না কেন।

—পারমিশন !

রঞ্জনা হেসে উঠে বললে, জানো, জীবনে এই প্রথম আমাকে কেউ চুমু খেল। অথচ তুমি সেটা আমাকে উপভোগ করতে দিলে না।

কথাগুলো দুর্বোধ্য ঠেকল সুবিমলের কাছে।

রঞ্জনা বললে, জীবনের প্রথম চুম্বন, তার একটা প্রস্তুতি থাকবে না ? এটা উপভোগ করার জিনিস, যেটা সারাজীবন মনে রাখব।

'জীবনে এই প্রথম আমাকে কেউ চুমু খেল।' কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল। অথচ রঞ্জনাকে দেখে ওর কোনওদিনই সে-কথা মনে হয়নি।

ওর সারা মন প্রাণ যেন আপ্লুত হয়ে গেল। কানে বাজতে লাগল একটু আগে রঞ্জনার কথা। 'তোমার সঙ্গে আমি জাহান্নামে যেতেও রাজি'।

পরিতোষ বললে, সুবিমল, আমার মনে হচ্ছে তুই জাহান্নামে যাচ্ছিস।

—যাচ্ছি না, অলরেডি চলে গিয়েছি। এখন আর ফেরার পথ নেই।

—এখনও থাম। এখনও সময় আছে।

—অসম্ভব, অসম্ভব। ওকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না, জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবে।

—তোর একটা বউ আছে, একটা মেয়ে হয়েছে।

—মেয়েটাকে আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখিনি। দেখতে ইচ্ছে করে না। রঞ্জনা আমাকে ভালবাসা দিয়েছে, ভালবাসা চিনিয়েছে।

সুবিমল তলিয়ে গেল, তলিয়ে গেল। হয়তো জাহান্নামেই।

কল্যাণীর বুঝতে অসুবিধে হয়নি। প্রথম প্রথম সেটা ছিল শুধুই সন্দেহ। স্ত্রীর ওপর থেকে স্বামীর মন সরে গেলে যে কোনও স্ত্রী তা বুঝতে পারে। আর তারপরই তার মনে হয় সে শুধু এ বাড়ির দাসী। তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু শেষ অবধি কল্যাণীকে সেই ফিরে আসতে হয়েছে, দু'বছরের বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে।

জন্মের পর যে মেয়েকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়নি, সেই মানুষটা আজ এত বছর বাদে সেই মেয়েকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে কেন এত অস্থির হয়ে উঠেছে কল্যাণী বুঝতে পারে না।

অস্থির হয়ে উঠেছিল বলেই ও ভেবেছে এটাই সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ। একটা দিনের জন্যেও রিমিকে দেখতে দেবে না। অনুশোচনা হয়েছে বলেই সুবিমলকে ক্ষমা করে দিতে পারবে না।

কল্যাণীর মনে পড়ে যায়, রিমি তখন স্কুলে পড়ে, বছর পনেরো বয়েস, হঠাৎ একদিন ওকে ফোন করে বসেছিল সুবিমল। বিব্রত বোধ করেছিল ও, কি ভয়-ভয়! আবার রাগ এবং বিদ্বেষ। রিসিভার নামিয়ে দিয়েছিল।

দিন কয়েক পরেই পরিতোষের আবির্ভাব ওদের বাড়িতে।

ভেবেছিল, তারপর আর বিরক্ত করবে না। জীবন থেকে যাকে মুছে দিয়েছে একেবারে, তার অনুতাপকে কি করে মেনে নেবে কল্যাণী।

কল্যাণী ভুলেই গিয়েছিল।

আজ এত বছর বাদে, রিমির বয়স এখন কুড়ি, সুবিমলের জীবন থেকেও তো রিমি আর কল্যাণী একেবারে মুছে যাওয়ার কথা।

কল্যাণী তো মুছে গেছেই, কিন্তু রিমিকে দেখার জন্যে এত আগ্রহ কেন তার ? এই এত বছর বাদেও।

ও বুঝতে পারে না। সন্দেহ হয় এটাও কোনও কৌশল। রিমির কোনও ক্ষতি করতে চায় হয়তো।

তা না হলে কল্যাণীকে চিঠিটা লিখেছে কেন ? এমন অনুনয় করে। এত আকুল উপরোধ ছিল কোথায়।

কল্যাণী মনে মনে ঠিক করল, রিমিকে সাবধান করে দিতে হবে।

—কোনওদিন যদি কেউ তোর সঙ্গে দেখা করে, বাবা এই পরিচয় দেয় ...

রিমি মাকে কথা শেষ করতে দেয়নি। বলেছিল, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেব তার গালে। সেই দুশ্চরিত্র লম্পট লোকটাকে আমি 'বাবা' বলে স্বীকার করব কি করে। সে তো আমার কাছে একটা অচেনা লোক, তার বেশি কিছু নয়।

শুনে মনের মধ্যে শান্তি পেয়েছিল কল্যাণী। ওর তো ওই একটাই ভয়। 'বাবা' পরিচয় দিয়ে কেউ সামনে এসে দাঁড়ালেই রিমি হয়তো একটুখানি আদর পেয়ে গলে যাবে। আর কল্যাণীর মনে হবে তার সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। হেরে যাবে সুবিমলের কাছে।

বাবা পরিচয় কি সত্যি এত বড় ? যার কাছে কল্যাণীর এই সারাজীবনেব দুঃখ-কষ্ট, অসীম স্বার্থত্যাগ, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা, সব মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে। বুক দিয়ে আগলে আগলে এই যে মানুষ করে তুলেছে রিমিকে, রিমি এখন কুড়ি বছরের, ও কি এখন বাবাকে ফিরে পেলে মাকে তুচ্ছ মনে কববে ?

সেজন্যেই বড় ভয় ছিল কল্যাণীর।

ওর মনে পড়ে গেল স্কুলে প্রথম ভর্তি করার সময় কি প্রবঞ্চনা করতে হয়েছে।

'মা'। একটা ছোট্ট শব্দ। তা নিয়ে দেশে দেশে কত কাব্য-সাহিত্য, কত গান। কত শ্লোক। অথচ বাস্তব জীবনে তার এতটুকু মূল্য নেই। একটি শিশুকে স্কুলে ভর্তি করতে হলে সেই মা'র কোনও স্বীকৃতি নেই। বাবার সই চাই, বাবার। বাবাকে একবার আসতে হবে, তা না হলে ভর্তি হবে না। বাবা নেই কেন ? হাজারও প্রশ্ন। কেমন সন্দেহের চোখ তুলে তাকানো। কিংবা আড়ালে উপহাস।

সুবিমলের চিঠিটা পড়েই বড় বিচলিত হয়ে উঠেছিল। নিয়ে গিয়ে দিল মাকে।

কনকনলিনী চোখে সোনা রঙের চশমাটা এঁটে পড়লেন। বললেন, ভেবে দেখি।

পরে বললেন, রেগে গিয়ে কিছু লিখে বসিস না যেন।

ছোটমামা আসতেই চিঠিটা পড়তে দিল কল্যাণী। না পড়তে দেওয়ার মতো তো কিছুই নেই। কল্যাণী সম্পর্কে কোনও কথাই নেই। কোনও অনুশোচনাও নেই। অথচ কল্যাণীকেই লেখা। সবটুকু শুধু রিমিকে ঘিরে। যেতে চাই, কথা বলতে চাই।

ছোটমামা বললে, ভেবেচিন্তে দেখ, একবার না হয় এলই।

কল্যাণীর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে।—কি বলছ, ছোটমামা!

—ঠিকই বলছি, ভেবে দেখ।

ছোটমামা ধীরে ধীরে বললে, রিমির বিয়ে নিয়ে ভাবি না, দু'-একটা ভাল পাত্র আমার হাতেই আছে। সব জেনেশুনেই বিয়ে করবে। কিছুই লুকোতে হবে না। তবু, ওর বাবা এসে যদি সম্প্রদান করে যায়, কেউ কোনও প্রশ্ন তুলবে না। সব অপবাদ মুছে যাবে।

কল্যাণী হেসে উঠল।—সেই অপবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই তো আমার সারা জীবন

কেটে গেল। ঠিক যখন মনে হচ্ছে আমি জিতে গেছি, তখনই আমাকে হেরে যেতে বলছ ছোটমামা!

ছোটমামা হেসে বললে, কি করবি বল? একটা স্কাউন্ড্রেল বাবাও এই সমাজে সব সময় জিতে যায়। সমাজ যে বাবাদের তৈরি। আর সব মেয়েই সেটা মেনে নিতে অভ্যস্ত।

কল্যাণীর সারা গা জ্বালা করে উঠল। আবার নতুন করে নিজেকে অসহায় মনে হতে লাগল। মূল্যহীন। মনে হল, আমার কোনও দামই নেই।

মা সেজন্যেই বলেছে, ভেবে দেখি। ছোটমামা তো স্পষ্টই বলে দিল।

অর্থাৎ এখন রিমির জন্যে, রিমির স্বার্থ ভেবে, সেই সুবিমলকেই মাথা নিচু করে ডেকে আনতে হবে।

ও তো শুধু একবার আসতে চেয়েছে, দেখা করতে চেয়েছে। হয়তো একটু আদর দেখাবে।

কল্যাণীকে নরম করে একটা চিঠি লিখতে হবে। যাকে দেখতেও ইচ্ছে করে না, তাকেই।

হেসে কথা বলতে হবে। হয়তো ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতেই।

চলে যাবার সময় মুখে হাসি এনে বলতে হবে, আবার এসো।

কারণ রিমির বিয়ের সময় সকলে বলবে, ওর বাবা নিজে সম্প্রদান করছে।

কল্যাণী যেন আর ভাবতে পারছে না। এখন মনে হচ্ছে নিজের পরাজয়ের চেয়ে রিমির জয়টাই বড়। রিমির জীবনটা যেন সাফল্যে ভরে ওঠে। সুখী হয়। যেন কোথাও কোনও কাঁটা না থাকে।

সব কাঁটা কল্যাণীর বুকের মধ্যেই থাক। রিমির চলার পথে একটাও না।

ভাবতে ভাবতে একসময় কল্যাণীর মন খুশিতে ভরে উঠল। ও ভাবলে, এটাকে আমি পরাজয় মনে করছি কেন। এটা আমার জিত।

সকলেই বলবে, সেই কল্যাণীর কাছেই তো ফিরে আসতে হল।

কার জন্যে ফিরে আসছে সেটা বড় কথা নয়। কার কাছে ফিরে আসতে চাইছে সেটাই বড় কথা। কে জানে, হয়তো কল্যাণীর কাছেই ফিরে আসতে চাইছে। সেটুকু বলার সাহস হয়তো হারিয়ে ফেলেছে। সেজন্যেই রিমিকে দেখতে চাওয়া, আসার ইচ্ছে।

—রিমি, তোর বাবা একবার আসতে চাইছে, কি জবাব দেব বল।

হাসতে হাসতে বললে কল্যাণী। বললে, চিঠি লিখেছে।

রিমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর বললে, আসতে যখন চাইছে, আসুক না। তুমি যদি চাও...

—বলছিস?

ঘাড় নাড়ল রিমি।

কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটল। আঃ, এই একটাই ভয় ছিল ওর। মেয়েকে। হয়তো বলে বসবে, আসতে দিয়ো না। আমি ওকে 'বাবা' বলতে পারব না।

তার বদলে রিমি বলছে, আসুক না।

কিন্তু একটা কথাই রিমি শুধু গোপন করে গেল। গোপন করে এসেছে। বলতে পারল না, বাবাকে আমি দেখেছি।

বাবার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল ও। স্পষ্ট মনে পড়ল না। ঝাপসা মতো।

সুপ্রীতি বলেছিল, বাবার সঙ্গে তুই ওভাবে কথা বললি? যত দোষই থাক, বাবা তো।

তার পরেও এসেছে সুবিমল। রিমি দেখাই করেনি।

সুপ্রীতি একদিন বললে, কত দুঃখ করছিলেন তোর বাবা, তুই দেখাও করলি না।

তোকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন বাড়িতে। কি যেন দেখাবেন।

জানার আগ্রহ হয়নি রিমির, কি দেখাবে। ওই বাড়িতে ! ওটা তো শত্রুপক্ষের বাড়ি। যে বাড়ি থেকে মা অপমানিত হয়ে একদিন চলে এসেছিল, যে বাড়ির সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্কই নেই, সে বাড়ির চৌকাঠে পা রাখতেও ওর অসীম ঘৃণা।

—কিন্তু তুই তোর মায়ের দিকটা ভেবে দেখছিস না রিমি। হয়তো তোকে উপলক্ষ করে উনি আসছেন, তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। আসলে তোর বাবা হয়তো তোর মায়ের কাছেই ফিরে আসতে চাইছেন।

সুপ্রীতি বলেছিল, তোর মা কি চায় সেটা তো আগে বুঝবি।

কথাগুলো রিমির মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে আর ঘুরপাক খেয়েছে।

শেষে একদিন সুপ্রীতিকে বলেছে, সেই লোকটা যদি আবার কোনওদিন আসে ...

—লোকটা বলছিস কেন, ও তো তোর বাবা।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে ও সুপ্রীতির দিকে। যেন এই 'বাবা' কথাটাই ওর অপছন্দ।

তারপর বলেছে, সে এলে বলিস, দেখা করব, কি বলতে চায় শুনব।

ওরা দু'জন একদিন ইউনিভার্সিটির গেট পার হয়ে বেরিয়েছে, দেখতে পেল, লোকটা, লোকটা ভাবছে কেন রিমি, দেখে দিব্যি ভদ্রলোক মনে হচ্ছে, দেখল উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে।

—চল্। রিমি বলল। ওর মনে একটা কৌতূহল। তাছাড়া আর কিছুই নয়।

ওদের রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসতে দেখে সুবিমলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সাহস করে সুবিমলও দু'পা এগিয়ে এল।

—রিমি, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে তোমার কাছে আসতে, তোমাকে দেখতে। কিন্তু সাহস হয়নি। তোমাদের কাছে আসার যে আর মুখ ছিল না আমার। কোন্ মুখ নিয়ে আসব। আমি জানতাম, তোমাদের ওপর অন্যায় করেছি, অবিচার করেছি।

অনুনয়-ভরা কথাগুলো রিমিকে স্পর্শও করছিল না। কিন্তু সুপ্রীতির মুখ দেখে ওর মনে হ'ল সে যেন অভিভূত হয়ে পড়ছে। হয়তো তা দেখেই লোকটার প্রতি একটু সমবেদনা জাগল। হ্যাঁ, লোকটা ! ওকে ও কিছুতেই বাবা বলে ভাবতে পারছে না।

—চলো, একবার আমার বাড়িতে চলো তুমি। দেখবে তোমাকে আমি কোনওদিনই ভুলিনি।

বিদ্রূপে হেসে উঠল রিমি। —আপনার বাড়িতে ! সেখানে তো একটা ডাইনি থাকে। আমাদের শত্রুপক্ষ।

থমকে গেল সুবিমল। বলল, ও-কথা ব'লো না রিমি। তুমি তাকে দেখোনি, জানো না। সেও তোমাকে কোনওদিন দেখেনি। কিন্তু তোমার জন্যে, তোমাদের জন্যে তার কত মায়া। ভাবতেও পারবে না।

রিমি হেসে উঠেছিল। —সেজন্যেই বুঝি আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

সুবিমল বললে, দোষ তার নয় রিমি, সব দোষ আমার।

একটু থেমে বললে, সে-ই বারবার আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি সাহস পাইনি, লজ্জায় যেতে পারিনি, তবু সে-ই সাহস দিয়েছে, বারবার তোমার কাছে পাঠিয়েছে।

—এত মায়া ! এত নিঃস্বার্থ ! ঠাট্টার স্বরে বলেছে রিমি।

সুবিমল নিজের মেয়ের কাছে কি করে বলবে, যে রঞ্জনা সত্যিই নিঃস্বার্থ। একটাই স্বার্থ ছিল তার। যে স্বার্থ ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। যেমন রঞ্জনাকে ছেড়ে আসা আমার

পক্ষেও সম্ভব ছিল না। সেই স্বার্থের নাম ভালবাসা। প্রেম।

—আঃ, অবৈধ প্রেম, গ্র্যান্ড। ঘরে সুবিমলের স্ত্রী আছে শুনেই সেই দ্বিতীয় দিনেই উল্লাসের স্বরে বলে উঠেছিল রঞ্জনা।

তখন বোঝেনি সুবিমল। শুধুই উপহাস মনে করেছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে একটা নেশার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল।

নিজের মেয়ের কাছে সব কথা বলা যায় না। বলতে পারেনি।

তবু অনুনয়ের স্বরে বলেছে, তাকে ডাইনি ব'লো না রিমি। সে অন্যরকম মানুষ, কারও সঙ্গে মেলে না। তোমার ওপর অবিচার হবে মনে হয়েছে বলেই কোনওদিন সে ছেলেমেয়ে চায়নি। এর চেয়ে বড় স্বার্থত্যাগ কে করতে পারত, বলো।

শুনতে শুনতে কেমন অবিশ্বাস্য লেগেছে। ভীষণ ইচ্ছে হয়েছে সেই ডাইনি মেয়েটাকে দেখার। ডাইনি মেয়ে, নাকি তাকে ডাইনি মা বলবে ও ?

সত্যি সত্যি ওর যেতে ইচ্ছে হয়েছে। একটা অদ্ভুত কৌতূহল। ফেলে আসা মাতৃভূমি দেখতে যাওয়ার আগ্রহ যেন। ওখানেই তো মা ছিল, মা'র নিজস্ব স্বর্গ ছিল একদিন, ওখানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে ও। বিতাড়িত হয়েছে। যাবে না একদিন দেখতে ? মা কি হারিয়ে এসেছে জানতে ?

রিমি বললে, যাব। যাবি সুপ্রীতি ? তুইও চল।

সুপ্রীতি রাজি হয়ে গেল। হয়তো বন্ধুর প্রতি সমবেদনায়। যদি একজন তার বাবাকে ফিরে পায়।

ওরা গিয়েছিল।

রঞ্জনাকে দেখে ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল। তার ব্যবহারেও। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, এই সুন্দর স্বভাবের মহিলা, সুন্দর চেহারার, একেই ও এতকাল ডাইনি ভেবে এসেছে !

ছোটমামা বলেছিল, উইচ।

কই, একটুও তো মিলছে না।

—রিমি তোমাকে আমি কোনওদিন ভুলিনি, এই দ্যাখো।

আলমারি থেকে একরাশ কাগজপত্র বের করে এনে দিয়েছে রঞ্জনা, হাসতে হাসতে বলেছে, দেখাও, দেখাও ওকে।

একটার পর একটা কাগজ খুলে দেখিয়েছে সুবিমল।

—এই দ্যাখো। পড়ে দ্যাখো। এ সবই তোমার নামে।

টাকা, টাকা, টাকা।

সুবিমল বলেছে, জীবনে যা কিছু জমাতে পেরেছি, সবই তোমার নামে। সেখানে তোমার এই নতুন মা কোথাও কোনও ভাগ বসায়নি। সব তোমার।

—এই দ্যাখো, তোমার বিয়ের জন্যে কত গয়না গড়িয়ে রেখেছি।

আলমারি থেকে এনে দেখিয়েছে সুবিমল।

এত টাকা, এত গয়না, এত ভালবাসা ওর অজ্ঞাতে এতদিন জমা ছিল, ও জানতেও পারেনি। অথচ এ-সব কিছুই না থেকে যদি জানতে পারত শুধু ভালবাসা আছে, তা'হলে জীবনভর এত যন্ত্রণা পেত না, এত লজ্জা। সঙ্কোচ এসে সব সময় ওর মাথা নিচু করে দিত না।

শুধু ভালবাসা ? ওর তো এখন কুড়ি বছর বয়েস, ও এখন কল্পনাও করতে পারে। বুঝতে পারে। আর এক ধরনের ভালবাসার জন্যে মানুষ কতখানি পাগল হয়ে যেতে পারে। মায়ের দুঃখ, লজ্জা, অপমান সব ভুলে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে ওর ইচ্ছে হয় এই দুটি অপরাধী মানুষকে ক্ষমা করে দিতে। ক্রিমিনাল ওরা দু'জনেই, কিন্তু মনে হ'ল দু'জনেই

মানুষ। কোথাও যেন মানুষের চেয়ে বড়।

রিমি কি আচ্ছন্ন বোধ করছিল ? নিজেকেই ভয় হচ্ছিল ওর ?

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলি।

তারপর সুবিমল আর রঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললে, আমি এসেছিলাম এ-কথা মা যেন কোনওদিন জানতে না পারে।

রাস্তায় বেরিয়ে সুপ্রীতিকে বললে, জানিস সুপ্রীতি, এত সব দেখাল, যখন দেখাচ্ছিল টাকা, গয়না, সত্যি বলছি লোভ হচ্ছিল। অথচ এখনও লোকটাকে আমি 'বাবা' মনে করতে পারছি না।

এ সব কথা কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও মাকে জানতে দেয়নি রিমি। জানাতে পারেনি।

কল্যাণী বললে, তোর বাবা একটা চিঠি দিয়েছে। একবার আসতে চায়। কি জবাব দেব বল।

একটু হেসে বললে, তোর ওপর চিরকাল তো আমার ইচ্ছেটাই চাপিয়ে এসেছি।

কেন আসতে চায় তা সবই জানে রিমি।

তবু কথা শুনে মনে হ'ল, মা'র ভিতরে ভিতরে বোধহয় একটা চাপা ইচ্ছে আছে। যৌবনের দিন অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। জীবনেরই বা কতটুকু বাকি। তবু, যার কাছ থেকে একদিন লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে চলে আসতে হয়েছিল, আজ তাকেই আবার ফিরে আসতে হচ্ছে, নতমস্তকে, সেটুকুই হয়তো মা'র বাসনা। ক্ষমা করার। তার চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কি হতে পারে।

—কি জবাব দেব বল্। কল্যাণী আবার জিগ্যেস করল।

রিমি বললে, আসুক না।

আসলে রিমি নিজেও যে মনে মনে লোকটাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এমন কি ওই সুন্দর স্বভাবের—এখন একটু একটু চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু দেখলে বোঝা যায় রূপের ঝরনা ছিল তার গায়ে, মাদকতা—সেই ডাইনি মেয়েটাকেও—এখন মহিলা—তাকেও ও ক্ষমা করে দিয়েছে।

ওই টাকার, ওই গহনার লোভ ? না অন্য কিছু ?

## আট

একটাই কাজ বাকি ছিল কল্যাণীর। রিমির বিয়ে। এই দিনটির কথা ভেবে কত না স্বপ্ন দেখেছে। ওর জীবনে আর কোনও সুখস্বপ্ন ছিল না। নিজেকে এতকাল বেঁধে রেখেছে কর্তব্যের বন্ধনে। রিমির বিয়ে দিয়ে তবে ওর কর্তব্যের শেষ। তারপর ওর মুক্তি এবং নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

ভেবেছিল তারপর আর কোনও আশঙ্কা থাকবে না। একটাই তো ভয় ছিল, যা ওকে সারা জীবন তাড়া করে ফিরেছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই একটা শূন্যতার মুখোমুখি হতে হয়, কানের দু'পাশে সাদা চুলগুলো, রিক্ত সিঁথির দু'পাশে, সারা মাথায় লুকিয়ে থাকা সাদা চুলের রাশি যেন ওকে উপহাস করে। তবু তারই মধ্যে একটা গর্ব উঁকি দিয়ে গেছে। আমি এখন আর সেই অসহায় দুঃখী মেয়ে নই। আমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। রিমিকে মানুষ করে তুলেছি।

ছোটমামা একদিন প্রশংসা করে বলেছিল, তুই তো সবাইকে অবাক করে দিয়েছিস কল্যাণী। যারা এতদিন তোকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, অপবাদ ছিটোনোর চেষ্টা করেছে,

এখন তারাই তোর প্রশংসা করে।

কল্যাণী তা জানে।

পুরনো দিনের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সব খবরই সে রাখত কল্যাণীর। সে বলেছিল, তুমি দেখালে কল্যাণী, মেয়েদের তোমার মতোই হওয়া দরকার।

মেজমাসি একদিন এসে বললে, সব মেয়েই তো শুধু কাঁদে আর স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায়। যেন আর কোথাও যাবার নেই। কল্যাণী, তোকে দেখলেও আমাদের মেয়ে বলে গর্ব হয়।

কল্যাণী জানে, এখন আর ওকে কোথাও মাথা নিচু করে চলতে হয় না। রিমির এখন আর কোনও লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই। যারা উপহাস করত, আড়ালে আলোচনা করত, তারাই এখন মাথা নিচু করে চলে।

অনেকদিন আগে রিমি একবার ওর গা ঘেঁষে বসে ধীরে ধীরে বলেছিল, জানো মা, যেদিন তুমি বললে, আমার বাবা একটা দুশ্চরিত্র লম্পট, একটা ডাইনি তাকে গ্রাস করেছে, সেদিন আমি সারা রাত কেঁদেছিলাম। তখন আমার কি লজ্জা, কি লজ্জা। আমি নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চাইতাম। যেন আমিই কোনও পাপ করে বসেছি।

কল্যাণী বলেছে, এই পৃথিবীটা কি অদ্ভুত দেখ। যে অপরাধ করে সে কিন্তু লজ্জা পায় না, যাদের কোনও অপরাধ নেই, লজ্জায় মুখ লুকোতে হয় তাদেরই। তুই কি এখনও লজ্জা পাস নাকি ?

রিমি হেসে উঠে বলেছে, না মা। এখন আর আমার কোনও লজ্জা নেই, কারণ আমি নিজেই এখন বলে বেড়াই। আমার বাবা খারাপ, খারাপ। আমার মা সহ্য করতে পারেনি বলেই চলে এসেছিল। ব্যস্, কিছুই লুকোই না বলেই এখন আর আমার নিজেকে লুকোতে হয় না।

কল্যাণী হেসে বলেছে, জিত তো আমাদেরই হয়েছে রে, আমরাই জিতে গেছি। তোকে আমিই একা একা মানুষ করে তুললাম, এর চেয়ে বড় জিত আর কি আছে। এরপর একদিন তোর বিয়ে দেব। সেই অমানুষটাকে জানতেও দেব না। আমি সম্প্রদান করব তোকে, দেখে নিস্।

সেই অহঙ্কারের কথাটাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল কল্যাণীর।

সুবিমলের চিঠিটা পেয়ে একটুও বিচলিত হয়নি। কেন হবে ? এই কুড়িটা বছরে অনেক, অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছে সুবিমল। কল্যাণী তার জীবন থেকে একেবারেই মুছে ফেলেছে তাকে। খামের ওপর লেখা ঠিকানাটা দেখে প্রথমে বুঝতেই পারেনি কার হাতের লেখা।

চিঠিটা পড়ে মনে মনে হেসেছিল। নৃশংস একটা আনন্দ। সেই পরিতোষ যেদিন এসেছিল বাড়িতে, ঠিক সেদিনের মতোই। একটু সন্দেহও হয়েছিল, কোনও ছলচাতুরি নেই তো এর মধ্যে। তা না হ'লে এতকাল পরে হঠাৎ তার এ আকুতি কেন।

পরিতোষের সঙ্গে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল। গর্ব করে সেদিন বলে ফেলেছে, রিমি এম. এ. পড়ছে, এম. এ.। গর্ব করে বলেছে, সবাই ভেবেছিল আমরা তলিয়ে যাব, যাইনি। কি বলেন।

হাসতে হাসতেই বলেছে কল্যাণী।

না, সুবিমলকে শোনানোর জন্যে নয়, পরিতোষকেও নয়। ও আসলে হয়তো নিজেকেই শুনিয়েছে।

তারপর হঠাৎ একদিন সুবিমলের এই চিঠিটা এল।

চিঠিটা পড়ে একেবারেই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ওটা এগিয়ে দিল কনকনলিনীর দিকে।

ছোটমামা আসতেই তাকেও পড়াল।

কনকনলিনী সোনা ফ্রেমের চশমাটা খুললেন চোখ থেকে, আঁচলে ঘষলেন কাচ দুটো। যেন এবার দূরের কোনও দৃশ্য স্পষ্ট করে দেখতে চাইছেন।

বললেন, রেগে গিয়ে হুট করে যেন কোনও জবাব দিয়ে বসিস না।

কল্যাণী মনে মনে হেসেছিল। রাগ? এখন আর তার বিরুদ্ধে কোনও রাগও নেই। কোনও অন্ধ গলিতে ঢুকে পড়ে সেই গলিটা পেরিয়ে এসে কেউ কি তাকে চিরকালের জন্যে মনে রাখে?

ছোটমামা বললে, তুই বরং একটু নরম করে একটা জবাবই দিয়ে দে। আসতে দে না একবার।

—কেন? কেন বলছ এ কথা?

ছোটমামা বললে, ভেবে দেখ, দু'দিন বাদেই তো রিমির বিয়ে দিবি। সুবিমল এসে যদি সম্প্রদান করে যায়, দেখায় ভাল। হাজার হোক বাবা তো!

প্রথমে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল কল্যাণী। এ কি কথা ছোটমামার মুখে? ও তো ভাবতেই পারে না।

ভিতরে ভিতরে কল্যাণীর নিজেরও একটু লোভ হচ্ছিল। সুবিমলের বিরুদ্ধে এখন তো ওর কোনও রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই। ভালবাসা কবেই চলে গেছে। তবু সবাই দেখুক ওর কাছেই তাকে মাথা নিচু করে আসতে হল। এর চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কি আছে। যদিও ও জানে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটুকুও ওর নেই।

তবু রিমির মতটা জানা দরকার।

কি ভাবে বলবে বুঝতে পারছিল না। কল্যাণী তো জানে বাবার বিরুদ্ধে কতখানি আক্রোশ লুকিয়ে আছে রিমির বুকে। আজ কি করে উল্টো সুরে ওকে বলবে, তোর বাবা একবার আসতে চায়।

শেষ পর্যন্ত সেই বলতেই হল।

আর রিমি বললে, আসুক না।

কারণ ও মনে মনে ভাবল, মা হয়তো চায়। মা হয়তো সুখী হবে।

সুবিমল এল।

একটা ভীরু মানুষ।

কলিং বেল বাজতেই কল্যাণী ধীরে ধীরে এসে সদর দরজার খিল খুলে দিল।

কনকনলিনী দুপুরে ঘুমোন না। সারাটা দিন চোখে চশমা এঁটে খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, বাসন্তীর মা এল বোধহয়। বাসন্তীর মা মানে ঠিকের লোক।

কল্যাণী বললে, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।

দরজা খুলতেই কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করল কল্যাণী।

চোখ তুলে লোকটার চোখের দিকে তাকাতে পারল না।

সুবিমল আসবে একদিন, জানত। ও নিজেই তো একটা ছোট্ট চিঠি লিখে জানিয়েছে, আসতে পার। লিখেছে, তোমারই তো মেয়ে, আমি বাধা দেবার কে।

এইটুকু লিখতেও ওর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। তবু লিখতে হয়েছে। মা বলেছে, রিমির জন্যে তোকে এটুকু করতেই হবে। ছোটমামা বলেছে, রিমির বিয়ের সময় ওর বাবা যদি সম্প্রদান করে, দেখায় ভাল।

কল্যাণী শেষ অবধি ভেবেছে, সারা জীবনটাই তো আমি রিমির জন্যে উৎসর্গ করে এসেছি, আজ যদি শেষ গর্বটুকুও ত্যাগ করি, কি যায় আসে। আমি তো জানব, রিমির জন্যেই সেই গর্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছি।

'এসো' এই ছোট্ট কথাটাও উচ্চারণ করতে বাধল কল্যাণীর। ও শুধু দরজা খুলে দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। বসার ঘরে।

শুধু বাঁ হাতটা বাড়িয়ে, বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে চেয়ারটায় বসতে ইঙ্গিত করল।

মানুষটা এখন অচেনা। কোনওদিন যে কিছু ছিল, কোনও সম্পর্ক, তা মনেও হয় না।

সুবিমল বসল। বসার ঘরে।

কল্যাণীর কাছে ও এখন শুধুই একজন বসার ঘরের লোক, বাইরের লোক। আর এক পাও সে এগিয়ে যেতে পারবে না, ঢুকতে পারবে না এই বাড়ির ভেতর। এতকাল এই বসার ঘরে ঢোকার অধিকারটুকুও দেয়নি। দরজায় এভাবে কলিং বেল-এর বোতাম টেপার সাহসও ছিল না সুবিমলের।

সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ, অপ্রতিভ মুখ নিয়ে সুবিমল প্রশ্ন করল, ভাল আছ ?

একটা কঠিন উদ্ধত মুখকে সহজ আর নরম করার চেষ্টা করল কল্যাণী। শুধুই ঘাড় নাড়ল।

সুবিমল হয়তো কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

আর কল্যাণীর কথা বলতে ইচ্ছেই হচ্ছে না।

কনকনলিনী বলেছিলেন, যদি আসে, আসবেই, তখন একটু ভালভাবে কথাবার্তা বলিস যেন।

ছোটমামা বলেছিল, একটু নয় আদরযত্ন দেখালি, চা-টা খাওয়ালি। পলিসি হিসেবেও তো মানুষ অনেক কিছু করে। ওকে আমাদের এখন দরকার।

কল্যাণী তা জানে। কিন্তু কেন দরকার হয় সেটুকুই জানে না। একজন পুরুষের কাছে শেষ অবধি মাথা হেঁট করানোর জন্যেই হয়তো দরকার হয়।

কিন্তু কল্যাণী পারছিল না। সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে ওঠা কত কঠিন।

এক ঝলক সুবিমলকে দেখল। রীতিমতো বুড়িয়ে গেছে, কল্যাণীর চেয়েও।

সুবিমল সঙ্কুচিত। কথা খুঁজছে, খুঁজে পাচ্ছে না।

হঠাৎ বললে, প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি।

একটা বিদ্রূপের হাসি এসে গেল কল্যাণীর ঠোঁটে। পাপের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি বলা যায়, প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি।

অসহ্য, অসহ্য লাগল কল্যাণীর।

—রিমি ! ও চিৎকার করে ডাকল।

রিমি এসে দাঁড়াল দরজার পরদা সরিয়ে, দূরেই দাঁড়িয়ে রইল।

কল্যাণী বললে, তোমার বাবা।

সুবিমলকে বললে, 'মেয়ে'। 'তোমার মেয়ে' কথাটা উচ্চারণ করতেও ইচ্ছে হল না।

ওরা যে পরস্পরকে চেনে কল্যাণী জানেও না।

সুবিমল কথা বলল, কল্যাণী কথা বলল, রিমি কথা বলল। অথচ ওদের কথা পরস্পরকে স্পর্শও করল না।

রিমির ভয় ছিল, লোকটা না বলে বসে, রিমিকে চেনে, রিমি ওর বাড়িতে গিয়েছিল।

মাকে সে-সব কথা ও বলতেই পারেনি। ভয়ে, নাকি মা দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে বলে, তা ও জানে না। কেন গিয়েছিল ? হয়তো শুধুই কৌতূহল। যে মেয়ে মা'র জীবনে এত

দুঃখ কষ্ট এনে দিয়েছে, জীবনটাই ব্যর্থ করে দিয়েছে, সে কেমন মেয়ে দেখার আগ্রহ হয়তো।

গিয়ে দেখেছে সকলেই কত স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের মতোই। কেউ শয়তান নয়, কেউ ডাইনি নয়। সাধারণ মানুষ কেন বলছি, তার চেয়েও বড়। তা হলে এমন কেন হয়! দু' বছরের একটা বাচ্চা শিশুকে কোলে নিয়ে একজনকে কেন চলে আসতে হয়।

ও চিরকাল জেনে এসেছে বাবা খারাপ, খারাপ। এখন দেখছে তা সত্যি নয়। অথচ লোকটাকে ও কিছুতেই বাবা বলে মেনে নিতে পারছে না। মনে হচ্ছে একটা অচেনা লোক। যার সঙ্গে ও কোনও তারে বাঁধা পড়েনি।

মাকে দেখেও মনে হল না, খুব একটা উৎফুল্ল, স্বামী ফিরে আসাতে খুশি। মা হেসেছে, কথা বলেছে, দোরগোড়া অবধি এগিয়ে এসেছে বিদায় দেবার সময়। কিন্তু সবটাই কেমন কৃত্রিম।

অথচ ওর মনে হয়েছিল মা হয়তো ফিরে পেতে চায়। কেন চায় তাও বুঝতে পারেনি।

মাকে জিগ্যেস করতে পারছিল না, মাকে বলেছে কি না, যে রিমির জন্যে সারা জীবন ধরে সঞ্চয় করেছে যা কিছু, তা রিমির নামেই রেখে দিয়েছে। রিমির বিয়ের কথা ভেবে গয়না গড়িয়ে রেখেছে। কে আবার! সেই লোকটাই, যাকে বাবা বলে ভাবতে পারছে না।

ক্ষণিকের মোহে সেদিন রিমির মনটা ভিজে এসেছিল। মনে হয়েছিল, কি ভাল, কি ভাল। ওটা বোধহয় ওর লোভ। আর কিছুই নয়।

এখন আর ওসবের প্রতি ওর কোনও আকর্ষণ নেই।

যেভাবে আর পাঁচটা মেয়ের বিয়ের চেষ্টা হয় সেভাবেই চলছিল। কখনও কখনও কথাবার্তা ওর সামনেই হত। ও কখনও কখনও মজা পেত, কখনও কপট রাগ।

—ছোটমামা, তুমি টাকার কথা ভেবো না। কল্যাণী বলেছে, যা কিছু এতদিন জমিয়েছি, সবই তো রিমির জন্যে। তারপর আমি তো একা মানুষ, মা আর কদ্দিন, চলে যাবে আমাদের।

একটু পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, কারও কাছে দয়ার ভিক্ষে যেন না করতে হয়।

ছোটমামা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, তুই অত ভাবিস কেন, রিমিকে যে দেখবে সেই পছন্দ করবে। ওর মতো ভাল মেয়ে ক'টা আছে!

সত্যি সত্যি একজনের পছন্দ হয়ে গেল, আর রিমিরও তাকে।

তবু রিমি বলে উঠল, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

কি কথা? ছোটমামার চোখ কপালে উঠল। কল্যাণীর ভুরু কুঁচকে গেল। তা হলে ছেলেটিকে রিমির পছন্দ হয়নি নাকি? না, অন্য কারও সঙ্গে ভাব-ভালবাসা হয়েছে।

রিমি বললে, একান্তে আপনাকে কিছু বলতে চাই।

যাঁরা ছেলেটির সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা উঠে গেলেন।

—ছোটমামা, চলে এসো। কল্যাণী বললে।

কল্যাণী নিজেও সরে এল।

রিমি বললে, একটা কথা বোধহয় এরা সবাই গোপন করে গেছে।

—কি কথা? ছেলেটি উৎসুক হয়ে জানতে চাইল।

রিমি বললে, আমার যখন দু'বছর বয়েস, আমার মা বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছিল, আসতে বাধ্য হয়েছিল।

ছেলেটি শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, সবই জানি। ওঁরা আমাদের সবই

বলেছেন। তোমার মা নিজে।

রিমি অবাক হয়ে গেল। সব জেনেও এই ছেলেটি ওকে বিয়ে করতে চাইছে!

তা হলে ওর সর্বাঙ্গে কোনও অদৃশ্য কালিমা জড়িয়ে নেই! কোনও স্ক্যান্ডাল নেই মা'র নামে! কেনই বা থাকবে, থাকার তো কথা নয়।

গভীরভাবে নিশ্বাস নিল রিমি। অযথা সারা জীবন ধরে মাথা নিচু করে এসেছে ও! এর মধ্যে মাথা নিচু করার কিছুই ছিল না, তবু।

ওর হঠাৎ মনে হ'ল, আমাদের তো চিরকাল মাথা উঁচু করেই চলা উচিত ছিল। মিথ্যা এতদিন লজ্জা পেয়েছি, কষ্ট পেয়েছি।

বিয়ের কথাবার্তা পাকা, সবাই ব্যস্ত।

মা, ছোটমামা, দিদা। বড়মামা এল একদিন, মামিমারা।

ঘর ভরে উঠেছে আনন্দ-উৎসবে।

ছোটমামা কল্যাণীকে বললে, এবার সুবিমলকে সব জানিয়ে একটা চিঠি দিয়ে দে। ও আসুক, ওকে বলি। বললেই রাজি হবে।

—কি রাজি হবে, মা? মা'র দিকে ফিরে ও প্রশ্ন করল।

ছোটমামা বললে, বিয়ের সময় তোর বাবা তোকে সম্প্রদান করবে। সবাই বলবে, বাবা নিজে সম্প্রদান করছে। তা হলে বেশ ভাল দেখায়।

তক্তপোশটার ওপর বসে ছিল রিমি। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল।

চোখেমুখে যেন ক্রোধ উপচে পড়ছে।

বললে, কি বলছ তোমরা!

বললে, না, কখনওই না। ওই লোকটাকে আমি 'বাবা' বলে ভাবতেও পারছি না। সে কেন আমাকে সম্প্রদান করবে!

শুধু কিছু টাকা আব গয়নার লোভ দেখিয়ে লোকটা বাবা হতে চায়?

রাগের স্বরে বললে, না মা, না। আমি তোমার মেয়ে। আমার বাবা নেই। কোনওদিন ছিলও না।

মা'র দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি সম্প্রদান করবে, তুমি।

কল্যাণী ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

চোখে জল এসে গেল কল্যাণীর। গভীর আবেশে ওকে জড়িয়ে ধরল। কান্নার গলায় বললে, তুই তো আমারই মেয়ে। চিরকাল ছিলি, চিরকাল থাকবি।

রিমি তখন ভাবছে, বাবার কথা শুনেই কেন এত কঠোর হয়ে উঠল ও। শুধুই বাবাকে অস্বীকার করার জন্য, নাকি যে কথা আজ সবাই ভুলে গেছে, সেটা আবার মনে পড়াতে চায় না বলে।

রিমি বললে, মা, আমরা তো এখন মাথা উঁচু করে চলতে শিখেছি, বাবা ফিরে এলে আবার মাথা নিচু হয়ে যাবে।



# অহঙ্কার



পুণ্য বললে, চল, ভুট্টা খাওয়া যাক।

কথাটা বলল, কিন্তু একটু হাল্কা চালে। যাতে প্রয়োজন হলে ওটা নিছক রসিকতা করেছে এমন ভাব দেখিয়ে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে।

ওদের গলির মোড়ে এই লোকটা বসে। এক পাশে একরাশ ভুট্টা সামনে একটা বালতি-উনোন, মা বলত 'তোলা উনোন', ওদের রান্নাঘরেও এক সময়ে ছিল, বোধহয় ফেলে দেওয়া হয়েছে, কিংবা যেখানটায় অকেজো জঞ্জাল স্তূপীকৃত করে রেখে স্টোর রুম বলা হয় সেখানেই কোথাও মুখ লুকিয়ে আছে। এই ক'বছর আগেও ওদের রান্না যখন গ্যাস বার্নারে, গ্যাসের অভাবে কেরোসিন স্টোভে, কেরোসিনের জন্যে পুণ্যকে কয়েকবারই, সে তো অতীব তুচ্ছ ব্যাপার, বাবাকেও একবার লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল। ঠিকের মেয়েটা কাজে কামাই করেছিল বলে। প্রায়ই করে, একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে। সে যে কি লজ্জার ব্যাপার, বাজারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে, পাঁচ লিটারের পলিথিন ক্যানটা হাতে রাখতে পারেনি, পায়ের কাছে নামিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তার চেয়ে লজ্জা যেদিন আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরে শুনল, বাবা কিউ দিয়ে কেরোসিন এনেছে। রেগে গিয়েছিল ভিতরে ভিতরে, কার বিরুদ্ধে ও নিজেও জানে না। লাইনে যখন নিজেকেই দাঁড়াতে হয়েছে তখন রেগেছে বাড়ির বিরুদ্ধে, মায়ের বিরুদ্ধে, এমনকি ঠিকের মেয়েটার বিরুদ্ধেও। কারণ সে কামাই না করলে এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ত না। সে যে কি অস্বস্তি, ফালতু লোকদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থেকে কেবল এপাশ ওপাশ দেখা, চেনা কেউ না দেখে ফেলে, বিশেষ করে বন্ধুবান্ধব। বাবাকেও কেউ দেখে ফেলেছে কিনা এই আশঙ্কাতেই রেগে গিয়েছিল সেদিন।

তবু, সেসবও সহ্য হয়েছে। কিন্তু ক'বছর আগেও, ঠাকুমা বেঁচে থাকতে, মাথা কাটা যেত ওই তোলা উনোনটার জন্যে। বিধবা মানুষ, মা আঁশ হাতে কখন কি ছুঁয়ে দেবে এই ভয়ে, বারান্দার এক কোণে নিজের হাতে রান্না করতেন। ওই তোলা উনোনে।

সমস্ত বাড়িতে তখন কি অশান্তি শুধু ওই তোলা উনোনটার জন্যে। নিজে রান্না করছেন ঠাকুমা, এটাই তো এক লজ্জা। কেউ বুঝবে না, কেন।

পুণ্যর তখন সবসময় ভয় বন্ধুরা কেউ এসে না দেখে ফেলে। মুখ ফুটে জিগ্যেস করবে না, কিন্তু কি ভেবে বসবে কে জানে। কারণটা বললে হয়তো অজুহাতের মতো শোনাবে। মন্যু, মানে মন্যুমান, ওরা অবশ্য মনু বলে ডাকে, কয়েকবারই গিয়েছে ও, ওদের স্বপ্নময় বাড়িটায়, সঙ্কোচ হয় বলেই আসতে বলে না, তবু এসে পড়ে মাঝে মাঝে। নীচের ঘরে বসায়, কিন্তু ও যা ছেলে, কোনদিন যদি তরতর করে দোতলায় উঠে আসে, দেখে ফেলে, ঠাকুমা তোলা উনোনে কড়াই চাপিয়ে খুন্তি নাড়ছে, কিংবা উনোনের ভাঙা ঝিক্-এ মাটি লেপছে, সে কি লজ্জা! মন্যুরা বেজায় মডার্ন, হয়তো বলে বসবে, বুড়ি ঠাকুমাকে দিয়ে রান্না করাচ্ছিস? এ ব্যাপারে ঠাকুমা যে একগুঁয়ে এবং জেদি সে-কথা বললে হয়তো হেসে উঠবে, 'সে কি রে, এ যুগেও এসব আছে নাকি।' পুণ্যর অন্তত তাই ধারণা। সবাই তো খুব আধুনিক হচ্ছে, কম বয়েসে বিধবা হয়ে বিয়েথাও করছে আবার, কিন্তু সে-সব বাড়িতে বয়স্ক বিধবারা কতখানি মডার্ন? মাছমাংস খায়? খেলে, বাড়ির লোক বুক ফুলিয়ে বলতে পারে? বললে অন্য সকলে স্বাভাবিক মনে করে? বদলেছে

তো শুধু বাইরেটা, ভিতরে ভিতরে আমরা তো সেই একই জায়গায় আছি। তবে ঠাকুমার এই স্বপাক খাওয়ার জিদটা একটু বাড়াবাড়ি। অথচ উপায় নেই। মায়ের ওপর কোনও চাপা রাগ থেকে কিনা তাও জানত না পুণ্য।

গ্যাস, হিটার, কেরোসিন স্টোভের বাড়িতে ওই কয়লার উনোনটার মতোই বেমানান এবং লজ্জার বস্তু হয়ে উঠেছিল ওই ঠাকুমাও। মারা গিয়ে মুক্তি দিয়ে গেছেন। বাড়িটা এখন ফিটফাট পরিচ্ছন্ন।

কিন্তু ওই তোলা উনোন দেখলেই ঠাকুমার কথা মনে পড়ে যায়। গলির মোড়ে মাঝে মাঝে ওটা দেখতে পায়। আজও দেখতে পেল।

পুণ্য বলে উঠল, চল্, ভুট্টা খাওয়া যাক।

—দাদা! উচ্চারণে একটা মৃদু ধমক।

পুণ্যর মনে কিছুটা সন্দেহ ছিল বলেই ও কথাটা বলেছিল হাল্কা চালে। ঋতা নাক সিঁটকে দিলে বা ভুরু কুঁচকে তাকালে ব্যাপারটাকে রসিকতা হিসেবে উড়িয়ে দিতে পারবে।

আজকাল ঋতাকে, ঋতার কথাকে মূল্য না দিয়ে পারছে না। ভিতরে ভিতরে সমীহ করছে কি?

হেসে উঠে কথাটা বাতিল করে দেবে ভেবেছিল, মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, খেলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত শুনি? এই সেদিনও তো বন্ধুদের নিয়ে পার্কের কোণে ফুচকা খেয়েছিস।

পাড়ার অনেকেই খায়, মেয়েরাও।

বৃষ্টিবাদলার দিন না হ'লে লোকটা ঠিক ওইখানটিতে এসে বসবে।

দেহাতি হিন্দুস্থানি, সামনের আধা জ্বলন্ত উনোনের ওপর দুটো ভুট্টা পুড়ছে। মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দিচ্ছে লোকটা। বাঁ হাতে হাতপাখা নাড়ছে তাপ বাড়ানোর জন্যে। বাঁ পাশে একরাশ ভুট্টা একটা ডালার ওপর। সাদা সবুজ খোসার ভেতর থেকে সাদা সাদা মুক্তোর দানা উঁকি দিচ্ছে।

পুণ্য একদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। খাবে ভেবেও ছিল। কিন্তু বড্ড সময় লাগে। এক একটা ভুট্টা সেঁকা হয়ে যাচ্ছে, আর ঘষে ঘষে নিম্বুনিমক মাখিয়ে দিচ্ছে। যখন ছোট ছিল কত খেয়েছে, এখনই একা খেতে লজ্জা।

একটা রিক্সা গলির মোড় থেকে বেরিয়ে আসছিল বলে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছিল।

ভুট্টাওয়ালার দিকে না তাকিয়ে ঋতা বললে, বাঁয়ে। অর্থাৎ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে।

পুণ্যর ইচ্ছে ছিল এখানেই নেমে পড়ে ভুট্টা চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরবে। মনে থাকে না যে, ঋতার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়।

তাই ইচ্ছেটা মনের মধ্যে গুটিয়ে রেখে শুধু বললে, বাড়িতে একটা উনোনও নেই, বাজার থেকে কিনে এনে যে...

ঋতা হেসে ফেলল। বললে, বাবা এত বেগুনপোড়া ভালবাসত।

পুণ্যও হাসল। —মা তো বলে গ্যাসে এসব নাকি ভাল হয় না।

ঋতা পুণ্যর মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, তা বলে আবার উনোন ঢোকাতে যাস্ না যেন।

—পাগল। অনেক কষ্টে বিদেয় হয়েছে। পুণ্য বলল।

—অনেক কষ্টে। ঋতাও উচ্চারণ করল।

আসলে একটু গুছিয়ে আনা এই বাড়িটায় আধুনিকতার পালিশ দিয়েও খুঁত রয়ে যাচ্ছিল। বারান্দার কোণা থেকে ওটাকে বিদেয় করার জন্যে যেন সকলে গোপনে

অপেক্ষা করছিল কবে ঠাকুমাও বিদায় নেবেন।

বার্ধক্যে জবুথবু, ধুতি-পাড় সাদা শাড়ি কখনো ইস্ত্রি দেখেনি, কিন্তু মন খুব নরম ছিল। অথচ নাতিনাতনিদের আদর করতে এলে, কিছু খাবার বানিয়ে দিতে এলে ওরা ঘেন্না করতো না ঠিকই। কিন্তু অপছন্দ তো করত।

পুণ্যর মনে পড়ল, বাবা একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, অত মডার্ন হতে গেলে কিছু কিছু ভাল জিনিস তো হারাতেই হবে।

কি নিয়ে কথাটা উঠেছিল ঠিক মনে নেই।

এখন আর ঠাকুমাকে জঞ্জাল মনে হয় না, তাই মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়। মানুষটাকে আরেকটু ভালবাসলে ক্ষতি হ'ত না। সেই তো চলেই গেল, চিরকালের জন্যে।

ছেলেবেলায় পুণ্য কিন্তু ঠাকুমাকে ভীষণ ভালবাসত, গায়ে লেপটে লেপটে থাকত। ঋতার সঙ্গে কোল নিয়ে কাড়াকাড়ি। তখন তো আর কিছুই বুঝত না, শুধু ভালবাসারই দাম ছিল।

এখন ঋতাকেই মনে হয় বড় বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভুট্টা কেনা যাবে না। কে জানে, দু'দিন বাদে হয়তো ওদের সবাইকে জঞ্জাল ভাবতে শুরু করবে।

এক একসময় তাই বাবা এবং মা'র ওপরও রাগ হয়, চোখে জল এসে যায়। বুঝতে পারে না, ও নিজেও ঠাকুমার মতোই পিছিয়ে পড়া মানুষ কিনা।

ঋতা জানালা ঘেঁষে বসেছিল, ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বললে, বাঁয়ে।

বাঁদিকের রাস্তাটা সরু, তার শেষ প্রান্তে বাড়িটা। অনেককাল আগেকার বাড়ি, সুকমলরা ভাড়াও নিয়েছিল অনেককাল আগে। যৎকিঞ্চিৎ বাড়িয়ে বাড়িয়েও এখনো ভাড়া নামমাত্র। কেউ জিগ্যেস করলে জানাতে লজ্জা হয়, শুনে অবাক হয়ে যায় সবাই।

বাড়ির সামনে কে একটা ঠ্যালা রেখে গেছে, তাই ট্যাক্সিটা বাড়ির দরজা অবধি আসতে পেল না, পুণ্য বলে উঠল, রোখো রোখো।

ঋতার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছে ততক্ষণে। একেবারে দরজার সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াতে পেল না বলেই নয়, ওর চোখ পড়ে গেছে তখন উল্টোদিকের তেতলার বারান্দায়। একেবারে সামনাসামনি নয়, দু'খানা বাড়ি পরে, এতকাল আছে তবু ওই মুখ-চেনা অবধি, রাস্তাঘাটে কোনওদিন কথাবার্তা হয়েছে কিনা মনে পড়ে না, কিন্তু কি বিশ্রী কৌতূহল। মেয়েটা, নিভা না কি নাম, আর তার মা, ঋতাকে দেখছে, কি যেন বলাবলি করল, হাসল। আগে এ সব দেখে কিছু মনে হত না, গায়ে মাখত না, মনে হত কোনও ইনোসেন্ট ব্যাপার, এখন সারা শরীর চিড়বিড় করে ওঠে।

ঋতা সেজন্যেই আর দাঁড়াল না, দ্রুত চলে এসে বেশ অনেকক্ষণ কলিং বেলের সুইচ টিপে রইল। দাদা ট্যাক্সির ভাড়া মেটাক, ঋতা এখন কপাটের আড়ালে চলে যেতে পারলে বাঁচে। এই সব উঁকিঝুঁকি, আড়ালে টিপ্পনী ওর একেবারে অসহ্য লাগে।

কাজের মেয়েটা দরজা খুলে দিতেই ঋতা ঢুকে পড়ল। অভ্যাসবশে যাবার সময় নীচের বসার ঘরে একটা উঁকি দিল, কেউ নেই, দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে চলে গেল।

সিঁড়ির মাঝামাঝি, মা ওপর থেকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, ঋতা এলি ? পুণ্য কোথায় ?

—আসছে।

হয়তো কথার কথা, কিন্তু শুনতে খারাপ লাগে ঋতার। যেন মা কিছু সন্দেহ করছে।

কল্যাণী অতশত বোঝে না, মেয়ের মনের ভেতর ঢুকবে কি করে।

সরলভাবে বললে, এত দেরি করে এলি ? সুমন্তবাবু এতক্ষণ বসে থেকে এই চলে

গেলেন।

মাথা নিচু করে সিঁড়ি ভেঙে উঠছিল, ঝট্‌ করে চোখ তুলে তাকাল। —ইস্‌, আরেকটু বসিয়ে রাখতে পারলে না!

একটু থেমে বললে, চা-টা দিয়েছিলে?

—টা আর কি দেব, ডিম ভেজে দিলাম।

ঋতা হেসে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যথেষ্ট। ডাবল ডিমের তো?

মা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

পুণ্য ততক্ষণে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে এসে পৌঁছেছে। ওদের কথা শোনার কোনও আগ্রহই ওর নেই। পাশ কাটিয়ে ওদিকের ঘরে চলে গেল।

ঋতা আড়চোখে দেখলো দাদাকে, ঠোঁটে একটু কৌতুকের হাসি ফুটল। যাক্‌, ফেরত না চাওয়াই ভাল। ভাড়া মেটানোর পর ক'টাকাই বা ফিরেছে। সেজন্যেই হয়তো দেরি করে এল, এসেই ওঘরে ঢুকে গেল। একটু হাসি পেল ঋতার।

কল্যাণী অতশত জানে না, দেখলে বেশ রাগ-রাগ মুখে পুণ্য সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। রাগ হবারই কথা, কিন্তু কল্যাণীও তো নিরুপায়। পুণ্য ছাড়া আর কাকেই বা সঙ্গে দেবে।

সেজন্যেই প্রথম প্রথম এত আপত্তি ছিল।

সুকমল তো বলেইছিল, এসব আমাদের পরিবারে চলে না। ঋতাও চায়নি। শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল, হেসে ফেলেছিল। বিশ্বাসই হয়নি। ঠাকুমা বেঁচে থাকলে ওসব সম্ভবও হত না।

—হ্যাঁ রে সুকু, মেয়েকে বাইজি বানাতে চাস নাকি? ফোকলা দাঁতের এক মুখ হাসি উগরে দিয়ে ঠাকুমা ছেলেকে বলেছিল।

সুকমল বুঝতেই পারেনি।

ঋতার তখন কতই বা বয়েস, সেভেন-এইটে পড়ে। স্কুলের বন্ধুদের, নাকি পাড়ার কাউকে দেখে বায়না ধরেছিল শালোয়ার-কামিজ বানিয়ে দিতে হবে।

কল্যাণী বানিয়ে দিয়েছিল, সুকমলের কাছেও আপত্তিকর মনে হয়নি। হাওয়ার সঙ্গে নিজেদের তো বদলাতে হবেই।

গোলাপি নক্সার শালোয়ার-কামিজ পরে বেণী ঝাঁকিয়ে ঠাকুমাকে দেখাতে এসেছিল। ফুর্তি মাখানো মুখে বলেছিল, দ্যাখো ঠাম্মা, কি পরেছি?

মুখ ফোকলা হলেও চোখ তেমন ঝাপসা হয়নি। চোখ দিয়ে বাচ্চা মেয়েটাকে ওপর থেকে নীচে অবধি যেন লেহন করছে এমনভাবে দেখে ছেলে সুকমলকে হাসতে হাসতে বলেছিল, হ্যাঁ রে সুকু, মেয়েকে বাইজি বানাতে চাস নাকি? অবশ্য বলেছিল হাসতে হাসতেই।

হয়তো নিতান্ত রসিকতা, প্রচ্ছন্ন আপত্তি থাকলেও সেটা তখন ঘুমন্ত, কিংবা বয়েসের ভারে নিজের মেরুদণ্ডের মতোই নুয়ে পড়েছে।

কিন্তু মানুষটার তেজ তো কল্যাণী এ বাড়িতে আসার পর থেকেই দেখে এসেছে। মুখে মা বলে ডাকেও, সম্মান-শ্রদ্ধাও যে না দেখাত তা নয়, কিন্তু এক একসময় বুকের ভেতরটা জ্বলে উঠত। মনে হত এই বুড়ো মানুষটাই তার যৌবনকাল হরণ করে নিয়েছিল। নিজের পায়ের তলায় যখন মাটি পেতে শুরু করেছে, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করে বসল, মন প্রৌঢ় হয়ে গেছে। হয়তো শরীরও।

চোখের সামনে দিয়ে দিনগুলো কেমন দ্রুত বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। একালের ছেলেমেয়েদের দেখে একটু আপশোস হয় কিনা ঠিক বুঝতে পারে না কল্যাণী। কি

পাইনি সে-কথা তো কোনওদিন মুখ ফুটে বলতে পারেনি, ঝাঁঝালো অভিযোগ যখন ক্বচিৎ কদাচিৎ সুকমলকে শুনিয়েছে শুধু তখনই পুরোনো কাসুন্দিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

কি পাইনি সেগুলো মনে আছে বলেই ছেলেমেয়েদের আব্দার যথাসম্ভব রাখার চেষ্টাই শুধু করেনি, নিজে থেকেই যেচে তাদের জন্যে যথাসম্ভব করে এসেছে।

ঋতা বায়না ধরতে কল্যাণী সেজন্যেই মেয়েকে শালোয়ার-কামিজ বানিয়ে দিয়েছিল। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কাপড় পছন্দ করে দর্জির দোকানে নিজে নির্দেশ দিয়ে।

—সকলেই তো পরছে, ওই বা পরবে না কেন ! স্বামীকে বলেছিল।

সুকমল হেসে সায় দিয়েছিল। বেশ তো, করিয়ে দাও।

আর ঋতা সেটা পরার পব কল্যাণীর মনের ভেতরটা যখন খুব খুশি, ঋতার চেয়েও, তখনই কিনা ঋতার ঠাকুমা বলে বসলেন, বাইজির পোশাক।

শুনে কল্যাণীর চোখের কোণ থেকে একটুকরো আগুনের ফুলকি ছিটকে গিয়েছিল। কিছু বলেনি, চোখের দৃষ্টিটাই বলা।

আর সুকমল হেসে চাপা দিতে চেয়েছিল। বলেছিল, আজকাল সবাই পরে মা, সবাই পরে।

মনে পড়লে কল্যাণীর মাঝেমাঝে বলে উঠতে ইচ্ছে করে, মা, আবো কত কি পরছে মেয়েরা দেখে যান।

বলার উপায় নেই। তিনি অনেকদিন হল চলে গেছেন, চিরদিনের জন্যে। কিন্তু সে-সব দিনের স্মৃতিগুলো রেখে দিয়ে গেছেন। মনে পড়লে আজও জ্বালা ধরে।

ওই বুড়ো মানুষটার জন্যেই যেন বাড়িটা একযুগ পিছিয়ে পড়ে ছিল। অন্তত ওদের সকলেবই তাই মনে হত। কিন্তু কিছু কি থেমে ছিল ? কিছুই না। দিনে দিনে সবই বদলেছে, বুড়িটাব চোখেব সামনেই।

ঠাকুমা কোনও পরিবর্তনই আটকে রাখতে পারেননি। শুধু অক্ষম অনুযোগ করেছেন। ভাবতে পারেননি ওই অনুযোগটুকুই বাড়ির শান্তি নষ্ট করেছে।

এখন আর বারান্দাব এক কোণে সেই উনোনটা নেই। হাতপাখা ছাই হাঁড়ি কড়া খুন্তি নেই। সব সরে গিয়ে ঝকঝকে তকতকে। কিন্তু কল্যাণী কি নিজেই একটু একটু করে বৃদ্ধা শাশুড়ির মতোই হয়ে যাচ্ছে নাকি ? মনে হচ্ছে ছেলেমেয়ের সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারছে না।

—চা-টা দিয়েছিলে তো ?

সুমন্তবাবু এতক্ষণ বসে থেকে থেকে চলে গেছেন শুনে ঋতা জিগ্যেস করেছে।

মুখে হাসি এনে তাকে খুশি করার মতো ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছে। কিন্তু মেয়ের মুখ থেকে এ-সব কথা শুনতে ভাল লাগেনি। এই বয়েসে ওঁকে কি ভদ্রতা সৌজন্য মেয়ের কাছ থেকে শুনতে হবে নাকি ! আর এত খাতির যত্ন করার প্রয়োজনই বা কি।

এক একসময়ে মনে হয় ঋতার জন্যেই পাড়াপড়শী থেকে আত্মীয়স্বজন থেকে কেমন যেন আলাদা হয়ে গেছে কল্যাণী।

ওদের সংসার তো বেশ সচ্ছলই ছিল। সুকমল ধাপে ধাপে উন্নতিও করেছে। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির চেহারাটাও বদলেছে। দেয়ালে ডিসটেম্পার, তা থেকে প্লাস্টিক পেন্ট। জানালা দরজার পর্দা দামি থেকে আরো দামি। কেউ এলে বিছানার চাদরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করত, কোথায় কিনেছেন ? এর বেশি একটা মানুষ আর কি চায় ?

চায় শুধু আরেকটু স্বপ্ন।

কল্যাণীর সে স্বপ্নও ছিল। ছেলে আর মেয়ের ভবিষ্যৎ।

দু'জনকেই ভাল স্কুলে পড়িয়েছে।

কল্যাণীর মামাশ্বশুর একবার তার বিধবা দিদিকে, অর্থাৎ ঋতার ঠাকুমাকে দেখতে এসে এই বারান্দায় মোড়া নিয়ে বসে খুব গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে আসতেন, যত না দিদিকে দেখতে, কল্যাণীর ধারণা বিধবা শাশুড়িকে কত অযত্নে রাখা হয়েছে সেটুকুই দেখতে।

যে কেউ দেখলে সে কথাই তো ভাববে। অযত্ন। অবহেলা।

কল্যাণীকে তাই বলতে হয়েছে, উনি তো নিজের রান্না ছাড়া খাবেন না। আমাদের হেঁসেলের ছোঁয়া থেকে দূরে থাকার জন্যেই ওইসব। বলে উনোন আর রান্নার সরঞ্জামগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়েছে কল্যাণী। হেসে হেসে বলেছে, আপনি বরং বুঝিয়ে বলুন, এই বয়েসে এ সব কি পোযায় ?

মামাশ্বশুর কিছু বলার আগেই ও কোণ থেকে রুক্ষ গলা ভেসে এসেছে, কেন, আমি কি মরে গিয়েছি নাকি, যে ছেলের বৌয়ের হাততোলা খেতে হবে।

ব্যস। কল্যাণীর আর কিছু বলতে ইচ্ছেও হয়নি।

অথচ এই মামাশ্বশুরই এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে বলে এসেছেন, দিদিকে কিভাবে যে রেখেছে সুকমল, হাজার হোক ওর তো মা।

লতায় পাতায় পল্লবিত হয়ে সেকথা কল্যাণীর কানেও এসেছে। তবু উনি এলে, হাজার হোক মামাশ্বশুর, তাই ভিতরের রাগ চেপে রেখে হেসে হেসে কথাও বলতে হয়, আপ্যায়নও করতে হয়। একেবারে উপেক্ষা করতে হলেও চার টাকার সন্দেশ বা কালোজাম। মনমেজাজ ভাল থাকলে লুচি আলুর দম। সকালের দিকে এলে ভাতও।

বেশ দশাসই চেহারা অনাদিবাবুর, আর খেতেও পারেন। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, কালোয় সাদায় আধাআধি। একটু ভোঁতা-ভোঁতা মুখ। কিন্তু একটাই গুণ, জমিয়ে গল্প করতে ভালবাসেন। অবশ্য বৈষয়িক কিংবা সাংসারিক কথাবার্তাই বেশি।

সেদিনও এই বারান্দায় মোড়ায় বসে গল্প করছিলেন।

ঋতা স্কুল থেকে ফিরল। কাঁধে স্কুলব্যাগ, স্কুলব্যাগের ভারে কাঁধটাও ঝুলে গেছে।

অনাদিবাবুকে দেখেই রোদে পোড়া ঘামে ভেজা মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে ঋতা ব্যাগটা মেঝের ওপরই অবহেলায় ধপাস করে ফেলে দিয়ে প্রণাম করল।

বাঁ হাতখানা তার মাথার এক বিঘত ওপরে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে রেখে অনাদিবাবু বললেন, বইয়ের ব্যাগ না চালের বস্তা রে।

ব'লে নিজেই নিজের রসিকতায় হেসে উঠলেন।

কল্যাণী বলল, আর বলেন কেন।

বলেই ঋতাকে ধমক দিল, ব্যাগটা যে ওইভাবে ফেললি, বইগুলো নষ্ট হবে না !

ঋতা ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে ব্যাগটা তুলে নিয়ে রাখতে গেল।

কল্যাণী পিছন থেকে কথা ছুড়ে দিল, তোদের আর কি, ছিঁড়ে গেলে কিনে দাও বলেই খালাস।

অনাদিবাবু হাসলেন। —তা অত ভাল ইস্কুলে পড়াবে, আর একটা বই ছিঁড়ে গেলে কিনে দেবে না ?

'অত ভাল ইস্কুলে', এই কথাটার মধ্যে একটা খোঁচা আছে।

প্রথম যখন ভর্তি হয়েছিল, ভর্তি হয়েছিল না বলে ভর্তি করতে পেরেছিল বলাই ভাল, ওরা লিস্টে নাম উঠেছে দেখে এসে খুব আনন্দ করছে। অনাদিবাবু এলেন, এসে শুনলেন, কিন্তু ওদের আনন্দে অংশ নিতে পারলেন না। উল্টে বলে বসলেন, ওখানে কেন, ওখানে তো শুনেছি অনেক খরচ। ওসব শুধু বড়লোকদের ব্যাপার।

সুকমলের চোখমুখের উচ্ছ্বাস দমে গিয়েছিল। তবু হাসার চেষ্টা করে বলেছিল, ওটুকুই

তো আমাদের ইনভেস্টমেন্ট, জমাবার মতো টাকাও রোজগার করি না, জমিবাড়ির কথাও ভাবি না।

অনাদিবাবু বেশ কয়েকবছর আগে বেহালায় একটা বাড়ি করেছেন। বিধবা দিদিটার ওপর এত মায়ামমতা দেখান, মাস দু'মাস অন্তর একবার দেখা করতেও আসেন, তবু মুখ ফুটে কখনও বলেন না, দিদি চলো দিনকয়েক আমাদের ওখানে থেকে আসবে।

একবার শুধু বাড়ি দেখানোর জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন।

'জমি বাড়ির কথাও ভাবি না', একথা সুকমল অত ভেবে বলেনি। কিন্তু অনাদিবাবু ভাবলেন ওঁকেও খোঁচা দিয়ে বলা।

বললেন তোমরা তো শুধু বাড়িটাই দ্যাখো, কিভাবে যে সংসার চালাই...

একটু থেমে বললেন, অন্য ইস্কুল থেকেও তো ছেলেমেয়েরা পাশ করছে...ফার্স্ট সেকেণ্ডও হয়। তাই বলছিলাম।

সুকমলের এসব আলোচনা ভাল লাগছিল না। কল্যাণীরও নয়। যার যার নিজস্ব কিছু ইচ্ছে থাকে, নিজের নিজের যুক্তি থাকে। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তার কোনও বিচার চলে না। সকলেই চায় আমি আমার মতো করে বাঁচব। একজনের যুক্তি আরেকজন মানে না বলেই তো তর্ক বেধে যায়। 'অন্য ইস্কুল থেকেও তো ছেলেমেয়েরা পাশ করছে... ফার্স্ট সেকেন্ডও হয়।'

সুকমল বিরক্তি চেপে বলেছিল, সে-সব ব্রিলিয়েন্ট ছেলেরা... আমার ছেলেমেয়েরা তেমন ব্রিলিয়েন্ট নয়।

কল্যাণী বলেছিল, এখন আর শুধু পাশ করারও কোনও দাম নেই।

অনাদিবাবু আর কোনও কথা বলেননি, শুধু হেসে উঠে সুকমলের কথার প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন, 'ইনভেস্টমেন্ট'। উপহাস আর কি।

অনাদিবাবু কি ভেবেছিলেন কে জানে, হয়তো ভেবেছিলেন ছেলেমেয়েরা ভালভাবে পাশ করে ভাল চাকরি করে বুড়ো বাবা-মাকে খাওয়াবে। ছেলেকে মানুষ করার পিছনে ওঁদের যুগে তো এ কথাটাই ভাবত।

সুকমল বা কল্যাণীরা ভাবে না। সুকমল জানে নিজের পেনশন নিজেকেই রোজগার করতে হয়। ইনভেস্টমেন্ট বলতে ও তো ভেবেছিল, ছেলেমেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করবে। তার জন্যে যতখানি সম্ভব ব্যবস্থা করে দেওয়া। গর্ব করার মতো কিছু হলে গর্ব করে বলবে, ওটুকুই লাভ।

সুকমলের অবশ্য এক একসময় খটকা লাগে, শুধুই কি তাই ? ওই স্কুলে ভর্তি করতে পেরে এত যে আনন্দ হয়েছিল, অফিসের সকলকে স্কুলের নামটা বলেছিল, যেন যুদ্ধ জয় করেছে এমন ভঙ্গিতে, তার পিছনে কি কিছুটা আত্মগর্ব ছিল না ? স্ট্যাটাস ?

ঋতা ব্যাগটা রেখে স্কুলের পোশাক বদলে হাতমুখ ধুয়ে এসে বললে, মা খেতে দাও, টেরিফিক খিদে পেয়েছে।

অনাদিবাবু মোড়াটায় বসে ছিলেন, বিধবা দিদিকে শোনাচ্ছিলেন দূরস্য দূর কোন আত্মীয়ের কার কি অসুখ হয়েছে, কার চাকরিতে প্রোমোশন, কে টাকা করেছে, কে দিব্যি মামলায় জব্দ হচ্ছে।

সেজন্যেই পুণ্য নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করে বলে, ঠাম্মা'জ গেজেট।

হয়তো শুধু ঠাকুমারই নয়, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরও। এ বাড়ির সব খবরও তাঁর জানা চাই।

ঋতাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করলেন, কোন ক্লাস হল ?

ঋতা বললে।

তারপর— । ফার্স্ট সেকেন্ড কিছু হচ্ছ ?

হয়তো এমনিই, কিংবা উৎসাহ দেবার জন্যে ।

কিন্তু কল্যাণীর শুনতে খারাপ লাগে । ফার্স্ট সেকেন্ড হয় না বলে একটা দুঃখ তো আছেই, তার ওপর অনাদিবাবুর কথাটা উপহাসের মতো শোনায় । যেন বলতে চাইছেন তা হলে আর এত খরচ করে এত ভাল স্কুলের দরকার কি ছিল ।

হঠাৎ অনাদিবাবু বলে বসলেন, জানো বৌমা, আমাদের সেই যমুনাকে মনে আছে ? শিলিগুড়ির ? তার ছেলে আই আই টিতে ভর্তি হয়েছে ।

ঠাকুমা মারা যাওয়ার বেশ কিছুদিন বাদে পুণ্য একবার বলেছিল, যাক্ বাবা, বারান্দার কোণ থেকে তোলা উনোনটা গেছে । কেউ এলে এত খারাপ লাগত...

শুনে হেসেছিল ঋতা । বলেছিল, যাঃ, ওভাবে বলতে নেই ।

এখন কল্যাণী ভাবে, যাক্, বাঁচা গেছে । ওই মামাশ্বশুরটা আর আসে না । ওই সব খোঁচা দেওয়া কথা শুনতে হয় না ।

কথায় যে কি বিষ থাকে আমরা কেউ জানি না । সাপের বিষ থেকে তবু মরে নিস্তার পাওয়া যায়, কথার বিষ যতদিন বাঁচবে ততদিন স্মৃতি হয়ে থেকে থেকেই ছোবল দেবে ।

সেই ঋতা এখন কলেজে পড়ে, টুয়েলভে, পুণ্য জয়েন্টে সুবিধে করতে না পেরে বি এসসি পড়ছে । কতকাল কেটে গেছে কিন্তু কথাগুলো কল্যাণী ভুলতে পারেনি ।

ছেলে পাশ করে বেরোলেই চাকরির চিন্তা করতে হয়, মেয়ে পাশ করে বেরোলে বিয়ে । কল্যাণীর অবশ্য ও দুটো চিন্তার একটাও নেই । একেবারেই যে নেই তাও নয় । তবু এখনও তো বেশ কয়েক বছর দূরে, তাই চিন্তাটাকেও সরিয়ে রাখতে পেরেছে ।

কল্যাণীর দাদাবৌদি থাকে হাতিবাগানে, দাদা গরমেন্টে কি একটা চাকরি করে । কল্যাণী ভাল জানেও না । কিন্তু বৌদির সঙ্গে খুব ভাব । দেখা হলে গল্প আর শেষ হতে চায় না । গোলগাল চেহারা, খুব হাসিখুশি । আর দাদা একেবারে আলাদা । বেশি কথা বলে, কথার মধ্যে সবসময় কেমন একটা উপদেশ কিংবা পরামর্শ জড়িয়ে থাকে ।

বিজয়ার পর প্রতিবছরই ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুকমল আর কল্যাণী একবার প্রণাম করতে যায় ।

গতবছরও গিয়েছিল । যেতেই ঋতাকে দেখে দাদা হেসে বলে উঠল, মেয়ে যে বড় হয়ে গেল রে, এবার তো বিয়ের কথা ভাবতে হয় ।

এরকম কথা শুনতে কল্যাণীর ভাল লাগে না, তবু যেহেতু দাদা বলছে, দাদা তো ভালই চায়, এ তো আর খোঁটা দেওয়া মামাশ্বশুরের কথা নয়, তাই কল্যাণী বললে, পাশ তো করুক, পড়া শেষ হোক্ । তারপর চাকরি করবে ।

দাদা হাসতে হাসতে বললে, দ্যাখ কল্যাণী, মেয়েদের ওই এম এ পড়া রিসার্চ করাও যা চাকরি করাও তাই । ওসব হ'ল ওয়েটিং রুম, ডেস্টিনেশন কিন্তু সেই একটাই—বিয়ে ।

সুকমল ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চাইল ।—বয়েস তো হোক্, তখন ভাবা যাবে । চাকরি করেও তো অনেকে বিয়ে করে । কি বলেন বৌদি ?

বৌদির গোলগাল ফর্সা মুখে কৌতুকের হাসি ফুটল । ওর মেয়ে নেই, দুটিই ছেলে । তার জন্যে একটা চাপা গর্বও । কিন্তু একটা চাপা ক্ষোভ আছে অন্যত্র, কিংবা অত্যন্ত গোপন একটা তাচ্ছিল্য ।

বলে বসল, তুমি চুপ করো, তোমার ওই হাতিবাগানের চিন্তাভাবনা নিয়ে ওরা চলে না । ওরা সাউথ ক্যালকাটায় থাকে ।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল ।

দাদা ছাড়বার পাত্র নয় । বললে, মেয়ের বিয়ের নর্থ সাউথ নেই গো, প্রবলেম ইজ

সেম এভরিহয়ের। বাঙালি তো!

কল্যাণী বললে, তা হ'লে তুমিই খোঁজখবর নিও দাদা, এখনও তো কয়েকবছর হাতে আছে।

দাদা বিজ্ঞের মতো বললে, দেখতে দেখতে কেটে যাবে, এখন তো বুঝছিস না, কয়েকবছর তখন মনে হবে কয়েকদিন।

বৌদি হেসে বললে, ছাড়ো তো। বিজয়ার পর এসেছে, সন্দেশ-টন্দেশ আনানোর জন্যে উঠে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীও উঠল, ওর পিছনে পিছনে যেতে যেতে কাঁধে একটা চাপড় মেরে বৌদিকে বললে, এই, সাউথ ক্যালকাটা বললে কেন? আমিও তো এই হাতিবাগান থেকেই গিয়েছি, না কি?

বৌদি গোলগাল মুখে হাসি ছড়িয়ে বললে, তোমার দাদা খুব জব্দ হয়।

কল্যাণীও হেসে উঠল, তার কারণ ও জানে, দেখে আসছে, দাদা হাতিবাগান ছাড়া আর কোনও বাসযোগ্য জায়গা আছে বলে বিশ্বাস করে না। ওই আড্ডা, ওই চায়ের দোকান, ওই গলির ভিড়, ট্রামবাস, সিনেমা-থিয়েটার—এ সব ছেড়ে কোথাও গেলে ওর নাভিশ্বাস ওঠে। কথায় কথায় বলে, এখানে লাইফ আছে। কে জানে কে কোনটাকে লাইফ মনে করে।

তবে ভবানীপুরের এই অঞ্চলটাকে কল্যাণী সাউথ ভাবতে পারে না। দাদাবৌদিরই শুধু ধারণা। যখন প্রথম এসেছিল তখন তবু মনে হত, এখন আর হয় না। এখন সাউথ অনেক দূরে সরে গেছে। পুরোনো কম ভাড়ার এই বাড়িটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না, সম্ভবও নয়, তাই আবো ঝকঝকে দক্ষিণপাড়ার যাওয়ার বদলে এটাকেই কিছুটা ছিমছাম করে নিয়েছে। পোশাক পরিচ্ছদও দিনে দিনে বদলে গেছে। বাইরে বেরোবার সময় পাড়ার অনেকেই দেখে, লক্ষ করে। তাদের সম্পর্কে কল্যাণীর মনে ঈষৎ ঘৃণা আছে।

কিন্তু ধারণাগুলো হঠাৎ একদিন যেন রাতারাতি ওলোটপালোট হয়ে গেল।

ঋতা কথাটার কোনও গুরুত্বই দেয়নি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। বরং সন্দেহ হয়েছে ওটা নিছক ইয়ার্কি।

কলেজে অনেক বন্ধুর মধ্যে ওরা তিনটি মেয়ে একটু বিশেষ বন্ধু। বেশি ঘনিষ্ঠ। বাণী, ঋতা, শর্মিষ্ঠা। সবসময় তিনজন একসঙ্গে। ক্লাসে পাশাপাশি, ক্যান্টিনে একই টেবিলে। আড্ডা, সিনেমা দেখা, নিউমার্কেট ঘোরা। কখনো বাড়িতে জানিয়ে, কখনো না জানিয়ে। তিনজন তিনদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, কিন্তু কলেজে এসে একজোট না হতে পারলে যেন দিনটাই মাটি। এত বন্ধুত্ব, কিন্তু শর্মিষ্ঠা যে এইরকম একটা কাণ্ড করে বসবে ও ভাবতেই পারেনি।

লজ্জায় রাগে ঋতার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

একদিন ওই শর্মিষ্ঠাব দাদার সঙ্গে সামান্য দু'চারটে কথা হয়েছিল, তার বেশি নয়। কি কারণে যেন কলেজে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বয়েসে বেশ বড় ওদের চেয়ে, তিরিশ হবে কি পয়ত্রিশ, আন্দাজে বুঝতে পারেনি।

স্বভাববশতই ওরা দূরে সরে গিয়েছিল, অপেক্ষা করছিল শর্মিষ্ঠা দাদার সঙ্গে কথা সেরে ফিরে আসবে।

কিন্তু শর্মিষ্ঠা দু'একটা কথা বলেই দু'পা এগিয়ে এসে ওদের দু'জনকেই ডাকল। পরিচয় করিয়ে দিল, আমাব দাদা।

দাদাটি কিন্তু বেশ স্মার্ট এবং কথাবার্তাতেও তুখোড়। ঋতাও এমন কিছু লাজুক লাজুক মেয়ে নয়। বরং দিব্যি সপ্রতিভ। সপ্রতিভভাবেই তার কথার উত্তর দিয়েছে, তার

রসিকতায় হেসেছে, নিজের থেকেই দু'চার কথা বলেছে। ব্যস্।

তারপর ঘাড় কাত করে মৃদু হেসে বলেছে, চলি ?

প্রথমত ওর কোনও কৌতূহলই হয়নি, নিতান্তই সৌজন্য। তার ওপর বেশি ভদ্রতা দেখিয়ে বেশি বেশি কথা বললে হয়তো শর্মিষ্ঠা কিংবা বাণী পরে খ্যাপাতে শুরু করবে, তাই।

ঋতা ওসব ভুলেও গিয়েছিল।

হঠাৎ একদিন শর্মিষ্ঠা বলে বসল, ঋতা, তুই স্কুলে কখনো অভিনয় করেছিস ?

—না তো। হেসে উঠে বললে, বাড়ি ফিরে মাঝে মাঝে করি, মায়ের সামনে। বাড়িতে না জানিয়ে যেদিন তোদের সঙ্গে সিনেমায় যাই...

তিনজনই হেসে ফেলেছিল। বাণী বলেছিল, সেরকম অ্যাক্টিং তো আমরা দিনরাত করছি।

শর্মিষ্ঠা কথাটায় গুরুত্ব দেবার জন্যে হাসল না। বললে, অভিনয় করবি ?

একটু থেমে আবার বললে, দাদা তো তোকে দেখে চার্মড, জিজ্ঞেস করছিল, তোর বন্ধু অভিনয় করে না কেন।

'দাদা তো তোকে দেখে চার্মড।' কথাটা আদৌ ভাল লাগেনি ঋতার। ও তাই ভুরু কোঁচকাল, কথাটা যে অপছন্দ তা বোঝাবার জন্য।

শর্মিষ্ঠা তবু মৃদু হেসে বললে, সিনেমার হিরোইন হবি ?

ঋতা এবার রেগে গিয়ে বললে, ওসব ফালতু কথা ছাড় তো।

বাণী বোধহয় খুব মজা পাচ্ছিল। ও সিনেমার ম্যাগাজিন পেলে আর কিছু চায় না। সব খবর রাখে, হিন্দি সিনেমার কে কটা বিয়ে করল, কে কাকে ছাড়ছে, কার সঙ্গে কে লিভিং টুগেদার, কার বাচ্চা হয়েছে, কার হয়নি ইত্যাদি।

ঋতার রাগ দেখে বাণী ন্যাকা ন্যাকা গলায় বললে, তার চেয়ে আমাকেই হিরোইন করে দে না ভাই।

শর্মিষ্ঠা আর ঋতা দু'জনেই হেসে ফেলল।

ব্যস্। এই হ'ল ইতিহাস।

ঋতা এসব আড্ডার ইয়ার্কি ফাজলামি মনেও রাখে না, মনে রাখেওনি। এসব কথা যে বাড়িতে বলতে হয় তা জানবে কি করে।

সেদিন বাড়ি ফেরার সময় একবার শুধু শর্মিষ্ঠার কথাগুলো মনে পড়েছিল। মনে পড়তেই নিজের মনেই হেসে ফেলেছিল। 'সিনেমার হিরোইন'।

ও তখন রাস্তার মোড়ের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভুট্টা কিনছে। লোকটা কাছেই একটা বস্তিতে থাকে, প্রতিদিন একডালা ভুট্টা সাজিয়ে বসে। সামনে তোলা উনোনে, উনোনের কয়লায় দুটো ভুট্টা, মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দিচ্ছে। বাঁ হাতে ঘন ঘন পাখা করছে। লোকটা হিন্দুস্থানি।

ঋতা বুকে বইখাতা চেপে খুদে মনিব্যাগ থেকে পয়সা গুনতে গুনতে বলছে, ভাল করে নিম্বুনিমক মাখিয়ে দিও।

আর সঙ্গে সঙ্গে শর্মিষ্ঠার কথাটা মনে পড়তে হেসে ফেলল। সিনেমার হিরোইন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভুট্টা কিনে খাচ্ছে। দেখে যা।

কিন্তু 'দাদা তো তোকে দেখে চার্মড' কথাটা বিড়বিড় করছে। লোকটা, হ্যাঁ লোকটাই তো, শর্মিষ্ঠার দাদা হতে পারে, কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের একটা লোক ওকে দেখে চার্মড হবে কেন, আর শর্মিষ্ঠা সেকথা বলবেই বা কেন।

হাতিবাগানের মামা বলেছিল, সুকমল, তোমার মেয়ে এমন কিছু ডানাকাটা পরী নয় যে

লোকে এসে যেচে বিয়ে দিয়ে যাবে, এখন থেকে চেষ্টা করো।

কথাটা ভাল লাগেনি। ও জানে সুশ্রী, ফ্রকপরা বয়েসে অনেকে সুন্দরীই বলেছে। কানে লেগে আছে এখনো। এখনো কেউ বললে ভালই লাগে। তা বলে ওই লোকটা, শর্মিষ্ঠার দাদা চার্মড হবে ? ওকে তো ঋতার একটুও ভাল লাগেনি। যাকে ভাল লাগেনি সে চার্মড হবে কেন !

বাঁ হাতে বইখাতা, ডান হাতে ধরা ভুট্টা দাঁতে কেটে চিবোতে চিবোতে মনে মনে হাসছিল ঋতা। বাঁদিকে নোংরা মোটর সারাইয়ের গ্যারেজ, কালিঝুলি মাখা বাচ্চাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এবড়োখেবড়ো সরু গলি দিয়ে যেতে যেতে দু'পাশের বড় বড় দুখানা বাড়ির মাঝখানে ছোট্ট দোতলা বাড়িটার হতশ্রী চেহারার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে মনে মনে বললে, সিনেমার হিরোইন।

এরপর হয়তো হঠাৎ হঠাৎ কোনদিন শর্মিষ্ঠার কথাটা মনে পড়ে গেছে, আর নিজের মনে মনেই হেসে ফেলেছে ঋতা।

একদিন পুণ্য দেখে ফেলেছিল। পড়ার টেবিলে সামনে বই মেলে রেখে পড়তে পড়তে একবার অন্যমনস্ক হয়েছে, মনে পড়ে গেছে শর্মিষ্ঠার কথা, 'সিনেমার হিরোইন হবি ?'.. সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলেছে।

পুণ্য অমনি বলে উঠেছে, ও কি ? সামনে মেলে রাখা বইটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছে, ওটা জিওগ্রাফি, না টিনটিন ? হাসছিস যে।

পিঠোপিঠি ভাইবোন, সব সময় দু'জনের মধ্যে খুনসুটি লেগেই আছে।

ঋতা বলে উঠেছে, আমার মুখটাই ওই রকম, হাসি হাসি। তোর মতো প্যাঁচা প্যাঁচা নয়।

কিন্তু শর্মিষ্ঠা কেন বলেছিল কথাটা, বুঝতেই পারেনি। নিছক ঠাট্টা কি ? নাকি লম্বা জুল্‌পিওলা ওর দাদা লোকটা ঋতার প্রেমে পড়ে গেছে ! ভাবতেও অস্বস্তি, কেউ জানলে তো আরও।

মা কিংবা বাবার কানে গেলে রক্ষে নেই। ঋতাকে ঘিরে ওদের মনে সবসময়েই ভয়। কলেজ থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেলে জেরার পর জেরা। বন্ধুদের সঙ্গে নিউমার্কেটে কেনাকাটা করতে গেছে একদিন, অফিস ছুটির বাস, ফিরতে ফিরতে সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটা হয়ে গিয়েছিল। বাবা সেদিন সকাল সকাল ফিরেছে, ঋতা ফেরেনি এখনো ! ব্যস্, সে কি দুশ্চিন্তা। যেন বাপের সুন্দরী মেয়েটাকে কিডন্যাপ করার জন্যে সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখ কাঁচুমাচু করে থাকতে হয়েছিল সারাক্ষণ। বাবার সঙ্গে এক টেবিলে খেতেও বসেনি রাত্তিরে।

আমরা কে কতখানি আধুনিক, সংস্কার থেকে কতখানি মুক্তি পেয়েছি ? নিজেকেই মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে ঋতা।

যখন ছোট ছিল, মাকে, কখনো কখনো বাবাকেও যথেষ্ট মডার্ন মনে হ'ত।

ঠাকুমার পুজোআর্চা, বারান্দার কোণে স্বপাক রান্না, কালো ধুতিপাড় সাদা শাড়ি পরা, সবই ছিল অপছন্দ। ঠাকুমাও তেমনি নতুন কোনও কিছুই পছন্দ করতে পারত না। গ্যাসে রান্না করায় কি আপত্তি। মা ঘোমটা ফোমটা দিতে পারত না। ঠাম্মার ভাই অনাদিবাবু, ঋতারা ওঁকে দাদুই বলত, তাঁর সামনেও মাকে ঘোমটা দিতে হবে। মা দিত না। দিত না বলেই ঠাকুমা টিপ্পনী কাটত।

ঋতা বেশ বুঝতে পারে মায়ের জীবনে সবচেয়ে বড় অশান্তি ছিল ওই ঠাকুমা। অথচ মানুষটা খারাপ ছিল না। ওদের দু'ভাইবোনকে খুব ভালবাসতেন। মা'র যখন কম বয়েস ছিল সে-সব দিন তো ওর অজানা, তবু বুঝতে পারে মাকে যুদ্ধ করে করে বাড়িটাকে

বদলাতে হয়েছে।

—সে কি রে সুকু, মেয়েকে বাইজি বানাতে চাস নাকি!

কথাটা কানে লেগে আছে ঋতার।

মেয়েরা তো এখন কত কি পরে, ম্যাক্সি জীন্‌স্‌, ধোতি-কুর্তা—কি নয়। ঠাম্মা দেখলে নির্ঘাত ঘন ঘন ফিট হত।

কিন্তু মা-বাবাই বা কতটুকু বদলেছে। ক্লাস টেন-এ পড়ার সময় একবার জীন্‌স্‌ পরার ইচ্ছে হয়েছিল। প্রথমে মা রাজি হয়নি।

নাক সিঁটকে বলেছিল, বিচ্ছিরি।

বাবার কাছে আব্দার করেছিল, বাবাও বিরক্তির সঙ্গে বলেছিল, না না, ও সব পরতে হবে না। শেষ পর্যন্ত ঋতার জেদাজেদিতে রাজি হয়।

সব মানুষেরই বোধহয় একটা থামার বয়েস আছে।

কলেজে ভর্তি হবার সময় চতুর্দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। কোথায় ভর্তি হতে পারে তার তো ঠিক ছিল না। ভাল কলেজ হলেই ভাল।

একটা কলেজের নাম করতেই মা বলে উঠল, ওখানে তো ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। কো-এড়।

সুতরাং বাতিল।

আসলে সকলেই ভিতরে ভিতরে সেই ঠাকুমার যুগে পড়ে আছে। দু'পা এগিয়েই থেমে পড়ে। তারপরই ভয়, গেল গেল ভাব। অথচ ঠাকুমার কাছে মা কত কি কষ্ট পেয়েছে মা মাঝে মাঝেই বলে ফেলে।

একদিন বাণীকে বলেছিল, জানিস বাণী, সকলের বাইরেটাই শুধু বদলাচ্ছে। বাইরের পোশাক, ড্রইংরুম সাজানো, টিভি, ভি সি আর, গ্যাস সিলিন্ডার, মেয়েদের গাড়ি চালানো।

বাণী সায় দিয়ে হেসেছিল, যা বলেছিস। রাস্তায় চেনা লোক কেউ ডেকে কথা বললেও ভয়, জেরা শুরু হয়ে যাবে।

অথচ সকলেই সেটা জানে।

বাবার অফিসের এক ভদ্রলোক একদিন এসেছিলেন।

বাবা বলেছিল, ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের সব সায়েন্স পড়াচ্ছে, আর দেশে জ্যোতিষী বাড়ছে, রত্নধারণ বাড়ছে। আমেরিকায় চাকরি করে আর জাত মিলিয়ে গোত্র দেখে বিয়ে।

ঋতার মনে হয়েছিল, ও নিজেও বোধহয় তাই। শুধু বাইরের পোশাকটাই বদলেছে। তা না হলে এত রেগে গেল কেন!

সেদিন বাড়ি ফিরেই মনে হ'ল কি যেন একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে।

হাসি হাসি মুখেই উঠছিল ওপরে, বাঁহাতে বইখাতা, ভুট্টা চিবোতে চিবোতে।

সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতে আসতে মা'র থমথমে মুখখানা দেখেই বুকের ভেতরটা আঁতকে উঠল। কিছু কি হয়েছে? ভয়ঙ্কর কিছু?

পুণ্য বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, ঋতাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখেও যেন তীব্র রাগ ফুটে উঠল।

ও ওপরে উঠে আসছে, দেখল মা দ্রুত বাবার ঘরে ঢুকে গলায় বেশ ঝাঁঝ, বলছে, ওই তোমার গুণধর মেয়ে ফিরল, ওকেই জিগ্যেস করো।

অবাক হয়ে গেল ঋতা। কিছুই বুঝতে পারছে না, কি এমন অপরাধ করে বসেছে? কিছুই তো মনে পড়ে না। এমন কিছু দেরি করেও ফেরেনি।

মাকে বলতে হ'ল না, বাবাকে বলতে হ'ল না। পুণ্যই এগিয়ে এসে প্রায় চিৎকার করেই বলে বসল, যত সব বাজে লোকের সঙ্গে মেশামেশি করছিস ! লজ্জাও করে না।
মা ঘর থেকে বেবিয়ে এসে বললে, তুই চুপ কর, তুই চুপ কর।
তারপর বেশ কঠিন স্বরে ঋতাকে বললে, তোর বাবা ডাকছে তোকে, যা।

॥ দুই ॥

সুকমল সকাল নটায় বেরিয়ে যায়, অন্য কোথাও কোনও কাজ না থাকলে ফেরে ছটার সময়। অফিসে যাওয়া-আসার বাস আসে, ওরা বলে জার্নিবাস, কিন্তু সরু রাস্তাটায় দু'বার পাক দিতে হয় বলে বাড়ি অবধি আসে না। বড় রাস্তায় দাঁড়ায়, নির্দিষ্ট সময়ে। সেও এক বিরক্তিকর ব্যাপার। ঘড়ি ধরে আগে গিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। দু' পাঁচ মিনিট দেরি হলেই বাসে অফিসের আর যারা বসে থাকে তাদের মুখে-চোখে চাপা রাগ প্রকাশ পায়। অথচ নির্দিষ্ট সময়ে যে আসবেই তার কোনও স্থিরতা নেই। দশ পনেরো মিনিট দেরিও করে, কোনওদিন শেষ অবধি আসেই না, বাস খারাপ। তখন ছোটাছুটির অন্ত থাকে না, মিনি কিংবা প্রাইভেটে অফিস টাইমের ভিড় উপচে পড়ছে, ভিড় ঠ্যালায় অনভ্যস্ত বলে ট্যাক্সি খুঁজতে হয়। ট্যাক্সিও মেলে না। পেলেও তিনটে লোক তিনদিক থেকে চেষ্টা করে কে কতখানি কায়দা করে হাতিয়ে নিতে পারে। এই অফিসের সময়েই দেখলে বোঝা যায় সভ্য ভদ্র মানুষগুলো আসলে কি বস্তু। অথচ দোষ দিতেও পারে না ; সুকমল নিজেও কি কম অভদ্র হয়ে যায়।
অফিসে যাওয়ার জন্যে এই জার্নিবাস ব্যবস্থা করাটাও এক ধরনের স্ট্যাটাস। অথচ অসুবিধে কম নয়। ঘুরতে ঘুরতে এ রাস্তা সে রাস্তা হয়ে এক একজনকে তোলে, বড় রাস্তার ওপব বাড়ি বলে কাউকে কাউকে বাড়ির সামনে থেকেই। তারা জানালা থেকে দেখতে পেয়ে 'যাচ্ছি' বলে একটু সময় নিয়ে বেরোয়। গ্রীষ্মের দিন হলে সে এক যন্ত্রণা। বসে বসে ঘামতে হয়। তার ওপর নানা রাস্তা ঘোরাঘুরি করে আসে বলে সময়ও অনেক বেশি লাগে।
চাকরিতে একটা লিফট পাবার পর এই জার্নিবাসের ব্যবস্থা। কল্যাণীকে বলেছিল, কাল থেকে জার্নিবাস আসবে। একটু চাপা গর্বও বোধহয় ছিল।
দিনকয়েক পরেই বলতে হল, ঋতা যে স্কুলবাসে যাতায়াত করেছে এখন বুঝতে পারি কি কষ্ট।
স্কুলে তো আবার ফার্স্ট শীফট সেকেন্ড শীফট। সে আরো যন্ত্রণা। বাস খারাপ হয়েছিল, কিংবা বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছিল, কল্যাণী কোনও কোনওদিন বলেছে, ছ'টা অবধি ফেরোনি দেখে সে কি দুশ্চিন্তা। শীতের দিনেও, যখন ফার্স্ট শীফট পড়েছে, সকাল আটটার মধ্যে তৈরি করে নিযে গিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াতে হয়েছে কল্যাণীকে। সুকমল নিজেই দেখেছে।
ক্লান্ত হয়ে ফিরত মেয়েটা। আধখানা শহর ঘুরে ঘুরে মেয়েদের নামাতে নামাতে এলে ক্লান্ত তো হবেই। কোনও কোনওদিন সন্ধে হতে না হতে ঘুমিয়ে পড়ত। তা নিয়েও কল্যাণী বকাবকি করত।
তখন এতটা বুঝত না সুকমল। এখন বোঝে। তবু মিনি কিংবা স্টেটবাসে যাতায়াতেব চেয়ে অনেক আবাম।
অবশ্য ক্লান্ত হয়েই ফেরে।
সাবা গায়ে প্যাচপ্যাচে ঘাম, তাই পাখাটা খুলে দিয়ে দু'দণ্ড বসতে ইচ্ছে হয় না, সোজা

স্নান করতে ঢুকে যায় অফিস থেকে ফেরার পর। সাবান ঘষে ঘষে ঘামটা তুলে না ফেলা অবধি স্বস্তি পায় না।

সাবান মাখতে মাখতেই কলিং বেল-এর ক্রর ক্রর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। ভেবেছিল, পুণ্য কিংবা ঋতা ফিরল।

কল্যাণীর গলার স্বরও শুনতে পেল, কাজের মেয়েটাকে বলছে, দ্যাখ তো করুণা, ঋতা ফিরল বোধহয়।

বাড়িটা ছোট, খুবই ছোট, তা হলেও পুরো বাড়ি তো, একতলা দোতলা সবটাই ওদের, তার ওপর ছাদ। সেই লোভেই সুকমলের বাবা এটা ভাড়া নিয়েছিলেন। তখন পাওয়াও যেত, কম ভাড়াতেই।

কিন্তু দোতলা বাড়ির এই এক যন্ত্রণা।

কেউ এসে বেল বাজালেই নীচে নেমে গিয়ে দরজা খুলতে হবে। করুণা নীচে থাকলে ওপর থেকে চিৎকার করে বলতে হবে। তা না হলে বলবে শুনতে পায়নি। সত্যি কানে খাটো না কুঁড়েমি করে বলে বোঝাও যায় না। এই সরু সিঁড়ি ভেঙে ওপর নীচ করতেও কষ্ট হয়।

কল্যাণী একসময়ে বিরক্ত হয়ে বলে, এর চেয়ে ফ্ল্যাট অনেক ভাল।

নীচের তলায় দু'খানাই ঘর, একটাকে এখন বসার ঘর করা হয়েছে। আগে ও ঘরটাই সুকমল আর কল্যাণীদের শোয়ার ঘর ছিল। পাশেরটা পড়েই আছে, আগে পুণ্য কিংবা ঋতার টিউটর এলে ওখানেই বসত ওরা। রান্নাঘর নীচে, কলঘরও একটা আছে, দরকার হলে ব্যবহার হয়।

একজন এসে দেখে বলেছিল, এ তো মশাই প্রাসাদ।

প্রাসাদেও বোধহয় এ ধরনের কিছু কিছু অসুবিধে থাকে, কে জানে।

করুণা ফিরে এসে কি বলল সুকমল শুনতে পায়নি।

ভেবেছিল, ঋতাই হবে হয়তো।

কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই, তখন সুকমল গায়ে জল ঢালেনি, বাথরুমে দরজায় টুক টুক টুক টুক আওয়াজ। কল্যাণীর গলা, এই শুনছ।

—কি ?

কল্যাণী কি বলল আস্তে আস্তে, সুকমল বুঝতে পারল না। তাই খুঁট করে বাথরুমের দরজা দু' ইঞ্চি ফাঁক করে সাবানমাখা অবস্থাতেই মুখ বাড়িয়ে দিয়ে আবার প্রশ্ন করল, কি বলছ ?

কল্যাণীও মুখ বাড়িয়ে চাপা গলায় বললে, দু' জন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কি বলব ?

—নাম বলেছে ?

কল্যাণী বললে, জিগ্যেস করেছিল, বলেনি।

সুকমল ভুরু কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করল কে হতে পারে, তারপর উত্তর দিল, বসতে বলো।

বলেই দরজা বন্ধ করে দিল।

বসার ঘর নীচে। কল্যাণী সেটাকে যথাসম্ভব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। কোনও লোককে ডেকে এনে বসাতে কোনও অস্বস্তি হয় না।

বাবা বেঁচে থাকতে কলেজের বন্ধুদের ডেকে এনে বসাতেও সুকমলের অস্বস্তি হত। তখন তো বসার ঘরই ছিল না। শোয়ার খাট, পড়ার টেবিল, একটা চেয়ার সুকমলের। বাইরের কেউ এলে ওখানেই। আর বাবা অধিকাংশই লোককে, আত্মীয় হোক বা ঘনিষ্ঠ

বন্ধু, একেবারে দোতলায় সরাসরি নিজের ঘরে নিয়ে যেত। খাটে বিছানায় বসাচ্ছে, কিংবা বারান্দা থেকে চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে। একটা মোড়া ছিল, সাইকেলের বাতিল টায়ার দিয়ে মজবুত করা। তখন পাওয়া যেত।

বসার ঘরের জন্যে একটা ক্ষোভ ছিল তখন সুকমলের। দু'একজন বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তাদের ড্রয়িংরুম দেখে তাক লেগে গিয়েছিল, তাদের খুব বড়লোক ভাবত। বুককেসের ওপব মূর্তিটুর্তি, জানালায় দারুণ দারুণ পর্দা, দেয়ালে বড় একটা ছবি, ঝালর ঝোলানো ল্যাম্পস্ট্যান্ড, মেঝেতে কার্পেট, গাবদা গাবদা গদি আঁটা শোফাকৌচ।

মনে হত ওসব না থাকলে যেন জীবনই ব্যর্থ।

বয়েস বোধহয় স্বপ্নের ডালপালা থেকে সব বাসনা কামনার পাতাগুলো একে একে ঝরিয়ে দেয়। এখন আর সুকমলের কোনও স্বপ্ন নেই। নিজেকে এক ধরনের তৃপ্ত মনে হয়।

বসার ঘবখানার জন্যে এখন আর সঙ্কোচ বোধ করে না। কারণও নেই, কল্যাণী নীচের ঘরটাকে একটু ভদ্র চেহারা দিয়েছে।

লোক দুটি দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। করুণা ওদের দাঁড় করিয়ে রেখেই খবর দিতে এসেছিল।

কল্যাণী বললে, যা নীচের ঘরে বসতে বলে আয়।

করুণা সিঁড়ি দিয়ে নামছে, চাপা গলায় কল্যাণী বললে, পাখাটা খুলে দিস।

কল্যাণী আদৌ পর্দানশীন নয়, মাথায় ঘোমটা দিতে চাইত না বলে শাশুড়ির মনে একসময় ক্ষোভ ছিল, এক ধরনের ঠাণ্ডা লড়াই। বাইরের কেউ এলে, সুকমলের কোনও বন্ধুটন্ধু বা অফিসের কেউ, কল্যাণী নিজেই গিয়ে দরজা খুলে হেসে অভ্যর্থনা করে, বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্পসল্পও। কিন্তু ওই সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামার কষ্টের জন্যেই ও পাট এখন কাজের মেয়ে করুণার, কিংবা পুণ্য বা ঋতা বাড়িতে থাকলে তাদের।

কিন্তু কল্যাণী সরে যেতে পারল না। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রইল। সামনে ছোট্ট এক ফালি উঠোন, সদর দরজা থেকে কেউ নীচের বসার ঘরের দিকে গেলে থামের আড়াল থেকে দেখা যায়।

করুণা এসে বলেছিল, নাম জানাল না, বললে বাবুর সঙ্গে দরকার।

তবু চেনা কিংবা পাড়ার লোক কিনা দেখা প্রয়োজন। হলে কল্যাণীকে একবার ভদ্রতার খাতিরেও গিয়ে বলে আসতে হবে, বসুন, আসছে। স্বামীর দু' একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, তারা আবার অনেকসময় ইয়ার্কি করে নাম বলে না। তবে করুণা, নতুন হলেও, এর মধ্যে তাদের চিনে গেছে।

তারা চুপচাপ আসার লোক নয়, বাইরের দরজা থেকেই হাঁকডাক পাড়তে শুরু করে। কল্যাণীকে চায়ের অর্ডার দিতে দিতে ঢোকে।

না, লোক দুটিকে চেনে না কল্যাণী।

করুণা ওদেব বসিয়ে রেখে ওপরে এলো। —ওদের জন্যেও কি করব ? চা ?

—না। দাঁড়া বাবু আসুক, এসে যদি বলে তখন করবি।

করুণা আবার তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। নীচের রান্নাঘরে। সুকমল অফিস থেকে ফিরেছে, চটপট চা জলখাবার বানিয়ে দিতে হবে। তার ওপর রাত্তিরের রান্না যতখানি সম্ভব এগিয়ে রাখতে হবে তাকে। এ সময় এ সব লোকজন এলে করুণার মুখ ব্যাজার হয়ে ওঠে। সব তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলে হাত খালি করতে না পারলে টিভির সামনে গিয়ে বসা যাবে না।

কল্যাণীই নেশা ধরিয়েছে তার। কিছু একটা নেশা ধরাতে না পারলে কোনও

মানুষকেই আটকে রাখা যায় না। আজকাল অবশ্য কাজের মেয়েদের নেশা ধরাতে হয় না, নেশা নিয়েই আসে ওরা। করুণা ক্যানিংয়ের দিকের গ্রাম থেকে এসেছিল বলেই তাকে নেশা ধরাতে হয়েছে। তবে এখন আর ও নেশা দিয়ে আটকে রাখা যায় না, সব বাড়িতেই তো টিভি। ওদেরটা আবার সাদা-কালো।

পুণ্য একদিন বলেছিল, মা, এবার একটা কালার আনতে বলো না বাবাকে। অনেকের বাড়িতেই তো এখন কালার।

ঋতা ছিল, ও হেসে বললে, কেন বদনাম নিচ্ছিস দাদা। শেষে বাবা বলবে আমাদের জন্যে এত টাকা নষ্ট।

পুণ্যর অসুবিধে বন্ধুদের কাছে বলতে পারে না। তাই উষ্মার সঙ্গে বললে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এখন রেডিও হয়ে গেছে।

ঋতা হাসল। বললে, কালার ঠিকই আসবে দেখিস, আমাদের জন্যে নয়, ওই করুণার জন্যে।

আসলে করুণাকে নিয়ে মায়ের সব সময়েই একটা টেনশন, ওরা লক্ষ করেছে। কখন ছেড়ে চলে যায়, পাড়ার কে কোথায় বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে যায়।

করুণা সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছিল, কল্যাণী ডাকল, এই, শোন।

ও থেমে পড়ে ফিরে তাকাল।

কল্যাণী চাপা গলায় বললে, পাখা খুলে দিয়েছিস?

করুণা ঘাড় কাত করে 'হ্যাঁ' বলে ছুটে চলে গেল।

কাজের লোকদের নিয়ে এই এক ঝঞ্ঝাট। কাউকে বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলার পর যে পাখাটা খুলে দিতে হয়, সে জ্ঞানও নেই। প্রতি বার বলে দিতে হবে।

আর আমাদেরই বা এ কি ধরনের শিষ্টাচার রে বাবা।

একবার এক ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে, বোধহয় ছেলের চাকরির জন্যে বলতে, যেন সুকমলের হাতে কত চাকরি. কাজের মেয়েটাকে বলা হল বসতে বলে আয়। সুকমল তখন খাটের ওপর ফাইলের কাগজপত্র মেলে কাজে ব্যস্ত। সব গুটিয়ে টুটিয়ে যেতে দেরিই হয়েছিল।

গিয়েই দু'চার কথায় তাকে বিদেয় করে ফিরে আসতেই কল্যাণী জিগ্যেস করল, পাখা বন্ধ করেছ?

—না তো।

সুকমলের এটা একটা রোগ।

কাজের মেয়েটাকে ডেকে পেল না, সে সাড়া দিল ছাদ থেকে, ভিজে কাপড় মেলতে গেছে। অগত্যা কল্যাণীকে নীচে নামতে হল।

এসে দেখে পাখা বন্ধ।

ওপরে উঠতে উঠতে, কাজের মেয়েটা তখন নামছে ছাদ থেকে, জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে, পাখা খুলে দিসনি?

মেয়েটা হ্যা করে বোকার মতো হেসে দিল। অর্থাৎ দেয়নি।

এসে সুকমলকে বললে, পাখা ঘুরছে কি না ঘুরছে তাও দেখনি? ছি ছি ছি, লোকটা কি ভাবল বলো তো? বেচারাকে আধ ঘন্টা বসিয়ে রেখেছ...

সেদিন খুব অনুশোচনা হয়েছিল কল্যাণীর। চাকরিবাকরি হয়তো দেওয়া যায় না, কিন্তু পাখার হাওয়া তো দেওয়া যায়। সে বেচারি চাকরির উমেদারিতে এসেছিল, নিজে পাখাটা চালিয়ে নিতে সাহস পায়নি।

কিন্তু শুধু সেই লোকটাই তো নয়। আরো অনেকেই এ রকম করে। কি সঙ্কোচ!

কাজের লোক পাখা চালাতে ভুলে গেছে বলেই কি নিজে নিজে সেটা চালিয়ে নেওয়া যায় না। তাতে কি কোনও গৃহস্বামী রেগে যাবে।

সুকমলের ধারণা তা নয়। বলেছিল, আসলে লোকে বদনাম দেবার সুযোগ খোঁজে। ঘামতে ঘামতে কষ্ট করে একটা সুযোগ পায়, পরে বলতে পারবে, কি কৃপণ, পাখাটাও খুলে দেয় না।

কল্যাণী হাসতে পারেনি। ওর মনে হয়েছিল সম্মান চলে গেল।

সেজন্যেই এখন আর ভোলে না। করুণাকে জিগ্যেস করল, পাখা খুলে দিয়েছিস তো ?

খুট করে শব্দ হল। সুকমল স্নান সেরে বেরিয়ে পড়ল। —কে এসেছে ?

কল্যাণী ঠোঁট উল্টে মুখভঙ্গি করে বললে, চিনি না।

একটু হেসে বললে, একটার ইয়া জুলপি।

সুকমল পোশাক বদলাতে গেল, আর কল্যাণী ওপর থেকেই ডাকল করুণাকে।

রান্নাঘর থেকে শুধু মুখটা বের করে তাকাল করুণা।

—দিয়ে যা। একটু চাপা গলায়। নীচে বসার ঘরে লোক বসে আছে বলে।

'দিয়ে যা', অর্থাৎ চা জলখাবাব।

লোক দুটো কেন এসেছে, কতক্ষণ লাগাবে কে জানে, তাই যাবার আগে ও পর্ব শেষ করে যাওয়াই ভাল। চা দিতে হবে কিনা তা তো জানা নেই, দিতে হলে পরে দু' কাপ পাঠিয়ে দিলেই হবে। আপ্যায়ন তো নির্ভর করে সম্পর্ক, স্বার্থ, প্রয়োজনের ওপর। এক একজনের জন্যে এক একবকম। নিজের স্ট্যাটাস দেখাবার জন্যেও কখনো কখনো।

সুকমল চা-টা খেয়ে একমুহূর্ত ভাবল গেঞ্জি পরেই নেমে যাবে, নাকি আদ্দির পাঞ্জাবিটা পরবে। গরমের দিনে কেউ এলে এ এক বিরক্তিকর ব্যাপার। নিজের ঘরটিতে খালি গায়ে কিংবা গেঞ্জি পরে থাকা যায়। নীচের ঘরটা এমনিতেই গরম, হাওয়া ঢোকে না, তার ওপর গায়ে জামা দিয়ে ঘামতে ঘামতে কথা বলা। মেজাজ ঠিক থাকে না।

কারা এসেছে জানে না, কেন এসেছে তাও না। জানার আগ্রহও তেমন নেই। কে আর আসবে। সুকমলের কাছে চেনা জানা কিংবা পাড়ার কেউ কখনো হয়তো আসে। অচেনা লোকের আনাগোনা নেই বললেই চলে। কল্যাণীও যখন চিনতে পারেনি, তখন আজেবাজে কেউ হবে। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই।

চা-টা খেয়ে একবার গেঞ্জিটা হাতে নিল, একবার পাঞ্জাবিটা, তারপর গেঞ্জিটা ছুড়ে দিল বিছানার ওপর। আদ্দির পাঞ্জাবিতেই মাথা গলিয়ে নিয়ে নেমে গেল।

দুটি লোক বসে আছে।

সুকমলকে ঢুকতে দেখে তারা দু'জনই মুখে হাসি এনে, হাসিটা কৃত্রিম, উঠে দাঁড়াল। নমস্কারের ভঙ্গিতে দু'জনই হাত জোড় করল বলে সুকমলকেও নমস্কারের ভঙ্গি করতে হল।

বললে, বসুন।

দু'জনের মধ্যে যার বয়েস একটু কম, কত আর হবে, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ, নীল প্যান্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট, স্ট্রাইপড শার্ট, চোখে মোটা শেল-ফ্রেমে চশমা।

সে নিজের নাম বললে, পাশের বয়স্ক লোকটির নামও বলল। কিন্তু সুকমলের নাম জানার আগ্রহ নেই বলে কোনওটাই কানে গেল না। সুকমল তখন শুধুই জানতে চায় কেন এসেছে।

বোধহয় খুব একটা কৌতূহল দেখাচ্ছিল না বলেই বয়স্ক লোকটির সন্দেহ হল, তাই প্রশ্ন করে বসল, আপনিই সুকমলবাবু তো ?

সুকমল হেসে ফেলে বলল, হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলুন তো ?

ওরা দু'জনেই একটু উসখুস করল, যেন কিছু একটা বলতে চায়, বলতে পারছে না। সঙ্কোচবোধ করছে যেন। কিংবা দু'জনের মধ্যে কে বলবে তা নিয়েই দ্বিধা।

শেষে বয়স্ক লোকটিই বললে, আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। কিছু যদি মনে না করেন...

সুকমল সত্যিই হেসে ফেললে। তারপর হাল্কা স্বরেই বলল, মনে করার মতো হলে তো নিশ্চয়ই মনে করব। অবশ্য মুখে হাসি লেপে রেখেই।

রসিকতার ভঙ্গিটা দেখে ওরা একটু যেন সহজ হল।

বয়স্ক লোকটির দু' উরুর ওপর একটা পেটমোটা চামড়ার ফোলিও ব্যাগ। নমস্কার করে উঠে দাঁড়ানোর সময় পাশে রেখেছিলেন, আবার কোলের ওপর তুলে নিয়েছেন। ভদ্রলোকের গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি আধময়লা ধুতি।

ভদ্রলোক পেটমোটা ফোলিও ব্যাগটা খুলে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন।

সুকমলের এতক্ষণ সন্দেহ হচ্ছিল এরা বোধহয় ইনসিওরেন্সের দালাল-টালাল, কিংবা ইউনিট বা এন এস সির এজেন্ট।

ভদ্রলোক সুকমলকে কার্ডে কি লেখা আছে পড়ার সময়ও দিলেন না, যেন কার্ড আছে এটুকু দেখানোই উদ্দেশ্য, তার আগেই বলে বসলেন, আমরা একটা ছবি করছি।

অবাক হয়ে তাঁদের দিকে তাকাল সুকমল।

কমবয়স্ক লোকটি হেসে হেসে বললে, মানে চেষ্টা করছি আর কি।

বয়স্ক ভদ্রলোক হেসে সায় দিলেন, হ্যাঁ, তাই। একটু থেমে বললেন, মানে লো বাজেটের ছবি—

সুকমল তখনো খুঁজে পাচ্ছে না ছবিটবির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক।

কমবয়স্ক ছেলেটি আত্মবিশ্বাসের কণ্ঠে জুড়ে দিল, কিন্তু প্রাইজ আমরা পাবই।

—হ্যাঁ, ছবি, মানে ওই সব কমার্শিয়াল টমার্শিয়াল নয়। একটা সিরিয়াস ছবি, মানে আর্ট ফিল্ম আর কি। বয়স্ক লোকটি বললেন।

সুকমলের মাথায় তখন কিছুই ঢুকছে না। ছবি, আর্টফিল্ম, প্রাইজ এসব সে কিছুই যেন শোনেনি, জানে না। ও শুধু জানে সিনেমা, হলে গিয়েও বহুবার দেখেছে, বিশেষ করে কম বয়েসে, যখন কল্যাণীরও বয়েস কম ছিল। শেষ কবে দেখেছে মনেও পড়ে না। এখন দেখে টিভিতে, পুরোটা দেখা হয়ে ওঠে কদাচিৎ, ওই হিন্দিটিন্দি কিংবা বাংলাও বেশির ভাগ সময়েই শেষ অবধি দেখার আগ্রহ থাকে না। যদিবা কখনো থাকে, লোডশেডিং-এর রসিকতায় দেখার উপায় নেই। টিভিতে খবর শোনে নিয়মিত, দু'একটা সিরিয়াল মাঝে মধ্যে। তৃপ্তি হয় না। ও যেন বিরাট প্যান্ডেল, ঝাড়লণ্ঠন, টুনি বাল্‌ব, সানাইবাদ্যি, আসুন আসুন আপ্যায়ন, তারপর স্রেফ এক কাপ কফি, একটু কাজু, দুটো ডালমুট। দূর দূর, কি যে দেখিস, ছেলেমেয়েদের বলেছিলেন।

নেশা, নেশা। কাজের মেয়েটাকে দেখো না। সাত সকালে রান্নাবান্না শেষ করে মেঝের ওপর এসে বসে পড়বে, ইংরিজি নিউজ হচ্ছে, তাই সই, কি যে দেখে আর কি যে বোঝে সেই জানে। সিনেমা কিংবা সিরিয়াল অবশ্য একটাও ছাড়ে না।

বাড়িতে একটা টিভি আছে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। কালার টিভির আব্দার, ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দু' একবার এসেছে, সুকমল শুনতে না পাওয়ার ভান করেছে। কিনতে হবে শেষ অবধি, তা জানে। তবু যদ্দিন ঠেকিয়ে রাখা যায়।

কিন্তু এ লোক দুটো কি বলছে ? সিনেমা, আর্টফিল্ম, প্রাইজ। এসবের সঙ্গে সুকমলের কী সম্পর্ক। ও তো জীবনে কখনো অভিনয় করেনি। স্কুলেও না।

কেমন বিভ্রান্তবোধ করল এবং অধৈর্য।

বললে, ব্যাপারটা কি আমাকে খুলেই বলুন তো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কোমরে চওড়া বেল্ট তিরিশ-পঁয়ত্রিশের মুখের দিকে তাকালে জুলপিটাই শুধু চোখে পড়ে। বেশ চওড়া জুলপি কানের নীচে অবধি নেমে এসেছে। স্বাস্থ্য ভালই, ওসবের দরকার ছিল না, তবু জুলপি লাগিয়ে ম্যাসকুলিন দেখানোর চেষ্টা।

বয়স্ক লোকটি উসখুস করছে দেখে কথাটা সে বলেই ফেলল।

—ঋতার কথা বলছি, মানে আপনার মেয়ে...

সুকমল যেন আকাশ থেকে পড়ল। —ঋতা?

বিভ্রান্ত, অবাক, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কিছু যেন বুঝতেই পারল না। লোকদুটিকে এতক্ষণ সহ্য করছিল শুধু একটা ক্ষীণ কৌতূহল থেকে। ভিতরে ভিতরে একটা বিরক্তি আর অপছন্দ দানা বাঁধছিল। তবু ভদ্রতা দেখাচ্ছিল। কারণ আমরা তো ভদ্রলোক।

কিন্তু ঋতার নাম ওই ছোকরাটির মুখে শুনে সারা গা রি রি করে উঠল। যেন চোখের সামনে একটা নিষ্পাপ সুন্দর পবিত্র ফুলের পাপড়িগুলো কেউ নির্দয়ভাবে ছিঁড়ে দিল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সুকমল, ছোকরার মুখের দিকে।

সুকমলের মনের ভেতরে কি হচ্ছে জুলপি ছেলেটি টেরও পেল না। ও তখন নিজের ছবি নিয়েই মশগুল। খ্যাতি, আর্টফিল্ম, প্রাইজ ইত্যাদির স্বপ্ন দেখছে।

বলছে, আমাদের ঠিক এই রকমই একটা ক্যারেকটার...স্ক্রিপট পড়লে দেখবেন, একেবারে হুবহু ওই চরিত্র...

ক্যারেকটার, চরিত্র কথা দুটো শুনে সুকমলের তখন গা ঘিন ঘিন করছে। চরিত্র শব্দটা যেন খট্ করে কানে লাগল। তোমাদের ক্যামেরার চোখ মেয়েদের শরীরের কোন অংশ খুঁজে বেড়ায় আমি কি জানি না। ক্রমশই ভিতরে ভিতরে রেগে যাচ্ছিল সুকমল।

বয়স্ক লোকটি বললে, না না, কোনও সাইড ক্যারেকটার নয়, মেন রোল...

সুকমল রাগ চাপবার চেষ্টা করল। যদি রূঢ় কোনও কথা বেরিয়ে আসে এই ভয়ে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করল, পারল না। শুধু অসহায়ের মতো বলল, ও তো একটা বাচ্চা মেয়ে, সবে টুয়েলভে পড়ছে...

উল্টো বিপত্তি হল। জুলপি ছোকরা উৎসাহিত হয়ে বলে বসল, আমাদের স্টোরি ওই রকম একটি মেয়েকে নিয়েই...

বয়স্ক লোকটি যেন সুকমলের দ্বিধা দূর করার জন্যে বললে, মানে কোনও লাভস্টোরি নয়, সিরিয়াস..

সুকমল তখন ভিতরে ভিতরে রাগছে আর পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করছে। অভদ্র না হয়ে পড়ে। অপরিচিত লোক দুটির সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার না করে ফেলে।

গলা ধাক্কা দেওয়া যায়, বলা যায়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু এই বয়েসের মেয়ে থাকলে সব সময়েই একটু সমঝে চলতে হয়। ভয় পেতে হয়। অপমান করে বের করে দিলে কি জানি কখন কি করে বসবে এরা। এসব যারা করে তাদের মধ্যে খারাপ লোকও তো কম থাকে না। অন্তত সে রকম অনেক কিছু তো শুনেছে সুকমল।

ঋতার ওপরও একটু রাগ হচ্ছিল। যেন তারই দোষ।

এতক্ষণ মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা চেপে রেখেছিল সুকমল, সেটাই হঠাৎ বেরিয়ে এল, ঋতাকে চিনলেন কি করে?

রহস্যের হাসি হেসে জুলপি বললে, আলাপ হয়েছে। না দেখলে, না কথা বললে সিলেক্ট করলাম কি করে?

সারা শরীর চিড়বিড় করে উঠল। আলাপ হয়েছে! সিলেক্ট করলাম কি করে। বলতে ইচ্ছে হল, সিলেক্ট করার তুমি কে হে ?

সুকমলদের পরিবার তেমন গোঁড়া রক্ষণশীল নয়। কোথাও কারো সঙ্গে ঋতার যদি আলাপই হয়, এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। তাই বলে এই লোকদের সঙ্গে ? কোমড়ে চওড়া বেল্ট, কানের পাশে লম্বা জুলপি ?

বয়স্ক লোকটি অনুনয়ের স্বরে বললে, আপনি অমত করবেন না, প্লীজ।

ছোকরাটি বললে, আমরা অন্তত একশো মেয়ে দেখেছি, জানেন। এই রোলের জন্যে নামকরা অভিনেত্রীরাও...

বয়স্ক লোকটি বললে, আছেন উনি ? একবার যদি ডাকতেন...

সুকমল তখন মনে মনে ঋতার কাছে চলে গেছে। এদের কথা কানেই যাচ্ছে না। হাত নিসপিস করছে। কষে একটা চড় লাগাবে কি ঋতাকে ?

সুকমল অসহায়ের মতো বললে, কোথায় আলাপ হয়েছিল ?

এবার শব্দ করে হেসে উঠল জুলপি ছোকরাটি। ছোকরা আর কোথায়! দিব্যি বয়েস হয়েছে।

হাসতে হাসতে বললে, ওঁদের কলেজে।

—হুঁ। ওই একটি শব্দই শুধু সুকমলের নাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

আর জুলপি হাসতে হাসতে বললে, আসলে শর্মিষ্ঠা, আমার বোন, জানাতে বারণ করেছে, তাই। ঋতা আমার বোনের বন্ধু, একসঙ্গে পড়ে।

সুকমল এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'ল, কিন্তু মনের মধ্যে একটা খটকা লেগেই রইল। এ সব কথা ঋতা বাড়িতে আগে জানায়নি কেন ? ও কি লেখাপড়া ছেড়ে সিনেমাটিনেমার কথা ভাবছে নাকি।

খুব কঠিন গলায়, একটু বোধহয় কর্কশ শোনাল, সুকমল বললে, আমাদের পরিবারে এ-সব চলে না।

—অ্যাঁ! অবাক হয়ে তাকালেন বয়স্ক লোকটি।

তারপর দু'জনই কিরকম স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বয়স্ক লোকটি দমে যাওয়া স্বরে বললেন, আজকাল যারা করছে তারা কিন্তু সব ভদ্রঘর থেকেই আসছে। বিশ্বাস করুন, এখন কিন্তু দিনকাল পাল্টে গেছে।

সুকমল কোনও উত্তর দিল না।

জুলপি ছোকরাটি বলে উঠল, ওঁর জীবনে এরকম একটা চান্স আসছে, আপনি ওঁর ফিউচারটা...

সুকমল ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, নষ্ট করে দিচ্ছি, এই তো ?

দু'জনই অপ্রস্তুত বোধ করল, অপ্রতিভ ভাবটা চাপা দেওয়ার জন্যে মুখে হাসি আনার চেষ্টা করল। আসলে এমন যে হতে পারে সেকথাই ওরা ভাবেনি। এমনকি একবার মনে হয়েছে আপত্তিটাপত্তি নয়, সবই সুকমলবাবুর চালাকি। এই ভা'ব অনিচ্ছা জানিয়ে টাকার অঙ্কটা হয়তো বাড়িয়ে নিতে চান।

সুকমল হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, দু'হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে বললে, আচ্ছা আসুন।

লোক দুটির ওঠার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সুকমল যেভাবে 'আচ্ছা আসুন' বলল তারপর আর বসে থাকা যায় না। অগত্যা উঠতে হ'ল।

ধুতি-পাঞ্জাবির বয়স্ক লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে শেষ

চেষ্টা করলেন। বললেন, আমরা অবশ্য কমার্শিয়াল ছবির মতো অত টাকা দিতে পারতাম না, কিন্তু যা দেব নেহাত খারাপ কিছু নয়।

সুকমলের সারা গা চিড়বিড় করে উঠছে। কি ভাবে এরা ? একজন 'ফিউচার' দেখিয়েছিল, জুলপিটা। এ আবার টাকার লোভ দেখাতে চাইছে। এরা বোধহয় মানুষের মনের খবর রাখতে জানে না।

জুলপিও বুঝতে পারল না। বলে বসল, একটা ছবিতে নাম হয়ে গেলে তখন তো বড় বড় প্রোডিউসাররাও...

সুকমল কোনও জবাব দিলে না। জুলপি তো পরিচয় দিয়েছিল ঋতার কলেজের কে এক বন্ধু শর্মিষ্ঠার দাদা বলে। সেজন্যেই যতখানি সম্ভব রাগ চাপতে হয়েছে।

রাগ এখন ওদের ওপর নয়, রাগ ঋতার ওপর। এত এত মেয়ে থাকতে তাকে সিনেমায় নামানোর প্রস্তাব নিয়ে কেউ আসবে কেন !

সুকমল সদর দরজা অবধি তাদের এগিয়ে দিতে গেল। তাদের বাইরে বের করে দিয়ে দরজায় খিল না দেয়া অবধি যেন স্বস্তি নেই।

দরজার বাইরে এক পা দিয়েও বয়স্ক লোকটি বললেন, আপনাকে আজই ফাইনাল কিছু উত্তর দিতে হবে না। আমাদেরও তো সব গুছিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে। আপনি একটু ভেবে দেখুন, পরে না হয় খবর নেব।

বিরক্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে সুকমল বললে, আচ্ছা।

সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় তাদের পিঠের ওপরই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে শব্দ করে খিল তুলে দিল।

এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটতে পারে সুকমল কোনওদিন ভাবেনি। কেমন যেন অপমানিত বোধ করছিল।

সমাজ সবই তো একে একে স্বীকার করে নিচ্ছে। সুকমলের চোখের সামনেই তো কত পরিবর্তন ঘটে গেল। এই মেয়েদের উদ্ভট উদ্ভট পোশাক। বারো বছর বয়েস না হতে শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হত এই সেদিনও। একে একে কত কি দেখলে সুকমল। শালোয়ার কামিজ, মিনি স্কার্ট, লুঙি, নুরি না কি যেন, ম্যাক্সি, জীন্‌স্‌, ধোতি-কুর্তা। ঋতার কাছেই নামগুলো শুনেছে।

বায়না ধরে ধরে ঋতাও একটা জীন্‌স্‌ প্যান্ট পরেছিল। পরে মাঝে মাঝে। মা মেয়ের একটাই যুক্তি, সবাই তো পরে।

প্রথম দিন দেখে হাসি পেয়েছিল সুকমলের। আপত্তি টেকেনি।

ঋতা বলেছিল, তুমিও তো ঠাকুমা হয়ে যাচ্ছ।

কে জানে সুকমলই পিছিয়ে পড়ছে কি না। এখন অবশ্য সবই চোখ সওয়া হয়ে গেছে, রাস্তায় ঘাটে দেখে, কই খারাপ তো লাগে না। সমাজ যা স্বীকার করে নেয়, সেটাকেই তো আমরা ভাল বলি।

সুকমলের মনে পড়ে, ঋতা গোলাপি নক্সার সালোয়ার-কামিজ পরে তার ঠাম্মাকে দেখাতে এসেছে, ঠাম্মা দ্যাখো কি পরেছি !

তখন কতই বা বয়েস। সুকমলের মা বলে উঠলেন, সে কি রে সুকু, মেয়েকে বাইজি বানাতে চাস নাকি ?

মায়ের এই রসিকতাটা বন্ধুবান্ধবদের কাউকে বলতে পারেনি, লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল। কারণ তখন তো বড় বড় মেয়েরাও পরতে শুরু করেছে। বললে হয়তো ভাবত, সে কি মশাই, আপনার মা এত কনজারভেটিভ ?

বিধবা মার কালো ধুতি-পাড় শাড়ি পরে বারান্দার এক কোণে তোলা উনোনে স্বপাক রান্না করার ব্যাপারটা যেভাবে লোকের চোখের আড়ালে রাখতে হ'ত, সেভাবেই এই রসিকতাটাও চেপে গিয়েছিল।

বৃদ্ধা মা যদি জীন্‌স্ প্যান্ট পরা দেখত কি বলত কে জানে।

আসলে সমস্যা এটাই যে ভালমন্দ বলে হয়তো কিছুই নেই। সমাজ মানে শুধুই ইউনিফর্মিটি। সবাই যা করছে তাই করো, সবাই যা পরছে তাই পরো। তা হলেই তুমি ভাল। প্রকৃত যুদ্ধটা তা থেকে আলাদা হতে চাওয়া, পৃথক হতে চাওয়া। তুমি যদি বেশি পিছিয়ে পড়ো তুমি একা, তুমি যদি বেশি এগিয়ে যাও তা হলেও তুমি একা।

সমাজে তো সবই চলছে, সব কিছু স্বীকার করে নিচ্ছে এই সমাজ। কিন্তু সে-সবই অনেক দূরে দূরে। সে সমাজ মধ্যবিত্তের জীবন থেকে অনেক দূরে, সম্পর্কহীন, অস্পষ্ট নিরবয়ব। সমাজ কি সবকিছু স্বীকার করে নিচ্ছে ? নাকি স্বীকার করে নিচ্ছে টাকাকে, টাকার লোভকে। টাকা থাকলে তোমাকে কিছুই মানতে হবে না, তুমি প্রায় স্বাধীন।

সুকমলের মতো মানুষদেরই যত যন্ত্রণা। কারণ ওরা জাঁতার দুটো চাকির মাঝখানে পড়ে আছে।

ওদের বিদায় দিয়ে সুকমল রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে এল। ওই সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেও যেন হাঁটুতে জোর নেই। রাগটা এখন ঋতার বিরুদ্ধে।

রাগ ? না, বরং নিজেকে কেমন যেন অসহায় লাগছে।

এর মধ্যে ঋতার ভূমিকা কোথায় কতটুকু কিছুই তো জানে না। মেয়েটা কি করে বেড়াচ্ছে কে জানে।

সুকমল তো বড় কোনও স্বপ্ন কখনো দেখেনি, দেখতে চায়ও না। দিব্যি সুখে-শান্তিতে চলে যাচ্ছে। সামান্য অভাব-অভাব বোধ নিয়ে। সে অভাব কার নেই।

একটা কালার টিভি কিনে ফেলতে পারলেই এখনকার মতো শান্তি।

পুণ্য যদি ভালভাবে পাশ করে বেরোতে পারে, চেষ্টাচরিত্তির করে একটা চাকরি নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আর ঋতার বিয়ে। এখনো হাতে অবশ্য অনেক সময় আছে। ওর একটা ভাল বিয়ে দিতে পারলেই সুকমল নিশ্চিন্ত। তার মধ্যে হঠাৎ এ কি একটা বিশ্রী ফ্যাঁকড়া !

সিনেমা করবে ! সিনেমা করে নাম হয়ে গেলে অনেক টাকা রোজগার করবে। যেন সুকমলের বৃদ্ধবয়েসের জন্যে পেনসন নেই, পি এফ নেই, যেন কিছুই জমায়নি এতকাল !

দোতলায় উঠে এসে হেলানো আরামচেয়ারে গা এলিয়ে দিল সুকমল। কোনও কথা বলল না। বলতে ইচ্ছেও হচ্ছিল না। রেগে ফেটে পড়ার ভয়। যেন সব দোষ কল্যাণীর।

এ সময়টা টি ভি খুলে বসে। খবর শোনে। আজ আর খবর শোনার কোনও আগ্রহ নেই। আজ তার নিজের বাড়িতেই খবর।

পুণ্য একবার এল, উঁকি দিয়ে চলে গেল। লোকদুটোর সঙ্গে যখন সুকমল কথা বলছিল তখনই হয়তো ফিরেছে।

খেয়েদেয়ে একজন প্রফেসরের বাড়িতে এসময় পড়তে যায় ও।

কল্যাণী ওপর থেকে করুণাকে হাঁক দিল। —দাদার চা দিয়ে যা।

একটু পরে এসে ঢুকল ঘরে।

নির্বিকার ভাবে প্রশ্ন করল, ওরা কারা গো ? কেন এসেছিল ?

ক্যাম্বিসের এই ফোল্ডিং চেয়ারটা বহুকাল আগে ফুটপাত থেকে কেনা। তখন দামও খুব সামান্য ছিল, কত আর হবে আঠারো-বিশ টাকা। আজকাল এগুলো কেউ বড় একটা ব্যবহার করে না, গায়ে পুরোনো পুরোনো গন্ধ বলেই হোক্ বা গুটিয়ে তুলে রাখার জায়গার

অভাব বলেই হোক কল্যাণী মাঝে মাঝেই চেষ্টা করেছে ফেলে দিতে। ফেলে অবশ্য দিত না, চেনাজানা কেউ নিতে চাইলে দিয়ে দিত। কিন্তু বাদ সেধেছে সুকমল। এমনকি নীচের তলার ছোট ঘরটাতেও নিয়ে গিয়ে রাখতে দেয়নি। কারণ অফিস থেকে ফিরে বা ছুটির দিনে সুকমল এই গা এলানো চেয়ারটায় বসে বেশ আরাম পায়।

সুকমল ওই ক্যাম্বিসের চেয়ারটাতে শরীর এলিয়ে চুপচাপ আধশোয়া বসে ছিল। দু'চোখ বোজা।

কল্যাণীর প্রশ্ন শুনে প্রথমে উত্তর দিল না।

তারপর চোখ মেলে তাকাল এবং বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, তোমার মেয়ে সিনেমার হিরোইন হবে।

কল্যাণী কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু সুকমলের গলার স্বরই বলে দিল কিছু একটা অঘটন ঘটেছে।

অবাক অস্ফুট গলায় কল্যাণী বললে, সিনেমা?

রাগে ফেটে পড়ল সুকমল। যেন সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে গেছে, যেন সব দোষ কল্যাণীর এভাবেই চিৎকার করে বললে, মেয়ে কার সঙ্গে মিশছে, কি করে বেড়াচ্ছে খবর রাখো তার?

বাবার চিৎকার শুনে পুণ্যও পাশের ঘর থেকে ছুটে এল।

সুকমল রাগে খুবই কম, কদাচিৎ। সেজন্যেই পুণ্য হবাক হল।

কল্যাণী এসব সময়ে খুব শান্ত থাকে। শান্ত করার চেষ্টা করে।

কিন্তু এই উষ্মা যেন তারও ধৈর্যের বাইরে চলে গেল। বললে, তা চেঁচাচ্ছ কেন। কি হয়েছে বলবে তো।

'মেয়ে কার সঙ্গে মিশছে, কি করে বেড়াচ্ছে!' লোকটার যদি একটু বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে। এ ধরনের কথা চেঁচিয়ে বলার নাকি। পিছনের বাড়িটা তো একেবারে গায়ে গা, এ বাড়ির জানালা ও বাড়ির জানালা প্রায় সামনাসামনি। সর্বক্ষণ পর্দা দিয়ে রাখতে হয়। জোরে কথাবার্তা বললে শোনাও যায় হয়তো। তাছাড়া ওই কাজের মেয়ে করুণা, ও তো এখনই পুণ্যর চায়ের কাপ থালা গেলাস নিয়ে যেতে আসবে। ওর কানেও যেতে পারে।

পিছনের বাড়ির রঞ্জুই শুনুক আর করুণাই শুনুক, সঙ্গে সঙ্গে তো পাড়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ডালপালা বিস্তার করে সেই তিলটুকু কত বড় তাল হয়ে যাবে তার ঠিক কি।

সুকমলের বুকের ভেতর থেকে একটা ক্ষোভ কঁকিয়ে উঠল। বললে, কি সব লোকের সঙ্গে মেয়ে তোমার আলাপ করে, দেখলে ঘেন্না হবে।

একটু থেমে বললে, ওর বন্ধুর দাদা! কথাটা বলল এমন ভাবে যেন ভেংচি কাটছে।

মুখ বিকৃত করে আবার বললে, ওই রকম দাদা যার সে মেয়ে বন্ধু হয় কেন? কলেজে আর মেয়ে নেই!

কথাগুলো বলে ফেলার পর একটু একটু করে রাগ কমল। তীব্র শ্লেষের ভঙ্গিতে শর্মিষ্ঠার দাদার চেহারার বর্ণনা দিল সুকমল। প্যান্টে তাপ্পি, কোমরে ইয়া চওড়া বেল্ট, বেল্টের মাথায় সাপের ফণার মতো ইয়াব্বড়ো নিকেলের চাকতি, কায়দা কত। জুলপির বাহার যদি দেখতে। আর মোটা শেল-ফ্রেমের চশমা, যেন মাল্টি ন্যাশনালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। করেন কি, না সিনেমা!

বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ক্রোধ আর ঘৃণা ঝরে পড়ছিল।

কল্যাণীর হাসি পাচ্ছিল, তবু চেপে গেল। এসময় হেসে ফেললে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। বলবে, তোমার প্রশ্রয় পেয়েই মেয়েটা এমন বেয়াড়া হয়ে উঠছে।

--কি হয়েছে তা তো বলবে। অধৈর্য হয়ে কল্যাণী জিগ্যেস করল।

সুকমল আবার রেগে গিয়ে বললে, এই রকম লোকের সঙ্গে আলাপ, সেটাই তো যথেষ্ট। বাড়িতে এসে বলেছিল তোমাকে ?

কল্যাণীও এবার একটু রেগে গেল। যেন সব দায়-দায়িত্ব তারই।

নরম প্রতিবাদের স্বরে বললে, সব কথাই কি কেউ বাড়িতে এসে বলে নাকি ? হয়তো মনে ছিল না। আর আলাপ হয়েছে বলেই কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি।

—এর পর তো বলবে সিনেমার হিরোইন হলেই বা ক্ষতি কি।

কল্যাণী চুপ করে গেল। ঋতাকে তো ভাল বলেই জানে, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। কোনওদিন কোনও বেয়াদপি করেনি। তাছাড়া দেখে তো মনে হয়েছে পড়াশোনায় দিব্যি মন আছে। যতটা আশা করেছিল ওরা ততটা না হলেও রেজাল্টও খারাপ নয়।

সুকমল বললে, আসলে নিজে তো সাহস করে বলতে পারেনি, তাই ওদের পাঠিয়েছে।

লোকদুটোর কথাগুলো মনে পড়ে যেতেই হঠাৎ আবার রেগে গেল সুকমল। বললে, শালারা আবার টাকার লোভ দেখাচ্ছে। আমাকে !

রাগ হবারই কথা। মানুষ সম্বন্ধে এই লোকগুলোর কি ধারণা ? টাকার লোভে আমরা সব পারি ! সুকমলের এমন কিছু বয়েস হয়নি, এখনো রিটায়ার করতে অনেক বছর বাকি। আরো উন্নতি হবে না তাও নয়। দিব্যি সচ্ছল অবস্থা। চলে তো যাচ্ছে, খুব একটা উচ্চ বাসনাও ওর নেই। বাসনা একটাই, সংসারটা পরিচ্ছন্ন ভাবে শেষ দিন অবধি চলবে। ছেলের চাকরি, মেয়েব বিয়ে এটাই তো আমাদের বানপ্রস্থ। আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের।

সুকমল টি ভি কিংবা সিনেমা দেখে কখনো কখনো। আনন্দও পায়। কিন্তু যারা এসব করে তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই, আগ্রহও নেই। গুণ দেখলে প্রশংসা করে এই অবধি। ওপরতলায় একটা ঝকঝকে সমাজ আছে, জানে, কিন্তু তাদের চোখে দেখা যায় না। দু'একজনকে দেখলেও অনেক দূর থেকে। তারা তো কোনও কিছুরই পরোয়া করে না, স্বাধীন, যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ায়। আর এক একেবারে হতদরিদ্র পরিবার থেকে কেউ কেউ সিনেমা করতে আসে। নিরুপায় হয়ে। টাকাটাই তাদের কাছে একমাত্র লক্ষ্য। যে কোনও উপায়ে রোজগার করতে চায়। তারপর গুণ থাকলে হঠাৎ একদিন বড় হয়ে যায়। খুব বড়লোক হয়ে যায়। সে গল্পও তো কিছু কিছু শুনেছে। কিন্তু তখন কি আর তারা আমাদের সমাজের মানুষ থাকে। তারা বোধহয় একটা আলাদা সমাজ গড়ে নেয়।

সুকমলের পরক্ষণেই মনে হল, না, তা অবশ্য নয়। নাচগানের মতোই কারো কারো এও একটা নেশা ! বড় অভিনেতা হতে চায়, বড় অভিনেত্রী হতে চায়। তারা হয়তো প্রতিভা নিয়েই জন্মায়। তারা মধ্যবিত্ত সংসারের বাধাবন্ধন মানে না। তাদের সামনেও একটা আদর্শ থাকে। একটা ভিন্ন আদর্শ। সংসারে তারা ব্যতিক্রম।

আসলে সমাজ চলছে তো এই দ্বন্দ্ব নিয়েই। একদিকে মানিয়ে চলা, সকলে যে রকম ঠিক সেই রকমই থেকে যাওয়া। এতে ঝড়ঝঞ্ঝা কম। কেউ এতটুকু কাদা ছিটোবার যেন অবকাশ না পায়। এর নাম ইউনিফর্মিটি। আর এক একজন এরই মধ্যে বেরিয়ে আসে। সব অমান্য করে, ভেঙেচুরে দিয়ে। সেখানে ব্যক্তিই বড়। তার ইচ্ছে অনিচ্ছেই নিয়ম বানায়। সেও এক ধরনের পোশাক বদলানো।

সুকমল ভাবল, আমরা বোধহয় ওই পোশাক বদলানো অবধিই যেতে পারি, তার বেশি নয়। তাও কখন বদলাই ? যখন সকলেই একে একে বদলাতে শুরু করেছে।

সেজন্যেই নিজেকে বড় অপমানিত লাগছিল সুকমলের। ঋতাকে কেউ সিনেমায় নামানোর কথা বলতে আসবে কোনওদিন কল্পনাও করেনি। আরো অসহ্য লাগছিল, জুলপিওয়ালা ছোকরাটার জন্যে। 'একবার নাম করে ফেললে, তখন অনেক টাকা।'

ক্ষোভের সঙ্গে সুকমল বললে, আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছে।

কল্যাণীও ভিতরে ভিতরে রাগছিল। তবু শান্ত করার জন্যে বললে, তাড়িয়ে তো দিয়েছ ওদের, তবু ফুঁসছ কেন।

একটু থেমে বলতে যাচ্ছিল, ঋতা আসুক না, সব জানা যাবে।

তখনই বোধহয় সিঁড়িতে চটির শব্দ শুনতে পেল।

পুণ্য অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছিল। বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে অপেক্ষা করছিল। টিউটরেব কাছে পড়তে যায়নি। রাগ ওরই সব চেয়ে বেশি।

ওর বয়েস কম। সিনেমা দেখে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সিনেমা নিয়ে গল্পগুজবও করে। ফিল্ম-অ্যাকট্রেসদের নিয়ে ওদের বয়েসী ছেলেরা যা সব সরল আলাপ-আলোচনা করে তার অনেকটাই তো তাদের সম্পর্কে স্ক্যান্ডাল। কিংবা তাদের দেহসৌষ্ঠব নিয়ে। তাই ভিতরে ভিতরে একটা ঘৃণাও আছে।

ঋতা কিনা সেই সিনেমায অভিনয় করবে! পুণ্য ভাবতেও পারে না। ও তা হলে বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাবে কি করে। পাড়াপড়শীদের সামনেও মাথা তুলে তাকাতে পাববে না। ছি ছি ছিটোবে সকলের চোখের দৃষ্টি।

মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছিল ওর। ও জানে বাবা-মা নিশ্চয়ই ঋতাকে তা করতে দেবে না। তা সত্ত্বেও যদি ও জিদ ধরে, তা হলে, তা হলে পুণ্য কলেজ ছেড়ে দেবে। কলেজেব বন্ধুদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ওরা কি ধরনের টীকাটিপ্পনী দেয়, রঙ্গরসিকতা করে তা তো ও জানে। ঋতাকেই কি ছেড়ে দেবে। আড়ালে কেন, ওকে শুনিয়ে শুনিয়েও হয়তো কত কি বলবে।

করুণা দরজা খুলে দিতেই ঋতা হাসি হাসি মুখে ঢুকল। হাতের আধ খাওয়া ভুট্টা চিবোতে চিবোতে।

আর সেই হাসি দেখেই সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল পুণ্যর।

ঋতা উঠে আসছে, সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

কল্যাণী কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। আর পুণ্যর ভেতরটা যেন রাগে ফেটে পড়তে চাইছে।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসতে আসতেই মা'র থমথমে মুখখানা দেখে ঋতার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। তেমন দেরি করে তো ফেরেনি। কিছু কি হয়েছে? ভয়ঙ্কর কিছু।

মা ঘরে ঢুকে গেল। শুনতে পেল বেশ রাগের সঙ্গে কি যেন বলছে বাবাকে।

আর সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য এগিয়ে এসে প্রায় চিৎকার করে বলে বসল, যত সব বাজে লোকের সঙ্গে মেশামেশি কবছিস। লজ্জাও করে না!

মা পুণ্যর চিৎকার শুনেই বেরিয়ে এল। বললে, তুই চুপ কর, তুই চুপ কর!

তারপর বেশ কঠিন স্বরে বললে, তোর বাবা ডাকছে তোকে, যা।

বলে ঘরের দিকে আঙুল দেখালো।

ঋতা আদরে মানুষ হয়েছে, এরকম ব্যবহার কোনওদিন পায়নি। কদাচিৎ মা হয়তো সামান্য কড়া কথা বলে। ও অবাক হয়ে গেল। ভয় পেল।

মা'র কথা শুনেই ওর হাত থেকে ভুট্টাটা পড়ে গেছে তখন। পা কাঁপছে। ভাবতেই পারছে না কি এমন অন্যায় করে বসেছে।

'যত সব বাজে লোকের সঙ্গে মেশামেশি করছিস, লজ্জাও করে না !' পুণ্যর কথাটা তখনো কানে বাজছে।

ধীরে ধীরে ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখল বাবা ক্যাম্বিসের হেলানো চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে, দু' চোখ বন্ধ।

ওর বুকের ভেতরটা অজানা ভয়ে কাঁপছিল। মার থমথমে মুখ আর পুণ্যর ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনেই ওর মনে হয়েছে কিছু একটা ভয়ঙ্কর অন্যায় করে ফেলেছে। অন্যায়টা কি সেটাই শুধু জানে না।

একটা আতঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও। নিজেকে খুব অপমানিত লাগছিল, এভাবে কেউ তো কখনো ওকে বলেনি। মা'র এরকম থমথমে মুখ কখনো দেখেনি।

ও প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিল বাবাও প্রচণ্ড রেগে গিয়ে কিছু বলবে। কি, সেটাই তো জানে না।

সুকমল চোখ খুলল।

একটু আগেই কল্যাণী বলেছে, ওই তোমার গুণধর মেয়ে ফিরল, ওকেই জিগ্যেস করো।

সেজন্যেই চোখ বন্ধ করে দিয়েছিল। মেয়ের মুখের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছিল না।

—বোস, ওখানে।

খুব শান্ত গলায় বলল সুকমল। সামনের খাটটা দেখিয়ে দিল।

যন্ত্রের মতো গিয়ে বসল ঋতা, ঠিক যেখানটায় বাবা আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে সেখানেই।

কল্যাণীও এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

আর ঋতার দুচোখে জল টলমল করল। ও ভাবতেই পারেনি বাবা এমন শান্ত ভাবে বলবে, বোস, ওখানে।

দু'জনে মুখোমুখি নয়। সুকমল হেলানো চেয়ারে মাথা হেলিয়ে আধশোয়া, তাকিয়ে আছে সামনের বারান্দার দিকে। ঋতা পিছনের খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে নিথর নিঃশব্দ। বুকের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্ক চেপে।

—শর্মিষ্ঠা বলে তোর কোনও বন্ধু আছে ? বেশ শান্ত প্রশ্ন।

আরো অবাক হল ঋতা। ঘাড় নাড়ল, কিন্তু বাবা তো অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, দেখতে পাবে না, তাই অস্ফুটে বললে, হ্যাঁ।

—তার দাদা এসেছিল।

চমকে তাকাল ঋতা বাবার মুখের দিকে।—কেন ? ওর গলার স্বর যেন কেঁপে গেল। শর্মিষ্ঠার কথাটা মনে পড়ল, তোকে দেখে তো দাদা একেবারে চার্মড্। কিন্তু তার জন্যে শেষ অবধি বাড়ি অবধি ধাওয়া করে আসবে !

মা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। পুণ্য চেঁচিয়ে উঠতে তাকে থামিয়েছে, 'তুই চুপ কর, তুই চুপ কর' বলে। ভেবেছিল স্বামীও হয়তো প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে একটা বিশ্রী ব্যাপার করে তুলবে। সেজন্যেই দাঁড়িয়ে আছে, তেমন কিছু ঘটলে, শান্ত করবে।

যে রকম রেগে গিয়েছিল, ভয় ছিল অত বড় মেয়েটাকে শেষে চড়চাপড় না মেরে বসে। তেমন হলে, বাধা দেয়ার জন্যেই যেন তৈরি হয়ে ছিল।

কিন্তু সে সব দিকেই গেল না দেখে, ওই অত ঠাণ্ডা গলার কথা শুনে কল্যাণী নিজেই রেগে গেল। একে তো স্রেফ প্রশ্রয় বলে।

ঋতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে বসল, কেন ?

সঙ্গে সঙ্গে মা বলে উঠল, কেন সে কথাই তো তোকে জিগ্যেস করছি। ওসব লোক কেন আসে!

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ঋতা।—বাবা বিশ্বাস করো, আমি কোনও অন্যায় করিনি ; আমি কিচ্ছু জানি না।

—তুই সিনেমা করবি বলিসনি ? মা'র গলার স্বর বেশ রূঢ়।

—সিনেমা ? অবাক হয়ে মা'র মুখের দিকে তাকাল ঋতা।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 'দাদা তোকে দেখে তো চার্মড।' তারপর সেই ইয়ার্কি ঠাট্টা, 'সিনেমার হিরোইন হবি ?'

কোথায় যেন একটার সঙ্গে আরেকটার যোগাযোগ আছে।

বাবা চুপ করে ছিল, বোধহয় কথাগুলো বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল।

হঠাৎ বললে, ওই জুলপিওয়ালা দাদাটা তো সিনেমা করে। তার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক, আলাপ হয় কেন ?

একথার কি জবাব দেবে ঋতা। ওর নিজের কাছেই তো দুর্বোধ্য লাগছে। এখন মনে হচ্ছে সমস্ত ঘটনাটা সাজানো। শর্মিষ্ঠার কারসাজি। ওকে দেখাবে বলেই হয়তো দাদাকে কলেজে আসতে বলেছিল। 'সিনেমার হিরোইন, সিনেমার হিরোইন', ওটা তা হলে শুধু ঠাট্টাইয়ার্কি নয়।

বাবা মা পুণ্য, সকলের ওপর ওর রাগ হচ্ছিল। ওকে এত অবিশ্বাস কেন। ও তো কোনও অন্যায় করেনি। তবে ওকেই কেন জবাবদিহি করতে হবে। ভেতরে ভেতরে ওর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল শর্মিষ্ঠার ওপর। এমন একটা কাণ্ড কেন করে বসল ও। জিগ্যেস না করে কেন পাঠাল।

এতক্ষণে হঠাৎ খুব সাহসী হয়ে উঠল ঋতা। সমস্ত ব্যাপারটা বলল।—আমাকে তো কিছু বলেনি শর্মিষ্ঠা। সেদিন ডাকল, ডেকে দু'চারটে কথা, ওকে কি আলাপ বলে নাকি! বললে, ও যে সিনেমা করে জানতামই না।

যাক্। নিশ্চিন্ত। দুর্ভাবনার ভারী পাথরটা নেমে গেল সুকমলের বুক থেকে।

—মিশিস না। মা বললে।

ঋতার কানেও গেল না কথাটা। সব বলে ফেলে হাল্কা মনে বেরিয়ে এল, মাটিতে পড়ে যাওয়া ভুট্টাটা তুলে নিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে ছুড়ে দিল। হাসার চেষ্টা করে বললে, এমন কাণ্ড করলে তোমরা, ভুট্টাটাও খেতে পেলাম না।

॥ তিন ॥

আজ সেদিনটার কথা ভাবলে ঋতার অবাক লাগে। হাসি পায়। কখনো কখনো মনে হয় সেই দিনগুলোই বুঝি ভাল ছিল। স্বাধীনতা ছিল। এখন আর সেটুকুও নেই।

সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে ফিরছিল ঋতা। গলির মোড়ে এসে ট্যাক্সিটা থেমে পড়ল। ওদিক থেকে একটা রিক্সা বেরিয়ে আসছে। যাবার রাস্তা নেই।

একেবারে মোড়ের মাথায়, যেখানে ভুট্টাওয়ালাটা বসে, সেখানেই ট্যাক্সি থেমে দাঁড়িয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য, ও সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে, বলে উঠল, চল ভুট্টা খাওয়া যাক।

পুণ্যর হয়তো খুব খিদে পেয়েছিল, কিংবা শুধুই ভুট্টা খাওয়ার ইচ্ছে। ঋতারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, কিন্তু আগেকার মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে ভুট্টাওয়ালার কাছ থেকে ভুট্টা কিনতে পারে না।

—দাদা ! উচ্চারণে বেশ একটা মৃদু ধমক দিল ঋতা ।

অর্থাৎ এ সব ওকে আর মানায় না। সেই স্বাধীনতা ও এখন হারিয়ে বসেছে। সত্যি কি তাই, নাকি নিজেকে নিজেই দামি বানিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

দামি বানিয়ে তোলার চেষ্টা ? তা হলে ট্যাক্সিটা বাড়ির দরজা অবধি আসতে পারল না বলে মনে মনে বিরক্ত হল কেন ।

বাড়ির সামনে কে একটা ঠ্যালা রেখে গেছে, তাই ট্যাক্সিটা বাড়ির দরজা অবধি আসতে পেল না, পুণ্য বলে উঠল, রোখকে রোখকে ।

বিরক্তিটা অন্য কারণে। ঋতার তখন চোখ পড়ে গেছে উল্টো দিকের তেতলার বারান্দায় । একেবারে সামনাসামনি নয়, দু-চারখানা বাড়ি পরে, বিপরীত ফুটপাত ঘেঁষে । বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিভা আর তার মা । ঋতাকে দেখে কি যেন বলাবলি করল, হাসাহাসি করল । ঋতা সম্পর্কে ওদের কি এক অদম্য কৌতূহল ।

শুধু ওদের নয়, পাড়ার সকলেরই। অথচ এখানে তো ওরা কতদিন আছে, সেই ছেলেবেলা থেকে। কেউ কাকিমা, কেউ মাসিমা। মেয়েগুলোর সঙ্গেও আগে দেখা হলে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করত। একসময় ওদের সঙ্গে পীচের রাস্তায় খড়ি টেনে এক্কাদোক্কা খেলেছে ।

এখনো দেখা হলে দু' একজন হেসে হেসে এগিয়ে আসে। দু' চারটে কথা বলে, একটু গায়ে পড়া ভাব দেখায়। ঋতাও হাসে, কথা বলে। কিন্তু ওই অবধি। কোথায় যেন একটা কাচের দেয়াল আছে। সেটা ঋতার নিজেরই সঙ্কোচ, না ওদের কৃত্রিম ব্যবহার, ঠিক বুঝতে পারে না ।

শুধু এইটুকু বুঝতে পারে, এতকাল যে মিলেমিশে ছিল, পাড়ার সকলের সঙ্গে, এখন একটু একটু করে ওদের বাড়িটাই কেমন যেন আলাদা হয়ে গেছে।

নিভা আর নিভার মা নির্ঘাত ওকে নিয়ে কিছু বলাবলি করছে, হাসাহাসি করছে। তাই দ্রুত পায়ে মাথা নিচু করেই ও বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল ।

অথচ এত সঙ্কোচ হবার তো কিছুই নেই। তবু, ঋতা ট্যাক্সির ভাড়া মেটাবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। ওর মনে হচ্ছিল নিভা আর নিভার মার কৌতূহলী দৃষ্টিটা ওর পিঠের ওপর সেঁটে আছে ।

ওরা কি ভাবে, কি বলে ঋতার অজানা নয়। ভদ্রলোক ! এই চারপাশের বাড়িগুলোকে সবাই ভদ্রলোকের বাড়ি বলে জানে। অথচ এরাই সব সময়ে চতুষ্পার্শ্বে শুধু কৌতূহলের নোংরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। নোংরামি খুঁজে পাওয়াতেই এদের পরম আহ্লাদ। খুঁজে না পেলে বানিয়ে নেয় ।

ওদের বাড়িটাও তো কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। তা না হলে শর্মিষ্ঠার দাদা শুধু দেখা করতে এসেছিল বলে বাবা-মা, এমনকি দাদাও এত রেগে গিয়েছিল কেন। ও নিজেও ।

পরের দিন কলেজে গিয়ে শর্মিষ্ঠাব সঙ্গে খুব রাগারাগি করেছিল ।

শর্মিষ্ঠা ওর রাগ দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। বাণীও ।

—তুই এত চটে যাচ্ছিস কেন ? শর্মিষ্ঠা বলেছিল, তুই ওসব করতে চাস না, বলে তো দিয়েছিস। ব্যস। এত রাগারাগির কি আছে।

একটু থেমে বলেছিল, তোদের বাড়ি যে এত কনজার্ভেটিভ আমি কি করে জানব, বল। তুই তো কোনওদিন বলিসনি ।

ভীষণ অপমানিত লেগেছিল ঋতার। 'তোদের বাড়ি যে এত কনজার্ভেটিভ'। এর চেয়ে বড় গালাগাল যেন আর নেই ।

মনে মনে বলেছে, আমার আধুনিকা হয়ে কাজ নেই ।

কতখানি গেলে আধুনিক হওয়া যায়, আর কোনও সীমা ছাড়ালে বেলেল্লাপনা, ঋতা তা আজো জানে না। এখন তো দেখছে ভদ্রতাকেও মানুষ ভুল চোখে দেখে। কেউ তোযামোদ ভাবে, কেউ ভেবে বসে ঋতা বুঝি নিজেকেই সস্তা করে দিতে চাইছে।

অন্যের কথা কি, মা নিজেও বোধহয় সন্দেহ করে। অথচ কিছু বলতে পারে না।

—সুমন্তবাবু এতক্ষণ বসে থেকে চলে গেলেন।

পুণ্য তখনো ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বাড়ি ঢোকেনি। মা বললে।

কথাটা শুনেই বলে উঠল, ইস, আরেকটু বসিয়ে রাখতে পারলে না।... পরক্ষণেই বললে, চা-টা দিয়েছিলে তো?

মা বললে, কি আব দেব, কিছুই তো নেই। ডিম ভেজে দিলাম।

এক এক সময় মার ওপর ওর প্রচণ্ড রাগ হয়। কিছুই নেই কেন। ফ্রীজ তো আছে, গ্যাসও। কে কখন এসে পড়বে, কিছু একটা বানিয়ে রেখে দিলেও তো পারে।

কিন্তু এটা কি শুধুই ভদ্রতা। ঋতা নিজেই বুঝতে পারছে না। ও শুধু বুঝতে পারছে একটু একটু করে ও নিজে কেমন বদলে যাচ্ছে। শুধু কি ও নিজে। বাবা মা পুণ্য সকলেই।

খুব আশ্চর্য লাগে ওর। মানুষ এভাবেই বুঝি বদলে যায়, নিজেরাও জানে না।

সেই প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ে গেল। মা কি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। কি না, একটা বাজে লোক এসেছে, সিনেমায় নামাতে চায়। যেন সব অপরাধ ঋতার।

কিন্তু পরের দিন থেকেই মা একেবারে অন্য মানুষ। বাড়ির সকলেই।

পুণ্য তো রসিকতা করে ওকে ফিল্মস্টার বলে ডাকতে শুরু করে দিল।

বাবা একদিন হাসতে হাসতে মাকে বললে, যাও একদিন তোমার হাতিবাগানের দাদাকে বলে এসো, আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে অত ভাবতে হবে না। সিনেমার হিরোইন হবার জন্যেই যখন পছন্দ করেছে...

সুকমল হাসতে হাসতে একদিন অফিসেও এক বন্ধুকে বলে ফেলেছিল।

যেটা বাড়িতে একটা আতঙ্ক ছিল, গোপন লজ্জা, সেটাই কেমন করে যেন হয়ে উঠল গর্ব। বিশেষ করে কল্যাণীর কাছে।

মেয়ে তো আব সত্যি সত্যি সিনেমা করতে যাচ্ছে না, তা হলে গর্ব করবে না কেন। মেয়ে যে সুন্দরী, এব চেয়ে বড় প্রমাণ কিছু আছে নাকি।

সুকমল বললে, যাও একদিন তোমার হাতিবাগানের দাদাকে বলে এসো।

কথাটার মধ্যে কোনও খোঁচা ছিল কিনা কল্যাণী বুঝতে পারল না। দাদা তো এমন কিছু দোষের কথা বলেনি। বরং ওদের কথা ভাবে, সৎ পরামর্শই দেয়। মেয়ে বড় হয়ে উঠলে কোনও বাবা-মা তার বিয়ের কথা না ভেবে পারে। কেউ আগেভাগে, কেউ দেরিতে। ওরা হয়তো একটু কম বয়েসেই বিয়ে দেয়া পছন্দ করে। কল্যাণীরা অবশ্য এখন ও সব চিন্তাও করে না। ঋতা পড়াশোনা শেষ করুক, তারপর ভাবা যাবে। এম-এ পড়ার ইচ্ছে তার, তা না হোক. গ্রাজুয়েট তো হতেই হবে। পাশ করে তেমন একটা ভাল জায়গায় ভাল চাকরি পেলেও সুকমলের আপত্তি নেই। একদিন বলেছিল, আজকাল একজনের রোজগারে সংসার চালানো যায় না, ভালই তো, চাকরি পেলে করবে। হাসতে হাসতে বলেছিল সুকমল। তা বলে সিনেমা-থিয়েটারে অভিনয়? না, সেসব কক্ষনো নয়।

কিন্তু কেউ একজন ঋতাকে সিনেমার হিরোইন হবার জন্য সাধাসাধি করছে, আর অনেক টাকার লোভ দেখানো সত্ত্বেও ওরা যে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, বলতে গেলে লোকটাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, সেটাও তো গর্ব করে বলার মতো।

না, হাতিবাগানে যাওয়ার কথা কল্যাণীর মনে এল না। সুকমল তো সব সময়ে বোঝে না দাদা যা বলে তা ভালর জন্যেই বলে, হিংসে তো দূরের কথা বরং ভালই চায়। ওদের কাছে গর্ব করে বলার কিছু নেই। একদিন গিয়ে বলে আসবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু এত তাড়া কিসের।

বরং মনে পড়ছে নির্মলেন্দুবাবুদের কথা। নির্মলেন্দুবাবুর চটক দেখানো বৌটার কথা। বয়েস তো কম হল না, এখনো পোশাক-আশাকের ঢঙ কি।

নির্মলেন্দু সুকমলদের অফিসেই কাজ করত। 'বড় বেশি অ্যাম্বিশাস', সুকমল একদিন বলেছিল। 'যা পেয়েছিস তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাক না বাবা, কেবল ঘুরছে কীভাবে উন্নতি করা যায় তার তালে।' সুকমল একদিন কল্যাণীর কাছে বলেছিল।

কল্যাণীর অবশ্য কথাটা ভাল লাগেনি। উন্নতির কথা কে না ভাবে। সুকমলই কি চায় না। কিংবা কে জানে হয়তো সত্যিই চায় না। মানে অন্য লোকদের মতো চেষ্টা নেই, আপনা থেকে যেটুকু হয়েছে তাতেই তৃপ্তি। চেষ্টা থাকবে কেন, ওকে তো আর সংসার চালাতে হয় না। ঋতা আব পুণ্যর পড়ার খরচ জোগাতেই তো ও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। দিনকাল যা পড়েছে, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে গেলেই অন্ধকার। সেটা সুকমলও জানে নিশ্চয়।

একদিন তো বলেই ছিল, এই যে লোকগুলোকে দেখ, সব হাসছে গল্প কবছে, নাচ-গান সিনেমা টিভি নিয়ে ফুর্তিতে আছে, এ সব কিন্তু কারো আসল চেহারা নয়। সবাই ভেতরে ভেতরে একটা আতঙ্ক পুষে বেঁচে আছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্ক।

কি প্রসঙ্গে বলেছিল মনে নেই কল্যাণীর। বোঝার চেষ্টাও করেনি। তখন বোধহয় খুব রেগে ছিল ও, কি নিয়ে যেন তর্কাতর্কি হচ্ছিল।

এ সব কথা সুকমল আগে বলত না, যত বয়স হচ্ছে ততই ওর কথাগুলো আর তেমন হাল্কা থাকছে না। আগে ভাবত জীবনটা তুড়ি মেরে কাটিয়ে দেবে।

কল্যাণীর কিন্তু নির্মলেন্দুবাবুকে ভালই লাগত। পোশাক-আশাকে খুব ফিটফাট। একদিন সাফারি স্যুট পরে চলে এল, সুকমলের সঙ্গে। অফিস থেকেই।

কল্যাণীকে রসিকতা করে ম্যাডাম বলে ডাকত।—এই যে ম্যাডাম, আসুন একবার এদিকে।

নীচেতলার বসার ঘর থেকে ডাক এল।

নীচের রান্নাঘরেই কাজের মেয়েটাকে কল্যাণী কি একটা নতুন খাবার শিখিয়ে দিচ্ছিল।

হাঁকাহাঁকি শুনে হাসি হাসি মুখে চলে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে নির্মলেন্দু ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দেখুন তো ম্যাডাম, কেমন লাগছে ? মানায়নি আমাকে ?

সুকমলেরই সমবয়েসী প্রায়, কানের পাশেই নয়, কালো চুলের ঢেউগুলোও যত্রতত্র সাদা চিকচিক।

নিজের থেকেই বললে, আহা বয়েস তো হয়েছেই, তা বলে সাফারি পরা যাবে না ?

কল্যাণী হেসে ফেলে বললে, বাঃ, ভালই তো লাগছে, বয়েস কমে গেছে অনেক। এবার চুলেও একটু কলপ দিয়ে ফেলুন।

—দেব ? হা হা করে হেসে উঠল নির্মলেন্দু। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সুকমলকে বললে, কি রে, এবার ?

বললে, জানেন ম্যাডাম, এই সাফারি পরে এসেছি বলে অফিসসুদ্ধ সব আমার পিছনে লেগেছে। এই বয়েসে নাকি মানায় না।

কল্যাণী হেসে বললে, ওদের সব হিংসে, বুঝলেন না। পরবেন, নিশ্চয়ই পরবেন। দারুণ স্মার্ট লাগছে।

সুকমলও হাসছিল হা হা করে। খুব বন্ধু ছিল দু'জনে।

সেদিন চা-টা খেয়ে নির্মলেন্দু চলে যাওয়ার পর কল্যাণী অবশ্য হাসতে হাসতে বলেছিল, যাই বলো, একটু চ্যাংড়া চ্যাংড়া লাগে। এ বয়েসে...

সুকমল উল্টে হেসে বলেছিল, না, এমন কিছু খারাপ লাগেনি, আমরা সব ইচ্ছে করে পিছনে লাগছিলাম। আরে বাবা, করিস তো সরকারি অফিসে চাকরি, ওখানে এ সব মানায় না।

সেই সুকমলই একদিন খুব বিমর্ষ মুখে অফিস থেকে ফিরল। কল্যাণী তো মুখ দেখে ভয় পেয়েই গিয়েছিল। ভেবেছিল, অফিসের কাজেই কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সেকথা জিগ্যেস করতেও অস্বস্তি। আপিসকাছারির কথা সুকমল বড় একটা বাড়িতে তোলে না। বন্ধুবান্ধবরা এলে, এই যেমন নির্মলেন্দু, ওরা আলোচনা করলে তবেই আভাসে কিছু জানতে পারে। তাছাড়া ওর অফিসের সঙ্গে কল্যাণীর সম্পর্ক ওই মাসমাইনের টাকাটা। জানতে ইচ্ছেও করে না।

বরং কল্যাণী চা দিতে গেলে ওরা বসতে বললে কিছুক্ষণ বসে। লোকগুলোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান আছে নাকি। বসতে বলবে, বলে এমন সব অফিসের কথা শুরু করবে, যার সম্পর্কে কল্যাণীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বসে থাকতেও যে ওর রীতিমতো কষ্ট হয়, অপ্রতিভ লাগে, এমনকি উপেক্ষিতও, তাও জানে না। কার কি প্রমোশন হল, কে কাকে ডেপুটির কাছে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, ছেলের চাকরির জন্যে কে সার্ভিস কমিশনের কাকে মন্ত্রীকে দিয়ে বলিয়েছে,...লোকগুলোর পৃথিবী এত ছোট, এত ছোট।

কল্যাণী বইটই পড়ে, হিন্দি সিনেমাও দেখে কখনো কখনো, টি ভি সিরিয়াল দেখে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে যায়, মাইকেল জ্যাকসনের গানের ক্যাসেটও পুণ্য এনেছে ; খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ে, স্টেফি গ্রাফ আর নাভ্রাতিলোভার খেলা দেখে—টি ভিতে। এতগুলো বিষয় আছে, যে কোনও একটা নিয়ে তো আলোচনা করতে পারে। করে না, কারণ দু'একটা বিষয় যদি বা কল্যাণী কখনো কানে তুলেছে, ওরা সবাই কেমন বোকা বোকা তাকিয়ে থাকে, কিছুই পড়ে না, দেখে না, কারণ অত সময় কোথায় ওদের। ওরা তো পুরুষ, চাকরি করে, ভীষণ ব্যস্ত। অফিস-পলিটিক্স নিয়ে। সময় তো শুধু অফিসে। তখন তো কিছু পড়াও যায় না, দেখাও যায় না। আড্ডা, পলিটিক্স, ফাইল খুলে রাখা আর বন্ধ করা, কেউ কোনও কাজের জন্যে এলে, আরেকদিন আসবেন। কল্যাণী ওসব জানে, জানে।

যারা বোকা বোকা তাকিয়ে থাকে তাদের তবু বোঝে। দু'একজন আবার মৃদু মৃদু হেসে এমন ভাবে তাকায় যেন কল্যাণী বোকার মতো কি সব আজেবাজে কথা বলছে। শুধু ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়!

অফিসের কথা ও জানতে চায় না, শুনতে চায় না। কিন্তু এটা তো অফিসের ব্যাপার নয়, যার সঙ্গে এই সংসারটাই জড়িয়ে আছে, অর্থাৎ চাকরি। মাস গেলে মাইনে। সুকমলকে বিমর্ষ মুখে বাড়ি ফিরতে দেখে সেজন্যেই বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল।

কিছু খারাপ খবর কি! কত আর খারাপ হবে। কিছু ভুলটুল করেছে হয়তো।

সরাসরি সে-কথা জিগ্যেস না করে বললে, শরীর খারাপ নাকি তোমার?

সুকমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। —নাঃ।

কল্যাণী আর কিছু বলল না। অথচ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে জানবার জন্যে।

—নির্মলেন্দু একটা ইডিয়েট! সুকমল হঠাৎ বললে।

আর কল্যাণী অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

সুকমল বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, এতদিনের চাকরি, একটা গাভমেন্ট সার্ভিস, ছেড়ে দিল।

চাপা আতঙ্কটা কল্যাণীর বুক থেকে তরতর করে নেমে গেল। যাক্। তা হলে আমাদের নিজেদের কোনও বিপদ নয়।

ও অবাক হয়ে তাকাল সুকমলের মুখের দিকে। —ছেড়ে দিল ?

সুকমল চিন্তিত ভাবে বললে, সত্যি সত্যি ছেড়ে দেবে আমরা তো ভাবিনি। সবাই কত বারণ করেছিল। শুনল না।

—কেন ছাড়ল ? কিছু হয়েছিল ?

সুকমল হাসল। —তা হলে তো বুঝতাম।

একে একে সব জানল কল্যাণী। নির্মলেন্দু মানুষটা চিরদিনই অখুশি, ওর চাকরি নিয়ে। বেকার জীবনে উপায় ছিল না বলেই ঢুকে পড়েছিল, তাও অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে। কিন্তু সর্বদা খোঁজখবর রাখত আরো ভাল কিছু পায় কিনা, আরো বেশি মাইনের চাকরি। সেজন্যেই সুকমল বলত, নির্মলেন্দুটা বড় অ্যাম্বিশাস। যেন উচ্চাশা থাকাটা দোষের।

কল্যাণীর সামনেই একদিন বলেছিল, জানেন ম্যাডাম, আমাদের চাকরিতে না আছে টাকা, না আছে প্রেস্টিজ।

সুকমল দুঃখ করে বললে, এই বয়েসে এমন একটা রিস্ক নিচ্ছে। কি যে দুঃসাহস ওর।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, অচেনা অজানা জায়গা, তার ওপর একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে নতুন চাকরি, এখানে দিব্যি আরামে ছিল। হাজার হোক গাভমেন্ট সার্ভিস !

নির্মলেন্দুর জন্যে কত দুশ্চিন্তা ছিল ওদের। যদি শেষ অবধি না পোষায়। ওখানে তো শুনেছে কথায় কথায় নাকি চাকরি যায় ! তখন কি করবে বেচারি।

খুব সাধারণ ভাবে থাকত ওরা। ভাড়াবাড়িটাও তেমন ভাল ছিল না। একটা পুরোনো আমলের বাড়ির আধখানায় বাড়িওয়ালা নিজে থাকে, তার অবস্থাও পড়ন্ত। বাকি আধখানায় তিন তিনটে ভাড়াটে। সে বাড়িতে বেড়াতে গেলে কল্যাণীর দম বন্ধ হয়ে আসত।

মেয়ে গীতাকে নিয়ে, ডাক নাম রিঙ্কু, খুব গর্ব ছিল নির্মলেন্দু আর তার স্ত্রী সবিতার। অথচ গর্ব করার কিই বা ছিল। রেজাল্ট তো সেই ঋতার মতোই। দেখতে সুশ্রী ঠিকই, একটু চটপটে স্বভাবের, স্কুলের স্পোর্টসে কি সব মেডেল পেয়েছিল, ওর মা দেখিয়েছিল। স্কুলের ডিবেটে ফার্স্ট না সেকেন্ড কি যেন হয়েছিল, তাও শুনিয়েছে কতবার। তবে মেয়েটা গুণের সত্যি, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনে নির্মলেন্দুবাবুরা কার্ড দিয়েছিলেন, নিয়ে গিয়েছিলেন জোর করে, 'নটীর পূজা' হল, খুব হাততালি পেয়েছিল। গুণ থাকলে স্বীকার করবে না কেন কল্যাণী, বেশ ভালই করেছিল, অনেকে প্রশংসাও করছিল। কিন্তু নির্মলেন্দুর স্ত্রী সবিতা একটু অহঙ্কারী অহঙ্কারী। যখনই দেখা হবে নিজের মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিছু না কিছু বলবেই।

কল্যাণীর এতকাল কিছু বলার ছিল না। স্কুলে নাটক-ফাটক ঋতাকে করতে দেওয়াও হয়নি, ওর নিজেরও কোনও উৎসাহ ছিল না। না স্পোর্টস না ডিবেট। সবিতার কাছে ওকে চিরকাল মাথা নিচু করেই থাকতে হত, ওই মেয়ের জন্যেই। কল্যাণীর মনে হল এখন গর্ব করে বলার একটা রাস্তা পেয়েছে। ঋতা ওসব অভিনয়-টভিনয় করবে না ঠিকই, করতে দেবেও না ওরা, তবু একজন তো ছুটে এসেছে, ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রায়

তোষামোদ করে গেছে। কত মেয়ে তো হন্যে হয়ে আছে সিনেমায় নামার জন্যে। তাদের বাবা-মাও। অথচ সুকমল তাদের কড়া কথায় ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। টাকার লোভ দেখিয়েছে। তবু গ্রাহ্য করেনি। এটাও তো গর্ব করে বলার মতো।

নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাবার পর একবার এসেছিল নির্মলেন্দু আর সবিতা। বার বার যেতে বলে গিয়েছিল। সংসারের ঝামেলায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সংসারের ঝামেলা নাকি যেতে ইচ্ছে হয়নি, তাও জানে না।

একদিন নির্মলেন্দু হঠাৎ এসে হাজির। খুব হাসিখুশি।

—কি বোকা ছিলাম সুকমল, এতগুলো বছর মিথ্যে মিথ্যে রট্ করেছি। ঠকিয়েছে ভাই, গাভমেন্ট আমাদেব ঠকিয়েছে।

তাবপর নতুন চাকরির ফিরিস্তি। কত মাইনে। পার্কস কত, ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ, এল টি এ, কত কি।

নির্মলেন্দুব সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল সুকমলের। সেজন্যেই পেনশনের চাকরি ছেড়ে দেওযায় দুঃখ পেয়েছিল ও। ভয় পেয়েছিল। ভয়টা যেন সুকমলেরই। খবরটা জানার পর কি বিমর্ষ মুখে ফিরেছিল।

নির্মলেন্দু খুব হাসছিল। কল্যাণী চা নিয়ে আসতেই বললে, ম্যাডাম, ওকে বোঝান, ওসব পেনশনেব মায়া ছেড়ে বড় কোনও কোম্পানিতে ঢোকার চেষ্টা করতে।

সুকমল খুব খুশি-খুশি ভাব দেখাচ্ছিল, কিংবা খুশিই হয়েছিল। কিন্তু সব শুনে কল্যাণী কেমন দমে গিয়েছিল। অবশ্য মুখে হাসিটা লাগিয়ে রেখে।—খুব খুশি হয়েছি, খুব খুশি। আপনার জন্যে ওর ভীষণ ভাবনা ছিল।

চলে যাবাব পর সুকমল বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিল, মহা ধুরন্ধর ওই নির্মলেন্দু। কি করে যে জোটাল।

হাসতে হাসতে বলেছিল, এখন বুঝছি কেন সাফারি স্যুটফুট বানিয়েছিল। হয়তো তখন থেকেই চেষ্টা চালাচ্ছিল।

কল্যাণী ম্লান হেসেছে।—সে আর বলতে। দেখবে যাও, ও অফিসে ওর আত্মীয়টাত্মীয় কেউ বসে আছে ওপরের পোস্টে।

সুকমলও হেসেছে।—আজকাল সব তো বাইরে একটা শো, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা, ইন্টাবভিউ, ভেতরে ভেতরে স্বজনপোষণ। সর্বত্র।

এব পরও নির্মলেন্দু আর সবিতা এসেছিল, নতুন ফ্ল্যাট পেয়েছে সে-খবর জানাতেই বোধহয়। ঠিকানা দিয়ে বারবার যেতে বলে গিয়েছিল। যায়নি।

নির্মলেন্দুর বৈভবের কথা শুনতে ভাল লাগেনি ঠিকই। কিন্তু ঈর্ষা হয়েছিল বলে তো মনে হয না। সুকমলের অত অ্যাম্বিশন নেই। কল্যাণীরও না। আরেকটু সচ্ছল হলে হযতো ভাল লাগত। না হলেও ক্ষতি নেই, চলে তো যাচ্ছে। পুণ্য মানুষ হলেই ওরা খুশি। আর ঋতার বিয়ে।

বাস্। ঝাড়া হাত-পা।

যেতে ইচ্ছে হয়নি আবেকটা কারণে। কল্যাণীর মনে হয়েছে ওরা কেমন যেন বদলে গেছে। ওপরে উঠে গেলে যা হয়। মনে হয়েছে, ওদের সঙ্গে আমাদের ঠিক চলে না। অর্থাৎ ওদের সঙ্গে ঠিক মানিয়ে চলা যায় না। নিজেদের কেমন ছোট মনে হয়। সবিতা যে শাড়িটা পরে এসেছিল কল্যাণীর মনে আছে। ও তো ওইসবই দেখছিল। বেশ দামি, গতবার পুজোর কাপড় কিনতে গিয়ে একটা দোকানে ওই রকম একটা শাড়ির ওপর দু'দুবার হাত বুলিয়েছিল।

কথাবার্তার ঢঙও বদলে গেছে। সবিতা ঠোঁটে চাপা হাসি মাখিয়ে বলেছিল, এবার

পুজোয় আমরা উটিতে যাব ভাবছি। যাবেন ? চলুন না সব একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

কল্যাণী বুঝতেই পারেনি। ওরা চলে যাওয়ার পর জিগ্যেস করেছে সুকমলকে, উটি আবার কি ? কোথায় ?

—উটকামণ্ড। সাউথে।

—ও।

আগে জানা থাকলে বলতে পারত, সাউথ আমার ভাল লাগে না।

কথাটা মনে হতেই হেসে ফেলল। দাদার কথা মনে পড়ে গেল। সুকমল তো এখানে বলে, তোমার হাতিবাগানের দাদা। দাদাও ঠিক ওই একই কথা বলে। 'সাউথ আমার ভাল লাগে না।'

ভাল লাগে না বলার মধ্যেও একটা গর্ব থাকে। গর্ব নাও হতে পারে, ওটা আসলে হয়তো অক্ষমতা ঢাকার চেষ্টা। কিন্তু ঋতাকে যে একজন সিনেমার হিরোইন করার জন্যে বাড়ি বয়ে এসেছে, আধঘন্টা ধরে ধানাইপানাই করেছে, এটা গর্ব করে বলার মতোই। ওরা যখন রাজি হয়নি, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেও তো গর্ব করার।

সুকমল লোকটাকে বলেছিল, আমাদের পরিবারে এ সব চলে না।

কল্যাণী শুনে সায় দিয়েছিল, ঠিক বলেছ। ওরা কি ভাবে কি আমাদেব।

কিন্তু কেন চলে না, তা ভেবে দেখেনি। আমাদের সে-রকম অভাব নেই বলেই কি। তেমন টাকার লোভ নেই বলে। কল্যাণী ঠিক জানে না। সিনেমার সঙ্গে নানান স্ক্যান্ডাল জড়িয়ে থাকে, তাই ? ও তো ঋতার জন্যে একটা সুস্থ জীবন চায়, আর কিছু নয়। কিন্তু এই সুস্থ জীবনের ছক বেঁধে দিয়েছে কে ? কারা ? এই ভদ্রলোকের সমাজ। আমাদের আত্মীয়স্বজন, আমাদের পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব। যারা আমাদের মতোই। আমাদের মধ্যে থেকে যখন কেউ ওপরে উঠে যায় সে আর তখন তোয়াক্কা করে না। আর যারা আমাদের চেয়েও অনেক নীচে পড়ে আছে তাদের তোয়াক্কা করলেও চলে না।

কল্যাণী হঠাৎ একদিন সুকমলকে বললে, চলো, একদিন নির্মলেন্দুবাবুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

সুকমল চুপ করে রইল। তারপর ক্লান্ত ভাবে বললে, গেলেও হয়।

—ওরা তো কত করে বলে গিয়েছিল, আমরাই গেলাম না। হয়তো সেজন্যেই আর আসেনি।

ওরা কেন আর আসেনি সে-কথা সুকমল কোনওদিন ভাবেনি। কেন যায়নি তা জানে।

নির্মলেন্দু হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দেয়াতে ওর খুব খারাপ লেগেছিল। এতদিনের চাকরি, তার ওপর সরকারি চাকরি। ওর ভয় হয়েছিল নির্মলেন্দু যদি তেমন ভাল চাকরি জোটাতে না পারে। কিংবা যে চাকরির লোভে যাচ্ছে সেটা যদি তেমন ভাল না লাগে। এত বড় একটা সংসার মাথার ওপর। অফিসেও ওরা বলাবলি করেছে সকলে। সুকমল রেগে গিয়ে বলেছে, ইডিয়েট, ইডিয়েট একটা।

নির্মলেন্দু আরেকটা এই রকমই চাকরি পেলে সুকমল খুশি হত, ভীষণ খুশি হত। ভাবত, যাক তবু একটা হিল্লে হ'ল। বেচারি।

এখন আর মুখে 'বেচারি' বলে সমবেদনা জানানোর উপায় নেই। নির্মলেন্দু অনেক ওপরে উঠে গেছে। যাক্ না, সুকমলের তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু যেতে ইচ্ছে হয়নি ওই ফ্ল্যাটটার জন্যেই। কোম্পানির ফ্ল্যাট।

অফিসের কে যেন গিয়েছিল একদিন। এসে এমন বর্ণনা দিচ্ছিল, সবারই মুখ কালো। সুকমল আনন্দ দেখিয়েছে, কিন্তু সেটা তো অভিনয়। এমনকি যে উচ্ছ্বাসের

সঙ্গে বর্ণনা দিচ্ছিল, সেও তো অভিনয় করছিল। অন্য সবাইকে অপদস্থ করার জন্যে।

তা না হ'লে সবশেষে বলল কেন, যাই বলুন, ওসব চাকরিতে স্বাধীনতা নেই।

কোন চাকরিতেই বা আছে।

আসলে কল্যাণীকে ওই ফ্ল্যাটটা দেখাতেই ভয়। দেখতেও। সে জন্যেই যায়নি। কে জানে, এতদিন হয়তো গাড়িটাড়ি পেয়েছে।

সুকমলের ভাবতে অবাক লাগে আমরা কত সহজে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিই। এই নির্মলেন্দুকে একসময় কত আপন মনে হত। ডেকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতে হয়নি, ওদের ওই পুরোনো বাড়িতে কতবার গেছে। চা খেয়েছে, আড্ডা দিয়েছে। কারো অসুখবিসুখ হলে, চল আমার চেনা ডাক্তার আছে। ওদের বাড়িটা ছিল বেশ পুরোনো আমলের, গলিটাও নোংরা, দেয়ালের ইটে নোনা ধরেছে কোথাও কোথাও, তার জন্যে সুকমলেরও খারাপ লাগত। একবার পাড়ায় একটা ফ্ল্যাট খালি হ'ল, সুকমল সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বলল, নেবে ? ভাল ফ্ল্যাট, এ বাজারের তুলনায় ভাড়া কমই। অর্থাৎ কাছাকাছি থাকলে আড্ডা আরো জমবে।

ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে শুনে যত দুর্ভাবনা তখন সুকমলের। তখন মনে হত ও আমাদেরই একজন। এখন যেতে ইচ্ছেই হয় না। এখন আর আমাদের একজন মনে হয় না।

সাফল্য কি মানুষকে আলাদা করে দেয় ? নাকি নিজেকে ছোট লাগছে বলে সুকমল নিজেই সরে এসেছে।

কল্যাণী বললে, কতবার তো যেতে বলেছিল, চলো না যাই একদিন।

কল্যাণী কেন যেতে চাইছে সুকমল বুঝতেও পারেনি। সেজন্যে অন্যমনস্ক ভাবেই বললে, গেলেও হয়।

—যাওয়া উচিতও। এদ্দিন গেলাম না কি ভাবলো কে জানে।

সে-কথা সুকমলেরও মনে হয়েছে। বিশেষ করে নির্মলেন্দু অনেককাল আসেনি বলেই। আসে না সেও যেন এক ধরনের নিশ্চিন্তি। অথচ সত্যিই তো ও সম্পর্কটা ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে না।

সুকমল বললে, ঠিক আছে চলো, এই হপ্তাতেই একদিন যাই।

সুকমল রাজি হয়েছে দেখেই কল্যাণীর ভীষণ আনন্দ। —রবিবারই ভাল।

সন্ধেবেলা পুণ্য ফিরে আসতেই বললে, যাবি ? চল না সবাই মিলে ঘুরে আসি।

পুণ্য এক ঝটকায় ছুড়ে দিল। —ওসব তোমাদের ফ্রেন্ড তোমরা যাও।

কল্যাণী রেগে গেল। ছেলে যত বড় হচ্ছে ততই কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। কথা বলার ধরনটাও। এক একসময় বেশ কষ্ট হয় কল্যাণীর। বড় হয়ে গেলে তখন আর ছেলেরা বোঝে না, কত দুঃখ সহ্য করে কত সুখ আনন্দ বলি দিয়ে মানুষ করেছে। শুধু গার্জেনিটুকুই মনে রাখে। তাই পদে পদে সেটা অস্বীকার করার চেষ্টা করে।

—তোর কলেজে ভর্তির সময় নির্মলেন্দুবাবু কত সাহায্য করেছিলেন। অন্তত সেটুকুও মনে রাখার কথা। গেলে খুশি হতেন।

পুণ্য বলে বসল, সারাজীবনই তো কেউ না কেউ সাহায্য করে, সকলের কাছে হাতজোড় করে থাকতে হ'লে তো আর কিছুই করা চলে না।

—ঠিক আছে, যাস না। এত অকৃতজ্ঞ তোরা।

কল্যাণী বলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হ'ল কথাটা ও নিজেকেই বলছে। এসব কথা তো ওর মনেও ছিল না। রাগের মুহূর্তে মনে পড়ে গেছে। কি আশ্চর্য ; একটা লোক হঠাৎ একটু ওপরে উঠে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আর আপন মনে হয় না।

—ম্যাডাম, খুব গরম গরম চা এক পেয়ালা।

হাসিখুশি লোকটার সেই সরল সহজ ব্যবহার, সেই আন্তরিক কথাগুলো যেন কানে বাজছে।

ঋতাকে বলতেই ও এক পায়ে খাড়া। — হ্যাঁ যাব, মা, উঃ রিঙ্কুকে কতদিন দেখিনি। নিম্মলকাকুও আসেন না।

ও ছেলেবেলায় নির্মলেন্দু পুরো নামটা উচ্চারণ করতে পারত না, কিংবা ইচ্ছে করেই উচ্চারণ করত না। ছোট করে নিয়ে নিম্মলকাকু বলত।

তারপরই জিজ্ঞেস করল, ঠিকানাটা রেখেছ ?

কি আশ্চর্য, যাব যাব ভাবছে, কবে যাবে ঠিক করে ফেলল, অথচ ঠিকানার কথা একবারও মনে পড়েনি।

হ্যাঁ, একটা কাগজে লিখে দিয়ে গিয়েছিল নির্মলেন্দু। টেলিফোন নম্বরও। কিন্তু কল্যাণীদের তো টেলিফোন নেই, সেজন্যে আগ্রহও ছিল না নম্বর জানার।

ফ্ল্যাটের নম্বর মনে না থাক্, ওই বিশাল বারোতলা বাড়িটার নাম শুনেই সুকমল বলে উঠেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি।

নির্মলেন্দু হাসতে হাসতে বলেছিল, তবু ফ্ল্যাটের নম্বরটা লিখে দিলাম। তোর নাম বললে, পাড়ার লোক বাড়িটা দেখিয়ে দেবে। আমাকে খুঁজতে হলে কিন্তু ফ্ল্যাটের নম্বর বলা চাই। হা হা করে হেসেছিল নির্মলেন্দু।

বলেছিল, একশো বারোটা ফ্ল্যাট, কে কার খবর রাখে বল।

কল্যাণীর কেবলই মনে হচ্ছিল লোকটা অনেক ওপরে উঠে গেছে, তার কথাবার্তাও বদলে গেছে। ও আর আমাদের লোক নয়। সেজন্যেই ঠিকানা লেখা কাগজটা নিয়ে এ ঘরে চলে এসেই দুমড়ে মুচড়ে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিল। তখন মনে ছিল না, পুণ্যকে কলেজে ভর্তি করানোর জন্যে সুকমলকে সঙ্গে নিয়ে ছোটাছুটি করেছিল এই লোকটাই।

নির্মলেন্দু চলে যাবার পর সুকমল ফিরে এসে জিগ্যেস করেছিল, ঠিকানাটা রেখে দিয়েছ তো ? নিজের মনেই বলেছিল, কখন কি কাজে লাগে ! কানেকশন্স্ আছে বটে ওর !

কল্যাণী ঘাড় কাত করে জানিয়েছিল. হ্যাঁ।

কিন্তু দোমড়ানো মোচড়ানো কাগজটা.তখন তো পাখার হাওয়ায় মেঝেতে পতপত করছে।

সুকমলের দৃষ্টি আড়াল করে চট করে তুলে নিয়েছিল কল্যাণী। হাতের তালুতে ইস্ত্রি করে করে তারের ফাইলে গেঁথে দিয়েছিল।

কিন্তু তার পর কত কাগজ, লন্ড্রির বিল, ক্যাশমেমো, চিঠিপত্র, রসিদ-টসিদ গেঁথে গেঁথে সেই কাগজের টুকরো কোথায় তলিয়ে গেছে কে জানে।

—ঠিকানাটা রেখেছ ? ঋতার কথাটা শুনেই কেমন অসহায় লাগল। পাওয়া যাবে তো।

তক্ষুনি তক্ষুনি ও ছুটে এলো। আলমারির পিছনে লুকোনো তারের ফাইলটা টেনে বের করে এনে খাটের বিছানার ওপর বসল।

খোঁজ খোঁজ।

দ্রুত হাতে একটার পর একটা কাগজ সরিয়ে যাচ্ছে। পাওয়া যাবে তো। ব্লাড পরীক্ষার রিপোর্টটায় চোখ পড়ল, একটা চিঠি. ইস্, মামিমাকে উত্তর দেওয়া হয়নি, ইলেকট্রিকের বিল-এ কি যেন লেখা, চোখ বোলাল, আছে আছে, পাওয়া গেছে, কি খুশি কল্যাণী, যেন কানের ট্যাপটা বাথরুমে খুলে রেখে ভুলে গিয়েছিল, খুঁজে পাচ্ছিল না,

পাওয়া গেছে... একটা অমূল্য সম্পদ।

—ট্যাক্সিতেই চলো।

রবিবার খাওয়াদাওয়া সারতে সারতে অনেক বেলা হয়ে যায়। আড়াইটে তিনটের সময় একটু গড়িয়ে নেয় কল্যাণী। কিন্তু সেদিন আর ঘুমোতে ইচ্ছে হল না। ঘুম থেকে উঠলে কেমন এক ধরনের ক্লান্তি জড়িয়ে থাকে শরীরে, তখন আর যেতে ইচ্ছে হবে না।

যখনই অবসর পেয়েছে, সকাল থেকেই বার কয়েক আলমারি খুলেছে। দু-একখানা শাড়ি বের করে ঋতাকে বলেছে, হ্যাঁ রে, এটা পরব ?

ঋতা ঘাড় কাত করে বলেছে, হুঁ। অর্থাৎ দায়সারা উত্তর।

মা কি পরে যাবে তা নিয়ে ঋতার কোনও দুর্ভাবনা নেই, দুর্ভাবনা নিজের জন্যে। সে কী পরে যাবে।

কল্যাণী একবার হেসে ফেলে বলেছে, বড়লোকের বাড়ি যাওয়া বড় ঝামেলার রে।

ঋতা ভুরু কুঁচকে বলেছে, বড়লোক আবার কি ! ওরা কি বড়লোক নাকি ?

কল্যাণী আবার হেসেছে। — আমাদের কাছে তো বড়লোকই।

দামি শাড়ি বেশ কয়েকখানাই আছে। শাড়ির ব্যাপারে ওর খুব যত্ন, তাই অনেককাল পরা চলে। শুধু মনে রাখতে হয় কোন শাড়ি পরে কার বিয়েতে গিয়েছিল, কারা কারা কারা এসেছিল সেখানে। অন্য বিয়েবাড়িতে অন্য কোনও শাড়ি পরতে হবে। একই শাড়ি যেন কেউ দু'বার না দেখে। দেখলে ভাববে ওই একখানাই আছে।

নতুন কেনা, অর্থাৎ গত দু'বছরের ভাল শাড়িগুলো এক একবার বের করে, আর মনে মনে ভেবে নেয়, ওই শাড়িতে নির্মলেন্দুর বউ সবিতা ওকে কখনো দেখেছে কিনা।

বিকেল হতেই দু'তিনখানা শাড়ি বের করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সুকমলের কাছে। ও তখনো বিছানায় গড়াচ্ছে।

—এই দেখো তো কোনটা পরব।

সুকমল হেসে বললে, বয়েস কমাতে চাও না বাড়াতে ?

কল্যাণী কোনও জবাব দিল না, ঋতাকেই বললে, এই, বল তো ঋতা, কোনটা পরব !

সুকমলের সবেতেই ইয়ার্কি। যেন বয়েস কমানোর জন্যেই জিগ্যেস করছে। ওর নিজেরও তো বোঝা উচিত ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়। আমরা এমন একজনের বাড়ি যাচ্ছি যে দু'দিন আগেও আমাদেরই সমান সমান ছিল। আমাদের চেয়েও একটা খারাপ বাড়িতে ছিল, একটা আধা-নোংরা গলিতে। আজ হঠাৎ ওপরে উঠে গেছে, কত ওপরে তা অবশ্য ঠিক জানে না। ভাল ফ্ল্যাটেও, কত ভাল তাও অবশ্য জানে না।

বিয়েবাড়িতে যাবার মতো বেশি দামি ভাল ভাল শাড়ি নেই তা নয়, কিন্তু সে-সব তো একটা লোকের বাড়িতে বেড়াতে যাবার সময় পরা যায় না। বয়েসের কথাও ভাবতে হয়। নিছক বেড়াতে যাওয়া, দেখা করতে যাওয়া। বেশি রঙচঙও মানায় না। ওপরে ওপরে সাদাসিধে হবে। অথচ দামটাও জানান দেবে এমন হওয়া চাই।

—তুই কি পরবি ? ঋতাকে জিগ্যেস করল। —শাড়ি তো ? নাকি অন্য কিছু ?

—যা হোক পরলেই হ'ল। ঋতা অবহেলার সঙ্গে বললে।

না, যা হোক পরলেই হয় না। সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য, আমরাও এমন কিছু খারাপ নেই। তবে ভেতরে ভেতরে একটু নার্ভাস লাগছিল। ওদের ওখানে নিজেদের বেমানান না লাগে, অপদস্থ না হতে হয় স্রেফ জামাকাপড়ের জন্যে। পাশের মানুষ হঠাৎ ওপরে উঠে গেলে, অনেক ওপরে উঠলে এমনিতেই দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়, কোথায় যেন গরমিল লাগে। ওরা এখন কি পরে, কি খায় ? আমাদের মতোই কি ! ফ্ল্যাটটাই বা কেমন, ফ্ল্যাটের ভেতরটাই বা সাজায় কিভাবে ? ঝোলানো টবে মানিপ্ল্যান্ট

আর ক্যাকটাস থাকে নিশ্চয়ই। পোর্সিলেনের টবে।

মা মেয়ে দু'জনেই সাজগোজ করছিল।

ঋতা বললে, হেসে ফেলেই বললে, বড়লোক তো দেখেছ মা, তবে আর অত ভাবছ কেন!

কার কথা বলছে কল্যাণীর বুঝতে অসুবিধে হল না। ধমক দিয়ে বললে, ফাজলামি হচ্ছে।

ঋতা হো হো করে হেসে উঠল।

আসলে ঋতা বলতে চাইছে কল্যাণীর পিসির বাড়ির কথা। ঋতা ছেলেবেলার অভ্যাস ছাড়তে না পেরে এখনো পিসিদিদু বলে। কিসের যেন ব্যবসা ওদের। প্রচণ্ড বড়লোক। পিসি মেয়ের বিয়েতে হীরের সেট দিয়েছিল। দেখে চোখ ঝলসে যায়। পিসিদিদু তো ও বাড়ির লক্ষ্মী, ওঁর বিয়ের পর থেকেই নাকি রবরবা। জয়েন্ট ফ্যামিলি ওঁদের। কি বিশাল চারতলা বাড়ি, একেবারে বড় রাস্তার ওপর। এক একটা ঘর হলের মতো! তিন তিনখানা গাড়ি। বিজয়ার পর একবার যায়, পারহেড প্লেটে দুটো কড়াপাকের সন্দেশ বরাদ্দ। ঘরে কোথাও কোনও শ্রীছাঁদ নেই। জানালা দরজায় পর্দার বালাই? তাও নেই। সুজনি মার্কা বিছানার চাদর, তাও আধখানা গুটিয়ে গিয়ে তোষক দেখা যাচ্ছে। মেঝেতে বালিশ লুটিয়ে আছে। মেঝেতে অবশ্য চমৎকার মোজেক টাইলস। এমন উড়নচণ্ডী বাড়ি কমই দেখেছে ঋতা।

—কোনও টেস্ট নেই। ঋতা একবার বলেছিল।

সেটা কল্যাণীর মনের কথা, কিন্তু বাড়িটা তো কল্যাণীর নিজের পিসির, শুনতে ভাল লাগবে কেন। তাই বলেছিল, ওই রকম বাড়ি ক'টা আছে দেখা তো!

ঋতা হেসে উঠে বলেছে, গায়ে লাগল তো!

সেই ওদের বড়লোক দেখা।

সন্ধে হতে না হতেই সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ল ওরা। কল্যাণীর বুকের ভেতরে কেমন একটা দ্বিধা, একটা সঙ্কোচ।

সুকমল অন্যমনস্ক ভাবে বললে, বাড়িতে থাকলে হয়।

কল্যাণীরও সেরকম সন্দেহ হচ্ছে। হেসে বললে, কি জানি আজকাল আবার পার্টিফার্টিতে যায় কিনা।

তারপরই বললে, ট্যাক্সিতেই চলো।

আজকাল ট্যাক্সি দেখলে আর বাসে মিনিতে উঠতে ইচ্ছে হয় না।

কল্যাণীর মনে পড়ে, আগে বিয়েবাড়ি কিংবা হাওড়া স্টেশন ছাড়া ট্যাক্সির কথা ভাবতই না। এখন দেখে লোভ হয়, কখনো-সখনো চড়েও, কিন্তু ভাড়া মেটানোর সময় বেশ চড়চড় করে লাগে।

নির্মলেন্দুদের ওখানে যাওয়ার কোনও অসুবিধে নেই, ফাঁকা মিনি বাস পাওয়া যায় এ-সময়। এমন কি ট্রামও।

কিন্তু কল্যাণী বললে, ট্যাক্সিতেই চলো।

ভাল শাড়িটাড়ি পরেছে বলে, নাকি নির্মলেন্দুর ওখানে বাসে যাওয়া মানায় না বলে, সুকমল বুঝতে পারল না।

বললে, তাই চলো।

নির্মলেন্দু কি আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ওরা ট্যাক্সিতে এসেছে কিনা দেখার জন্যে? ট্যাক্সিতে গেলেই বা কতটুকু ইজ্জত বাঁচবে। নির্মলেন্দু নিজেই গাড়ি কিনে বসেছে কিনা তাও জানে না।

এই দিকটায় বড় একটা যাওয়া আসা নেই কল্যাণীর। এখন আবার রাতারাতি সব বদলে যাচ্ছে। আগে যে বিশাল দোতলা তিনতলা বাড়িকে প্রাসাদ মনে হত, এখন সেগুলোকেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে বারোতলা চোদ্দতলা কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। নতুন রঙ চড়িয়ে রাস্তার আলো বাড়িয়ে দিয়েছে সেই নতুন বাড়িগুলো। আগে কেমন মরা মরা লাগত রাস্তাটা।

সুকমল যেতে আসতে দূর থেকেই দেখে আসছে, ওর চোখের সামনেই তো তৈরি হয়েছিল। এখন এদিকটায় বাঙালি কম, বাড়িগুলো বেচে দিয়ে বড়জোর দু'খানা ফ্ল্যাট পেয়েছে এখানেই, আর নগদ টাকা কিছু। বেশির ভাগই সিন্ধি পাঞ্জাবি গুজরাটি। বাঙালি যারা ফ্ল্যাট পেয়েছে কিংবা কিনেছে, তারাও আবার ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। কোম্পানি লিজ। নিজেরা কোথায় থাকে কে জানে। হয়তো ভাড়াবাড়িতে। তবু তো ফ্ল্যাট ওনার। টাকাটা খাটিয়ে সুদ খায়।

নির্মলেন্দুই বলেছিল হাসতে হাসতে। বেশ গর্ব করেই বলেছিল, কোম্পানি ফ্ল্যাটে আছি।

—বাঁয়ে বাঁয়ে। সুকমল বলে উঠল।

রাস্তা নয়, গেট। বিশাল গেট, দু'তিনখানা গাড়ি পাশাপাশি ঢুকতে বেরোতে পারে। সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাড়ি রয়েছে। কল্যাণী দেখে অবাক হয়ে গেল। ও এই কমপ্লেক্স আগেও হয়তো দেখেছে, কিন্তু এখানেই নির্মলেন্দু থাকে ভাবতে পারেনি। এখানে যারা থাকে তাদের সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু নির্মলেন্দুও ? হোক্ না কোম্পানির ফ্ল্যাট।

ট্যাক্সিটা ভেতরে ঢুকতেই একজন খাঁকি উর্দি পরা দারোয়ান ছুটে এল। —ইধার নেহি, ইধার নেহি।

ট্যাক্সি সোজা গাড়িবারান্দার দিকে যাচ্ছিল, পাশের খালি জায়গাটা দেখিয়ে দিল দারোয়ান। সেটা দিয়ে পাশের ছোট ফটক হয়ে ট্যাক্সি বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা।

অথচ প্রাইভেট গাড়িগুলো সোজা যাচ্ছিল। যাচ্ছিল বলেই ট্যাক্সিটাও যেতে চেয়েছিল। এখানে যে এমনধারা নিয়মকানুন আছে সুকমলও জানত না।

ভাড়া মিটিয়ে ওরা নেমে পড়ল। কিন্তু কেমন অপমান অপমান লাগল সুকমলের। সেটা লুকোবার চেষ্টা করল। আর কল্যাণী এমনই বোকা, বোকা বোকা ভাবে বললে, কেন, ওদিকে যাবে না কেন।

সুকমল বলতে যাচ্ছিল, এ আরেক রকম জাত, এখানে, গলার পৈতের কোনও দাম নেই।

অগত্যা হাঁটতে হাঁটতে।

এই পেল্লায় আকাশছোঁয়া বাড়িটাই কেমন ভয় পাইয়ে দেয়। অনবরত গাড়ি আসছে যাচ্ছে, কোনও কোনওটা মাথায় বেঁটে কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ নিয়ে দু'খানা গাড়ির সমান। দিশি না বিলিতি বোঝা দায়। আর নীচেতলাটা গাড়ি গাড়ি গাড়ি। নির্মলেন্দু বলেছিল বটে, নীচে গ্যারাজ আছে।

হাঁটতে হাঁটতে গাড়ি বারান্দার কাছে আসতে বড় সঙ্কোচ লাগছিল। কিশোরী বয়েসের ক'টা অবাঙালি মেয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে, তাদের পোশাকআশাক দেখে তো থ। শরীরকে দর্শনীয় করে তুলতে দর্জিকে কত না মাথা খাটাতে হয়েছে। তবে ওরা বাঙালি না অবাঙালি জানা গেল না। সবারই মুখে ইংরিজি বুলির চটপটি ফুটছে ফাটছে। হাসছে, তাও অন্য রকম।

অনেকগুলো লিফট, কোনটা দিয়ে উঠবে ঠিক করতে পারছিল না। নামঠিকানা লেখা

কাগজটা কল্যাণীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে সুকমল একজন লিফটম্যান না দারোয়ান...তাকেই জিজ্ঞেস করল। ভদ্রলোক যারা যাচ্ছে তাদের জিজ্ঞেস করতে পারল না। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। হবে হয়তো।

—আইয়ে।

লোকটা লিফটম্যান, এবং তার বিনীত ভদ্র ব্যবহারে সুকমল চমৎকৃত হয়ে গেল। এত ভাল ব্যবহার ও আশাই করেনি।

চড়চড় করে সাততলায় তুলে নিয়ে গিয়ে লিফটম্যানও বেরিয়ে এল, খানিকটা গিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিল। দেখিয়ে না দিলে খুঁজে বের করতে সময় লাগত, সময়ের চেয়ে বেশি লাগত অস্বস্তি, কারণ এই এক করিডরেই একই ধরনের নেমপ্লেট দেওয়া কয়েকটাই দরজা।

ডোরবেলটা মনোগ্রাম করা, দেখতে সুন্দর, গোল চাকতির মতো। টিপতেই সুইচের ওপরে সবুজ আলো জ্বলে উঠল, কিন্তু ভিতরে শব্দ হ'ল কি হ'ল না শোনা গেল না। তবে নিঃসন্দেহে নির্মলেন্দুর ফ্ল্যাট। দরজার ওপর খুব ছোট ছোট পিতলের হরফে নাম রয়েছে।

এমন অস্বস্তি ও সঙ্কোচ নিয়ে সুকমল কখনো ওর বড় সাহেবের বাড়িতেও যায়নি। তাই আশাও করেনি খোদ গৃহকর্তা নিজেই দরজা খুলতে আসবে।

—আরে, আরে, আরে! দবজা খুলেই নির্মলেন্দু বলে উঠল। সারা মুখ হাসিতে ভাসিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, এই রিঙ্কু, রিঙ্কু, মাকে ডেকে দে ; দেখে যা কারা এসেছে।

আগের মতোই হট্টগুলে চেঁচামেচি।—বোসো, বোসো। বলে এগিয়ে গেল। কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বললে, বসুন, বসুন।

ম্যাডাম বলল না।

কল্যাণীও মৃদু হেসে এগিয়ে গেল। হাসির জবাবে হাসি, নাকি নির্মলেন্দুর গায়ে গেঞ্জি কাঁধে তোয়ালে দেখে!

কল্যাণী তখন ঘরখানা দেখছে, না দেখার ভান করে।

ঘর নয়, একটা বিশাল হল। আধখানারও বেশি জুড়ে কার্পেট, বেশ নকশা করা মাঝখানটায়। মোটা মোটা শোফা কৌচ, পাশে একটা ডিভান, ডিভানের গায়ে রঙচঙে সিল্কের ঝালর দেওয়া মানুষ-সমান উঁচু একটা দাঁড়ানো ল্যাম্পস্ট্যান্ড, একপাশে বুককেসে ঝকঝকে বই। দেয়ালে বড় ছবি।

কাঁধে তোয়ালে নিয়েই বসে পড়ল নির্মলেন্দু। হাসছে।

—এ তো দেখছি রাজপ্রাসাদ। সুকমল বললে।

নির্মলেন্দু বললে, এসব কোম্পানির দেওয়া। ছেড়ে যেতে বললে ছেড়ে যেতে হবে। বলে হাসল।

ভিতরের ঘর থেকে তখন জোর কদমে রেকর্ডের গান বাজছে, কি একটা ইংরিজি গানের সুর। সারা ঘরখানা গমগম করছে গানের তালে।

কল্যাণী কোনও রকমে বললে, সময়ই পাই না।

এতদিন আসেনি বলে যেন জবাবদিহি করছে। এত আন্তরিকতা দেখাচ্ছে নির্মলেন্দু, এত হইচই করছে, একটুও বদলায়নি। দেখে আনন্দ, সঙ্গে সঙ্গে একটু অনুশোচনা। যেন আগেই আসা উচিত ছিল।

কেউ আসছে না দেখে কল্যাণী নিজেই ভেতরে যাবার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল। তার আগেই মাঝখানের করিডর মতো জায়গায় চোখ পড়ল।

রিঙ্কু। পাশে সবিতা। দুজনের মুখেই চাপা হাসি।

সুকমল উঠে দাঁড়াল, সবিতা এগিয়ে আসতে আসতে বললে, আমি তো ভেবেছিলাম আসবেই না। রাগ করে আর যাইনি।

সুকমল সরলভাবে বললে, আসব কি, আসতে হাঁটু কাঁপে। এ তো স্বর্গরাজ্য।

কল্যাণীর বোধহয় কথাটা ভাল লাগল না, তাই উচ্ছল হাসিটা মুখে এসেও ম্লান হয়ে গেল।

রিঙ্কু ততক্ষণে গিয়ে ঋতার কাছে বসেছে। ঋতা দেখছে রিঙ্কুকে। অবাক হয়ে দেখছে। ও এমন কিছু গ্রাম্য নয়, ম্যাক্সি শালোয়ার এমনকি টি-শার্ট জীনসও পরে কখনো-সখনো। কিন্তু রিঙ্কুর পোশাকআশাক দেখে এইমাত্র নীচে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে যাদের দেখে এসেছে, তাদের কথা মনে পড়ছে।

ভাল লাগছে না।

রিঙ্কু হঠাৎ দু'হাত তুলে লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গি করে বলে উঠল, মাসিমা, খুব ভাল দিনেই এসেছেন। না বাপী ?

হাসতে হাসতে বললে, দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেব।

নির্মলেন্দু হো হো করে হেসে উঠল, সবিতার ঠোঁটেও মাপা হাসি।

— আমি স্নানটা সেরে আসি। কাঁধে তোয়ালে নিয়ে নির্মলেন্দু চলে গেল।

সবিতা মিহি গলায় ডাকল, চম্পা।

বোধহয় কাজের মেয়েকে।

আর ঋতা তখন বলছে, কি সারপ্রাইজ রিঙ্কুদি, বল না।

—উঁহু, এখন নয়। বেশ মজা করে বললে রিঙ্কু। মাকে বললে, মা বল না যেন।

সবিতার চোখে চাপা কৌতুকের হাসি। কৌতুকের না গর্বের।

কি এমন সারপ্রাইজ হতে পারে। তা জানার জন্যে কল্যাণীর কোনও বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ও শুধু দু'জনের চোখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হাসল। একটা ক্ষীণ সন্দেহ জাগল, রিঙ্কুর বিয়ে কি ! উঁহু, তাহলে তো ও একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব দেখাত, আর নিজেই বলতো না, দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেব। তবে, বলা যায় না, এখানে এসে ওরা তো অনেক বদলে গেছে, রিঙ্কুর এই পোশাকপরিচ্ছদ দেখেই তো অস্বস্তি হচ্ছিল, কথা বলতে বলতে কেমন ডিভানটার ওপর ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে শুয়ে পড়ল, ছেলেমানুষের মতো একবার সুইচ টিপে ঢ্যাঙা ল্যাম্পস্ট্যান্ডের আলো জ্বালল , যাতে আলোটা নিজের মুখের ওপর পড়ে আরো সুন্দর দেখায়. ও মেয়ের লজ্জা-ফজ্জা নাও থাকতে পারে, হয়তো নিজেই বিয়ে করছে কারো সঙ্গে ভাব-ভালবাসা করে, বাপ-মাও রাজি, মুখে বলতে আর বাধো বাধো ঠেকবে কেন, ওই পোশাকটাই কি কম নির্লজ্জ নাকি।

মাথায় তোয়ালে ঘষতে ঘষতে নির্মলেন্দু ভিতরে চলে গেল, কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল ধোপদুরস্ত চিকনের পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে। এতক্ষণে সুকমল লক্ষ করল চশমার ফ্রেমটা বদলেছে, বেশ মোটা শেল ফ্রেম। চেহারায় বেশ একটা ব্যক্তিত্ব এসে গেছে।

আর কল্যাণীর চোখে পড়েছে সবিতা একবারও আগের মতো শব্দ করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে না। মুখে শুধু মাপা হাসি।

নির্মলেন্দুও বদলেছে বৈকি ! গায়ে গেঞ্জি কাঁধে তোয়ালে নিয়ে নিজেই দরজা খুলে দিয়েছে, ঠিকই কিন্তু একবারও 'ম্যাডাম' উচ্চারণ করেনি রসিকতা করে।

তবে ওদের ব্যবহারে আন্তরিকতা আছে, দূরত্বটা খুব বেশি বুঝতে দিচ্ছে না। সেজন্যেই জড়তা আর সঙ্কোচও নেই কল্যাণীর। তাছাড়া, যেজন্যে আসা ! ও শুধু একটা সুযোগ খুঁজছিল। কিভাবে কথাটা শুনিয়ে দেবে।

কল্যাণীর নিজেরই আশ্চর্য লাগছিল। কি মজা দেখ। নীচের বসার ঘর থেকে উঠে এসে সুকমল যেদিন ঋতার ওপর অকারণ চেঁচামেচি করছিল, তখন কল্যাণী ভয় পেয়ে গিয়েছিল, পিছনের বাড়ির কেউ শুনতে না পায়। শুনতে পেলে কে কি ভাববে, কে কি বলাবলি করবে সেই ভয়। আর এখন সে-কথাটাই এদের গর্ব করে বলার জন্যে সুযোগ খুঁজছে।

নির্মলেন্দু স্নান সেরে ফিরে আসতেই বলব বলব ভাবছে, মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে কথাগুলো, চম্পা ট্রে হাতে এসে পৌঁছল।

সেই যে চম্পা বলে ডেকেছিল সবিতা, ও দূর থেকে দেখা দিয়েছিল আর সবিতা বসে বসেই চোখে কি ইশারা করল, তখন বোঝেনি।

সবিতা নিজেই দাঁড়িয়ে উঠে ওর হাত থেকে ট্রে নিল। টিপয়ের ওপর নামিয়ে রাখল।

কল্যাণীর বলা হ'ল না। ও তখন চম্পাকে দেখছে।

বাঃ, বেশ সুশ্রী তো মেয়েটা। বছর ত্রিশ বত্রিশ হবে, কিন্তু কালোর ওপর শরীরটা আঁটসাঁট। ব্লাউজটাতেও বাবুদের বাড়ির ছাঁট আছে মনে হল। না বাবা, এমন হলে আমি রাখতাম না।

চম্পা চলে যেতেই, সবিতা কাপ এগিয়ে দিচ্ছে, এক প্লেটে কাজুবাদাম, অন্যটায় চানাচুর, কল্যাণী হেসে উঠে বললে, এই জানো, সেদিন কাণ্ড হয়েছে...

হাসি সংক্রামক, রিঙ্কুও হেসে উঠল, তারপরই তর্জনী তুলে, মাসিমা প্লীজ, একমিনিট...

নির্মলেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললে, বাপী ! টিভিটা।

নির্মলেন্দু ঘড়ি দেখল, হাসল, তারপর যেখানে বসেছিল সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে টি ভি-র রিমোট কন্ট্রোল বের করে আনল। সুইচ টিপতেই ওপ্রান্তে টি ভি চালু হয়ে গেল।

কালার টিভি। কল্যাণীর কথা আটকে গেল। যে-ভাবে বলবে ভেবেছিল, বাধা পেয়ে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বিদেয় দিয়ে একটা কালার কিনতেই হবে।

টিভি চলছে, টিভি চলছে। এখন বিজ্ঞাপন। কি একটা নতুন সিরিয়াল শুরু হচ্ছে আজ।

নির্মলেন্দু মেয়ের দিকে তাকাল হাসতে হাসতে, রিঙ্কু ! এবার সারপ্রাইজটা দিয়ে দাও।

সবিতাও হেসে উঠল, রিঙ্কুও। বেশ শব্দ করেই। এখন আর মাপা চাপা হাসি নয়।

হাসতে হাসতে বললে, মাসিমা, এই সিরিয়ালের নায়িকার নাম রিঙ্কু চ্যাটার্জি।

একটু থেমে বললে, অবশ্য আমার শুভনামে।

এই কমপ্লেক্সে প্রচুর অবাঙালি, ওর কলেজের বন্ধুদের মধ্যেও। তাই 'শুভনামে' শব্দটা এসে গেল রিঙ্কুর মুখে। সংশোধন করে বললে, ভাল নামে।

কারো মুখে কোনও কথা জোগাল না। যেন ভাল করে বুঝতেই পারছে না ওরা। সবাই অবাক। সুকমল আরো।

সিরিয়ালে অভিনয় করছে রিঙ্কু। এই রিঙ্কু ? নির্মলেন্দুর মেয়ে !

কল্যাণীর গলার স্বর ক্ষীণ। আমতা আমতা করে বলল, জানো ভাই, সেদিন এক কাণ্ড। ঋতাকে সিনেমার হিরোইন করবে বলে এক ডিরেক্টর এসেছিলেন, সে কি ঝোলাঝুলি...

সিরিয়াল শুরু হয়ে যাচ্ছে, সবাই তাকিয়ে আছে টিভি-র দিকে।

দেখতে দেখতেই নির্মলেন্দু বললে, তাই নাকি ! কথায় প্রাণ নেই।

রিঙ্কু বলে উঠল, সত্যি ? স্ক্রীন টেস্ট হয়ে গেছে ঋতার ?

—স্ক্রীন টেস্ট ? কল্যাণী অবাক হ'ল।

ঋতা বললে, না তো।

রিঙ্কু হেসে বললে, তাহলে তো কিছুই হয়নি। ওরকম তো ওরা কতই আসে।

## ॥ চার ॥

এই অফিস ঘরখানার সঙ্গে সুকমলের জীবন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই কোনওদিন ঘর, ঘরের আসবাবপত্র, ফাইলের স্তূপ বেমানান মনে হয়নি।

দু'একবার ঘর বদল হয়েছে, দু'একবার ট্র্যান্সফার হয়েছে, কিন্তু অফিসঘরের চেহারা সর্বত্রই একরকম। বদল হয়েছে শুধু আশপাশের টেবিলের মানুষগুলো। কিন্তু তারাও সেই একই রকম। তাই কখনো কোনও অস্বস্তি বোধ করেনি।

একবার কার সঙ্গে দেখা করার জন্যে টাটাসেন্টারে কোনও একটা অফিসে গিয়েছিল। ঝকঝকে তকতকে ভাব দেখে মনে মনে বলে উঠেছিল, বাঃ বাঃ। ব্যস্। তারপরই মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

আমাদের এই ভাল। বেশ একটা ঘরোয়া ব্যাপার আছে, আড্ডা আছে, হাসিফুর্তি, পান খেতে খেতে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁটা। সুকমল নিজে অবশ্য পান খায় না।

এই বিবাট ঘরখানার সীলিং অনেক উঁচু। আর দেয়ালজুড়ে চারপাশে সীলিং অবধি ফাইলের র‍্যাক, ধুলোটে ফাইলের স্তূপ, কয়েকটা মান্ধাতা আমলের কাঠের আলমারি। আব সারি সারি সেই মান্ধাতা আমলের টেবিল-চেয়ার। একটার সঙ্গে আরেকটার কোনও মিল নেই। না মাপের না পালিশের রঙের। কোনও কালে পালিশ পড়েছিল বলে মনেই হয় না।

নির্মলেন্দুর ফ্ল্যাট থেকে ফিরে আসার পর এই প্রথম যেন অফিসঘরটা খারাপ লাগল সুকমলের। নির্মলেন্দুর অফিসে কখনো যায়নি, যাওয়ার ইচ্ছেও নেই, কিন্তু কল্পনায় যেন সেই ঝকঝকে তকতকে অফিসঘরগুলো দেখতে পাচ্ছে। নির্মলেন্দুর নিশ্চয় নিজের একটা আলাদা চেম্বার আছে। কোথায় ছিল, কোথায় উঠে গেছে।

ওকে কেন নিয়ে গেছে খানিকটা আভাসে বুঝতে পারে। চেনাজানা কেউ ছিল নিশ্চয়ই, তার ওপর ও এতকাল কোম্পানিদের ব্যাপারস্যাপার নিয়েই ডীল করে এসেছে, সব ঘাঁতঘোঁত জানে। ফর্ম ফীল আপ করতে ওরা বারবার ভুল করে, সঙ্গে কাগজপত্র সব ঠিকঠাক দেয় না, ফাইল পড়ে থাকে, একজন এক্সপিরিয়েন্সড লোক ওদের দরকার ছিল।

ওপাশের টেবিলের রতনকে ছোকরা বয়েসের ফিটফাট পোশাকের একজন কি সব কথা শোনাচ্ছে।

কান পেতে দু'একটা কথা শুনল, হাসল সুকমল।

লোকটা কিছু একটা ব্যবসা করে হয়তো। লাইসেন্স ফাইসেন্সের জন্যে টাকা জমা দিয়েছিল, পায়নি। এখন টাকা ফেরত চায়, তারই দরখাস্ত। মনে মনে হাসল ও, বিজ্ঞাপন দেখে টাকা জমা দিয়েছ, সরকারের কাছ থেকে টাকা ফেরত পাওয়া যে কি জিনিস জানতে না!

লোকটা বলছে, অরিজিনাল রসিদ দিয়ে দেব ? তারপর আমার হাতে প্রমাণ কি থাকবে ? জেরক্স তো দিয়েছি।

রতন ক্রমশ বিরক্ত হচ্ছে। —সেকথা গভর্নমেন্টকে বলুন।

লোকটাও চটেছে। —গভর্নমেন্ট লোকটা কে ? আপনার কাছে তো তিনি আপনার ওপরওয়ালা। কে তিনি, নামটা বলুন।

—ফিনান্স মিনিস্টার।

লোকটা রসিকতা করে বললে, তাই নাকি ? আপনি ঠিক ফিনান্স মিনিস্টারের নীচেই ? এই ভাঙা চেয়ারটেবিল দেখে ভাবতেই পারিনি আপনি এত বড় অফিসার।

সুকমলের রাগও হল, হেসেও ফেলে। হাসি রতন জব্দ হয়েছে বলে, রাগ ওর অফিসেরই একজনকে বলছে সেজন্যে।

লোকটা বললে, ঠিক আছে অরিজিন্যাল রসিদই দিচ্ছি। কিন্তু ছাপ মেরে সই করে রসিদ দিন যে অরিজিন্যাল পেয়েছেন।

রতন অক্লেশে বললে, দেবার নিয়ম নেই। হঠাৎ আরো রেগে গিয়ে বললে, এখন হবে না, আপনি টিফিনের পর আসুন।

—এখনো তো কুড়ি মিনিট বাকি আছে ? লোকটা বললে।

রতন রেগে বললে, হবে না বললাম তো, টিফিনের পর আসুন।

লোকটা নিরুপায় হয়ে চলে গেল।

'এইটুকুই যা মজা। বোধহয় বেকার গ্র্যাজুয়েট, ব্যবসা করে টাকা লুটছে। তুমি টাকা করবে আমবা খেটে মরি।' রতন হয়তো একথাগুলোই মনে মনে বলছে। কিংবা তা নাও হতে পারে। একটু অভদ্রতা করে, লোককে কষ্ট দিয়ে পাঁচবার ঘুরিয়ে আমরা বোধহয় আনন্দ পাই। সুকমল ভাবল।

অথচ রতন ছেলেটা ভালই।

নির্মলেন্দুও তো আমাদের মতোই ছিল। এই রতনের মতোই। এ অফিসের সকলেই। অথচ এখন কত বদলে গেছে। ও নিশ্চয় এখন আর রতনের মতো কথাবার্তা বলে না, বলতে পারে না। এখন ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। কিন্তু কেন ? টাকা বেশি পাচ্ছে বলে ? টাকা তো গাভমেন্ট অফিসাররাও পায়। বোহয় ডিসিপ্লিন।

দিবাকর উঠে এল। চেযারটা টেনে নিয়ে বসল। — খবরটবর আছে কিছু ?

সুকমল বললে, আছে।

হাসতে হাসতে বললে, কাল রবিবার ছিল, হঠাৎ নির্মলেন্দুর বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।

—নির্মলেন্দু ?

সুকমল বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের সেই নির্মলেন্দু।

—ও। সে তো ফ্ল্যাট পেয়েছে শুনেছি। ফ্ল্যাটে থাকে।

সুকমল হাসল। —ওই হ'ল আর কি। সে যে কি ফ্ল্যাট, ভাবতে পারবে না।

—শুনছিলাম।

সুকমল হাসতে হাসতে বললে, তার চেয়েও বড় খবর আছে।

দিবাকর সপ্রশ্ন চোখে তাকাল সুকমলের মুখের দিকে।

সুকমল মুহূর্ত কয়েক চুপ করে রইল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ঈষৎ ক্ষোভ মেশানো গলায় বলল, নির্মলেন্দুরা একেবারে বদলে গেছে, একেবারে। তুমি ভাবতে পারো, ওর মেয়ে টি ভি সিরিয়ালে অভিনয় করছে।

দিবাকর বেশ খুশি হয়ে উঠল। বললে, তাই নাকি ?

সুকমল বোধহয় লক্ষ করল না, ও যেন রীতিমত অসন্তুষ্ট এমনভাবে বললে, ওর তো এখন আর টাকাপয়সারও অভাব নেই। তবু মেয়েটাকে ওইসব করতে দিয়ে কি গর্ব। বাবা মা দুজনেরই।

দিবাকর হাসল। বললে, তা চান্স পেয়েছে, করবে না ? আজকাল তো অনেকেই করছে। দোষ কি বল ! আফটার অল ওটাও তো একটা আর্ট। একটু থেমে বললে, নির্মলেন্দুদের ফ্যামিলিটা বেশ কালচার্ড।

সুকমল থমকে গেল। ধীরে ধীরে বললে, তুমি পারতে ?

দিবাকর হাসল। —আমাদের কথা বাদ দাও। আমরা হলাম টিপিক্যাল মিড্‌ল ক্লাস। মেয়ের বিয়েই আমাদের ধ্যানজ্ঞান। কালচার্ড ফ্যামিলিতে...

সুকমল ধীরে ধীরে বললে, ঠিকই বলেছ। নির্মলেন্দু আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। হয়তো আরো আলাদা হয়ে যাবে। ওরা আর কোনও কিছুই কেয়ার করে না। সমাজ ওদের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে। আর সেজন্যেই আমাদের আরো যন্ত্রণা দেয়।

—সমাজ কাকে বলে সুকমল ! দিবাকর হাসতে হাসতে বললে, সমাজ বলে সত্যি কিছু আছে ? তুমি মানলে সে আছে, না মানলে নেই।

সুকমল অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বিষণ্ণভাবে বললে, কি জানি।

একটু থেমে আবার বললে, চান্স ! তুমি চান্স বলছিলে না ? আমার মেয়েও পেয়েছিল—ঋতা। সিনেমার হিরোইন করতে চেয়েছিল। টাকার লোভ দেখিয়েছিল। তাড়িয়ে দিয়েছি।

একটু থেমে বললে পারলে লোক দুটোকে কান ধরে বের করে দিতাম।

বলে অনেকক্ষণ গুম হয়ে রইল।

দিবাকরও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, কি বলবে যেন খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর সান্ত্বনার স্বরে বললে, আমাদের সঙ্গে ওদের মেলে না সুকমল, মেলে না। নির্মলেন্দুরা এখন অন্য জগতের মানুষ।

কিন্তু সুকমলের মনে পড়ল, একটু আগেই দিবাকর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। 'তা চান্স পেয়েছে, করবে না ? আজকাল তো অনেকেই করছে। আফটার অল ওটাও তো একটা আর্ট'।

এ এক বিচিত্র বিচার। একজনের ক্ষেত্রে যেটা প্রশংসার, গর্বের, আরেকজনের ক্ষেত্রে সেটাই লজ্জার, ভয়ের। আশ্চর্য।

সমাজ মানে তা হলে ইউনিফর্মিটি। আর কিছুই নয়। এক নিয়ম এক নীতি মেনে চলা। সকলেই মেনে চলে, মেনে চলার চেষ্টা করে। আর তারই মধ্যে থেকে এক একজন বেরিয়ে আসে। তারা ব্যক্তি। ইনডিভিজুয়াল। তারা ভাঙে, বদলায়, বদলে যায়। ক্রমাগত এ দুইয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে, একটা দ্বৈরথ যুদ্ধ। আর ধীরে ধীরে সমাজ কেমন বদলে যাচ্ছে।

সত্যি কি সমাজ বদলাচ্ছে, নাকি শুধু বাইরের পোশাক !

দিবাকর বিশ্বাস করল কিনা কে জানে। হয়তো ভেবেছে নির্মলেন্দুর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে বানিয়ে বানিয়ে বলছে।

সুকমল যে ঋতার জন্যে এ ধরনের একটা জীবন চায় না, টাকার কিংবা গর্বের লোভ উপেক্ষা করেছে তার জন্যে যেন কোনও প্রশংসাই ওর প্রাপ্য নয়। হয়তো বোকা ভাববে, কিংবা গোঁড়া রক্ষণশীল।

নির্মলেন্দু নিশ্চয় তাই ভেবেছে।

কল্যাণী যখন বলছিল তখন নির্মলেন্দুর স্ত্রী সবিতার ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি দেখেছিল ও। সেটা বিদ্রূপের না কৌতুকের ঠিক বুঝতে পারেনি। অবিশ্বাসেরও হতে পারে। সবিতা নির্ঘাত ভেবেছে কল্যাণী ওকথা বানিয়ে বানিয়ে বলছে।

সেজন্যেই সুকমল একটু বিরক্ত হয়েছিল কল্যাণীর ওপর। কল্যাণী যে দুম করে বলে ফেলবে ভাবেওনি। বলার তো কোনও দরকার ছিল না। এখন মনে হচ্ছে ও কথাটা শোনাবার জন্যেই গিয়েছিল কল্যাণী।

ওরা যে বিশ্বাস করবে না সেটা তো স্বাভাবিক। কে কি চায় আর কে কি চায় না তা জানা কি এতই সহজ। যে যেটা আকাঙ্ক্ষা করে, স্বপ্ন দেখে তার তো ধারণা সারা পৃথিবীর মানুষই তা পাবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে।

নির্মলেন্দু হাসতে হাসতে রিঙ্কুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, এবার সারপ্রাইজটা দিয়ে দাও রিঙ্কু!

কি আনন্দ ওদের, যখন টিভিতে দেখছিল রিঙ্কুকে। সুকমল আর কল্যাণীও হাসছিল। ঋতা বলে উঠলে, কি দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে রিঙ্কুদি।

না দেখলে বিশ্বাস হত না। কি স্মার্ট চেহারা, চলন-বলন, একেবারে মড পোশাকে সেজে না-সেজে উঁচু ল্যাম্পস্ট্যান্ডের আলোয় মুখ রাঙিয়ে এক্ষুনি শুয়ে ছিল ডিভানের ওপর, পায়ের ওপর পা তুলে, একটু দৃষ্টিকটু লাগছিল ঠিকই, সিরিয়াল শুরু হতেই হাসি মুখে উঠে বসল দু'হাতে থুতনি রেখে, চোখ টিভির দিকে।

সেই মেয়ে, ভাবাই যায় না, ঋতা বললে, রিঙ্কুদি, তুমি? বলে টি ভির পর্দার দিকে আঙুল দেখাল।

কল্যাণীও হাসতে হাসতে বললে, ও মা, এক্কেবারে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে!

সেই আদ্যিকালের পাড়াগাঁ। আর সেই আদ্যিকালের গ্রাম্য মেয়ে। আজকাল ও রকম আছে নাকি! কত বদলে গেছে। সে সবের এরা বোধহয় কোনও খবরই রাখে না।

কিন্তু চমৎকার মানিয়ে গেছে। একটু চোখে লাগছিল, কাঁধের কাছটা খোলা, শুধু শাড়ি পরেছে, তবে হাঁটাচলায় একেবারে গ্রাম্য, কি সুন্দর অভিনয় করছিল, কথাগুলোর উচ্চারণও শ্যাওলা মাখানো পিছল পিছল।

সুকমল হাসছিল। ওরা সবাই।

শেষ হওয়ার পর ওরা খুব প্রশংসাও করেছিল।

ঋতা বলেছিল, দেখো রিঙ্কুদি তোমার খুব নাম হয়ে যাবে।

রিঙ্কু হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ ঋতা, এর মধ্যেই আরেকটা কথা হচ্ছে।

নির্মলেন্দু আর সবিতার মুখে কি আনন্দ!

ফেরার সময় নির্মলেন্দু লিফটে ওদের সঙ্গে নীচে অবধি নেমে এসেছিল।

কল্যাণী কেবল বলছিল, আপনাকে আর আসতে হবে না, আসতে হবে না।

হয়তো সঙ্কোচের জন্যেই। ওদের তো হেঁটে বেরিয়ে যেতে হবে, গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি ট্যাক্সি বলে চেঁচাতে হবে, সেই সব লজ্জার কথা ভেবে বলেছিল।

কেউ ওপরে উঠে গেলে সেজন্যেই বোধহয় দূরত্ব বেড়ে যায়।

ট্যাক্সি পেয়েছিল, কিন্তু কেউ কোনও কথা বলেনি। ওরা সবাই চুপচাপ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কল্যাণী হেসে উঠে বলেছিল, ঋতাকে করতে দিলেই হত। তুমি তো তাড়িয়েই দিলে।

ঋতা কেমন কষ্ট-কষ্ট গলায় বললে, দেখলে মা, ওরা কেউ বিশ্বাসই করল না।

কি আশ্চর্য, যে-কাজ ও করবে না, করতে চায় না, তাব সুযোগ এসেছিল, হয়তো এখনো আছে, সেটা নির্মলেন্দুরা বিশ্বাস করল না ভেবে সুকমলেরও খারাপ লাগছে।

সুকমল নিজেও হঠাৎ একসময় বলে ফেলেছিল, ও কিন্তু দেখো খুব নাম করে ফেলবে। রিঙ্কু।

কল্যাণী আর ঋতা কোনও কথাই বলেনি।

ট্যাক্সিতে বসে ওরা তিনজনই অন্যমনস্ক। কি যেন ভাবছিল। তিনজনই কেমন বিমর্ষ।

সুকমল আর কল্যাণী এতদিন তো ঋতার জন্যে শুধুই একটা সুখী সুস্থ জীবন

চেয়েছিল। আর কিছুই নয়। এখনো আর কিছুই চায় না। তা হলে নিজেদের এত লাগছে কেন। ঋতা পাশ করবে, তেমন ভাল চাকরি পেলে তাও করবে। পেলে বা না পেলে শেষ অবধি গন্তব্য তো সেই একটাই। ভাল বিয়ে। ভাল পাত্রে।

এর মধ্যে একদিন কল্যাণীর দাদা এসে হাজির।

রবিবার খাওয়াদাওয়া সারতে দুপুর গড়িয়ে যায়। পুণ্যর কোনও ঠিকঠিকানা নেই, সেই যে সকালে চা-টোস্ট খেয়ে বেরিয়ে যায়, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কখন ফেরে তার হিসেব নেই। কাজের মধ্যে সকালে শুধু মাংস এনে দেওয়া। রবিবারের ছুটির আমেজ শুধু ওই একটি জিনিসে। মাংস।

এখন মাঝে মাঝে মুর্গীব মাংসও হয়, কিন্তু কেউই তেমন পছন্দ করে না।

আগে শাশুড়ি বেঁচে থাকতে বাড়িতে মুর্গী ঢুকতে পেত না। তা নিয়ে ওদের অসন্তোষ ছিল। পুণ্য আর ঋতা তো ঠাকুমার সঙ্গে ঝগড়া জুড়ে দিত।

ঋতা রসিকতা করে একদিন বলেছিল, তোমার ঠাকুর মুর্গীকে এত ভয় পায় কেন গো ঠাম্মা ? মুর্গী দেখলেই বুঝি ভয়ে পালাবে ?

ঠাকুমা রেগে যেতেন।

কল্যাণীর একটু প্রশ্রয়ও ছিল। ছেলেমেয়েরা খেতে ভালবাসে, খেতে ইচ্ছে হয় ওদের, অথচ বাড়িতে এনে রান্না করা যাবে না। মাংস দূরের কথা, মুর্গীর ডিমেও শাশুড়ির আপত্তি ছিল। কিন্তু কল্যাণী তা মানেনি। লুকিয়ে লুকিয়ে মুর্গীর ডিম সেদ্ধ করে দিত। পুণ্য একবার নীচে নেমে যেত, একবার ঋতা, নীচের বসার ঘরে বসে খেয়ে আসত। রান্নাঘরেও ঢুকতে সাহস হত না, দোতলার বারান্দা থেকে বুড়ি শাশুড়ি দেখতে পেলেই সন্দেহ করবে কিছু একটা বিধর্মী ব্যাপার ঘটছে।

আর জানতে পারলে নির্ঘাত কুরুক্ষেত্র।

তখন মুর্গীর মাংস খেতে কল্যাণীরও ভাল লাগত। শাশুড়িকে জানিয়ে কাজের অছিলায় সুকমলের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে সিনেমা দেখেছে, আর ফেরার পথে কোনও রেস্টুরেন্টে বসে ফাউল কাটলেট কিংবা ফাউল কারি আর পাঁউরুটি খেয়ে এসেছে। কি সুস্বাদু লাগত তখন।

কিন্তু ববিবার মানেই বাড়িতে পাঁঠা বা খাসির মাংস। চলে আসছে বিয়ের পর থেকেই।

বারান্দার কোণ থেকে তোলা উনোনটা সরে গেছে বহুকাল। জল ঢেলে সপ্ সপ্ করে ঝাঁটা দিয়ে বারান্দা ধুয়ে বারান্দাটা আরো নোংরা করে তোলে না কেউ এখন।

শাশুড়ি মাবা যাবার পর থেকে এ বাড়িতে আর মুর্গী নিষিদ্ধ নয়। মাঝে কিছুকাল তো প্রতি ববিবারেই হত। কিন্তু এখন আর তেমন সুস্বাদু মনে হয় না।

ঋতাই একদিন মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, পাঁঠার মাংসই ভাল ছিল মা, এ আর ভাল লাগে না।

সুকমল খেতে খেতে বলে উঠল, ঠিক বলেছিস।

পুণ্য আর কল্যাণী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল। অর্থাৎ ওদেরও তাই মত।

তাহলে কি নিষিদ্ধ ছিল বলেই মুর্গীর মাংস খাওয়ার জন্যে এত লোভ হত ? এত সুস্বাদু মনে হত ?

রবিবার সকালে মাংস কিনে আনার কাজটা পুণ্যর। ও গিয়ে একটা দোকান থেকে পাঁঠা কিংবা খাসির মাংস কিনে এনে থলেটা নামিয়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়ে।

ফেরে সেই দুপুর একটায়, এক পেট ঝাঁ ঝাঁ খিদে নিয়ে। দু'মিনিটে স্নান সেরে নিয়েই বসে যায়। ঋতা আর কল্যাণী অনেক সকালেই স্নান করে নেয়, কর্পোরেশনের জল,

কখন থাকবে কখন থাকবে না অনিশ্চিত।

দেরি অবশ্য সুকমলেরও হয়। ছুটির দিন মানেই তো কাজের দিন। কলের মিস্ত্রির খোঁজে বেরিয়ে পড়ো, বলে এলেই হবে না, রীতিমত তার পিছনে পিছনে ঘুরতে হবে, সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে। তা না হলে 'যাচ্ছি বাবু' বলে কোথায় যে সটকে পড়বে তার ঠিক নেই। কোনওদিন কাঠের মিস্ত্রির খোঁজ, বাথরুমের দরজাটা ঠিক মতো লাগছে না, কিংবা জানালা বন্ধ হচ্ছে না। এ ছাড়া আরো কতরকমের টুকিটাকি কাজ যে থাকে। অফিসের কাজও কখনো কখনো। তারপর অবশ্য কোনও কোনওদিন ছোটখাটো একটা আড্ডাও হয়, অফিসের কেউ এসে পড়লে। আড্ডা শেষ করে উঠতে না চাইলে বলা তো যায় না, এবার আসুন। তা ছাড়া নিজেরও খেয়াল থাকে না। নির্মলেন্দু আজকাল আর আসে না। ও যখন আসত, দু'একবার কল্যাণী ঠাট্টা করে বলেছে, কি মশাই, একটা বাজল, বাড়ি যেতে হবে না! বৌটা যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে।

নির্মলেন্দু আসে না, কিন্তু দেরি এখনো হয়।

রবিবার সকালে ওরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসে। কাজের মেয়েটা, করুণা, একা সামলাতে পারে না বলে কল্যাণী তাকে সাহায্য করে। ঋতা বড়জোর জলের গ্লাসগুলো এনে রাখে খাবার টেবিলে। তারপর ঘরোয়া গল্পগুজব চলে খেতে খেতে, হাতের কাজ শেষ করে এসে কল্যাণীও বসে পড়ে। এ ছাড়া পুণ্য আর ঋতাকে একসঙ্গে নিয়ে খেতে বসার সুযোগই মেলে না সারা সপ্তাহে। আগে রাত্রে একসঙ্গে বসত, টি ভি হওয়ার পর থেকে সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা টি ভি বন্ধ না হলে খেতে বসে না, সুকমলকে অফিসের কথা ভেবে চটপট শুয়ে পড়তে হয়। ইচ্ছে থাকলেও দেখা হয়ে ওঠে না।

এই খাবার টেবিলটা কেনা হয়েছিল ঋতার বায়নায়। কেনা হয়নি, তৈরি করানো হয়েছিল। ছ'খানা চেয়ার সঙ্গে নিয়ে যখন ঘরজুড়ে বসল, তখন সবাই কি খুশি। ঋতা সবচেয়ে বেশি।

সেই টেবিলটারই মর্যাদা কমে গেল একটা দিনেই।

নির্মলেন্দুদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে পরের দিনই খেতে বসার সময় ঋতা বললে, রিঙ্কুদের ডাইনিং টেবিলটা দেখেছ মা ?

—হুঁ। শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করল কল্যাণী।

অর্থাৎ দেখেছে, এবং মনে হয়েছে খুবই দামি। দেখতেও চমৎকার, বিশেষ করে চেয়ারগুলো পিঠের দিকটায় ডিজাইন আছে। সাদামাটা নয়।

এই টেবিলটা করানোর সময় সুকমলের একটু টাকার টানাটানি ছিল। প্রথম প্রথম তাই এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল।

ঠাট্টা করে বলেছিল, খিদেটাই আসল ব্যাপার। খিদে থাকলে টেবিল-ফেবিল লাগে না। সারাদিনে বসবি তো দু'মিনিট করে দু'বেলায় চার মিনিট, তার জন্যে একটা ঘর জোড়া। এতগুলো টাকা নষ্ট। বলে হেসেছিল।

শেষ অবধি চাপে পড়ে করাতেও হয়েছে সুকমলকে। খুব কৃপণতাও করেনি। প্রথম প্রথম সবারই খুব ভাল লাগত।

নির্মলেন্দুদের ডাইনিং টেবিল দেখে আসার পর নিজেদেরটা আর তেমন ভাল লাগেনি।

ঋতাটা খেতে চায় না, খেতে পারে না। তাই কল্যাণীর চোখ শুধু ওর খাওয়ার দিকে। না খেলে, এ বয়েসের মেয়ে খেতে না চাইলে, সব মায়েরই বড় কষ্ট। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল করতে হবে তো। বিয়ে দিতে হবে, এবং বিয়ের পর সংসারের কাজকর্ম করতে হবে। রোগাসোগা থাকলে তো মেয়ে দেখতে এলেও পছন্দ করবে না।

ঋতা খাচ্ছিল না, পাতের তরিতরকারি যথারীতি সরিয়ে সরিয়ে রাখছিল, কল্যাণী ধমক দিয়ে বললে, রিঙ্কুদের ডাইনিং টেবিল দেখে কি তোর খিধে চলে গেল নাকি।

ঋতা হেসে বললে, ঠিক তাই। একটু থেমে হাসতে হাসতে যোগ করল, বেশি খেলে মোটা হয়ে যাব, মা। তখন আর কেউ সিনেমার হিরোইন করার জন্যে আসবে না।

কল্যাণীও হেসে ফেলল। বললে, ওদের সঙ্গে তুলনা করিস না। ওরা তো এখন বড়লোক হয়ে যাবে। রিঙ্কুও কত টাকা রোজগার করবে এরপর।

সুকমল শুনছিল, কোনও কথা বলছিল না। ওদের ওখান থেকে ফিরে আসার পর নিজেকে কেমন যেন মূল্যহীন মনে হচ্ছে। এতকাল নির্মলেন্দুকে মনে হয়েছে সমান সমান। চাকরিতে, মাইনেতে, শিক্ষায়-দীক্ষায়। তর্কেবিতর্কে কি আলোচনায়, পলিটিক্স নিয়ে কথাবার্তায় যখন 'আমরা' শব্দটা ব্যবহার করত তখন তার মধ্যে নির্মলেন্দুকেও ধরে নেওয়া হত। এখন 'আমরা'র গণ্ডি থেকে নির্মলেন্দু বেরিয়ে গেছে। সুকমলের একটা পয়সাও মাইনে কমেনি, সেই বাড়িতেই আছে। সেই ডাইনিং টেবিলেই খেতে বসেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন নির্মলেন্দুর অনেক ধাপ নীচে নেমে এসেছে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার মানে যে নেমে যাওয়া তা কে জানত।

অথচ একসময় কম ভাড়ায় এই গোটা বাড়িটা নিয়ে আছে বলে ঈষৎ করুণার দৃষ্টিতেই বোধহয় দেখত নির্মলেন্দুকে। কল্যাণী যেতেই চাইত না ওদের সেই ঘিঞ্জি বাড়িতে। বলত, গেলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। ছাদ নেই বারান্দা নেই থাকে কি করে।

এখন অফিসের বন্ধু দিবাকরের চোখেও, নির্মলেন্দুদের ফ্যামিলিটা কালচার্ড। কাকে কালচার বলে কে জানে। ভাল চাকরি, ভাল ফ্ল্যাট ? দামি দর্জির বানানো সাফারি স্যুট ? হিংসে করার মতো বসার ঘর ? নাকি কারো কিছু তোয়াক্কা না করে, সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রিঙ্কুর অভিনয় করা !

সব কেমন বদলে যাচ্ছে, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

সুকমলের মনে হ'ল ও এতকাল সবই ভুল করে এসেছে। সব ভুল। সমাজ বলে সত্যি কিছু আছে নাকি। সে তো একটা অক্ষম জড়পদার্থ। কিচ্ছু করতে পারে না। শুধু অক্ষমের কাছেই সবল। এত যে বাধাবন্ধন, পিছুটান, কেয়ার করি না বলে কেউ যদি যা খুশি করে, সমাজ শুধু পঙ্গুর মতো অক্ষম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বড়জোর হিংসেয় জ্বলতে জ্বলতে পরনিন্দা করে আনন্দ পায়।

একটাই তো গর্ব ছিল, আমাদের কিছু নেই, কালচার আছে। আমরা ভাল বই পড়ি, ছেলেমেয়েদের পড়াই। আমরা ভাল গান শুনি, ভাল ছবি দেখি। অল্পে সন্তুষ্ট থেকে সুস্থ জীবন নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিই। যারা ভাল সিনেমা থিয়েটার করে, নাচে গায়, দূর থেকে তাদের গুণের দাম দিই। প্রশংসা করি। কিন্তু নিজেরা তার মধ্যে যেতে চাই না।

সুকমলের মনে একটা খটকা লাগল। আমরা কি ভণ্ড ? হিপোক্রিট ? তা না হলে বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রশংসা করি কেন ? ভক্ত হয়ে পড়ি কেন ? কেন সম্মান জানাই ? অথচ নিজের বাড়ির মেয়েটিকে আড়াল করে রাখতে চাই। আশ্চর্য তো ! এটা কি কোনও চাপা হিংসে ?

নির্মলেন্দুদের ফ্যামিলিটা কালচার্ড !

দুদিন আগেও দিবাকর একথা বলেনি। বলত না, যদি সে অফিসেই সুকমলদের পাশাপাশি এই ধুলোপড়া ফাইলের অন্ধকূপে বসে কাজ করত। ওই ঘিঞ্জি বাড়িতে থাকত। তখন সমাজ ওকেও শাসন করত। আর নির্মলেন্দুও সমাজকে ভয় পেত।

রবিবার দুপুরে বসে খেতে খেতে ঋতা হাসতে হাসতে বললে, কালার টি ভি কিনবে না বাপী ? রিঙ্কুকে কালারে কি সুন্দর লাগছিল।

*কল্যাণী রসিকতার স্বরে বললে, হাসতে হাসতে বললে, তুই সিনেমা করলে দিব্যি কেনা যেত ; কি বলিস !*

*সুকমলও হাসল।*

এখন এটা রসিকতাই। সেদিন রেগে গিয়েছিল ঠিকই, লোক দুটোকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন তো আর কোনও আশঙ্কা নেই। ঋতা সিনেমায় নামছে না, নামছে না। ওরা তো ভুল বুঝেছিল। ভেবেছিল, ঋতাই সব ব্যবস্থা করেছে।

ঋতাকে ঘিরে একটু শখ অবশ্য ওদের সকলেরই ছিল। গানের স্কুলেও দিয়েছিল, বেশ কয়েকবছর, ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল, পড়ার চাপ, তাই ছেড়ে দিতে হল। ভাল স্কুলে দু'জনকেই পড়িয়ে এসেছে, পুণ্য জয়েন্টে চান্স পেল না, তখন স্বপ্ন, ঋতা তো লেখাপড়ায় ভাল, ওকে ডাক্তারি কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবে। পারবে বলে মনে হয় না। না হলেই বা কি।

রবিবারের দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে উঠতে উঠতে দুটো বেজে গেল।

সুকমল সবে বিছানায় গড়াতে যাবে দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

কে এল আবার, এই অসময়ে।

দোতলা থেকে কল্যাণী চিৎকার করে বললে, কে দেখ তো করুণা ?

নিজের মনেই বলল, খবরের কাগজওয়ালা বোধহয়। টাকা নিতে এসে সকালে ফিরে গেছে। ... সময় পেল না ?

কে এসেছে করুণাকে আর বলতে হ'ল না। নীচের তলা থেকেই চিৎকার শুনতে পেল, কই রে কল্যাণী, কোথায় তোরা ?

পরক্ষণেই সিঁড়ি থেকেই সহাস্য প্রশ্ন, কই, আমাদের ফিলিমস্টার কই রে !

হাতিবাগানের দাদা। পিছন পিছন কুলকুল হাসি নিয়ে গোলগাল ফর্সা চেহারার বৌদি ' মাথায় আধখানা ঘোমটা ছিল, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এক ঝটকায় সেটা সরিয়ে দিল।

এ বাড়িতে ঘোমটা-ফোমটার চল নেই বলেই নয়, একটু মোটাসোটা চেহারা, তাই ঘোমটা দিলেই ওর গরম করে. কাঁধ আর ঘাড় নাকি ঘামে জ্যাবজ্যাব হয়ে যায়। তবু দিতে হয়। যে পাড়ায় যার চল।

কল্যাণী হাতে স্রেফ সোনার বালা পরে। আর নোয়াটাও সোনায় মোড়া।

বৌদি প্রথমদিকে কবে যেন চমকে উঠেছিল, ও কি গো, হাতে শাঁখা পরো না। নোয়া পরো না !

নিজে ও পলার বালা পরে, শাঁখা পরে, লোহা দেখানো নোয়াও। তার সঙ্গে এক রাশ চুড়ি, অল্প বাইরে কোথাও যেতে হলে। কল্যাণী প্রথম প্রথম হাসত, ঠাট্টা করত, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ওপর থেকে দেখতে পেয়েই কল্যাণী বলে উঠল, কি ভাগ্যি ! সুকমল ঘরের ভেতরে, তাকে উদ্দেশ করে বললে, দেখে যাও দেখে যাও, কে এসেছে।

কল্যাণীর গলার ফূর্তি ভাবটা লক্ষ করেই নয়, গলার স্বরটাও বোধহয় চিনতে পেরেছিল। সুকমল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাসিখুশি বৌদি মানুষটাকে হেলেদুলে উঠতে দেখেই বললে, আরে ব্বাবা, এ যে ভাবাই যায় না, একেবারে জোড়ে এসেছেন যে !

হাতিবাগানের দাদার সঙ্গে সম্পর্কটা দাদার হলেও দু'জনের বয়েস খুবই কাছাকাছি। কল্যাণীর সঙ্গে তার বৌদির বয়েসও প্রায় একই। তাই ঈষৎ ঠাট্টা রসিকতা চলে আসছে প্রথম থেকেই।

—এসো এসো। বলে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল কল্যাণী, বললে, একেবারে অবাক করে দিলে!

আসা-যাওয়া আজকাল সত্যি কমে গেছে, যত বয়েস বাড়ছে দূরত্বও বাড়ছে হাতিবাগান আর ভবানীপুরের মধ্যে।

দাদা বলে উঠল, কেন, আসতে পারি বলেনি পুণ্য ?

পুণ্য ? পুণ্য কই ? ডাকাডাকি করে জানা গেল খেয়ে উঠেই সে পালিয়েছে। হ্যাঁ, পালিয়েছে।

বৌদি বললে, পুণ্যর কাছেই তো শুনলাম সব, ও যে ওপাড়ায় থিয়েটার দেখতে গিয়ে আমাদের ওখানে গিয়েছিল।

দাদা বললে, আমরা তো বললাম ওকে, রোববারে যেতেও পারি।

বলে হাসল, তারপর ঋতার মুখের দিকে তাকাল। —দেখি ফিলিমস্টার দেখি!

হইহট্টগোল শুনে ঋতা এসে দাঁড়িয়েছিল, ঈষৎ লজ্জার, ঈষৎ অপ্রতিভ মুখ নিয়ে। কথাটা ওর কানে গিয়েছিল, 'আমাদের ফিলিমস্টার কই রে!'

—মামাবাবু! রাগত স্বরে লজ্জা মিশিয়ে ঋতা যেন ধমক দিল।

মামাকে নয়, বোধহয় পুণ্যকে। কি পাজি দেখো দাদাটা, এর মধ্যে গিয়ে সব খবর দিয়ে এসেছে। অথচ খবরটা কি, কিছুই তো নয়। মা সেদিন দুম করে নির্মলেন্দুকাকুদের বাড়িতে বলে ফেলেছিল বলেও রাগ হয়েছিল। না বললে রিঙ্কু ওভাবে ঠোঁট উল্টে বলতে পারত না, স্ক্রীন টেস্টই হয়নি!

স্ক্রীন টেস্ট ব্যাপারটা কি তাই তো জানে না ঋতা।

ঋতা মামার রসিকতা পছন্দ করল না বলেই প্রতিবাদের স্বরে বললে, মামাবাবু! অর্থাৎ হচ্ছেটা কি!

ঋতার মামা ওসব বুঝলেনও না। বললেন, উঁহুঁ, উঁহু! ওসব মামাবাবাটাবু আর চলবে না। আজকাল ফ্যাশন করে মামাকে কি বলে ডাকে, সেইরকম চাই।

মামাবাবু ডাকটা ওকে ছেলেবেলায় কে শিখিয়েছিল কারো মনে নেই। কেউ তখন ছাড়াবার চেষ্টা করেনি, তাই রয়ে গেছে। বড় হয়েও বদলাতে পারেনি।

মামিমা রসিকতা করে বলেছে, বাবারা বাপী হয়ে গেল, কাকারা কাকু, কিন্তু তোমার মতো জবুথবু লোককে মামাবাবু ছাড়া কিই বা বলবে।

সুকমল বললে, আসুন আসুন!

ঘরজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবাই বসল। কেউ খাটে বিছানায়, কেউ মোড়ায় চেয়ারে।

ঋতা পালাতে চাইছিল, মামিমা বলে উঠল, তোমাকেই দেখতে এলাম, আর তুমিই পালাচ্ছ ?

হাতিবাগানের দাদাও হাসল, এরপর বিখ্যাত হয়ে গেলে তো আর দেখতেই পাব না রে, এখন দেখে নিই। গর্ব করে তো বলতে হবে সবাইকে, আমার ভাগ্নী, নিজের ভাগ্নী!

ঋতা আর তার মা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সুকমলও বিভ্রান্তের মতো তাকাল ওদের মুখের দিকে।

ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করল সুকমল, আঃ কি হচ্ছে কি। ও কি সত্যি সিনেমা করছে নাকি ? পুণ্য তাই বলেছে ?

ঋতা বেশ রাগ করেই উঠে চলে গেল।

আর সুকমল বললে, শুনুন ব্যাপারটা। দুটো সিনেমার লোক, একজন ডিরেক্টর ফিরেক্টর হবে হয়তো...

একে একে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেল সুকমল।

শেষে বললে, আমি তো তাদের তাড়িয়েই দিয়েছি। আবার আসবে বলে গেছে। যদি আসে...

হাতিবাগানের দাদা বলে উঠল, যদি আসে, তাড়িয়ে দেবে না।... সেজন্যেই তো এলাম!

বৌদি হাসতে হাসতে বললে, ঋতাকে বেশ সুন্দর বলেই জানতাম। বেশ একটা আলগা শ্রী আছে, কিন্তু ও যে এত সুন্দরী হয়ে উঠেছে মনেই হয়নি।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

সেদিনের সেই ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে সুকমল ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। বারবার বলছিল, সেই লম্বা জুলপি ছোকরা...

অবশ্য সেই প্রথম দিনের মতো উত্তেজিত হয়নি। এখন সয়ে গেছে। তা ছাড়া এর পিছনে যে ঋতার কোনও সায় ছিল না তাও জানা গেছে। এখন তো মনে হচ্ছে এত উত্তেজিত হবার মতো ব্যাপার নয়। রিঙ্কু তো এসব করছে, মনে হল এরপরও করবে। তার জন্যে নির্মলেন্দু এবং সবিতা তো রীতিমত গর্বিত। কোথায় ভেবেছিল সবাই শুনে ছি ছি করবে, কিংবা হাসাহাসি, তার বদলে দিবাকর বলে উঠল, নির্মলেন্দুদের ফ্যামিলিটা বেশ কালচার্ড।

চোখের সামনে থেকে যেন ধারণাগুলো পাল্টে যাচ্ছে সুকমলের। সমাজটাও। কে জানে, এভাবেই হয়তো পাল্টায়। একসময় যেটার জন্যে লোকের আতঙ্ক ভয় ছি ছি, একদিন সেটাই কালচার হয়ে দাঁড়ায়। ও তো এতকাল কালচার বলতে অন্য কিছু ভেবে এসেছে। এখন দেখছে ওটাও পোশাক। অন্তত অন্যেরা তো তাই ভাবছে।

দিবাকরের কাছ থেকে রতন শুনেছিল, রতনের কাছ থেকে আবও কে কে।

রতন এসে জিগ্যেস কবল, সুকমলদা, সত্যি। নির্মলেন্দুদার মেয়ে?

সুকমল ঘাড় নাড়তে রতন মন্তব্য করল, ফাইন। আফটার অল আমাদেরই একজনের মেয়ে তো।

আরেকজন কে, এসে বললে, সিরিয়ালটা আমি তো দেখেছি, দারুণ অভিনয় করেছে। ও রাইজ করবে, দেখবেন। আগে তো ওঁর মেয়েকে দেখিনি কখনো, চিনতে পারিনি।

সে-সব কথা ভেবে সুকমলের মাথার মধ্যে এতদিনের ধারণাগুলো সব ওলোটপালোট হয়ে গেছে।

এখন আবার ধাক্কা খেল।

যে মানুষটাকে গোঁড়া প্রাচীনপন্থী হিসেবে দেখে এসেছে, জেনে এসেছে, তার মুখে এই ধরনের কথা আশাই করেনি। প্রথমে ভেবেছিল ঠাট্টা করছে।

—দ্যাখো সুকমল, এটাও তো এক ধরনের গুণ। কার মধ্যে কি আছে, তুমি কি জানো? এটা তো জীবিকাও।

সুকমল একটু থমকে গেল। বললে, আপনার মেয়ে হলে করতে দিতেন?

—তা তো জানি না। হাতিবাগানের দাদা উত্তর দিল। বললে, ভেবে দেখিনি।

বৌদি জুড়ে দিল, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনওদিন ঋতার অনুশোচনা হয়। ভাবে যে বাপীই করতে দেয়নি। দিলে নাম হ'ত, টাকা হ'ত।

কল্যাণীর কি এখনই একটু-আধটু অনুশোচনা হচ্ছে। ঋতাকে নিয়ে রিঙ্কুর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারছে না বলে!

ও মন্তব্য করল, একসময় তো মেয়েদের চাকরি করাতেও কত আপত্তি।

—আমাদের আপিসেই, সরকারি আপিসেই এখন কত। বলে হা হা করে হাসল হাতিবাগানের দাদা।

বৌদি একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, আর ঘোমটা পরিয়ে রেখো না। এই আমার যেমন। এতকালের অভ্যাস, ছাড়তে পারি না, অথচ নিজেরও কষ্ট, লোকেও হাসে।

এমন কি কল্যাণীও। সেজন্যেই এ বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বৌদি মাথার আধ-ঘোমটাও নামিয়ে দিয়েছিল। জানে, কল্যাণী পছন্দ করে না। বলে, তখন শ্বশুর শাশুড়ি ছিল, দিতে বাধ্য ছিলে, এখন কেন! বোঝে না অভ্যাস হয়ে গেলে সেটা ছাড়া কত শক্ত। এই হাতের পলার বালা, শাঁখা, নোয়ার মতোই, ছাড়তে ভয়-ভয় করে।

সকলেই বোধহয় এক জায়গায় এসে থমকে থেমে যায়। যেমন সুকমল আর কল্যাণী। এদিকে এত আধুনিক হবার চেষ্টা। অথচ মেয়ে সিনেমায় নামবে শুনেই আতঙ্ক।

—শেষে আপনি এ কথা বলবেন, আমি ভাবতেই পারিনি! সুকমল বলল হাসতে হাসতে। বললে, এই সেদিনও আপনি মেয়ের বিয়ের জন্যে এত কথা বললেন।

—তবে? দেখলে তো আমরাই আসলে মডার্ন। বলে হা হা করে শব্দ করে হেসে উঠল।

একটু থেমে বললে, সুযোগ হাতছাড়া করতে নেই।

সুযোগ? কথাটা শুনতে ভাল লাগল না। যা চাই না, যা ছুড়ে ফেলে দিয়েছি, সেটাকে সুযোগ বললেও তো অপমান করা হয়। কে যেন বলেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জুলপি-ছোকরা বলেছিল, পরে অনেক বড় বড় চান্স পাবে। চান্স!

হাতিবাগানের দাদা বৌদি লুচি আলুর দম খেয়ে সন্ধ্যের পর বিদায় নিল। যাবার আগে ঋতাকে ডেকে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, তোর যদি ইচ্ছে হয় সিনেমা করবি, কেন করবি না। অনেকেই তো করছে।

বৌদি হাসল। বললে, তোমাদের আর কি বলব। পুণ্য আজকালকার ছেলে, কত পলিটিক্স, কত আধুনিক কথাবার্তা, এদিকে বোন সিনেমায় নামলে তার নাক-কান কাটা যাবে। বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না!

কল্যাণী হঠাৎ দেখতে পেল কাজের মেয়ে করুণা দাঁড়িয়ে শুনছে। এঁটো থালা গেলাস নিয়ে যেতে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে লক্ষই করেনি।

বলে উঠল, তুই যা, তুই যা।

ওরা চলে যাবার পর সুকমল নিশ্চিন্ত হল। বেশিক্ষণ থাকলে এই সব প্রশ্রয় দিয়ে মেয়েটার মাথাতেও হয়তো ঢুকিয়ে দিত। কিন্তু নিশ্চিন্ত হল কি? মনের মধ্যে কেমন একটু খিচখিচ করছে যেন।

সুকমলের নিজেকে বড় অসহায় লাগছে। একটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছে।

হাতিবাগানের দাদা বলেছে, দ্যাখো সুকমল, এটাও তো এক ধরনের গুণ, কার মধ্যে কি আছে তুমি কি জানো? এটাও তো জীবিকা!

হাতিবাগানের বৌদির কথাটাও মনে পড়ছে।—যদি কোনওদিন ঋতার অনুশোচনা হয়, যদি ভাবে বাপীই করতে দেয়নি। দিলে নাম হত, টাকা হত?

প্রথম যখন মেয়েরা চাকরি করতে এল তখন তো অনেকে ছি ছি করেছে। ভদ্রঘরের মেয়েরা যখন স্টেজে উঠে নাচে, গান গায়, নাটক করে, কই আজকাল কেউ তো দোষ দেয় না। বরং গর্ব করে।

কারণ তো একটাই, অনেকেই করছে।

আসলে বোধহয় এই সব যুক্তিতর্কগুলোর কোনও দাম নেই। অনেকেই করছে কিনা সেটাই বড় কথা। সমাজ। সমাজ মানে ইউনিফর্মিটি। ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রয়োজনের টুঁটি টিপে রাখতে চাইছে। ভেঙে বেরিয়ে এলে সে অসহায়। বড়জোর দুটো

টিপ্পনী ছুড়ে দিতে পারে, ঠোঁট টিপে হাসতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

সুকমল খুব বিচলিত বোধ করছিল। ও বললে, একটু বেড়িয়ে আসি।

আর সুকমল বেরিয়ে যাওয়ার পর কল্যাণী তার দাদা-বৌদির কথা নিয়ে ঋতার সঙ্গে হাসাহাসি করতে করতে হঠাৎ জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে, তোর সেই শর্মিষ্ঠা বন্ধু, তারপর আর কিছু বলেনি ?

ঋতা শুধু ঘাড় নেড়ে জানাল, না। কোনও কথা বলল না। মাথা নিচু।

কল্যাণী হেসে হেসে বললে, জিগ্যেস করিস না তাকে ? অন্য কাউকে নিয়েছে কিনা !

ঋতা কোনও জবাব দিল না। ম্লান হেসে বললে, কি হবে মা, জেনে ?

—তবু।

কৌতূহল যে ঋতারও হয়নি তা নয়। কিন্তু জিগ্যেস করতে পারেনি। সেই বিশ্রী ঘটনাটা ও ভুলে থাকতে চায়, শর্মিষ্ঠা হয়তো ভুলে গেছে। মনে পড়িয়ে দিয়ে কি লাভ। জিগ্যেস করতে গেলেই তো ওর মনে পড়ে যাবে।

এমনিতেই একটা চাপা আতঙ্ক আছে ওর মনের মধ্যে। ওরা নাকি যাবার সময় বাবাকে বলে গিয়েছিল, ভেবে দেখতে। আবার আসবে শাসিয়ে গিয়েছিল। 'শাসিয়ে যাওয়া' ছাড়া আর কি। ঋতার তাই মনে হয়। একটা ভয়, আবার না এসে হাজির হয় একদিন। বাবা কি বলতে কি বলে বসবে সেও এক আতঙ্ক।

একজনকে বিদেয় করতে হলেই এত রূঢ় হতে হবে কেন। কেন বলতে হবে, এসব আমাদের পরিবারে চলে না।

ফিরে গিয়ে শর্মিষ্ঠার দাদা শর্মিষ্ঠাকে কি বলেছিল কে জানে।

আর শর্মিষ্ঠা নিশ্চয় মনে মনে বলেছে, জানি জানি, বাইরে তোর এত মড পোশাকআশাক, কথাবার্তায় এত আধুনিক তুই, আসলে তো তোরা ভীষণ ব্যাকডেটেড। গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবার তোদের।

এর চেয়ে বড় গালাগাল, বড় লজ্জা যেন আর নেই। অথচ ঠাকুমা তো কই লজ্জা পেত না। গোঁড়ামি নিয়ে ঠাট্টা করলে অবুঝের মতো তর্ক করত, নিজের বিশ্বাসকেই জোর গলায় জাহির করত। লজ্জা পেত না।

কিন্তু শর্মিষ্ঠাব ওপর সত্যি খুব রেগে গিয়েছিল ঋতা।

পরের দিনই কলেজে গিয়ে প্রথম রাগটা প্রকাশ করে ফেলেছিল বাণীর কাছে। শর্মিষ্ঠা তখনো আসেনি।

দেখা গেল বাণী সবই জানত। ও কুলকুল করে হেসে উঠে বললে, গিয়েছিল ? বাড়িতে রাজি হয়েছে ?

রাগে ফেটে পড়েছিল ঋতা। —তুই জানতিস সব ?

জানবে না কেন। শর্মিষ্ঠা শুধু বলতে বারণ করেছিল।

ঋতার রাগকে ও কোনও পাত্তাই দিল না। শুধু বললে, ওর দাদাটা ফিল্ম ফিল্ম করে একেবারে পাগল।

একটু থেমে বললে, সেই যে আমরা একদিন ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম, মনে আছে ? আড্ডা দিচ্ছিলাম দোতলায় ? সেদিনই তোকে দেখেছিল।

—আমাকে ? ঋতার বিস্মিত প্রশ্ন।

বাণী হেসে উঠে বললে, হ্যাঁ। ওরা তো নীচের ঘরে গল্প করছিল, তুই দেখিসনি। কলেজে এসেছিল তোকেই ভাল করে দেখতে, কথা বলতে।

বলে মিটিমিটি হেসে বললে, তারপর তোকে দেখেই তো চার্মড।

শর্মিষ্ঠা সেদিন আর কলেজেই আসেনি। হয়তো ভয়ে। দাদার কাছ থেকে সব শুনে

বুঝতেই পেরেছিল ঋতা দারুণ রেগে যাবে।

বাণী বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, ওর কি দোষ বল। যার দাদা ছবি করবে বলে ছুটে বেড়াচ্ছে...

শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যেদিন দেখা হল, ঋতার রাগ তখন পড়ে গেছে। বাড়ির পরিবেশটা সহজ হয়ে গিয়েছিল বলেই।

তবু অনুযোগ করেছিল।

শর্মিষ্ঠা ওর হাতখানা ধরে বলেছিল, বিশ্বাস কর, দাদা ঠিকানার জন্যে এমন জেদাজিদি করছিল, না দিয়ে উপায় ছিল না।

বাণী হেসে বলেছিল, তোর মনে নেই ? আমার খাতার পিছনে তোর বাবার নাম আর ঠিকানা লিখে দিয়েছিলি !

ঋতা তখন প্রায় ক্ষমা করে দিয়েছে শর্মিষ্ঠাকে। বরং রাগ বাণীর ওপরেই, ষড়যন্ত্রে সেও অংশ নিয়েছিল বলে।

ঠিক তখনই শর্মিষ্ঠা বলে বসল, বিশ্বাস কর, তোদের বাড়িটা যে এত কনজারভেটিভ জানতাম না।

বুকের মধ্যে গিয়ে লাগল তীরটা। আমরা কনজারভেটিভ ! যারা সিনেমা করে তারা হয়তো ভাবে দেশসুদ্ধ সব মেয়েরাই সিনেমায় নামার জন্যে হন্যে হয়ে আছে। রাজি না হলেই, কনজারভেটিভ।

তাই রেগে গিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, কনজারভেটিভ। কনজারভেটিভই থাকতে চাই। ওই সব বেলেল্লাপনা..

চোখে জল এসে গিয়েছিল, কথা শেষ করতে পারেনি।

শর্মিষ্ঠা থমকে গিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল, আমার দাদাকে তুই চিনিস না। ওর একমাত্র অ্যাম্বিশন একটা ভাল ছবি করা।

—আমি তোর দাদার কথা বলিনি। ঋতা কেটে কেটে উচ্চারণ করেছে, সিনেমার কথা বলেছি। সবাই যা বলে।

ব্যস্। এ নিয়ে আর কোনও কথাবার্তা হয়নি। এই অধ্যায়টুকু মন থেকে মুছে ফেলে দু'জনে আবার সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আবার সেই পুরোনো দিনের মতোই। এখন ওরা তিন বন্ধু সেই তিন বন্ধুই।

কৌতূহল যতই থাক্ সে-সব কথা আর তোলা যায় নাকি !

মামাবাবু চলে যাওয়ার পর ঋতার নিজেরই অবাক লাগছিল। মামাবাবু এবং মামিমা নিজেদের বদলাতে পারেনি বলে বাবা-মাও কত হাসিঠাট্টা করেছে। অথচ তারাই বলে গেল, সুযোগ যখন পেয়েছে, কেন করবে না ? কে প্রাচীনপন্থী আর কে নয়, বাইরে থেকে এতটুকু বোঝা যায় না। এই তো পুণ্য, ওর দাদা, আজকালকার ছেলে, এত মডার্ন, তার নাকি বন্ধুদের কাছে মাথা কাটা যাবে !

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল মাকে।

হেসে হেসে মা বললে, জিগ্যেস করিস না শর্মিষ্ঠাকে, অন্য কাউকে নিয়েছে কিনা ?

ও বলেছে, কি হবে মা, কেন ?

—তবু।

তা হলে মা'র কি এখন আবার গোপনে গোপনে ইচ্ছে হচ্ছে, মেয়ে ফিল্মের হিরোইন হয়ে নাম করবে, টাকা আনবে ? নাকি নির্মলেন্দুকাকুর মেয়ে রিঙ্কুর সঙ্গে পাল্লা দেবে !

একটা ক্ষীণ অনুশোচনা ঋতার মনেও উঁকি দিতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে নির্মলেন্দুকাকুদের বাড়ি থেকে ফেরার পর থেকে। রিঙ্কুকে খুব সুন্দর লাগছিল। কালার

টিভি-তে। রিঙ্কু কিন্তু অত সুন্দর নয়। তবে সত্যি ভাল অভিনয় করতে পারে। একেবারে গ্রামের মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। যখন রেগে গিয়ে খুন করতে গেল লোকটাকে, মনে হচ্ছিল সত্যি ঘটছে, অভিনয় নয়। তবে ও সব তো ডিরেক্টররাই শিখিয়ে দেয়, শুনে এসেছে। সুযোগ পেলে ও নিজেও যে ওই রকম অভিনয় করতে পারবে না, কে বলতে পারে।

করবে না ঠিকই, ইচ্ছে নেই, তবু জানার কৌতূহল ওরও হয়েছিল। অন্য কাউকে কী সিলেক্ট করে ফেলেছে ! নাকি আবার আসবে কোনওদিন। বাপীকে তো সেই কথাই বলে গিয়েছিল। 'সব রেডি হয়ে গেলে আবার আসব, আপনি বরং ভাবার সময় নিন।'

আবার যেদিন আসবে, যদি আসে, নিশ্চয় একটু অশান্তি হবে। দাদার কথা বলা যায় না, ওকেই হয়তো দায়ী করবে, আজেবাজে কথা বলে বসবে। বাপী তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে, আমাদের পরিবারে এ সব চলে না, তবু দাদার ভয় যায়নি। মামাবাবু তো বললেন, পুণ্য গিয়ে বলে এসেছে। উদ্দেশ্য তো একটাই, বাপী যদি রাজি হয়ে পড়ে, মামাবাবু আটকাবেন। ওঁরা তো কনজারভেটিভ, নিশ্চয় পছন্দ করবেন না। উনিই উসকে দেবার চেষ্টা করেছেন সে-কথা শুনলে ভুল ভাঙবে তার।

কি আশ্চর্য ! একটা মেয়ে সিনেমায় নামার সুযোগ পাচ্ছে, করবে কি কববে না, সে নিজে ঠিক করতে পারবে না। শুধু বাবা মা আত্মীয়স্বজনই নয়, পাড়ার লোকও গার্জেন হয়ে বসবে। এর নামই নাকি সমাজ।

অথচ যেই নাম করবে, বিখ্যাত হয়ে উঠবে, তখন এরাই গর্ব করে বলবে, আমাদেরই পাড়ায় থাকে. আলাপও আছে, দু বেলা তো দেখি।

শুধু খ্যাতি অখ্যাতির তফাত। তুমি সফল হলেই সমাজ তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে। যতক্ষণ তা না হচ্ছ, প্রবল বাধা। টীকাটিপ্পনী ! উপহাস। স্ক্যান্ডাল রটানো।

সে জন্যেই তো এত ভয়, এত বাধানিষেধ।

তবে ঋতার কোনও ইচ্ছে নেই, ও-সব করবেও না। মাঝ থেকে এই ঘটনাটা ঘটে গিয়ে পড়াশোনায় তেমন মন বসছে না। না, ভাল রেজাল্ট চাই, দাদার বেলায় স্বপ্ন ছিল জয়েন্টে বসবে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে। পারেনি দাদা। এত ভাল স্কুল, ভাল টিউটর সত্ত্বেও। ঋতা বাবা-মার স্বপ্ন সার্থক করতে পারে কি না দেখবে।

কৌতূহল ঋতারও হয়েছে। কিন্তু শর্মিষ্ঠার কাছে সে-সব কথা আর তোলা যায় না। কি ভাববে ! একবার তাড়িয়ে দিয়ে এখন লোভ হচ্ছে ওর ?

লোভই তো।

মাঝে মাঝে তো স্বপ্ন দেখেছে। ওকেও কালারে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, রিঙ্কুর চেয়েও সুন্দর। দারুণ অভিনয় করছে। কাগজে কাগজে প্রশস্তি, ছবি। বাবা-মার মুখে ওই নির্মলেন্দুকাকু আর সবিতাকাকিমার মতো গর্বের হাসি। একটা নতুন কালার টিভি এসেছে। ঋতার টাকায়। ওইরকম ফ্ল্যাট, গাড়ি। স্বপ্নে তো সবই পাওয়া যেতে পারে। ভাবতে দোষ কি। তারপর নিজের মনেই হেসে ফেলেছে। দূর, আমি অভিনয়ই করতে পারব না। করেছি নাকি কখনো।

কিন্তু সেই ভাগ্যবান মেয়েটি কে ? যাকে ঋতার বদলে সিলেক্ট করেছে !

জিগ্যেস করবে কি করবে না, এই নিয়েই বেশ ক'টা দিন কেটে গেল। সঙ্কোচ এসে মুখ আটকে দিচ্ছে। হয়তো বলে বসবে, তোর এত জানার দরকারটা কি। তুই তো আর করলি না।

ওকে জিগ্যেস করতে হল না।

শর্মিষ্ঠা হঠাৎ একদিন বললে, শোন ঋতা। রাগারাগি করিস না। দাদাটা একেবারে

পাগল, তুই তো জানিস। টাকাপয়সা জোগাড় করে ফেলেছে, সব রেডি।

—সত্যি ? ঋতার মুখ থেকে কথাটা এমন ভাবে বেরোল যেন তার সাফল্যে ওর নিজেরও খুব আগ্রহ।

শর্মিষ্ঠা বললে, আবার যাবে। বারণ করেছি তবু শুনছে না, কি যে দেখেছে তোর মধ্যে সেই জানে।

চুপ কবল। ঋতার ভেতরটা তখন থরথর করে কাঁপছে। ভয়ে না লজ্জায় ! না কি কোনও গোপন ইচ্ছা ! ও কি সত্যি কোনও স্বপ্ন দেখছিল ?

শর্মিষ্ঠা অনুনয়ে হঠাৎ ওর হাতটা ধরল।—শোন ঋতা, অপমান-টপমান যেন না করেন তোর বাবা, সে তো আমারই অপমান ! তুই যে করবি না শুধু সেইটুকু বলতে বলবি। কেমন !

প্রায় কান্নার স্বরে বললে, মাঝ থেকে তোদের কাছে আমি দোষী হয়ে গেলাম। আমি কি করি বল তো।

॥পাঁচ ॥

সুকমল একটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছে। কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। এ যেন নিজেব সঙ্গেই নিজের যুদ্ধ করা। এ সময়ে দায়িত্বটা অন্য কেউ নিয়ে নিলে বেঁচে যেত ও।

অফিসে এসে চুপচাপ চেয়ারে বসে রইল, কাউকে ডেকে দুটো কথাও বলতে ইচ্ছে হল না। দু'চারটে উচ্চস্বর শব্দ কানে আসতে ফিরে তাকাল রতনের দিকে। যথারীতি ওর সামনে যে ভদ্রলোক অনুনয়ের ভঙ্গিতে বসে আছে রতন তাকে নিজস্ব মেজাজে কড়া কড়া কথা বলছে। এসব এখন গা সওয়া হয়ে গেছে ওর, সহ্য করে। কিছু বলতে যাওয়া মানে তো অপমানিত হওয়া। এরা আজকাল কেউ কারো কথা শোনে না। অধস্তন শুধু নামেই, বরং সুকমলেরই কখনো কখনো মনে হয় রতনই ওর ওপরওয়ালা। ওকে একা দোষ দিয়ে লাভ কি, ওরা সবাই। বাইরের যে কোনও লোক এলেই ভাবটা এমন দেখায় যেন সে লোকটা ওর প্রজা। ওদের দেখে দেখে সুকমলের কখনো কখনো মনে হয় ও নিজেও বুঝি ওদের মতোই হয়ে গেছে। দু'একসময় নিজেও ও অভদ্র ব্যবহার করে ফেলে।

এই বতনের বয়েসী লোকগুলোর একমাত্র আনন্দ যেন লোককে কষ্ট দেওয়া। দেখবে সামনে কোনও লোক আর্জি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, না তাকিয়ে অন্যের সঙ্গে গল্পগুজব করবে, ডেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে খিঁচিয়ে উঠে জিগ্যেস করবে কি চাই, তারপর স্রেফ বলে দেবে দিনকয়েক পরে আসুন, কিংবা এখন হবে না এখন হবে না, টিফিনের পর।

ঠায় দেড ঘণ্টা সে ভদ্রলক দরজার বাইরে পায়চারি করে টিফিনের সময়টা পার করার জন্যে, কিংবা সাতদিন পরে এলে, সি ফর্মটা আনেননি ? কি কি চাই একসঙ্গে বলে দেবে না। বলে বসবে, সে-সব কি আমার কাজ !

কেন করে তাও সুকমলের জানা হয়ে গেছে। ব্যবসা-ট্যাবসা করে কেউ হয়তো দু'পয়সা রোজগার করার চেষ্টা করছে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, সেটাই ঘোর অপরাধ। না, ও ঘুস নেয় না তা জানে সুকমল। আসলে কমপ্লেক্স। এদের সকলেরই ধারণা নির্মলেন্দুর মতো বড় ফ্ল্যাটে থাকার কথা, এয়ারকন্ডিশনড চেমবারে বসার যোগ্যতা আছে, দুর্ভাগ্য তাকে এখানে বসিয়ে রেখেছে। বাইরে থেকে যে আসে সেই যেন অনেক উঁচুতে বসে আছে।

অতএব এখানে অন্তত ক্ষমতা দেখিয়ে নাও। একটা কথা বললে যদি কারো উপকার হয়ে যায়, সেটুকুও করে না। রতন কেন, সকলেই। আমাদের সকলেরই চরিত্র এটা। মানুষকে কষ্ট দাও।

অথচ নিজেদের মধ্যে যখন গল্পগুজব করি, তখন সবাই কত ভদ্র। কত বিনয়ী। কত উপকারী। কার ছেলের ভর্তি ঠেকে গেছে, কার স্ত্রীর জন্যে হাসপাতালে বেড চাই, কার র‍্যাশন কার্ড করিয়ে দিতে হবে ; অনেকগুলো হাত এগিয়ে আসে।

মানুষগুলোকে চেনা যায় না, চেনা যায় না। চেয়ারে বসলেই অন্যরকম হয়ে যায়।

চুপচাপ বসে ছিল সুকমল, কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। রতন চেঁচাচ্ছে, যেন ধমক দিচ্ছে লোকটাকে। অথচ ওই লোকটা নিজেই হয়তো মালিক, কিংবা কর্মচারী হলেও হয়তো রতনের তিন ধাপ ওপরে।

অপমানও গায়ে মাখে না রতন, অপমানের বোধটাই নেই। দু'একবার তো দেখেছে, রাগারাগি করে লোকটা ওই সুইংডোর ঠেলে চলে গেছে বড় সাহেবের কাছে, বড় সাহেব সুকমলকে ডেকে বলেছেন, এক্ষুনি করে দিন।

মুখ বুজে রতনই করে দিয়েছে। আমতা আমতা করে লোকটাকে বলেছে, আমি তো বললাম, একটু দাঁড়ান করে দিচ্ছি।

লাজ লজ্জাও নেই, দিব্যি মিথ্যে কথাটা ওই লোকটাকেই বলল।

এর নাম কাজ। আপিসের কাজ।

কত সম্মান। আজকাল মেয়েরাও তো করছে, এই ঘরেই সাত আটজন। তার জন্যে এখন হয়তো তাদের কোনও অসম্মান সহ্য করতে হয় না। কে জানে।

নাঃ, দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে। হয়তো সিনেমা টিভি নিয়েও আজকাল আর কেউ আপত্তি করে না। এখন টাকাটাই আসল। কিংবা টাকা আর খ্যাতি।

সত্যি কি তাই, নাকি সুকমল নিজেই পিছিয়ে পড়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। সেজন্যেই এত যন্ত্রণা।

সকালে দাড়ি কামাচ্ছিল। খবরের কাগজে তখনো চোখ বোলায়নি।

ঋতা হঠাৎ চিৎকার করে ডাকল, মা মা দেখে যাও।

কল্যাণী তখন সাবান তোয়ালে এনে রাখছে বাথরুমে। সুকমলের স্নানের জন্যে।

সুকমল বললে, কি হল কি ?

—রিঙ্কুর ছবি। ব'লে হাসল ঋতা।

কল্যাণীও কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

হ্যাঁ, রিঙ্কুরই।

ঋতা খবরটা পড়তে শুরু করেছে। সামান্য কয়েক লাইনের খবর। ছবিটাও ছোট্টই। তবু তো ছাপা হয়েছে। আজকাল এসবই ছাপা হয়। এসবেরই দাম। সুকমলদের স্কুলের হেডমাস্টার নিজে স্কুল করেছিলেন, তিরিশ বছর আদর্শ মাস্টারমশাই হয়ে মারা গেলেন, কি একটা সরকারি সম্মানও পেয়েছিলেন ; সুকমলরা চেষ্টা করেও তাঁর ছবি ছাপাতে পারেনি।

রাংতা আজকাল রুপোর চেয়ে দামি হয়ে গেছে, পান মুড়ত সেই সোনালি তবক সোনার চেয়ে দামি।

খবরটা পড়ে শোনাল ঋতা। একটা কি নতুন ছবির মহরত। রিঙ্কুই নায়িকা।

কল্যাণী বললে, ও কিন্তু বলেছিল। বলল না, আর একটার তো কথা হচ্ছে। বোধহয় সেটাই।

কল্যাণী আর ঋতা দু'জনেই খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সুকমল লক্ষ করল,

মুহূর্তের মধ্যে ওদের দু'জনের মুখ থেকেই হাসি সরে গেল। কেমন যেন বিষণ্ণ। নাকি সুকমলেরই মনের ভুল।

রতন এখনো লোকটার সঙ্গে তর্ক করছে। করুক। কিছু বলতে গেলে তো সুকমলের সম্মান রাখবে না। এরা শুধু বড় সাহেবকে খাতির করে, তাও ট্র্যান্সফারের ভয়ে।

—দিবাকর উঠে এল, এসে সামনের চেয়ারটায় বসল।

—কি ব্যাপার কি, আজ এত চুপচাপ কেন!

—এমনি।

কাগজে রিঙ্কুর ছবি ছাপা হওয়ার কথাটা বলবে কি বলবে না একবার ভাবল।

ওরা কেউ নিজেরাই লক্ষ করেছে কিনা তাও জানে না। তবে টিভি সিরিয়ালটা অনেকেই দেখছে। অনেকেই প্রশংসা করছে।

রতন একদিন এসে বললে, জমিয়ে দিয়েছে সুকমলদা। নির্মলেন্দুবাবুর মেয়ে যে এত ভাল অভিনয় করতে পারে, কই কোনওদিন তো বলেননি। যখন এখানে ছিলেন উনি, একেবারে চেপে রেখেছিলেন।

ছাই অভিনয়। ওসব তো ডিরেক্টররা শিখিয়ে দেয়। আগে করত না তাও সুকমল জানে। করলে নির্ঘাত টিকিট কিংবা কার্ড দিত, জোর করে নিয়ে যেত। স্কুলে 'নটীর পূজা' দেখতে নিয়ে গিয়েছিল জোর করে।

আরে বাবা, সে রকম সুযোগ আমার মেয়েও পেয়েছিল, করতে দিলে সেও হয়তো রিঙ্কুর চেয়েও ভাল করত। মেক-আপ টেক-আপ নিয়ে কালারে ঋতাকেও কম সুন্দর দেখাবে না। ওসব ফলস্। এখন তো ফলসেরই দাম। চুল না থাকলে নাকি উইগ পরে। ঋতাই বলেছিল। লাবণ্য শ্রী এসবের এখন আর দাম নেই। আগে মা-দুর্গার প্রতিমার মুখে ঘাম তেল লাগাত, এখনো হয়তো লাগায়। আর আজকাল মেয়েরা মুখ চকচকে করার জন্যে কী যেন মাখে। নামটাও ভুলে গেছে।

ঋতার মুখে লাবণ্য আছে, বেশ একটা আলগা শ্রী আছে। অনেকেই বলেছে, ও মেয়ের বিয়ে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

অর্থাৎ যেটা ভাবার কথা সেটুকুই ভাব। টাকার কথা। মেয়ে সুন্দরী বলে বিনাপয়সায় তো আর বিয়ে হবে না। জমাচ্ছে, জমিয়ে আসছে।

কল্যাণীর হাতিবাগানের দাদার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। অকারণ প্রশ্রয় দিচ্ছিল ঋতাকে। ওর মাথাতেও ঢুকিয়ে দিয়েছে কিনা জানে না।

সুকমল বিব্রত হয়ে বলেছিল, সিনেমাটিনেমা করলে মেয়ের বিয়ে দিতে পারব? সমাজ এখনো বদলায়নি। বুঝলেন। বদলাবে না।

হাতিবাগানের দাদা হেসে উঠেছে। বলেছে, তুমি যদি কেরানি কিংবা ইস্কুলমাস্টার খোঁজ, তা হ'লে পাবে না।

আর কল্যাণী বলে উঠেছে, সে-কথা বল না। রিঙ্কুর কি বিয়ে হবে না? দেখবে, কল্পনাও করতে পারছ না এমন ভাল পাত্র..

বৌদি হেসেছে। —হয়তো নিজেই ভাবভালবাসা করে কত ভাল বিয়ে করে বসবে।

সকলেই ভাগ্যের লাইনে চলে যায়। কপালে থাকলে কত কী তো হতে পারে। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ, ভদ্রলোক পরিবার, সে তো পাতা রেললাইন ধরেই চলতে চায়।

হাতিবাগানের দাদা বললে, আমি কি ঋতাকে ফিলিমস্টার বানাতে বলছি। দু একটা করবে, একটু নাম হবে, টাকাও। ব্যস্, তারপর ছেড়ে দিক না। আর যদি সত্যি খুব রমরম্ নাম হয়ে যায়..

দিবাকর এসে বসেছে সামনের চেয়ারটায়। বলছে, কি ব্যাপার কি, আজ একেবারে

চুপচাপ কেন !

আসলে সুকমল একটা দ্বিধার মধ্যে পড়েছে। ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না। দিবাকরকে বলা চলে কিনা তাও ভেবে পাচ্ছে না। হয়তো বিশ্বাসই করবে না। নির্মলেন্দুরা বিশ্বাস করেনি বলেই তো মনে হয়েছিল।

বলতে পারল না। বললে, নাঃ এমনি।

ভাবল, যদি বলে ফেলে, আর বিশ্বাস না করে, তখন ওর কথাটা যে সত্যি তা প্রমাণ করার জন্যেই ওকে রাজি হতে হবে। কিন্তু সুকমল রাজি নয়। কিছুতেই নয়।

কল্যাণীর হাতিবাগানের দাদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সেজন্যেই এত সব কথা ভাবতে পারছে না। আমাদের পরিবারে কি সম্ভব নাকি !

লোভ যে না হচ্ছে তা নয়। সুকমলও মানুষ। তবে একেবারে সাধারণ মানুষ। কোনওদিক থেকেই কোনও বিশেষত্ব নেই। মোটামুটি একটা ভাল চাকরি করে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে চেষ্টা করছে। ও নিজে কোনওদিন নির্মলেন্দু হতে পারবে না তা জানে। ওই রকম একটা রিস্ক নেয়ার সাহসই নেই। আর আলাপ-পরিচয়ের পরিধিও এত কম, ওপরমহলে তো বিশেষ চেনাজানা নেই, কে করে দেবে। পেনশনটাই ভবিষ্যৎ।

লোভ একটাই। হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়াবার। তখন সবাই ওদের দিকে তাকাবে। হয়তো একটা ফ্ল্যাটও হবে, গাড়ি। আমার নিজের জন্যে দরকার নেই। কিন্তু ঋতার তো ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে।

সত্যি কি অনেক টাকা পায় ? রিঙ্কুকে জিগ্যেস করা হয়নি। জিগ্যেস করতে বাধো বাধো ঠেকেছিল। ভেবে বসত টাকার লোভেই ঋতাকে সিনেমা করতে দেব কিনা ভাবছি।

রিঙ্কু নিশ্চয়ই টাকাপয়সার জন্যে করছে না। ও এক ধরনের স্ট্যাটাস। নির্মলেন্দুর। এত ওপরে উঠে গেছে যে কাদা ছুড়লেও ওদেব গায়ে লাগছে না। বরং যে ছুড়বে তারই গায়ে এসে পড়বে। মুশকিল হয়েছে আমাদেরই। আমরা তো দোতলার বেশি ওপরে উঠতে পারি না। ওখান পর্যন্ত কাদা পৌঁছয়, তারপর আর পৌঁছয় না। ফিরে আসে।

লিফটে যখন উঠছিল সোঁ-ও-ও করে উঠে গেল। কত তলা বোঝারই উপায় ছিল না। সামনে দরজার মাথায় তাকালে জানা যেত। নম্বর বদলাচ্ছে, কত তলা জানা যাচ্ছে। তখন লক্ষ করেনি। নম্বরটা দেখে নিয়েই লিফটম্যান এসে থেমেছিল, দরজাটা দেখিয়ে দিয়েছিল। অত উঁচুতে ঢিলপাটকেল কাদা কিছুই পৌঁছয় না। এটাই ওদের সুবিধে।

—আচ্ছা দিবাকর, এই যে নতুন যারা সিনেমাটিনেমায় নামে, ওই ধরো নির্মলেন্দু, ওরা টাকাকড়ি কি রকম পায়, জানো ? ধরো টিভিতে করছে...

দিবাকর হাসল। বললে, টাকা তো আজকাল এসবেই। জানি না, প্রথম প্রথম হয়তো বেশি পায় না, তবে...

কিছুই জানা গেল না। জানার প্রয়োজনই বা কি।

অফিস থেকে ফিরে আসতেই কল্যাণী বললে, স্নান করে এসো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—বলই না।

—না, মাথা ঠাণ্ডা করে এসো।

অগত্যা পোশাক বদলে স্নান করতে চলে গেল।

ফিরে এসে সেই ক্যাম্বিশের হেলানো চেয়ারটা নামিয়ে গা এলিয়ে বসল সুকমল।

মাছের চপ বানিয়েছে কল্যাণী। কাজের মেয়ে করুণার হাত থেকে নিয়ে সামনে রাখল।

সুকমল মুখ তুলে দেখল, করুণার মুখ থমথম।

বুঝল না। জিগ্যেস করল, ওর আবার কি হল ?

করুণা চলে গেল। আর কল্যাণী বললে, বকুনি খেয়েছে।

—ও।

কল্যাণী বলে উঠল, 'ও' নয়। একটা কাণ্ড করে বসেছে করুণা।

অবাক হয়ে তাকাল সুকমল।

কল্যাণী বেশ রাগের সঙ্গে বললে, আমি তখনই বুঝেছিলাম। দাদার তো কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, ওর সামনেই সেদিন ঋতাকে বলেছে কেন সিনেমা করবি না কেন !

একটু থেমে বললে, ঋতা তো চটে লাল।

কত সামান্য ব্যাপার, তা থেকে যে এতখানি ছড়িয়ে যাবে ভাবেনি ঋতাও।

ও যেমন কলেজ যাচ্ছে, কলেজ থেকে আসছে, সে-ভাবেই চলছিল।

সেই ছোট বয়েস থেকে এই বাড়িতে। এই পাড়ায়। সকলেই চেনে, সকলের সঙ্গেই কিছু না কিছু আলাপ। পাড়ার কয়েকটা সমবয়েসী মেয়ের সঙ্গেও বন্ধুত্ব। যেতে আসতে দেখা হলে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দু'চারটে কথাও বলে।

এক একদিন খুব সেজেগুজে কলেজে যায় ও, শর্মিষ্ঠা আর বাণীর সঙ্গে আগের দিন থেকে পরামর্শ করে। —এই চল কাল খুব সেজে আসব।

এক ধরনের মজা। তুই কি পরবি বল, আমি দেখি যদি মা'র ঢাকাইটা দেয়। না রে তিনজনই ব্যাগি পরে, উঁহু, জীনস্ টি-শার্ট, ধোতি-কুর্তা তো ঋতার নেই।

সারাদিন খুব হৈ হৈ করে ফিরছিল, আনন্দের রেশটা ঠোঁটে লেগে আছে, ক্লান্ত একটু, কাঁধ থেকে লম্বা সাদা স্ট্র্যাপে কোমরের নীচে এসে ঝুলছে দুধ-সাদা ব্যাগটা, ফোম-লেদারের, হাত দিলে বেশ আরাম আরাম লাগে, ঋতা ধীর পায়ে ফিরছিল।

একটা বাড়ির সামনে ফুচকাওয়ালা, পাড়ার দু'তিনটি মেয়ে, ওরই বয়েসী, হাতে শালপাতার ঠোঙা ধরে ফুচকা খাচ্ছে আর হাসাহাসি করছে। ওরাই ডেকে এনেছে হয়তো, কাছেপিঠে কোথাও বসে না। দেখে ঋতারও একটু ইচ্ছে হল, চেনা মেয়ে দুটির মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর ভাবলে না থাক, কলেজ থেকে তিন বন্ধু একসঙ্গে বেরিয়ে একটা ঘাম-জ্যাবজেবে রেস্টুরেন্টে ফাউল কাটলেট খেয়েছে।

মিনু আর সুধার সঙ্গে চোখ চাওয়াচাওয়ি হল, ঈষৎ হাসল ঋতা, আজকাল বড় একটা দেখা হয় না, কথা হয় না।

ও চলে আসছে, হঠাৎ দুজনেই, এই ঋতাদি, এই ঋতাদি, একটু দাঁড়াও না।

হাতের শালপাতা ফেলে ছুটতে ছুটতে এল।

হাসতে হাসতে কাছে এসে বললে, ঋতাদি, তুমি সত্যি সিনেমা করছ ?

উত্তর শোনার আর অপেক্ষা নেই। মিনু বললে, আঃ কি দারুণ হবে ঋতাদি, একটাও ফিল্ম স্টার দেখিনি, যা ওই ছবিতে..

সুধা বললে, পাশ দিতে হবে কিন্তু।

একটু থেমে বললে, এ পাড়াতেই থাকবে তো ? নাকি ভাল কোথাও উঠে যাবে ?

মিনু অনুনয় করল, যেও না ঋতাদি।

ঋতার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অবাক হয়ে কেবল তাকাচ্ছে ওদের মুখের দিকে। কোথাও কিছু নেই, এরা শুনলই বা কোথায়, পাগলের কাণ্ড, বিশ্বাস করে বসে আছে, যেন সত্যি শুটিং করে ফিরছে।

এক মুহূর্ত ভেবে নিল কে হতে পারে। হাতিবাগানের মামাবাবু কি যাবার সময় এই

গলিতে মামিমার সঙ্গে গল্প করতে করতে গেছে ? আস্তে কথা বলতে তো জানে না, কথা বলতে হলেই চেঁচিয়ে বলতে হয়। সাধে কি বাবা হাতিবাগান বলে ঠাট্টা করে ! ঠাট্টা করার অবশ্য কিছু নেই, এই ভবানীপুরও মরে হেজে হাতিবাগানই হয়ে উঠছে।

ঋতা অবাক হয়ে তখনো ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে। এক পলকের জন্যে মনে হল, শর্মিষ্ঠার দাদা নয় তো ! পাড়ার কারো সঙ্গে চেনাটেনা আছে নাকি। কিংবা আগেই এসে হাজির হয়নি তো !

শর্মিষ্ঠা অবশ্য বলেছে, দেখিস, দাদাকে যেন অপমান-টপমান না করেন, আমারই তো দাদা...

কেন আমরা কি ভদ্রলোক নই। ভদ্রতা জানি না। যা বলার বলে দেবে বাবা, অভদ্রতা করবে কেন। একটু খারাপ লেগেছিল ঋতার।

কিন্তু তার কাছ থেকেই যদি এরা খবর পেয়ে থাকে, তাও মিথ্যে খবর, তা হলে গলা ধাক্কা দেওয়াই উচিত।

রেগে গিয়ে বললে, কি সব আজেবাজে বলছিস ! সিনেমা ?

—সত্যি নয় ? মিনু আর সুধা কেমন যেন হতাশ হল। তারপরই অবিশ্বাস, হেসে উঠে বললে, চেপে যাচ্ছ ঋতাদি, আমাদেব অন্তত বল...

এবারে রেগে ঋতা বলে, কে বলেছে তোদের, বল। কার কাছে শুনেছিস ?

সুধার হাত চেপে ধরল। একটা চড় মারার ইচ্ছে হচ্ছিল, মারা যায় না।

সুধা কাঁদো কাঁদো ভাবে বললে, তবে যে ওই উনিশ নম্বরের মেজবৌদি বলল, তোমাদের করুণা নাকি বলেছে...

—করুণা ? রাগে সারা শরীর জ্বলে উঠল। —দাঁড়া দেখাচ্ছি। হাত ছেড়ে দিয়ে হনহন করে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সুধা বলে, বল না ঋতাদি, আমরা বলেছি বল না। করুণা নাকি বলতে বারণ করেছিল...

ঋতার তখন শোনার সময় নেই, শোনার মেজাজ নেই।

বাড়ি ঢুকে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মার কাছে কথা বলতে পারেনি। কেঁদে ফেলেছে। চোখে জল।

—তোমার করুণা আমায় পাড়ায় থাকতে দেবে না।

বকুনিটা সেজন্যেই।

করুণার হাত থেকে খাবার নিয়ে কল্যাণী নামিয়ে দিতেই তার মুখের দিকে তাকাল সুকমল, দেখল করুণার মুখ থমথম করছে।

কল্যাণীর কাছে সব শুনল সুকমল। শুনে অসহায়ের মতো বললে, কি ঝঞ্ঝাট বল তো। কোথাও কিছু নেই, রাতারাতি আমরা কি সিনেমার বাড়ি হয়ে গেলাম নাকি।

কল্যাণী বলল, তাও যদি সত্যি সত্যি করত, বুঝতাম।

একটু থেমে বললে, আমরা করতে দিইনি কেউ বিশ্বাসই করবে না। এরপর সবাই বলবে, চেষ্টা করেছিল, নেয়নি।

—বলুক। সুকমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

খবরের কাগজটা টেনে নিল। সকালে তাড়াহুড়োয় ভাল করে দেখা হয়নি।

কল্যাণীকে বললে, কই দেখি সেই রিঙ্কুর ছবিটা।

ওটা আলাদা করে তুলে রাখা আছে। হাজার হোক আমাদেরই চেনা একজন। একসময় তো ঘরের লোক মনে হত। আমাদের নির্মলেন্দুর মেয়ে। রিঙ্কু।

সুকমলের নিজেকে বড় অসহায় লাগছে, অক্ষম লাগছে। ওর মনের ভেতরটা কত

পরিষ্কার ছিল, পরিচ্ছন্ন ছিল। একটা তুচ্ছ ঘটনা থেকে ক্রমশ বুকের ভিতরটা যেন জটিল হয়ে উঠছে। নিজেকে নিজেই বুঝতে পারছে না।

একটা ক্ষীণ অপমানবোধ লুকিয়ে আছে। অপমানই তো।

অথচ সেদিন বুকের ভেতরটা কত হাল্কা লাগছিল। কেটে কেটে দৃঢ় গলায় বলেছিল, আমাদের পরিবারে এসব চলে না!

লম্বা জুলপি ছোকরাটা কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। —দেখবেন, এ ছবি প্রাইজ পাবেই। আমি এমন একটা ছবি করতে চাই, ওই সব বাজে কমার্শিয়াল ছবি নয়..

লম্বা জুলপিব জন্যেই ছেলেটিকে খারাপ লেগেছিল কি? ওটা তো এক ধরনের পোশাক। কেটে দিলেই থাকবে না। তখনো তো মানুষটা একই। তখন তো খারাপ লাগত না।

ওই চওড়া বেল্টের জন্যে? নাকি বাকলস-এর গোল চাকতিটা?

ছেলেটার মধ্যে কিন্তু একটা ভাল কিছু করার উত্তেজনা ছিল। একটা দারুণ কিছু করে ফেলার। চোখ দুটো যেন স্বপ্ন দেখছে।

কলেজে পড়ার সময় সুকমলের মধ্যেও এই রকম একটা উত্তেজনা ছিল। চোখে স্বপ্ন লেগে থাকত। তখন দল বেঁধে সব পলিটিক্স করত। নিজেদের রীতিমতো পাওয়ারফুল মনে হত। দুটো মুঠোর মধ্যে যেন অসীম শক্তি। যা খুশি করে ফেলার। ভাবত, সমাজটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, বদলে দেবে। একটা নতুন সমাজ গড়ে তুলবে। ধুস। সে-সব কোথায় মিলিয়ে গেছে।

তবু ওই উত্তেজনাব জন্যেই ছোকরাকে ভাল লাগছে। খারাপ ভাবছে কেন তাকে! এই বয়েসে ও তো হেরোইন খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকতে পারত। পলিটিক্সের নামে খুন করে বেড়াতে পাবত। আজকাল কত সব গুরুদেব টুরুদেব হয়েছে, তাদের দলে ভিড়ে গিয়ে নিজেকে ঠকাতে পারতো। কত বাচ্চা বাচ্চা ছেলে তো যায়।

এ সব না করে স্রেফ একটা ভাল ছবি করবে স্বপ্ন দেখছে। অন্যায় তো কিছু করেনি। কান, বার্লিন, ভেনিস কি সব বলছিল। ও-সব কাগজ পড়ে সুকমলও কিছু কিছু জানে।

কিন্তু ছেলেটা, ওই শর্মিষ্ঠার দাদা না কি যেন, ঋতার বন্ধুর দাদা, সে যে সুকমলকে এভাবে অপমান করবে, তাচ্ছিল্য দেখাবে ভাবতে পারেনি। নিশ্চয়, এও এক ধরনের অপমানই।

অপমান নয়!

যাবার সময় বলেছিল, হাসতে হাসতেই বলেছিল, এখনই ফাইনাল কিছু বলতে হবে না, আপনি একটু ভাবুন, আমাদেরও তো জোগাড়যন্তর করতে একটু সময় লাগবে...

সঙ্গের লোকটা বলেছিল, সব রেডি হলে আবার আসব।

কিন্তু তারপর তো আর এল না। কেন এল না?

সুকমল নিজের মনেই হাসল। অকারণ চটে যাচ্ছে ওদের ওপর। আসলে হয়তো টাকা জোগাড় করে উঠতেই পারেনি। টাকা আজকাল গাভমেন্টও দেয় শুনেছি। সে বোধহয় আদায় করা বেশ কঠিন।

কিন্তু যদি না আসে, ঋতার বদলে অন্য কাউকে সিলেক্ট করে...

ঋতাকে সিলেক্ট করেছে এ-কথা শুনে সেদিন খুব রাগ হয়েছিল। তুমি সিলেক্ট করার কে হে।

রাগটা এখন বুঝতে পারছে অকারণ। ওদের দিক থেকে সিলেক্ট করার একটা ব্যাপার

আছেই। আমি করতে দেব কি না দেব সে আমার ব্যাপার।

কিন্তু সত্যি কি আর আসবে না!

—শোনো। একটা কথা বলি, ঠাণ্ডা মাথায় শোনো। তুমি মাথা গরম করো না।

কল্যাণী বলল।

বলে চুপ করে রইল। কি ভাবে বলবে যেন ভাবছে।

একটু কাছে এগিয়ে এসে বসল খাটের বাজুর পাশে।

বললে, ওরা আসবে একদিন।

—কারা ?

কল্যাণী হেসে হেসে বললে, সেই শর্মিষ্ঠার দাদা।

একটু থেমে। —যা বলার বল, কিন্তু...

থামল আবার।

বললে, শর্মিষ্ঠা ঋতাকে বলেছে, ওরই তো দাদা, একটা বদ্ধ পাগল, যেন অভদ্রতা করো না। অপমান করলে বেচারার...

—আমি কি রতন নাকি! চিৎকার করে উঠল সুকমল।

কল্যাণী স্বামীর রাগ দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন কিছু আপত্তিকর কথা তো ও বলেনি।

অফিসের রতনকে কল্যাণী কোনওদিন চোখেও দেখেনি। তাছাড়া সুকমল ওর কাছে অফিসের কথা কদাচিৎ বলে। রতনের নাম শুনেছে দু' একবার। শুধু জেনেছে, যে কেউ বাইরের লোক ওর কাছে কাজে এলে অভদ্রতা করে। ইচ্ছে করে তাকে অপদস্থ করে, বার বার ঘোরায়, দাঁড় করিয়ে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরে একদিন বলেও ছিল, রতনটা একেবারে ছোটলোক।

সেই রতনের কথাই যে বলছে কল্যাণী প্রথমে বুঝতে পারেনি।

রাগ কমিয়ে সুকমল বললে, আমি তো ভদ্রলোক, না কি ?

ঋতা এসে অনুনয়ের স্বরে মাকে যা বলেছিল সেইটুকুই সুকমলকে জানিয়ে দিতে চাইল কল্যাণী। এত রেগে যাবার কি আছে।

কল্যাণী অনুযোগের স্বরে বললে, প্রথম যেদিন এসেছিল, তুমি তো চা দিতেও বলনি।

—দিলেই তো পারতে। আমি কি নিষেধ করেছিলাম।

কল্যাণী চুপ করে রইল। —এবার দেব।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ সুকমল বলল, ঋতা কি বলছে। ভদ্রতার কথা আসছে কেন, ও কি করতে চায় নাকি।

কল্যাণী বললে, জানি না। কিছু তো বলেনি। তারপর হেসে ফেলে বললে, করলেও এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না। কটা দিনের তো কথা, কয়েক ঘণ্টা করে।

একটু থেমে বললে, ওর পরীক্ষার এখনো অনেক দেরি।

সুকমল চুপ করে রইল।

খবরটা শুনে থেকে ওর মনের মধ্যে যে অপমানবোধ লাগছিল সেটা সরে গেছে। শুধুই অপমানবোধ কিনা তাও বুঝতে পারছে না।

কিন্তু যাবার সময় দিব্যি অনুনয় বিনয় করে গিয়েছিল ওরা দু'জন। চওড়া বেল্ট কোমরে, বাক্‌লসটার মাথায় ইয়াব্বড়ো ড্রাগনের ছবি না কি যেন। বিলিতি বোধহয়। জুলপি আর ওটার জন্যেই ছোকরাকে, ছোকরা কেন ভাবছে বার বার, রীতিমতো ভদ্রলোক, ব্যবহারে অন্তত। রতনের তুলনায় দিব্যি কালচার্ড। অথচ দু'জনেরই কাছাকাছি বয়েস। যাবার সময় বলে গেল, আপনি একটু সময় নিয়ে ভাবুন, আবার

আসব।

এতদিন আসেনি বলেই খারাপ লাগছিল। না আসা মানে যেন অভদ্রভাবে বলা, যান যান মশাই, আপনার মেয়ে আমার ছবিতে নায়িকা হবার যোগ্যই নয়। আরো অনেক ভাল পেয়েছি। নিউ ফেস না কি যেন বলেছিল। 'ছবিতে আমরা একটা নিউ ফেস্ দিতে চাই।' তখন প্রচণ্ড রেগে ছিল, মানে বোঝেনি, বুঝতে চায়ওনি।

একটা নতুন মুখ। অর্থাৎ যারা নিয়মিত অভিনয় করছে তাদের নিতে চায় না। 'আমার ছবির গল্পটা খুবই সিরিয়স, ওসব বাঁধাধরা অভিনেত্রী চলবে না।'

যাক্, আসবে তা হলে। না এলে মনে হত উপেক্ষা করছে। আমি করতে দেব কি না দেব সে আমাদের ব্যাপার, তুমি উপেক্ষা করার কে। আমার মেয়েও কিছু ফ্যালনা নয়। অত্যন্ত রিজার্ভড টাইপের মেয়ে। হ্যা হ্যা হো হো করে যারা বেড়ায়, যারা তোমাদের কাছে ছুটে যায়, তাদের উপেক্ষা করতে পারো।

বুকের মধ্যে সেজন্যেই একটা যন্ত্রণা ছিল। বোধহয় চাপা রাগও।

—ওরা আবার আসবে বলেছে। হাসি হাসি মুখে কল্যাণী বলল।

ওরা ? মানে বুঝতে পারেনি প্রথমে।

বিশদ বলার পর বুকের ওপর থেকে ভারী পাথরটা নেমে গেল। নাঃ, এখন আর উপেক্ষা মনে হচ্ছে না, অপমান মনে হচ্ছে না।

এখন সবকিছু আমার হাতের মুঠোয়, সুকমল ভাবল, আমি ইচ্ছে করলেই হ্যাঁ বা না যা খুশি বলতে পারি।

নির্মলেন্দুদের বাড়ি থেকে ফেরার সময় ট্যাক্সিতে ঋতা হঠাৎ বলেছিল, দেখলে মা, ওরা বিশ্বাসই করল না।

ঋতার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল সুকমল। বিষণ্ণ আর ফ্যাকাশে। সামান্য একটু গর্ব করার মতো ব্যাপার। নিজেরা রিঙ্কুর জন্যে গর্ব এতই মশগুল যে সেটুকু দিতেও কৃপণতা। ঋতার সেটুকু আনন্দও কেড়ে নিয়েছিল।

কিন্তু করে আসবে, কখন আসবে বলেনি কেন। বলে দিলে সে-সময় ঠিকই থাকত বাড়িতে। এ এক যন্ত্রণা। দরকার থাকলেও বেরোতে পারে না, দেরি করে ফিরতে পারে না। যদি আসে, এসে চলে যায়।

তার জন্যে এত উদগ্রীব কেন সুকমল। মনঃস্থির করতে পারছে না বলে।

-এই করুণা, দেখ তো কে এসেছে। কল্যাণী বলল দোতলা থেকে।

এ ক'টা দিন সব সময়েই কলিং বেল-এর দিকে কান।

পুণ্য ফিরল। ঋতা কিংবা পুণ্য বাড়ি ফিরলে বেশ ভাল লাগে। ওরা না থাকলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা। কথাবার্তা কিই বা হয়, কিছুই না, যে যার নিজের ঘরে কিংবা যা কথাবার্তা কল্যাণীর সঙ্গে। তবে ভাল লাগে। বাড়িতেই তো আছে। বাড়ি মানে তো শুধু চারটে দেয়াল নয়, সকলকে নিয়ে বাড়ি।

সুকমল নিজের মনেই হাসল। পুণ্য নাকি কল্যাণীর হাতিবাগানের দাদার বাড়িতে গিয়ে বলে এসেছিল, ঋতা সিনেমা করলে বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

আশ্চর্য। ও তো একালের ছেলে। ওরা তো কত পাল্টে গেছে। পুরনো দিনের কোনও বাধানিষেধই ওদের ভাল লাগে না। কল্যাণীর সঙ্গে কথায় কথায় তর্ক করে। অথচ ওরাও এত কনজারভেটিভ।

দু' দিন পরে পাশ করে ঋতা যদি চাকরি পায়, চাকরি তো করবেই, আজকাল স্বামী-স্ত্রী দু'জনে চাকরি না করলে সংসার চালানো দায়। তা ছাড়া মেয়েদের বিয়ের পর সময়ও কেটে যায়। তখনো ওর মাথা কাটা যাবে নাকি। এখন বরং মেয়েরা চাকরি না করলেই

লজ্জার কথা।

—এসেছে। খুব হাসি হাসি মুখে কল্যাণী এসে বলল।

—কে ?

কল্যাণী হাসল।—কে আবার। সেই তারা।

চোখের ভাষাতেই যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল।

বুঝতে অসুবিধেও হল না। চোখের হাসিটাই বুঝিয়ে দিল, কিংবা মনের ভেতরের গোপন প্রতীক্ষা।

—দু' কাপ চা করে দাও। আর যদি কিছু থাকে।

সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল সুকমল, বসার ঘরে ঢুকেই আগে দেখে নিল পাখাটা খুলে দিয়ে গেছে কিনা।

বেশ হাসি হাসি মুখেই ঢুকল। বোধহয় ওরা দু'জনেই ওকে দেখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখ করল বলে।

—বসুন, বসুন। সুকমল বললে।

ওরা বসল, আর শর্মিষ্ঠার দাদা হাসতে হাসতে বললে, আমার ভবিষ্যৎ কিন্তু আপনার হাতে।

বাঃ, ছেলেটি বেশ ভাল কথাবার্তা বলতে জানে তো। খুশি খুশি লাগল নিজেকে।

—আপনি বইটা পড়ে দেখুন।

একটা বই নামিয়ে রাখল। সামনের টি-পয়ে। সঙ্গের বয়স্ক লোকটি একটা মোটা ফাইলও রাখল। বললে, স্ক্রীপ্টও দেখতে পারেন।

ও সব সুকমল বোঝে না। শুধু শব্দটা শুনেছে। খবরের কাগজেও পড়েছে।

বইটা তুলে নিল। নিয়ে বললে, আমাকে এত অশিক্ষিত ভাবছেন কেন।

—আজ্ঞে ?

উনি চটে গেছেন মনে করে দু'জনেই নার্ভাসভাবে ওঁর মুখের দিকে তাকাল। কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছে না।

সুকমল হাসতে হাসতে বললে, এ তো ক্লাসিক বলতে গেলে। কোন যুগে পড়েছি। হ্যাঁ, ভাল বই। আপনার রুচি আছে।

কল্যাণী নিজেই ট্রে-তে বসিয়ে দু' কাপ চা নিয়ে এল। দুটো প্লেটে মাংসের ঘুগনি। আগের দিন করা হয়েছিল, বাড়তিটা ফ্রীজে রাখা আছে।

সুকমল হাসি হাসি মুখে তাকাল কল্যাণীর দিকে।

আর কল্যাণী হেসে বললে, নাও চা খাও, কথা পরে হবে।

একটু থেমে বললে, তুমি বলছি, কিছু মনে করো না। তুমি তো শর্মিষ্ঠার দাদা।

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছিল কল্যাণীকে দেখে, বসে পড়ল খুশি হয়ে।

সুকমল হেসে বললে, তা হলে করুক, কি বল ? বলে কল্যাণীর দিকে তাকাল।

আর কল্যাণী অবাক হয়ে তাকাল সুকমলের মুখের দিকে। কল্যাণীর সারা মুখ তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বেশ খুশি। সুকমলের মনে হল, তা হলে কল্যাণীও কি ভেতরে ভেতরে চাইছিল।

বয়স্ক লোকটা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, দাড়ি মসৃণভাবে কামানো নয়, পেটমোটা চামড়ার ফোলিও ব্যাগটা কোলের ওপর।

সে বললে, বাঁচালেন।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, তা হলে টাকাপয়সার ব্যাপারটা।

সুকমল হঠাৎ বললে, মেয়েকে একবার জিগ্যেস করতে হবে। ও রাজি কিনা...

ওরা দু'জনই একটু থতমত খেল। বয়স্ক লোকটার কপালে ভাঁজ পড়ল। বোধহয় ভাবল, টাকার পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা কিনা। টাকা কমানোর জন্যেই তো নিউ ফেস।

—ওকে একবার জিগ্যেস করে দেখি।

কল্যাণী বলে উঠল, ওকে আবার কি জিগ্যেস করবে। আমরা রাজি হলেই ও রাজি।

—বলেছে ?

কল্যাণী হেসে উঠল। বললে, ওর চোখ মুখ দেখেই তো বুঝতে পারি।

ব্যস। এর পর আজেবাজে কথা। কল্যাণী বললে, শর্মিষ্ঠাকে একদিন আসতে বল।

ঘাড় নাড়ল ছেলেটি। তারপর কিন্তু কিন্তু করে বললে, ঋতাকে একদিন নিয়ে যেতে হবে। আমিই আসব।

কথাটাকে কোনও গুরুত্ব দিল না ওরা।

সুকমল হাসতে হাসতে বললে, টাকাপয়সাটা কোনও বড় ব্যাপার নয়।

ওরা চলে গিয়েছিল খুব খুশি মনে।

সুকমলবাও খুব খুশি। ঋতা বাড়ি ফিরতেই কল্যাণী হৈ হৈ করে উঠল।

—একটা দারুণ সুখবর আছে রে।

হাসতে হাসতে বললে, একদিন হাতিবাগানে যেতে হবে। আর একদিন নির্মলেন্দুবাবুদের বাড়ি।

সকলেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিল।

ঋতাব একটু ভয় ভয় করছিল। বললে, পারব তো মা ?

—কেন পারবি না ?

ঋতা যেন একটু সাহস পেল।

হঠাৎ বললে, অনেক টাকা হবে, না মা ? উঃ, আমরা যদি নির্মলেন্দুকাকুদের মতো হয়ে যেতে পারি।

ঋতার সারা মুখে হাসি।

পুণ্য বললে, চল ভুট্টা খাওয়া যাক।

এই ক'দিনেই পুণ্য ওকে সমীহ করতে শুরু করেছে। বাবা-মা সমীহ করছে তো ও কোনও ছাব। সেজন্যেই হাল্কাভাবে বলতে হল।

---দাদা। উচ্চাবণে একটা মৃদু ধমক।

পুণ্য আর কিছু বলল না।

আজকাল ঋতাকে, ঋতার কথাকে মূল্য না দিয়ে পারছে না।

ভুট্টাওয়ালাব দিকে না তাকিয়ে ঋতা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললে, বাঁয়ে।

বাঁদিকেব রাস্তাটা সরু, তার শেষ প্রান্তে বাড়িটা।

রাস্তায় দাঁড়িযে ভুট্টা খাওয়া আর চলবে না। এই মান্ধাতার আমলের বাড়িটাও বাতিল হয়ে যাবে। স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে ঋতা।

বাড়ির সামনে কে একটা ঠ্যালা বেখে দিয়ে গেছে, তাই ট্যাক্সিটা বাড়ি অবধি গেল না। বিরক্ত হল ঋতা। চোখ পড়ে গেছে তেতলার বারান্দায়, সেজন্যে আরো।

আজকাল বাড়িব বাইবে বেরোলেই সবাই তাকায়। কি সব বলাবলি করে। করুণার কাছ থেকে উনিশ নম্বব, তাদের কাছ থেকে সকলেই শুনেছে।

ঋতা লক্ষ করল উল্টো দিকের তেতলার বারান্দায় নিভা না কি নাম, সেই মেয়েটা আর তাব মা, কি যেন বলাবলি করল, হাসল।

করুক। এবার সত্যি সত্যি হিরোইন হচ্ছে, সিনেমার হিরোইন। আর কাউকে কেয়ার

করে না।

তবু একটু ভয় ভয় করছে ঋতার। পারব তো।

ওরা এতসব ছবিটবি করছে, এই নিয়েই তো আছে। ওরা কি আর বোঝে না। না বুঝলে এত ছোটাছুটি করবে কেন।

সিঁড়ির মাঝামাঝি, মা ওপর থেকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, ঋতা এলি? পুণ্য কোথায়?

ট্যাক্সির ভাড়া মেটানোর জন্যে পুণ্য আছে, ঋতা তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল ওই তেতলার বারান্দার হাসাহাসি আর পিঠের ওপর আছড়ে পড়া চোখের দৃষ্টি এড়াতে।

কল্যাণী বললে, এত দেরি করে এলি? সুমন্তবাবু এতক্ষণ বসে থেকে এই চলে গেলেন।

—ইস, আরেকটু বসিয়ে রাখতে পারলে না।

একটু থেমে বললে, চা-টা দিয়েছিলে?

—টা, আর কি দেব, ডিম ভেজে দিলাম।

ঋতা হেসে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যথেষ্ট। ডবল ডিমের তো?

মা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যথেষ্ট। কথাটা এমনভাবে বলল ঋতা, যেন বলতে চায়, অত খাতির কিসের। অথচ ও বেশ বুঝতেই পারছে একটু একটু করে ওদের তোয়াজ করতে শুরু করেছে ঋতা। একা ঋতা নয়, ওরা সকলেই। এমন কি বাবাও

সুকমল হঠাৎ একদিন বলল, টাকাপয়সার কথা ওরা স্পষ্ট করে কিছু বলল না।

—তুমিই তো বললে, টাকাপয়সাটা বড় কথা নয়।

কল্যাণীর কথায় একটু থমকে গেল সুকমল। বাঃ, তা হলেও নিজে থেকে বলবে না।

ঋতার কানে আসছিল কথাগুলো। মনে মনে ভাবল, বাপী বড় আনপ্র্যাকটিক্যাল।

নিশ্চয় অনেক টাকা। আর নাম। কালারে নিশ্চয় ওকে রিঙ্কুর চেয়েও সুন্দর দেখাবে। আরো কত কি স্বপ্ন দেখছে ঋতা।

—সুমন্তবাবু কিছু বলে গেলেন? ঋতা মাকে প্রশ্ন করল।

—আবার আসবেন।

সেই পেটমোটা চামড়ার পোর্টফোলিও ব্যাগ কোলে নিয়ে বসে থাকা লোকটাই সুমন্তবাবু।

কল্যাণী ঠাট্টা করে একবার সুকমলকে বলেছিল, ব্যাগটার মধ্যে কি আছে অত সব। টাকা নাকি। বলে হেসে উঠেছিল।

সুকমলও হেসেছে। —তুমি বড় লোভী হয়ে পড়ছ। হয়ত শেষ অবধি দেখবে বিশেষ কিছু দেবে না।

মুখ দেখে মনে হল সে-রকম একটা আশঙ্কা যেন রয়েছে তার। কল্যাণীর অন্তত মনে হল।

ও ভুরু কুঁচকে বললে, না দিক। নাম হয়ে গেলে পরে তো পাবে।

ঋতা হাসতে হাসতে বলেছে, যদি খুব বড়লোক হয়ে যাই, বেশ মজা না মা?

পুণ্যও এখন আর মুখ ভার করে থাকে না। সয়ে গেছে। সকলেই যখন চাইছে, বাবা মাও, তখন ওর আপত্তির দাম নেই। কেনই বা আপত্তি করবে। গরিব থাকাটাই কি কম লজ্জার নাকি। ওর কলেজের বন্ধুদের কারো কারো বাড়ি আছে, কেউ কেউ গাড়ি করে আসে।

পুণ্য বললে, টাকা পেলে আমাকে কি দিবি বল।

এতদিন সমীহ করে এসেছে দাদাকে, কত ধমক খেয়েছে, বকুনি সহ্য করেছে। এখন আর করে না।

ঠাট্টা করে বললে, একটা গাড়ি দেব তোকে, চালাবি। মানে আমার গাড়ির ড্রাইভার রাখব তোকে।

বলে হেসে উঠল। পুণ্য ওর মাথায় একটা চাঁটি মারতে গিয়েও পারল না।

কিন্তু একটা আশঙ্কা রয়েই গেছে।

সুমন্তবাবু কেন এসেছিলেন ? টাকাপয়সার কথা বলতে কি ? কিন্তু সে-সব তো বাবার সঙ্গে। বাবাকে বলতে হলে তো সন্ধেবেলাতেই আসতে পারত।

পরের দিন কলেজে যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতে শেষ অবধি গেল ঋতা। পড়াশোনা তো আর শেষ করে দেবে না। ওরা তো বলেছে কোনও অসুবিধে হবে না, মাত্র ক'টা দিন।

সুমন্তবাবু কেন গিয়েছিলেন মাথায় সেই প্রশ্নটাই বার বার ঘুরছিল।

কলেজে ঢুকছে, শর্মিষ্ঠা দৌড়ে এল। মুখ গম্ভীর, থমথমে।

ছুটে এসে বললে, তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি।

—কি ব্যাপার ? হাসল ঋতা। তেমন কি আর গুরুতর কথা হতে পারে। ও তো জেনেই গেছে, ঋতা রাজি হয়েছে, বাড়ির সকলেই।

— তোকে বলতে ভীষণ খারাপ লাগছে ঋতা।

শর্মিষ্ঠা যেন কথাগুলো বলতে পারছিল না।

—দ্যাখ ভাই, আমার কোনও দোষ নেই। শর্মিষ্ঠা অনুনয়ের স্বরে বলছে।

ঋতার মুখে আর হাসি এল না।

সপ্রশ্ন চোখে তাকাল শর্মিষ্ঠার মুখের দিকে।

শর্মিষ্ঠা ধীরে ধীরে বললে, তুই তো স্ক্রীন টেস্ট দিয়ে এসেছিলি। দাদা যেদিন নিয়ে গিয়েছিল।

ঋতা ঘাড় নাড়ল।

হ্যাঁ, গিয়েছিল। ও ভুলবে কেন, স্পষ্ট মনে আছে, এই তো দিনকয়েক আগে। এসে বাড়িতে গল্প করে বলেছে হাসতে হাসতে।

ছবিটবি কি সব তুলল ক্যামেরায়।

একটা ছোট্ট এক টুকরো দৃশ্য অভিনয় করে দেখাতে বললে।

—এই যে এই রকম একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো, যেন খুব রেগে গেছে...

দৃশ্যটা দেখাতে দেখাতে শর্মিষ্ঠার দাদার কথাগুলোকে ক্যারিকেচার করে দেখাচ্ছিল ঋতা। যেন বেশ একটা মজার ব্যাপার।

শর্মিষ্ঠার দাদা বলেছিল, বাঃ বাঃ।

ও তো সেটাকে প্রশংসাই ভেবেছিল।

শর্মিষ্ঠা যেন বলতে লজ্জা পাচ্ছে। কোনওরকমে বললে, কাল সুমন্তবাবু গিয়ে তোর দেখা পাননি।

ঋতা কোনও কথা বলল না।

—তোর নাকি ক্যামেরা ফেস নেই। গলার স্বরটাও...

শর্মিষ্ঠার মুখ প্রাণহীন। যেন বলতে কষ্ট হচ্ছে।

বললে, নেবে না রে, তোকে ওরা নেবে না।

নেবে না !

ঋতার সারা মুখ রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে গেল। আনন্দে খুশিতে কত কি স্বপ্ন দেখছিল

ও। স্বপ্ন ভেঙে গেছে, ওর পায়ের তলায় মাটি নেই।

স্বপ্নে অনেক, অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিল, নির্মলেন্দুকাকুদের ওই ফ্ল্যাটটার মতো ওপরে। ওর সুন্দর মুখখানা রিঙ্কুর মতোই কালারে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছিল। এখন রক্তহীন, বিবর্ণ।

চোখ ঠেলে জল এসে গিয়েছিল ঋতার, কোনওরকমে আটকাল। শর্মিষ্ঠার কাছে আর ছোট হতে পারবে না।

হাসবার চেষ্টা করে বললে, নাই বা হল। কি যায়-আসে।

কিন্তু সত্যি তো যায়-আসে। এখন যে ও আগেকার দিনগুলো সব হারিয়ে ফেলেছে। সেই তাচ্ছিল্য, সেই অনিচ্ছা, সেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া। তুড়ি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া।

এখন যে মনে মনে অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

কি করে বলবে ও। বাবা হয়ত কষ্ট পাবে, মা কষ্ট পাবে।

ক্লাসে ওর একটুও মন বসল না। কথা বলতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না কারো সঙ্গে।

বাণীও চুপচাপ। ও সব শুনেছে শর্মিষ্ঠার কাছে।

বাড়ি চলে যাব ? একবার ভাবল ঋতা। পৃথিবীতে কোনও কিছুই যেন ওর ভাল লাগছে না। ভাল লাগার নেই। অথচ এই সেদিনও, যখন এ সব কোনও কথাই শোনেনি, স্বপ্ন দেখেনি, তখন তো এই কলেজেই ছুটে আসার জন্যে অস্থির হত। কত আনন্দ।

আজ বাণী শর্মিষ্ঠা কাউকেই ভাল লাগছে না।

না, বাড়ি চলে যেতে পারবে না। শর্মিষ্ঠা কি ভাববে, বাণী কি ভাববে ? ভাববে ঋতা খুব আঘাত পেয়েছে। বুঝতে পারবে, ও স্বপ্ন দেখতে দেখতে অন্য এক জগতে চলে গিয়েছিল, এখন স্বপ্ন ভেঙে গেছে।

কিন্তু হাসতে গিয়েও তো ও হাসতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না।

কলেজ ছুটির পর একা-একাই বাড়ির পথ ধরল ও।

কি বলবে মাকে, বাবাকে। ঋতাকে ঘিরে ওরা অনেক স্বপ্ন দেখেছিল।

গলির মোড়ে এসে দাঁড়াল ঋতা।

ফুটপাত ঘেঁষে সেই হিন্দুস্থানি ভুট্টাওয়ালা যথারীতি বসেছে। সামনে একটা তোলা-উনোন। বাঁ হাতের হাত-পাখা দিয়ে উনোনের নীচে হাওয়া করছে। পাশে একটা ডালায় থরে থরে ভুট্টা সাজানো। উনোনের ওপরেও দুটো ভুট্টা আগুনে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

কটা লোক ঘিরে আছে ভুট্টাওয়ালাকে। দুটো বস্তির লোক।

তবু দাঁড়িয়ে পড়ল ঋতা।

ঠাকুমার সেই তোলা-উনোনটার কথা মনে পড়ে গেল। বারান্দার এক কোণে স্বপাক রান্না ঠাকুমার। তার জন্যে কত লজ্জা। কেউ এলে সেটা আড়াল করার জন্যে কি ব্যর্থ চেষ্টা।

অথচ ঠাম্মার এ সব নিয়ে কোনও মাথাব্যথাই ছিল না। লাজলজ্জা কিছু না। অন্যায় তো কিছু করছি না। যা বিশ্বাস করি তাই করছি, মেনে চলছি।

—আমাকেও একটা দাও। ভাল করে নিম্বুনিমক মাখিয়ে দাও।

ঋতা বলল ভুট্টাওয়ালাকে।

মনে মনে হাসল। *এই সেদিনও ট্যাক্সিতে আসতে আসতে পুণ্য খেতে চেয়েছিল।*

মনের ভিতরটা চিড়বিড় করে উঠেছিল ওর। আমি না সিনেমার হিরোইন হতে চলেছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভুট্টা খাওয়া আমাকে মানায় না।

ভুট্টা চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরল ঋতা। একটা স্বপ্নের জীবন থেকে সেই পুরনো জীবনের স্বপ্নটা ফিরে পেতে চাইছে।

ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সকলে বসে আছে। কারো মুখে কোনও কথা নেই। যেন ভয়ঙ্কর একটা সর্বনাশ গ্রাস করেছে বাড়িটাকে।

সুকমল চুপচাপ বসে আছে সেই ক্যাম্বিসের হেলানো চেয়ারটায়, শরীর এলিয়ে।

খাটের বাজুতে হাত রেখে বিছানার ওপর বসে আছে কল্যাণী। মুখে কোনও কথা নেই, বিবর্ণ ম্লান মুখ।

পুণ্য দাঁড়িয়ে আছে দরজায় হেলান দিয়ে। স্থির বিষণ্ণ।

আর ঋতার দু' চোখে জল।

সুকমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কল্যাণীর নতমুখ চমকে চোখ তুলল সুকমলের দিকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সুকমল হঠাৎ বললে, কিছুই তো নেই। কিছুই তো ছিল না আমাদের। কিন্তু একটা জিনিস ছিল..

গলা কেঁপে গেল সুকমলের।

কাঁপা কাঁপা গলাতেই বললে, একটা বিশাল অহঙ্কার ছিল। আত্মসম্মানের অহঙ্কার। তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। টাকার লোভ দেখাচ্ছে বলে রেগে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এসব আমাদের পরিবারে চলে না।

সুকমলের চোখে বোধহয় জল এসে গেল।

বললে, সেই অহঙ্কারটাও চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল, ছোট্ট একটা গর্বের পিছনে ছুটতে গিয়ে। সামান্য একটু লোভের জন্যে।



# জৈব



তনুকা একাই নিউ জার্সি থেকে কলকাতায় ফিরে এল।
টেলিফোনে বাবা মাকে জানিয়ে দিয়েছিল, তোমাদের এয়ারপোর্টে আসতে হবে না।

বয়েসের কথা ভাবলে তনুকার নিজেকেই বয়স্ক মনে হওয়ার কথা। এর আগে যখন দু চারবার এসেছে, প্রতিবেশী বা বন্ধু কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে, অথবা ও নিজেই গেছে তাদের বাড়ি। এবং আঁতকে ওঠার ভান করে বলে উঠেছে, কি হয়েছিস রে তুই।

চাপা গলায় হাসতে হাসতে বলেছে, তোকে তোর মা মনে হচ্ছে, রিয়েলি।

অত ভেবেচিন্তে কথা বলতে শেখেনি ও, হাসি যে কখনও কখনও উপহাস মনে হতে পারে তাও জানে না। কিংবা উপহাসকেও নির্দোষ মজা ভাবতে অভ্যস্ত।

ওর হাসি সংক্রামক, বন্ধুটিকেও সে জন্যে হেসে উঠতে হয়েছে। সে ছেলেমেয়ে দুটিকে দেখিয়ে বলেছে, এত বড় বড় ছেলেমেয়ে, মা হব না? তোর মতো বিয়ের কনেটি থেকে যাব?

—তা বলে এত মোটা?

মোটা হওয়ার জন্যে তার হয়তো একটা লুকোনো আফশোস আছে, তাই মুখে একটা বিষণ্ণতার ছাপ পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু তনুকার হাবেভাবে কথাবার্তায় ছটফটানিতে এমন একটা জাদু আছে, যে দু মিনিটেই সেই বন্ধুটি ফুর্তিতে মশগুল। গল্পগুজব করে, দুজনে মিলে প্রচুর হেসে, ঘণ্টা দু-তিন কাটিয়ে তনুকা যখন চলে আসে, তখন বন্ধুটি যতক্ষণ দেখা যায়, নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে ওর খুশি ফোটানো ছিপছিপে শরীরটার দিকে। বৃষ্টিভেজা বিকেলের স্নিগ্ধ হাওয়ায় মন জুড়িয়ে যায়। একটু ক্ষীণ ঈর্ষাও কি বুকের মধ্যে রিনরিন করে? কে জানে।

তনুকা পরের দিনই জগিং শুরু করে দেয় এবং যোগব্যায়াম। যখন কলেজে পড়ত যোগব্যায়ামে তখন থেকে অভ্যস্ত, আমেরিকাতে তার আগে থেকেই ইয়োগা আর মেডিটেশনের হিড়িক শুরু হয়েছে। ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসেও ছাড়েনি। আবার ওদেশকেও একেবারে ছাড়তে পারেনি, জগিং জিনিসটাই বা মন্দ কি। তবে এ সবের আড়ালে আসল সাধনা একটাই, শরীরটাকে পুরোদস্তুর ফিট রাখা, এবং মোটা না হওয়া।

প্রসাধন বা পার্লার থেকে তারুণ্য অর্জনে তনুকা বিন্দুমাত্র বিশ্বাসী নয়, এবং তার প্রয়োজনও ঘটে না। কারণ, রাস্তায় ঘাটে, সিনেমা হলে বা যত্রতত্র যেখানেই যাক, কেউ ওর দিকে ফিরে না তাকিয়ে পারে না। সেটা শুধু ওর চেহারার জলুসের জন্যে নয়। ওর শরীরে কোথাও কোনও জড়তা নেই, ওর হাঁটাচলা ধরনধারনে এমন এক নির্ভয় ভাব, যা দেখে মনে হয় ও বুঝি পরিপার্শ্বকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে চলে। কেউ কেউ অহঙ্কারী ভেবে বসে; কেউ বা মনে করে, কর্মমুখ আমেরিকা দেশটাই ওকে এমন করে দিয়েছে। ওর বন্ধুরা তা শুনে হেসে উঠে বলে, 'না মা, ও সব সময় ঠিক এই রকমই ছিল।' শুনেও বিশ্বাস হয় না কারও কারও।

যেমন নিজের বয়েসটা নিজেরই বিশ্বাস হয় না তনুকার।

হাসতে হাসতে বলেছিল, জানিস সুরূপা, আমার কিন্তু মনে হয় আমি সেই কলেজের বয়েসেই আছি।

একটু থেমে: না, তা নয়, এই ধর পঁচিশ-ছাব্বিশ।

সুরূপা হেসে উঠে বলেছে, তনু, তোর কেন, আমারও তো এক একসময় তাই মনে হয়। মনের আবার বয়েস হয় নাকি!

—তোরও? হেসে উঠেছে তনুকা, যাকে বন্ধুরা সকলেই তনু বলে ডাকত। বাড়িতেও কেউ কেউ।

তবু এই বয়েসে এখনও একা একা কি করে বেরিয়েছে, কোথায় কোথায় ঘুরেছে, সে সব অভিজ্ঞতার কথা শুনে সবাই অবাক হয়। বলে, কি করে যে তোর এত সাহস হয়...

তনু হেসে উঠে বলেছে, মনের বয়েস কম থাকলে দু হাতে দুটো ক্রাচ লাগে না।

এর একটাই উত্তর : ধন্যি বাবা!

—আরে ছোঃ। যখন পঁচিশ-ছাব্বিশ তখনই ভয় পাইনি। সেটাই তো ভয় পাওয়ার বয়েস, কি বল? চোখেমুখে একটা দুষ্টুমির হাসি এঁকে দিয়েছে।

এই মেয়ে রেগে গিয়ে বাবা মাকে একটা ধমক দেবে, বলবে, 'এসো না বলছি, এয়ারপোর্টে আসতে হবে না', এ আর আশ্চর্য কি!

আসলে দোষটা বাবা মার নয়। তনুই বোঝে না।

চেনা মানুষ আসছে দেখতে পেলে যে কেউ দু পা এগিয়ে আসে। বাবা মারও তো এয়ারপোর্টে যেতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে ও এবার একেবারেই ফিরে আসছে বলে। কই, এর আগে যে এতবার এসেছে, সেই প্রথম একবার ছাড়া কখনও কি ওরা যেতে চেয়েছে? তনু নিজেই তো ট্যাক্সিতে চলে এসেছে।

সে আসা, আর এ বারের আসা এক নয়। এখন ওদের মনে অন্য এক উদ্বেগ।

বাবা মার উদ্বেগের কথা এ মেয়েকে বোঝানো যাবে না। কারণ ওর নিজেরই কোনও উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নেই। অন্তত টেলিফোনে যতবার কথা হয়েছে একবারও মনে হয়নি। ও তো চাপা স্বভাবের মেয়ে নয়, বাবা মা কষ্ট পাবে বা বিব্রত বোধ করবে ভেবে ততখানি খুশি খুশি অভিনয় করবে বলে মনে হয় না। অভিনয় ওর রক্তে নেই। অথচ সংসারে থাকতে হলে তো একটু আধটু অভিনয় লাগে।

উদ্বেগের কথা বলাও যাবে না, হেসে উঠে বলবে, টেনশন? তোমাদের? কেন?

ভালমন্দ, জীবনে যা কিছু আসুক, বিচলিত হওয়া ওর স্বভাবে নেই। অন্তত বাইরে থেকে দেখে তা বোঝা যাবে না। ভেতরে ভেতরে জমাট বেঁধে থাকে কি না, কে জানে। থাকে নিশ্চয়ই। অথচ, যাই ঘটুক না কেন, গাড়ির কাচে জলের ফোঁটার মতো, ওয়াইপার বুলিয়ে মুছে দাও। ওর উচ্ছল হাসি আর কথা ওই ওয়াইপার কি না কে বলতে পারে।

বাবার স্বগত উচ্চারণ, স্টুপিড। আমাদের একটা কথাও এতদিন বলতে পারিসনি।

মা বলেছিল, এতগুলো বছর শেষ করে এলি কেন? জীবনটাই তো শেষ।

সেই হাসি, টেলিফোনে অনুরণিত হল। —মা, জীবন কি শেষ হয় নাকি? যে কোনও দিনই তো জীবন শুরু হতে পারে।

শুভব্রত ভাবছিলেন, আর ঘড়ির কাঁটার দিকে দেখছিলেন বারবার। প্লেন নামার সময় হল কি না কে জানে। লেট নয় তো। ফ্লাইট নম্বর জানেন, ইচ্ছে করলে এখনই একবার ফোন করে জেনে নেওয়া যায়। কিন্তু সাহস হচ্ছে না।

ওই যে চোখে চশমা এঁটে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে, ওল্টাচ্ছে না কচু, কিছুই যেন বুঝি না, একটা পাতাও তখন থেকে ওল্টায়নি, নিথর বসে আছে আরামকেদারায়, কিন্তু শুভব্রত ঠিক বুঝতে পারছেন, সুপর্ণার চোখ দুটো ম্যাগাজিনের পাতা থেকে সরে গিয়ে এয়ারপোর্টের রেলিং ঘেরা বেরোনোর প্যাসেজে নিবদ্ধ। ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে মালপত্তর নিয়ে যারা বেরিয়ে আসছে তাদের দিকে চোখের সার্চলাইট ফেলে একটা মুখই খুঁজছে।

ওর মনেও সমান উৎকণ্ঠা।

কিন্তু শুভব্রত যদি সোফা থেকে উঠে গুটি গুটি পায়ে টেলিফোনের টেবিলটার দিকে এগিয়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে একটা ধমক আসবে ইজিচেয়ার থেকে। সেই বেতবোনা ইজিচেয়ার, বেতগুলো ছিঁড়ে গিয়ে বারান্দার শ্রী নষ্ট করছিল, আর ওটাতে বসতে না পেলে মহিলার আর কোথাও বসে আরাম হয় না, তবু শুভব্রতর পক্ষে কোনও সুরাহা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজকাল ক্লান্তি লাগে, দ্রুত হাঁটতে পারলেও হাঁটেন না, কখন খিঁচ করে কোথায় ফিক ব্যথা লেগে যাবে, তা ছাড়া কোথায় পাবেন ওদের তাও জানেন না। আগে হাতে গুটোনো বেতের বাণ্ডিল ঝুলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আসত, এখন আসে না। কিংবা কখন আসে জানার জন্যে সারাটা দিন দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। ব্যাটারা আজকাল সুর করে 'বেত বোনাবে' হাঁকও দেয় না।

টাকাপয়সা যতই থাক না কেন, বুড়োবুড়িদের আজকাল দুর্দশা। ছেলে থাকলেও কাছে থাকত না। তাদের অ্যাম্বিশন আছে, আর অহঙ্কার : নিজের পায়ে দাঁড়াব। মেয়ে হলেও সে অহঙ্কার তনুরই বা কম কি।

আত্মীয়স্বজনরা সবাই বলত, ভাগ্য করে এসেছিল শুভ, এমন মেয়ে হয় না, মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

ছাই দেখেছে ওরা, দেখে তো দূর থেকে, বাইরে বাইরে। ওই হাসির মধ্যে কি আছে, বাবা মা জানতে পারে না, ওরা বুঝবে!

সেবার যখন এল, ওই ছেঁড়া বেতের আরামকেদারার দিকে চোখ পড়তেই তেতো ছিটোনো গলায় বলে উঠল, তোমরা কি বলো তো ? ওটাকে সারিয়ে নাওনি কেন ? কি বিশ্রী লাগছে।

সুপর্ণা কাচুমাচু গলায় বললেন, একটা বড় তোয়ালে বিছোনো থাকে, আজকে কাচতে দিয়েছি।

মেয়ে দুদিনের জন্যে আসে, তাকে কেন সারানো হয়নি তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে লাভ কি। হয়তো আরও চটে যাবে। এই কটা দিন অন্তত শুধুই ভালবাসা দিতে চান, ভালবাসা পেতে চান।

—দাঁড়াও, আমিই গিয়ে লোক ডেকে আনছি। নাকি নতুন বেত লাগালে ওটার অ্যান্টিক ভ্যালু কমে যাবে!

শুভব্রত হেসে ফেলেছিলেন, তারপর সুপর্ণার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই মহিলাকে জিগ্যেস করো।

সুপর্ণা একটা তীর্যক দৃষ্টি হানলেন ওঁকে 'মহিলা' বলার জন্যে, তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে তো বেঁচে যাই, গরমের দিনে সোফাকোচের গদিগুলো যা তেতে থাকে...

শুভব্রত সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে নিলেন, বললেন, সেকালে সাহেবরা যা করে গেছে, সব ভেবেচিন্তেই করে গেছে। ওরা বেতের চেয়ার পছন্দ করত।

সুযোগ পেলেই শুভব্রত একটু সাহেবপ্রীতি দেখান, আর সুপর্ণা পরিহাস করে সেটুকু উড়িয়ে দেন। এটাই রীতি।

বললেন, মোটা জীনের প্যান্ট পরত, ওদের আর কি। ধুতি পরা বাবুদের যে কি অবস্থা হত সেটা ভাবো। বেতের চেয়ার ছিল ছারপোকার আড্ডা।

বাধা পেলেই শুভব্রত পোল ভল্ট দিতে অভ্যস্ত।

বললেন, তা ঠিক। আজকাল তবু ডিডিটি আছে। ছেলেবেলায় মনে আছে, বিছানার তলায় বকুল ফুল কিনে এনে ছড়িয়ে রাখা হত। সুন্দর গন্ধও হত...

সুপর্ণা বললেন, কাজের কাজ কিছুই হত না। মিথ্যে ধারণা ছিল লোকের।

—বকুল ফুল কিরকম মা ?

ফুল কি কখনও বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যায় ? যে আগে দেখেছে কেবল সেই বুঝতে পারে। যে আদৌ দেখেনি, তাকে বোঝাবেন কি করে।

তবু এ সব প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক কথা এক একসময় শুনতে ভালই লাগে তনুকার। একটা বায়বীয় ধারণা হয়, অস্পষ্ট, ঠিক হাতে ছোঁয়া যায় না। অনেকটা ইতিহাস পড়ার মতো। বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসে না। অথচ একটা হিস্টোরিক্যাল নভেল পড়লে, অথবা তেমন একটা সিনেমা দেখলে সেই পিরিয়ডটা ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসে যায়।

বাবাকে সে জন্যে তনুকা মাঝেমাঝে একটু প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু বেশি বেশি বলতে শুরু করলেই ভেতরে ভেতরে কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়ে, একটা তিক্ত কষায় ভাব জট পাকাতে শুরু করে, কিন্তু সেটা বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করে, মনে মনে ভাবে, কখন থামবেন ইনি !

শেষে থামাবার জন্যেই বলে বসল, তোমরা তো পারোনি, দেখো দুদিনেব মধ্যে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তনুকার বাবা মার কাছে তা অজ্ঞাত নয়, এ মেয়ের ডিকশনারিতে 'কাল' বলে কোনও কথা নেই। ফিউচার টেনসে কোনও কথা বলেই না, ওর সবই বর্তমান।

পরের দিনই সত্যি সত্যি এক মুখ হাসি নিয়ে হাজির—নিয়ে এসেছি।

বাবা মা দুজনেই অবাক, এ রকম অলৌকিক কাণ্ড কলকাতা শহরে ঘটতে পারে জানাই ছিল না। এমন অসম্ভব কি করে সম্ভব হল তা একমাত্র তনুকাই কিছুটা বোঝে। এর আগেও অনেকবার এমন হয়েছে।

অন্তরঙ্গ বন্ধু মন্দিরার কাছে হাসতে হাসতে বলেছে সে কথা। হাসতে হাসতেই : তোর কি মনে হয় আমি যথেষ্ট অ্যাট্রাক্টিভ নই ?

মন্দিরা আকাশ থেকে পড়েছে—তুই এখনও এই বয়েসেও যে-কোনও লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারিস।

—তবে ? আর আমার হাসি তো জানিস, ইনফেকশাস। আর কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা ?

ওর আত্মপ্রশংসা শুনে মন্দিরা হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলে, তুই ভাল সেল্‌স গার্ল হতে পারবি।

তনুকাও মুখ থেকে হাসি না সরিয়ে বলে, এ চাকরিটা গেলে ভেবেই রেখেছি, সেল্‌স গার্ল। ওরাও কম পায় না রে, ও দেশে।

মন্দিরা জানে, তনুকা মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে মোটামুটি একটা ভাল চাকরিই করে, নিউ জার্সিতে। সেজন্য একটু ঈর্ষা বোধও যে নেই তাও নয়। কিন্তু সত্যি ও তনুকাকে এত পছন্দ করে, ভালবাসে, যে সেই সুপ্ত ঈর্ষা বা গোপন আত্মধিক্কার কখনও মাথা তুলতে পায় না।

তাই বলে বসল, তোর অ্যাডভেঞ্চারটা আগে বল।

—অ্যাডভেঞ্চার বলিস না, জাস্ট বুদ্ধি। চলে গেলাম, বউবাজার স্ট্রিটে। জানতাম একটাকে ভেজাতে পারবই।

মন্দিরা হেসে উঠে বললে, পারিস তুই, আমি হলে একা যাওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম না।

তনুকা হাসল—সেজন্যে তুই তুই, আর আমি আমি। আমাকে বিচার করতে হলে আমার ক্যারেক্টার দিয়েই বিচার করতে হবে। অন্যদের চরিত্র আমাকে বিচার করবে এ জিনিসটাই আমার কাছে প্যারাডক্স মনে হয়। আমার একটা আইডেন্টিটি আছে তো,

ব্যক্তি না ব্যক্তিত্ব কি বলে যেন...

মন্দিরা যথেষ্ট শিক্ষিত মেয়ে, বোধবুদ্ধি আছে, কিন্তু সবসময় মাটিতে পা ফেলে চলতে চায়। তনুকা যখনই একটু জটিল তত্ত্বকথা শুরু করে ও হালে পানি পায় না।

তাই বললে, তুই বউবাজারের গল্পটা বল।

আবার ফিরে এল আগের কথায়। বললে, আজকাল তো বেতবোনা প্রায় উঠেই গেছে, তবু দু-একজন দোকানদার, মানে ফার্নিচারের দোকানে, একে ওকে জিগ্যেস করে বেড়ালাম। কৃতার্থ হতে না পেরে কি দুঃখ তাদের। শেষে, একজন পালিশ করছিল, সে বলল, কবে চাই ? তার চেনা একজন আছে।

—তারপর ?

তনুকা বলল, বিশ্বাস করবি না, সাতখানা দোকান পার হয়ে একটা দোকানে এসে দেখিয়ে দিল, লোকটাকে বললে, যা দিদিমণির সঙ্গে...

মন্দিরার তখন চোখ কপালে উঠেছে।

তনুকা হাসল। বললে, এখনই অবাক হচ্ছিস কি, শোন আগে। লোকটাকে হেসে এমন ভাবে রিকোয়েস্ট করলাম, তবু বললে, ঠিকানা দিয়ে যান কাল যাব। এখানকার এই মিস্ত্রি ক্লাসটাকে তো চিনিস, ওদের 'আজ' মানে, শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেব, কাজ মানেই 'কাল'।

মন্দিরা হেসে উঠে বললে, যা বলেছিস।

তনুকা এক পলক চুপ করে থেকে বলল, না, একসেপশেন আছে। জুতো সারায় ছাতা সারায় যারা, রাস্তায় বসে, অল্পেই সন্তুষ্ট। সে জন্যে ওদের আর উন্নতি হল না। আমার মতো। বলেই হেসে উঠল তনুকা।

আসলে তনুকাকে হেসে উঠতেও হয় না, হাসিটা মুখের ওপর আঠা দিয়ে লাগানোই থাকে।

—তারপর ?

তনুকা বলল, তারপর আর কি, ট্যাক্সি করে নিয়ে যাব, লোভ দেখালাম। ব্যস, রাজি। তবে ভাই, তোদের শহর বটে, একটা ট্যাক্সি পাওয়া যে কি দুর্ভোগ।

এই এত কাণ্ড করে যে আরামকেদারার বেত বোনানো হয়েছিল শুভব্রত বা সুপর্ণা জানেনও না।

প্রথম দিন শুধু সুপর্ণা গা এলিয়ে বসে বলেছিলেন, তনু না এলে আমার আর চেয়ারটা সারানোই হত না।

খোঁচাটা লেগেছিল ঠিক জায়গাতেই, কিন্তু শুভব্রত সেটাকে গায়ে বিঁধতে দেননি।

সেই চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে মহিলাটি, চোখ ম্যাগাজিনের পাতায়। সেই একই পাতায়। এতক্ষণ লাগে নাকি একটা পাতা পড়তে ?

শুভব্রত ভাবলেন, বাথরুমে গেলেও তো পারে, কিংবা রান্নার ঘরে। রান্নার লোকটার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি লাগিয়ে দিলে উনি টুক করে ফোন করে জেনে নিতেন, প্লেন ল্যান্ড করেছে কি না, কিংবা কত ঘণ্টা লেট।

মেয়ে তো বলে দিয়ে খালাস, তোমাদের কাউকে আসতে হবে না, আসতে হবে না। ভেবেও দেখে না আমাদের কি উদ্বেগ নিয়ে কাটাতে হয়। টেলিফোনকেই কি বিশ্বাস আছে, এক ফ্লাইটের বদলে অন্য ফ্লাইটের কথা বলে দেবে। তখন আরও বেশি দুশ্চিন্তা।

তা হলেও ফোন করলে একটা খবর পাওয়া যেত। কিন্তু যেই উঠবেন, গুটিগুটি পায়ে এগোবেন, সঙ্গে সঙ্গে আরামকেদারা বলে উঠবে : অল্পেই বড্ড অধৈর্য হয়ে ওঠো। আসবে বলেছে, আসবে ঠিকই। উনি যেন কিছু বুঝতে পারেন না। তখন একটা গাড়ি

হর্ন দিল রাস্তায়, অমনি ফিরে তাকাল কেন ও দিকে। ওটা তো চেনা হর্ন, পাশের পাশের বাড়ির গাড়ি, রোজ শুনছেন। ট্যাক্সির হর্ন হলে উনি নিজেও ছুটে যেতেন।

এয়ারপোর্টে যেতে পেলে অনেক শান্তি ছিল। কিন্তু যাওয়া তো দূরের কথা, গাড়ি পাঠানোতেও মেয়ে রাজি হয়নি।

নিষেধ না মানলে, এ ভাবে আসছে, একেবারে চলে আসছে একা-একা, প্রদীপ্ত আসছে না, মেয়ের মুখ এমনিই ভার থাকবে, কান্না থমথম করবে চোখের আড়ালে, তার ওপর নিজে গেলে বা গাড়ি পাঠালে একটা কথাও বলবে না। কিছু জানাই যাবে না।

কিছু একটা যে হয়েছে তা জানেন, কিন্তু সবটুকু নয়। মেয়ের সঙ্গে যখনই সুপর্ণার কথা হয়েছে টেলিফোনে, এস টি ডি-র মীটার উঠছে খেয়ালই রাখেনি। ও পারের দু-একটা শব্দ ওঁকে বিচলিত করে তুলেছে।

কাছে যেতে চেষ্টা করতেই এক ধমক, তুমি এ ঘর থেকে যাও তো, এ ঘর থেকে যাও।

চালুনি দিয়ে চেলে নিয়ে যে কটা কথা বলেছে সুপর্ণা, ফোন নামিয়ে রাখার পর, বেশ বুঝতে পেরেছেন, সেন্সরের ছাপ পড়েছে।

এর আগে যখনই এসেছে তনু, ওঁর কত ভাল লেগেছে। বারান্দায় সারি দিয়ে সাজানো সব টবেই ফুল ফুটলে ভোরবেলা উঠে দেখতে পেলে যেমনটি লাগে। তনুর জন্যে এ বার বিশেষ কিছু একটা করতে হবে, কিন্তু কি করতে হবে তা ভেবে ভেতরে ভেতরে ছটফটানি। অথচ বিশেষ কিছু করা ওঁর এলাকায় কিই বা আছে। যা কিছু করতে পারেন সবই টাকা দিয়ে, অথচ এ মেয়ের কাছে সে সবের কোনও দামই নেই। তনু নিজেই কি রোজগার কম করে নাকি। চাইলে আরও বেশি পারত।

—বাপি, একটা ফ্যান্টাস্টিক অফার পেয়েছি, বস্টনে। কি করি বলো তো ?

শুভব্রতর আনন্দ হয়েছে মেয়েকে কেউ দুর্মূল্য ভেবেছে বা উচিতমূল্য দিতে চেয়েছে এই খবরে। পরমুহূর্তে হাসি পেয়েছে। যা কিছু ঘটুক, যেখানেই ঘটুক, উপদেশ বা পরামর্শ চাইবে। কোনও কোনও ব্যাপারে বাবার কাছে, তেমন তেমন বিষয় হলে মাকে জিগ্যেস করবে। মেয়েদের কাছে মা বন্ধু হয়ে যেতে পারে, বাবা যেন কিছুটা দূরের মানুষ। অথচ বাবা সবটুকুই আপন আপন। মার সঙ্গে কোথাও একটা চাপা রেষারেষি, একটা দুর্বোধ্য ক্ষোভ। পরে সবচেয়ে আপন হয়ে গেলেও, মা যে সেই উঠতি বয়েসে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করে, একটু আগলানো ভাব, উঠতে বসতে উপদেশ, সেই অভিমান বোধহয় ভেতরে ভেতরে থেকেই যায়।

হাসতে হাসতে একদিন তনুকা বলেছিল, মা, তুমি সেই পরতে দিলে তোমার লাল কল্কি শালটা, কিন্তু...

ও কথা শেষ করার আগেই সুপর্ণা বলেছিলেন, পরতে দিলাম কি রে, তুই নিয়েই নে না।

শুনে একটুও আনন্দ হয়নি তনুকার।

মনে মনে বলেছে, দিয়েই দাও আর পরতে দাও, যখন চেয়েছিলাম সেই বয়েসটা দিতে পারবে ?

কবেকার কথা, কত ছোট তখন, ঠিক মনে আছে তনুকার।

তখন পরলে মেয়ে বন্ধুরা হাঁ হয়ে যেত, ছেলেরা ড্যাবড্যাব করে তাকাত।

বাবা মার সামনে এ ধরনের কথা বলায় তনুর কোনও জড়তা নেই এখন। সে ভাবেই ওঁরা ওকে মানুষ করে তুলেছেন। সে কথা ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু জানেন, ওকে কেউ মানুষ করে তোলেনি। তা হলে ও মানুষ হতই না। ও নিজেকে নিজে মানুষ করে

তুলেছে। ব্লাইন্ড লেনে হঠাৎ ঢুকে পড়লে ও নিজেই ফিরে আসতে জানে।

বস্টনের চাকরিটা নেবে কি না জিগ্যেস করেছিল, হাসি পেয়েছিল শুনে। শুভব্রত জানেন ওঁর পরামর্শ চায় বটে, কিন্তু ওর কাছে তার কোনও দাম নেই।

ঠিক তাই। উনি যেই বললেন, 'নিয়ে নে না', সঙ্গে সঙ্গে বললে, কিন্তু প্রদীপ্তর কথা তো ভাবতে হবে, ও একা একা বেচারি...

এত মায়া তার জন্যে, নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতেও পিছু-পা নয়, তাই প্রথম যখন শুনলেন সুপর্ণার কাছে, তাও বিশদে নয়, আভাসে, তখন বিশ্বাস করতে পারেননি।

এ মেয়েকে পুরোপুরি বোধহয় ওঁরাও বুঝতে পারেন না।

কিসে খুশি করা যায় জানেন না।

এর আগে যখনই এসেছে, খুশি করার জন্যে শুভব্রতর ভেতরে ভেতরে কি ছটফটানি।

শাড়ি, গয়না, এটা ওটা ? সব মেয়েরই ও সবে কত লোভ। পেলে চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। এক ফাঁকে উল্টে পাল্টে দেখার ভান করে লেবেলে দামটা দেখে নেয়। তনু ঠিক উল্টো। দামি জিনিসটাই হয়তো ঠোঁট উল্টে ছুড়ে দেবে, 'কি হবে এ সব ?' বলেই হাসি। আবার কখনও অতি তুচ্ছ সস্তা একটা কিছু পেয়ে সে কি আহ্লাদ।

আসলে এর আগে ও যখনই এসেছে, ওকে খুশি করার, ভালবাসা উজাড় করে দেওয়ার সমস্ত এলাকাটা দেখেছেন সুপর্ণার রাজত্বে।

—চল, তোকে একটা সিনেমা দেখিয়ে আনি. ভাল ছবি।

—তোমার সঙ্গে ? চোখ কপালে তুলেছে তনু।

জুড়ে দিয়েছে অপ্রতিভ করার মতো কথা। বলেছে, কেন, আমার কি সিনেমা যাবার সঙ্গীর অভাব ?

সঙ্গে একটু পরিহাসও।—বরং বলো, এই অজুহাতে নিজেরই ছবিটা দেখে আসার ইচ্ছে।

সুপর্ণা তা শুনে শব্দ করে হেসে উঠেছেন।—ঠিক বলেছিস।

আজকাল লক্ষ করেছেন মা সব সময়েই মেয়ের দিকে। কি যে এত প্রাইভেট কথাবার্তা ওদের, বুঝতেও পারেন না।

যখনই এসেছে একই রকম। বাবার সামনে বসে দু দণ্ড কথা বলবে তার ফুরসতই নেই মেয়ের। মা আর মা।

হবে না কেন, খুশি করার সব মালমশলা তো ওর হাতেই। রান্নার লোককে সরিয়ে দিয়ে এটা-ওটা নিজেই বানাবে, তনু বড্ড ভালবাসত খেতে। ছাই। মুখে দিয়ে দেখেছেন, এমন কিছু আহামরি রান্না নয়। অথচ খেয়ে তনুর কি উল্লাস। অবশ্য রান্নাটাই কি আর লোকে প্রশংসা করে, ভাল লাগে ওই ভালবাসার ছোঁয়াটা।

এখন তো আবার ওঁরা ষোল আনা দিশি হয়ে গেছেন। সে সব দিনের কথা স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। তখন মনে আছে, শুভব্রত যখনই আসতেন, মাকে নিত্যদিন এক একটা ফরমাশ করে বসতেন। মোচার ঘণ্ট। ব্যস। মার সে কি আনন্দ। বাবাকে হুকুমের স্বরে : যেখান থেকে পাও মোচা নিয়ে এসো। সারা বাজার তোলপাড়, সারা বাড়ি তোলপাড়। 'আঃ, দারুণ খেলাম আজ।' মার চোখে জল চকচক করে উঠত।

সুপর্ণা সেই বেতবোনা আরামকেদারায় সোজা হয়ে বসেছে, এখন আর গা এলিয়ে নয়। ম্যাগাজিন হাতে গোটানো। একবার যেন টেলিফোন রিসিভারের দিকে তাকাল।

তবে ? নিজেও তো ভেতরে ভেতরে ছটফট করছ। এখনও এল না কেন, পৌঁছল না কেন। আমি ফোন করতে গেলেই ধমক দিতে।

ঠিক তখনই হর্ন, গাড়ি থামার শব্দ। এত ঘর্ঘর, এত আওয়াজ করে থেমেছে যখন, ট্যাক্সি না হয়ে যায় না।

সুপর্ণা দ্রুত পায়ে বারান্দায় চলে গেলেন। শুভব্রত ধীরে ধীরে এগোলেন।

নীচের থেকে চিৎকার এল। —দিদিমণি এসে গেছেন, মা!

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওঁরা নামতে শুরু করলেন।

—হোয়াট এ ল্যাংগোয়েজ। ছেলেবেলায় একবার তনু বলেছিল। সিঁড়ি আর ভাঙছে কই, যেমনকার তেমনি তো রয়েছে।

ওঁদের নামতে যত সময় লাগবে তার আগেই কাঁধে ভারী ব্যাগটা ঝুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে তনু।

একমুখ হাসির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে দিয়ে বললে, দেখে নাও, গোটা গোটাই ফিরেছি, হাত পা কিছু রেখে আসিনি।

তনু আগে আগে, ওর সঙ্গে পারবেন কেন ওঁরা। তাই পিছনে পিছনে।

—এক গ্লাস জল দাও তো মা।

ভারী ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। ধপাস করে বসল শোফায়।

—খুব ওয়ারিড হচ্ছিলে তো? ওটা তোমাদের রোগ। বলেই হাসি।

জলটা খেয়ে নিয়েই বললে, দাঁড়াও, আগে একটা ফোন করে দিই।

মা অনুযোগ করল, কাকে? সে তো পরে করলেও হবে।

কানেই গেল না। তনুকা উচ্ছল হয়ে বলে উঠল, জানো, প্লেনেই আমার এখানে একটা চাকরি হয়ে গেছে? প্রায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

—এয়ারওয়েজে? শুভব্রতর গলায় অসন্তোষ।

—না, না। দারুণ ভাল চাকরির অফার।

তারপর উঠে দাঁড়াল। —ফোনটা করি আগে, বলছি।

সুপর্ণা জিগ্যেস করলেন, কাকে? এত তাড়া কিসের?

তনুকা ততক্ষণে ডায়াল ঘোরাচ্ছে। ঘোরাতে ঘোরাতেই বললে, প্রদীপ্তকে।

শুভব্রত আর সুপর্ণা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। অবাক কাণ্ড। প্রদীপ্তকে আবার কেন!

সব তো চুকেবুকে গেছে। অর্থাৎ যাবে। তা হলে আবার তাকে ফোন কেন?

কিছুই বুঝলেন না দুজনে। চলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কি ভাবে কথা বলে, কি বলে একটু শুনতে পেলে মন্দ হত না। কিন্তু সেটা রীতিবিরুদ্ধ। নামে চিঠি এলে অন্য কেউ খুলে দেখার মতো।

ঘর থেকে দুজনেই বেরিয়ে যেতে যেতে, পায়ের গতি দুজনেরই হয়তো একটু বেশি শ্লথ হয়ে গিয়েছিল, শুনতে পেলেন সেই উচ্ছল হাসি। আনন্দের ফোয়ারা যেন। —দীপ, আমি। পৌঁছে গেছি। এখন আর টেনশন নেই তো? স্লিপ ওয়েল। বাই।

একটু পরে: এখন টায়ার্ড, কাল ফোন করব।

## দুই

মুখে যতই আমেরিকার প্রশংসা করুক এই পদ্মপুকুরের বাড়িতে ফিরে আসতে গেলে তনুকা যতখানি উন্মুক্ত মাঠের সবুজ হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারে, তেমনটি আর কোথাও নয়। অথচ ওর সঙ্গে এই বাড়িটার যোগ কতখানি! বলতে গেলে কিছুই না। এমন কি

প্রথম প্রথম নিজেকে এ বাড়ির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ওকে রীতিমতো অস্বস্তি পোয়াতে হয়েছে। অথচ বংশ পরম্পরায় ওটা ওদের পৈতৃক বাড়ি। শুভব্রতর। তবে এর খোলনলচে পাল্টানোর কাজে তনুকার কৃতিত্বই বেশি।

শুভব্রতর সঙ্গেই কি এ বাড়ির কোনও সম্পর্ক ছিল? যে টুকু সম্পর্ক তা শুধু দলিলে। কারণ শুভব্রত আর সুপর্ণাও জীবনের অনেকটা সময় বিদেশেই কাটিয়ে এসেছেন। তখন মাঝে মাঝে আসতেন এমন নয়, পাঁচ সাত বছর অন্তর। হয়তো পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জাগত, বাবা-মা যদ্দিন ছিলেন, তার একটা টান তো থাকেই, এলে কাকা জ্যাঠা, মাসি মেসোদেরও কাছের মানুষ মনে হত।

কিন্তু শেষের দিকে একটু ঘন ঘনই আসতে শুরু করেছিলেন শুভব্রত।

—কি ব্যাপার হে, এত ঘন ঘন? এখন প্রতি বছরই তো দেখছি ঘরমুখো।

শুভব্রত হেসে উত্তর দিয়েছেন, অ্যাক্লামেটাইজ করতে হবে না?

একটু নিশ্বাস নেবার সময় নিয়ে, অতিরিক্ত বিশুদ্ধ খাবার খেতে খেতে মোটা হয়ে গেছে বলে হাঁপ ধরে, অতএব তার টান রুখে দিয়ে আবার বলেছেন, আর তো দু বছর, তারপর ফিরে আসব ভাবছি।

যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত, হয়তো যৌবনকালে বিদেশে যাওয়ার সুপ্ত বাসনাও ছিল, সুযোগ হয়ে ওঠেনি, তাই গোপন একটা কাঁটা ফুটোবার চেষ্টায় বলেছিলেন, অ্যাক্লামেটাইজ তো জীবজন্তুদেরই করতে হয়। নিজের দেশে ফিরতে মানুষেরও লাগে নাকি।

বিদেশে যেতে না পেলে অনেকেই 'নিজের দেশ' কথাটার ওপর বেশি-জোর দিয়ে ফেলে। তা শুভব্রতর কান এড়ায় না।

তনুকার বাবা আসলে একজন সাকসেসফুল ম্যান। এখন এই পদ্মপুকুরের বাড়ির চৌহদ্দিতে ওঁকে লুঙি পরা অবস্থায় দেখলে কেউ ভাবতেই পারবে না। তনুকার দিকে তাকালে কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে, প্রকৃত পশ্চাৎপট কি ছিল।

সাফল্য ওঁকে অর্জন করতে হয়নি, আপনা থেকেই যেন হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল, অন্তত সে রকম একটা বিশ্বাস, শুধু ঈর্ষাকাতরদেরই নয়, শুভব্রতরও ছিল। বাইরে প্রকাশ করতেন না।

সব সফল লোকরা সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে গেলে অনেক সময় তাই ভেবে বসে। কারণ একটার পর একটা সিঁড়ির ধাপগুলো উঠতে তাকে যে কতখানি শক্তি সঞ্চয় করতে হয়েছে, এবং দক্ষতা, চূড়ায় উঠে গেলে তখন আর তা মনে থাকে না। মনে হয় সহজেই এসেছে। আর সেই সহজ সাফল্যের ধারণা মানুষকে এক ধরনের বিনয় দেয়, এবং আত্মধিক্কারের বিলাস।

'অ্যাক্লামেটাইজ তো জীবজন্তুদেরই করতে হয়' কথাটায় শুভব্রত কাঁটা দেখতে পাননি।

হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ও দেশে থেকে থেকে জীবজন্তুই তো হয়ে গিয়েছি।

যিনি প্রশ্ন করেছিলেন, একদা খুবই বন্ধুস্থানীয়, তাঁর বুকের ভেতরে লুকোনো টেপ-রেকর্ডারে একটি অনুচ্চারিত স্বগতোক্তি রেকর্ডেড হয়ে গিয়েছিল—শালা।

অবশ্য সে কারণে শুভব্রত একেবারে নির্দোষ অপাপবিদ্ধ ভালমানুষ মনে করার কারণ নেই।

গর্ব তাঁরও ছিল। এখনও আছে। ঈর্ষা দ্বেষ অহঙ্কার এ সব কার না থাকে। না থাকলে সে মনুষ্যপদবাচ্যই নয়। তবে কে কোনটা প্রকাশ করে ফেলে, কার কোনটা বেশি, তা আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। ভদ্রলোকরা ও সব সাধারণত চেপে রাখে,

ক্ষেত্রবিশেষে একটা গোলাপ ফুল এগিয়ে দিচ্ছি ভান করে সেটা এমন ভাবে এগিয়ে দেয় যে হাতে নিতে গেলেই কাঁটাটা আঙুলে ফোটে। ফুটে এক ফোঁটা রক্ত বেরোলে কি আনন্দ।

গাছের ডাল থেকে ভেঙে কেউ গোলাপ এগিয়ে দিলে সেটা কি ভাবে ধরতে হয়, শুভব্রত তা জানতেন। আগেই কাঁটা দু-একটা পটপট করে ভেঙে দিতেন। গর্বের বদলে বিনয় দেখালে, কিংবা নিজেকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে কাঁটা বিঁধবে কোথায়।

এখন সেই গর্বের জায়গাতেই কাঁটা বিঁধছে। আপনা থেকেই।

প্রথম যখন সুপর্ণার কাছ থেকে আভাস পেয়েছিলেন, বিষণ্ণতায় মন ভরে গিয়েছিল। তারপর মন শক্ত করেছেন ওঁরা দুজনেই। কি যায় আসে। ভূমণ্ডলে কার কি তোয়াক্কা করেন ? ঘরে ঘরে এ সব তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে। কেউ লুকিয়ে রাখে, ভেতরে ভেতরে লজ্জা পায়, আবার কেউ কেউ ঢাক পিটিয়ে বলে। যাতে ঢাকের আওয়াজে অন্যদের ফিসফিসানি চাপা পড়ে যায়।

তাই ভেবেছিলেন একটা শুকনো বিষণ্ণ মুখ নিয়ে এসে হাজির হবে তনুকা।

ও মেয়ের চোখে জল দেখা যায় না, তা বলে বুকের মধ্যে অশ্রুপাত ঘটে না তাই বা কি করে বলেন। তার ছাপ চোখে থাকে না, সারা মুখে সারা শরীরে পাওয়া যায়।

অথচ এতখানি প্লেন জার্নির পর এল, দিব্যি হেল অ্যান্ড হার্টি। এল যেন নাচতে নাচতে, ফুল ফোটাতে ফোটাতে। হৃষ্ট তো বটেই, ঈষৎ পুষ্টও। তার ফলে আরও সুন্দর লাগছে।

কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছেন না। ঝগড়াঝাঁটি, মন কষাকষি, কিছুই নয় তা হলে। মিথ্যে মিথ্যে কত কি ভেবে বসে আছেন ওঁরা।

তেমন কিছু হলে ঘরে পা দিতে না দিতে প্রদীপ্তকে ফোন করার জন্যে এই ব্যস্ততা থাকত !

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় একবার ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন, দিব্যি প্রফুল্লময়ী, আনন্দে উদ্দাম। কথাগুলোও কানে গেছে।

ঠিক আগের মতোই ইন্টিমেট কণ্ঠস্বর।—দীপ, আমি পৌঁছে গেছি। প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মরে যাইনি। এখন আর টেনশন নেই তো ? স্লিপ ওয়েল। বাই।

একটু পরে : এখন টায়ার্ড, কাল ফোন করব।

ঘর থেকেই বেরিয়ে এসে সুপর্ণা আর শুভব্রত দুজনে দু চেয়ারে মুখোমুখি বসে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। দুজনের মুখেই চাপা হাসি।

শুভব্রত বললেন, আমি কনফিউজড।

সুপর্ণা বললেন, ও এই রকমই। কখন যে কিসে বার্স্ট করে ! তারপরেই একেবারে জল।

শুভব্রতর আত্মবিশ্বাস টাল খেয়েছিল সুপর্ণার কাছ থেকে আভাস পেয়ে।

তাই বললেন, আমি তোমাকে তখনই বলেছিলাম। আরে বাবা তা হলে কি এত বছর চুপচাপ থাকত ?

স্বস্তি পেতেই মনে হল তাঁর গর্বের জায়গাটা ঠিকঠাক আছে, একটুও টলে যায়নি।

শুভব্রতর গর্ব এই তনুকাকে নিয়েই, নিজের সাফল্য নিয়ে নয়।

তনুকা নাম কেন অনুসন্ধান করলেই শুভব্রতকে আরেকটু চেনা যাবে।

চাকরি নিয়ে নিউ ইয়র্কে যাওয়ার পরপরই শুভব্রত আর সকলের মতোই হাবেভাবে উচ্চারণে, ভাষায় পোশাকে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বা পদক্ষেপের ছন্দে যেমন দ্রুত আমেরিকান বনে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, সকলেই করে, তেমনই ওঁর বুকের মধ্যেও

এক একদিন 'হারিয়ে যাচ্ছি' 'হারিয়ে যাচ্ছি' ভাবটা দেখা দিত। বিশেষ করে ক্বচিৎকদাচিৎ অতিরিক্ত মদ্যপান করলে।

তার ফলে যেখানে যৌবনের জীবন কেটেছে সেই কলকাতাকে কাছে টানতে চাইতেন, বিশেষ করে উইকএন্ডে।

সমুদ্রের ধারে কোথাও গেলে বীচে শুয়েবসে দু একখানা বাংলা বই পড়ার চেষ্টা করতেন। কে না জানে, বিদেশে গেলে দেশপ্রীতি বাড়ে। বাংলা নাটক, পথের পাঁচালী, দুর্গাপুজো। সুপর্ণার তাগিদে বঙ্গরঙ্গ সভাসমিতিতেও।

এমনি এক ছুটির সন্ধ্যায় কোন একটা পত্রিকায়, সুপর্ণা পড়তে বলেছিল, হাফ এ কলাম, পড়ে ফেলেছিলেন। সেই বহুপঠিত কাহিনী, শুভব্রতর কাছে তাজা নতুন। কাহিনী না বলে ইতিহাসের ছিন্নপত্র বলাই ভাল। 'দেবদত্ত নামে কোনো রূপদক্ষ...'

—সুপর্ণা! রূপদক্ষ মানে কি?

এ প্রশ্নে অবাক হওয়ার বা হাসিঠাট্টা করার কোনও সুযোগ নেই, কারণ শুভব্রত তার বছর কয়েক আগে চাকরিটা বাগিয়েছিলেন নিজের টেকনোলজিক্যাল দক্ষতায়। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন এবং দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আপন ক্ষেত্রের জ্ঞানাহরণের জন্যে যদি বা সময় পেতেন, অপ্রয়োজনীয় রসপ্রাপ্তির জন্যে বইটই পড়ার ফুরসত পেতেন না। সায়ান্টিস্ট, এঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞদের বৃত্তবহির্ভূত বই পড়া রীতিমত অবাক হওয়ার মতো ঘটনা। নেহাত বিদেশে না থাকলে, সুপর্ণার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কিছুটা বাঙালিয়ানা থাকলেও, শুভব্রত এ সব পড়তেন নাকি। বলতেন, সময় কোথায়?

সে কারণে সুপর্ণাই ছিলেন ওঁর অভিধান।

সুপর্ণা উত্তর দিলেন, স্কাল্পটার। ভাস্কর যাকে বলে।

—আই সী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, 'ভাস্কর' জানব না কেন।

ওই আধকলম লেখাটা পড়ে শুভব্রত সেদিন রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। থ্রিল্ড। এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা আইডিয়া এসে গিয়েছিল।

শুভব্রতর ধারণা তিনি অত্যন্ত প্রাকটিক্যাল মানুষ, রোমান্সটোমান্সে বিশ্বাস করেন না। সুপর্ণাকে সংগ্রহ করার সময় কতটা প্রেমে পড়েছিলেন, আর কতটা সুন্দর একটা বউ খুঁজেছিলেন এখন আর ওঁর কাছে স্পষ্ট নয়। সেজন্যেই সাহিত্যে বা সিনেমায় প্রেম দেখলেই ওঁর হাসি পায়। কিন্তু ওই দুটি লাইন ওঁকে দূর অতীতের স্বপ্নজগতে পাঠিয়ে দিল। কেমন উদাস হয়ে গেলেন। বারাণসীর অর্থাৎ বেনারসের দেবদত্ত নামের এক রূপদক্ষ সুতনুকা নামের এক দেবদাসীকে ভালবেসেছিল, এই সরল বাক্যটি দু' লাইনে ছন্দে লিখে মনের দুঃখে এক পাহাড়ের গুহায় খোদাই করে রেখে গেছে সেই ব্যর্থ প্রেমিক। হয়তো এই অপরাধে তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আর সুতনুকার কথা মনে রেখে ওই গুহাতেই হয়তো তার জীবন কেটেছিল।

এত শতাব্দী পরে আমেরিকার সমুদ্রতটে বসে শুভব্রতর মনে একটা সমবেদনা জাগল দেবদত্ত আর সুতনুকার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে আইডিয়া।

থ্রিল্ড্ হবার মতোই ব্যাপার। সামান্য একটু পান করেছিলেন, তাই মন বলছিল, দিশি হও, দিশি হও।

তাই বললেন, সুতনুকা নামটা সুন্দর, তাই না?

সুপর্ণা সায় দিলেন। —খু-উ-ব।

ছেলের নাম আগেই পছন্দ করে রাখা ছিল, শুভব্রত ফুরফুরে খুশিতে বলে উঠলেন, মেয়ে যদি হয়, নাম রাখবো সুতনুকা। কেমন?

কিন্তু যথাসময়ে মনে হয়েছিল ও নামটা স্টেটসের স্কুলেকলেজে বেমানান, একটু বেশি

দীর্ঘ। দীর্ঘতর বিদেশি নামগুলোতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে তেমন বড়োসড়ো মনে হয়নি। সুতরাং সুতনুকার প্রথম অক্ষর বর্জন করে নামকরণ হয়েছিল তনুকা।

সেই তনুকা যত বড় হতে লাগল শুভব্রতর ততই গর্ব। কারণ শৈশবে সে কথাবার্তায় অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং স্বভাবচরিত্রে তার কিঞ্চিৎ জড়তা থাকলেও, স্কুল রিপোর্টেই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে তনুকা রীতিমত ব্রিলিয়েন্ট।

'হারিয়ে যাচ্ছি', 'হারিয়ে যাচ্ছি' ভাবটা যে শুধুই শুভব্রতর মধ্যে ছিল, তা নয়। মেয়ে যত বড় হচ্ছে, তার দিকে তাকিয়ে সুপর্ণারিও বোধহয় কিছুটা আত্মবিশ্লেষণ ঘটছিল। নিজেদের দিকে তাকিয়ে কিছু কিছু অসন্তোষ এবং শূন্যতাকেই হারিয়ে যাওয়া মনে হ'ত, কিন্তু সেটা তীব্র হয়ে উঠতে লাগল তনুকার দিকে তাকিয়ে। নিজের শৈশবের সঙ্গে পদে পদে তনুকার শৈশবকে তুলনা করতেন সুপর্ণা। তুলনা করতে গিয়ে একদিক থেকে যেমন খুশি হয়ে উঠতেন, যা নিজে পাইনি তা দিতে পারছি, যা হতে পারিনি তনুকা তা হতে চলেছে। তবু এক এক সময় বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠত, বুকের মধ্যেই বলে উঠতেন, হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তনুকা।

মুখে বাংলা বুলি শোনাই যেত না, তার ওপর স্কুল থেকে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব চটকদারি ভাষা আমদানি করত তনুকা, যে সুপর্ণাও মাঝে মাঝে হকচকিয়ে যেতেন।

সুতরাং মেয়েকে দিশি করো, দিশি করো।

বাড়িতে বাংলা পাঠশালা খুলে দেওয়া হ'ল। সুপর্ণা একদিন বলে বসলেন, তনু, তুমি আমার সঙ্গে সব সময় বাংলায় কথা বলবে।

একেবারে ছোটবেলায়, তনুকার যাতে স্কুলে কোনও অসুবিধে না হয়, একদিন যেমন বলেছিলেন, আমাদের সঙ্গে সব সময় ইংরেজিতে কথা বলবে।

সেজন্যেই কিনা কে জানে, তনুকা কথাই কম বলত, হাবেভাবে একটা জড়তাও পেয়ে বসেছিল তাকে।

শুভব্রত এবং সুপর্ণার এতখানি শিকড়ে পৌঁছনোর চেষ্টা এবং মেয়েকে দিশি বানানোর স্বপ্ন অকারণ নয়। মেয়ের গতিবিধি অপেক্ষা মেয়ের বন্ধুদের গতিবিধি যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল না, তা নয়। সুপর্ণা যতই আধুনিকা হোন, এবং তার ওপর যত পুরু আমেরিকান পলেস্তারা পড়ুক, ধমনিতে তাঁর যে রক্ত বইত তা নির্ভেজাল পদ্মপুকুরের বাঙালি বাড়ির বউয়ের। সুতরাং কখনও কখনও আতঙ্ক হবারই কথা।

ওঁর হাস্যমুখর ভয়ের কথা শুনে শুভব্রত রসিকতা করে বলতেন, না হয় একটা আমেরিকান সাহেবকেই বিয়ে করে বসল, ক্ষতি কি।

রাগত স্বরে সুপর্ণা বলেছেন, না, তনু আর তা হ'লে আমাদের থাকবে না।

শুভব্রত হেসে উঠেছেন সেকথা শুনে। বলেছেন, আমরাই তো আর আমাদের নেই।

শিকড় সম্পর্কে সচেতনতা প্রথম দিকে ছিল না। গাঁয়ের ছেলে শহরে এলে যেমন সব গ্রাম্যতা বর্জন করে একটু বেশি এগিয়ে যেতে চায়, শুভব্রতর প্রথম প্রথম সেই অবস্থা। ওদেশটা তখন বেজায় ভাল লেগে গিয়েছে, আর কোনওদিন ফিরব সে-কথা মনেই হয়নি। কেন ফিরব, দেশ আমাদের কি দিয়েছে! ফিরে গেলেই বা কি দেবে?

তারপর ক্রমশ বয়েস বেড়েছে, থিতু হয়েছে দু'জনেই। কিন্তু বয়েস বাড়ার একটা অসুখকর দিকও আছে। তখন চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার দিনটা লক্ষ্যের মধ্যে এসে যায়। যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে। উপরন্তু ইনফ্লেশন তখন একটা বিভীষিকা। অতঃপর ডলারে উপার্জন করে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করতে পারলে সস্তার স্বদেশের মতো উপাদেয় আর কিছুই নেই।

কে যেন বলেছিল, আমাদের কথা আর বোলো না সুপর্ণা, জিনিসপত্তরের দাম যা

বাড়ছে দিনকে দিন...

তার দু'দিন আগেই সুপর্ণা মার্কেটিঙে বেরিয়েছিলেন, তাই শুনে হাসি পেয়েছিল। হাসিটা মুখে আনতে পারেননি, পাছে ওরা আঘাত পায়। দেখেছেন যথেষ্ট সস্তা।

শুভব্রত সে-কথা সুপর্ণার কাছে শুনে বলেছেন, লোকগুলো মোটেই হার্ডওয়ার্কিং নয়। না খাটলে আয় তো কম হবেই, তখন সব জিনিসেরই দাম মনে হয় আকাশছোঁয়া। ওখানে আমাদের পাঁচটা দিন যে নাভিশ্বাস উঠে যায় তা তো এরা জানে না, শুধু ডলার দেখে।

না, এতখানি টানা বাংলা বলতে গিয়ে তিনবার তোতলাতেন শুভব্রত, তাই দুটো ড্যাশের মাঝখানের অংশটুকুই বাংলায় বলেছিলেন। মাতৃভাষা আঁকড়ে ধরে রেখেও সুপর্ণার মুখ থেকেই পিছলে পিছলে ইংরেজি বুলি বেরিয়ে পড়ত। প্রথম প্রথম নাকে নস্যি নেয়া ইয়্যাঙ্কি টান আনতে সে কি কসরত, বুঝতে আরও।

শেষের দিকে যখন একবার এসেছিলেন, তনুকাকে সঙ্গে নিয়েই, তখন পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন চোখ কপালে তুলে বলেছে, আরে, মেয়েটা তো এখন দিব্যি বাংলা বলে।

ভাষার এমন মজা, চট করে আপনজন হয়ে যাওয়া যায়।

তনুকাকে দেখে বড়মাসি ভরা-কলসির গলায় বলে উঠেছে, ও মা, এ মেয়ে তো সে-মেয়েই নয়। হাসতে হাসতে বলেছে, কি রে তনু, তোকে ছোটবেলায় বদলে নেয়নি তো তোর মা ?

রসিকতায় তনুকার একটুও হাসি পায়নি। চট্ করে উত্তর দিয়ে বসেছে, তোমাদের এখানে হয় বুঝি এ রকম ?

বাব্বা ! এই একটি শব্দেই বড়মাসি বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে অবাক হয়ে গেছে তনুকার পরিবর্তন দেখে।

যারা একসময় বলত, 'লেখাপড়াই সব নয়, ফুটফুটে দেখতে হলেই হয় না, মুখে যে কথা ফোটে না মেয়ের', তারাই অবাক, এবং প্রশংসার বদলে 'কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, বয়েস মানে না, গুরুজন মানে না।'

শুভব্রতর মেজকাকা মানুষটি বড় ভাল। সাতে পাঁচে থাকে না, পারলে উপকার করে। বললে, 'ফিরে আসব' 'ফিরে আসব' তো করছিস শুভ। তা হ'লে ঘরদোর এখন থেকে মেরামত করিয়ে নে। তোর তো টাকার অভাবে থেমে নেই।

আবার একটু পরে : অবশ্য বলবি, কে করবে। লোকজন নেই।

এবং হাসি। সম্ভবত তারপরই বলতে চেয়েছিল, টাকা দিয়ে যা, আমিই না হয়...

কিন্তু তার আগেই তনুকা বলে বসল, আমি কি লোক নই, বাপি বলুক না, একমাস এসে থাকব, দেখবে কি করে তুলি বাড়িটাকে।

আবার 'বাব্বা'। এ মেয়ে মেয়ে নয়। চটপট হাঁটা দেখেই বোঝা যায়।

মেজকাকার বলতে ইচ্ছে করেছিল, জীন্‌স্ পরে হটাং হটাং করে হাঁটতে পারলেই পুরুষ হওয়া যায় না। বাড়ি সারানো যে কি জিনিস তা তো জানো না বাছা।

শুভব্রতকে বা সুপর্ণাকে তবু মুখের ওপর কিছু বলা যেত। এ মেয়েকে একেবারেই নয়। তনুকাকে যে ওরা অপছন্দ করে তাও নয়। কেমন এক ধরনের মিশ্র অনুভূতি ছিল ওর সম্পর্কে। মনে মনে তারিফ করত, সকলেই। মেয়েদের তো এইরকমই হওয়া উচিত। আবার ভেতরে ভেতরে একটা ভয়ও ছিল। ওকে দেখে আমাদের বাড়ির মেয়েগুলোও না ওইরকম হয়ে যায়। ওইরকম বলতে কিরকম সে সম্বন্ধে অবশ্য স্পষ্ট ধারণা ছিল না। শুভব্রতর কাকা জ্যাঠাদের বাড়ির কেউ বিলেত আমেরিকা যায়নি, কেউ বিদেশে চাকরিও করে না। তবু এই কলকাতায় বসেই বাড়ির মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ

প্রায় রাতারাতি পাল্টে গেছে। ঠেকাতে পারেনি কেউ। তারপর চোখে বেশ সয়েও গেল। তবে শালোয়ার-কামিজের ওপর দিয়েই বদলেছে, ওড়না না থাকলে একটু দৃষ্টিকটু লাগে এখনও।

তাই তনুকাকে হঠাৎ একদিন টি-শার্ট আর জীনসের প্যান্টে দেখে শুভব্রতর মেজকাকা বলেছিল, এ-সব এখানে নাই বা পরলে দিদিভাই, দেখতে ভাল লাগে না।

ঝটিতি উত্তর এসেছিল, আই স্পেশালিস্টের কাছে গিয়ে চোখ দেখিয়ে আসুন, আপনার চোখের দোষ হয়েছে।

বিশ-বাইশ বছরের কোনও মেয়ে যদি মুখের ওপর এ কথা বলে তা হ'লে মেনে নিতেই হয়। ভেতরে ভেতরে মনও মেনে নেয়, কারণ ছিপছিপে লম্বা চেহারার এই মেয়েটার গায়ের রঙও এমন উজ্জ্বল যে টি-শার্ট জীনসে ওকে দেখতে ভালই লেগেছিল। তার ওপর কোথাও কোনও জড়তা নেই। ওকে সব পোশাকেই সমান মানায়।

শুভব্রতর মেজকাকা, তনু যাকে কাকাদাদু বলতে শিখেছে, সেই অনন্তলাল এখন স্বীকার করে, যে সবই চোখের দোষ। কারণ, তনুকাকে নকল না করেও ওসব পোশাক ধীরে ধীরে ওর বাড়িতেও ঢুকে গেছে। তবু, ওরা শাড়ি পরলেই যেন বেশি ভাল লাগে।

প্রাচীনপন্থী হওয়ার যন্ত্রণা অনেক। তার চেয়ে যা আসছে তাকে দু'হাত বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে পারো বা না পারো, মেনে নাও।

তনুকা ঘরদোর মেরামতি করার কথা শুনে বলেছিল, আমি কি লোক নই, বাপি বলুক না, একমাস এসে থাকব, দেখবে কি করে তুলি বাড়িটাকে।

অনন্তলাল উপকার করতেই চেয়েছিল, কোনও স্বার্থ ছিল না, পাইপয়সার হিসেব রেখে শুভব্রতকে বুঝিয়েও দিত। আসলে শুভব্রতদের ফিরে আসায় অনন্তলালদের তখন একটা স্বার্থও ছিল। বাড়িটা তিন শরিকে ভাগ হয়ে সব পৃথক হয়ে গেলেও আমরা তো এক ফ্যামিলি। পাড়ায় গর্ব করে দেখাবার মতো। শুভব্রত সুপর্ণাই নয়, তনুকাও। এখন শুধু কথায় একটা বায়বীয় ধারণা হয় ওদের, চোখের সামনে এসে বসলে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

বাড়ি মেরামত যে ছেলেখেলা নয়, সেটা একটু খোঁচা দিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, বলতে পারেনি অনন্তলাল।

আবার এই বাচ্চা মেয়েটার কাছে, তনুর বয়েস তখন বিশ-বাইশ, হটে যাওয়া সম্ভবও নয়। অনন্তলাল ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছে, মেয়ে মানেই খাটো গোছের কিছু। চেহারায় গুণে, বিদ্যেয় বুদ্ধিতে কেউ মাথা তুলতে চাইলেই তাকে আসল জায়গায় খোঁচা দাও। কিছু না পারো, একটু স্ক্যান্ডাল রটিয়ে দিলেই সব ঠাণ্ডা।

অনন্তলাল মানুষ ভাল। খোঁচা দেবার ইচ্ছেও ছিল না, কিন্তু জন্মে থেকেই খাটো করে দেয়ার স্বভাবটা রক্তের মধ্যে এসে যায়। তখন তার মনেও হয় না কথাটা উচ্চারণ করাও অভব্যতা। অনন্তলাল পুরুষমানুষ, সে অতশত বুঝবে কি করে। মাসি পিসিরাই বোঝে না। তাদের কথাই তো কতবার ফূর্তির হাওয়াটাকে বিগড়ে দিয়েছে।

অনন্তলালের মুখে এসে গিয়েছিল, মিস্ত্রি খাটানো কি জিনিস, জানো না তো ভাই।

কিন্তু পলকের মধ্যে সেটা গিলে ফেলে বলতে হ'ল, তা শুভ, মেয়ের বিয়ে দেয়ার কিছু ভাবছটাবছ ?

সঙ্গে সঙ্গে তনুকার কি হাসি। হাসতে হাসতেই বললে, বিয়ে তো করব আমি, বিয়ে আবার দেবে কি ? মেট্রিমোনিয়াল কলম ? দুধে আলতা রঙ ? মায়ের বিয়ের যে ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল ?

ওর হাসির দাপটে অনন্তলাল একেবারে অনন্ত কালো হয়ে গেল।

তবু হারবার পাত্র নয় পদ্মপুকুরের ওই বনেদি বংশের কাকাদাদু। দাদু যখন, অনন্তলালের ধারণা, রসিকতা করাই চলে।

তাই প্রশ্ন করে বসল, তা ডেটিং ফেটিং চলছে নাকি ?

—অবকোর্স।

ভাগ্যিস সুপর্ণা কাছে ছিলেন না। বাবার কাছে মেয়ে অতিরিক্ত প্রশ্রয় পায় বলেই তাঁর ক্ষোভ আছে। তনুকা সম্পর্কে একটা চাপা আতঙ্ক। নিজেও যে মেয়েকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, ওদেশের নেশায় পড়ে ওদেশি ঘড়ির সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে তনুকে এতখানি জেদি আর স্বাধীনচেতা করে তুলেছেন সে কথা ভুলে থাকতে চাইতেন। দোষ চাপানোর জন্যে স্বামীর ঘাড়ের চেয়ে নিরাপদ আর কি আছে।

এ মেয়ে কখন কি করে বসে তার হদিস পাওয়া দুরূহ। হদিস পেলেও কিছু করার নেই। মাথায় যা ঢুকবে তা থেকে নড়ানো যাবে না। দু' একবার চেষ্টা করে নড়াতে পারেনও নি।

একবার এক বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ায় তদন্ত তল্লাশি চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। ওর সঙ্গে কোথায় যাস, কি করিস এতক্ষণ ?

হেসে উঠে সরল উত্তর। —আড্ডা দিই, বেড়াই। ও তো আমার বন্ধু।

তারপর আরও হেসে, হঠাৎ কোনও কোনও দিন জাস্ট চুমু। কেন তোমার আপত্তি আছে ?

সুপর্ণা যতই ইংরেজি বুলি রপ্ত করুন না কেন, রক্তে তো সেই পদ্মপুকুরের শ্যাওলা ভাঙা জলের মিশেল ছিল তখনও। ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলেও মুখে অপ্রতিভ ভাব যাতে না ফোটে সেই চেষ্টায় হাসতে হয়েছে। বলেছেন, তোর সঙ্গে কথা বলাও দায়।

তনু ততক্ষণে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছে, আয়াম সিওর, আমি ওর প্রেমে পড়িনি।

মেয়েটা বুঝতও না, যে মায়ের কাছে এটা আরও বড় আতঙ্ক।

সেবার ক'সপ্তাহের জন্যে তো এসেছিলেন। আত্মীয়স্বজনের কাছে এ সব চাপা ঢাকা রাখার ইচ্ছে ছিল। তাই ডেটিংয়ের কথা অকপটে স্বীকার করছে দেখলে অস্বস্তি বোধ করতেন। ভাগ্যিস কাছে ছিলেন না।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই যে তখন দেশে ফেরার ইচ্ছে জেগেছিল, সেজন্যেই কিনা কে জানে।

হাজার হোক, শরিকি সম্পর্ক হলেও অনন্তলাল ওঁর খুড়শ্বশুর, চেহারাতেই বোঝা যায় একেবারে সেই প্রাচীনপন্থী। ওরা আর কোনওদিন বদলাবে না। তার সামনে মেয়ের এ ধরনের বেয়াদপি দেখলে নিশ্চয় ভুরু কুঁচকে সুপর্ণা মেয়েকে নিষেধ করতেন।

আর শুভব্রতকে ওই কথা শুনে হা হা করে হাসতে দেখলে নিশ্চয় বলে উঠতেন, তুমিই ওকে স্পয়েল করছ।

শরিকি সম্পর্কের আত্মীয়তায় একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলে সে অনেক ভাল। কেউ কারও হাঁড়ির খবর জানতে পারে না। কিন্তু যে হেতু শুভব্রত একজন সাকশেসফুল ম্যান, বলতে গেলে বংশের একটা গর্ব, সে কারণে বাকি দু' অংশের মানুষগুলো কারণে অকারণে গায়ে পড়া ভাব দেখাতে আসত। আড়াল করবেন কি করে !

শরিকি সম্পর্ক মানে এই পদ্মপুকুরের বাড়ি। ল্যান্সডাউন রোডের চারখানা বাড়ির পিছনের রাস্তায়, রাস্তাটা সরু নয়, পঁচিশ ফুট মতো চওড়া, গাড়ি ঘোরানো যায়। কিন্তু নামে স্ট্রিট হলেও ল্যান্সডাউন রোডের তুলনায় অপ্রশস্ত হওয়ায় অনেকে চিঠিতে ঠিকানা লেখার সময় ভুল করে লেন লিখে বসে। আভিজাত্যে ঘা খায়। অথচ এক সময় এ তল্লাটটা বাঙালিদের কাছে রীতিমতো পশ এরিয়া ছিল। এখনও আছে, তবে গুজরাতি

ব্যবসাদারদের কাছে। তাদের নেকনজর এখন এদিকেই।

কালচার জিনিসটাও প্রায় সেই রকম। অনন্তলাল আনন্দলালরা একসময় তাদের রক্ষণশীলতার জন্যে কালচার্ড হিসেবে গণ্য হ'ত। এখন শুভব্রত-সুপর্ণাও পিছিয়ে পড়ছে তনুকার কাছে। টিভি এসে যাওয়ার পর রেডিওর যা অবস্থা হয়েছে।

এই বাড়িটা তেমন পুরনো নয়। বছর চল্লিশ আগেকার পাকাপোক্ত গাঁথনি, দেখে বোঝা যায়, তৈরির সময় কোথাও টাকার টানাটানি ছিল না। যে স্বর্গত ব্যক্তিটি আপন বংশকে অর্থকৌলীন্য, সুতরাং বনেদিয়ানাও দিয়েছিলেন, প্রভূত অর্থের সঙ্গে তাঁর রুচিও ছিল এমন, চল্লিশ বছর পরেও যার গায়ে এতটুকু মরচে ধরেনি। তবু, পুঞ্জীভূত ঈর্ষা দ্বেষ, নাকি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, কোন্ কারণে এই বিশাল বাড়িটি তিন ভাগ হয়ে গিয়ে তিনটি পার্টিশন দেয়াল তুলেছিল, তা আজ আর কারও মনে নেই।

উত্তরাধিকারসূত্রে তার এক-তৃতীয়াংশ শুভব্রতর করায়ত্ত হয়েছে, অবশ্যই পিতামাতা স্বর্গত হওয়ার পর। শুভব্রত এবং সুপর্ণা আমেরিকাবাসী হয়ে যাওয়ার ফলে এটি ফাঁকাই পড়ে থাকত, কিন্তু শূন্যস্থান পূরণের জন্যে কেউ কেউ এসে দরবার করত অনন্তলাল বা আনন্দলালের কাছে। বিব্রত হলেও ওদের একটা আত্মতুষ্টিও ছিল। সমস্ত বাড়িটা দেখিয়ে বলা যেত, আমাদের বাড়ি।

শুভব্রতর বাবা অমৃতলাল বংশবৃদ্ধিতে অমনোযোগী হলেও দুই খুল্লতাত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে তৎপর। সুতরাং এই শূন্যগৃহ এবং শুভব্রত ও সুপর্ণার বিদেশে চাকরি এবং ডলার অর্জনের সক্ষমতা অন্য দুই-তৃতীয়াংশের ঈর্ষা উদ্রেক করলেও শুভব্রতর জন্যে তারা কিছুটা গর্বও অনুভব করে।

সেজন্যেই অনন্তলাল হয়তো বলতে চেয়েছিল যে, টাকাপয়সা দিয়ে গেলে বাড়ি মেরামতের কাজটা সেই করিয়ে দিতে পারবে। কারণ তার একটু আগেই শুভব্রত এবং সুপর্ণা তাদের বাসনা ব্যক্ত করেছিল।

শুভব্রত বলেছিল, ওদেশে পড়ে থেকে কি হবে ? ভাবছি রিটায়ার করে দেশে ফিরব।

তনুকা বলেছিল, ফিরতে হয় তোমরা ফিরে এসো, আমি ফিরছি না।

সুপর্ণা হেসে উঠে বলেছেন, তুই একা একা কি করবি ? চাকরি ?

তনুকা হেসে হেসে বলেছে, একা একাই থাকব ভাবছ কেন, তেমন হ্যান্ডসাম কাউকে ভাল লেগে গেলে দোকাও তো হতে পারি।

শুভব্রতর সেই প্রশ্রয়ের হাসি। সুপর্ণারও যে খুব একটা আপত্তি ছিল তা নয়। শুধু চেয়েছিলেন, হবু জামাইটি যেন চেহারাতেই শুধু হ্যান্ডসাম না হয়।

## তিন

রাত্তিরে খাবার টেবিলে একসঙ্গে খেতে বসে তনুকা বললে, জান বাপি, এ বাড়িতে এলেই আমার মনে হয় আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রশ্রয় দেওয়া এক জিনিস, আর মন থেকে মেনে নেওয়া আরেক। তনুকাকে শুভব্রতর চিরকালই মনে হয়েছে প্রবলেম চাইল্ড। ওকে বোঝা মুশকিল, কেমন যেন হেঁয়ালির মতো। সেই যে বিয়েটা করে ফেলল, সেও তো একটা হেঁয়ালি। অথচ ওর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এক দৃষ্টিতে নজর কাড়ে এবং বিদ্যা অর্থ চাকরিবাকরি কৌলীন্যে ওদেশি সমাজেও সমীহ আদায় করতে পারে এমন কয়েকজনই ছিল। তাদের দু'একজনের মধ্যে এমন কিছু ছিল যে ওঁদের মনের সায়টুকুও আদায় করে নিচ্ছিল।

মাঝে মাঝেই শুভব্রত এবং সুপর্ণা মেয়ের আড়ালে নিজেদের মধ্যে ফিসফিসও

করেছেন, সঙ্গে সম্মতির হাসি।

সুপর্ণাই শুধু একটু সন্দেহ প্রকাশ করতেন, ওর পছন্দের যে কোনটা সেটাই বুঝতে পারছি না।

শুভব্রত দিলখোলা মানুষ, অতশত ভাবেন না। এসব দায়দায়িত্ব উনি সুপর্ণার ওপরই ন্যস্ত করে দিয়ে নিশ্চিত ছিলেন। অথবা সংসার ওঁকে ছুঁতেই পারত না। সন্ধের পর কিঞ্চিৎ দামি পানীয় হলেই জীবনের সমস্ত অতৃপ্তি এবং বঞ্চনাকে ডুবিয়ে দিতে পারতেন। যদিও নিজে তা বিশ্বাস করতেন না, কারণ অতৃপ্তি বা বঞ্চনা ওঁর জীবনে যদি বা কিছু থেকে থাকে সেটুকু অনুভব করার বোধশক্তি তাঁর ছিল না। থাকলেও তা রোমন্থন করে যৎকিঞ্চিৎ দুঃখবিলাস উপভোগ করার সময়ও ছিল না।

তাই প্রদীপ্তকে যখন হঠাৎ বিয়ে করে বসল তনুকা, ওঁর মনে হয়েছিল যে চেয়ারে বসে আছেন সেটা হঠাৎ যেন কেউ উল্টে দিয়েছে।

ওকে বিয়ে করতে চায় শুনে বলে বসলেন, বেশ তো। ভালই তো মনে হয় ছেলেটিকে।

নিজেদের পছন্দ অপছন্দ মেয়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী কোনদিনই ছিলেন না। ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছেন, বাধা দিতে গেলে মেয়ে অবস্টিনেট হয়ে ওঠে। বাধা না দিলে ওর নিজের ভেতর থেকেই একটা প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কারণ প্রতি পদে পদে তনুকা যে নিজেকেই যাচাই করে চলেছে সে বিষয়েও ওঁর সন্দেহ নেই। এক এক সময় অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ হলেও পদে পদে ও যে যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজেই নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, সেটুকু বোঝার বুদ্ধি শুভব্রতর আছে। না থাকলে সাকশেসফুল হতে পারতেন না। যদিও সাকশেস বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ওঁর নেই।

সুপর্ণা হাসতে হাসতে বললেন, এ বাড়িতে এলে তোর তো ভাল লাগবেই, বলতে গেলে তোর হাতেই তো গড়া।

একটু অতিশয়োক্তি অবশ্যই, তবু সুপর্ণা ভুলতে পারেন না, তনুকা সাহস করে সব ভার নিজের কাঁধে নিয়ে না নিলে এ বাড়িটার এমন ভোল ফেরানো যেত না। তবু সেই পুরোনো দিনের কথা যে মনে পড়িয়ে দিলেন, তার একটাই কারণ। মেয়েকে খুশি করতে চাইছেন। আর সত্যি সত্যি যদি কোনও চাপা দুঃখ ওর বুকের ভেতর দানা বেঁধে থাকে, প্রদীপ্তকে নিয়ে, তা হলে মাতৃস্নেহের একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়ে সেটুকুর কষ্ট লাঘব করা। আর সেই ফাঁকে রহস্যটা জেনে নেওয়া।

ওঁরা তো ভেবেছিলেন ডিভোর্সটা ওখানেই সেরে আসছে।

—কি করব না করব এখনও ডিসাইড করিনি। পরে জানাব।

কিছুই জানায়নি, হুট্ করে একদিন ফোন করে বসল, ফিরে যাচ্ছি। একেবারে।

শুভব্রত এবং সুপর্ণা সেভাবেই নিজেদের তৈরি করে রেখেছিলেন। কিন্তু মেয়েটা যে চিরকালই হেঁয়ালি সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

প্লেন থেকে নেমে এতখানি পথ, সঙ্গে লটবহর, তোর তো একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা। শোফায় কি বিছানায় গড়িয়ে পড়ার কথা। নিদেন পক্ষে ঠাণ্ডা কিছু, অথবা চা কিংবা কফি।

একটা বিমর্ষ মুখ দেখবেন কল্পনা করে রেখেছিলেন। মনে মনে ভেবেছেন বিয়ে তো আমরাও করেছি, একটা দিন স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে বুক ভার হয়ে থাকত। আর ওই যে মানুষটি মেয়েকে কাছে পেয়ে বুকের চাপা আতঙ্ক সত্ত্বেও দিব্যি হেসে হেসে কথা বলছে, তখনও ওর মুখখানাও জমাট মেঘ।

তাই সুপর্ণা ভেবেই পাচ্ছিলেন না, তনু এমন উৎফুল্ল মুখ নিয়ে কি করে এল, আর ওটা

যদি ওর মুক্তি পাওয়ার আনন্দই হয়, তা হলে এক মুহূর্ত বিশ্রাম না নিয়ে টেলিফোনের কাছে ছুটে গেল কেন ?

যেটুকু কানে এল, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কান পেতেই শোনার চেষ্টা করেছেন, এবং শুনে অবাকও হয়েছেন। আর কাউকে নয়, প্রদীপ্তই বোধহয় আসার সময় বলেছে, খুব টেনশনে থাকবে তনু বাড়ি না পৌঁছনো অবধি, তাই এসেই ফোন, মাঝরাত্তিরে ঘুম ভাঙিয়ে। ওখানে এখন মাঝরাত্তিরই।

চুকেবুকেই যদি গিয়ে থাকে তা হলে তার টেনশন হল আর না হল, তোর এত মাথাব্যথা কিসের।

ন্যাকামি। প্রদীপ্তর অত টেনশন হবার কথাই নয়। বিশেষ করে তনুকে নিয়ে এত দুর্ভাবনা ওঁদেরই হয় না।

সকালে যে উদ্বেগ নিয়ে দু'জনে বসে ছিলেন, সেটা তনু একা আসছে বলে আদৌ নয়। আসলে এতদিন বাদে তনু আসছে বলে। তার ওপর প্রদীপ্তকে নিয়ে একটা রহস্য করে রেখেছে বলে।

প্লেনে একা একা কোথাও যাওয়া আসা ওর কাছে জলভাত। আমেরিকা ইউরোপে কত অচেনা জায়গাতেই তো গেছে একা একাই। প্রথম প্রথম ওঁদের একটু দুর্ভাবনা হত। এখন হয় না।

'এ বাড়িতে এলে তোর তো ভাল লাগবেই, বলতে গেলে তোর হাতেই তো গড়া।' সুপর্ণা যেন খুশি করার জন্যেই বললেন।

তনুকা প্রশংসা শুনতেই অভ্যস্ত। বেশ ভালই লাগে। ও দেখেছে, প্রশংসা মানুষকে নিজের মাপের চেয়ে বড় করে তুলতে প্রেরণা দেয়। ওদেশে সবাই যে সব ব্যাপারে এত হাততালি দেয়, প্রশংসা করে, সেটা শুধুই সৌজন্যবোধ নয়। নাচ গান বাজনা, ম্যাজিক শো কিংবা নীরস বক্তৃতা, সবেতেই হাততালি দিয়ে হল ফাটিয়ে দেয়। তার একটা কারণ, ওরা উপভোগ করতে জানে, উপভোগ করতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ ওরা উৎসাহ দিতে চায়।

তনুকা সেবার যখন এসেছিল, প্রদীপ্তকে সঙ্গে নিয়েই, একটা ম্যাজিক শো দেখতে গিয়েছিল। নামী ম্যাজিসিয়ান, এক একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছে, বেশ ভালই, তিন চারটি লোক শুধু হাততালি দিচ্ছে।

শো শেষ হতে এক নামী অবাঙালি গায়িকাকে স্টেজে তোলা হল।

তিনি এক কড়া ধমক দিলেন, বললেন, বাঙালিরা হাততালি দিতে জানে না, হাততালি দিতে শিখুন।

বললেন, আমার একটা গানে হাততালি পড়লে পরের গানটা আরও ভাল হয়।

তনুকা সকলের দেখাদেখি ওদেশে বিস্তর হাততালি দিয়েছে, তার মধ্যে যে এমন একটা মন্ত্র আছে জানত না। সেই গায়িকার কথা শুনে প্রথম সচেতন হয়। সত্যি, প্রশংসা ওকেও কতবার সাহস জুগিয়েছে।

প্রদীপ্ত বলেছিল, আসল ব্যাপারই উনি জানেন না। আমরা তো চাই না কেউ নিজের চেয়ে বড় হয়ে উঠুক।

মা যে মনে রেখেছে সে সব কথা, আর এখন প্রশংসা করছে, তা শুনে তনুর মন খুশি হয়ে উঠল।

কিন্তু মুখে বললে, মা, বাড়ি মানে এই বাড়িটা নয়। বাড়ি মানে তোমরা।

মায়ায় এবং স্নেহে সুপর্ণা ভিজে গেলেন।

শুভব্রত অরহরের ডাল দিয়ে পরোটা খেতে খেতে বললেন, তুই এলে তবেই বাড়িটা

বাড়ি হয়ে ওঠে।

পরোটার টুকরোটা চিবিয়ে চিবিয়ে গলা দিয়ে নামিয়ে শুভব্রত বললেন, এত লোনলি লাগত আমাদের...

তনুকা হাসল। বললে, বাপি, কাকাদাদুরা কি লোনলি নয়? মানুষ মাত্রেই তো একা।

শুভব্রতর বললেন, ঠিকই। একা আসে, আর একা যায়।

তনুকা হেসে উঠে উপহাসের স্বরে বললে, ফিলজফি?

কাকাদাদুর প্রসঙ্গ টেনে আনার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে।

নিজের ঠাকুর্দাকে তনুকা দেখেইনি। কারণ তনুকার জন্মের আগেই তিনি গত হয়েছেন। কাকাদাদুকে দেখেও যে তাঁর সম্পর্কে একটা আভাস পাবে তারও উপায় নেই। বাবা এবং মা বারবার বুঝিয়েছে, তিনি ওই কাকাদাদুদের মতো ছিলেন না। এরাও অশিক্ষিত নয়, কিন্তু শুভব্রত বলেছেন, বাবা ছিলেন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ, খুব প্রগ্রেসিভ ধরনের। অধ্যাপনা করতেন কোন কলেজে। ছেলেকে, অর্থাৎ শুভব্রতকে উচ্চশিক্ষিত করে তোলা ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনও আদর্শ ছিল না। উপরন্তু একটি মাত্র পুত্রেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ঠাকুর্দার গুণপনায় বিমুগ্ধ হবার মতো মেয়ে তনুকা নয়, ও জানে যে কোনও পুত্র পিতৃচরিত্রকে একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাতে অভ্যস্ত। ঠাকুর্দা সম্পর্কে প্রথম যখন শোনে, সে ছেলেবেলায় যখন বাড়িতে বাংলা পাঠশালা খোলা হয়েছে, তখন 'ঠাকুর্দা' শব্দটা শুনে হেসে উঠে বলেছিল, ঠাকুর্দা? সো ফানি! তারপর উচ্চকিত হাসি।

বাবার কাছে শোনা তাঁর সম্পর্কে যাবতীয় প্রশস্তিকে তাই কাকাদাদুদের সঙ্গে মেলাতে পারেনি।

শুভব্রত বাবা অমৃতলাল। তাঁর দু'ভাই অনন্তলাল ও আনন্দলাল। এই অনন্তলালকেই তনুকা কাকাদাদু বলে। আনন্দলাল হয়ে গেছে ছোটদাদু।

ও বললে, বাপী, কাকাদাদুরা কি লোনলি নয়? মানুষ মাত্রেই তো লোনলি।

তনুকা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো জেনেছে, চারপাশে অনেক বন্ধুবান্ধব, সঙ্গী সহচরী, আত্মীয়স্বজন থাকলেও মানুষের একাকিত্ব ঘোচে না। একা-একা বোধ থেকেই একসময় এক বন্ধু থেকে আরেক বন্ধুতে ছিটকে ছিটকে বেড়াত। এখনও, মেয়েপুরুষ বাছাবাছি নেই, মানুষ দেখলেই গায়ে পড়ে আলাপ করে, মিষ্টি হেসে ওর সপ্রতিভ আহ্লাদী ব্যবহার মানুষকে আপন করে নেয়। তারা কেউ কেউ ভুল বুঝে একটু এগিয়ে আসতে চাইলে কৌতুকের দেয়াল তুলে দিয়ে কি করে দূরে সরাতে হয় তাও জানে। প্রখর বুদ্ধি আর সপ্রতিভতাই ওর সম্বল। আর নিজের ওপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস।

অনন্তলাল শেষ অবধি না বলে পারেনি, মিস্ত্রি খাটানো যে কি জিনিস জানো না তো ভাই।

বাড়িটা মেরামত করার কথাই অনন্তলালের ভাবনায় ছিল।

শুভব্রত তার কয়েক বছর পরেই রিটায়ার করে দেশে ফেরার কথা ভাবছেন। সুতরাং নিজেদের মনোমত করে বাড়িটার ভোল পাল্টানোর কথা তখন শুভব্রতর কল্পনায়।

আসলে নিজেদের আর্থিক বা সামাজিক উন্নতির বদলে অনন্তলাল এবং আনন্দলাল বংশবৃদ্ধিতেই বেশি মনোযোগী হওয়ার ফলে শুভব্রতর এক তৃতীয়াংশকে এখনও বিশালায়তন মনে হয়, আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাকি দুই তৃতীয়াংশে স্থানাভাব।

ঘরভর্তি লোক থাকলেই যে মানুষের একাকিত্ব ঘুচে যায় না, এ কথা বোঝানোর জন্যেই তনুকা বললে, বাপি, কাকাদাদুরা কি লোনলি নয়?

প্রথম প্রথম যখন তনুকা এসেছে, এই আত্মীয়স্বজনের ভিড় ওর ভালই লাগত। বিশেষ করে ওরা যখন বিমুগ্ধ ভাবে ওর দিকে তাকাতো এবং ওর কোনও ফরমাশ খেটে

দেওয়ার জন্যে হুটোপুটি করত। কিন্তু প্রাইভেসি থাকত না বলে মাঝে মাঝে যে বিরক্তও হয়নি তাও নয়।

সবচেয়ে খারাপ লাগত ঢোলা ময়লা পাজামা আর হাফ হাতা নোংরা ফতুয়ার অনন্তলালকে। এই লোকটাকে খুড়শ্বশুর হিসেবে পরিচয় দিতেও সুপর্ণার লজ্জা করত। ওর সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মতো পুরুষ্টু সাদা গোঁফ নিয়ে হাসাহাসি করত তনুকাও। কাকাদাদু এসেছে না বলে বাবাকে খবর দিত, সেকেন্ড ব্র্যাকেট এসেছে। একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, ওঁর গায়ের জামাকাপড়ের চেয়ে মাথার বাবরি চুল আর গোঁফজোড়া বেশি সাদা।

অনন্তলাল মানুষ ভাল। উপকার করতেই চায়, চেয়েওছিল। তা না হলে মিস্ত্রি খাটানোর ভার নিজের কাঁধে নিতে চাইবে কেন। টাকা মেরে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বলেনি। ওর বিরুদ্ধে ছোটভাই আনন্দলাল বা তাদের পরিবারের লোকরাও কিছু কটু কথা বলে না। তাদেরই তো এসে আগেই শুভব্রতকে সাবধান করে দেওয়ার কথা। তারা না স্বজন! রেষারেষি, দ্বেষ, হিংসা না থাকলে আপনজন বলে কেন। তবু বলেনি।

লোকটার আসল দোষ, মেয়েদের খাটো মাপের মানুষ মনে করে। সেটা সুপর্ণা বা তনুকা সহ্য করতে পারে না। আরেক দোষ, মেয়েদের চারিত্রিক শূচিতাকেই একমাত্র পর্যবেক্ষণের তথা প্রশংসার বস্তু মনে করে। দ্বিতীয়টিতে সুপর্ণা তেমন উত্ত্যক্ত বোধ করেন না, কারণ প্রাকবিবাহ জীবনে দু'একটি অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতাকে উনি বেবাক ভুলে গেছেন। তনুকার আপত্তি আছে, অভিজ্ঞতার কারণে নয় নিশ্চয়ই, সম্ভবত তার প্রখর বুদ্ধির চুলচেরা বিচারে। আমি সমাজের জন্যে, নাকি সমাজ আমার জন্যে? এ প্রশ্ন ওকে বিব্রত করে, কারণ ছেলেবেলা থেকেই ও কোনও বিশেষ সমাজে মানুষ হয়ে ওঠেনি। না এদেশি, না ওদেশি।

খুড়শ্বশুরের সামনে মুখ ফুখে বলতে পারেননি সুপর্ণা।

চলে যাবার পর বলেছিলেন, মিস্ত্রি খাটানো যেন কি ভীষণ পুরুষালি ব্যাপার। আমাদের বাড়ির পাশের গুপ্তরা ..

বাপের বাড়িকে 'আমাদের বাড়ি' বলার অভ্যাস ছাড়তে পারেননি সুপর্ণা। বিয়ের এতকাল পরেও এবং বিদেশে গিয়েও। কিংবা বিদেশে গিয়েই হয়তো অভ্যাসটা আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

মেয়েদের খাটো মাপের মানুষ মনে করার জন্যে অনন্তলালকে দোষ দেওয়া যায় না। বংশ পরম্পরায় এই বনেদি ঘরের রক্ত যে ওর মধ্যে বয়ে চলেছে।

তার মুখের মতো জবাব হত যদি সুপর্ণা স্মরণ করিয়ে দিতেন আমেরিকায় ইনি কি চাকরি করেন এবং কত বেতন পান। এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি বলতেন যে তনুকাও ওখানে একটা চাকরিতে ঢুকেছে। তার মাসিক বেতনটা জানালেই অনন্তলাল ভিরমি খেত।

পরিবর্তে সুপর্ণা শুভব্রতকে বললেন, গুপ্তরা দোতলা তুলল। গুপ্তকাকু তো লোহা সিমেন্ট কিনে দিয়েই খালাস, অফিস চলে যেতেন। বাণীকাকিমাকে সবাই বলত, বাড়ি তো আপনিই তুললেন। কেউ কেউ খ্যাপাতো, এবার কন্ট্রাক্টরিতে নেমে পড়ুন।

সেটাই দেখিয়ে দিয়েছিলেন সুপর্ণা। কিংবা সত্যি বলতে তনুকা।

প্লেনে আসতে আসতে সে কথা মনে পড়েছিল তনুকার।

অনন্তলালের ছোট্ট নাতি বল্টু এসে বাড়ি দেখে বলেছিল, দেখালে বটে ফুলদিদি।

সেবার ফেরার সময় প্লেনে মা মেয়ে পাশাপাশি।

তনুকা হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেছিল, আমাকে বল্টু ফুলদিদি বলত কেন মা?

সুপর্ণা জবাব দিয়েছিলেন, বাড়িতে সাত আটটা মেয়ে কিংবা বউ থাকলে...

তার আগেই তনুকা প্রশ্ন করেছে, ফুল কেন ?

একেবারে আদরে ঢলে পড়া গলায় তনুকা নিজেই বলেছে, আসলে ফুল তো খুব সুন্দর। আমি সুন্দর তো, তাই...

বলেই হেসে উঠেছে।

মায়ের মুখেও হাসি। অন্য কারও মেয়ে নিজেকে নিজেই সুন্দর বললে খারাপ লাগত, হয়তো উপহাসও করতেন। কিন্তু নিজের মেয়ে নিজেকে সুন্দর বলছে, তাতে কোনও দোষ দেখলেন না। সুন্দরই তো। বলবে না কেন।

বল্টু ওর ছোট ভাই, তখন ছোট ছিল। টুনি তার ছোট দিদি।

একদিন বলেছিল, বল্টু তোর অত ন্যাওটা কেন রে ?

'ন্যাওটা' শব্দটা সেই প্রথম শুনল তনুকা।

ঠিকই। মুখ থেকে কথা সরলেই হল। কেক, আইসক্রিম কিংবা কোনও বিশেষ ধরনের ক্লিপ চাই। বল্টু যেখান থেকে পারে খুঁজে এনে দেবে।

মায়ের কাছে ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল, আমার গ্রেট অ্যাডমায়ারর।

বাড়িটা যখন ঢেলে চটকদার করা হচ্ছে তখন কোন কাজটা করে দেয়নি।

আশ্চর্য! এবার আসার সময় ওর জন্যে কিছু নিয়ে আসার কথা মনেই ছিল না।

মনে থাকার কথাও নয়। কারণ এবার ও একেবারেই ফিরে এল। বুকের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা নিয়ে, শূন্যতা নিয়ে এল বললে ভুল হবে। এই শূন্যতা ওর সঙ্গী হয়েই ছিল।

শুভব্রত বললেন, এ বাড়ি তো তোরই হাতে গড়া।

কথাটা অনেকবার শুনেছি, অনেকের মুখেই। শুনতে ভালও লাগে। মনে হয়, যেন কিছু একটা করেছি, করতে পেরেছি। সেই হাততালির মতো। ইচ্ছে হয়, কিছু করি, করে দেখিয়ে দিই। চারপাশের সকলের চেয়ে নিজের মাথাটা আরেকটু উঁচুতে তুলে ধরি। অভাব শুধু একটাই, কি ভাবে তুলে ধরবে, কোন পথে, সেটাই খুঁজে পাচ্ছে না।

পদ্মপুকুরের এই বাড়ির এক তৃতীয়াংশও যথেষ্ট সুন্দর এবং ভালই ছিল। কিন্তু বিদেশে থাকার ফলে চোখের রুচি পাল্টে গিয়েছিল। তাই ভোল পাল্টাবার চেষ্টা। তবে বলা যায় না, হয়তো ভেতরে ভেতরে শুভব্রত এবং সুপর্ণার অন্য ইচ্ছেও ছিল। নেপালি রঙিন মার্বেল দিয়ে বাড়ির সামনেটা বদলে ফেলার ইচ্ছেটার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় অনন্তলাল এবং আনন্দলালদের সঙ্গে গায়ে গা সম্পর্কটাকে লোকচক্ষে একটু দূরে সরিয়ে দেওয়া! আমরা ওদের মতো নই, আমরা অন্য।

চক্ষুশূল ছিল অবশ্য খড়খড়ির জানালা, আর সেই সরু সিঁড়ি। তিনভাগ নিয়ে যখন পুরো বাড়িটা একই বাড়ি, চওড়া সিঁড়িটা পড়ে যায় আনন্দলালের ভাগ্যে। দক্ষিণ পাওয়ার লোভে অমৃতলাল এ পাশের সরু সিঁড়িটা মেনে নেয়, যে সিঁড়ি দিয়ে কাজের লোকরা ওঠানামা করত।

এমনিতে ঘরগুলো বেশ বড়সড়, উঁচু সিলিং। সিঁড়িটা তাই একেবারেই মানাত না। সেটা দেখে তনুকা ফ্রকপরা বয়েসেই বলেছিল, আমাদের সিঁড়িটা, ছোটদাদু, তোমাদের মতো নয় কেন ? তোমাদেরটা লাভলি।

আনন্দলাল হেসে বলেছেন, তোমাদের যে তেমনি বড় বড় ঘর।

শরিকি ভাগ বাঁটোয়ারা ব্যাপারটা সে বয়েসে তনুকার মাথায় ঢোকার কথা নয়। সে বয়েসে তা নিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করার ইচ্ছে বা উৎসাহও ছিল না। এখন বুঝতে পারে বড় বড় আত্মতুষ্টি বা গর্ব দিলেও শূন্যতা বাড়িয়ে দেয়। আবার নিজেকেই প্রশ্ন করে, ছোট ছোট ঘর আর মাথা ঠেকা সিলিং হলেই কি বুকের ভেতরের শূন্যতা কমানো যায়।

অনন্তলাল, অর্থাৎ কাকাদাদু, বোঝাতে চেয়েছিল, খড়খড়ির জানালার সুবিধে অনেক। রোদ ঢুকবে না, কিন্তু আলো ঢুকবে, গরমের দুপুরে। বৃষ্টির সময় জলের ছাট আসবে না, কিন্তু হাওয়া ঢুকবে। খড়খড়ি নামিয়ে দিলে গ্রীষ্মের দিনে এয়ার কন্ডিশন।

কোনও যুক্তি ওদের মত পাল্টাতে পারেনি। কারণ, যা কিছু আমেরিকায় দেখেছে তাকেই তখন সুন্দর মনে হত।

সুতরাং সব বদলে ফেলে অন্য চেহারা দিতে হবে।

সুপর্ণার সঙ্গে তনুকা চলে এসেছিল। মেজকাকিমা—অনন্তলালের মেজছেলের বউ—ঠাট্টা করে বলেছিল, তনুর সঙ্গে এলে ?

সবাই হাসাহাসি করে বলত, মেয়ের সঙ্গে মাও এসেছে।

শুভব্রতর ছুটি পেয়ে আসতে দেরি হবে বলে ওরাই চলে এসেছিল আগে।

এক প্রোমোটার বন্ধুর সঙ্গে আগেই কথাবার্তা হয়েছিল। সে প্রথমে বাড়িটাই কিনে নেবার তালে ছিল, অসম্ভব জেনে শেষে বন্ধুত্বে ফিরে এসেছিল। বলেছিল, আমার এক সাব কন্ট্র্যাক্টরকে দিয়ে দেব, যেমনটি চাও করিয়ে নিযো।

সেই চিঠি নিয়েই চলে গিয়েছিল তনুকা।

ঠিকানা খুঁজে বের করা ওর পক্ষে একটু কঠিন ছিল। ও তো কলকাতার প্রায় কিছুই জানত না। এ শহরের সঙ্গে সুপর্ণার পরিচয়ও বিশ বছর আগের। ইতিমধ্যে সব নামই বদলে গেছে।

রাস্তাটা কোথায় বল্টুকে জেনে দিতে বলেছিল।

—তুমি কোথায় খুঁজে পাবে ফুলদিদি, চলো আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

সুপর্ণা বললেন, আমিও যাই ?

তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল তনুকা। বল্টুকে বললে, আমি একাই একশো। শুধু রাস্তাটা কোথায় বলে দাও।

মা একটু বিচলিত ভাবে বললে, পারবি তুই ?

তনুকা হেসে উঠে বললে, মা ভুলে যেও না, আই হ্যাভ আ প্রিটি ফেস।

সুপর্ণা বাংলা বই পড়তে ব্যস্ত ছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, বঙ্কিম লিখে গেছেন। জানতেন না, ভয়ও সর্বত্র।

## চার

ভয় কাকে বলে তনুকা জানেই না।

কলকাতা শহরে একটা ঠিকানা খুঁজে পৌঁছনো, একটা লোকের সঙ্গে দেখা করা, তাও বাবার বন্ধু। আশ্চর্য, তার জন্যেও বল্টু বলে কি না, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি, চলো। অনন্তলালও বলেছিলেন, ও আমি বল্টুকে বলে দেব, ও ঠিক নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে।

এদের ক্ষমা করা যায়।

কিন্তু মা কি করে বললে, আমিও যাব তোর সঙ্গে ?

তনুকার ইচ্ছে হয়েছিল, প্রশ্ন করে, মা, তুমি যখন অফিসে যাও কে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় ? যখন কেনাকাটা করতে বের হও, কিংবা ব্যাঙ্কে ডাকঘরে, কার আঙুল ধরে ধরে হাঁটো ?

তবে আর কাকাদাদুর কি দোষ, বল্টুই বা সঙ্গে যেতে চাইবে না কেন ?

তনুকার মনে হয়েছিল, বিদেশে এতকাল থেকেও মায়ের শুধু বাইরের চেহারাই বদলেছে, ভেতরে ভেতরে বোধহয় সেই পদ্মপুকুর।

মুখ ফুটে কথাটা বলেনি, বললে সুপর্ণা নিশ্চয় উত্তর দিতেন, মা সব সময় মা'ই থাকে।

হাতে ঢাউস ব্যাগটা ঝুলিয়ে বের হবার জন্যে তোড়জোড় করছে, শাড়ি গোড়ালি ছুঁয়েছে কি না দেখে নিল, ব্যাগের জ়িপ ফাসনার খুলে কাগজপত্তর দেখে নিয়ে বন্ধ করল, আর সুপর্ণা বলব কি বলব না ভাবতে ভাবতে শেষ অবধি হেসে বলেই ফেললেন, এই শাড়িটা পরলি ? তোকে যে গরিব গরিব লাগবে রে !

তনুকা হেসে বললে, লাগুক না, আমি তো বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি না।

একটু থেমে আবার হাসল, কাল ফুলের দোকান থেকে রজনীগন্ধা কিনলে, পুরোনো খবরের কাগজেই তো মুড়ে দিল।

সুপর্ণা জানেন, বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সিনেমায় গেলেও তনুকা এই পোশাকেই চলে যেত।

ওখানে থাকতে তনুকার ছেলেবন্ধুদের মধ্যে একজনের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব বোধহয় গাঢ় হবার দিকে। ছেলেটিকে, চেহারা চটপটানি— অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার চাকরি, সুপর্ণা এবং শুভব্রতর বেশ মনোমতো মনে হয়েছে। অভিপ্রেত বলেই ওঁদের দু'জনের মধ্যে একটু ফিসফিসানি এবং হাসিও।

একদিন বাড়ি থেকে বের হচ্ছে, সুপর্ণা বললেন, যাচ্ছিস, একটু ঝকঝকে হয়ে যা !

নুয়ে পড়ে দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে বেদম হাসি। কেন মা ?

ওই রকম একটা অট্টহাস, মেয়ের মুখে দেখে সুপর্ণা নিভে গিয়েছিলেন। তা হ'লে ওঁদের এতসব জল্পনাকল্পনা সব মিথ্যে নাকি ?

তনুকা ততক্ষণে হাসি থামিয়েছে। বলেছিল, কেউ আমাকে দেখে অ্যাট্রাক্টেড হ'ল কিনা দ্যাটস নান অফ মাই বিজনেস। আমি কোথাও অ্যাট্রাক্টেড হই কি না সেটাই বড় কথা। তা না হ'লে আর আমি 'আমি' কেন ?

অর্থাৎ বোঝাতে চাইল যে অন্য সব মেয়েদের থেকে ও অনেক পৃথক। তাদের মতো স্বামী শিকারের জন্যে ও মোটেই হন্যে হয়ে নেই।

তা হ'লে সেদিন অকপটে 'হঠাৎ কখনও দু'একটা চুমুটুমুর কথা বললে' কেন ? নিছক সঙ্গ পাবার জন্যে উদাসীন একটা চুমু দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করা ? নাকি কোনও কোনও মুহূর্তে এ কঠিন জেদি মেয়েটাও দুর্বল হয়ে পড়ে !

সুপর্ণার কাছে তাঁর মেয়ে এই তনুকা এত বছর বাদেও একটা রহস্যই রয়ে গেছে। সত্যি হেঁয়ালি। ভালবাসি না, প্রেমে পড়িনি, অথচ একজনকে হঠাৎ চুমু খেতে দেওয়া, এ সব ছেলেবেলায় শুনলে তো উনিও ভিরমি খেতেন। ওই খুড়শ্বশুর অনন্তলাল বা তার গিন্নি জানলে তো কান পাতা দায় হবে। স্ক্যান্ডাল রটাবে। মেয়ের জন্য শেষে মায়ের নামেও।

মেয়ে দূরে দূরে আছে, ওঁরা ফিরে এলেও দূরে দূরেই থাকবে, এই যা রক্ষে। একটা কাউকে বিয়ে করে ফেললে উনি নিশ্চিন্ত।

এখন যে এই পদ্মপুকুরের বাড়ির পলেস্তারার খোসা ছাড়িয়ে শুভব্রত তার একটা 'নিউ লুক' দেবার স্বপ্ন দেখছে, সবই অর্থহীন হয়ে যাবে তনুকা পছন্দসই কাউকে বিয়ে করতে না পারলে।

নিজেদের এখন আর মিড্‌ল্ ক্লাস মনে হবার কথা নয়, ছিলও না কোনওদিন, বিশেষ করে যাদের কলকাতা শহরে পদ্মপুকুরের ওই বিশাল বাড়ি। তবু মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় আছে নাকি ? কুকুরের যেমন একটা গন্ধ শোঁকার, গন্ধ চেনার ইনটুইটিভ পাওয়ার আছে, বাঙালির তেমনি, বাঙালি কেন, সারা ভারতবর্ষেরই— মেয়ের চরিত্র আর মেয়ের বিয়ে।

খুড়শ্বশুর অনন্তলালও তো তনুকা কি চাকরি করে না-জিগ্যেস করে শুভব্রতকে খোঁটা

দেবার জন্যে কি না কে জানে, জিগ্যেস করেছিলেন, মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছটাবছ শুভ ?

নিজে শোনেননি এই রক্ষে, রেগে গিয়ে দু' কথা শুনিয়ে ফেলতেন।

কিন্তু তনুকা তো ছাড়বার পাত্র নয়। ও বাড়ির মেজবউ একদিন এসে যেই না তনুকার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলেছে, 'তা তনু, বিয়ে করছিস কবে রে, নিজে করবি না মা বাবাকে দিতে হবে ?' অমনি তনু উল্লসিত হবার ভান করে বলে উঠেছে : পাত্র আছে না কি মেজ্‌কাকিমা ? দাও না গো আমাকে পার করে।

একটু থেমে হাসতে হাসতে : কানাখোঁড়া হলেও চলবে। একটু না হয় হোঁচট খাবে, একটু খুঁড়িয়ে চলবে।

আবার থেমে : দু' হাতে দুটো ক্রাচ কিন্তু চলবে না।

মেজকাকিমা চুপ, মুখ থমথম, যেন ভেতর থেকে বলছে, কি বেয়াদপ মেয়ে বাপু ! অথচ খারাপ ভেবে যে কিছু বলেছে, তাও নয়। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে সবাই ব'লে, তাই বলেছে।

মা একটা ভাল শাড়ি পরতে বলেছিল বলে বেরোনোর সময় তনুকা বললে, অভিসারে যাচ্ছি না, এই শাড়িটাই গুড এনাফ।

তনুকাকে বেশ দীর্ঘাঙ্গী বলা যায়। ইঞ্চির মাপে পাঁচ ফুট পাঁচ হলেও ওর সুন্দর ফিগারের জন্যে— কোমব সরু রাখার জন্যে নিত্যদিন সকালে সাহেবি কায়দার যোগ্যব্যায়াম করে, ইয়োগা, তাই শীর্ণকটি চেহারাটা আরও লম্বা মনে হয়।

একদিন এক বন্ধুকে, অবশ্যই ছেলে, জিগ্যেস করেছিল, আমার কোমরটা মোটা হয়ে যাচ্ছে নাকি রে ?

সে হেসে বলেছিল, সরু কোমর হলেই সুন্দর হয় ?

—হ্যাঁ। কারণ তনুকার ধারণা ওটা অবধারিত সত্য। তবে সৌন্দর্য অ' পা ফিটনেসের দিকেই ওর দৃষ্টি। বিদেশি যোগব্যায়ামও সে জন্যেই।

বন্ধুটি হেসে উঠে বলেছিল, তা হ'লে বোলতাই তো সবচেয়ে সুন্দর। বোলতার কোমর দেখিসনি ?

ওই শীর্ণকটি বা 'মাই প্রিটি ফেস' রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই চোট খেল। এ শহরের ট্যাক্সি ড্রাইভার সম্পর্কে ওর কোনও ধারণাই ছিল না।

বল্টুকে সঙ্গে নিতে চায়নি বলেই হয়তো সে রাস্তাটা সম্পর্কে খুব স্পষ্ট একটা ধারণা দিতে চায়নি। 'আমি একাই পারি' এমন একটা অহঙ্কার থেকে যে ওর সঙ্গ খারিজ করেছে তাও নয়। বাড়িতে কেক, আইসক্রিম গরম জিলেপি অর্ডার মতো এনে খাওয়ালে, সে ঠিক আছে। তা ব'লে বোকাসোকা একটা খুড়তুতো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা হাঁটা ? অসম্ভব।

বল্টু কম বয়েসে ওর খুব আজ্ঞাবহ ছিল, মনে হ'ত তনুকাকে যেন পুজোর বেদীতে বসিয়ে রেখেছে। তার ওপর পরীর দেশ থেকে আসা পরীর মতোই দেখতে সে। এ ক'বছর পরে দেখলে মাথায় একটু ঢ্যাঙা হয়েছে, কিন্তু মুখেচোখে একটুও চালাকচতুর ভাব ফোটেনি।

মাকে বলেছিল, বল্টুটার কেমন ভাত-ভাত চেহারা, না মা ?

ফর্সা চেহারার লোক একটু বোকাবোকা হ'লেই তনুকার তাকে কেমন ভাত-ভাত মনে হয়।

বল্টু রাস্তার হদিস স্পষ্ট করে দিতে পারেনি, বা চায়নি, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে

না। বেরিয়ে এসে পাশাপাশি তিন চারটে দোকানে ঢুকে জিগ্যেস করে নিল।

তারপর একটা ট্যাক্সি আসছে দেখতে পেয়ে বাঁ হাত তুলে থামতে বলল।

প্রথমটা থামলই না, মীটারে লাল কাপড় জড়ানো।

দ্বিতীয়জন থামল, মাথা নামিয়ে জানালা দিয়ে তনুকার দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিগ্যেস করল, কোথায় যাবেন ? এবং রাস্তার নাম শুনেই বিনা বাক্যব্যয়ে স্পীডে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ ছ'টা ট্যাক্সি ওকে রীতিমত তাচ্ছিল্য দেখিয়ে চলে যাওয়ায় ও যখন হাল ছেড়ে দিয়ে কোনও বাসে উঠবে ভাবছে, হঠাৎ একটা ট্যাক্সি থেমে পড়ল। চলুন দিদি, কোথায় যাবেন ?

দুটি বাঙালি যুবক বয়েসী ছোকরা সামনের সীটে। ওকে দেখে একটু যেন নিজেদের মধ্যে হাসি বিনিময় করল।

একটু মর্যাদায় লাগল, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে উঠেও পড়ল।

নতুন লোক, রাস্তাঘাট চেনে না, এমনটি দেখলেই ট্যাক্সির পোয়া বারো। মীটার যাতে একটু বাড়ে তার জন্যে সহজ পথে না গিয়ে একটু ঘুরপথে নিয়ে যাবেই।

যাক্।

ছোকরা দুটো নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, কথার চেয়ে হাসি বেশি, বদমাশ টাইপের কিনা কে জানে, তাই তাদের ভড়কে দেবার জন্যে তনুকা এক বিঘত আমেরিকান উচ্চারণে বুকনি ছাড়ল।

ভড়কে যাবার লোকই নয় ওরা, দিব্যি একজন বললে, দিদি, অত ইংরিজি জানলে কি ট্যাক্সি চালাতাম ? বাংলা ছাড়ুন।

ওদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার পর, মনে মনে তখন ভাবছে ছেলে দুটো মোটেই খারাপ নয়, একটু অভব্য, ওটা কালচারের অভাব, আর হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির নম্বর দেখছে।

পেয়ে গেল। অনেকগুলো দোতলা তিনতলার ফাঁকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো একটা আটতলা ফ্ল্যাট বাড়ি। ঘাড় উঁচিয়ে উচ্চতা দেখল না, কারণ ওদেশি স্কাই স্ক্র্যাপারের কাছে এটা নিতান্তই বেবি সাইজ।

দারোয়ানকে পিতৃবন্ধু প্রোমোটারটির নাম বলতেই সে লিফ্‌ট দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। বলল সাততলা।

ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই ছিল। ঢুকেই একটা বিশাল হল ঘর, একটা অংশে অনেকগুলো গদি আঁটা শোফা কোচ, কিন্তু প্রত্যেকটিতেই লোক বসে আছে। মাঝখানে একটা গোল টেবিলে ভিজিটর্স স্লিপ।

যে লোকগুলো অপেক্ষা করছিল, বুড়ো, প্রৌঢ়, গিন্নিবান্নি, ত্রিশোর্ধ্ব যুবক, প্রসাধন ও পোশাকে সুগঠিতা তন্বী, তারা সকলেই যে ওর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল তা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না।

তখনই একজন ঢ্যাঙা লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, একজনের নাম ধরে ডাকল। একজন নয়, দু'জন উঠল। বয়স্ক এক ভদ্রলোক, আর তাঁর স্ত্রী।

সোফা খালি পেয়ে আরাম করে বসার আগেই ভিজিটর্স স্লিপ নিয়ে নিজের নাম, ও বুদ্ধি করে বাবার নাম লিখে, বাবার নামের পরে 'অফ নিউ জার্সি, ইউ এস এ' লিখে দিল। এবং সেটা নিয়ে ঢ্যাঙা লোকটার পিছনে পিছনে ছুটে গেল।

স্লিপটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফাঁকা সোফাটায় বসল চামড়ার ব্যাগটা পাশে রেখে।

তনুকার ধারণা হয়েছিল ওর স্লিপটা পেয়েই প্রোমোটার ভদ্রলোক ওকে ডাকবেন। কারণ স্লিপে বাবার নাম লিখে দিয়েছে ও। চিনতে সুবিধে হবে বলে নিউইয়র্ক,

ইউ এস এ।

চটপট ডাক এল না।

প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছে, দ্বিতীয় ধাক্কা প্রোমোটারের অফিসে।

ফিসফিস কথা বলছিল সবাই, কিছু কিছু কানে আসছিল। বেশ বুঝতে পারল এরা সকলেই বলির পাঁঠা হবার জন্য ব্যস্ত। কোথাও একটা দশ-বারোতলা বাড়ি উঠছে, তাতে অসংখ্য খুপরি হবে, ছ'সাতশো থেকে বাইশশো স্কোয়ার ফুট অবধি, আর তারা চেকবই নিয়ে হাজির, সেই বিল্ডিংয়ে ছোট বড় কোনও একটা ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্যে। সকলের মুখেচোখেই উৎকণ্ঠা : পাব তো ?

নিজের ঠাকুর্দাকেই তনুকা দেখতে পায়নি, তিনি ওর জন্মের আগেই স্বর্গত হয়েছেন। সেই ঠাকুর্দার বাবাটিকে ও কল্পনাতেও আনতে পারে না। বড় জোর অনন্তলালের মতো ময়লা পাজামা এবং হাফহাতা ফতুয়ার মতো কেউ হবে। এ রকম একটা বাড়ি করার জন্যে বল্টুরা সবাই, এবং আনন্দলালদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাও দিনরাত তার সম্পর্কে কটূক্তি করে। এমন কি তনুকার বাবা মাও। 'একটা চওড়া সিঁড়ি করার জন্যে আরেকটু জায়গা এখানে রাখা যেত না ?' কিংবা 'জমির দাম তো তখন জলের দর, পিছনে কিছুটা বাগান থাকলে ক্ষতি হ'ত ?'

শুনে শুনে লোকটিকে নির্বোধ ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তনুকাও।

এই প্রথম তনুকা সেই প্রপিতামহের সুবুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন হল। এবং বুঝতে পারল সেই বিশাল বাড়ির এক তৃতীয়াংশও এ যুগে কতখানি গর্বের বস্তু। ওটুকু না থাকলে বাবা মাকেও হয়তো এই রকম একটা প্রোমোটারের সামনে উৎকণ্ঠা নিয়ে উবু হয়ে বসে থাকতে হ'ত। থ্যাঙ্কিউ, গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার।

আরও দু'জনের পর তনুকার ডাক এল।

মাথা ঠেকা শিলিং দেখতে ও অভ্যস্ত, বড় মাপের সিটিং রুমও। কিন্তু যে ঘরখানায় প্রোমোটার ভদ্রলোক বসেছিলেন, সেটি দশ বাই দশ।

এক মুখ হেসে : তুমি শুভর মেয়ে ?

তনুকার মুখও তখন ফুলঝুরি।

অনিমেষবাবু হাসতে হাসতেই বললেন, স্লিপে নিউ জার্সি লিখলে কেন ? বরং পদ্মপুকুর লিখলে চট্ করে চিনতে পারতাম। ব'সো। ব'সো।

দু'দুবার ধাক্কা খেয়ে তনুকার আত্মবিশ্বাস টলে গিয়েছিল।

অনিমেষবাবুর হাসি আর সৌজন্য সব ভুলিয়ে দিল।

বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম কোনো এন.আর.আই, ফ্ল্যাট কিনে রাখতে চায়।

তনুকা পাশে খালি চেয়ারটায় ব্যাগটা রেখে বসল।

তারপর জীপ-ফাসনার টেনে বাবার চিঠিটা বের করল। দিল অনিমেষবাবুকে।

তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে অনিমেষবাবু বললেন, প্ল্যান তো পাশ করিয়ে দিয়েছি। আরে বাবা, টাকা ছাড়লে কর্পোরেশনকে দিয়ে কি না করানো যায়। এ তো সামান্য ব্যাপার।

তারপরই ওই ছোট্ট ঘরের এক কোণে বসে থাকা একটি যুবক চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রদীপ্ত !

সেই প্রদীপ্ত। যাকে এই ছোট্ট ঘরেও তনুকা এতক্ষণ লক্ষই করেনি।

তনুকা তাকাল, সৌজন্যের হাসি দুলিয়ে তার দিকে তাকাতেই মৃদু হেসে প্রদীপ্তও ওর চোখে চোখ রেখেই চোখ সরিয়ে নিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে তনুকার বুকের অন্তঃস্থল থেকে একটা অনুচ্চারিত শব্দ বের হ'ল।

—বাঃ।

অনিমেষবাবু তাকে বললেন, প্রদীপ্ত, তুই তো কাজ চাইছিস, এদের রিবিলডিঙের কাজটা করে দে, আমার ছেলেবেলার বন্ধু শুভব্রত, তার মেয়ে...

তনুকার দিকে ফিরে : কি নাম তোমার ?

তনুকা নাম বলল। বাঃ, বেশ নাম।

তারপর হাসতে হাসতে : তুমি নিউ জার্সির পর ইউ এস এ লিখেছ, আরে বাবা, এই শর্মাও আমেরিকা থেকেই পাশ করে এসেছে।

লজ্জায় পড়ে গেল তনুকা। ও তো আর সত্যি সত্যি অনিমেষবাবুকে ঠিকাদার টাইপের লোক ভাবেনি। তবে খোদ আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে এখানে প্রোমোটার হয়ে বসে আছে তাও ভাবেনি। বড়জোর ভেবেছে যাদবপুর কি শিবপুরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বাপিও তো এখান থেকে পাশ করেই গিয়েছিল...

মনে মনে ভাবছে তখন অনিমেষবাবুকে 'কাকু' বলবে, না অনিমেষকাকু। ওরকম সম্বোধনে লোকে খুশি হয় তা লক্ষ করেছে।

অনিমেষবাবু আবার তাকালেন প্রদীপ্তর দিকে : কিরে করবি ?

প্রদীপ্ত ঘাড় নেড়ে সায় জানাল : বেকার বসে থাকার চেয়ে তো ভাল।

'বেকার'। কথাটা খট্ করে কানে লাগল তনুকার। একটু আগে যে ওকে দেখে বুকের ভেতরটা 'বাঃ' বলে উঠেছিল সেটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে স্লেট মোছার মতো মুছে দিতেও পারছে না। কিন্তু অনিমেষবাবুর ওপর বিরক্তও হ'ল ভেতরে ভেতরে। এদিকে বলছে বাবার ছেলেবেলার বন্ধু, অথচ নিজে কোনও দায়িত্ব না নিয়ে একজন বেকার লোককে কাজ জুটিয়ে দিচ্ছে।

সিদ্ধান্ত নেবার ভার ওর নিজের হাতে থাকলে ও তখনই 'গুডবাই' বলে চলে আসত। কিন্তু চিঠি লিখে বাবা যে আগেই এই অনিমেষবাবুর হাতেই ওদের সমর্পণ করে দিয়েছে।

তনুকা ভীষণ জেদি মেয়ে এবং হঠাৎ হঠাৎ রেগেও যায়। ভাগ্যিস চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েনি।

কারণ তখনই অনিমেষবাবু বললেন, প্রদীপ্ত, কাশীনাথকে আমি সঙ্গে দিয়ে দেব। তুই শুধু কাজটা তদারক করবি। আমিও সময় পেলে যাব মাঝেমাঝে।

তারপর সামনে দেয়ালঘেঁষা বেঁটে মাপের আলমারিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, শুভব্রতর ফাইলটা নিয়ে আয়।

প্রদীপ্ত উঠে গেল, আর তনুকা ফিরে তাকিয়ে দেখল আলমারিটার মাথায় একরাশ ফাইল স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

ওই স্তূপের ভেতর থেকে ফাইলটা খুঁজে বের করতে হবে, ওদেরই কাজ, এ সব ক্ষেত্রে চুপচাপ বসে থাকা তনুকার ধাতে নেই। ও বললে, আপনি বসুন, আপনি বসুন, আমি খুঁজে দিচ্ছি।

অনিমেষবাবু ধমক দিলেন ! তুমি ব'সো তো। হাসতে হাসতে বললেন, বেকার লোকদের একটু খাটাখাটনি করাই ভাল।

তারপরই বললেন, তুমি আবার সত্যি সত্যি ওকে বেকার ভেবে ব'সো না। আর্কিটেক্ট। মাথায় ঢুকেছে চাকরি করবে না।

একটু থেমে বললে, আমার দু'একটা প্ল্যান করে দিয়েছে, এখন হাতে আমার নতুন কাজ নেই...

তনুকা নিজেকে খুব বুদ্ধিমতী ভাবে এবং কেউ ওকে বা ওর কাজকে দায় ভেবে বসবে সেটা মোটেই পছন্দ করে না। সেজন্যেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গুডবাই বলবে কিনা

ভেবেছিল। ভাগ্যিস বলে বসেনি।

ফাইলটা নিয়ে আসতেই পাতা উল্টে, প্ল্যানটা মেলে ধরে দেখলেন, তারপর প্রদীপ্তকে দিলেন। —দেখে নে, তারপর তনুকার সঙ্গে চলে যা, বাড়িটা দেখে আয়।

—অনিমেষদা, তুমিও তো গেলে পারতে, যখন তোমার সময় হবে বলো না, এক সঙ্গেই যাব।

হয়তো লাজুক লাজুক মুখের প্রদীপ্ত ওর সঙ্গে যেতে সঙ্কোচ বোধ করছে, তনুকার মনে হ'ল। নাকি নিজের ওপর বিশ্বাস নেই।

অনিমেষবাবু বললেন, আমার আর সময় নষ্ট ক'রো না। বাইরে অনেকে অপেক্ষা করছে। ও বাড়ির সবকিছু মুখস্থ, বললাম না, ছেলেবেলায় ওখানে আড্ডা দিতাম।

প্রদীপ্ত হেসে বললে, ওটা তো তোমার চাল, ভিড় দেখানো।

তনুকা যে কোনও কথা চটপট বুঝে যায়, ওর আই কিউ অসাধারণ। কিন্তু প্রথমে বুঝতে পারেনি, বুঝতে পেরেই হেসে ফেলল।

—গাড়িটা নিয়ে যা। অনিমেষবাবু বললেন।

লিফ্‌টে আর কেউ ছিল না, শুধু ওরা দু'জন। প্রদীপ্তর চোখ অন্যদিকে। কিন্তু তনুকা সোজাসুজি তাকিয়ে দেখল প্রদীপ্তকে, মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত, নাক মুখ চোখের সাইড ভিউ, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, এবং ওর সঙ্গে উচ্চতার পার্থক্য। মনে মনে হাসল এবং ভাবল দিব্যি মানিয়ে যায়। ইচ্ছে করলে বন্ধু হয়ে যেতে পারে। হবে কি ? সম্পর্কটা ব্যবসার, না হওয়াই ভাল।

'গাড়িটা নিয়ে যা', অনিমেষবাবু বলেছিলেন, আর তা শুনে তনুকা খুশিই হয়েছিল। আবার ট্যাক্সি ধরতে হবে ওই চিন্তাটা এক রকম আতঙ্ক হয়ে গেছে। ভেবেছিল কোনও বাস ধরে ফিরবে। এখানকার বাসে এর আগেও চড়েছে, নামার সময় রীতিমত বিধ্বস্ত লাগে, কিন্তু বেশ একটা মজাও পেয়েছে। ভিড় ঠেলে নামতে যে এত সময় লাগে জানত না, দু' স্টপ পরে গিয়ে থেমেছে, তারপর হাঁটতে হাঁটতে ফেরা, সে আরও মজার।

নেমে এসে প্রদীপ্ত বললে, দেখি, ড্রাইভার ব্যাটা কোথায় খৈনি খাচ্ছে।

একটু পরেই তাকে নিয়ে ফিরে এল।

দু'জনে গাড়ির দিকে হাঁটছে, ড্রাইভার আগে আগে, তনুকা হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা প্রদীপ্ত তোমরা যে...

চোখ প্রদীপ্তর মুখের দিকে নিবদ্ধ ছিল বলে তনুকা লক্ষ করল প্রদীপ্ত রীতিমত হকচকিয়ে গেল।

মনে মনে হাসল, কিন্তু কিছুই লক্ষ করেনি এমন ভাব করে কথা শেষ করল : ওই তোমরা যে কাগজের ওপর একটা বাড়ির প্ল্যান ছকে দাও, ওটা কি পুরোপুরি কল্পনা ? না কি, কোনও বাড়ি আগে দেখেছ সেটাকেই নতুন করে...

প্রদীপ্ত ততক্ষণে কিছুটা অস্বস্তি এবং বিভ্রান্তিও কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু ও নিজে মেয়েটিকে কি বলবে ঠিক করতে পারছিল না। আপনি, না তুমি ?

মনে মনে ভাবল, ইংরিজি ভাষাটার কত সুবিধে, আপনি, তুমি, তুইয়ের কোনও ঝামেলা নেই। সেই অভ্যাস থেকেই ও হয়তো 'তুমি' বলে বসেছে। জানেই না, কোনও মেয়ে কোনও ছেলেকে হঠাৎ 'তুমি' বলে বসলে ছেলেটার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত্ করে ওঠে। তারপর চোখে রামধনু দেখতে শুরু করে দেয়।

গাড়ির পিছনের সীটে দু'জনে দু'কোণে বসল। তনুকাই ডানদিকে সিঁটিয়ে গেল, ও যতই মিশুকে হোক, অথবা আলাপে উদার, দূরত্ব রাখায় বিশ্বাসী। এই দূরত্বটা যেন স্পষ্ট ভাবে বলে দেয়, তোমার সঙ্গে আমি যতই আপন আপন ব্যবহার দেখাই না কেন, তুমি

আসলে বাইরের লোক, বড় জোর বসার ঘরে বসতে পাবে।

—বললে না ? তনুকা আবার প্রশ্ন করল।

প্রদীপ্ত বলল, যদি কোনও বাড়ি দেখেই করি, সে বাড়িটাও তো কেউ নিজের কল্পনা থেকেই করেছিল।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। ড্রাইভারকে বলাই আছে পদ্মপুকুর যেতে হবে।

প্রদীপ্ত হঠাৎ প্রশ্ন করল, নামটা তখন ভাল করে শুনিনি। কি যেন নাম ?

'আপনি' এবং 'তুমি'র দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে সেন্টেন্সটা আগেই ভেবে নিতে হয়েছে।

ও বলল, তনুকা।

এবং নিশ্চিন্ত ছিল এর পরেই শুনবে, বাঃ, কি সুন্দর নাম। কিংবা নামটা দারুণ মিষ্টি তো।

একটু চুপ করে থেকে প্রদীপ্ত বলল, নামটা কিন্তু আরো অনেক সুন্দর হতে পারত।

—তনুকা নামটা খারাপ বুঝি ? খিলখিল করে হেসে উঠল ও, নিজের হিসেব ভুল হয়েছে দেখেও।

প্রদীপ্ত বলে উঠল, না না, তা নয়। তবে কাছাকাছি একটা নাম আছে, আরো সুন্দর। হাজার বছরের পুরনো, আবার একেবারে নতুন।

তনুকা হাসতে হাসতে বলল, কি নাম ?

—সুতনুকা।

তনুকা হেসে বলল, জানি জানি। ওই নামটাই আমার ছিল। বাবা ছোট করে দিয়ে তনুকা করেছে। ওখানে স্কুলে আমাকে টোনি টোনি বলে ডাকত।

একটু থেমে বললে, আসলে মা বোধহয় রাখতে দেয়নি। হেসে উঠে বলল, দেবদাসীর নাম তো, তাই।

প্রদীপ্তর মুখে এসে গিয়েছিল, দেবদাসীরাও কিছু ফ্যালনা নয়, তারাই আমাদের নৃত্যকলাকে...

কিন্তু ও কোনও কথা বলল না, কারণ দেবদাসী প্রসঙ্গটা তনুকার সামনে তোলা উচিত হবে না। বিশেষ করে এই সদ্য আলাপ, তার ওপর তনুকার বাবার বন্ধু অনিমেষদা, যিনি ওকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, এবং ওকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চান।

তনুকার নিজেরই সন্দেহ ওর শরীরে 'হৃদয়' নামক কোনও বস্তু আছে কি না, সবটাই হয়তো মস্তিষ্ক, সেজন্য কথার মধ্যে একটু চমক দেওয়াই ওর অভ্যাস, মুখে আগল নেই।

বলল, সুতনুকা না হয়ে ভালই হয়েছে, দেবদত্তর মত একজন স্কাল্পটার কি আর আমার ভাগ্যে জুটত ? হেসে উঠল কথার শেষে।

প্রদীপ্ত বলল, সুতনুকার ভাগ্যেও ছিল না, থাকলে কি আর দেবদত্ত মনের দুঃখ গুহার মধ্যে খোদাই করে রাখত।

—তুমি এত সব জানলে কি করে, তুমি তো আর্কিটেক্ট।

প্রদীপ্ত হাসল। বলল স্থাপত্য গুহা থেকেই শুরু, খড়ের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি থেকেও।

—প্রদীপ্ত, তুমি গ্রাম দেখেছ ?

প্রদীপ্ত হেসে ফেলল—অনেক।

—আমার এত দেখতে ইচ্ছে করে। দেখাবে ?

প্রদীপ্ত আর হাসি সামলাতে পারল না। ওর ধারণা হল মেয়েটির মাথায় সম্ভবত একটু গোলমাল আছে। সত্যি যে কারও গ্রাম দেখার উদ্ভট বাসনা হতে পারে সে কথা প্রদীপ্ত

ভাবতেই পারে না। যেমন একটু আগেও ভাবতে পারেনি তনুকা ওকে প্রথমেই তুমি বলে বসবে।

ইউনিফর্মিটি ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে তা থেকে কেউ এতটুকু বিচ্যুত হলেই আমরা ধরে নিই তার মস্তিষ্কে কোথাও একটা স্ক্রু ঢিলে আছে। সবাই যা করে তোমাকেও তা করতে হবে। এক রকম পোশাক, এক রকম কথাবার্তা, এক রকম ন্যায়নীতি, উচিতানুচিত জ্ঞান এবং এক রকম ইচ্ছা। তুমি সমাজের মধ্যে থাকতে চাও বা না চাও, একটা শর্ত তোমাকে মেনে চলতেই হবে, তুমি নিজের মতো হবে না। হতে পাবে না। হলেই লোকে তোমাকে পাগল ভাববে।

প্রদীপ্ত বলল, আপাতত বাড়িটা দেখে আসাই কাজ আমার।

তনুকা বলল, শুধু দেখে আসাই নয়, ঠিক যেমনটি চাই সেইরকম করে দিতে হবে।

ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা ফুলের তোড়ার মতো নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলায় খুব যে একটা আপত্তি আছে তনুকার তা নয়। আসলে উৎসাহ নেই। যাদের সম্পর্কে ওর কোনও আকর্ষণ নেই, আগ্রহ নেই, কি হবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর এমন যদি কেউ এসে পড়ে যাকে ওর সত্যি ভাল লেগে যেতে পারে, আপন মনে হতে পারে, তা হলে তাকে সাজ প্রসাধনের বাইরের আসল মানুষটাকেই চিনে নিতে হবে।

সুপর্ণা কতবার অনুযোগ করেছেন, তোর কি একটু ছিমছাম সুন্দর হতেও ইচ্ছে করে না?

শুভব্রত বাধা দিয়ে বলেছেন, ভগবান তো ওকে যথেষ্ট সুন্দর করেই পাঠিয়েছেন, আবার খোদার ওপর খোদকারি করা কেন। কি বল, তনু?

তনুকা হেসে উঠেছে। বলেছে, আবার এর মধ্যে ভগবানকে টানাটানি কেন বাপি? অর্থাৎ বলতে চেয়েছে, তোমরা দু'জনেই তো আমাকে যথেষ্ট সুন্দর করে এনেছ।

মুখে বলেছে, তার চেয়েও সুন্দর একটা জিনিস দিয়েছ, এই জিনিসটা! বলে নিজের মাথায় আঙুলের টোকা দিয়েছে।

গর্বের মতো শোনালেও মানুষ সব সময় বিনয়ী থাকতে পারে না।

গর্ব করার কারণও যথেষ্ট আছে।

স্কুলে কলেজে 'ব্রিলিয়ান্ট' শব্দটার পিঠ চাপড়ানি শুনতে শুনতে শেষ অবধি যারা তলিয়ে যায়, বড় জোর একটা ভাল চাকরি বা অধ্যাপনা করে জীবন শেষ করে দেয় তনুকা সে দলের নয়। এম এস আর ডক্টরেট করার পর অধ্যাপনার অফারও পেয়েছিল। আমেরিকাতেই।

মাইনের অঙ্কটা শুনে শুভব্রত এবং সুপর্ণা দু'জনেই উল্লসিত। এ তো দারুণ অফার, নিয়ে নে।

ওদের উল্লাসের হাসি দেখে তনুকাও হেসে ফেলল। বলল, বাপি, একটা ফ্যাট স্যালারির চাকরি নিয়ে শরীরে কিছু ফ্যাট জমাব বলেই কি আমাকে এতখানি লেখাপড়া করিয়েছ?

বাবা মা দু'জনেই দুর্বোধ্য বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছেন। আর কিসের জন্যেই বা লোকে পড়াশোনা করে!

বললে, আফটার অল আমি একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, এ কথাটা ভুলো না। আমি কিছু একটা করতে চাই।

শুভব্রত বললেন, আর কি হবি? প্রফেসারি লাইনে কি হওয়ার শেষ আছে?

তনুকা বলল, ইউনিভার্সিটি তো একটা ছোট্ট ক্যাম্পাস। আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর দি

ইউনিভার্স।

একটু থেমে বললে, মাইক্রোবায়োলজির পৃথিবীটা কত বড় জানো? কয়েক হাজার জীবজন্তু নিয়ে এই পৃথিবী, কয়েক মিলিয়ন কীটপতঙ্গ পোকামাকড়। ব্যাস্। তাকেই কত বড় ভাবি আমরা। কিন্তু ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস এসব নিত্যদিন নতুন নতুন জন্মাচ্ছে। তার সম্পর্কে কতটুকু জানি আমরা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আই উইল প্রেফার আ ল্যাব।

এটাই তনুকার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। স্বপ্নে সেই ল্যাবরেটরিটা দেখেছে। কলেজের বাইশজন রিসার্চ স্কলারের সেই ছোট্ট ল্যাব নয়। যে কোনও একটা নামী আমেরিকান ওষুধ কোম্পানির বিশাল ল্যাবরেটরি। যেখানে একটা অ্যাসিডের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা টেবিলে পৌঁছে যায়। যতদূর চোখ যায় সারি সারি টেবিল, টেবিলে গবেষণার সাজসরঞ্জাম, আর টেবিলের সামনে ইউনিভার্সিটি থেকে ছেঁকে আনা রিসার্চ স্কলারের দল। নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছে, কিংবা পরীক্ষা করছে। একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে যেন অপার বিস্ময় লুকিয়ে আছে, যে কোনও মুহূর্তে যেন একটা পৃথিবীকাঁপানো আবিষ্কার ঘটে যাবে।

ওই অসংখ্য মানুষের মধ্যে সামান্য একজন গবেষক হয়ে থাকতে চায় তনুকা। একেবারেই দৃষ্টির আড়ালে, নিতান্তই 'ওয়ান অফ দেম' হয়ে। এর চেয়ে আনন্দ যেন আর কিছুতেই নেই। নিবিষ্ট মনে কল্পনার অ্যাসিড বদলে বদলে শুধু অপেক্ষা করা। কলেজে কোনও কোনও দিন আট-দশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিত, ভুলে থাকত বাইরের পৃথিবী। ঠিক সেই ভাবে এ জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। আর তারই ফাঁকে কোনওদিন হয়তো সামান্য থেকে অসামান্য হয়ে উঠবে। ওয়ান অফ দেম থেকে একজন, একমেব। বাঁ হাতে টেস্ট টিউবটা তুলে ধরে বলবে, দ্যাখো তোমরা, এই দ্যাখো, আমি পেয়েছি।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে শুভব্রত বলেছিলেন, ওরা তো বেশির ভাগই ফেল্সিওর্স।

তনুকা বলেছে, বাপি, তাতেই বা কি আসে যায়। একশো লোক ব্লাইন্ড লেনে ঢুকে ফিরে আসে, যে রাস্তা খুঁজে পায়, তাকে অন্তত ফিরে এসে বলতে পারে ওপথে যেয়ো না, সময় নষ্ট হবে, ওটা আসলে ব্লাইন্ড লেন।

এ মেয়েটা চিরকালই ওঁদের কাছে হেঁয়ালি। কিছু বুঝতে পারেন না। একটা ঘরের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থেকে কি যে ওর আনন্দ ও-ই জানে। পাশে রাখা স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে কাজ আর কাজ। আবার তারই ফাঁকে কফি ব্রেকের সময় কাউকে টেলিফোন করে ডেটিং। নেক্সট উইক এন্ড, স্যাটারডে, ছ'টা, ঠিক মনে থাকবে।

সুপর্ণার সে জন্যেই ভয় করত। বলতেন, সে সব হবে, তুই আগে বিয়েটা করে ফেল।

শেষ অবধি সত্যি-সত্যি একটা নামী ওষুধ কোম্পানিতে যেমনটি চেয়েছিল সেরকম একটা চাকরি পেয়ে গেল তনুকা। কি খুশি।

সুপর্ণা বললেন, এবার অন্তত বিয়েটা কর।

তারপর আজ আবার এসেছে। সেই মেয়ে।

ওঁরা তো সব ছেড়েছুড়ে কবেই চলে এসেছেন। সুখী জীবন। একেই হয়তো সুখী জীবন বলে। তারই মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছে তনুকা।

হ্যাঁ, তনুকা একাই নিউ জার্সি থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছে।

সুপর্ণা জানতেন মেয়ে সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে ডিমসেদ্ধ, কলা আর ড্রাই টোস্ট খেতে অভ্যস্ত। কিন্তু গরম জিলিপি ভীষণ ভালবাসে। যখনই এসেছে বল্টুকে অর্ডার

দিয়েছে। অর্ডারই বলা যায়। ছেলেটা হুকুম তামিল করতে পারলেই যেন খুশি হত। এতটুকু বিরক্তি নেই।

সুপর্ণা জিগ্যেস করেছিলেন, সকালে পাড়ার দোকানে বেশ গরম জিলিপি পাওয়া যায়, আনাবো ?

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত তনুকার, হাতের চারটে আঙুল দেখিয়ে বলেছে, চারটে।

হাসতে হাসতে বলেছে, মনে আছে মা, বল্টু যখন ছোট ছিল, ওকেও দুটো জিলিপি খাওয়ার জন্যে কত সাধাসাধি করতে হত !

সুপর্ণা হেসে বললেন, এখন তো আর আসেই না।

মনে মনে খুশি, যে ওঁরা এসে এখানে পাকাপাকি বাস করার পর এখন আর বল্টু বা অনন্তলাল কেউই বড় একটা আসে না। না এলেই ভাল। এলেই তো তনুকার ব্যাপারটা শুঁকে বেড়াবে। হয়তো খুশিই হবে।

আসলে সুপর্ণা যে ভাল বুঝতে পারছেন তাও নয়। কি ঘটেছে, সত্যি সত্যি কিছু ঘটেছে কি না তাও জানেন না। টেলিফোনে তো তনুকার অর্ধেক কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, গলার স্বরে কান্না ফুটে উঠছিল। 'আমি একেবারেই চলে যাচ্ছি, একেবারে। একাই।'

একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, জান মা, আমেরিকার সঙ্গে আমার একটা লাভ-হেট রিলেশন। ভালবাসা আর ঘৃণা—দুই-ই। আমি বোধহয় আর মানিয়ে চলতে পারব না। আমি এক-এক সময় ভীষণ কষ্ট পাই।

এখন সন্দেহ জাগছে, ওটা আমেরিকা সম্পর্কে, না প্রদীপ্ত সম্পর্কে।

কিন্তু তাই বা কেন মনে হবে। তেমন হলে কি এয়ারপোর্ট থেকে ফিরেই, এক কাপ চা-ও না খেয়ে, টেলিফোনের কাছে ছুটে যেত। পৌঁছে গিয়েছি এই খবরটুকু দেবার জন্যে তর সইল না কেন। আর পৌঁছনো সম্পর্কে তারই বা এমন টেনশন হবে কেন। 'এখন আর কোনও টেনশন নেই তো ?' আর কথা বলতে বলতে ওই যে হাসি, ওটাও তো কৃত্রিম বলে মনে হয়নি।

গরম জিলিপি চিবোতে চিবোতে পা-দুটো চেয়ারে তোলা, হাঁটু মুড়ে বসেছে চেয়ারে, হঠাৎ আদুরে গলায় বললে, মা, তোমার সেই তসরের শাড়িটা আজ পরতে দেবে, সেই যে চওড়া ভায়োলেট পাড়।

সুপর্ণা বললেন, পরতে কেন, ওটা তুই নিয়েই নে। তোকে বেশ মানাবে।

—সে জন্যেই তো বলছি। হাসল তনুকা। বললে, আজ, সেই প্লেনে আলাপ হয়েই চাকরি অফার করল...

হাতে দাঁতে জিলিপি নিয়েই উঠে গেল, বাঁ হাতে জিপ টেনে ব্যাগ খুলে কার্ডটা বের করে বলল, মিস্টার এন টি সোয়ামি...ভাবছি যাব একবার। হেসে উঠে বলল, ওই শাড়িটা পরে গেলে নির্ঘাত ব্যাটার মাথা ঘুরে যাবে।

সুপর্ণা বিষণ্ণভাবে বললেন, মাথা তো ঘুরেই গেছে, তা না হলে প্রথম আলাপেই কেউ চাকরি অফার করে। দেখিস আবার, কেমন লোক কে জানে।

তনুকা ভুরু কুঁচকে মার কথাগুলো শুনছিল, দপ্ করে বলে উঠল, সার্টেনলি নট। লোক খারাপ নয়। আর চাকরি আমাকে নয়, আমার কোয়ালিফিকেশনকে দিতে চেয়েছে।

মনে মনে ভাবল, যদি সৌন্দর্যকেই দিয়ে থাকে তাতেই বা দোষ কি।

প্রদীপ্ত বলেছিল, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও, ঠিক সময়ে তুলে দেব। এয়ারপোর্ট পৌঁছেও দেব আমি। প্লেন মিস্ করবে না।

সকালে ঠিক সময়েই প্রদীপ্ত ওকে তুলে দিয়েছিল, কাঁধে যে জায়গাটায় হাত রেখেছিল,

এখনও স্পর্শ মনে আছে। চোখ চেয়ে দেখেছিল, প্রদীপ্তর হাতে কফির পেয়ালা, কফি থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে।

দারুণ খুশি হয়েছিল ও, কিন্তু মনে মনে ভাবতে চেয়েছে এর আগে আর কখন কখন সকালের প্রথম কাপ কফি প্রদীপ্ত তৈরি করে দিয়েছে।

বুকের মধ্যে একটা ঠাট্টার সুর বেজেছে : দীপ, আমি বাঁচতে চলেছি কি না জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি যেন বেঁচে গেলে। তা না হলে এত আদর কেন ?

নিজে ড্রাইভ করে ওকে পৌঁছে দিয়েছিল প্রদীপ্ত।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে একটা চেয়ারে বসে ছিল তনুকা। আনন্দ না বিষাদ কিছুই বুঝতে পারছিল না, শুধু মাথার মধ্যে একটা শূন্যতা। বুকের মধ্যে কি যেন জমাট বেঁধে আছে, কিংবা দুঃখ আনন্দ স্মৃতি বিস্মৃতি সব তালগোল পাকিয়ে আছে।

ওকে বসিয়ে রেখে প্রদীপ্ত পায়চারি করছিল এখানে ওখানে।

—হোয়াই আর ইউ উইপিং বেবি ?

তনুকা চমকে উঠল। ও নিজেও টের পায়নি ও কাঁদছে। ওর দু'চোখে জল, যা কেউ কোনওদিন দেখতে পায় না বলে ওকে ভুল বোঝে। যারা চোখের জল বের করে নিজের ভেতরের শূন্যতা দেখাতে পারে, দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারে তারা কত ভাগ্যবান।

একটু অপ্রতিভ বোধ করল বলেই হেসে উঠে চোখ মুছল। নিজেই অবাক হয়ে গেল। একটা চাপা বিষণ্ণতা বোধ করছিল ঠিকই। কিন্তু কেন তাও জানে না। ভাগ্যিস প্রদীপ্ত দেখেনি, দেখলে কি ভেবে বসত কে জানে। ওরা এত বোকা হয়, এই পুরুষগুলো।

তনুকা জানে, ওর এই চোখের জলের একটা ফোঁটাতেও প্রদীপ্তর ছায়া পড়েনি। ওকে ছেড়ে আসতে হচ্ছে বলে যে ওর মনে কোনও দুঃখ বা কষ্ট হচ্ছে তাও নয়। মনে মনে বলল, আই হেট হিম, অ্যান্ড আই লাভ হিম। লাভ ? আবার প্রশ্ন করল নিজেকে। কুকুর বেড়াল পুষলেও তো তার ওপর একটা মায়া হয়, ও তো একটা জলজ্যান্ত মানুষ। ওর কথাই তো এখন ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবতে পারছে না। কারণ বুকের মধ্যে এখন অনুভব করতে পারছে একটা বিশাল ভয়েড। যার মধ্যে এখন কারও কোনও প্রবেশাধিকার নেই।

পাশের লোকটি নির্ঘাত ওর বয়েস বুঝতে পারেনি। না পারারই কথা। তাই বেবি বলেছে। নাকি দু'দিন বেড়াতে এসেই আমেরিকান বুকনি শিখে নিয়েছে ?

তোমার কেউ কি খুব অসুস্থ ? তুমি দেখা করতে যাচ্ছ ?

তনুকা বললে, না।

ওই লোকটি কে ? দূরে প্রদীপ্ত নিবিষ্টভাবে কি দেখছিল, তার দিকে আঙুল দেখাল লোকটি। কারণ কিছুক্ষণ আগে প্রদীপ্ত যে ওকে বসিয়ে রেখে গেল তা নিশ্চয় দেখেছে।

তনুকা বলল, মাই হাসব্যান্ড।

প্রদীপ্ত আর তনুকা একটু আগে যে ভাবে হাসাহাসি করছিল, কথা বলছিল, তা দেখে স্বামীকে ছেড়ে যাচ্ছে বলে কাঁদছিল কি না তা আর জিগ্যেস করল না। তনুকা বেঁচে গেল।

এবার আবার একটা প্রশ্ন এল।

তা হলে কাঁদছিলে কেন ?

তনুকা ঠোঁটে মৃদু হাসি দুলিয়ে বলল, আমি আমার ফিউচারকে বিদায় দিয়ে যাচ্ছি বলে।

লোকটির কাছে দুর্বোধ্য ঠেকল। —ফিউচার ?

মুহূর্তের মধ্যে তনুকা প্রগলভ হয়ে উঠল। উত্তেজনার স্বরে বলল, হ্যাঁ তাই। বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, আই অ্যাম এ মাইক্রোবায়োলজিস্ট।

পৃথিবী বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানিটার নাম বলল। গড় গড় করে নিজের অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের কথা। কি নিয়ে রিসার্চ করছিল তার কথা।

তারপর হাসতে হাসতে বলল, আমার মতো একজন মেয়ের এটাই তো ফিউচার। যাকে বিষয়ী লোকেরা প্রসপেক্ট বলে, তা তো আমি চাইনি।

তারপর বলল, আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি, কারণ সেখানেই আমার বাবা মা থাকেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি কি করব বলতে পারেন ? আমি কিছু একটা হতে চেয়েছিলাম, আমি এখন কিছু না-হওয়ার জগতে ফিরে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক তখনই ওয়ালেট খুলে একটা কার্ড বের করে দিলেন। বললেন, রেখে দাও। যদি মনে কর তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারব, দেখা কোরো।

তারপর আর কোনও কথা হয়নি। কার্ডটাও ভাল করে দেখেনি তনুকা। এমন কত কার্ডই তো ওর ব্যাগে জমা হয়, সপ্তাহে একদিন ওগুলো বের করে দেখে, দু'একটা রাখে, বাকিগুলো ফেলে দেয়। মনেই করতে পারে না কার কার্ড।

ভদ্রলোক একজিকিউটিভ ক্লাসের যাত্রী। তাই প্লেনে আর দেখাই হয়নি। কলকাতায় পৌঁছে এয়ারপোর্ট থেকে বেরনোর সময় মুহূর্তের দেখা।

হেসে বললেন, দেখা কোরো, আমি তোমাকে তোমার ফিউচার ফিরিয়ে দেব। তনুকা হেসে উঠেছিল।

ট্যাক্সিতে লাগেজ তুলে আরাম করে বসার পর লোকটির কথা মনে পড়তেই নিজের মনেই হেসেছে। মাদ্রাজি ভদ্রলোককে রীতিমতো বৃদ্ধ মনে হল এতক্ষণে। হাসল ও। লোকটা নিজেই এখন পাস্ট টেন্স হয়ে গেছে, বলে কি না আমাকে আমার ফিউচার ফিরিয়ে দেবে।

## পাঁচ

শুভব্রত বললেন, রোজ রোজ আমেরিকায় আই এস ডি করে এভাবে টাকার শ্রাদ্ধ করার কোনও মানে হয় না।

বললেন চাপা গলায়।

সুপর্ণা বললেন, ও তো বলেই দিয়েছে টেলিফোনের বিল ওই দেবে। ওর টাকা ও কি ভাবে ওড়াবে তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন ?

সেই চাপা গলায় ! কারণ তনুকা এখন ও ঘরে প্রদীপ্তকে ফোন করছে। আর এ সব কথা তনুকার সামনে বলার সাহসই নেই ওঁদের। বললে হঠাৎ রেগে গিয়ে কি করে বসবে কে জানে। হয়তো বলে বসবে তা হ'লে কি একটা আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে হবে আমাকে ?

কিন্তু শুভব্রতর কথাটাও শুনতে ভাল লাগল না।

বললেন, ওড়াবার মতো টাকা ওর আছে জানলে আমার মাথাব্যথা হ'ত না। জীবনটাকে নিয়ে তো ছিনিমিনি খেলেই চলেছে। ওর যা যোগ্যতা, স্টেটসের অত ভাল চাকরি ছেড়ে...চাইলেই লাখ লাখ টাকা করতে পারত। তা নয়, আমি কিছু হতে চাই। মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে রিসার্চ করব। রিসার্চ মানে ওষুধ কোম্পানির রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট। তাও ছেড়ে চলে এল। এখানে কতই বা পাবে ?

একটু থেমে বললেন, যেন টেলিফোনের বিলটা আমি দিতে পারব না। সুপর্ণা বললেন, কে কোনটাকে আত্মসম্মান মনে করে তুমি কি করে বুঝবে। আমি যে চাকরি করতাম তা কি শুধু টাকা রোজগারের জন্যে !

শুভব্রত কোনও উত্তর দিলেন না। কারণ চাকরি করা মানেই তো আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া। শুভব্রতর তাই ধারণা। আর টাকা রোজগার ছাড়া চাকরি করার অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে ব'লে মনে করেন না। কেউ কেউ যে শুধুই কাজ করার জন্যে চাকরি করে তা বিশ্বাসই করেন না।

কিন্তু এ সব কথা শুভব্রত আগে কখনও ভাবেননি। চাপা রাগটা আসলে তনুকা প্রদীপ্তকে ফোন করছে বলে।

তনুকা রাত্তিরে ফিরে এসে বললে, মা, প্রদীপ্তকে একটা ফোন করব।

অর্থাৎ তোমরা এখন এ ঘর থেকে যাও।

একটা কর্ডলেস রিসিভার ওঁরা চলে আসার সময় এনেছিলেন, সেটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। এখানেও পাওয়া যায়, কিন্তু কেনা হয়ে ওঠেনি।

সুপর্ণা বললেন. আসার সময় একটা কর্ডলেস নিয়ে এলেই পারতিস্।

তনুকা বললে, তোমরা তো বললেই পারতে। নিয়ে আসতাম।

সুপর্ণা বলতে পারলেন না, ফোনে যে সব কথা বলছিলি, তারপর কি টুকিটাকি জিনিসপত্তর আনার কথা বলা যায়। তোকে তো দেখে মনে হচ্ছে দিব্যি আছিস, কিন্তু আমরা যে ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছি তা তুই বুঝবি কি করে।

সুপর্ণা ভুলে গেছেন যে সামান্য একটা কর্ডলেস টেলিফোন আনতে গিয়ে আসার সময় কি ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল। বেশি সৎ হতে গিয়েছিলেন বলে কাস্টমস ওটা আটকে দিয়েছিল। শুধু হাজার দুয়েক টাকা ডিউটি দিয়েও নিস্তার নেই। ওটা জমা রেখে আসতে হ'ল ওদের কাছেই। কারণ টেলিফোন অফিস থেকে অনুমতি চাই। সে কি ছোটাছুটি। সেটা যদি বা আদায় হ'ল, টাকা নিয়ে ছোটো আবার এয়ারপোর্টে। অথচ এখানেই নাকি দেদার পাওয়া যায়, ফ্যান্সি মার্কেটে, আরও কোথাও কোথাও। টেলিফোন অফিসকে না জানালেই হ'ল।

তনুকা ভাবল একটা কর্ডলেস কিনে নেওয়াই ভাল। দিব্যি নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে ফোন করা যাবে।

আঙুল ব্যথা হয়ে যায় তনুকার, ডায়াল করতে করতে। কয়েকবার দেখা গেল কেউ কল চুরি করছে। যে সব জায়গায় বা যে সব নম্বরে ওদের চেনাজানা কেউ নেই সেখানে দেদার আই এস ডি কল করছে কেউ। হাজার হাজার টাকার বিল আসছে। তারপর বাধ্য হয়ে ডাইনামিক লকিং। তাই কোড নম্বর ডায়াল করে লক খুলতে হয়, তারপর অ্যামেরিকার লম্বা নম্বর।

—হ্যালো দীপ ! আছো কেমন ? বাঃ, হঠাৎ ফোন করলাম বললে কেন ? তুমি কি এক্সপেক্ট করছিলে না ? তা হ'লে রেখে দিই। ...ঠিক আছে, ঠিক আছে, রেখে দিচ্ছি না। কাল তো জেট-ল্যাগ, তবু এসেই খবরটা দিয়ে দিয়েছিলাম। তখনই বললাম না, কাল ফোন করব ?

একটু চুপচাপ।

তারপর আবার ! ভাল ঘুমিয়েছ তো ? আয়াম ফাইন। তোমার কথা বলো। প্লীজ ব'লো না তোমার একটুও একা লাগছে না। দীপ, আমার কিন্তু শুনতে ভাল লাগবে না। শোনো, একটা মজার খবর দিই।

একটু চুপচাপ। —কি হতে পারে বলো তো ? গেস্।

উচ্ছল হাসি। —না।
আবার হাসি। —তাও না।
হাসি বন্ধ রেখে। —ধ্যুৎ।
—পারলে না তো। শোনো দীপ, যা ভাবতেও পারবে না। আজই আমার একটা চাকরি, সম্ভাবনা নাইনটি পার্সেন্ট।
—সেই যে টাকমাথা মাদ্রাজি বুড়োটা পাশের চেয়ারে বসে ছিল, তখন তো বুঝতে পারিনি মাদ্রাজি, হি ওয়াজ সো নাইস টু মি... কার্ড দিয়েছিল... দেরি হ'লে হয়তো ভুলে যাবে, তাই আজই গিয়েছিলাম।
উচ্ছল হাসি। —শেষে প্রেমে পড়ে যাবে কিনা কে জানে। নাম আবার এন টি সোয়ামি। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বামী।
আবার হাসি। —ওকে স্বামী বলে ডাকতে গিয়ে হেসে না ফেলি।
সব শেষে। —তুমি আমাকে মাঝেমাঝে ফোন করবে তো ? বাঃ, আমি তো করবই।

ফোন ছেড়ে দিয়ে দুপুরের কথাগুলো মনে পড়ল।
তনুকা জানে ওর জীবনে মাঝেমাঝেই একটা উচ্ছলতার ঢেউ আসে, মিলিয়েও যায়। কোনও কিছুতে ওর যে বিশেষ আগ্রহ আছে তা নয়। হ্যাঁ, ইচ্ছে আছে, কিন্তু আগ্রহ নেই। আগ্রহ দিয়ে ইচ্ছেকে ধরে রাখতে হয়। ও পারে না।
এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফিরেই, তখন মনের মধ্যে উল্লাস, হাত-পা ছুড়ে বাবাকে বলেছিল, জানো বাবা, প্লেনেই একটা চাকরির অফার পেয়ে গেছি।
শুভব্রতর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল, তবু কিছু বলেননি। বরং উপভোগ করেছেন।
চওড়া ভায়োলেট পাড় তসরের শাড়িটা যখন মা'র কাছে চাইল, তখনও আগ্রহ ছিল, কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে মনে হ'ল চাকরিটা না পেলেই বা কি। ও তো সেই দরিদ্র ঘরের বেকার ছেলেমেয়েদের একজন নয়, যারা চাকরিটাকেই জীবনমরণের প্রশ্ন ভেবে নিয়ে টেনশনে ভুগতে ভুগতে শুকনো মুখে ইন্টারভিউ দেয় এবং শেষ অবধি পায় না।
তনুকা জানে ও চাকরি খুঁজবে না, মনের মতো একটা কাজ খুঁজবে। এন টি সোযামির ওখানে কাজটা কি তাই তো ভাল করে জানে না। পেয়ে গেলে পছন্দ হোক বা না হোক আপাতত নিয়ে নেবে। তারপর আমাকেই কেউ খুঁজে নেবে, আমাকে খুঁজতে হবে না।
ও রিসার্চ থামিয়ে দিয়ে, চাকরি ছেড়ে, দেশে চলে যাচ্ছে শুনে ওর বস্ অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিষণ্ণতায় ইহুদী সেই ভদ্রলোকের লম্বা মুখ আরও লম্বা হয়ে গেল।
—ওটা কিরকম দেশ ? আমি কখনো যাইনি। ডেভেলপ্‌ড্ ? ইনফ্রাস্ট্রাকচার কেমন ?
বস্ বললেই একটা ম্যানেজার ম্যানেজার ভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু এ লোকটি আদৌ তা নন। আসলে একজন প্রবীণ সায়েন্টিস্ট। একটু নামধামও আছে। কিন্তু ভারতীয়দের মতো কোন হাম্বড়াই ভাব ছিল না। ওদের প্রতিষ্ঠানের দু'একজন মাঝারি ধরনের ইন্ডিয়ান ! উফ্। তনুকার হাতের টেস্ট টিউব বা জ্বলন্ত বার্নারের দিকে তাকাতই না। সুযোগ পেলেই অকারণে গা ঘেঁষে দাঁড়াত বা মুখের দিকে চেয়ে থাকত।
তপতী, ওর বন্ধু তপু হেসে বলেছিল, কারও প্রেমে পড়ে গেলেই পারতিস।
—প্রেম ? সেটা কি জিনিস ?
তপু হেসে বলেছে, ওই যে মনের মধ্যে কিসব হয়।
—মন ? সেটা আবার কি ?
তপু হেসে বলেছে, দ্যাখ তনু, ন্যাকামি করিস না। প্রেমে পড়লে বুকের মধ্যে কিছু হয় না ? প্রদীপ্তর বেলায় অন্তত হয়নি ?

তনুকা. হেসে ফেলে বলেছে, অলুমিনাম ফয়েলের চৌকো বাটিতে মাটন বিরিয়ানি কিনিসনি কখনো ? প্রেম হ'ল ওই অ্যালুমিনিয়ম ফয়েল, খুলে ফেললেই তার আসল চেহারা।

তারপর একটু থেমে বলেছে, প্রদীপ্ত ? ওর সঙ্গে তো আমার শুধু বন্ধুত্ব ছিল, আছে এখনো। থাকবেও চিরকাল। স্রেফ বন্ধুত্ব থেকে বিবাহ।

তপুর কাছে সবটাই হেঁয়ালি ঠেকেছে। আর কোনও প্রশ্নই করেনি। হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছে, প্রেমেই যার কোনও আগ্রহ নেই, তার কোন জিনিসে আগ্রহ থাকবে ?

—কেন, চিকেন পকৌড়া, ফিশফিংগার। খাওয়াবি ?

উদ্দাম হাসি এরপর।

সেই যে বার মা মেয়ে এসে পদ্মপুকুরের বাড়িটার হাল ফিরিয়েছিল তখনই কিভাবে যেন বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল তপুর সঙ্গে। প্রথম আলাপ কোথায় তাও এখন মনে নেই।

এন টি সোয়ামির সঙ্গে দেখা করে সটান চলে গিয়েছিল সেই তপুর কাছে। রাত অবধি আড্ডা দিয়ে ফিরেছে।

বাড়ি ফিরে তসরের শাড়িটা ছাড়ল, বিছানায় ফেলে পাট করল, হাত চেপে চেপে ইস্ত্রি, তারপর গিয়ে মাকে ফেরত দিল।

মা বললে, তুই পরিস, ওটা তোকেই দিয়ে দিলাম।

কিন্তু শাড়িটায় কি সত্যি ওর কোনও আগ্রহ ছিল নাকি ? একটুও না। ওই যে মা কবে যেন বলেছিল, 'একটু ঝকঝকে হয়ে গেলেই তো পারিস,' সেজন্যে হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল টেকো এন টি সোয়ামির কাছে হ্যালোজেন ল্যাম্প হয়ে গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার। তখন খুব অহঙ্কারী মনে হয়েছিল লোকটাকে : আমি তোমাকে তোমার ফিউচার ফিরিয়ে দেব। একটা লোক নিজেই পাস্ট টেন্স হয়ে গেছে, সে আমাকে ফিউচার দেবে। মনে মনে হেসেছিল তনুকা।

'লোকটার কাছে একবার গেলে হয়,' এর বেশি কিছু ভাবেনি। তা হ'লে, ভায়োলেটপাড় তসরের শাড়িটা কেন ? কারণ : তুমি তো এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে আমার কান্নাসজল চোখ দেখেছ, বিষণ্ণ বিমর্ষ মুখখানা। তখন আমি ভেতরে ভেতরে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিলাম। ওটাই আমার আসল চেহারা নয়। আমার এই সুন্দর মুখ, এই সুন্দর শরীর যদি কারও পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, তা হ'লে যে কোনও অশীতিপর বৃদ্ধ, যে কিনা নিজেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তারও ইচ্ছে হবে, আহা, মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে একটু সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করি। করুণা, কিংবা তার কোমরজড়ানো হাড় বের করা আঙুলের লোভ।

তনুকা সেজন্যেই উজ্জ্বল হয়ে, প্রায় অলিম্পিকের দীপ্তশিখা মশাল হয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল। এবার দেখি, তোমার করুণা কিংবা লোভ, কোনটা বেশি মিস্টার এন টি সোয়ামি, তুমি হয়তো জানো না, তোমার করুণার হাত কিংবা লোভের হাত, কোনওটাই আমার নাগাল পাবে না। আমেরিকায় আমাদের ইনস্টিটিউটের একজন আমার দুর্বল মুহূর্তে আমার নাগাল পেয়েছিল। স্টুপিড ছেলেটা ভেবেছিল সে আমাকেই পেয়ে গেছে। সে এখন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আসার সময় তাকে একটা গুডবাই জানানোর কথাও মনে হয়নি।

বাড়িটা বেশ বড়, সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘাস বিছোনো, এখানে ওখানে ফুলগাছের গ্রোভ, লোহার ফটকের বাইরে থেকেই দেখতে পেল।

নাম আর নম্বর মিলে যেতেই এক মুহূর্ত কি ভাবল তনুকা, তারপর লেদারকালার চামড়ার ব্যাগটা হাতে দোলাতে দোলাতে নুড়ি পাথরের রাস্তা মাড়িয়ে হেঁটে গেল বাড়িটার

দিকে।

একবার মনে হ'ল এই নুড়ি ছড়ানো রাস্তা পার হতে হবে জানলে বাড়ির গাড়িটায় এলেই হ'ত। কিন্তু গাড়িতে এসেছি জানলে লোকটা—মানে এন টি সোয়ামি নির্ঘাত হাত গুটিয়ে নিত। ওকে আর স্টাডি করা যেত না। কিন্তু তাই বা কেন, ও তো দেখেছে অ্যামেরিকার এয়ারপোর্টে, শুনেছে আমি একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, চাকরি করতাম ওখানেই।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ব্যাগ থেকে কার্ডটা বের করে দেখল তনুকা, লক্ষ্যই করেনি, লোকটির নামের নীচে কোনও ডেজিগনেশন নেই। শুধুই প্রতিষ্ঠানের নাম। কে হে তুমি তালেবড় ব্যক্তি, টেনে আনলে আমাকে। 'তালেবড়' শব্দটা অনন্তলাল প্রায়ই বলতেন, অপছন্দের মানুষ হ'লেই।

আজেবাজে খুব একটা হবে না, কারণ আমেরিকায় গিয়েছিল, সম্ভবত কোনও কনফারেন্স টনফারেন্সে, অফিসের পয়সায়।

—আচ্ছা, মিস্টার এন টি সোয়ামি বলে কেউ কি...আমি কি ডেজিগনেশন জানি না।

রিসেপসনিস্ট হেসে ফেলল। বলল, ডেজিগনেশন ? হি ইজ দ্য ইনস্টিটিউশন।

তনুকার মতো মেয়েরও হাঁটু কেঁপে গেল কি !

তপুকে বলেছিল, আমি জানতামই না, জানলে বোধহয় যেতে সাহসই হ'ত না।

রিসেপসনিস্ট একজন পুরুষ, মেয়ে হ'লে হয়তো ওখান থেকেই ফিরিয়ে দিত আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে যাওয়ার জন্যে।

তনুকার নিজেরই মনে হয়েছিল, আমি এত নির্বোধ কেন। বাড়ি থেকে একটা ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যেত। হাসতে হাসতে বলা : আমি আপনার সেই পাশের চেয়ারে বসা বেবি, আপনি বলেছিলেন..

তনুকা বলল, আপনি একবার বলুন না, উনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। ভিজিটর্স স্লিপটা এগিয়ে দিল...

এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে রিসেপসনিস্ট কি বলল— ফোনে, পরমুহূর্তেই রিসিভার এগিয়ে দিল তনুকাকে।

সোয়ামি নিজেই। তনুকা সংক্ষেপে পরিচয় দিতেই, 'চলে এসো।'

রিসেপসনিস্টকে বলতেই সে একজন বেয়ারাকে ডেকে নির্দেশ দিল তনুকাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

ওর কানে তখনও বাজছে, ডেজিগনেশন ? হি ইজ দ্য ইনস্টিটিউশন।

টাকটাই শুধু মনে ছিল, তখন ও নিজে খুবই বিমর্ষ বলে চেহারাটা ভাল করে দেখেওনি। বেশ বাজে দেখতে, বেজায় কালো। হাঁড়ির মতো মুখ। টাক থাকায় সাদা চুল দেখে বার্ধক্য ধরার উপায় নেই।

তনুকা ঢুকে ওঁকে দেখতে পেল। এগিয়ে যেতে যেতে দেখল, উনি এমন চোখে দেখছেন তনুকাকে, যেন চিনতেই পারছেন না। তারপরই সহাস্যে অভ্যর্থনা। —এসো এসো, ওই শাড়িটা তোমাকে একেবারে অচেনা করে দিয়েছিল।

এরকম হয়, তনুকা আগেও লক্ষ করেছে। যাদের সঙ্গে অল্পক্ষণের আলাপ, পোশাক বদলে গেলে তারা অনেক সময় দেখে চিনতেই পারে না।

বসতে বললেন। —ইউ নীড এ জব, রাইট ?

—চাকরি না চাইলে এলাম কেন ? তনুকা হাসল।

তারপর উনি না চাইতেই পেপার্স এগিয়ে দিল। ইচ্ছে করলে অনেক কিছু আনতে পারত। আনেনি। শুধু ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ সার্টিফিকেট, রেকর্ড নম্বর, রিসার্চ

চলাকালীন পাবলিকেশন, আর যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত তাদের সার্টিফিকেট : একটি লাইন, ওঁকে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের অ্যাসেট মনে করতাম। এরপর একটা চাকরি পাওয়ার আর কোনও অসুবিধে থাকার কথা নয়। কিন্তু এই যোগ্যতার উপযুক্ত চাকরি আছে কিনা সেটাই প্রশ্ন। যে কোনও একটা ভাল চাকরি পেলেই ঢুকে পড়ার ক্যান্ডিডেট ও নয়।

সার্টিফিকেট দুটো এক লহমায় দেখে নিয়ে সোয়ামি হাসতে হাসতে বললেন, তুমি তোমার নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই উদ্বেগে ছিলে, সেদিন ইউ অয়ের অলমোস্ট অ্যাট দি পয়েন্ট অফ উইপিং। কিন্তু মাইক্রোবায়োলজির কি ভবিষ্যৎ আছে তোমার মনে হয় ? ওই ওষুধ কোম্পানিগুলোর কি ধারণা ? জাস্ট ওষুধ বের করার জন্যে ব্যাকটিরিয়ার জাতবিচার ?

তনুকার মস্তিষ্কের কোষগুলো এত পরিষ্কার, এত দ্রুত কাজ করে যে, ওকে এক মুহূর্তও ভাবতে হ'ল না। আর কথাগুলোকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রুপোর রেকাবিতে পরিবেশন করতে জানে।

হেসে বললে, মাইক্রোবায়োলজি ইজ দ্য ফিউচার।

হকচকিয়ে গেলেন এন টি সোয়ামি।

—মানে ?

উনি নিজে, অন্তত তাঁর ধারণা, বক্তৃতা দেবার সময়, কিংবা নিত্যদিনের কাজকর্মে সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তায় বেশ চটকদার কথা বলতে পারেন। কিন্তু এটা ঠিক চটকদার কথা নয়, কি যেন গভীর অর্থ আছে।

সোয়ামিকে অবাক করে দিয়েছে দেখে তনুকার বেশ মজা লাগল।

হেসে বললে, ইট ক্যান ডু ওয়ান্ডার্স। অবশ্য জেনেটিক সায়েন্সের সঙ্গে কমবাইন করতে পারলে। একটু থেমে বললে, আপনাদের এখানে জেনেটিক সায়েন্সের কেউ নেই ?

সোয়ামির মুখ প্রথমে এতটুকু হয়ে গেল, তনুকা ভাবল সঙ্কোচে লজ্জায়, তারপরই মৃদু মৃদু হেসে বললেন, তোমার সেই ওয়ান্ডার্স কি একটু বলো।

সবচেয়ে উদ্ভট কথাটাই প্রথমে বললে তনুকা। বললে, একটা বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করবেন, শাবল গাঁইতি কিংবা বুলডোজার আপনার হাতিয়ার। কিন্তু উইপোকা সব কিছু খেয়ে শেষ করতে পারে। জেনেটিক্সের সাহায্য নিয়ে এমন ব্যাকটিরিয়া বানানো যায়, যা তিনমাসের কাজ তিনদিনে করে দেবে, উইদাউট এনি ফাস।

হাঁ করে তনুকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন সোয়ামি। তারপর : সায়েন্স ফিকশন লেখো নাকি তুমি ?

কথাটা ঠাট্টা ভেবে তনুকার ভাল লাগল না, ও গম্ভীর মুখে মাথাটা একবার বাঁদিকে একবার ডান দিকে হেলালো। অর্থাৎ না। পরক্ষণেই মনের মধ্যে একটা হাসি কুলকুলিয়ে উঠল, কারণ ওর মনে পড়ে গেল, কে যেন বলেছিল, হ্যাঁ এবং না বোঝানোর জন্য সাউথ ইন্ডিয়ানদের মাথা নাড়া ঠিক আমাদের উল্টো।

চাকরি দিতে পারে বলে তার তালে তাল দিয়ে যাবে সে-মেয়েই নয় তনুকা। বললে, সারের কারখানা খোলা হচ্ছে বড় বড়, হাজার কোটি টাকা ঢেলে, কত স্পেস নষ্ট কারখানার জন্যে। কিন্তু ব্যাকটিরিয়া থেকে জমির ফার্টিলিটি বাড়ানোর কাজ কত সহজ। কাজও কিছু হয়েছে।

তনুকা বলতে যাচ্ছিল, এই যে শহরের জঞ্জাল সাফ করা, হার্মলেস কোনও ব্যাকটিরিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শহরকে পরিচ্ছন্ন করে দিতে পারে। কোনও ধাঙড় লাগবে না,

কোনও লরি লাগবে না। অল ইউ নীড ইজ আ জেনেটিসিস্ট।

সোয়ামি হেসে উঠে বললেন, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ নট হার্ড মাই নেম ?

বুঝতে না পেরে তনুকা বললে, হ্যাঁ, কার্ডে দেখেছি।

সোয়ামি আবার হেসে উঠলেন। বললেন, আই অ্যাম কমপ্লিটলি শ্যাটার্ড। জানো, আমেরিকার যে কোনও জেনেটিসিস্ট আমার নাম জানে। আর তুমি...

তনুকা পলকের মধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অবাক হয়ে। —এক্সকিউজ মি, আমি সত্যি জানতাম না, আমি একজন বিখ্যাত জেনেটিসিস্টকে জেনেটিক সায়েন্স বোঝাচ্ছিলাম।

সোয়ামি হেসে বললেন, বসো বসো, আই লাইক ইউ মাই গার্ল। ইউ হ্যাভ আ ওয়াইড ভিসন।

অপ্রতিভ ভাবটা তখন কেটে গেছে, 'আই লাইক ইউ মাই গার্ল।' কি বাবা, এই চটকদার চেহারা, না কমপ্লেকশন, হেসে সোয়ামির কথার সঙ্গে জুড়ে দিল, অ্যান্ড আ ন্যারো আই ফর দি ব্যাকটিরিয়া।

হো হো করে হেসে উঠলেন সোয়ামি।

আর তনুকা ভাবল, ব্যাটা সত্যি ইন্টারভিউ নিচ্ছে, না আমার সুন্দর শরীরটা চোখ দিয়ে চেখে নিচ্ছে।

সোয়ামি বললেন, ব্যাকটিরিয়া তা হ'লে শুধু কজ অফ ডিজিজ নয়, কি বলো ? কিন্তু ভাইরাস ? ওটা কি শুধুই পয়জন, জিনের মতোই জটিল প্রোটিন মলিকিউল, কিন্তু বাড়ে লিভিং সেলকে আশ্রয় করে ?

(তালে ঠিক আছ ? পরীক্ষা নিচ্ছ ?)

উত্তর : অনেকের মতে ভাইরাসও লিভিং অরগ্যানিজম।

সোয়ামি বললেন, ইট ইজ ফিক্সড। আমাদের সেন্টার একটা ফাউন্ডেশনের টাকায় চলে, বোর্ড আছে, পাস করাতে হবে। তবে তুমি এখানে আসছ। একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দাও। তবে স্যালারি ইন্ডিয়ার মতোই। বেশি আশা ক'রো না।

সোয়ামি ভেবেছিলেন তনুকা জিগ্যেস করবে, কত ?

তার বদলে ব্যাগটা তুলে নিয়ে তনুকা উঠে দাঁড়াল, জিগ্যেস করল, কাজ করতে পাবো তো ?

সোয়ামি শুধু হাসলেন। তারপর বেল্ টিপে একজনকে ডেকে বললেন, ওঁর কাছ থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে নাও।

তনুকা তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে ছুটে গিয়েছিল তপতীর কাছে। তপু।

—তোকে তো বলে গিয়েছিলাম এইট্টি পার্সেন্ট সিওর। এই দেখ, সেন্ট পার্সেন্ট। পেয়েছি।

তারপর হাসতে হাসতে : টাক মাথা হাঁড়িমুখ আমার প্রেমে পড়ে গেল না তো ?

—কি বলছিস তুই, এত বড় একজন সায়েন্টিস্ট। তোর সব সময়েই ধারণা, সকলে তোর প্রেমে পড়ে যাচ্ছে।

—ঠিক উল্টো। এত চেষ্টা করি, কেউই প্রেমে পড়ে না।

—মাটন বিরিয়ানিতে কি তোর এতই অরুচি ?

হাসি। —আদৌ নয়। কিন্তু হোটেলকে আমার পছন্দসই হতে হবে। নামী হোটেল হলেই আমার পছন্দ হবে তা ভাবিস না। আবার হোটেল পছন্দ হলেই বিরিয়ানি পছন্দ নাও হতে পারে।

তপু হাল ছেড়ে দিল। বললে, তোকে বোঝা মুশকিল।
—আমিই বুঝি না।
একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল। তপু ওর কপালে দু'টো ভাঁজ দেখতে পেল। কি এত ভাবার আছে? চাকরি তোর দরকার। চাকরি পেয়েছিস।
—ভাবছি, কাজ পেলাম কিনা।
আবার একটু চুপ করে থেকে বললে, আমি যে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই। জানিস তনু, আগে বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হ'ত। এখন শুধুই এতবড় একটা ভ্যাকুয়াম।
—প্রদীপ্তর সঙ্গে তোর ব্যাপারটা কি বলত?
—কিছুই না।
তপু গোয়েন্দাগিরি শুরু করে দিল। বুঝল না ওর একটা আনন্দের দিনকে বিস্বাদ করে দিচ্ছে।
প্রশ্ন করল, খুব ড্রিঙ্ক করে? মাতাল হয়ে যায়?
—না। বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল তনুকা। বললে, বরং একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করতাম ওখানে, বেশ ফুরফুরে লাগে রে! সারাদিন ল্যাবে বসে কাজ, সব ক্লান্তি কোথায় উড়ে যায়।
তপতী হেসে উঠে বললে, আমার কাছে তুই মদের বিজ্ঞাপন দিস না তপু, আমি বেশ আছি।
তনুকা বললে, ছেড়ে দিয়ে আমিও তো বেশ আছি।
একটু পরে তপু আবার প্রদীপ্ততে ফিরে এলে।
—খুব রাগী?
—প্রচণ্ড। তবে বছরে দু'একটা দিন।
—মারধর করেছে কখনো?
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, না।
এড়িয়ে গেল কিনা তপতী বুঝতে পারল না।
প্রশ্ন করল, অন্য কোনও মেয়ে?
—না।
—তোর জীবনে অন্য কোনও ছেলে?
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, না।
হেসে উঠল। বললে, তা হ'লে চলে আসব কেন?
তপতী বললে, তোকে বোঝা দায়, হেঁয়ালিই রয়ে গেলি।
তনুকা হাসল। বললে, ডিসাইফার করার চেষ্টা করিস না, সুখে থাকবি।
তপতী তবু নাছোড়বান্দা। বললে, অথচ প্রদীপ্তর কথা যখন বলিস, মনে হয় ওর জন্যে তুই...
—ইয়েস, আই ফীল ফর হিম।
একটু চুপ করে থেকে বললে, দ্যাখ, বন্ধু ছিলাম, বউ হয়ে গেলাম। তা হ'লে বউ থেকে আবার বন্ধু হয়ে গেলে অবাক হবার কি আছে? হেসে উঠে বললে, তোদের বউ পোড়ানোর কেস নয় বলেই হেঁয়ালি লাগছে।
তনুকা উঠে পড়ল। ফিরে আসতে আসতে প্রদীপ্তর কথা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। সে এক অন্য প্রদীপ্ত। হয়তো অন্য তনুকাও।
—মা, দ্যাখো কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

প্রদীপ্তকে নীচের ঘরে বসিয়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেতে যেতে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল প্রদীপ্ত সুবোধ বালকের মতো বসে আছে। সেখান থেকেই বললে, এই সিঁড়িটা...একেবারে বদলে দিতে হবে।

প্রদীপ্ত মৃদু হাসল। ওর এই নির্ভেজাল হাসিটাই তনুকার কেন যেন ভাল লেগে যাচ্ছে। স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছল হাসি ও অনেক দেখেছে, নিজেও তো মাঝেমাঝেই তেমন ভাবে হেসে ওঠে। আর ভদ্রতার সৌজন্যের কিংবা কপট মুগ্ধতার সাজানো হাসি ওর সেই বয়েসটাকে উপহার দেবার জন্যে সকলেই তো ব্যস্ত। ওর কর্মস্থলে কফিব্রেকের সময় ওকে সঙ্গে টানার জন্যে প্রথম প্রথম তো সে রকম হাসি দিয়েই সকলে ওকে টানতে চাইত।

সিঁড়ির মাঝখান থেকেই মাকে দেখতে পেল। বলল, মা, দ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি।

সুপর্ণা নেমে এলেন। তনুকার কাছ থেকে সব শুনলেন।

—প্রদীপ্ত এসো, তুমি বাড়িটা ভাল করে দেখে নাও।

কলেজ জীবনে 'তুই' বা 'তুমি'তে অনভ্যস্ত ছিল না প্রদীপ্ত, দু'চারদিন 'আপনি' বলার পর দু'একজনের ক্ষেত্রে 'তুমি'তে নেমে এসেছে। কিন্তু বাইরের জগতে চলে আসার পর প্রথম সাক্ষাতেই 'তুমি' শুনে ওরও একটু অস্বস্তি হয়েছিল। হয়তো ভালও লেগেছিল।

কিন্তু মা'র সামনেও সেই একই সম্বোধন করায় 'তুমি' বলার বিশেষত্বটাই হারিয়ে গেল। বোঝা গেল এটা কোনও ঘটনা নয়, তনুকার মা'ও শুনতে অভ্যস্ত।

প্ল্যানটা মেলে ধরে বাড়িটার আনাচে কানাচে কোথায় কি করতে হবে তার একটা আঁচ পাবার চেষ্টা করছিল প্রদীপ্ত, তখন তনুকাও ঝুঁকে পড়ছিল ব্লু-প্রিন্টের ওপর। —এই যে এখানে যা দেখছ,...

প্রদীপ্ত অবাক হয়ে হেসে বলল, তুমি প্ল্যান দেখে বুঝতে পারছ ? বেশ চেষ্টা করেই 'তুমি' উচ্চারণ করতে হ'ল। প্যাসিভ ভয়েসে যেতে হ'ল না।

তনুকা হেসে বললে, কেন পারব না ?

—কি পড়ো তুমি ?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তনুকা বললে, পড়ি না. একটা চাকরি করি।

ওর যে গর্ব করে বলার মতো এই বয়েসেই অনেক কিছু আছে, সেটা চেপে যেতে পারলেই যেন খুশি।

সুপর্ণা বলে উঠলেন, আমি বাবা ওসব কিছু বুঝি না। অনিমেষবাবুই আমাদের ভরসা। আমি তো ভেবেছিলাম উনিই আসবেন।

একটা ক্ষীণ ক্ষোভ প্রকাশ পেল ওঁর কথায়।

—আসবেন, আসবেন। তনুকা সান্ত্বনা দিল। তারপর : ইনিই বা কম কিসে। হেসে : এত চিন্তা করছ কেন ? আমি তো আছি।

প্রদীপ্ত মেয়েটির আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হয়ে গেছে।

তাই ভাবল, হয়তো অবাক হওয়া উচিত হয়নি। বললে, অনেকেই তো বোঝে না। কাগজের মধ্যে যে একটা বাড়ি থাকতে পারে, ভাবতেই পারে না।

বাঁ হাতের তর্জনীটা মাথায় ঠেকিয়ে তনুকা বললে, এখানে কিছু থাকলে না বোঝার তো কিছু নেই!

প্রদীপ্ত হাসল, কি চাকরি করো তুমি। আমি তো ভেবেছিলাম কলেজে পড়।

তনুকা বলল, ছোট্ট চাকরি, ছোট্ট জিনিস নিয়েই। ওই যে সব ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা আছে, মাইক্রোসকোপে দেখা যায়, তাদের স্বভাবচরিত্র দেখা।

—প্যাথোলজি ?

তনুকা হাসল। —না, না। তার চেয়েও ছোট কাজ। ওঁরা তো চেনা জিনিসকে চিনে নেন। আমি অচেনা জিনিস খুঁজি।

সমস্ত ব্যাপারটাকে ও রহস্যই রেখে দিতে চাইল।

তারপর কেমন করে যেন কাজের মধ্যে দিয়ে প্রদীপ্তর সঙ্গে ওর গাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

মাত্র একমাসের ছুটি নিয়ে এসেছিল তনুকা। কি ভাবে যেন কেটে গেল। কাজ ব'লে মনেই হয়নি।

—কাজ আবার কি করলাম বাপি, আমি আর দীপ শুধুই আড্ডা দিয়েছি।

প্রদীপ্ত বলেছে, আজ একটা গ্র্যানাইট ফ্যাক্টরিতে যাব, ভাল শেড কি পাওয়া যায়।

—চলো, আমিও যাব।

কোথায় নেপালি কালার্ড মার্বেল পাওয়া যায়, গ্র্যানাইটের কোন শেডটা কেমন দেখাবে, চলো না প্রদীপ্ত, আমিও যাব ইট ভাটাতে। হেঁটে, ট্রামে বাসে, ট্যাক্সিতে গাড়িতে, কখনও মাল বোঝাই লরিতে পাশাপাশি বসেছে দু'জনে, আর তনুকার সে কি উদ্দাম হাসি। এর চেয়ে মজার ব্যাপার ও জীবনে কোথাও পায়নি। দুপুর রোদে হাঁটছে তো হাঁটছেই, পাশাপাশি দু'জনে, কোথাও দাঁড়িয়ে পরে দুটো ডাব কিংবা কোল্ড ড্রিঙ্ক। একদিন মনে আছে, কোথাও কিচ্ছু নেই, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে, রাস্তার টিউবওয়েলে প্রদীপ্ত হটাং হটাং করছে, আঁজলা ভরে জল খাচ্ছে তনু, আর তনুকা পাম্প করছে, দীপ আঁজলা ভরে জল খাচ্ছে।

সুপর্ণার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। প্রদীপ্ত এখন দীপ হয়ে গেছে তনুর মুখে।

ওর বিয়েটাই ওঁর একমাত্র চিন্তা। এ মেয়ে তো কনে সেজে বিয়ের পিঁড়িতে বসার মতো মেয়ে নয়। ওঁরা তা চানও না। তবু, নিজের মর্জি মতো কাউকে বিয়ে করুক।

এখানে এলে মেজগিন্নি তা হ'লে জিগ্যেস করবে না, এখনও মেয়ের বিয়ে-থা হ'ল না।

অনন্তলাল অযাচিত উপদেশ দেবে না।

শুনতে অস্বস্তি লাগে। কারণ কথাটা যে ওঁর নিজের মনের মধ্যে ঘোরে মাঝে মাঝে। বিয়ে হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন নয়। ভয়। ও তো একটা হেঁয়ালি। কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই। আজেবাজে কাউকে না বিয়ে করে বসে।

মানুষ কাছাকাছি এলে কত লোককেই তো তেমন খারাপ ঠেকে না। এই প্রদীপ্তকেই কি প্রথমে মনের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে আসতে দিয়েছিলেন। একজন আর্কিটেক্ট, তাও চাকরি করে না। কন্ট্রাক্টরের মিস্ত্রিরা কাজ করছে, ও এসে দেখাশোনা করে, তনুকে সঙ্গে নিয়ে মালপত্র কিনে দেয়। পি ডবলু ডির ওভারসিয়ার যেন।

কিন্তু দিনের পর দিন দেখতে দেখতে সুপর্ণার মনে হতে শুরু করল, ছেলেটি কিন্তু মন্দ নয়। আর্কিটেক্ট। ওকে আমাদের ওখানে যদি নিয়ে যাই, আমেরিকায়...

তনুকা অবাক হয়ে বললে, কি বলছ মা ? ও তো আমার বন্ধু, দারুণ বন্ধু। কিন্তু আমি তো ওর প্রেমে পড়ে যাইনি।

তপতী সব শুনে বলেছিল, দ্যাখ তনু, তোর অনেক বুদ্ধি, তুই সব কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারিস, তুই শুধু নিজেকে বুঝতে পারিস না।

অবাক হয়ে হেসে উঠে তনুকা বললে, সত্যি বলছিস ? অ্যাম আই ইন লাভ ? একেই প্রেম ব'লে ? অলুমিনাম ফয়েল ?

শুভব্রত এসে বললেন, ওয়ান্ডার অফ ওয়ান্ডার্স। তুই তো সব কাজই শেষ করে

এনেছিস।

তনু কোনও প্রশংসা শুনতে রাজি নয়। বললে, খেটে মরেছে বেচারা দীপ। আমি তো স্রেফ আড্ডা দিয়েছি ওর সঙ্গে। কিন্তু বাপী, অনিমেষবাবুকে তুমি যে ফোন করতে, আই এস ডি কলের বিল হয়েছে কত ? রিমোট কনট্রোল তো ছিল তোমার হাতে, আমি তো নিছক একটা রোবট।

শুভব্রত এসে গেলেন, তখনও বেশ কিছু কাজ বাকি।

তনুকার ছুটি ফুরিয়ে গেল। বাবার ওপর বাকি দায়দায়িত্ব দিয়ে ওর চলে যাবার দিন। না, ঠিক তার আগের দিন।

প্রদীপ্ত বললে, তুমি তো চলে যাচ্ছ।

তনু হেসে বললে, আর জ্বালাব না।

প্রদীপ্ত বললে, আমি একদম একা হয়ে যাব এরপর। কি লোনলি লাগবে ভেবে পাচ্ছি না। ওই বাড়িটা এত যত্নে রিমডেল করার কাজ করে গেছি, আর কেবল মনে হয়েছে তুমি একদিন ফিরে এসে এই বাড়িতেই থাকবে। আমি এসে বেল্ বাজালে তোমাকে দেখতে পাব।

—আমি এখানে ফিরে আসব ? হেসে উঠেছে তনুকা। —কখনো না। আই লাভ অ্যামেরিকা। বাপী আর মা এখানে ফিরে আসবে। এটা তাদের ওল্ড্ এজ হোম।

একটু থেমে বলেছে, কিন্তু তুমি আমার বন্ধু থাকবে। ফর এভার— এ ফ্রেন্ড।

## ছয়

আমেরিকার সঙ্গে তুলনাই হয় না। ছেড়ে আসা সেই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে এই রিসার্চ সেন্টারের তুলনা করতে যাওয়াই ভুল। কোন জিনিসটারই বা তুলনা করা যায়। প্রথম প্রথম মনে হত শহর নয়, মানুষের জঙ্গল। পথঘাট, ফুটপাথ, বাস, ট্যাক্সি, লরি, টেম্পো যেন সর্বত্র দঙ্গল পাকিয়ে আছে। ধোঁয়া ধুলো আবর্জনা দুর্গন্ধ। রাস্তায় খানাখন্দ। 'চলবে না, চলবে না' স্টুপিড প্রশেসন, যার শ্লোগানের আড়ালে একটাই বক্তব্য : 'চাই, আরও চাই।' আগে ভাবত মানুষ থাকে কি করে এখানে ?

অথচ শহরটার মধ্যে কি যেন এক ম্যাজিক আছে। একটু একটু করে ভাল লেগে যায়। ভাল লাগারও বোধহয় একটা নেশা আছে, সেটাকে শেষ অবধি ভালবাসা বলে মনে হতে থাকে। সত্যি ভালবাসা কি না কে জানে। চার চোখের মিলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ভালবাসা, তা সেকালের রোম্যান্টিক উপন্যাসেই মানাত। তার মধ্যে একটা চটক আছে। কিন্তু সে তো নিছক শরীরের ভাললাগা। বাইরের ঝকমকানি দেখে মন আপ্লুত হয়ে যায়। বিচ্ছেদের সময় বুক নিঙড়ে ওঠে না। তনুকা সে ভাবেই বিদেশের শহরগুলোকে দেখেছে। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সব সুন্দর, সব সুন্দর। কিন্তু তারা যেন শুধু শরীরটাকেই টানে।

এই রিসার্চ সেন্টার তুলনায় অনেক ছোট।

তার জন্যে এন টি সোয়ামিও যেন লজ্জিত। বড় বড় কয়েকটা হল, সারি সারি টেবিল, টেবিলে গ্যাস বার্নার থেকে স্বচ্ছ কাচের সরঞ্জাম, কোনও কোনও টেবিলে কম্পিউটার আছে। টেবিলের সামনে বেশির ভাগই কমবয়েসী ছেলেমেয়ে, কেউ কেউ তনুকার চেয়েও। এখানে ওখানে দু'একজন একটু বয়স্ক।

সোয়ামি সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, 'ইটস আ স্মল বিগিনিং'।

তনুকা সদাই সপ্রতিভ, ওর কোনও সঙ্কোচ নেই। লোকগুলোকে দেখে একটু যে

কৌতুক বোধ করছিল না তা নয়।

সমস্ত বিভাগ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন সোয়ামি। বললেন, সেন্টারটা ছোট হতে পারে, কিন্তু তুমি এখানে হ্যাপি ফিল করবে। উই আর অল অফ ওয়ান ফ্যামিলি।

তনুকার এখন একটাই লজ্জা। সোয়ামি লোকটিকে প্রথমে কোনও গুরুত্বই দেয়নি। আর লজ্জা, ওর নামই শোনেনি। ইতিমধ্যে যা একটু আধটু শুনেছে তাতেই ওর চোখ কপালে ওঠার জোগাড়।

প্রাথমিক ভুল শুধরে নেবার জন্যে ও একটা সুযোগ পেল সোয়ামি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বশত বারবার 'ছোট' এবং 'স্মল বিগিনিং' বলছিলেন বলে।

তাই হেসে বললে, বাট দেয়া'রস আ বিগ থিং হিয়ার, ইওর...

নিজের মাথার চারপাশে হাতের তর্জনী ঘুরিয়ে সোয়ামির মাথাটা ইঙ্গিতে বোঝাল।

হেসে উঠলেন সোয়ামি, তুমি আমার চেহারা নিয়েও ঠাট্টা করছ?

মুহূর্তে অপ্রতিভ বোধ করল তনুকা। ওর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না ঠাট্টা করার। সেই প্রথম দিকে যদিও হাসাহাসি করেছে তপুর কাছে। এখন একটা চাপা শ্রদ্ধা উঁকি দিতে চাইছে বুকের মধ্যে। এই সেন্টারের মস্তিষ্ক বলে নয়, ওঁর নিজের মস্তিষ্ক সম্পর্কে কিছু কিছু খবর পেয়েছে বলেই। এমন একজন বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট, ওদেশের জেনেটিক সায়েন্সের বইয়ে যাঁর নাম ফুটনোটের স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না। তাঁর কার্ডের নামের নীচে ডেজিগনেশন থাকবেই বা কেন, আর নামের পাশে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি বা বিদেশের দেওয়া ফেলোশিপের অ্যালফাবেটগুলো অর্থহীন। সেজন্যেই অনুল্লেখিত।

তনুকার মতো মেয়েও লজ্জায় কুঁকড়ে গেল, মুখ বিবর্ণ। বললে, আমি ঠাট্টা করিনি। আই নো হোয়াট ইউ আর। আমি তোমার মগজের বিগনেস বোঝাতে চাইছি। সেন্টার ছোট হলে কিছু যায় আসে না, যদি তার মাথায় থাকে মাথাওয়ালা লোক।

অট্টহাস সোয়ামির।—এই ব্যাপার? সো ইউ হ্যাভ ডান ইয়োর হোমওয়ার্ক।

তনুকা বললে, সামান্যই।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছিলেন সোয়ামি। ফিরে তাকিয়ে কেউ কেউ দু'একটা কথা বলছিল, কেউ উঠে দাঁড়াচ্ছিল না। তনুকার বুঝতে অসুবিধে হল না এখানে কোনও ফরম্যালিটিজের ধার ধারেন না সোয়ামি।

—এই যে সান্যাল, এই মেয়েটি এখানে জয়েন করছে, মাইক্রোবায়োলজিস্ট। তোমার পাশের টেবিলটায় ওকে বসতে দাও।

হেসে তনুকাকে বললেন, তুমি তো ব্যাকটিরিয়া ভালবাসো, এই ডিপার্টমেন্ট ফুল অব ব্যাকটিরিয়া।

—এই পৃথিবীটাই ব্যাকটিরিয়ায় ভর্তি ডক্টর সোয়ামি, সর্বত্র আছে। তার মধ্যে কিন্তু কিছু আছে যা উপকারও করে। বাকিগুলোকে চেষ্টা করলে আমাদের উপকারী বন্ধু বানিয়ে নেওয়া যায়।

এই সেন্টারের একটা শাখা সম্পর্কেই বলতে চেয়েছিলেন উনি, ব্যাকটিরিওলজি নিয়েই যেখানে যা কিছু কারবার। তনুকা বোধহয় তার মধ্যে কোনও গূঢ় অর্থ আছে ভেবে বসেছে। ভেবেছে, উনি এই ডিপার্টমেন্টের লোকগুলির কথা বলতে চেয়েছেন।

তনুকা লোকগুলির কথা ভেবে যে উত্তর দিল তা ঠিক বোধগম্য হল না সোয়ামির। ভাবলেন, এই বাচ্চা মেয়েটা ভেবেছে আমি জেনেটিকসের লোক, ব্যাকটিরিওলজির কিছুই জানি না। তাই তার কথাগুলো উপভোগ করলেন প্রশ্রয়ের হাসি দিয়ে।

সোয়ামি লোকটির মাটির অনেক ঊর্ধ্বে থাকার কথা, এ দেশের কাজ কারবার সম্পর্কে যেটুকু জেনেছে, তাতে সকলের কাছে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকার কথা তাঁর। তার ওপর

তিনি বিজ্ঞানজগতে মোটেই অনুজ্জ্বল প্রতিভা নন। ওঁর পা এবং মাটির মাঝখানে দেড় ফুট অহঙ্কার থাকার কথা।

অথচ তনুকা বেশ বুঝতে পারল লোকটি মিশুকে, রসিক এবং বোধহয় তনুকার মতোই কাজ পাগল। কারণ ওকে এই ডিপার্টমেন্ট দেখাতে নিয়ে আসার সময় উনি করিডরে দাঁড়িয়ে একজন মধ্যবয়সী মহিলার সঙ্গে দেখা হতেই ওকে প্রায় অগ্রাহ্য করে মিনিট পাঁচেক কি সব আলোচনা করলেন। তার কিছু কিছু কানে এসেছিল। কিছু সায়েন্টিফিক টার্মস, তনুকার অচেনা নয়, যদিও শব্দগুলি ইউজেনিক্স্ সংক্রান্ত।

ডিপার্টমেন্ট চিনিয়ে দিয়ে ফিরে আসার সময়ে বললেন, সান্যাল তোমাকে কিউ দিয়ে দেবে দু'চারদিনের মধ্যে। আজ চলো, আমার ঘরে একটু কফি খেয়ে নেবে।

কিন্তু করিডরে সেই মধ্যবয়সী মহিলার সঙ্গে আবার দেখা হল। বেশ সুশ্রী, তনুকার চেয়েও দীর্ঘাঙ্গী। তার মুখের হাসি দেখে তনুকা ফিরে তাকাল সোয়ামির মুখের দিকে। হাসছেন। এবং এক সেকেন্ড মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু একটা উচ্চারণ করে তার কাঁধে হাত চাপড়ে বললেন, প্রবলেম হলেই আমাকে জানিও।

নিয়ে যাবার সময় ওকে অগ্রাহ্য করে পাঁচ মিনিট ওর সঙ্গে আলোচনায় ডুবে গিয়েছিলেন, স্বাভাবিক, তনুকা কে, ওর তো অগ্রাহ্য পাওয়ারই কথা। ফেরার সময় হেসে মহিলার কাঁধ চাপড়ে দেওয়াও ওর কাছে অস্বাভাবিক লাগার কথা নয়। আমেরিকায় এর চেয়েও অনেক বেশি কিছু দেখেছে। তার জন্যেই এখন কাগজে এত লেখালিখি। অনেকে তো যেচে এগিয়ে যায়। দ্রুত উন্নতির লোভে। বস্‌দের কি দোষ।

নিজের ঘরে নিয়ে এসে বেয়ারাকে কফি দিতে বললেন।

কফি এল।

গরম কফি আর ঠোঁটের স্পর্শ থেকে অশোভন শব্দ করে এমন ভাবে কফিটা পান করলেন, যেন বেশ রেলিশ করছেন।

তনুকা নিঃশব্দে গরম কফিতেও চুমুক দিতে অভ্যস্ত।

ওঁর চালচলন, কফি খাওয়া, মহিলার কাঁধে হাত রাখা, এ সব দেখে তনুকার মনে হল ভদ্রলোক কোন এটিকেটের তোয়াক্কা করেন না।

হয়ত তনুকাকে উৎসাহ দেবার জন্যেই বললেন, তোমার কোনও ভয় নেই, আমাদের এখানে উই আর অল ফ্রেন্ডস। কোনও প্রবলেম হলেই তুমি চলে এসো।

তনুকার মনে সব সময়েই একটা সন্দেহ উঁকি দেয়, যদিও ও চায়, ওর চেহারা, চটুলতা এবং সপ্রতিভ ভাবের জন্যে সকলেই ওকে একটু সমাদর করুক, একটু স্পেশাল অ্যাটেনশন ও আশা করে, অথচ সেটুকু পেলেই সন্দেহ, কি বলতে চাইছ বাপু।

'প্রবলেম হলেই তুমি চলে এসো' কথাটা শুনল, কিন্তু ওর মনে হল, বলতে চাইছেন, মাঝে মাঝে চলে এসো।

কাউকে শত্রু না বানিয়েও কি ভাবে বুদ্ধিদীপ্ত কথায় কোনও উর্ধ্বতনের আব্দারও প্রত্যাখ্যান করা যায় তা রপ্ত করে এসেছে ও আমেরিকাতেই। অথচ ওকে নিয়ে একটু ফিসফিসানি হলে সেটুকুও মন্দ লাগে না।

কিন্তু সোয়ামি যদিও বা বুঝিয়ে থাকে মাঝে মাঝে চলে এসো, তা সত্ত্বেও তনুকা বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করল না।

ও বিচলিত হল অন্য কারণে। ওই মহিলা সম্পর্কে ওর হঠাৎ তখন ঈষৎ জেলাসি হল কেন?

সোয়ামি বললেন, করিডরে যার সঙ্গে কথা বললাম, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ভুলেই গিয়েছিলাম, আত্রেয়ী দেশপাণ্ডে, আমার প্রাক্তন ছাত্রী, অ্যান্ড হিয়ার শি ইজ অ্যান

অ্যাসেট টু আস অল।

জেলাসি আরও তীব্র। মনে মনে হেসে বললে, আই নো, আই নো, কোন অ্যাসেটের কথা বলতে চাইছ।

—মাইরি বলছি তপু...

'মাইরি' শব্দটা তপু প্রায়ই বলে, তা থেকে তনুকাও শিখেছে।

বেশ কিছুদিন পরে বলে বসল, জানিস তপু, সোয়ামিকে নিয়ে তো অনেক হাসিঠাট্টা করেছি তোর কাছে, লোকটা খারাপ নয়।

তপু হেসে বলেছে, খারাপ হতে যাবে কেন!

চিন্তিত ভাবে বললে, না, মানে হাঁড়ির মতো মাথা নয়, কেন যে সেদিন বলেছি, তাছাড়া টাক মাথা হলেই কি খারাপ লাগে, ধর যদি এক মাথা শনের মতো সাদা চুল হত...

তারপর বলল, যেমনই হোক না, আমি তো ওর প্রেমে পড়তে যাচ্ছি না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর বললে, কিন্তু যখন ওই আত্রেয়ী দেশপাণ্ডের সঙ্গে কথা বলেন, আমি একটু জেলাস ফীল করি কেন বল তো।

গল্পটা আগেই বলেছে তপুকে, তাই তপু বলল, তুই আমেরিকা থেকে এসেছিস, ভাল চাকরি করতিস, তোর সার্টিফিকেটগুলো দেখে যে কোনও লোকের চোখ গোলগোল হয়ে যাবে, তার ওপর তুই দিব্যি দেখতে শুনতে...

হেসে বাধা দিল তনুকা, বললে, সুন্দরী বল, শুনতে ভাল লাগে আমার...

তপু ওর কথায় হেসে ফেলল। তোর প্রশংসা শোনার অভ্যেস আর গেল না।

—প্রশংসা কে শুনতে চায় না বল। এই যে সোয়ামি এত বড় সায়েন্টিস্ট, দেশে বিদেশে নাম, অথচ আমার মতো একটা তুচ্ছ মেয়ের প্রশংসা শুনে একেবারে কাত।

—তারপর কি বলছিলি বল।

তনু বললে, ভুলেই গেছি। কি বলছিলাম ?

—জেলাসি। হ্যাঁ, তুই ভেবেছিলি, সোয়ামি তোকেই অ্যাসেট ভাববে। তার বদলে অন্য এক মহিলাকে, আত্রেয়ী তো বললি দেখতে সুশ্রী...

তনুকা বললে, না রে না, অন্যরকম জেলাসি।

তপতী হেসে বললে, তুই তো সব সময়েই আনপ্রেডিক্টেবল, দেখিস প্রেমে পড়ে যাস না যেন।

—প্রেম কি তাই তো জানি না। প্রদীপ্তর বেলাও তো ভেবেছিলাম, এটাই বুঝি প্রেম।

তপতী হাসল, তা ভাবিসনি। অন্য কিছু ভেবেছিলি।

—কি জানি।

প্রদীপ্তর কথা ভাবতে ভাল লাগে না। ভুলেই গেছে হয়তো।

অথচ চাকরিতে জয়েন করার পর প্রদীপ্তকেই প্রথম মনে পড়েছিল। উপায় থাকলে তখনই একটা ফোন করত। কিন্তু সে সময় ওকে পাওয়াও যেত না।

তাই তপতীর ওখানে চলে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে একটা ফোন না করে পারেনি।

শুভব্রত বলেছেন, অকারণ টাকা নষ্ট। ওকে এখনও ফোন করার কি আছে!

সুপর্ণা বলেছেন, যা শেষ হয়ে গেছে তাকে আর টেনে চলার মানে হয় না।

তনুকার চেয়ে সে কথা আর বেশি কে জানে। কিন্তু সকলেই শুধু শেষ করার কথাই বলছে! যেন সেটাই সমস্যা। কিন্তু তনুকার সারা মন উদগ্রীব হয়ে আছে একটা কিছু আঁকড়ে ধরার জন্যে। আবার একটা নতুন জীবনের স্বপ্ন যদি দেখতে পায়। একটা নতুন স্বপ্ন যদি কেউ দেখাতে পারে।

ওখানে একজনও তা দেখাতে পারেনি। তাই চলে এসেছে সব ছেড়ে। যত দূরেই চলে যাক না কেন, একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ওর সঙ্গ ছাড়ত না। দূরে থাকলে বেশ বন্ধু থাকা যায়।

তিল তিল করে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হয়, সেটাকে এক ঝটকায় নষ্ট করে দেওয়া যায় না। নষ্ট করতে মন চায় না। কোনও সম্পর্ক নেই, তবু কোথাও কেউ একজন বন্ধু আছে তার চেয়ে বড় আশ্বাস আর কি হতে পারে।

তপুও বুঝতে চায় না। বলে, ওই পিছুটান শেষ করে দে, নিজেকে অনেক মুক্ত লাগবে।

সে কথা তনুকা নিজেও জানে। ওকে কেউ কোথাও বেঁধে রাখেনি, বেঁধে রাখতে পারতও না। ও তো নিজেকে মুক্তই মনে করে। আইনের মুক্তিটাই কি বড় কথা। আর বেশি কি দিতে পারবে সেই মুক্তি।

প্রদীপ্তর সেই কথাগুলো এখন উপহাসের মতো শোনায়।

বলেছিল, এত যত্ন নিয়ে বাড়িটা তোমার মনের মতো করে রিমডেলিং করলাম, এত পরিশ্রম, সে কি শুধু অনিমেষদার কথা শুনে। কিছু অভিজ্ঞতা হবে বলে ?

অবাক হবার ভান করে তনুকা বলেছে, তাহলে কিসের জন্যে ?

প্রদীপ্ত চুপ করে থেকেছে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলেছে, ভেবেছিলাম, হঠাৎ কোন কোনওদিন এসে তোমাদের দরজার বেল বাজাব, তুমি এসে দরজা খুলে দাঁড়াবে।

এ ধরনের রোমান্টিক কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত নয় তনুকা।

তাই হেসে উঠেছে। বলেছে, আমি ? আমি এসে তোমাকে দরজা খুলে দেব ? আমি কি আমেরিকা ছেড়ে আসব নাকি এখানে ? এটা তো আসলে আমার বাবা আর মার ওলড্ এজ হোম। চাকরি ছেড়ে ওরা চলে আসবে, আমি নই।

শুনে সমস্ত মুখ হতাশায় ভরে গিয়েছিল প্রদীপ্তর। চলে যাবে ?

বলেছিল, এই একটা মাসে সমস্ত মন ভরিয়ে দিয়েছিলে। তুমি চলে গেলে ওই শূন্যতা নিয়ে বাঁচব কি করে !

বাঁচব কি করে, বাঁচাব কি করে। আমেরিকায় ফিরে গিয়ে কথাটা বার বার তনুকার মনে পড়েছে।

ওর বুকের ভেতরে কোনও গোপন কক্ষ কি ফাঁকা ফাঁকা লেগেছিল। কে জানে, এখন আর কিছুই মনে পড়ে না।

ওটাকেই ভালবাসা ভেবে বসেছিল কি না তাও মনে পড়ে না।

কয়েকদিন পরেই মনে হয়েছে, আহা বেচারিকে একটা চিঠি দিই। আমাদের জন্যে ও তো অনেক করেছে। একটা পয়সাও কাউকে ঠকাতে দেয়নি, কোথায় গেলে সবচেয়ে কম দামে পাওয়া যাবে. দুপুর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রিদের ধমক দেওয়া। কি প্রয়োজন ছিল ওর। শুধু আমি, আমার জন্যেই।

আমি এমন কি অন্যায় করেছি, মনে মনে ভাবলে তনুকা। আমি তো মানুষ। একজন ভালবাসা চেয়ে না পেলে তার দুঃখ সবচেয়ে বেশি। কিন্তু যে সেই ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারে না তার দুঃখও কম নয়।

না, প্রেমে পড়েনি তনুকা। বিয়ে করবে তাও ভাবেনি।

শুধু একটা চিঠি লিখে দিয়েছে। তার মধ্যে কোনও রঙিন স্বপ্নকে রুপোলি তবকে মুড়ে দেয়নি। একটা সাদামাটা এয়ার লেটার। কালো কালিতে লেখা একটাই লাইন। আই ফিল ফর ইউ। তা যে এতখানি আশা দেখাতে পারে ভাবতেও পারেনি।

তপতীকে বলেছে, বিশ্বাস কর তুই, আমি প্রেমের কথা ভাবিনি, বিয়ের কথাও নয়।

ওর জীবনের হতাশার কথা মাঝে মাঝে শোনাত, সরকারি চাকরি নিলে কোন এক মফঃস্বল শহরে জীবন কাটানোর কথা। ওর অনিমেষদা তখন একমাত্র ভরসা, যদি কিছু সুযোগ করে দেয়।

—তারপর ?

—লিখলাম, ভেবো না তুমি, তোমাকে আমি এখানে নিয়ে আসব। এখানে সুযোগের অভাব নেই।

—তারপর ?

হেসে উঠল তনুকা। বললে, কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল, না ভেবেচিন্তে বিয়ে করে বসলাম। হয়তো মায়া পড়ে গিয়েছিল। নিয়েও গিয়েছিলাম।

তনুকার এক একসময় মনে হয় প্রদীপ্তই ওর জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থেকে থাকে, সেই ঈশ্বর সব দিক থেকে অকৃপণ ভাবে ওকে সব কিছু দিয়েছেন। এমন কি প্রায় সমবয়সী সুদর্শন স্বামীও। বাইরে থেকে দেখলে যে কেউ ভাববে কত সুখী ও। জানতেও পারবে না ভেতরে ভেতরে কত নিঃস্ব। কত অসুখী।

কে দায়ী নিজেও জানে না। তাই ওর মধ্যে একটা অপরাধবোধও আছে। সন্দেহ হয়, প্রদীপ্তও ভাবছে না তো, তার জীবনও ব্যর্থ করে দিয়েছে তনুকা।

—জানিস তপু। এক একসময় মনে হয় আমিই দায়ী। আমিই তো ওকে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লোভ দেখিয়েছিলাম।

—তারপর ?

তনুকা বললে, ওখানে তো গাড়ি ছাড়া চলাই দায়। কিনলাম। নিজেও চালাতাম, দীপও চালাত। আমিই জোর করে শিখিয়েছিলাম ওকে।

তনুকা বিষণ্ণ হেসে বললে, একটা সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট করে বসল একদিন।

সে সব দিনের কথা ভাবলে এখনও আতঙ্ক হয়। ইনস্টিটিউটে তনুকা তখন রিসার্চে মগ্ন। বৃদ্ধ ইহুদি বস এচেভেরিয়া হঠাৎ একদিন এসে বললে, একটা খারাপ খবর আছে টাঙ্কা। যাও গিয়ে ফোন ধরো।

অ্যাকসিডেন্ট। কি দিনই না গেছে, মাসের পর মাস। মনে হয়েছিল বাঁচবে না, বাঁচাতে পারবে না ও দীপকে। যথাসর্বস্ব সঞ্চয় জলের মতো খরচ করেছে, কোনও অনুতাপ ছিল না, যদি বাঁচাতে পারে। তখন কেবলই মনে হত আমি দায়ী, আমিই দায়ী।

তারপর হুইল চেয়ার ছেড়ে দু'হাতে ক্রাচ নিয়ে উঠে দাঁড়াল, হাঁটল প্রদীপ্ত। জানতেও পারল না আসল ক্রাচ ওই তনুকাই।

প্রায় সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠল দীপ, কিন্তু সে শুধু শরীরের দিক থেকে। প্রদীপ্তর মন তখন ক্রাচ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সেবা দিয়ে, অর্থ দিয়ে দীপের শরীরটাকে ও সুস্থ করে তুলতে পারল, কিন্তু তার মন সুস্থ করবে কি দিয়ে ? ও যে তখন তনুকার ভালবাসাকেও ভয় পাচ্ছে।

বিয়ের পর পরই একদিন বলেছিল, বয়েসে দু'বছরের বড় হলেও আমি তো সব দিক দিয়েই তোমার চেয়ে ছোট।

এই কমপ্লেক্স ওর বরাবরই ছিল। অ্যাকসিডেন্টের পর আরও বেড়ে গেল। আর তার পর থেকে ওর অন্য এক চেহারা। পদে পদে আমাকেই ছোট করতে লাগল। সে আরও অসহ্য। দাম্পত্য জীবন বলে আমাদের আর কিছুই রইল না।

হাসতে হাসতে বললে, আমি কি বোকা দ্যাখ, শুধু অপেক্ষা করেছি ও কবে সেরে উঠবে। ভাবিনি, আমার নিজের জীবনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তপতী বাধা দিল, জীবন বলিস না। জীবন অনেক বড়।

—বড় হলে তো আরও দুঃখ। বুকের ভেতরটা এক একসময় এত ফাঁকা লাগে। আ বিগ্ ভয়েড। এ নিয়ে কি বাঁচা যায় নাকি ? ভেবে দ্যাখ, যখন ষাট বছর বয়েস হয়ে যাবে, অথচ কোথাও কেউ নেই। আমি একা।

হেসে উঠে বললে, এই বাড়িটাকে বাবা মার ওলড এজ হোম বলেছিলাম, এখন আমার দরজায় এসে ডোর বেল বাজানোর মতো আর কেউ নেই।

ধীরে ধীরে বললে, আমার সব ছিল, সব আছে। অথচ সত্যি তো কেউ নেই, কেউ থাকবে না।

হাসতে হাসতে বললে, ষাট বছর বয়েসে হাত কাঁপবে, সেই হাতে টেস্ট টিউব ধরে ব্যাকটিরিয়ার মিউটেশন দেখব...

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, প্রদীপ্ত ভেবেছিল ওই বাড়িটায় আমি থাকব, আমি বলেছিলাম, কখনও না। এখন সেই বাড়িতেই ফিরে আসতে হল, যে বাড়ি প্রদীপ্ত আমার মনের মতো করে গড়ে দিয়েছিল। অথচ প্রদীপ্তই আজ আমার জীবন থেকে কত দূরে সরে গেছে। আমিই সরিয়ে দিয়েছি। সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।

—কিন্তু কেন ? সেটাই তো প্রশ্ন আমার। তপু জিগ্যেস করেছে।

উদাস ভাবে তনুকা বলেছে, সব কেনর কি উত্তর হয় ? আমিই কি জানি ?

পেয়ালার চা শেষ করে উঠে পড়েছে তনুকা—চলি, দেখি ভাবতে ভাবতে যাই, তোর কেনর উত্তর খুঁজে পাই কিনা।

## সাত

পদ্মপুকুরের বাড়ি থেকে ল্যান্সডাউন মার্কেট খুবই কাছে। তা সত্ত্বেও শুভব্রত কোনওদিন নিজে বাজারে যান না। উনি ভোজনরসিক, ভালমন্দ খেতে ভালও বাসেন, কিন্তু শাকসব্জি বা মাছমাংস কেনার জন্যে বাজারে যেতে হ'লে গায়ে জ্বর আসে। সেজন্যে একটা অজুহাতও হাতের কাছে আছে। কবে একবার অস্টিও আথ্রাইটিসে ভুগেছিলেন, এখন সেরে গেছে, তবু বাজারে যাওয়ার কথা হ'লেই কাঁধ কিংবা কোমরে সেই ব্যথাটা ফিরিয়ে আনেন। সুপর্ণা নিজেই দু'একদিন গিয়েছিলেন, প্রয়োজনে যান, কিন্তু নিত্যদিনের বাজারের ভার ছিল গৃহভৃত্য বদ্রীনাথের ওপর।

আথ্রাইটিস রোগটা অবশ্য ব্যর্থ প্রেমের মতো, একেবারে সেরে যায় না। হঠাৎ হঠাৎ জানান দিয়ে যায়। বাজার মানেই তো সেই জলকাদা, বিশেষ করে মাছের বাজার, তার ওপর হল্লা চিৎকার। সেজন্যেই শুভব্রত ওসব এড়িয়ে যেতে চান। তার চেয়ে ফিটফাট পাঞ্জাবি পায়জামা পরে ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে। কিন্তু সকালে একবার বের হন, কিংবা বিকেলের দিকে, কাছেই বড় মাপের পুকুরটায় ছেলেরা সাঁতার কাটে, গিয়ে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সাঁতারকাটা দেখেন।

পাড়ার লোক চেনে, সমীহ করে, এসে সে সময় দু' চারটে কথা বলে। কেউ কেউ আছে প্রশংসা শোনাতে ভালবাসে, তারা এসে বলে, আপনার মতো একজন মানুষ এ পাড়ায় এসে আছেন, এটা পাড়ার গর্ব।

শুনে শুভব্রত খুব খুশি হন, কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই বুঝতে পারেন, তার আসল উদ্দেশ্য ছোট ভাইটিকে আমেরিকা পাঠানোর সুলুকসন্ধান জেনে নেওয়া।

বিরক্তিকর না লাগলে সে সব খবর পরিবেশনে শুভব্রতর কার্পণ্য নেই। যত অনিচ্ছা শুধু বাজারে যাওয়ায়।

বদ্রীনাথই ভরসা ছিল, মুটেকেও তো দু'এক টাকা দিতে হয়, সে টাকা যদি বদ্রীনাথ

সরায়, আপত্তি করার কিছু নেই। বরং মাস মাইনের ওপর কিছু উপরি পাচ্ছে বলে খুশি থাকবে। ঝট্ করে ছেড়ে যাবে না।

এমনিতেই ঠিকের মেয়েটা থেকে রান্নার লোক, এমন কি এই বদ্রী আর গাড়ির ড্রাইভার, সকলের মাইনেই পাড়ার অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ ওঁরা যে আমেরিকা ফেরত। আর বাধ্য হয়ে বেশি দেন ব'লে পাড়ার লোকের গঞ্জনাও শুনতে হয়েছে প্রথম প্রথম।

এতগুলো লোক না রেখে উপায়ও নেই। এই বিশাল বিশাল ঘরের মেঝে নতুন ক'রে মোজেক করিয়েছেন, কোনও কোনওটায় সুদৃশ্য মোজেক টাইলস বসানো। সবই তনুকার পছন্দমতো।

তখন নিজের কথা একটুও ভাবেনি তনুকা, ভাবার কথাও নয়। ও শুধু খুশি হয়েছিল, বোধহয় প্রদীপ্তর ওপর একটু কৃতজ্ঞও, কারণ ওর মনে হয়েছিল বাবা-মা যদি ফিরেই আসে তা হ'লে অন্তত মর্যাদার সঙ্গে এখানে বাস করতে পারবে। পাড়ার লোকের সঙ্গে সমগোত্রীয় হয়ে যাবে না।

কিন্তু ঝামেলা বেধেছে ওই মেঝে ভিজে ন্যাতা বুলিয়ে পরিষ্কার করানোয়। ঠিকের মেয়েটা কাজ নেবার সময় খুব আগ্রহ দেখিয়েছিল, একটা ঘর শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের পিছনে বাঁ হাতের মুঠি দিয়ে ঘুষি মারতে মারতে বলেছিল, ঘর তো নয়, খেলার মাঠ। সেজন্যেই বদ্রীনাথ।

ছিল সবই। অর্থাৎ সবই এনেছিলেন : একে একে খারাপ হয়েছে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কাজ করে না, মেকানিকও মেলেনি। আলমারি-সাইজের ফ্রীজটা চলে, খারাপ হ'লে স্পেয়ার পার্টস পাবেন কি না সন্দেহ। ওয়াশিং মেসিন অনেক কষ্টে সারানো গেছে।

সুপর্ণাও বুঝতে পারছেন একটু একটু করে পদ্মপুকুর হয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। তাতে যে উনি খুব অখুশি তাও নন।

অখুশি শুধু একটাই কারণে, তনুকা ফিরে এসেছে বলে। একাই।

আবার নিজের মনকেও প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছেন, এলোই বা। এ সব তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে, ঘরে ঘরে। নিজেদের মুখ চেপে রাখতেই অস্থির সবাই, টীকাটিপ্পনী কাটবে কখন। কান বন্ধ করে তো মুখ খোলা রাখা যায় না।

তবে প্রদীপ্তর সঙ্গে তনুকার সম্পর্কটা এখনও ওঁদের কাছে রহস্য। মাঝে মাঝেই প্রদীপ্ত ফোন করে, হেসে হেসে তনু ওর সঙ্গে কথাও বলে।

একদিন বললে, দীপ হয়তো আসতেও পারে ছুটি পেলে।

ভেবেছিলেন, স্পষ্ট করে জিগ্যেস করবেন তনুকে। সকালে চা খেতে খেতে কথাটা কি ভাবে পাড়বেন, মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন।

বদ্রীনাথ বাজারের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে ঝট করে উঠে পড়ল তনুকা। বদ্রীনাথের হাত থেকে ব্যাগটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বললে, আমি যাচ্ছি।

সেই দিন থেকে শাকসব্জির বাজারটা তনুকাই করে আসছে।

শুভব্রত বা সুপর্ণা কেউই আপত্তি করেননি। ওঁরা তো জানেন কাজ ছাড়া মেয়েটা একদণ্ড থাকতে পারে না। রয়েবসে যে ভাল করে সমস্যাটা কি জিগ্যেস করবেন তার উপায়ও নেই সেজন্যে। কাজের ফাঁকে যখন গল্পগুজব করবে, ওঁদের সঙ্গেই হোক্ বা কাজের মেয়ে কি বদ্রীনাথের সঙ্গে, হৈ হৈ হাসি হল্লা উল্লাস। তখন ওর ফুর্তিটা নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। আবার কখনও কখনও একেবারে চুপচাপ, ডাকলে সাড়াও দেয় না। তখন প্রদীপ্তর কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে ওর দুঃখ বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে না।

বাজার থেকে ফিরলে সুযোগ খুঁজবেন, ভেবেছিলেন সুপর্ণা।

সুযোগ পাওয়া গেল না।

ফিরে এসেই মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসল বেতের চেয়ারটায়। হাতে বাঁধানো লাল মলাটের খাতাটা।

এই খাতাটায় তনুকা তার দৈনন্দিন রিপোর্ট রাখে, রিসার্চ টেবিলে যা কিছু ঘটে, যা কিছু দেখে নোট রেখে দেয়। একটু ভাবনাচিন্তা করে। ব্যস্, তারপর ছোটাছুটি।

স্নান খাওয়া সেরে ছুটতে ছুটতে এসে বাসস্টপে দাঁড়ানো।

বাস থেকে নেমে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে সেন্টারের সিঁড়ি ভাঙা, লিফট্, তারপর নিজের হলে ঢোকার আগে দরজার ওপরে লেখাটিতে অবশ্যই চোখ পড়বে। ইংরেজি অক্ষরে লেখা আছে 'ব্যাকটিরিয়াম'। লেখাটা ওর ঠিক পছন্দ নয়, সেজন্যেই হয়তো প্রতিদিন চোখে পড়ে। আমেরিকায় ছিল : ইউনিসেলুলার অরগ্যানিজম। তবে সেখানে ওদের ডিপার্টমেন্টের কাজটা ছিল শুধুই ব্যাকটিরিয়া নিধনের কাজ ; অর্থাৎ নতুন নতুন ওষুধের গুণাগুণ বিচার করা। আর সব কাজেই একটু তাড়া। কত তাড়াতাড়ি তুমি তোমার কাজ সম্পন্ন করতে পারো। কারণ ওষুধটা তাড়াতাড়ি বাজারে বের করতে পারলে কোটি কোটি ডলার লাভ। সবটাই প্রফিট মোটিভ। তা না হ'লে এত মাইনে দিয়ে এত এত লোক পুষবে কেন!

ফাউন্ডেশনের টাকায় চলে, তাই এখানে খোঁজাটাই বড়। তুমি কি খুঁজছ, কি কাজে লাগবে তা কেউ জানতে চায় না। সান্যালের কাছে রিপোর্ট সই করিয়ে নিয়ে সোয়ামির কাছে প্রতি মাসে জমা দিলেই হ'ল।

তনুকা সারা জীবন ধরে স্বাধীনতাই খুঁজেছে। দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও চাই। এখানে তা পেয়েছে। পেয়েছে বলেই খুশি।

হলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তনুকা বিশ্বসংসার ভুলে যায়। যখনই একটু সময় পায় এর ওর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, দু'একটা হাসিইয়ার্কি। কেউ কেউ সেরাম নিয়ে কোনও রোগপ্রতিষেধক খুঁজছে। নিজেরাই নিজেদের উপহাস করে বলে, আমরা হলাম খোঁজ পরিষদ্। শুধুই খুঁজছি।

একটি বয়স্ক লোক, সুবিমলবাবু একদিন এসে তনুকার টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। আসলে ওর হাসি, কথাবার্তা, রসিকতার জন্যে ওকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। সুবিমলবাবু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, এই সব ছ্যাবলামি ওঁর পছন্দ নয়। উনি যখন কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন, মনে হয় অ্যাটলাসের কাঁধ থেকে পৃথিবীটা কেউ ওঁর ঘাড়ে এনে বসিয়ে দিয়েছে। তাই তনুকা ওঁকে এড়িয়ে যেত।

সেই সুবিমলবাবুও এসে তনুকার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছেন দেখে আশপাশের সকলেই অবাক হয়ে তাকাল। মনে মনে হয়তো বললে, মেয়েটা জাদু জানে।

খোঁজাখুঁজির রসিকতা উনিও করতেন না তা নয়।

তাই একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, তুমি কি খুঁজছ গো দিদিমণি?

আমি?

অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তনুকা বললে, আমি কি খুঁজছি। তারপরই সহাস্য উত্তর : এ হ্যান্ডসাম ইয়াংম্যান।

সারা হল হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল।

কিন্তু কোনও হ্যান্ডসাম ইয়াংম্যানের কাছে যাওয়ার বদলে চায়ের সময় একদিন সটান চলে গেল এন টি সোয়ামির ঘরে।

সোয়ামি অফিসে কোনও ফরম্যালিটি মানেন না। বাইরের লোক দেখা করতে চাইলে

উনি যতখানি দুষ্প্রাপ্য, ঘরের লোকদের কাছে ততখানি অবারিত দ্বার। যে কেউ যখন খুশি গিয়ে দেখা করতে পারে, পরামর্শ নিতে পারে। এই খবরটা জানার পর তনুকা একদিন সটান গিয়ে হাজির হ'ল।

দু'জন লোকের সঙ্গে গল্প করছিলেন। দু'জনই পুরুষ।

তনুকা ভেবেছিল আত্রেয়ী দেশপাণ্ডের সঙ্গে হয়তো চা খাচ্ছেন।

না, নেই। নিশ্চিন্ত।

বললে, চা খাওয়ান।

সকলেই এ সময় চা খায়। ক্যান্টিন নেই, কিন্তু কয়েকজন বেয়ারা মিলে চা বানায়, বিক্রি করে।

তাই চায়ের কথাটা হঠাৎ ওর মুখে এসে গেল।

সোয়ামি খুশি হয়ে বললেন, এসো এসো, বসো।

তারপর : আমি একজন সাউথ ইন্ডিয়ান তুমি জানো না? আমাদের ঘরে চা ঢুকতে পায় না। কফি খাও।

বেয়ারাকে বেল্ বাজিয়ে ডেকে কফির অর্ডার দিলেন।

সেই শুরু।

পরস্পরে একটিও কথা না বলে দু'জনেই চুপচাপ কফি খেয়ে যাচ্ছে। তনুকার মুখে বোধহয় কোনও কথা জোগাচ্ছিল না। কিংবা ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে ধরনের কথা বলে এই নীরস লোকটির কাছে সে ধরনের কথা বলা যায় কি না ভাবছিল। ঢুকতেই হেসে যে ভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন, তারপর আর বিশেষ কোনও সমাদর পাচ্ছে ব'লে মনে হ'ল না তনুকার। ভেতরে ভেতরে একটু আহত বোধ করেছিল।

এরই মধ্যে দু'একজন লোক আসছিল, দু'একটি কথা সেরে নিচ্ছিল। কেউ কেউ মুখচেনা, এই অফিসেরই, কোনও ডিপার্টমেন্ট জানে না।

—তা তোমার কেমন লাগছে এখানে, তা তো বললে না। সোয়ামি হঠাৎ বললেন।

—আমার পছন্দ হয়েছে।

সোয়ামি কথাটা ছুড়ে দিয়ে টেবিল থেকে সায়েন্স জার্নালটা তুলে নিলেন, এবং মুহূর্তে তার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন, উত্তর শোনার জন্যে যেন অপেক্ষা করলেন না।

অথচ এর আগে ওর কেমন সন্দেহ হয়েছিল, লোকটি ওর প্রতি আগ্রহী। তা নিয়ে তপতীর সঙ্গে হাসাহাসি করতেও কসুর করেনি।

ওদের হলের মধ্যে দিয়ে, হয়তো সব ডিপার্টমেন্টেই, সোয়ামি প্রতিদিন কোনও না কোনও সময়ে একটা রাউন্ড দিয়ে যান। যাবার সময় কাউকে উৎসাহ, কাউকে নিছক কোনও প্রশ্ন। একদিন তনুকার পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তনুকার কর্মরত হাত থেমে গিয়েছিল, ও হয়তো উঠে দাঁড়াতেও চেয়েছিল, যদিও সেটা নিয়ম নয়। অপ্রতিভ শব্দটা তনুকার অভিধানে নেই, কোনও অবস্থাতেই ও আড়ষ্ট বোধ করে না।

তনুকা দেখেছে অনেকে সোয়ামিকে এতই সমীহ করে যে সেটাকে ভয়ও মনে হতে পারে। কেউ কেউ একেবারে বন্ধুর মতো কথা বলে, সোয়ামিও এমন ভাবে মেশেন, যে বাইরের লোক দেখলে টেরই পাবে না যে তারা সোয়ামির চেয়ে তিন ধাপ নীচের লোক। আসলে এই সায়েন্টিফিক সেন্টারে উচ্চনীচ ভেদ নেই বললেই চলে। কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই টের পেয়ে গিয়েছিল, সোয়ামি অজাতশত্রু নন। কারও কারও অপছন্দ এতই তীব্র, অথচ কেন তারও কোনও হদিস পায়নি। কারণ তারা সোয়ামির সঙ্গে একেবারেই সংস্পর্শহীন। সেজন্যে সোয়ামিকে কিছুটা রহস্যও মনে হত।

উনি পিছনে এসে দাঁড়াতেই তনুকার হাত থেমে গিয়েছিল, ও গ্যাস বার্নারের নীল

শিখার ওপর কাচের পাত্রে কি একটা সলিউশন ধরতে যাচ্ছিল, হাত সরিয়ে নিল।

সোয়ামি বললেন, থেমে গেলে কেন, গো অন উইথ ইয়োর ওয়ার্ক। ইউ আর নট সাপোজ্ড টু লুক অ্যাট মাই ফেস।

এবং পরমুহূর্তেই পরিহাস, তোমার মতো গুড লুকিং গার্লের পক্ষে তাকিয়ে থাকার মতো মুখও আমার নয়।

—অবকোর্স ইউ হ্যাভ। রসিকতায় হেসে উঠেই তনুকা বললে, এবং সেটা যাতে স্তাবকতার মতো না শোনায় সেজন্যে যোগ করে দিল : কারণ ওই মাথাটা তোমার ফেস্-এর ওপরেই আছে।

হো হো করে হেসে উঠলেন সোয়ামি। পাশ থেকে সান্যালও বলে উঠলেন, ওয়েল সেড।

আর সোয়ামি তখনও নিজেকে পরিহাস করছেন : এই টাক মাথাটা কি করেই বা লুকোব ?

আশপাশের কয়েকজনের কানে গিয়েছিল এই কথোপকথন, তারাও মৃদু মৃদু হাসছিল। কিন্তু তনুকার মনে হ'ল সর্বসমক্ষে এই প্রশংসা সরল মনে সকলে কি নিতে পারবে। আর নিজের মনেও বোধহয় কিছুটা সংশয় উঁকি দিয়েছিল। আরও তো অনেক মেয়ে কাজ করছে, কই তাদের পিছনে গিয়ে তো এতক্ষণ দাঁড়াও না, এত রসিকতাও করো না তাদের সঙ্গে।

তাই সোয়ামি রাউন্ড দিয়ে বেরিয়ে যেতেই তনুকা ফিসফিস করে বললেন, সান্যালদা, কি ব্যাপার বলুন তো ?

সান্যালদা বললেন, ব্যাপার তো তোমার ! একটু হেসে, পছন্দ হয়ে গিয়েছে বস্কে ?

হাসি থেমে গিয়ে তনুকার মুখে একটা চিন্তাক্লিষ্ট ভাব ফুটে উঠল। এটা বলতে গেলে তনুকার একটা রোগ। হঠাৎ হঠাৎ কোনও কথা যেন মস্তিষ্কের কোষে গিয়ে আঘাত করে, এবং তখন ও যেন তন্ন তন্ন করে কি খুঁজে বেড়ায়। কিংবা সেটাকে যাচাই করে দেখে, সত্যি কি না।

ও পর পর ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে গেল। যখন চলে আসছে, লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে প্লেনের জন্যে, মন বিষণ্ন, প্রায় ভেঙে পড়া অবস্থা, চোখে জল এসে গিয়েছিল ও জানতেই পারেনি। অথচ কেন কাউকে বোঝানো যাবে না। প্রদীপ্ত সী-অফ করতে এসেছিল, কাছেই ঘোরাঘুরি করছিল। প্রদীপ্ত, যার কাছ থেকেই পালিয়ে আসা, তার জন্যে খানিকটা মুক্তির হাওয়া মনের মধ্যে। আবার প্রদীপ্ত, মানে ওর দীর্ঘদিনের বন্ধু, যাকে দাঁড় করানো ছিল ওর স্বপ্ন, এবং সেই বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যথাও। আসল দুঃখ ছিল আর কিছুই নয়, আমেরিকাকে ছেড়ে আসার। আমেরিকা তো ওর কাছে ভোগ ঐশ্বর্য সুযোগ সম্ভাবনার দেশ ছিল না। তনুকার কাছে আমেরিকা ছিল ওর গ্রামের বাড়ি। ও গ্রাম দেখেনি, মা জোর করে কিছু বই পড়িয়েছিল, নিজেও পড়েছে, আর সেখান থেকেই তনুকা এই অনুভূতিটা পেয়েছে, যে গ্রাম্য একটি ছেলে যখন গ্রাম ছেড়ে চলে আসে তখন তার বুকের ভেতর কি একটা মায়াময় ব্যথা সারা বুক নিঙড়ে দেয় ! সেভাবেই ওর বুকের ভেতর একটা অবোধ্য ব্যথা গুমরে উঠছিল, কিন্তু তা যে ওর চোখ সজল করে দিতে পারে ভাবতেই পারেনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে ও যেন কোনও সমবেদনার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিল।

পাশের চেয়ার বলে উঠল, হোয়াই আর ইউ উইপিং, বেবি !

তারপর দমদম এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছে : একখানা কার্ড এগিয়ে দিয়ে বললে....

যখন দেখা করতে এল এই অফিসে, কি সাদর আমন্ত্রণ। কি আন্তরিক ব্যবহার। কি লজ্জা, কি লজ্জা, এত বড় একজন সায়েন্টিস্টের নামই শোনেনি। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বসেছে তপতীর কাছে।

অথচ করিডরে আত্রেয়ী দেশপাণ্ডের সঙ্গে অতক্ষণ গল্প করা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ফেরার পথে তার কাঁধে দুটো অন্তরঙ্গ চাপড় দেওয়া এবং তার জন্যে ওর হঠাৎ ঈষৎ ঈর্ষাবোধ...সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে চাইল তনুকা।

সান্যালদা পরিহাস করে যা বললেন, তা কি সত্যি নাকি ?

কিছুটা যে সত্য আছে তা যেন তনুকা এখন বুঝতে পারছে।

কফি যে শেষ হয়ে গেছে এখন, ঝট্ করে উঠে চলে যাওয়ারই কথা।

যে কেউ মনে করতে পারে ও কোনও সুযোগের সন্ধানে এসেছে, স্তাবকতা করছে, হয়তো দুটো ইনক্রিমেন্ট কি একটা লিফ্‌ট চেয়ে বসবে সময় হলেই। কারণ ওরা তনুকাকে আদৌ চেনে না। স্যালারি নিয়ে ওর কোনও মাথাব্যথা নেই, কাজটাই আসল। ও একটা কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। এমন কাজ যেটা ওর স্বপ্নের মধ্যে আছে।

কিন্তু এই উপেক্ষা বড় দুঃসহ, কারণ ও সামনে বসে থাকা সত্ত্বেও সোয়ামি একটা সায়েন্স জার্নালের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিয়েছেন।

সোয়ামি হঠাৎ যেন তনুকার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হলেন। জার্নালটা নামিয়ে রেখে হেসে বললেন, সান্যাল তোমাকে একটা কিউ দিয়েছে, কিন্তু তুমি কি করতে চাও।

—আমি জেনেটিক সায়েন্স সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চাই।

ইংরেজিতে 'ইউ' একটাই শব্দ, কিন্তু সেটা উচ্চারণ করার সময় তনুকার কানে 'তুমি' শোনাল।

সোয়ামি হেসে বললেন, হঠাৎ আবার মাইক্রোবায়োলজি থেকে জেনেটিক সায়েন্সে পড়াশোনা শুরু করবে নাকি ?

—হ্যাঁ, আপনার কাছে। আমি আপনার ছাত্রী হতে চাই। মুখে মৃদু হাসি।

'ছাত্রী' শব্দটা, স্টুডেন্ট, উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তনুকার মনে পড়ে গেল আত্রেয়ী দেশপাণ্ডে সোয়ামির প্রাক্তন ছাত্রী, যার জন্যে উনি গর্ব বোধ করেন। গর্ব না প্রেম, কে জানে।

সোয়ামি হেসে হালকা করে দিলেন তার কথাটা। বললেন, এনি আদার সায়েন্স ফিকশন ?

তনুকা হেসে বলল, অনেক।

তারপরই গম্ভীর হয়ে বলল, আমরা প্রয়োজনমতো যদি ব্যাকটিরিয়াকে বন্ধু করে নিতে পারি, মিউটেশন করিয়ে...

সোয়ামি তখনও হাসছেন।

—ধরুন এই যে শহরের পলিউশন, গাড়ির ধোঁয়া, কারখানার ধোঁয়া...কিংবা শহরের গার্বেজ, কারখানার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এসে পড়ছে গঙ্গায়...এ-সবই কি আপনার মনে হয় না, নতুন ধরনের ব্যাকটিরিয়া তৈরি করতে পারলে, কোনও প্রবলেমই থাকবে না।

একটু থেমে বললে, ব্যাকটিরিয়া বানিয়ে পেট্রোল শোধনের কাজ তো...

সোয়ামি বলে উঠলেন, আই নো, আই নো। অবাস্তব কথা তুমি একটাও বলনি সেদিন।

তনুকার মধ্যে কি যে ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। ও তো একটুও আবেগপ্রবণ নয়, বিশেষ আবেগ ভিতরে যদি বা থাকে, প্রকাশ করার বদলে হেসে ওঠে। অথচ...

—শুধু একা একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, উইদাউট দি হেল্প অফ এ জেনেটিসিস্ট,

কিই বা করতে পারে।

একটু থেমে বলল, তুমি যদি আমার দিকে একবার একটু হাত বাড়িয়ে দাও, ইফ উই কোলাবোরেট...

—ঠিক আছে ভাবব। তুমি এখন চলে যাও। সময় নষ্ট কোরো না। অন্তত সায়েন্সের ফিল্ডে, মনে রেখো, নষ্ট করার মতো সময় কারো হাতে নেই।

পরে ও এতখানি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল বলে তনুকার নিজেরই খারাপ লাগছিল।

সেদিন মনটা খুব অশান্ত ছিল, কি করি কি করি ভাব, একা একা, অফিসের যাকেই বলত সে সঙ্গ দিতে উৎসাহ দেখাত, কিন্তু শেষ অবধি চলে গেল তপতীর কাছেই।

ফাজলামিতে তপতীও কম যায় না। সব শুনল। সোয়ামির প্রতি তনু সত্যি একটু একটু করে অনুরক্ত হয়ে পড়ছে না তো ! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজল। তারপর কফি খেতে খেতে এবং খাওয়ার পর কি কি কথা হয়েছে।

তনুকাকে তপতীর চিনতে বাকি নেই, অবাক হয়ে বললে, তুই এ কথা বললি ? আমার দিকে যদি একবার হাত বাড়িয়ে দাও ?

—হ্যাঁ।

হো হো করে হেসে উঠল তপু। বলল, যদি সত্যি বাড়িয়ে দিত হাতটা ?

তনুকার অট্টহাস।

তারপর। কি মানুষ রে তপু, যে কেউ আমার হাত ছোঁবার জন্যে ছুকছুক করে। ছুঁতে পেলে বর্তে যায়। আর হাঁড়িমুখ ওই সুযোগে একটা হ্যান্ডশেকও করতে চাইল না।

তপতী বলল, তা হলে লোকটা ভাল !

—ছাই। আত্রেয়ী দেশপাণ্ডের প্রেমে হাবুড়বু খাচ্ছে।

কপাল কুঁচকে গেল তপতীর। তীক্ষ্ণ চোখ তার তনুকার চোখদুটোকে পর্যবেক্ষণ করছে যেন। হঠাৎ বললে, তনু, আমার ভয় করছে রে !

—এর মধ্যে ভয় করবার কি আছে ? দ্যাখ তপু, তুই ভুলে যাস না, বার্বারিক আমেরিকা আমাকে নষ্ট করতে পারেনি। আর আমি যদি সত্যি সত্যি ওই সোয়ামির প্রেমে পড়ে যাই, আই ক্যান অ্যাজ ওয়েল গো টু বেড উইথ হিম।

বলেই হেসে উঠল তনুকা।

তপতীর চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

—কি বলছিস তুই !

তনুকা চোখ ছোট ছোট করে ঠোঁট টিপে দুষ্টুমির হাসি হাসল। —তুই তো জানিস, আমি অন্যদের মতো নই। আমি আমার মতো। আমার নিজেরও কতকগুলো ন্যায়নীতি আছে, ভ্যালুজ আছে, সেগুলো আমি মেনে চলি। অন্যদের সঙ্গে তার একটুও মিল নেই। মিল নেই বলেই তোরা ভয় পাস।

একটু থেমে বলল, আমি প্রেম খুঁজে বেড়াচ্ছি তাও ভাবিস না। প্রেম বলে সত্যি কিছু আছে তাই তো আমি বিশ্বাস করি না। আই হ্যাভ হ্যাড এনাফ অফ ইট।

এ ধরনের কথা বলার সময় তনুকার গলার স্বর একটু বদলে যায়। সামান্যই। গলার স্বর গাঢ় হয়ে যাবে, মুখে বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠবে, কিংবা বুকের অন্তঃস্থল থেকে সেই ব্যথা মাখানো চাপা কান্নাকে চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসতে দেবে তেমন মেয়েই নয় তনুকা। তাই বাইরে থেকে কেউই ধরতে পারে না।

তপতী পারে, গলার স্বর কিংবা মুখের চেহারা সামান্যই বদলায়, তবু ও তা ধরতে পারে। শুধু গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বলেই নয়। ও জেনে ফেলেছে, যে মেয়ে নেশার ঘোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাইক্রোস্কোপ চোখে এঁটে ব্যাকটিরিয়ার ধর্ম চরিত্র খুঁজে বের করার

চেষ্টা করে, তাকেও জানতে হলে অণুবীক্ষণ দৃষ্টিতে তাকে যাচাই করতে হয়। ব্যথা কোথায় ও বুঝে গেছে।

তনুকা বলেছিল, এত খোঁজার তো কিছু নেই। আমি অচেনা কোনও ব্যাকটিরিয়াম নই। একেবারে স্ট্রেট। সোজা রডের মতো ব্যাসিলাস। অবশ্য রোগ ছড়াই না।

সেজন্যেই মনে হয়, ওর জীবনে প্রদীপ্তকে বিয়ে করা ওর একটা বড় ব্লান্ডার।

তাই আবার একদিন সুযোগ পেয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, প্রদীপ্তর কি কোনও অক্ষমতা...

না। গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করেছে তনু।

তা হলে তোর কি...

হেসে গড়িয়ে পড়েছে তনুকা। মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি, হাসতে হাসতে বাঁ হাতটা নেড়ে নেড়ে বুঝিয়েছে—না।

এই হেঁয়ালি তো সুপর্ণার কাছেও।

বিয়ের বছর কয়েক পরে, ও তখন আমেরিকায়, প্রদীপ্তও।

মা এখান থেকে ফোনে কথা বলতে বলতে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁ রে, তোদের বাচ্চাকাচ্চা হবে না ?

এক মুহূর্ত থমকে গিয়েছিল তনুকা। তারপর হেসে বলেছে, মা, এক বিছানায় শুলেই কি বাচ্চাকাচ্চা হয় ?

এরপর সুপর্ণার থমকে যাবার পালা।

ধাতস্থ হয়ে অন্য কিছু ভেবে জিজ্ঞেস করেছেন, ডাক্তার দেখিয়েছিস ?

আবার হাসি। প্রয়োজন হলে তো !

সুপর্ণা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেছেন। তারপর বলেছেন, তা হলে তুই ওখানে আছিস কেন, চলে আয়।

—তনুকা বলে উঠেছে, কি করে যাব মা। আমার কাজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, ওখানে গেলেও কিছু একটা পেয়ে যাব। কিন্তু বেচারা দীপ, তার কথা ভাবো। ও একেবারে একা হয়ে যাবে, ভেঙে পড়বে। ওকে একবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও, ও এসটাব্লিশ্‌ড্ হলেই আমি নিজেই ফিরে যাব।

একটু থেমে বলেছে, আমারও বড় একা লাগে, ওখানে গেলে তবু তো তোমাদের কাছে থাকতে পারব।

সুপর্ণা বোধহয় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। ফোন নামিয়ে দিয়ে বসে পড়েছিলেন।

না, শুভব্রতকে বলা যাবে না। এখন তো নয়ই। শুনলে ভেঙে পড়বে। এমনিতেই সেই কর্মচঞ্চল মানুষটা কেমন বদলে গেছে। জীবনটাকে কেমন অর্থহীন মনে করতে শুরু করেছে। কোনও কিছুতেই যেন আগ্রহ নেই। চুপচাপ বসে থাকেন। দু'পা হেঁটে ওই বড় পুকুরের সুইমিং ক্লাবের ছেলেদের সাঁতার দেখতে যান।

এক রবিবার সকালে তনুকা হঠাৎ বলল, মা ওই পুকুরটায় সবাই তো সাঁতার কাটে। ভাবছি, আমিও যাব।

ওই পুকুরটার পাশ দিয়ে যেতে আসতে সাঁতার দেখতে দেখতে ওরও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, সুইমিং কস্টিউমটা পরে নেমে পড়তে। ওখানে থাকতে মাঝে মাঝেই সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে যেত অ্যাকসিডেন্টের আগে, ও আর দীপ। নিজেকে দিব্যি ফ্রেশ লাগত।

সুপর্ণা ওর কথা শুনে বলে উঠলেন, এই না।

—কেন জল কি খুব খারাপ নাকি ?

সুপর্ণা বললেন, হ্যাঁ। নামলেই অসুখ হবে।

প্রথম প্রথম এখানে এসে এই সব ভয় হত সুপর্ণার। শুভব্রতরও। জলই আমাদের জীবন, সেই কোন শিশুপাঠ্য বইয়ে পড়েছিলেন। আর এখানে জলকেই ভয়। চতুর্দিকে আবর্জনার, রাস্তার ধার দেওয়ালের গা থেকে উৎকট গন্ধ। এই শহরটার যেন কুৎসিত একটা দুর্গন্ধ আছে। এক এক সময় অসহ্য মনে হত। এখন সয়ে গেছে।

সুপর্ণা বলে উঠেছিলেন, এই না।

যেন দূষিত নোংরা জলের ভয়েই বলেছেন।

আসলে আপত্তি অন্যত্র। সুইমিং কস্টিউম পরে পাড়ার পুকুরে তনুকা সাঁতার কাটতে নামলে বিশেষত এত বয়সে, হয়তো বল্টু এসেই, অথবা ওই মেজগিন্নি বলবে, তোমাদের জন্যে পাড়ায় মুখ দেখানো দায়। অনেকেই ছি ছি করবে। পাড়ার ছেলেগুলো ঢিল ছুড়বে জানলায়। মস্তানরা বাড়ির সামনে দাঁড়াবে, জটলা করবে। দেওয়ালে কোথায় কি লিখে রেখে যাবে কে জানে।

একসময় বিদেশে বসে শিকড় খুঁজতে চেয়েছিলেন। ওই তো শিকড়ের নমুনা।

তনুকা ভাবল সত্যি জল খারাপ।

মন খারাপ ছিল। ভেবেছিল সাঁতার কাটতে পেলে এই মন খারাপ ভাবটা কেটে যাবে।

তাই উপায় না দেখে রাস্তা পেরিয়ে একটা বাসে উঠে পড়ল।

এক পলকের জন্য তপতীর কথা মনে পড়ল। ওকে সঙ্গে নিতে পারলে দারুণ মজা হত। কিন্তু সকলেই তো আর তনুকার মতো নিঃসঙ্গ নয়। বুকের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় না তাদের। তপুর ঘরসংসার আছে। আজ রবিবার। হয়তো অন্য বন্ধুবান্ধব আসবে। তাছাড়া ওর তো আজ মাংসভাতের দিন। নিজেই রান্না করে, হয়তো ব্যস্তও থাকবে।

এই একটা মধ্যবিত্ত অভ্যাস তনুকাদের বাড়িতে নেই। তার কারণ ওখানে থাকতে উইকএন্ড হলেই কোথাও একটা চলে যেত ওরা। বাইরে খেত। রান্নাবান্নার পাটই ছিল না ছুটির দিনে। আর মাংসও কোনও একটা নির্দিষ্ট দিনের সঙ্গে জুড়ে থাকত না। যেদিন খুশি ফ্রীজ থেকে বের কর, রান্না করে খাও। সেই অভ্যাসটা এখানেও রয়ে গেছে।

কোথায় যাবেন ? কনডাক্টর জিজ্ঞেস করল।

তনুকা তখনও উদ্দেশ্যহীন, আগে থেকে ভেবে তো বাসে ওঠেনি।

আমতা আমতা করে বলল, ওই যে কি নাম যেন! মনে পড়তেই বলে উঠল, বারুইপুর, সোনারপুর, চম্পাহাটি—ওইসব কোথাও।

কনডাক্টর কেন, বাসসুদ্ধ লোকই ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। বেশবাস অতি সাধারণ হলে কি হবে, যাত্রীভরা বাসের নগণ্যতার মধ্যে ওকে যে একটা বড়সড় লালগোলাপের তোড়ার মতো লাগছে।

কনডাক্টর ওর কথা শুনে হেসে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা নিমেষে বেবাক চেপে গিয়ে একটু সহৃদয় স্বরে বলল, ও সবের বাস তো আপনি এখানে পাবেন না। বরং গড়িয়া থেকে, কিংবা গোলপার্কে নেমেও...

ওর হাতের দশটাকার নোটটা নিয়ে টিকিট আর টাকা ফেরত দিল।

তনুকা নিজে মোটেই অবাক হল না। কেউ অবাক হলে চটপট বলে দিত, বাংলায় এর নাম মেধা, তাই না ? মেধা মানে স্মৃতিশক্তি, আবার কমপ্রিহেনশনও, ঠিক বলেছি ?

ও নিজে অবাক হবে কেন, ওর কাছে এটা খুবই স্বাভাবিক।

সেই কবে কত বছর আগে, প্রদীপ্তর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিন, অনিমেষকাকুর ওখান থেকে আসছে ওদের বাড়িটা দেখতে, ভেঙেচুরে নতুন চেহারা দেবার জন্যে, ও হঠাৎ বলেছিল, তুমি আমাকে গ্রাম দেখাবে ? আমি দেখিনি কখনও।

প্রদীপ্ত হাসেনি, না দেখাই তো ওর পক্ষে স্বাভাবিক। যে আমেরিকায় জন্ম থেকে মানুষ, সে আমাদের গ্রাম দেখার সুযোগ পাবে কি করে।

আরেক দিন মনে পড়িয়ে দিতেই দীপ বলেছিল, ও আর শক্ত কি, বাসে উঠে চলে গেলেই হল, বারুইপুর, সোনারপুর, চম্পাহাটি যেখানেই যাও, কত গ্রাম দেখবে।

তারপর আর ওইসব নাম একদিনও শোনেনি। তবু এত বছর বাদেও সব মনে আছে। একটা স্থির স্নিগ্ধ দিঘির জলের মতো নিষ্কম্প হয়ে ছিল ওর মন এবং মস্তিষ্ক, হঠাৎ যেন একটা ঢিল পড়ল। অস্থিরতা, চিন্তা। কেন মনে পড়ল, কেন ? শুধুই স্মৃতিশক্তি ? না কি প্রদীপ্ত এখনও জড়িয়ে আছে মগজের কোনও অপাংক্তেয় মেমরি লেনে। এখন যদিও একটা ব্লাইন্ড লেন। কানাগলি। যে রাস্তা দিয়ে কোথাও পৌঁছতে পারেনি। ফিরে আসা ছাড়া উপায় নেই।

ভিড়ের বাস বদলে বদলে ও হঠাৎ এক জায়গায় অনেক গাছ দেখতে পেল, দূর থেকে প্রায় বনের মতো লাগে, ফাঁকে ফাঁকে মেটে বাড়ি, ইট-বের করা দেওয়াল, গ্রাম্য মানুষজনের হাঁটাচলা।

হঠাৎ নেমে পড়ল, যদিও ওর টিকিট ছিল আরও দূরের।

বাসরাস্তা দু পাশের জমি থেকে বেশ উঁচু, কিন্তু এক জায়গায় ঢল নামা ঝর্নার মতো একটা পায়েচলা সাদা মাটির পথ এঁকেবেঁকে নেমে গেছে। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে তনুকা সেদিকে হাঁটতে শুরু করল।

গ্রাম।

একবার সিনেমায় দেখেছে, কিন্তু ছবির মধ্যে এই সত্যিকারের গ্রাম কোথায় ! তনুকার খুব অবাক লাগছিল। দু'চারজন লোক যারা আসাযাওয়া করছিল তাদেরও অবাক লাগছিল ওর দিকে তাকিয়ে।

তনুকার মনে হল ওর ঘরে এখনও প্রদীপ্তর একটা ছবি আছে। তার দিকে কোনও দিন চোখই পড়ে না। হঠাৎ পড়লেও কোনও অনুভূতি জাগে না। অথচ ঘরে সোয়ামির কোনও ছবি নেই, থাকবেই বা কেন। ও তো আর টাকমাথা হাঁড়িমুখ লোকটার প্রেমে পড়ে যায়নি। প্রদীপ্তর মতো কোনও আইনের বন্ধন নেই, প্রথম যৌবনের ঘা খাওয়া সুপ্ত বেদনা নেই, প্রেমও নয়, তবু তনুকার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সোয়ামি ইজ মোর রিয়েল। তাকে স্পর্শ করা যাচ্ছে, যেমন এই গ্রামটাকে।

একটা ছোটখাটো পুকুর, নাকি ডোবা, দেখতে পেয়ে ও তার পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল ! এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

একটা লোক ফাঁকা ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, পুকুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে ও তাকে জিজ্ঞেস করল, ওগুলো কি ভাই ?

লোকটা বুঝতে পারে না, পুকুরটায় কি এমন দর্শনীয় জিনিস আছে।

—ওই যে বড় বড় পাতা, লতার মতো।

লোকটা হেসে ফেলে বলল, ও তো কচুরিপানা।

তনুকা তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পুকুরের অর্ধেক জুড়ে ভাসমান কচুরিপানার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়ানো কয়েকটা অহঙ্কারী বেগুনি রঙের ফুলের দিকে। চূড়া করে বাঁধা খোঁপার মতো। যারা ওভাবে খোঁপা বাঁধে তাদের যেমন গর্বিত দেখায় তেমনই।

অস্ফুটে বলল, এই নাকি হায়াসিন্থ ফ্লাওয়ার ! কি সুন্দর।

কবে কোনও ইংরেজি কবিতায় পড়েছিল, স্কুলে পড়ার সময়। তখন এর সৌন্দর্য বোঝেনি। এখন ও বুঝতে পারছে কেন এ ফুল একজন কবির মনে উল্লাস জাগাতে পেরেছিল।

ফেরার সময় মনে হচ্ছিল, আমার জীবনটা ওই কচুরিপানায় ঢেকে যাওয়া ডোবার মতো। একটা হায়াসিন্থ ফ্লাওয়ারও যদি তার মধ্যে থাকত।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসার সময় প্রত্যেকটি গাছের দিকে ও তাকাচ্ছিল। খেতের সবুজ মুগ্ধতার দিকে। হলুদ ফুল ফাঁকে ফাঁকে। অথচ একটারও নাম জানে না ও, একটা গাছও চেনে না। বাসের ভিড়ের মতো, রাস্তার চলমান মানুষের মতো, প্রশেসনের জনতার মতো। নামহীন, পরিচয়হীন। শুধু ভুলে যাওয়ার মতো মুখ।

তার মধ্যে, সোয়ামি তুমি কি আমার জীবনে একটা হায়াসিন্থ ফ্লাওয়ার হয়ে উঠতে পার না। অন্য সকলে বলবে, একটা কচুরিপানার ফুল এনে তনুকা তার দামি আর সুন্দর ভাসের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু আমি জানব, ইট্‌স্ আ হায়াসিন্থ ফ্লাওয়ার, যা একজন কবিকে উদ্বুদ্ধ করে। আমার মধ্যে যে কবি আছে তাকে।

## আট

ছুটির পর সায়েন্টিফিক সেন্টারের সামনের চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে এসে সাদা নুড়ি বিছনো রাস্তা গেট অবধি।

ও নেমে আসছিল, ক্লান্ত শরীর। এখন গিয়ে একটা ভিড়ের বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। না পেলে, বাধ্য হলে তবেই ট্যাক্সি। বাড়ি থেকে অনেকটা দূর। মিটার নিতান্ত কম উঠবে না।

—গাড়িটা পড়েই থাকে, আমরা বুড়োবুড়ি কোথায় আর যাচ্ছি। তুই ব্যবহার করলেই তো পারিস। শুভব্রত একদিন বলেছিলেন।

বলে লাভ নেই, ও মেয়ে তোমার জেদ ছাড়বে না। সুপর্ণা বলেছেন।

জিদ ! ওরা বোঝে না। এর মধ্যেই আমার আমি হওয়া আছে। গেট পার হওয়ার সময় হঠাৎ গাড়িটা পিছন থেকে এসে ওর পাশেই থামল।

ও হকচকিয়ে গিয়ে তাকাতেই গাড়ির জানালায় সোয়ামির হাস্যমুখর মুখ। —চলে এসো, আমি তোমাকে নামিয়ে দেব।

তনুকা হেসে বললে, আপনি তো জানেন না আমি কোন দিকে থাকি।

—জানি। চলে এসো।

তবু কিন্তু কিন্তু করে তনুকা বললে, আমি সাউথে... ল্যান্সডাউন রোড...

—উঠে এসো।

তনুকা উঠে বসল। সোয়ামি কোন দিকে থাকে ও জানেও না, জানার ইচ্ছেও হয়নি। সিঁড়ি বেয়ে যখন নেমে এসেছে, গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। ওটা যে সোয়ামির গাড়ি তাও জানত না।

উঠে পড়তে হ'ল তনুকাকে। খুব যে একটা অনিচ্ছা ছিল তাও নয়। কিন্তু, সঙ্কোচ হচ্ছিল, যদি সোয়ামি উল্টো পথের যাত্রী হয়, আর ওর জন্যেই ওদিকে যায়, তা হলে একটু দাক্ষিণ্য নিতে ওর খারাপই লাগবে।

সোয়ামি বললে, আমি লেক ভিউ রোডে থাকি, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না আমার, আমার রাস্তাতেই পড়ে।

—কিন্তু আমি কোথায় থাকি, আপনি জানলেন কি করে।

—জানি। হাসলেন সোয়ামি।

(আত্রেয়ীর কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে পারো, আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কত গল্প, প্রবলেম নিয়ে আলোচনা। তুমি আবার আমার ঠিকানা জেনে নেবে না!)

সোয়ামি হঠাৎ বললে, তোমার সেই প্রোপোজিশনের কথা আত্রেয়ীকে বলেছি, ওর খুব উৎসাহ। ও রাজি আছে, অ্যান্ড সী ইজ এ ব্রিলিয়েন্ট জেনেটিসিস্ট। ইফ ইউ টু কোলাবরেট...

মাথার ভেতরটা যেন ঝনঝন করে উঠল তনুকার। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, ফর গড্‌স সেক তুমি অফিসের কথা এখন এনো না। লেট মি এনজয় দিস্ ড্রাইভ পীসফুলি।

সোয়ামি হেসে উঠল। অল রাইট, অল রাইট, বি কমফর্টেবল।

অনেকক্ষণ পরে সোয়ামি বললে, পরের সপ্তাহে বম্বে থেকে একজন আসছে, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। না, সায়েন্সের লোক নয়, নিছক ব্যবসাদার। সায়েন্টিফিক অ্যাপারেটাস আমদানি করে, তোমার কি কি দরকার জেনে নেবে।

তনুকা শুধু ঘাড় নাড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সোয়ামি বললেন, তোমার স্বামী কখন আসছেন? সেই যে লাউঞ্জে দেখেছিলাম।

—কিছু মনে করবেন না, আজ আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না। আরেকদিন বলব।

সোয়ামির গাড়িকে ও গলিতে ঢোকাতে চাইল না। ল্যান্সডাউন রোডেই নেমে পড়ল। ছোট্ট করে বললে, ধন্যবাদ।

ওটা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নামার সময় বলে, রেস্টুরেন্টে যে বয় খাবার দেয়, তাকেও।

তপতী হাসে, তোর সকলকেই 'ধন্যবাদ'। বাড়ির জমাদার যে টয়লেট পরিষ্কার করে তাকেও দিস নাকি?

তনুকা হেসেছে। —দু'একটা ভাল অভ্যাস যদি থেকেই যায় ক্ষতি কি!

সোয়ামি কিন্তু এইসব ফরম্যালিটিজের ধার ধারেন না।

বাড়ি ফিরেই রাত্তিরে ফোন করল তপতীকে। ওর এই হঠাৎ হঠাৎ একে ওকে ফোন আসলে কাজের জন্যে নয়। নিছক নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে।

ফোন ধরল তপতীর স্বামী। কাকে চান জিগ্যেস করতে হল না, গলার স্বর চেনা, তাই বলে উঠল, দিচ্ছি তপতীকে দিচ্ছি।

রসিকতার লোভ সংবরণ করতে পারল না তনুকা। বললে, কি বেরসিক লোক আপনি! সুযোগ পাচ্ছেন তবু দুটো কথা বলতে ইচ্ছে হল না।

এর আগেও যে এ ধরনের রসিকতা করেনি ও, তা নয়।

তনুকা বললে, আমি তো ভাবছিলাম আপনাকে নিয়ে কাল কোথাও লাঞ্চ খেতে যাব।

ও প্রান্তে অট্টহাস। —তা হ'লে আমাকেই ডিনারে সার্ভ করে দেবে আপনার বন্ধু।

—কি আশ্চর্য, আমার মতো একজন চার্মিং লেডির সঙ্গে লাঞ্চ খেতে পাওয়ার লোভে বউকে ফাঁকি দিয়ে আসতে পারবেন না?

তনুকা কি বলছে সেটাই তপতীকে শোনাল তার স্বামী।

সে হাসতে হাসতে ফোন ধরে বললে, ফাজলামি রাখ, কি খবর বল, তোর ডায়েরি তো আমাকেই লিখে রাখতে হচ্ছে।

তনুকা হাসতে হাসতে বলল, বাড়ি ফেরার সময় সোয়ামি আজ আমাকে লিফ্‌ট দিল

তার গাড়িতে।

তপতী হেসে বললে, প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেখে খুব একটা আশান্বিত হচ্ছি না।

—হবে কি করে, মাঝখানে যে একটা আত্রেয়ী দেশপাণ্ডে আছে।

—বাবা, এতদূর! তার ওপর জেলাসিও হচ্ছে তোর?

—বুঝতে পারছি না। তবে এখন আর হাঁড়িমুখো মনে হচ্ছে না।

—কুঁজোর মতো লাগছে? কিন্তু টাক?

—লাভলি। বেশ একটা ব্যক্তিত্ব দিয়েছে টাকটা। কিন্তু আমার কি ভয় হচ্ছে জানিস লোকটা সত্যি সত্যি না প্রেমে পড়ে যায়।

তপতী বললে, আমার ভয় ঠিক উল্টো, তুই না শেষে ওর প্রেমে পড়ে যাস।

—আরে দূর, তাও কি সম্ভব নাকি! বড় জোর ও আমার বন্ধু হয়ে যেতে পারে। তুই তো জানিস আমার মধ্যে আর কোনও প্রেম নেই। বয়েস যখন কম ছিল, আই ওয়াজ ডিচ্‌ড্ এগেন অ্যান্ড এগেন। ড্রপ আউট হওয়ার আর সাধ নেই।

তপতী হাসছিল। —যাক তা হ'লে তোর মাথাটা মাথার মধ্যেই আছে।

তনুকা হাসছিল। —আরে এরপর কি কি হবে সবই তো আমার জানা। একদিন মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে বলবে, চলো একটু কফি খেয়ে যাই। তারপর : লাঞ্চের নিমন্ত্রণ। ডিনার। এবং অবশেষে আমার দুঃখের কথা শুনতে শুনতে কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা, আই ফীল ফর ইউ।

দু' দিক থেকেই অট্টহাস।

কিন্তু এ সবের কিছুই হ'ল না।

পরিবর্তে বেয়ারা এসে বললে, সাহেব ডাকছেন আপনাকে।

ডাকতেই পারেন। আশেপাশে যারা ছিল তারা কেউই বিচলিত হ'ল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লিফটের সামনে দাঁড়াল তনুকা। ভাবছে, ডাকটা কেন। কফি খেতে? নাকি আত্রেয়ী দেশপাণ্ডের সঙ্গে জুটি বেঁধে দেবার জন্যে। ব্রিলিয়েন্ট জেনেটিসিস্ট। আর তনুকার পরিচয় দিয়ে হয়তো বলবে, মাইক্রোবায়োলজিস্ট। কিন্তু ওর মাথায় অনেক আইডিয়া আছে। কিংবা তোমার কি কি অ্যাপারেটাস লাগবে লিস্টটা দিয়ো।

ঘরে ঢুকতেই তনুকাকে দেখে সোয়ামির মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্তত তনুকার তাই মনে হ'ল। ভাবতে ভাল লাগল। আরো ভাল লাগল সোয়ামিকে একা দেখে।

—তনুকা, একটা উপকার করবে। আমার বোন ব্যাঙ্গালোর থেকে চিঠি লিখেছে, বেঙ্গল হ্যান্ডলুমের একটা ভাল শাড়ি পাঠাতে। ছুটির পর তুমি সঙ্গে গিয়ে পছন্দ করে দেবে?

কত কি ভেবেছিল তনুকা। তার বদলে একটা শাড়ি পছন্দ করে দেওয়া! যেন আমি শাড়ির কতই জানি। তবু কেন জানি, তনুকার খুব ভাল লাগল। বাইরে যতই হাসিঠাট্টা করুক, সেগুলো কেন করে তাও জানে। 'আসলে তুই তো কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারিস না, পুরুষদের সম্পর্কে তুই সিনিক হয়ে গিয়েছিস।'

এই একটা মানুষকে ওর কেন যে এক একসময় ভাল লাগে বুঝে উঠতে পারে না। শ্রদ্ধা? শ্রদ্ধেয় তো কতই আছে। আসলে ওর মনে হয়েছে মানুষটা ভেতরে ভেতরে খুবই ভাল। এতবড় নামীদামি একটা সেন্টারের একেবারে মাথায় বসে আছে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি, সবাই সমীহ করে, অথচ রাস্তায় দেখলে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া একজন। প্রথম দিন লাউঞ্জে দেখে ও ভাবতেই পারেনি। 'হোয়াই আর ইউ উইপিং, বেবি।' কথাটা মাঝেমাঝেই শুনতে পায়। তা হলে কি স্নেহ। সমবেদনা? কিন্তু

সোয়ামির কোনও উপকার করতে পারলে ও যেন বর্তে যায়। আরো বড় কিছু উপকার করতে পেলে খুশি হত। এ তো নিছক একটা শাড়ি পছন্দ করে দেওয়া।

সোয়ামির সঙ্গে দোকানে দোকানে ঘুরতে বেশ ভাল লাগছিল তনুকার। গড়িয়াহাটের কয়েকটা দোকান ঘুরল, পছন্দ হল না। চলে গেল দক্ষিণাপনে। আসলে সোয়ামির সঙ্গ তনুকার খুব ভাল লাগছিল।

শাড়িটা কেনার পর তনুকা হাসতে হাসতে বললে, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এলে তিনি হয়তো আরো ভাল পছন্দ করতে পারতেন।

—ইয়েস, সি ইজ এ বেঙ্গলি। জানো বোধহয়।

—না তো। তা হলে তাঁকে আনলে না কেন ?

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। সোয়ামি চুপচাপ, কোনও কথা বলছিলেন না।

হঠাৎ বললেন, তনুকা, আই ফীল সো লোনলি। আমার একেবারেই কাজে মন বসে না, আই ক্যাননট কনসেনট্রেট অন এনি সাবজেক্ট। আমার মনে হচ্ছে আমি ফুরিয়ে গিয়েছি, আমাকে দিয়ে আর কিছু হবার নয়।

কথা শুনতে শুনতে তনুকা নিজেও বিমর্ষ হয়ে পড়ল। —কেন, কেন ? তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। তোমার কাছে এই ইনস্টিটিউশনের কত আশা !

সোয়ামি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আই অ্যাম এ ফিনিশড ম্যান। আমি এখন শুধুই একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হয়ে গেছি। ওয়ান অফ দোজ ব্রেনলেস পিপল।

গাড়িতে উঠে কথা হচ্ছিল।

তনুকা হঠাৎ সোয়ামির হাতখানা ধরে ফেলল। বললে, তোমার সব আছে, তুমি মিথ্যে হতাশ হয়ে পড়ছ। আমি বলছি, তুমি তোমার রিসার্চের মধ্যে ডুবে যাও। কাজ ছাড়া লোনলিনেসকে জয় করার আর কিছু নেই।

হঠাৎ বললে, তুমি গাড়ি থামাও। এক্ষুনি তো পৌঁছে যাব। পার্ক করো।

এ মেয়ের কথার যেন কেউ অন্যথা করতে পারে না। অনুরোধের মধ্যে কি এক মাধুর্য আছে যা আদেশের চেয়েও তীব্র।

তনুকা বললে, শোনো, আমার জীবনটা কত লোনলি তা তুমি ভাবতেও পারবে না। কিন্তু দ্যাখো, আমি সবসময় হাসি। আই স্মাইল অ্যান্ড আই লাফ অল দি হোয়াইল। কেন জানো ? আমি কাজের মধ্যে ডুবে যেতে পারি। কাজ আর হাসি না থাকলে আই উইপ।

সোয়ামি গাড়ি পার্ক করে রাখল।

আর গাড়িতে বসে বসেই অনর্গল নিজের জীবনের কথা বলে গেল তনুকা।

সোয়ামি অবাক। বিষাদ মাখানো বিস্ময়ে ওর গলা গাঢ় হয়ে এলো। —এই শূন্যতা নিয়ে তুমি এতগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছ ? ডিভোর্স করনি কেন ?

তনুকা বিষণ্ণ হাসল। —কিছুই ছিল না, কিছুই নেই। কিন্তু মায়া ? আফটার অল আই অ্যাম এ হিউম্যান বিয়িং।

একটু থেমে বললে, ডিভোর্স কি কোনও ড্রিমল্যান্ডের সদর দরজা ? ইজ ইট এ গেট টু প্যারাডাইস ? তারপর কি আছে আমার জন্যে ?

দু'জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ, গাড়ির মধ্যেই।

তারপর হঠাৎ তনুকা বললে, তোমাকে কাজ করতে হবে। দ্যাখো কাজের মধ্যে আমি আমার নিঃসঙ্গতা কি ভাবে ডুবিয়ে দিয়েছি।

একটু থেমে বললে, তুমি আমাকে একটুও বুঝতে পারোনি। আমি কোনও আত্রেয়ী দেশপাণ্ডেকে চাই না, আমি তোমাকে চাই।

কথাটার কোনও গুরুত্ব আছে বলে সোয়ামির মনে হল না।

বললে, কিন্তু আমার লোনলিনেস অন্যরকম।

—বলে ফ্যালো, মন হাল্কা হয়ে যাবে। আমি এই যে সব কথা তোমাকে বলে ফেললাম, কি ভাল লাগছে তুমি ভাবতে পারবে না। আই অ্যাম হ্যাপি নাও। এত সব কথা আমি আজ অবধি কাউকে বলিনি। আমার বাবামাকেও নয়। আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু তনু, তাকেও নয়।

একটু থেমে বললে, আমার কি রকম মনে হল একমাত্র তোমাকেই বলা যায়। কারণ আমরা দুজনেই একই পথের পথিক। উই হ্যাভ সো মেনি থিংস ইন কমন। মন বলছিল, তুমি ঠিক আমারই মতো।

সোয়ামি তনুকার মতো এত গুছিয়ে বলতে পারে না। হয়তো নিজেকে এত ভাল করে বোঝেও না।

শুধু বললে, আমার স্ত্রী বাঙালি মেয়ে, সেও খুব ভাল ছাত্রী ছিল, ওই আত্রেয়ী দেশপাণ্ডের সঙ্গে পড়ত। আমি তখন একজন অধ্যাপক। বিয়ে করলাম আমার ফ্যামিলির সঙ্গে যুদ্ধ করে। স্ত্রী দেবযানীর সঙ্গে তার বাবামা'র চিরকালের জন্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

—তারপর?

সোয়ামি বললে, আমি স্বপ্ন দেখতাম দেবযানীও একজন ব্রিলিয়েন্ট সায়েন্টিস্ট হয়ে উঠবে। হ'ল না। বছর কয়েক পরেই ধরা পড়ল ওর লিউকেমিয়া আছে।

তনুকা চমকে উঠল। —তিনি কোথায় এখন?

সোয়ামি বিষণ্ণ হাসি হাসল। —বম্বে। টাটা হসপিটালে।

বললে, আমার সব স্বপ্ন ভেঙে গেল। যেদিন প্রথম জানলাম লিউকেমিয়া, আমি তোমার মতোই লাউঞ্জে বসে কেঁদেছিলাম। কেউ জানতেও চায়নি, আমার চোখে জল কেন?

হাসার চেষ্টা করল সোয়ামি। বললে, সব টাকা সর্বস্ব দিয়েও ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি, জানি সবই ব্যর্থ হবে। শুধু দিন গুনতে হবে আমাকে, কখন, কবে? অ্যান্ড আই ফীল সো লোনলি।

তনুকা বললে, চলো।

যখন এসেছিল তখন মনে হয়েছিল যেন একটা বাতাসে কাঁপা ফুলের বাগানের মধ্যে দিয়ে আসছে। কি ভাল লাগছিল। আর এখন মনে হচ্ছে অন্ধকার একটা গুমোট টানেলের মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে সোয়ামি হঠাৎ বললে, আত্রেয়ীকে খুঁজে খুঁজে এই সেন্টারে নিয়ে এলাম। কেন জানো? আমি ওর মধ্যে দিয়ে দেবযানীর সাকশেস আশা করি। সাকশেস দেখতে পাই। কিন্তু ও সংসারের মধ্যে এমন ভাবেই আটকে গেছে যে আমি হতাশ হয়ে পড়ছি।

সোয়ামি হেসে বললে, এখন তুমিই আমার একমাত্র আশা।

সোয়ামির কথাগুলো, তার দুঃখ বেদনা একাকিত্ব, তার হতাশা গাড়ির মধ্যে একটা বিষণ্ণ থমথমে আবহাওয়া এনে দিয়েছিল।

তনুকা হঠাৎ হেসে উঠে বললে, হাউ শেলফিস, তুমি চাও না আমি সুখী হই সংসারী হই। একটা কিছু করে ফেললাম, খুব নাম হল, আর তার মধ্যে তুমি তোমার সাকশেস দেখতে পেলে, ব্যস? বাট আই ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি, এই বয়েসেও।

সোয়ামি কোনও কথা বলল না, নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

তনুকার মনে হল ও বোধহয় ভুল জায়গায় ঘা দিয়ে ফেলেছে। বেচারা সেজন্যেই চুপ করে গেছে। হয়তো স্ত্রীর কথা ভাবছে। লিউকেমিয়া। সর্বস্ব দিয়েও যে রোগ সারানো যায় না। কবে, কখন ? যন্ত্রণা চেপে রেখে শুধু অপেক্ষা করা।

ওকে সেই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করার জন্যেই হেসে হাল্কা করতে চাইল তনুকা। আদুরে গলায় বলে উঠল এ সব কথা কেনই বা বলছি আমি ? তোমার কাছে আমার কতটুকুই বা দাম ? এতগুলো রিসার্চ ওয়ার্কারের মধ্যে নগণ্য একজন।

সোয়ামি বললে, ইউ আর লাইক এ গাস্ট অফ উইন্ড টু দিস ইনস্টিটিউশন।

একটু থেমে বললে, অ্যান্ড এ ব্রেথ অফ ফ্রেশ এয়ার টু মি। টু এ লোনলি অ্যান্ড আনহ্যাপি হার্ট।

তনুকা সান্ত্বনার স্বরে বললে, সেজন্যেই হয়তো আমরা দুজনে বন্ধু হতে পারব। পারহ্যাপস এ লিটল মোর দ্যান এ ফ্রেন্ড।

তনুকাকে বাড়ির কাছে বড় রাস্তায় নামিয়ে দেবার সময় সোয়ামি স্টিয়ারিঙ ছেড়ে তার বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল তনুকার ডান হাতখানার দিকে। ছোঁয়া মাত্র তনুকাই সোয়ামির হাতখানা মুঠো করে ধরল, ঈষৎ চাপ দিল।

সোয়ামির বুকের মধ্যে বাগানের এক রাশ রজনীগন্ধা যেন ঝড়ো বাতাসে নেচে নেচে উঠল। অস্ফুটে বললে, আই অ্যাম হ্যাপি।

তনুকার মনে পড়ে না কোনওদিন এমন নিস্তরঙ্গ জীবন উপভোগ করেছে। প্রতি মুহূর্তে ওর মনে হত বুকের ভেতরটা যেন শূন্যতায় ভরা। কি যেন চাই, কি যেন নেই। মনে মনে বললে এখন আর আমার কারও কাছে কোনও চাহিদা নেই। বিশ্বাস কর তপু, এখন মনে হচ্ছে একেই বোধহয় অ্যাবসলিউট ব্লিস বলে। জীবনের এই স্বাদ আমি আর কখনও পাইনি। কারণ আমরা দু'জনই পরস্পরের কাছে কিছুই চাই না। মাঝে মাঝেই মনে হত বাকি জীবনটা আমি কি করে টেনে নিয়ে যাব। বয়েস হবে, চুলে পাক ধরবে, হয়তো শরীর অথর্ব হয়ে পড়বে একদিন, আর তখন চারপাশে তাকিয়ে দেখব কেউ কোথাও নেই, আমি একা, আমি একা। সহ্য করতে করতে চোখে জলও আসবে না, চোখের জল দেখিয়েও কাউকে কাছে টানতে পারব না।

আমার বাইরের ঐশ্বর্যটাই সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে এসেছে। আমার শরীরের ঐশ্বর্য, হ্যালোজেন ল্যাম্পের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে চারপাশ থেকে কেবল কীটপতঙ্গ টেনে এনেছে, ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরে গেছে। আগুনের শিখা হয়ে তাদের পুড়িয়ে দিতেও সাধ হয়নি। কখনও কদাচিৎ নিজেই শুধু জ্বলেছি।

নাও আই অ্যাম ইন পারফেক্ট হ্যাপিনেস। তপু তুই একদিন বলে উঠেছিলি, শান্ত হ, নিজেকে শান্ত কর। 'প্রশান্তি' শব্দটা তুই সেদিন ব্যবহার করেছিলি, আমি তার মানেও বুঝতে পারিনি। আজ বুঝতে পারছি।

আমি জানি, যেদিন আমার চারপাশে কেউ থাকবে না, সেদিনও একজন থাকবে, জীবন্ত শরীর নিয়ে নয়, স্মৃতিতে। একদিন হাসতে হাসতে তোকে বলেছিলাম, শুধু স্মৃতিগুলো পরপর গেঁথে গেলেই একটা মহাভারত হয়ে যাবে। ব্যর্থতা, শূন্যতা, আঘাতের পর আঘাত। নিজেকে মনে হত কমপ্লিটলি ওয়াশড় আউট। আজ কি মনে হচ্ছে জানিস, ধুয়ে মুছে যদি সব সাফ হয়ে গিয়ে থাকে, সে আমি নই, আমার ফেলে আসা জীবনটা। কারণ আমি আবার নতুন করে বেঁচে উঠছি। বেঁচে উঠতে চাই।

সোয়ামি বললে, আমাদের ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্টদের দোষ কি জানো, আমরা একটা কোনও কাজ করে ফেলি, প্রচুর পরিশ্রম করে হয়তো কোনও আবিষ্কার, তারপর ভাবি কাজ শেষ হয়ে গেছে। বার্ধক্যের শীতে খ্যাতির রোদ্দুর পোয়াতে শুরু করি।

বললে, আমি তো একজন শ্যাটার্ড ম্যান, রাত্রে শুতে যাবার আগে টেলিফোনের পাশে চুপচাপ বসে থাকি। উৎকণ্ঠা নিয়ে। সে যে কি দারুণ যন্ত্রণা তুমি ভাবতে পারবে না। বুকের মধ্যে ভয়। যদি কোনও খারাপ খবর আসে, ছেলের কাছ থেকে। দেবযানী কেমন আছে শুধু সেইটুকু জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকি। বিকজ আই লাভ হার। আমার কাজের চেয়েও তাকে বেশি ভালবাসি।

তপু শোন, এই লোকটাকে আমি কি বলতে পারি। কি সান্ত্বনা দিতে পারি। এমন একজন মানুষকে কি বলা যায়, আমি তোমাকে আমার ভালবাসা দেবো, তোমার সব যন্ত্রণা দূর করে দেবো! যদিও আমার এক একসময় সন্দেহ হচ্ছিল, আমি হয়তো ভেতরে ভেতরে মানুষটাকে ভালবেসে ফেলছি।

যা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল তা বলতে পারলাম না।

শুধু সান্ত্বনা দিলাম, তুমি তোমার কাজের মধ্যে ডুবে যাও আবার। হয়তো জেনেটিক্সের নতুন কোনও আবিষ্কার তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

সোয়ামি হতাশ ভাবে বললে, আমার দ্বারা আর কিছু হবে কিনা বুঝতেই পারি না। বড় জোর একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মতো এই সেন্টারটাকে বড় করে তুলতে পারি।

বললাম, আমি যদি তোমার পাশে থাকি...

সোয়ামি অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। বোধহয় কথাটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করল। আমার মনে হল ওর মুখটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ও বললে, আমি তো চাই তুমি সুখী হও। তোমার বুকের ভেতরের যে ভয়েড, সেদিন গাড়িতে বসে বসে বলছিলে, তারপর থেকে আমার কেবল মনে হয়েছে তোমাকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে যদি একটুও দূর করা যায়।

আমি কি বোকা দ্যাখ তপু, আমি বলতে চাইছিলাম, আমি ভালবাসা দিয়ে ওকে একটু শান্তি দিতে চাই। হয়তো বলতে চাইছিলাম আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

সোয়ামি সে দিক দিয়েও গেল না। বললে, আমি অনেক ভেবেছি তনুকা, তোমার সেই অদ্ভুত অদ্ভুত ধাবণা। আমি এই শহরটাকে ভীষণ ভালবাসি, কারণ এটা দেবযানীর শহর।

তপু, একদিন ওকে আত্রেয়ী দেশপাণ্ডের কাঁধে হাত রাখতে দেখে আমার ঈর্ষা হয়েছিল। কিন্তু ওর মুখে 'দেবযানী' নামটা শুনেও কোনও ঈর্ষা হল না। আমার মনে হল ওই নামটা ওর কাছে একটা জ্বালাজুড়োনো ঠাণ্ডা প্রলেপের মতো।

আর তারপরই সেই অবাক করা কথা।

সোয়ামি বললে, তুমি আমাকে চেয়েছিলে, আমি রাজি। এই শহরের আবর্জনা একটা মস্ত বড় সমস্যা। মিউটেশন করে সত্যি যদি কোনও হার্মলেস ব্যাকটিরিয়া বানানো যায়, যা সব আবর্জনাকে নির্দোষ মাটি বানিয়ে দেবে...

একটু থেমে বললে, ইয়েস ইট্‌স্ পসিবল্। ইফ উই ওয়ার্ক টুগেদার...

শোন তপু, সঙ্গে সঙ্গে কি মনে হল জানিস? একশোটা নানা রঙের বেলুন যেন হঠাৎ সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল আকাশ জুড়ে হাজার হাজার পায়রা উড়েছে, পায়রা ঘুরছে।

সে এক অদ্ভুত সম্পর্ক। তুই বুঝতে পারবি না। কেউ বুঝতে পারবে না। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে জেনেটিক্সের সঙ্গে মাইক্রোবায়োলজি কোথায় মিল?

একেই বোধহয় অ্যাবসলিউট ব্লিস বলে। জীবনের এই স্বাদ আমি আর কখনও পাইনি। নাও আই অ্যাম পারফেক্টলি হ্যাপি।

সব স্মৃতি ধুয়ে মুছে গেছে, কিন্তু জানি এই একটা স্মৃতি আমার শেষ জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে।

## নয়

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে নটা। তনুকার ধারণা তা নিয়ে বাবা মা'র কোনও উদ্বেগ নেই। বাধাবিষেধ কোনওকালে ছিল না, থাকার কথাও নয়। সেই শৈশব থেকেই জেনে গেছে এ মেয়ে নিজের ইচ্ছেয় চলবে। আর পাঁচজনে কি ভাবল না ভাবল তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। একটাই ভরসা, নিজের বিচারবিবেচনা আছে। কিন্তু থেকেই বা কি লাভ হ'ল। সেই তো প্রদীপ্তকে বিয়ে করে বসল। বিয়ে অবশ্য এমনই একটা ঘটনা, বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে যে আগে থেকে কিচ্ছুই বোঝা যায় না। এ এক ধরনের লটারি খেলা। বাপ মা বিয়ে দিলেও যা, নিজে বিয়ে করলেও তাই। ভবিষ্যতে কি আছে তা তুমি জানতেও পারবে না। কিন্তু তোর যদি এতই বিচারবিবেচনা তা হ'লে এতকাল চেপে রাখলি কেন। আমাদেরও তো বলতে পারতিস। আর এলি যদি তো ডিভোর্সটা করে এলি না কেন !

তনুকার কাছ থেকে সব শুনে সোয়ামিও বলে উঠেছিলেন, হাউ ফুলিশ, তোমার তো অনেক আগেই ডিভোর্স করে চলে আসা উচিত ছিল।

তনুকা হেসে উঠে বলেছে, তা হ'লে তুমি কি ঝট করে আমাকে বিয়ে করে ফেলতে পারতে ? তোমার তো আত্রেয়ী আছে, তার ওপর....

স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে থমকে গেল। বিষণ্ণ গলায় বললে, এমন স্যাড ব্যাপার, আমার সত্যি তোমার জন্যে কষ্ট হয়। একটা ওষুধও কেউ আবিষ্কার করে ফেলছে না।

সোয়ামি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আগে সেই স্বপ্নই দেখতাম, প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখতাম আশায় আশায়, এই বুঝি একটা খবর বেরিয়েছে....

তনুকার মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, এই যে আমরা দু'জনেই সমান বঞ্চিত, সুখী জীবন থেকে, সেটাই বোধহয় আমাদের পরস্পরকে এত কাছে এনে দিয়েছে।

আসলে তনুকার নিজেরই এক এক সময় অবাক লাগে।

সান্যালদা বলেছিলেন, মানছি ও সায়েন্টিস্ট বড় দরের, কিন্তু ব্যাটা কিপটের জাসু, একবার পার্টি দিল ইডলি আর দোসা। ও তোমাকে লিফট দেয়, কেন জানো, এক ফোঁটাও তো বাড়তি তেল খরচ নেই।

সান্যালদা লোকটিকে তনুকার ভালই লাগে। কোনও একটা সলিউশনের দরকার, ডেকে ডেকে বেয়ারাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সান্যালদা নিজেই স্লিপ নিয়ে চলে যান। টেলিফোন আর ইলেকট্রিকের বিল জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

না করে দিলে অবশ্য ক্ষতি ছিল না। তনুকা নিজেই কতবার চলে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছে, দিয়ে এসেছে।

ছোকরা বয়েসের একজন বলেছে, সায়েন্টিস্ট না ছাই, মন্ত্রী ফন্ত্রী ধরে চাকরিটা বাগিয়ে নিয়েছে। কাজের মধ্যে তো আত্রেয়ীকে নিয়ে ফস্টিনস্টি।

আত্রেয়ী দেশপাণ্ডের কথায় বুকের কোথাও একটা কাঁটা বিঁধেছে। আবার হাসিও পেয়েছে। কারণ ও তো সবই জানে। এরপর হয়তো তনুকার নাম জড়িয়েও ওরা বলাবলি করবে। করুক না।

আসলে আমি যে অন্য রকম, আর পাঁচজনের মতো নই, এটাই এরা বোঝে না। এক একজনের সঙ্গে এক একরকম সম্পর্ক হতে পারে তাই জানে না। সোয়ামির সঙ্গে প্রেম বা

ভালবাসা বলে নিজেকে বোঝাতে চাইছি, কিন্তু তা যে নয় তা আমার চেয়ে বেশি কে জানে। একটা দিনও তো আমরা পরস্পরের হাত ছোঁয়াছুঁয়ি করিনি। একদিন, সে তো কথা শুনতে শুনতে সমবেদনায় বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল। সান্ত্বনা দেবার জন্যে ধরেছিলাম হাতটা। বুদ্ধি দিয়েই কি সারাক্ষণ বলা যায়, মানুষের শরীরে আবেগ বলেও তো কিছু আছে।

কিন্তু সোয়ামি একটা নেশা এ বিষয়ে তনুকার সন্দেহ নেই। কিসের নেশা সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

ভয়ও হয়, সোয়ামি না ওর প্রেমে পড়ে যায়। সোয়ামি ওকে ভালবেসে ফেললেই হয়তো সব শ্রদ্ধা চলে যাবে। ও শুধু কাজ করতে চায়, একটা কোনও বড় কাজ। আর সেই কাজে সবচেয়ে বড় সহায় এই সোয়ামি। প্রেম ভালবাসা সব সময় প্রেরণা নয়, মানুষকে ধ্বংসও করে।

তনুকার পরিকল্পনাকেও প্রথম দিকে সোয়ামি সায়েন্স ফিকশন বলে ঠাট্টা করলেও পরে যে ওর মনে ধরেছে তা ওর টেবিলে জমা দেওয়া বইগুলো দেখেই বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

একটা কিউ ধরিয়ে দিয়েছে তনুকাকে। কয়েকটা বিশেষ ধরনের ব্যাকটিরিয়া বেছে নিয়ে মিউটেশন করানোর চেষ্টা করছে।

সোয়ামি একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, হতাশ হয়ো না, আমার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি পারবে।

কথায় কথায় সোয়ামির জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরিহাস তনুকার আদৌ ভাল লাগে না।

কারণ সোয়ামিই এখন ওর জীবনে একমাত্র খড়কুটো, যা ধরে ও ভেসে থাকতে চায়। যাকে ও একটা নতুন স্বপ্ন দেখিয়ে নিজেও স্বপ্নে ডুবে থাকতে চায়। ওর সঙ্গ তনুকার কাছে খুব দামি। একটা বর্মর মতো। ওকে অনেকের লোভের দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

এই সায়েন্টিফিক সেন্টারে অনেকেই চাকরি করে, কাজের নেশা সামান্য কয়েকজনের। চাকরির অর্থকরী দিকটাই ওদের কাছে বড়। হয়তো কেউ কেউ ভাবে ও নিজেকে সস্তায় বিলিয়ে দিয়ে চাকরিতে উন্নতি করতে চাইছে। জানেই না, ওর কাছে চাকরি মানে কাজে ডুবে থাকা।

সোয়ামি যখনই ওকে নামিয়ে দিয়ে যায় তারপরই ও একেবারে নিঃস্ব। সেই ভ্যাকুয়াম। কোথাও কেউ নেই। বুকের ভেতরটা সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়া মরুভূমি।

যারা কাছে এসেছে, কাছে আসতে চায়, তারা জানেও না তনুকা আসলে কি চায়। ওরা সঙ্গ মানে শুধুই শরীর বোঝে। শরীর তো তুচ্ছ তনুকার কাছে, ও সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারে ও যা খুঁজছে তা পেলে।

তপতী বলেছিল, সারাজীবন কাটাবি কি করে, তুই আবার বিয়ে কর।

—কাকে ? হাসতে হাসতে তনুকা বলেছে, 'পাত্রপাত্রী'র বিজ্ঞাপন ? লাল চেলি, বেনারসি, আর লাল টকটকে সিঁদুর ?

—তা কেন ? তোর যাকে ইচ্ছে হয়।

তনুকা হেসে বলেছে, সেই লোকটাকেই তো পাচ্ছি না, তোদের ভগবান আমার জন্যে সেই লোকটাকে বানাতে ভুলে গিয়েছিল।

রসিকতা করে গানের সুরে হাসতে হাসতে বললে, পাচ্ছি না, পাচ্ছি না, পাচ্ছি না।

পরমুহূর্তে হাসি উবে গেল। বিষণ্ণ মুখে বললে, পারছি না, পারছি না।

এক একসময় এমন হয়, সোয়ামি বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর। একেবারে একা। একা। বাবা মা'র সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না, টি ভির দিকে তাকিয়ে থাকে, কিছুই মাথায় ঢোকে না।

অস্ফুটে বলে ওঠে, আই হ্যাভ মেড এ মেস অফ মাই লাইফ।

একটা দীর্ঘশ্বাস।

আজ তা মনে হ'ল না। দিনটা বড় ভাল কেটেছে। ভেতরটা কেমন যেন গুনগুন করছে।

গেট পার হয়ে বেশ খানিকটা এসেছে, সোয়ামি বললে, সময় আছে? চলো না, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ওই যে আলো-ফোয়ারা, যাইনি কখনো। যাবে?

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল তনুকা।

ওখানে বসে গল্প করতে করতে এত রাত হয়ে গেছে টেরই পায়নি দু'জনে।

বাড়ি ফিরতে মা বলল, আজকাল রাস্তাঘাট বড় খারাপ রে, একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস।

তনুকা মনে মনে বললে, মা, তোমার এই রূপসী মেয়েকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে না।

তনুকা নিজের ঘরে চলে গেল। স্নান করবে, কিছু খেয়ে নেবে, তারপর ডায়েরি লিখতে বসবে। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস। ছাড়তে পারেনি। অথচ কি হয় লিখে। যা স্মৃতির স্লেট থেকে মুছে গেছে ডাইরি খুলে তাকে খড়ির অক্ষরে জাগিয়ে তুলে লাভ কি।

তনুকা ডাইরিতে লিখল :

"কদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছে, সোয়ামি যত কাছের মানুষ হয়ে উঠছে, ততই ভয় ও আমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে না তো? ওই সব ভালবাসাটাসাকে আমার ভীষণ ভয়। যদিও আমার নিজেরই এক একসময় মনে হয় আমি নিজেই ওকে ভালবেসে ফেলছি। সেটা তো আমার নিজের ব্যাপার, তেমন হলে আমি নিজেকে সরিয়ে নিতে পারব। সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু ওই লোকটি যদি সত্যি সত্যি ভালবেসে ফেলে, পিছিয়ে আসা ছাড়া তো গতি নেই। অথচ অকারণ আঘাত দিয়ে ফেলব ওকে। অথচ সেই আঘাত আমি দিতে চাই না।"

"ওই আলোর ঝর্নায় যাওয়ার আগের দুটো দিন সোয়ামি ছিল না। বাইরের কাজে, কি একটা গ্র্যান্ট আদায় করার জন্যে ও দিল্লি গিয়েছিল। সোয়ামির দু'দিনের অনুপস্থিতিতে ওর কথা যে দু'একবার মনে পড়েনি তা নয়। কিন্তু ওখানে একটা বেঞ্চিতে বসে গল্প করতে করতে সোয়ামি যেই বলে উঠল, গত দু'দিন 'আই ওয়াজ এ মিজারেবল ম্যান, সব সময় তোমার কথা মনে পড়ছিল,' আমি ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলাম। আমি হেসে উঠে বললাম, কেন? কই আমার তো কিচ্ছু মনে হয়নি। মুখ দেখে বোঝা গেল ও ঠিক এমনটা আশঙ্কা করেনি।'

তপতী বললে, তা হ'লে তুই সবসময় সোয়ামি সোয়ামি করিস কেন?

তনুকা হাসল। আসলে ব্যাপার কি জানিস, ওর কাছে আমি নিজেকে ফিরে পাই।

—মানে?

তনুকা বললে, আমি দীপ, প্রদীপ্তের কাছে যা পাইনি, ও সোয়ামি সেটাই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আত্মমর্যাদা।

একটু থেমে বললে, আমার কি কোনওদিন কোনও অহঙ্কার দেখেছিস, কোনও কিছু নিয়ে গর্ব করেছি?

তপতী হেসে বললে, কেন রূপের?

তনুকা বললে, দ্যাখ, আমি কি সত্যি এত বোকা ? ওটা নিছক ইয়ার্কি, মেয়ে দেখলেই পুরুষদের কি হয় তা জানি বলেই ইয়ার্কি করে বলি। কিন্তু আমি কি জানি না আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী হাজার হাজার আছে। আর যদি বা তেমন সুন্দরী হই, তাতে কি লাভ হ'ল। অনেক কুৎসিত মেয়েও তো আমার চেয়ে অনেক গুণ সুখী।

হঠাৎ হাসল।—তোকেই তো আমার সুন্দর লাগে, অনেক সুন্দর। স্বামী, ছেলেমেয়ে নিয়ে যার সংসারটা সুন্দর সেই তো আসল সুন্দরী।

তপতী নিজের খুশি মুখটা আড়াল করার জন্যে বললে, আর স্তাবকতা করতে হবে না, ওটা সোয়ামির কাছে করিস।

তনুকা বললে, দীপের হাইট ছাড়া আর সব দিকেই আমার হাইট বেশি। সেটা তো স্বীকার করিস। দীপ কোনওদিন আমাকে সমকক্ষ ভাবেনি। সব সময়েই আমাকে ছোট মনে করেছে, ছোট করতে চেয়েছে। আমার যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, বুদ্ধিবিবেচনা আছে, আমার কাছে আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে যে সবচেয়ে দামি, ও-কথা ও বোঝেইনি। পদে পদে মনে হয়েছে ও আমাকে হেয় করতে চায়।

একটু থেমে বলেছে, আমি সব দিক থেকে ওর চেয়ে ছোট, এটা কথায় ব্যবহারে সব সময় বুঝিয়ে দেওয়ার পিছনে কি আছে আমি জানি। ওর কমপ্লেক্স। ওকে নিয়ে গিয়ে আমিই দাঁড় করিয়েছি কথাটা ও কিছুতেই ভুলতে পারে না। ভেতরে ভেতরে ও নিজে ছোট হয়ে আছে বলেই আমাকে ছোট করে। এক একদিন আমার কান্না পেয়ে যেত।

তপতী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বললে, তুই হয়তো ঠিকই ধরেছিস। যে মই বেয়ে লোকে ওপরে ওঠে প্রথমে সেটাকেই ফেলে দিতে চায়। যাতে কেউ দেখতে না পায়।

কথাটা বোধহয় কানেও গেল না তনুকার। ও কি যেন ভাবছিল। চোখে কোনও দৃষ্টি নেই। কিংবা অন্য কোনও গভীরতা।

হঠাৎ বললে, আর সোয়ামি আমাকে সেই আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, সেই আত্মসম্মান বোধ। ও এমন ভাবে কথা বলে যেন আমি ওর সমবয়স্ক। যেন আমারও সমান বুদ্ধি, সমান জ্ঞান। সোয়ামি এত বড় একজন সায়েন্টিস্ট, আমি ওর কাছে কত তুচ্ছ, অথচ যখন ল্যাবে বসে কাজ করি, ওর প্রশ্ন, ওর পরামর্শ চাওয়া, ওর ছোট্ট কোনও ভুল ধরিয়ে দিলে, দীপ্ত যেখানে চটে আগুন হয়ে যেত, কিংবা অপমানিত বোধ করে গম্ভীর, সোয়ামি সেখানে....

তনুকার কি মনে পড়তে হেসে উঠে বললে, ওর জেনেটিক্সের ফীলডের একটা ভুল ধরিয়ে দিলাম একদিন, ছোট্ট ব্যাপার। আমি একটু ঠাট্টাও করলাম, আর সোয়ামি হেসে উঠে বললে, ভুল তো হতেই পারে, জাস্ট লাক মেড মি এ সায়েন্টিস্ট, তোমার মগজ তো আমার নেই।

—তোরা কি দু'জনে ঠাট্টাইয়ার্কিও করিস নাকি ?

তনুকা অবাক হয়ে বললে, করিই তো। এক একসময় মনে হয় যেন কলেজ ল্যাবে পাশের ছেলেটার সঙ্গে দু'জনে মিলে কোনও এক্সপেরিমেন্ট করছি। পাশে বসা আমেরিকান ছেলেটার ভুল ধরিয়ে দিয়েছি, আর সে ইয়ার্কি করে বলছে, ইউ হ্যাভ আর্নড এ কিস ফ্রম মি।

তারপর দু'জনেই অট্টহাসে হেসে উঠেছে।

তনুকা মনে মনে বলছিল, সোয়ামি আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ। আমি নিজেকে একটা ভ্যাকুয়াম ভাবতাম, বিধ্বস্ত, মূল্যহীন। এখন আমি নিজেকে 'আমি' ভাবতে পারি। তুমি আমার বুকের ভেতরের সব শূন্যতা দূর করে দিয়েছ। জীবনের সব

ব্যথা দূর করে দিয়ে একটা স্বপ্ন দিয়েছ। সে স্বপ্ন দেখার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছ, আমার হাতে তোমার হাত, স্বপ্ন দেখছি, একটা অচেনা পরোপকারী নতুন ব্যাকটিরিয়া খুঁজে বের করার স্বপ্ন, যা এই কলকাতা, পৃথিবীর সমস্ত শহরকে আবর্জনামুক্ত করে দিতে পারে।

এত আনন্দের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

সোয়ামি আগের দিনই বলেছিল, একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারবে ?

তাড়াতাড়িই এল। সিঁড়িগুলো টপকে টপকে প্রায় দৌড়াচ্ছে। গিয়ে লিফটের সামনে দাঁড়াতে হবে। এ সময় লিফটের সামনে লম্বা লাইন লেগে যায়।

ওকে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আসতে দেখে সব পিছনের লোকটি হেসে বললে, আপনি আগে যান।

'আগে যান' বলার জন্যে লোকটি ফিরে দাঁড়িয়েছিল। তনুকাকে এক দৃষ্টে দেখল। তনুকাও।

তনুকার বুকের ভেতরটা কি মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠল ? তনুকা নিজেও জানে না।

এখন তো ও ব্যাকরিটিয়ার ঘরে বসে না। অন্য ল্যাব। সেই ব্যাকটিরিয়ার ঘরটাকে ঠাট্টার ছলে ওরা নাম দিয়েছিল খোঁজ পরিষদ। খোঁজাখুঁজিই যেখানে সার। কে একজন রসিকতা করে ওকে জিগ্যেস করেছিল, আপনি কি খুঁজছেন দিদিমণি ? ও ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, এ হ্যান্ডসাম ইয়ং ম্যান।

কি বলব তপু, এমন সুন্দর চেহারার পুরুষ বোধহয় জীবনে দেখিনি। কি ফর্সা, উইথ এ টিন্ট অফ রেড, শার্প নাক, রদাঁর ভাস্কর্য যেন, লম্বা লম্বা আঙুল, গলায় টাই ঝলমল করছে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কি সুন্দর। আমি ওকে আরেকবার দেখার জন্যে, লিফটে ঢুকেই ঘুরে দাঁড়ালাম। লাইন দিয়ে ও তো আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল, এত ইচ্ছে করছিল পিছন ফিরে ওকে দেখতে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর কত অসুবিধে।

লিফটে ঢুকেই তো ঘুরে দাঁড়াবে, তখন আর মুখটা দেখতে পাব না।

দেখলাম।

বেশ বুঝতে পারছিলাম বাইবের লোক। কোনও কাজে এসেছে। অন্য কোনও জায়গার ইয়াং কোনও সায়েন্টিস্ট হয়তো। এসেছে, চলে যাবে, এক্ষুনি হারিয়ে যাবে।

সারা জীবনে হয়তো আর ওকে কোনওদিন খুঁজে পাব না।

লোকটি ঢুকলে, বেশ সমীহ করে, অথবা সভ্যভব্য হবার জন্যে আমার স্পর্শ বাঁচিয়ে সামনে দাঁড়াল। মুখ ঘুরিয়ে। আরে বাবা। একটু ছোঁয়া লাগলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। পথে হাঁটতে হাঁটতে কত লোক তো মুখ ফিরিয়ে দেখে, যাদের দেখতে ইচ্ছে হয় না তারাই। আর একে দেখতে চাইছি আরেকবার, আর উনি সামনে মুখ করে দণ্ডায়মান স্ট্যাচু।

আমি তো সাততলায় যাব, লিফটে ঢোকার সময়েই সাত নম্বরের বোতাম, ও কত নম্বরে দেখতে পাইনি।

একটা ছেলেমানুষি তনুকাকে পেয়ে বসল। ও যে-তলাতেই লিফট থেকে বেরোবে, আমি সেখানেই। আরেকবার ও দেখে নেবে এই উজ্জ্বল পুরুষকে।

বাঃ রে বাঃ, লোকটিও সাত তলাতে।

বেরিয়ে এসেই দেখি, উনি ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার দিকেই চোখ, যেন অপেক্ষা করছেন।

আমাকেই জিগ্যেস করলেন, যেন আর লোক ছিল না, ডক্টর সোয়ামির ঘরটা কোন দিকে ?

তনুকা কি বলবে, এত ছুটতে ছুটতে এসেছে তো সোয়ামির জন্যেই। উনি বলেছিলেন, একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারবে ! সেজন্যেই।

পাশাপাশি হেঁটে যেতে বেশ ভাল লাগছিল। বেশ লম্বা, সুপুরুষ না কি বলে না, তাই। তনুকাকে অনেকেই লম্বা বলে, পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চিতেই। অথচ ওর মনে হ'ল মাথাটা লোকটির কাঁধ ছাড়িয়ে উঠতে পারছে না। একবার ভাবল রসিকতা করে কত হাইট জিগ্যেস করবে নাকি !

হেসে ঘরটা দেখিয়ে দিল তনুকা, নিজে আর ঢুকল না। মনে হ'ল, বাইরের ভিজিটর, একটু পরে যাওয়াই বোধ হয় ভাল।

বললে, স্লিপ লাগবে না, আপনি চলে যান।

লোকটি ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর অল্পক্ষণ করিডরে নিরুদ্দেশ পায়চারি করল তনুকা। নাঃ, টানছে টানছে, এই সুন্দর চেহারাটা ওকে বড় বেশি টানছে।

অন্যদিন হ'লে ও হাসতে হাসতে ঢুকে পড়ত, একটু গলা চড়িয়েই বলত, আমি এসে গেছি। অ্যাম আই লেট ?

কি হ'ল ওর কে জানে, পায়ে পা জড়িয়ে যাওয়ার অবস্থা, কি একটা অবোধ্য জড়তা ওকে পেয়ে বসেছে, মুখে হাসি আনতে পারছে না।

সোয়ামি ওকে দেখেই বলে উঠলেন, এসো এসো, ইউ আর রাইট অন টাইম।

তারপর পরিচয়পর্ব।

বেশ সুন্দর নাম তো, অনুরূপ। কি মানে কে জানে। কার অনুরূপ ? বাবা, না মা ?

বঙ্গসন্তান, বাংলায় যখন কথা বলেছে, কিন্তু নমস্কার না করে টেবিলের ওদিক থেকে হাত বাড়িয়ে দিল।

ধেত্‌। আমি কি তখন আমার মধ্যে আছি নাকি। আমার হাতটা ধরে হ্যান্ডশেক করার সময় একটু বেশি চাপ দিল যেন।

সোয়ামি বললেন, ওঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম। বম্বে থেকে এসেছেন, আসার কথা ছিল অনেক আগে, এদ্দিন পরে সময় পেয়েছেন। ব'লে সোয়ামি হাসলেন।

অনুরূপ বললে, একদম সময় পাচ্ছিলাম না ডক্টর সোয়ামি। আই ওয়াজ সো বিজি অল দ্যা টাইম।

মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিল তনুকার দিকে, লোকটির মুখে এয়ার হোস্টেস হাসি লেগেই আছে।

আর তনুকার শরীর তখন কত্থকের থালি নাচের শেষ মুহূর্তটির মতো, থিরথির করে সারা অঙ্গ কাঁপছে। শরীরের কাঁপন দেখাই যায় না, শুধু সলমা চুমকিতে আলো পড়ে চিকচিক করে নড়ছে, তাই কাঁপনটা অনুভবে বুঝে নিতে হয়।

—লিস্ট কমপ্লিট হয়েই আছে, তবু দ্যাখো তোমার আর কিছু লাগবে কি না।

সোয়ামি লিস্টটা অনুরূপের হাতে দিলেন।

তারপর তনুকাকে বললেন, তুমি একটা কাজ করে দেবে ? ওঁকে সঙ্গে নিয়ে ডিপার্টমেন্টগুলো একটু ঘুরিয়ে আনো। ওঁর যদি কোনও সাজেশন থাকে।

ওঃ ফাইন। সোয়ামি, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ।

দ্রুত হাঁটা তনুকার অভ্যাস। ওটা ওদেশে থাকতেই রপ্ত হয়ে গেছে। সময় যেন সদা সর্বদাই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা। এতটুকু অপব্যয় চলবে না। ভোগের জগতে সাধ মিটিয়ে দু'হাত খুলে খরচ ক'রো। কিন্তু সময়ের অপব্যয় নৈব নৈব চ।

তনুকা ইচ্ছে করে ধীরে ধীরে হাঁটছিল, যা ব্যস্ততার ফিরিস্তি দিল সোয়ামির কাছে। সব দেখা হয়ে গেলেই হয়তো চলে যাবে। ব্যবসাদার মানুষ, তনুকা ওকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে

কি না তা জানার সময় কোথায়। এসেছে তো টাকা রোজগারের ধান্দাতে।

তবু তনুকা বললে, আপনি কি আজই চলে যাবেন ?

কি আশ্চর্য ! দেখে মনে হচ্ছে অনুরূপ ওর চেয়ে বয়েসে ছোটই হবে। কত ছোট কে জানে। বয়েসে বড় প্রদীপ্তকে এক যুগ আগে প্রথম আলাপেই 'তুমি' বলেছিল। অথচ তখন ওর নিজেরই বয়েস কত কম। জড়তা থাকার কথা তখনই।

—আপনি থাকতে বললে অবশ্যই থাকব।

কথাটা হঠাৎ যেন ওর কাঁধ ধরে ওকে ঝাঁকিয়ে দিল।

বুঝতে না পারার ভান করে তনুকা বললে, আমি কি বলব ? আমি বলার কে ?

এক নম্বরের ধূর্ত।

ভেতরে ভেতরে একটু থতমত খেয়েছে, ভেবেছে বলা ভুল হয়ে গেল, তাই সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টে বললে, থাকলে যদি আরও একটা লিস্ট অ্যাড করেন, আমি তো কিছু ব্রোসিওর দিয়ে এসেছি ডক্টর সোয়ামিকে।

ইস্। এইসব ব্যবসাদারি কথাগুলো আমাকে না বললে পারতে না অনুরূপ। মনে মনে তনুকা ভাবল। তার চেয়ে আগের কথাতেই তুমি স্টিক করে থাকলে না কেন। আমি কি বুঝিনি, আমাকে তোমার ভাল লেগেছে।

নির্বোধের মতো বলে বসল, একটা সপ্তাহ তো আছি, আরো অনেক জায়গায় দেখা করতে হবে।

গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছিল না তনুকার। বলল, তা'হলে আসবেন মাঝে মাঝে, দেখি আরও কিছু যদি কেউ চায়।

—রোজ নয় কেন ? হাসল অনুরূপ। বোধহয় এবার সাহস সঞ্চয় করেছে।

ব্যাকটিরিয়ার সেই পুরনো হলে ঢুকতেই একটা চাপা উল্লাস, দু'একজন এসে অভিযোগ করল, আজকাল তো এদিকে আসেনই না।

ওরা যখন তনুকাকে ছেঁকে ধরেছে অনুরূপ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে কাকে বলছে, এটা তো এখন আউটডেটেড আরো মডার্ন অ্যাপারেটাস পাওয়া যায়, ডক্টর সোয়ামিকে দিয়ে এসেছি, ছবি স্পেসিফিকেশন সবই আছে, দেখে নেবেন।

এরই ফাঁকে সান্যালদা ফিসফিস করে রসিকতা করল, দারুণ মানিয়েছে।

—ধ্যেত্।

অন্য সময় হ'লে কথাটা মেনে নিত, এবং আরেকটা দুঃসাহসিক রসিকতা নিজেই ছুড়ে দিত।

সব দেখানো হয়ে যাওয়ার পর আবার সোয়ামির ঘরে।

কিন্তু সে ঘরে ঢোকার আগেই মোক্ষম কয়েকটা কথা বলে ফেলেছে অনুরূপ। বলেছে, গোলি মারো ওইসব বিজনেসটক। আমি সেলসম্যান নই। একটা কোম্পানির মালিক। মাঝে মাঝে ফ্রেটারনাইজ করতে হয় তাই আসা। আসল কথাটাই তো বলিনি এখনো।

—ব'লে ফেলুন। তনুকার ঠোঁটে কৌতুকের হাসি।

অনুরূপ বলল, সার কথাটা হল, এই যে এতক্ষণ আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম, ইট ওয়াজ সাচ আ প্লেজার...

তনুকা হেসে উঠে বলল, ঘুরে বেড়ালেন কোথায় ? সারাক্ষণ তো কোন যন্ত্রটার কি নতুন মডেল বেরিয়েছে সে-সবই বোঝাচ্ছিলেন। আমাদের সেন্টারের কিন্তু অত টাকা নেই।

—উঃ। অনুরূপ অসহিষ্ণু ভাবে শব্দ করল। বলল, আপনি আমাকে ব্যবসাদার ছাড়া

কিছুই কি ভাবতে পারছেন না ?

তনুকা কোনও উত্তর দিল না।

আর অনুরূপ বলল, ল্যাবরেটরির গন্ধই তো আমার নাকে আসেনি। আমার মনে হচ্ছে এতক্ষণ আপনার সঙ্গে একটা বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছি, সদ্য ফোটা গোলাপে ছাওয়া একটা বাগানে।

তনুকা হেসে বলল, কবিতাও লেখেন, জানতাম না।

—ইউ হ্যাভ মেড মি এ পোয়েট।

এরপরই সোয়ামি ঘরে ঢুকে গিয়েছিল ওরা।

কথা সেরে অনুরূপ সোয়ামিকে বলল, কাল আসছি আবার।

বলল সোয়ামিকে, তাকাল তনুকার দিকে।

কিছুক্ষণের জন্যে তনুকা একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল অনুরূপ চলে যাওয়ার পর। একটা ক্ষীণ বিতৃষ্ণা ঝিলিক দিয়ে গেল সোয়ামির সম্পর্কে। ও আমার ভাল চায় জানি, লোকটাকে ভালও লাগে, একসময় তো সন্দেহ করতাম নিজেকেই, হয়তো ভালবেসে ফেলেছি। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হত সোয়ামি হয়তো ভালবাসে, মুখ ফুটে বলতে পারছে না। কিন্তু অনুরূপ চলে যাওয়ার পর সোযামির ওপর বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল। লোকটা আমাকে এ ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাইছে কেন ? বেঁধে ফেলেছে যেন।

ওর মন জুগিয়ে চলাই কি আমার কাজ নাকি। সেও তো আরেক ধরনের বন্ধন। তা হলে আর প্রদীপ্ত কি দোষ করল। সে আমাকে কখনও তার সমকক্ষ মনে করেনি, পদে পদে ছোট করে রাখতে চেয়েছে, যেন তা হলেই বাঁধন অটুট থাকবে। আর সোয়ামি আমাকে একটা স্বপ্ন দিয়েছে, প্রতি মুহূর্তে মনে করাতে চায় আমি তার সমকক্ষ। বয়েসের পার্থক্য যেন কোনও পার্থক্যই নয়। একজন সম্মানের চূড়ায় বসে আছে, জেনেটিক সায়েন্সের দুনিয়ায় কে চেনে না তাকে, আর আমি তো সামান্য একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, যে শুধু কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে বুকের ভেতরের শূন্যতাকে ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু এও এক ধরনের বন্ধন।

তনুকার ইচ্ছে হয়েছিল অনুরূপের সঙ্গে বেরিয়ে আসার। নীচে নেমে এসে লোহার গেট অবধি না হোক, অন্তত নুড়ি বিছনো রাস্তা অবধি গিয়ে বিদায় জানাবার।

উঠে দাঁড়িয়েও ছিল তনুকা। কিন্তু সোয়ামি কি ভাববে, হয়তো ওর খারাপ লাগবে, এই ভেবে অনুরূপের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আবার বসে পড়েছিল। যেন কোথাও কিচ্ছু হয়নি, কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়নি ওর মনের মধ্যে, এমন একটা ভাব করে ও আবার বসে পড়েছিল। বিতৃষ্ণা সেজন্যেই। তাই নিমেষের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

—আমি তোমার ওপর এত বেশি ডিপেন্ড করতে শুরু করেছি, আই নো, এটা উচিত নয়, আই অ্যাম ট্যাক্সিং টু মাচ অন ইয়োর টাইম অ্যান্ড এনার্জি।

তন্ময়তা ভাঙতেই তনুকা হেসে উঠল, কেন, কি হল আবার।

—আমার উচিত ছিল অন্য কাউকে ডেকে ওকে ডিপার্টমেন্টগুলো দেখিয়ে আনতে বলা।

—কিন্তু আমার তো ভালই লেগেছে।

—তোমাকে এতক্ষণ খাটালাম বলে মনে মনে গালাগাল দিচ্ছ না তো ?

সোয়ামি হাসল।

তনুকা শুধু ঘাড় নেড়ে 'না' বলল। মনে মনে বলল, সোয়ামি, কেন তুমি এই লোকটার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে নিজেই নিজের কবর খুঁড়লে। এখন আর

তোমার কথা একবারও মনে পড়ছে না। তোমার কাছেই বসে আছি, অথচ তোমার কোনও অস্তিত্বই নেই এখন। আমার সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে যে লোকটা এইমাত্র চলে গেল সে।

কাছে থাকাটাই যে সব নয়, এ পৃথিবীতে কে বোঝে। কেউ বোঝে না। টি ভি-র রিমোট কন্ট্রোলের মতো কেউ হয়তো অনেক দূরে থেকেও বুকের মধ্যে তার ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে। কাছের মানুষ জানতেও পারে না।

বছরের পর বছর আমি আর প্রদীপ্ত একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থেকেছি, ঘুমিয়েছি, ঘুম থেকে উঠে সেই আদরের ডাক দিয়ে বলেছি, দীপ, তোমার চা। অথচ আমার মধ্যে দীপের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। দূরপাল্লার কোনও ট্রেনে বা প্লেনে, যেন দু'জন পাশাপাশি আসনে বসা যাত্রী। যাত্রা শেষ হলেই যে যার নিজের গন্তব্যে চলে যাব। গ্রীন চ্যানেল পার হলেই নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে বিব্রত দু'জনেই, ট্যাক্সিতে উঠলেই দুজন অচেনা মানুষ। যদি কিছু থাকে তা শুধু ওই ডায়েরির পাতায়। যা কোনওদিন খুলে দেখার সময়ই হবে না।

—টুডে আই অ্যাম নট গোয়িং উইথ ইউ।

কোনও অজুহাত দেখাল না তনুকা। কোনও মিথ্যে স্তোকবাক্য নয়। ওসব ওর স্বভাবেই নেই।

ওর কথাটা শুনে সোয়ামির মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। আঘাত পেল কি ? আই অ্যাম সরি ফর দ্যাট। কিন্তু আজকের দিনটা শুধু আমার, আমার একার। আমি আজ শুধু অনুরূপের কথা ভাবব। শুধু অনুরূপ।

বাড়ি ফিরতেই শুভব্রত বললেন, তনু, তোর কি শরীর খারাপ।

তনুকার তখন কথা বলতেই ইচ্ছে হচ্ছে না কারও সঙ্গে। ভেতর থেকে বলে উঠল, আমাকে একা থাকতে দাও, একা থাকতে দাও। মুখে শুধু একটু হাসি আনবার চেষ্টা করল, পারল না।

জবাব না পেয়ে বললেন, মুখ শুকনো শুকনো, তাই বলছি।

সুপর্ণা বললেন, এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরলি, কোনওদিন তো আসিস না। তাই ভাবছি শরীর খারাপ নাকি।

তোমরা ছাই বোঝ। এই শুকনো শুকনো মুখ মানেই আই অ্যাম হ্যাপি। এমন কারও দেখা পেয়েছি, যার সম্পর্কে ভাবতে ভাল লাগছে আমার। অন্যদিন দেরি করে বাড়ি ফিরি, কেন জান, বাড়ি ফিরলেই বড় একা লাগে। বুকের ভেতরের সেই ভয়েড, সেই শূন্যতা, আমি সহ্য করতে পারি না। আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছি, কারণ আজ আমার সঙ্গে অনুরূপ আছে।

এসেই তপতীকে ফোন করল। বলল, একটু ধৈর্য ধরে থাক। কাল অবধি। হয়তো কালই তোর কাছে চলে যাব। অনেক কথা বলার থাকবে। দেখবি, হয়তো কথা ফুরোবেই না।

অন্যপ্রান্ত থেকে কথা এল : তোর সবেতেই হেঁয়ালি, একটুখানি হিন্ট দে অন্তত।

—কাল, কাল।

ঝট করে লাইন কেটে দিল তনুকা।

পরের দিন তনুকা আর সোয়ামির ঘরেই গেল না। যথারীতি এসে বসল ল্যাবের চেয়ারে। এটা জেনেটিক্সের ঘর, মাত্র কয়েকজন, তার মধ্যে একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট। যেন অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে। দূরের একটা টেবিলে নিবিষ্ট মনে

কাজ করছে আত্রেয়ী দেশপাণ্ডে। সোয়ামি মাঝে মাঝে আসে, থাকে কিছুক্ষণ, একে ওকে প্রশ্ন করে, পরামর্শ দেয়। কার টানে তাও বুঝতে পারে না। আত্রেয়ী ? তনুকা ? না কি কাজ, দায়িত্ব। আজ আর ওসব চিন্তা করার সময় নেই ওর।

আজ আর সোয়ামির ঘরে যাবে না। দেখা যাক, অনুরূপ আসে কি না। ওর চোখের দৃষ্টি যে আগ্রহ দেখিয়েছে তা যদি সত্যি হয়, খোঁজ নিয়ে নিয়ে এখানেই আসবে সে।

সোয়ামি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি আমার একাকিত্ব অনেকখানি দূর করে দিয়েছিলে, শূন্যতা ভরে দিতে চেয়েছিলে আমাকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে, একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিলে। তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তুমিই একদিন বলেছিলে, আই ওয়ান্ট টু সি ইউ হ্যাপি।

অনুরূপ এল। বেশ লোক আপনি, এখানে ঘাপটি মেরে বসে আছেন। আমি খুঁজে খুঁজে হন্যে।

তনুকা হেসে পাশের টুলটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, বসুন।

চারপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখল অনুরূপ। এখানে কথা বললেই অন্যের কানে যাবে ; অথচ ও যে অনেক কথা বলতে চায়।

—কবে ফিরবেন ? তনুকা জিজ্ঞেস করল।

—সে তো আপনার ওপর নির্ভর করছে।

অবাক হয়ে হেসে ফেলল তনুকা। আমার ওপর ?

চাপা গলায় অনুরূপ বলল, আপনাকে না নিয়ে ফিরব ? ব্রীফকেস পাশে নামিয়ে রেখেছিল, সেটা কোলের ওপর তুলে নিল।

খুলে তা থেকে একটা ছোট্ট সাদা কাগজের প্যাড বের করল। ডট পেন।

—দেখতে চেয়েছিলি এই দ্যাখ। তনুকার হাসি। বললে, ও লিখছে, আমি জবাব দিচ্ছি। কখনও আমি লিখছি, ও জবাব দিচ্ছে। ক'টা দিন মাত্র। তারই মধ্যে প্যাড শেষ। এই দ্যাখ।

তপতী হাসছে, হাসছে, আর কাগজগুলো পড়ে দেখছে।

*অনুরূপ : আজ আমার সঙ্গে বেরোতে পাববেন। কোথাও বসে চা খাব।*

*তনুকা : তারপর কি লাঞ্চ ? তারপর ডিনার ? তারপর ?*

*অনুরূপ : জবাব হ'ল না।*

*তনুকা : আমন্ত্রণ উপেক্ষা করি সাধ্যি কি ? সোয়ামিকে বলে ছুটি নিতে হবে।*

*অনুরূপ : হ্যাং ইয়োর সোয়ামি।*

*তনুকা : কিন্তু ডিনারের পর কি ?*

*অনুরূপ : সকালে উঠে দু'জনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট।*

তনুকা হেসে উঠে কাগজগুলো ছিনিয়ে নিল তপতীর হাত থেকে। হাসতে হাসতে বললে, আমি কি বোকা রে, 'একসঙ্গে ফিরে যাব,' 'সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট' এ সবের মানেই বুঝতে পারছিলাম না। খারাপ ভেবে রাগও হচ্ছিল।

এই সেন্টারে নিয়মের তেমন কড়াকড়ি নেই। প্রয়োজনে দু'এক ঘণ্টা বেরিয়ে যাওয়া চলে। কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। আবার কেউ কেউ রিসার্চের নেশায় ছুটির পর অনেক রাত অবধি থেকে যায়, কারও অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

তনুকার কাছে অনুরূপের চা খেতে বাইরে যাওয়ার আমন্ত্রণ রীতিমতো লোভনীয় লেগেছে। সোয়ামির কাছে ছুটি চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবু সোয়ামির সঙ্গে এমন একটা অবোধ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যেতে হলেও তাকে বলে যাওয়ার যেন একটা নৈতিক দায়িত্ব বোধ করতে শুরু করেছে তনুকা। তাই চিরকুটে যখন

অনুরূপ লিখল 'হ্যাং ইয়োর সোয়ামি', তখন শব্দ তিনটি বিস্বাদ লাগল তনুকার। অনুরূপের সঙ্গে সোয়ামির সম্পর্কটা শুধুই ব্যবসার হতে পারে, বড় কোম্পানির মালিক হতে পারে সে, এই সেন্টারের অর্ডারকে তাচ্ছিল্য করার মতো আর্থিক অবস্থাও হয়তো আছে তার, কিন্তু সোয়ামিকে কেউ তাচ্ছিল্য করলে বা তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে ভীষণ খারাপ লাগে ওর। 'হ্যাং ইয়োর সোয়ামি' কথাটা তাই তনুকার খারাপই লাগল, কিন্তু ওর তখন অনুরূপকে এত ভাল লেগে গেছে, এমন একটা হিপনোটিক আকর্ষণের মধ্যে পড়ে গেছে ও, যে ক্ষমা করে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ওরও ইচ্ছে করছিল অনুরূপের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে কথা বলার। উঠে পড়ার ইচ্ছে আরেকটা কারণে। এই সেন্টারে টেবিলের সামনে রিসার্চ ওয়ার্কারের জন্যে একটাই চেয়ার। পাশে ছোট্ট একটা টুল। প্রয়োজনে কোনও জিনিসপত্র টেবিল থেকে সরিয়ে রাখার জন্যে। বাধ্য হয়েই তাই অনুরূপকে ওই টুলে বসতে বলেছিল। সে বসেও পড়েছিল। কিন্তু তনুকার সঙ্কোচ হচ্ছিল তার হঠাৎ ভাল লেগে যাওয়া এই মানুষটিকে টুলে বসতে হয়েছে বলে। সোয়ামি যাকে এত খাতির করে সে এসে তনুকার পাশের টুলে দিব্যি বসে আছে তা দু'একজন ফিরে তাকিয়ে দেখেও নিয়েছে। কিন্তু কি ভাবছে কে জানে। নিজের চেয়ারটা ওকে দিয়ে তনুকা যদি টুলে বসে সে আরও দৃষ্টিকটু হবে। তার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল।

কোথায় আর যাবে, বড় জোর কাছাকাছি কোন চায়ের দোকানে।

—চলুন।

তনুকা উঠে পড়ল, অনুরূপও।

কিন্তু লিফটের সামনে এসে তনুকা বললে, ওপরে যাব, সাততলায়। আপনি বরং এখানেই দাঁড়ান বা নীচে চলে যান।

অনুরূপ বললে, চলুন আমিও উঠছি ওপরে।

—কেন ? ভয় পাচ্ছেন, ফস্কে যাব বলে ?

সাততলায় লিফট থেকে বেরিয়ে তনুকা বললে, আপনি যাবেন না প্লীজ। আমি সোয়ামিকে বলে আসছি।

চলে গেল।

অনুরূপের কিন্তু এই 'সোয়ামি, সোয়ামি' লয়্যালটি ভাল লাগছিল না। অত কিসের। তনুকাকে ওর দারুণ ভাল লেগে গেছে, এবং তনুকার চোখের দৃষ্টি, অন্তরঙ্গ কথাবার্তা, খোলা আকাশের মতো ব্যবহারে যেটুকু বুঝেছে, তনুকারও ওকে ভাল লেগেছে। এর মধ্যে আবার তৃতীয়জন আসে কি করে, আসবেই বা কেন ? এই চাকরিটাকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়ার কি আছে ? এ ধরনের একটা চাকরি তো অনুরূপ দু'আঙুলের টুসকি দিয়ে বম্বেতে যে কোন অফিসে পাইয়ে দিতে পারে।

অন্য কোথাও কেন, নিজের কোম্পানিতেই আরও বড় আসনে।

তনুকা বেশ হাসিমুখেই ফিরে এল। —চলুন। ছুটি।

সোয়ামির কাছে গিয়ে 'একটু বেরিয়ে যাচ্ছি' বলতে তনুকার অস্বস্তি হচ্ছিল। না বলেও চলে যাওয়া যেত। কিন্তু কেন জানি, ইচ্ছে হয় না। ওই লোকটিকে ও যে ঠিক কোনও জায়গায় রেখেছে, বুঝতেই পারে না। ওর জীবনের কোনও কথাই বা সোয়ামিকে বলেনি। কোনও কিছু লুকোনো ওর স্বভাবেই নেই, যদি না কেউ আগে থেকেই গোপন করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়। আর সোয়ামির কাছে লুকোনোর কথাই ওঠে না।

প্রদীপ্ত কখনও কখনও বিরক্ত হ'ত। 'এসব কথা আমাকে বলার কি দরকার, তোমার কথা তোমার মধ্যেই রেখে দাও'। কত তফাত। সোয়ামি সব কথা ওর ধৈর্য ধরে শোনে, প্রয়োজনে পরামর্শ দেয়। অবশ্য তনুকা যখন পরামর্শ চায়। আর প্রদীপ্তর যেন সময়ই

নেই ওর কথা শোনার। 'তোমার তো বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, যা ভাল মনে কর তাই কোরো।' তনুকা শুনেছে, কোনও কোনও স্ত্রী নির্দোষ কোনও কোনও ব্যাপারকে তুচ্ছ মনে করে বলে স্বামীর কানে তোলে না। তোলার প্রয়োজন নেই মনে করে। অথচ তা গোপন করেছে জানতে পারলে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়ে যায়। প্রদীপ্ত ঠিক উল্টো।

এটা বোধহয় ওর সেই অ্যাকসিডেন্টের পর থেকেই হয়েছে।

কোনও কিছু তো ওকে কখনোই শেখানো গেল না। ওদেশে গাড়িতে সীট বেল্ট না বেঁধে যে অত স্পীডে গাড়ি চালানো উচিত নয় তা বারবার বলেও বোঝাতে পারেনি। যেন জীবনটা ছেলেখেলার ব্যাপার।

হ'লও তাই। অ্যাকসিডেন্ট।

এক হাতে চাকরি, অন্য হাতে তার ভাঙা পায়ের সেবাযত্ন। হাসপাতালে ছোটাছুটি। জমানো টাকা জলের মতো বেরিয়ে গেছে। ভাঙা পা আর পুরোপুরি স্বাভাবিক হ'ল না। নিয়ম না মানলে হবে কি করে।

মাঝ থেকে তনুকার পা দুটোই ভেঙে দিল।

কত লোক তো ভাঙা পা নিয়েই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেই মানুষ অস্বাভাবিক হয়ে যায় না। কিন্তু তার মনটাও যদি খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করে তখন তার স্বাভাবিক হওয়ার উপায় থাকে না। তার চেয়ে বড় কথা তনুকা তার সঙ্গে তাল রাখার জন্যে কি করে খুঁড়িয়ে চলবে।

তপতী বললে, তুই সব কথা খুলে বলছিস না কেন? কথায় কথায় ছোট করে দেয় তোকে, মানেটা কি!

তনুকা বললে, কত আর বলব। প্রথম শুরু তো সেই উচ্চারণ নিয়ে। প্রোনানসিয়েশন।

বললে, ও যখন প্রথম গেল, আমিই চেষ্টাচরিত্র করে নিয়ে গেলাম। বিয়েটা তখনো হয়নি। বলেছিলাম, দোষ তোমার নয়, তুমি স্কুলে কলেজে যেমনটি শিখেছ তেমন বলছ। কিন্তু এখানে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে হলে, সমানে সমানে পাল্লা দিতে হলে ওদের মতোই ইংরিজি বলতে হবে, ওদের মতোই উচ্চারণ করতে হবে।

তপতীকে বললে, আমার জন্ম ওখানে, বড় হয়েছি ওখানেই। আমার কাছে শিখতে কিসের লজ্জা বল? আমি হেসে হেসেই দু'একটা কারেক্ট করে দিতাম। তার মানে কি আমি বলতে চেয়েছি, আমি তোমার চেয়ে বড়?

তপতীও সায় দিয়েছে। —ঠিকই তো, আমারই তো ইচ্ছে করে তোর কাছে শিখে নেওয়ার।

তনুকা বলেছে, ওর কেমন জিদ চেপে গেল, ওই ভুল উচ্চারণই ও চালাল। কিছুতেই শিখবে না। বলে বসল, আমি টাকা রোজগার করতে এসেছি, ইয়্যাঙ্কি বনে যেতে আসিনি।

—এ কি গোঁয়ার্তুমি? তপতী অবাক হয়েছে।

তনুকা হেসে বলেছে, তুই ভেবে দেখ, যদি না পার সে অন্য কথা, পারতে চাই না এ কেমন জেদ। আমাদের ইনস্টিটিউশানের পার্টিতে হাসব্যান্ডকে না নিয়ে যাওয়া অসভ্যতা। যেত। কিন্তু ওই উচ্চারণে যখন কথা বলত, কেউ কেউ বুঝতে না পেরে হাঁ হয়ে থাকত। কেউ কেউ ঠোঁট টিপে হাসত। কি মিজারেব্‌ল্ যে লাগত নিজেকে, কি বলব!

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, সোয়ামি ওখানে গিয়ে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে

পড়েছে, ভালই বলে। তবু দু'একটা উচ্চারণে এদেশি টান আছে। হয়তো সাউথ ইন্ডিয়ান বলেই। একদিন একটা শব্দের উচ্চারণ কারেক্ট করে দিতেই হাসতে হাসতে বললে, ইজ ইট সো ? ও দেশে যখন পেপার পড়েছি, না জানি কত লোক মুখ টিপে হেসেছে। একটা থ্যাঙ্কিউ দিতেও ভোলেনি।

সেজন্যেই কি সোয়ামি ওর মনের মধ্যে একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, অথচ ও বুঝতে পারছে না। ওর সঙ্গে যখন কথা বলে, মনে হয় একজন সমকক্ষ, এক সমবয়স্কের সঙ্গেই যেন কথা বলছে। যেন সমান সমান হাইট দু'জনের, মুখোমুখি চোখাচোখি কথা বলা যায়। প্রদীপ্তর কাছে পদে পদে মনে হ'ত আমার পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চিকে পৌনে পাঁচ ফুট নামিয়ে না আনলেই অশান্তি।

সোয়ামিকে গিয়ে বললে, একটু বেরিয়ে যাচ্ছি।

সোয়ামি ঘাড় নেড়ে দিল।

কিন্তু কেন যাচ্ছি, কার সঙ্গে বলতে বাধল। পরে অবশ্য একদিন বলতে হবে, না বলে পারবে না। সোয়ামির কাছে তো আমি এখন ওপন বুক, খোলা পাতা। কেন বলতে হবে সেটাই প্রশ্ন। কেন বলি !

তনুকা জানত না সেন্টারের সিঁড়ির সামনে অনুরূপের গাড়ি অপেক্ষা করছে।

সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে বললে, আপনার গাড়ি ?

অনুরূপ হেসে বললে, না ওটা হোটেলের। যে ক'দিন থাকব, ওটা আমারই।

(হোটেলেই নিয়ে যাবে না তো চাঁদু ? আমি কিন্তু অন্য মেটালে তৈরি।)

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলল, আমার দুটোই সুরাটে। কোম্পানির আরো পাঁচটা।

(বোঝাতে চাইছ তুমি কতখানি অ্যাফ্লুয়েন্ট, এই তো ?)

পার্ক স্ট্রীটের একটা নামী রেস্তোরাঁর সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। উর্দিপরা শোফার নেমে এসে দরজা খুলে দিল।

দুপুরের রেস্টুরেন্ট প্রায় জনহীন। একটা মৃদু নীল আলোর কুয়াশায় ঢাকা। শীতাতপের ঠাণ্ডা বেশ উপাদেয়। এরকম পরিবেশ না হলে কি প্রেমের কথা বলা যায় ?

বেশ একটা কৌতুক চেপে তনুকা অপেক্ষা করছিল, অনুরূপ কি ভাবে শুরু করে জানার জন্যে। যদি বেশি দূরে দূরে ঘোরাফেরা শুরু করে তখন না হয় ও নিজেই সাহস জোগাবে।

অনুরূপ চা আর ফিশ ফিঙ্গারের অর্ডার দিল।

তারপর বললে, দেখি আপনার হাতটা !

এই সব রেস্টুরেন্টে কেউ উচ্চকিত ভাবে হেসে ওঠে না। কিন্তু কোনও নিয়মই খাটে না তনুকার কাছে। এখানে আসার আগে সবাই তো নিজেকে পরিপাটি করে সাজিয়ে আনে। তনুকা সেদিক থেকেও যেমন ব্যতিক্রম, তেমনি হাসিতেও।

—হাসলেন যে ? অনুরূপ অপ্রতিভ ভাবে প্রশ্ন করল।

(পামিস্ট্রি যে আসলে মেয়েদের হাত ধরার ছুতো তা আমি তপুর কাছেই শুনেছি।)

মনে মনে কৌতুক বোধ করলেও তনুকা বললে, আমার হাতের রেখায় আপনার ভবিষ্যৎ লেখা আছে নাকি ?

—থাকতেও তো পারে।

বলেই এবার সপ্রতিভ ভাবে বললে, যদি বলি এতকাল আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

(তাই বুঝি। আমি তো ঠিক উল্টোটাই ভাবছিলাম। এতকাল আমিই তোমাকে খুঁজছিলাম।)

তনুকা কোনও কথা বলল না, ওর বেশ ভাল লাগছিল অনুরূপ স্পষ্ট করে কথা বলতে

পারছে বলে।

তনুকা এবার হাতটা এগিয়ে দিল, দেখুন তা হ'লে কি আছে এখানে।

ও ওসব একেবারেই বিশ্বাস করে না। হাতের রেখা, কোষ্ঠীবিচার, গ্রহরত্ন। জানে ওসবই এক ধরনের কুসংস্কার। তবু মজা লাগছিল।

অনুরূপ বললে, আজ থাক, আরেকদিন দেখব।

(থ্যাঙ্কিউ, থ্যাঙ্কিউ। তা হ'লে এরপরও আবার দেখা হবে। চলে যাচ্ছ না।)

অনুরূপ কথাটা কি ভাবে বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না হয়তো।

হঠাৎ দুম করে বলে বসল, আই ওয়ান্ট টু ম্যারি ইউ।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল তনুকা। তারপরই বিভ্রান্ত। বেশ কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে যাওয়ার পর ভেতরে ভেতরে একটা আনন্দ গুনগুন করে উঠল। এক গাছ টকটকে লাল পলাশ ফুলের ওপর ঝকঝকে রোদ্দুর পড়ল যেন। এক মাঠ সাদা কাশফুলের ওপর দিয়ে এক দমকা ঝ'ড়ো বাতাস বয়ে গেল।

তনুকার মতো ঝকঝকে কথার মেয়েও চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

মুখে কোনও কথা জোগাচ্ছে না।

জীবনে এই প্রথম এ কথাটা ওকে কেউ বলল।

তনুকা জড়তা জড়ানো ভীরু ধাঁচের মেয়ে নয়। ও দুঃসাহসে ভর করে অনেক এগিয়ে যেতে পারে, ওর মাথার মধ্যে কোথাও একটা লুকোনো টাচস্টোন আছে, কষ্টিপাথর না কি বলে, তাই। কে নিখাদ কথা বলছে, কার কথায় কতখানি খাদ, তা ধরে ফেলতে ওর সময় লাগে না। ঠকে ঠকে বয়েস আর অভিজ্ঞতা থেকে এই জাদুপাথরটা পেয়েছে।

সন্দেহ নেই অনুরূপকে ওর প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গিয়েছে। ওকে মোহগ্রস্ত করে ফেলেছে। মোহ না ভালবাসা নিজেই বুঝতে পারছে না।

ও ভেবেছিল, ওর যে একটা নাইট গাউন আছে, ওদেশ থেকে কিনে এনেছে, ফিকে নীল, তার হাতায় গলায় কোমরে নীচে লুটিয়ে পড়া প্রান্তে যে সুন্দর লেসের কাজ আছে —অনুরূপের সত্যি যদি ওকে ভাল লেগে থাকে তা হ'লে, এই ঠাণ্ডা চা-দোকানে বসে অনুরূপ ধীরে ধীরে মুগ্ধতার কথাগুলো দিয়ে সেই রকম লেস বুনবে। সত্যি প্রেমে পড়া মানুষ তো সে ভাবেই লেস বোনে।

ওকে দেখে, ওর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছে অনেকেই। দুঃখ এই যে ও নিজে মুগ্ধ হয়েছে দু'একবার। সেই দু'একজন লেস বুনতে বুনতে বোধহয় অধৈর্য হয়েই হঠাৎ সরে গেছে। সেই আধবোনা লেসগুলোই ওর এখন একমাত্র সম্বল, স্মৃতি। এবং ওগুলো একদিন ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েও স্মৃতি থেকে মুছে দিতে পারেনি। সে সব অনেক কম বয়েসের কথা।

তারপর প্রদীপ্ত এল। কিন্তু ওই কয়েকটা কথা, যার জন্যে সারা জীবন উন্মুখ হয়ে ছিল, মুখ ফুটে বলতে পারেনি।

প্রদীপ্ত আমেরিকায় গিয়ে কোথায় থাকবে, কি ভাবে থাকবে, এই সমস্যাটা যখন প্রদীপ্তকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তখন তনুকাকেই বলতে হ'ল, কেন তুমি আমাদের ওখানেই থাকবে।

প্রদীপ্ত হেসে বললে, তা কি করে হয়!

শেষে তনুকাকেই বলতে হয়, কেন, খুব সহজ রাস্তা। আমরা বিয়ে করে ফেললেই আর কোনও সমস্যা থাকে না।

এরপরও অনেকে কাছে আসতে চেয়েছে। তনুকা তখন জেনে গেছে বিয়েটা মনের দিক থেকে ভেঙে টুকরো টুকরো। শুধু কাচের আলমারিতে সাজানো আছে ভাঙা

টুকরোগুলো, কাচ জোড়ার আঠা দিয়ে।

অনুরূপের মতো এই একটা কথা তারা কেউ বলেনি। এমন ভাবে তো নয়ই।

ফলে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে।

নিমেষের জন্যে তনুকার মনে হ'ল এই চমৎকার দুপুরটাকে আমি নষ্ট করে দেব না। অন্তত অনুরূপের দুপুরটা আজকের মতো সুন্দর থেকে যাক্ না। ও জীবনে এমন একটা কথা প্রথম শোনালো, যার জন্যে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অনুরূপ বললে, আপনাকে আজই কোনও উত্তর দিতে হবে না। ভেবে দেখার সময় নিন।

তারপর ! তার আগে আমার কার্ডগুলো আপনার সামনে মেলে ধরি।

একটার পর একটা তাস উল্টে উল্টে রাখছিল অনুরূপ। কিন্তু সে সবই টাকার কথা, ঐশ্বর্যের কথা। আমাদের কোম্পানির টার্নওভার বছরে...

অন্য কেউ বললে কান ঝালাপালা হয়ে যেত তনুকার। হয়তো বিরক্তিতে উঠে চলে যেত।

কিন্তু তনুকার ভেতরটা বারবার বলছিল, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, ভাল লেগেছে, ভাল লেগেছে। ও শুধু নিজের কথাগুলোই শুনছিল, অনুরূপের কথা কানেই যাচ্ছিল না।

সমস্ত কথা যখন অনুরূপ বলে ফেলে চুপ করে গেল, তখন তনুকা ধীরে ধীরে বললে, বাট আয়াম ম্যারেড।

অনুরূপের মুখের দিকে তাকিয়েই বলল, কারণ এমন একটা রূঢ় সত্য শোনাব পর ওর মুখটা কেমন দেখায় জানার ইচ্ছে ছিল।

অনুরূপের মুখ বিবর্ণ।

ভেতরে ভেতরে কৌতুক অনুভব করছিল, তবু ওই মুখ দেখে একটু মায়া হ'ল।

সান্ত্বনা দেবার স্বরে বললে, ডিভোর্সটা করা হয়ে ওঠেনি, তবে প্রয়োজন হলে যে কোনওদিন করতে পারি।

অনুরূপ যেন একটু আশা দেখতে পেল। বললে, সে তো অনেক ঝামেলার ব্যাপার শুনেছি।

—না। আমরা দু'জন খুব বন্ধু। ডিভোর্স মিউচুয়েল করেই হবে, ওকে বললেই ও রাজি হবে।

হেসে বললে, ডিভোর্সের পরেও আমরা বন্ধুই থাকব। সেই সম্পর্কটা কোনওদিন নষ্ট হবে না।

একটু কপালে যেন ভাঁজ পড়েছিল, তনুকা সেটা লক্ষ না করে পারেনি।

কিন্তু বেশ বোঝা গেল এখন আর কোনও কিছুই ওকে আটকে রাখতে পারবে না। প্রশ্নও জাগল, এটা কি সত্যি প্রেম ? না কি ইনফ্যাচুয়েশন। তনুকা যেমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তেমনই কিছু ? এত দ্রুত দু'জনে পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেছে ! এমন একটা অলৌকিক ঘটনায় তনুকার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সেই ছেলেবেলার কথাটা মনে আছে, ওর মধ্যে প্রেম একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল। মাত্র গতকাল আলাপ, আর আজই বিয়ের প্রস্তাব ! এ যে প্রায় ঘটকালি করে বিয়ের চেয়ে অবিশ্বাস্য। জড়োসড়ো একটি মেয়ে কোনওরকমে মুখ তুলে তাকাল ছেলেটির দিকে। ছেলেটি দেখল মেয়েটিকে। ব্যস, বিয়ে পাক্কা। তারপর অবশ্য দিব্যি মানিয়েও নেয়।

অনুরূপকে ভীষণ ভাল লাগছিল তনুকার। ওর মনে হচ্ছিল ও সত্যি প্রেমে পড়ে গেছে। এতকাল পরে এই বয়েসে সত্যি সত্যি বুঝি প্রেম এল ওর জীবনে। সেজন্যেই

হয়তো ওর কেবলই ভয় হচ্ছিল, এখনই বুঝি সব মুগ্ধতা ভেঙে যাবে।

কিন্তু এরই মধ্যে যাকে এতখানি ভালবেসে ফেলেছে, বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছে, হয়তো সেই শূন্যতা চিরকালের জন্যে উবে যাবে যার ভালবাসা পেয়ে, তার কাছ থেকে কোনও কিছু গোপন রাখবে কি করে !

তনুকা বললে, আমার তাসগুলোও একটা একটা করে মেলে রাখছি। তারপর ভেবে দেখুন যে কথাটা প্রথমেই বলে ফেলেছেন সেটা আরেকবার বলতে চান কি না।

সব শুনে অনুরূপ বললে, আমি আবার বলছি, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।

এইবার সেই মোক্ষম কথাটা তনুকাকে বলতে হবে। সেটা আগে বলে ফেললেই ভাল ছিল। এখন ওর মনের মধ্যে একটা ভয় : হারিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে।

একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনই একটা বিস্বাদ নিয়ে মাটিতে পা ফেলতে হবে। অস্ফুটে বলে উঠতে হবে, সব মিথ্যে সব মিথ্যে।

ভয়ে ভয়ে তনুকা প্রশ্ন করল, আপনার বয়েস কত ?

—টোয়েন্টি এইট।

সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে হেসে উঠল তনুকা। আর পাঁচজনে শুনতে পাবে এমন গলায় বলে উঠল, হোয়াট এ কাপ্‌ল।

হাসি থামিয়ে বললে, আমাকে দেখে অনেক কমবয়েসী মনে হয়, সেটা আমার দোষ নয়। আয়াম নট দ্যাট ইয়াং।

বয়েসটা শুনল অনুরূপ। বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল বলে মনে হ'ল না।

বলল, এই একটা দিনেই আমি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি।

—সত্যি ? তা হলে বলি, আমিও।

অনুরূপ বললে, ভালবাসার চেয়ে বড় কথা আর কি থাকতে পারে ! আমার কাছে আর সবই তুচ্ছ, তুচ্ছ।

একটু পরে বললে, মনের কোনও বয়েস হয় না।

অনেকদিন আগে কে যেন বলেছিল, তারুণ্য কোনও বয়েসকেই ছেড়ে যায় না। মনের কোনও বয়েস হয় না।

আঃ, কি আনন্দ, কি প্রশান্তি।

তনুকা পুরীর সমুদ্রের ধারে বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূর থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ এগিয়ে আসছে, ফেটে পড়ছে। ব্রেকার্সের সারি ফেটে পড়তেই সাদা দুধের মতো ফেনার ওপর উন্মত্ত জ্যোৎস্নার লুটোপুটি। দূরে দূরে কয়েকটা পালতোলা জেলে নৌকো ঘরে ফিরছে, ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। ঢেউ ফেটে পড়ার শব্দটা কি বিচিত্র। তনুকার চোখের সামনে যে পর্দাটা ওকে কিছুই দেখতে দেয়নি, ভবিষ্যৎ ঢেকে রেখেছিল, সেটা যেন কে ছিঁড়ে ফালি ফালি করে দিচ্ছে। এমনই আওয়াজ ওই ঢেউ ফেটে পড়ার। তনুকা দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের ধারে, বালির ওপর। আর সেই ঢেউয়ের সারি যেন অনন্ত স্নেহে ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে। বলছে, সুখী হও, সুখী হও।

বাড়ি ফিরে এল তনুকা, এসেই ফোন, প্রদীপ্তকে।

—দীপ, আমি একজনকে ভালবেসেছি। বিয়ে করতে চাই।

ও প্রান্ত থেকে স্বর ভেসে এল। —খুবই সুখবর। কোনও প্রবলেম হবে না, ডিভোর্স পেয়ে যাবে। বাট আই স্টিল লাভ ইউ তনু।

(দীপ, ভালবাসা কি তাই তুমি জানো না। আমি জেনেছি। আমি পেয়েছি।)

—দীপ, ডিভোর্সের পরেও কিন্তু আমরা বন্ধুই থাকব।

মনে মনে বলল, কত কষ্টে আমরা এক একজনের সঙ্গে এক একটা সম্পর্ক গড়ে তুলি, সেটা এত সহজে নষ্ট হতে দেব কেন।

তনুকার হঠাৎ মনে হ'ল বন্ধুর চেয়ে বড় সম্পর্ক আর কিই বা আছে। আর সমস্ত সম্পর্কগুলোর মধ্যেই কিছু না কিছু স্বার্থ জড়িয়ে আছে। কিছু না কিছু চাওয়াপাওয়ার কথা। বন্ধুর কাছে আমরা কিছুই চাই না, বন্ধুর কোনও চাহিদা থাকে না। কি সুন্দর একটা সম্পর্ককে এই পৃথিবীতে আমরা নষ্ট করে দিয়েছি।

তনুকা হাসতে হাসতে বললে, শোন তপু, আমি একেবারে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। সোয়ামির কথা, ওই সায়েন্টিফিক সেন্টারের কথা বেবাক ভুলেই গিয়েছিলাম। সাত সাতটা দিন সেন্টারে যাইনি। শুধু অনুরূপ আর অনুরূপ। প্রেমের কথাগুলো এই দ্যাখ, কাগজে লেখা দলিল হয়ে গেছে।

তপতী হাসতে হাসতে কাগজগুলো হাত বাড়িয়ে নিল।

—কাগজে কেন ?

তনুকা হাসছে। বলছে, চারপাশে লোক, রেস্টুরেন্টের ভিড়ে কি প্রেমের কথা বলা যায় !

তপতী জোরে জোরে পড়ছিল।

*অনুরূপ : আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। হৃদয় দিয়ে কি কিছু অনুভব করছ।*

*তনুকা : হৃদয় দিয়ে কিছু অনুভব করি না, শুধু ভয় হয়।*

*অনুরূপ : হৃদয় দিয়ে অনুভবই যদি না করো তা হলে ভয় হবে কেন ?*

*তনুকা · ভয় হয় পরিণতিতে হয়তো শেষ অবধি হতাশা।*

তপতী বলে উঠলো, বাব্বা, এ তো একেবারে হৃদয় নিয়ে টানাটানি। তা আপনি থেকে 'তুমি' শুরু হ'ল কবে ?

তনুকা বললে, বলব, বলব। সে একটা ঘটনা। দুর্ঘটনা কি না জানিনা। এখন পড়ে যা।

*অনুরূপ : তোমাকে জানিয়ে গিয়েছিলাম দু'দিন কলকাতার বাইরে যেতে হবে। কিন্তু ওখানে গিয়ে দুটো দিন সারাক্ষণ তোমার কথা মনে পড়েছে। কেবলই কাজ ফেলে চলে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল। এ দু'দিনে তোমার কি একবারও আমার কথা মনে পড়েছে।*

*তনুকা : সমুদ্রে যে ডুবে আছে তাকে কি প্রশ্ন করা যায় স্নান করেছ কি না ?*

*অনুরূপ : কি জাদু করেছ, তুমিই জানো।*

*তনুকা : আমি তো করিনি কিছু, শুধু আমি হয়ে থাকি। মাঝেমাঝে তোমার চোখ দিয়ে নিজেকে দেখার চেষ্টা করি। খুব বেশি দেখতে পাই না, যেটুকু আভাস পাই, অবাক হই, আমি কি ওরকম ? মনে হয় এবার হয়ত সত্যিকে চিনতে পারব।*

পড়েই তপতী চিৎকার করে উঠল। বললে, প্রেমে না পড়লে এ সব লাইন বেরোয় না।

তপতী বললে, এবার তোর সেই ঘটনা না দুর্ঘটনা, তার কথা বল।

তনুকা ঠোঁট টিপে হাসল, কোনও কথা বলল না। কিছু কিছু কথা আছে যা গোপন রাখতেই আনন্দ। একজনকেও বলা যায় না। বললেই যেন সব মুগ্ধতা কেটে যাবে।

যথারীতি সেদিনও অনুরূপ সায়েন্টিফিক সেন্টারে এল। এসে বসল তনুকার টেবিলের কাছে রাখা ছোট টুলটায়।

এত বড় একটা কোম্পানির মালিক, লেখাপড়াও যথেষ্ট আছে বলে মনে হয়, বেশ

কয়েকবার বিলেত গিয়েছে সে কথাও প্রকাশ করেছে কথায় কথায়, সে তনুকার প্রেমে পাগল ভাবতেও ওর বিস্ময় লাগছিল। খুঁজে পাচ্ছিল না ওর মধ্যে এমন কি আছে যা এই প্রায় ছেলেমানুষ যুবকটিকে উতলা করে তুলেছে। তনুকা তো মুগ্ধ হয়েছিল শুধু চেহারা দেখেই। ও কি তনুকার মধ্যেও তেমন কিছু দেখেছে।

একটা টুলের ওপর গুটিসুটি হয়ে এই সুদর্শন যুবকটির বসে থাকা অনেকের কাছে দৃষ্টিকটু লাগার কথা। কিন্তু তনুকার বেশ ভাল লাগছিল। ওকে তো জীবনে কেউ কোনওদিন তেমন মূল্য দেয়নি, অন্তত তনুকার তাই ধারণা, কিন্তু এই সুদর্শন যুবকটি যেন কোনও দেবীর পায়ের তলায় বসার মত ভঙ্গি করে বসে আছে। নিজেকে দারুণ মূল্যবান মনে হচ্ছিল তনুকার।

অনুরূপ বললে, আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি কিন্তু এখনও।

তনুকা ভেবেছিল ওদের দু'জনের মধ্যে এতগুলো অমিল ছন্দের বাধা ডিঙিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা আর অনুরূপ তুলতে চাইবে না। দারুণ আনন্দে সেদিন ছুটতে ছুটতে গিয়ে প্রদীপ্তকে ফোন করার জন্যে অনুশোচনাও হচ্ছিল।

বেচারি! ও চলে আসার পর নিশ্চয় সব ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্তে আছে। ডিভোর্স দিতে রাজি হয়ে আছে প্রথম থেকেই। কিন্তু 'আমি একজনকে বিয়ে করতে চাই, সেজন্যে ডিভোর্সটাও তাড়াতাড়ি হ'লে ভাল হয়', এমন কথা শোনার পর নিশ্চয়ই একটু আঘাত পাবে। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে আগেই আলোচনাও হয়ে গেছে। তবু কথাটা বলতে প্রথম দিকে তনুকার দ্বিধা হচ্ছিল কেন? একসঙ্গে থাকতে পারছি না, থাকতে পারব না, তবু আঘাত পাবে বলে মায়া।

তনুকার বদলে প্রদীপ্তই যদি কোনও মেয়ের প্রেমে পড়ে যেত এবং তাকে বিয়ে করতে চাইত, তা হ'লে তনুকা যেন আরও খুশি হত। ওর তরফ থেকে আগে ডিভোর্স চাইলে তনুকা আঘাত পেত কি? হয়ত অপ্রিয় কাজটা ওকে কবতে হচ্ছে না বলে বেঁচে যেত। কিন্তু বলা যায় না, মানুষের মন বড় বিচিত্র। হয়তে খারাপ লাগত। ইগো ছাড়া কোনও মানুষ হয় নাকি। এই প্রেম, যা নিয়ে এত কাব্য, যা এখন তনুকার মনপ্রাণ জুড়ে আছে সেও তো ইগো। আমি কারো কাছে আমার দামের চেয়েও বেশি হয়ে উঠেছি এই বোধ। ভালবাসা বলতে আর কিই বা বোঝায়।

ও সত্যি সত্যি অনুরূপকে ভালবেসেছে কি না সে বিষয়ে যে ওর কিছুটা সংশয় নেই তাও নয়। কারণ ওর হাতের ওই আংটি দুটো যার ওপর দুটো বড় বড় পাথর বসানো, গ্রহরত্ন না কি বলে, প্রথম দিকে চোখে পড়েনি, চোখে পড়ার পর মনে হয়েছে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

ঠাট্টা করে জিগ্যেস করেছিল, তোমার ব্যবসা যে এত ফুলেফেঁপে উঠেছে তা কি ওই পাথর দুটোর জন্যে?

বিব্রত আর অপ্রতিভ বোধ করেছিল অনুরূপ। —কেন, তুমি বিশ্বাস কর না?

—তা হ'লে আমার কাছে মত জানতে আসছ কেন বারবার। জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে আর একটা পাথর বসানো আংটি পরলেই আমার মতো পেয়ে যাবে।

কথাটা শুনে বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল অনুরূপ। আর কল্পনায় দেখেছে ভবিষ্যতে কোনও একদিন অনুরূপের দু'হাতে দশটা পাথর বসানো আংটি। হেসে ফেলেছে।

তপতী শুনে বলেছে, সে কি রে, দশ আঙুলে দশটা আংটি নিয়ে যদি তোকে কোনওদিন আদর করে জড়িয়ে ধরে তোর তো এক শিশি ডেটল লাগবে।

দু'জনেই হেসে উঠেছে, কিন্তু পরক্ষণেই তনুকা বলেছে, প্রেমে পড়লে এ সব উপেক্ষা করা যায়।

—যায় না। তুই একবার ভুল করেছিলি, আর করতে যাস না।

তনুকা বলেছে, তবু তো তোকে গুরুমার কথা বলিনি। ওদের পরিবারের একজন গুরুমা আছেন। তার কাছে হয়তো দীক্ষা নিতে হবে।

তপতী হেসে বলেছে, তারপর গুরুবাবার কাছে পাঠিয়ে দিতেও পারে।

এ কথাটা তনুকার মাথায় ঢোকেনি, বলে উঠল, সত্যি ?

এটা তনুকার কাছেও একটা রহস্য। পোশাকে পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, হাবেভাবে যে মানুষটা একেবারে আধুনিক, তার সঙ্গে ওই আংটি আর গুরুমাকে কিছুতেই মেলাতে পারে না।

একদিন গল্প করতে করতে গর্ব করে বলেছে, ওদের কোম্পানিতে একবার স্ট্রাইক ভেঙেছে কি-ভাবে।

এই স্ট্রাইক ব্যাপারটা তনুকার একেবারেই পছন্দ নয়। ও কাজ করতে চায়। করতে পেলে বেঁচে যায়। যারা ধর্মঘট করে, কেন করে সে বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা নেই। তবু অনুরূপ নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে গিয়ে যা বলেছিল, ওর কাছে মনে হয়েছে তা নিষ্ঠুরতার সামিল।

তবু এই লোকটাকে ওর কেন যে ভাল লেগে গেছে বুঝতে পারে না।

'আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাব,' কিংবা 'সকালে উঠে দু'জনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব'—কথাগুলোর মানে তখন বুঝতে পারেনি।

অনুরূপ পাশের টুলে বসে থাকতে থাকতে বললে, বিয়ে করতে রাজি আছেন কি না স্পষ্ট করে বলুন।

তখনও আপনি।

তনুকা একটু কৌতুক বোধ কবছিল ওর ছটফটানি দেখে।

হেসে ফেলে বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপের মুখটা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে, তা দেখে তনুকার মনে হ'ল তার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই।

তখন বিকেল। ঘরে কয়েকজন এসে গিয়েছে। অনুরূপ কাগজ বের করল।

*অনুরূপ : আমার কথা কি অন্য সময় মনে পড়ে ?*

*তনুকা : মনে হওয়ার একচেটিয়া অধিকার কি শুধু আপনার ? আমার কিন্তু আড্ডা মারতে ইচ্ছে করছে আজ।*

*অনুরূপ : আগে কোনও রেস্টুরেন্টে খাওয়া। আড্ডা তো আমাদের সারাজীবনই আছে।*

*তনুকা : আমি সারাজীবনের দিকে চেয়ে আজকে হাঁ করে বসে থাকতে রাজি নই। আমার তো এখনই দরকার। আজই।*

সোয়ামি তখনও ওর মনের মধ্যে একটু উঁকি দিচ্ছে। তাই বললে, ছুটি নিয়ে আসি। সাততলায় উঠে গেল দু'জনেই। অনুরূপ করিডরে পায়চারি করছে। তনুকা হাসিমুখে ফিরে এল। দু'জনে দাঁড়াল লিফটের সামনে। লিফট ফাঁকা, একজনও লোক নেই। এ সময় থাকার কথাও নয়। লিফট নামছে, ওরা দু'জনে মুখোমুখি। এমন একটা অভাবনীয় নির্জনতা পেয়ে অনুরূপ এগিয়ে এল।

তনুকা হেসে উঠে তপতীকে বললে, এবং চুম্বন। আপনি তুমি হয়ে গেল। নিজেই বললে, দারুণ রোমান্টিক, তাই না ?

তনুকাই সেদিন পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেই আলোর ঝর্নার সামনে।

একটা বেঞ্চিতে বসে গল্প করতে করতে হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল, সেখানেই একদিন সোয়ামির সঙ্গে পাশাপাশি বসে ছিল। ও ভেবে পাচ্ছিল না এতগুলো বেঞ্চি থাকতে ঠিক সেই আসনটিতেই ও এসে বসল কেন। কেনই বা এত এত বেড়ানোর জায়গা থাকতে এই আলোর ঝর্নার কাছেই আসতে ইচ্ছে হল।

ওর মনের মধ্যে যেখানে সোয়ামির জন্যে একটা আসন পাতা হয়ে আছে, সেখানেই কি অনুরূপকে বসাতে চাইল।

সোয়ামির কথা মনে পড়ে যেতেই তনুকা বলল, চাকরিটা ছেড়ে যেতে আমার কিন্তু কষ্ট হবে।

অনুরূপ হেসে উঠল। —কত মাইনে দেয় এখানে ? তোমাকে তো বিয়ের পর আমার কোম্পানির ডিরেক্টর করে নেব। টাকা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে তনুকার সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে গেল।

ও রিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, ফর গডস সেক, তুমি টাকার কথা বলো না। আমি কোনও মিলিওনেয়ারকে বিয়ে করার কথা ভাবতেই পারছি না। আমি প্রথম দিন যে মানুষটাকে মুগ্ধ চোখে দেখেছিলাম তাকেই বিয়ে করতে চাই।

সুর কেটে গেল। কিন্তু তনুকা যে একটু আগেই কৌতুকের ভঙ্গিতে বলে ফেলেছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ওর কথা শুনে অনুরূপের উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখখানা মনে পড়ে গেল।

দ্যাখ, তপু, তোরা আমাকে একটুও বুঝতে পারিসনি, বুঝতে চেষ্টা করিসনি : প্রথম থেকেই আমার মধ্যে দ্বিধা ছিল, ভয় ছিল। কিন্তু লোভও কি ছিল না। ভেতরের ক্ষোভ থেকে একদিন তোকে বলেছিলাম, তোদের ভগবান, সকলের জন্যে সব কিছু দিয়েছে, কিন্তু আমার জন্যে আমার মনের মতো কাউকে বানাতে ভুলে গেল কেন ? তারপর হঠাৎ অনুরূপের সঙ্গে দেখা। এত সুন্দর পুরুষ আমি জীবনে দেখিনি। কি ঋজু দীর্ঘ ছিপছিপে চেহারা, চার্মিং, সেই রেডিশ হোয়াইট কমপ্লেকসন। টিকলো নাক, হাতের আঙুল, চুলের বিন্যাস, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কি সুন্দর। আমি ওকে ভালবেসে ফেললাম। ভাবলাম, এই লোকটাই আমার বুকের ভেতরের সমস্ত শূন্যতা দূর করে দেবে। দু'দিনের মধ্যে মনে হল আমার বুকের মধ্যে আর কোথাও কোনও ভয়েড নেই, সব শূন্যতা উবে গেছে। এমন কি আমাদের ওই সেন্টার, সহৃদয় ওই মানুষটা, সোয়ামি, যে আমাকে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিল, যাকে আমার জীবনের ঠাণ্ডা প্রলেপ মনে হত, প্রদীপ্তর মতো অবুঝ কিন্তু অকৃত্রিম বন্ধু, তাদের কারও জন্যে যেন বুকের মধ্যে তিলমাত্র জায়গা নেই। নিষ্ঠুর অত্যাচারী আর পররাজ্যলোভীর মতো হঠাৎ আক্রমণ করে সমস্তটুকুই দখল করে নিয়েছে। কারও যেন সেখানে মুহূর্তের জন্যেও প্রবেশাধিকার নেই। অথচ আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পারছিলাম, আমি যাকে চেয়েছি সে অনুরূপ নয়। ও এক ধরনের রূপের প্রতি আকর্ষণ। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি, কণ্ঠলগ্ন টাইয়ের বাহার, হাসি... সবকিছুর আড়ালে একটা নির্বোধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অহঙ্কারী, অর্থসর্বস্ব একজন চতুর ব্যবসায়ী লুকিয়ে আছে। চতুর এবং প্রয়োজনে নিষ্ঠুর। এমন একটা মানুষ কখনও আমার শূন্যতা ভরে দিতে পারে ? অসম্ভব। আমার সেই আমেরিকান বস্, এচেভেরিয়া, লোকটা ইহুদি। ইসরায়েল থেকে এসেছিল, হাসতে হাসতে বলত, টাঙ্কা, তোমার ওই ছোট্ট মাথার মধ্যে এত বড় একটা সুপার কমপিউটর কি করে লুকিয়ে রাখ ? একদিন একটা কমপিউটর ক্রমাগত ভুল তথ্য দিচ্ছে, বিগড়ে গেছে কোথাও, ঠাট্টা করে একজনকে বললেন, যতক্ষণ সি ই না আসে, ওই বাচ্চা মেয়েটার মাথাটা ওর ভেতর ঢুকিয়ে দাও। ওই অ্যাডমিরেশন, আর ওই ভালবাসা। কি অকৃতজ্ঞ আমি, ফিরে এসে সেই একটাই চিঠি লিখেছিলাম, 'একটা চাকরি

পেয়েছি এখানে, আমি সুখী'।

অনুরূপের ওপর এত টান, দেখা না হ'লে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা, অথচ কেবলই মনে হত ও কেন প্রদীপ্তর মতো বন্ধু নয়, ও কেন সোয়ামি নয়, যে আমার মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে, দেখাতে পেরেছে। মনে হ'ত অনুরূপ কেন ইহুদি এচেভেরিয়ার মতো আমার মগজটাকে অ্যাডমায়ার করে না। শুধু রক্তমাংস দেখে, লোভীর মতো চুমু খেতে চায়, চাকরি বলতে বোঝে শুধু মাইনের অঙ্কটা। তোমাকে তো আমার কোম্পানির ডিরেক্টর করে নেব।

আঃ, এমন একজনকে যদি পেতাম, যে একই সঙ্গে প্রদীপ্ত, অনুরূপ, সোয়ামি, এচেভেরিয়া, আর সেই পাশে বসা মার্কিন সহপাঠী ফাজিল ছেলেটি! ইউ হ্যাভ আর্নড এ কিস ফ্রম মি। কোনও জাদুবলে কেউ যদি এদের সকলকে একজন বানিয়ে দিত। কারণ, আই নীড দেম অল।

তনুকা সঙ্গে গিয়েছিল সী অফ করতে। এয়ারপোর্টে।

অনুরূপ বলেছিল, হোটেলের এই গাড়িটাই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

তনুকা অপেক্ষা করল, যতক্ষণ না প্লেন আকাশে উড়ে যায়।

উড়ে গেল।

শূন্য মন নিয়ে ফিরে এল তনুকা। না, শূন্যতা নয়, সবটুকু জুড়ে শুধু এ ক'দিনের স্মৃতির স্বাদ। একটা পরিপূর্ণ ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

—তোমার একটা ছবি দেবে তনুকা?

হাসতে হাসতে। —আমাকেই তো দিয়ে দেব, ছবি কি হবে?

—দাও না একটি ছবি। না থাকে, চলো তুলিয়ে নিই।

তনুকা হেসে উঠেছে। অনুরূপ কাছে না থাকলে আজকাল আর হাসেও না। ও ভেতরে ভেতরে স্থির হয়ে গেছে। নিস্তরঙ্গ দিঘির মতো শান্ত।

তনু হেসে উঠল। —ছবিটা গুরুমাকে দেখাতে হবে, এই তো?

অনুরূপ চমকে উঠেছে, কি করে বুঝলে?

—দিস্ কমপিউটর ব্রেন। নিজের মাথায় একটা আঙুলের টোকা দিয়ে বুঝিয়েছে।

তারপর বলেছে, বড় তাড়াতাড়ি তুমি জিগ্যেস করে ফেলেছিলে, বিয়ে করব কি না। তখন গুরুমার কথা একবারও তোমার মনে আসেনি।

একটু থেমে বলেছে, তুমি নিজেকে জিগ্যেস করো। আর কাউকে নয়। তোমার গুরুমা নয়, পরিবারের লোক নয়, তোমার জ্যোতিষী নয়। আস্ক ইয়োর্সেলফ।

অনুরূপ। —কে কি বলল, কে কি মত দিল, কিছুই যায় আসে না। আমি তোমাকে বিয়ে করছি। না করতে পারলে আই উইল বি ডুমড।

ছেড়ে যাওয়ার সময় শেষ কথা, ডিভোর্সটা তাড়াতাড়ি।

ফেরার পথে কাগজটা হঠাৎই হাতে ঠেকল।

তনুকার পাশের টুলে বসে মাঝে মাঝে চাপা স্বরে কথা বলছিল অনুরূপ। আবার কাগজে দু'চার লাইন লিখছিল।

তনুকার মনে পড়ল, ও এত তন্ময় হয়ে কথা বলছিল যে কখন অনুরূপের কাঁধে কনুই রেখে কথা বলতে শুরু করেছে খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ সচেতন হ'তেই হাত সরিয়ে নিল চমকে উঠে। লিখল :

*কাঁধে কনুই রেখেছি, বলোনি কেন?*

*অনুরূপ : ভাল লাগছিল ব'লে। ভীষণ ভাল লাগছিল।*

এরপরই তনুকা হেসে উঠেছিল।

*অনুরূপ : হেসে উঠলে কেন ?*
*তনুকা : তা না হ'লে গম্ভীর হতে হ'ত। হেভি স্টাফ ! এরকমভাবে শুধু কথা দিয়ে কেউ কখনও আমার মাথা ঘোরায়নি।*

## দশ

ক'টা দিন সেন্টারে যায়নি, একেবারে ডুব মেরেছিল। তা নয়, ও একটা ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে এ ক'টা দিন। বিশ্বভুবন ভুলে গিয়েছিল। একটা ফোন করে জানানো বা একটা চিঠি পাঠানোর কথাও মনে ছিল না। চলেই তো যাচ্ছি। বিয়ে, তারপর সুরাট। কেমন শহরটা তনুকা জানেও না। শুধু মনে হয়েছিল একবার প্লেগ হয়েছিল।

তপতী ঠাট্টা করে বলেছিল, প্লেগে মারা যাওয়া বড় কষ্টের রে।

তনুকার হঠাৎ মনে হ'ল এচেভেরিয়াকে একটা চিঠি লেখা দরকার। বৃদ্ধ খুব স্নেহ করতেন, অতিশয়োক্তি ছিল তাঁর প্রশংসায়, তনুকা তা জানে। কিন্তু প্রশংসার যে ওর প্রয়োজন। ওটুকু না পেলে নিজেকে কাজের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারত না।

চিঠিটা লিখে খাম এঁটে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। রাস্তায় কোনও পোস্ট অফিস পেলে স্ট্যাম্প লাগিয়ে ডাকে দেবে। না পারলে সান্যালদা তো আছেনই।

তারপরই একটা সঙ্কোচ ওকে পেয়ে বসল। একটু অভিমানও।

কি করে গিয়ে দাঁড়াবে ও সোয়ামির সামনে ? কি বলবেন উনি ? রেগে যাবেন ? সোয়ামি কি রেগে যান ? কেউ কেউ বলেছে, কিন্তু তনুকা একদিনও রাগতে দেখেনি। তনুকা নিজেই কি রেগে যেতে পারে না ! ওর একটু অভিমান যে না হচ্ছে তা নয়। তনুকার ওপর সোয়ামির একটা অবোধ্য টান আছে সে বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ। তা না হ'লে নিজের ঘরের খবর, নিজের জীবনেব কথা এমন অকপটে বলতে পারত না। তনুকার নিজেরও সোয়ামির প্রতি কি একটা অবোধ্য টান ছিল। অনুরূপ এসে সেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, নাকি অনেক গভীরে সুপ্ত হয়ে আছে সেটা জানে না।

অনুরূপ। সুরাট। বিয়ে। কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে হঠাৎ একদিন সোয়ামির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

আজ হঠাৎ মনে পড়তেই বুঝতে পারল। সোয়ামি একজন মানুষ নয়, আমার বস নয়, একজন বড় দরের বিজ্ঞানী নয়। স্ত্রী লিউকেমিয়ায় নিঃস্ব শূন্য রিক্ত একজন দুঃখী মানুষ নয়।

তনুকা বুঝতে পারল সোয়ামি আসলে ওর কাছে একটা প্রতীক। একটা স্বপ্নের, আশার, সম্ভাবনার।

ওর জীবনের নিঃস্বতার কথা শুনতে শুনতে সোয়ামি একদিন বলেছিল, ভুলে যেও না, প্রত্যেকটি মানুষ কিন্তু আসলে দু'জন মানুষ। একজন মানুষ একেবারে সাদামাটা, অন্য সকলের মতো সে শুধু সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকে। বাবামা'র সঙ্গে সম্পর্ক, ভাইবোন, স্বামীস্ত্রী, বন্ধুবান্ধব, প্রেম, আরও কত রকমের সম্পর্ক নিয়ে তার জীবন।

তনুকা প্রশ্ন করেছে, আরেকজন ?

—তার স্বপ্ন, আশা, সম্ভাবনা। ওসব নিয়ে সে একটা আলাদা মানুষ।

পরক্ষণে : অথচ এদের দু'জনের মধ্যে সবসময়েই একটা শত্রুতা ; একজন আরেকজনকে নষ্ট করতে চাইছে। অথচ দু'জনকে নিয়েই চলতে হয়।

অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর বলেছিল, আমি তখন রিসার্চের মধ্যে মেতে আছি। লক্ষ করিনি, হয়তো একটু আগেই ধরা পড়ত। একদম প্রথম দিকে ধরা পড়লে... দেবযানী।

তনুকা সেজন্যেই এখন হঠাৎ ধরতে পারছে সোয়ামি ওর কাছে শুধুই একটা প্রতীক।

বেশ ক'দিন ডুব মারার পর সেন্টারের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, পিছনে পিছনে আত্রেয়ী দেশপাণ্ডে।

আত্রেয়ী দ্রুত পা চালিয়ে এসে ওর পাশে।

—তনুকা, তুমি আসোনি কেন এতদিন।

তনুকাকে হাসতে হ'ল, কিন্তু জবাবটা উপেক্ষার। —আসিনি।

আত্রেয়ীকে ও কেন যে পছন্দ করতে পারছে না বুঝতে পারল না। এখনও ঈর্ষা ? ঈর্ষা কেন ? সোয়ামি এখন ওর কে ? এখন তো মনপ্রাণ ভরে একজনই। অনুরূপ। সোয়ামি কখনও কি কিছু ছিল ওর ? কিছুই না। তবে ?

আত্রেয়ী হঠাৎ বললে, সোয়ামিকে তোমার একটা ফোন করে জানানো উচিত ছিল। প্রতিদিন আমাদের ঘরে রাউন্ড দেবার সময় এসেছেন, তোমার খালি চেয়ারটা ধরে জিগ্যেস করে গেছেন, আসেনি।

এ মেয়েটা কি বলতে চায় ? সোয়ামি আমার প্রেমে পড়ে গেছে ?

আত্রেয়ী ধীরে ধীরে বললে, হি নীডস ইয়োর কম্পানি।

একটু থেমে, অ্যান্ড দি সেন্টার নিডস হিম।

কি হ'ল কে জানে তনুকার মধ্যে একটা প্রচণ্ড অভিমান ফেটে পড়তে চাইল। তা হ'লে এরা ওকে আর সোয়ামিকে নিয়ে একটা স্ক্যান্ডাল রটিয়েছে। হি নীড্‌স্ ইয়োর কম্পানি। কিন্তু কেন. কেন, কেন।

দু'দিন বাদেই যখন অনুরূপকে বিয়ে করে চলে যাবে তখনই এই স্ক্যান্ডালের জবাব পাবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অভিমান বুক ঠেলে উঠতে চাইল। তুমি রোজ গিয়ে আমার চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে স্পর্শ পেতে চেয়েছ। 'আসেনি' কথাটা শুনতে হয়তো ভালই লাগেনি। কিন্তু এতই যদি তুমি আমার জন্যে ফীল করো, না গেলে একটা অভাব অনুভব করো, তা'হলে একদিন বাড়িতে ফোন করে জানতে পারনি ? গাড়ি তো আছে, ঠিকানাটাও মুখস্থ রেখেছ, প্রথম দিনই বুঝেছিলাম, তা হ'লে একদিন চলে যেতে পারনি ? মেয়েটা বেঁচে আছে না মরে গেছে খবরটা নিতে কি হয়েছিল ?

অভিমান কি ওর চোখ ভিজিয়ে দিল নাকি ?

ঘরে ঢুকতেই সোয়ামির মুখে এমন এক বিদ্যুতের আলো চমকে উঠে স্থির হয়ে রইল, পলকের মধ্যে তনুকার সব রাগ অভিমান উবে গেল। ওর মনে হ'ল আত্রেয়ী ঠিকই বলেছে, আমাকে ওর প্রয়োজন। আত্রেয়ীর ওপর একটু আগে বিতৃষ্ণায় মন ভরে গিয়েছিল। মনে মনে বলল, আত্রেয়ী, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে বসার আগেই বলল, আমি প্রেমে পড়েছি। আমি বিয়ে করছি।

—সত্যি ? কবে ?

ওর ডিভোর্সটা যে এখনও বাকি, সে কথাই বোধহয় ভুলে গিয়েছিল।

তপতী সব শুনে হাসতে হাসতে বলল, প্রেম বিয়ে এ সব শুনে হাঁড়িমুখের মুখটা কেমন হয়ে গেল দেখিসনি ?

—না তো। বেশ খুশিই মনে হ'ল। বলল, আমি সুখী, কারণ তুমি সুখী হতে যাচ্ছ।

কথাটা বলেই তনুকার মনে হ'ল সে সময় সোয়ামির মুখ তো লক্ষ করিনি। মুখের কথাই কি সব নাকি। বুকের ভেতরে আরেকটা মুখ লুকিয়ে থাকে। সেটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল কি না কি করে জানব। কিন্তু ম্লান হবে না কেন। সম্পর্ক যত দুর্বোধ্যই হোক,

আমাকে যার প্রয়োজন, ছেড়ে চলে গেলে তার মনে ব্যথা লাগবে না ?

কিন্তু তনুকার ওসব কথা ভাবার সময় কোথায় ।

ও সোয়ামিকেই বলল, তোমার চেনা কোনও উকিল আছে, ডিভোর্সটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়...

আশ্চর্য, ছেলেটি কে তা জানতেও চাইল না সোয়ামি ।

হাসতে হাসতে বলল, উকিল ? আছে একজন, দেখি ।

তারপর মুখের দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললে, থিঙ্ক টোয়াইস বিফোর ইউ টেক এ ডিসিশন ।

ডিভোর্স নিয়ে তনুকার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। প্রদীপ্ত আগেই বলে রেখেছিল, সেদিনও ফোনে বলল, ও নিয়ে তোমাকে কোনও দুর্ভাবনায় পড়তে হবে না। মিউচুয়েল ব্যাপার, যা করতে বলবে, পেপার্স পাঠিয়ে দিয়ো সই করে দেব ।

একটু পরে কেমন যেন গাঢ় গলায় বললে, তনু, যাই করো একটু ভেবেচিন্তে করো ।

যেন তনুকা না ভেবেচিন্তে কিছু করতে যাচ্ছে, কখনো কিছু করেছে ।

ও সামনে একটা আনন্দের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছে, একজন ওকে প্রগাঢ় ভাবে ভালবাসতে চায়, ভালবেসেছে। আর তনুকার মনে হচ্ছে অনুরূপের ওপর নির্ভর করা যায়। এখনই তো বড় একা লাগে, শূন্যতা। যখন ষাট বছর বয়েস হবে, কে থাকবে ওর পাশে। তখন তো বাবামাও থাকবে না। ছেলেবেলা থেকে তনুকার মাঝেমাঝেই মনে হ'ত, আমার যদি একটা ছোট ভাই থাকত, কিংবা দাদা, খেলার সঙ্গী পেতাম। একই ছবির বই দু'জনে ভাগাভাগি করে দেখতাম। একসঙ্গে কত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পেতাম।

বয়েস হয়ে সেই অভাবটা আরও বেশি করে বুঝেছে। বুঝছে ।

তপতী একদিন বলেছিল, তোর একটা দাদাও যদি থাকত, কিংবা ভাই ।

—কি এমন সুবিধে হ'ত শুনি ?

তপতী হেসেছে। — তোর তো নেই, তুই বুঝবি না। সম্পর্ক যেমনই হোক, নির্ভর করার মতো মানুষ। দাদা ছাড়া আর কার কাছেই বা তুই গিয়ে প্রাণ খুলে কাঁদতে পারবি। বাবা মা ? তাদের কাছে কান্না লুকোতে হয়। পাছে কষ্ট পায় ।

সেলফিশ। তোমরা ভীষণ স্বার্থপর। বাবা আর মা'র উদ্দেশে যেন বলল। তোমরা শুধু নিজেদের সুখসুবিধের কথা ভেবেছ ।

সেই যে মেজগিন্নি একদিন এসে বলেছিল, তোমার আর কি সুপর্ণা, ঝাড়া হাত পা, একটি মাত্র মেয়ে...

তখন শুনতে ভালই লেগেছিল, একটু বোধহয় গর্বও হয়েছিল, আমি তো বাড়ির রাজরাজেশ্বরী ।

কিন্তু যতই বয়েস বাড়ছে, মনে হচ্ছে একজন দাদা থাকলে কি ভালই না হ'ত। এরকম একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়ানো ভালবাসার দিনে তার কাছে সব কথা বলা যেত। পরামর্শ পাওয়া যেত। পৃথিবীতে আর কে আছে যার কাছে সব কথা বলা যায়। সকলেই তো নিজের নিজের স্বার্থের দিকে টেনে বিচার করবে। মুখে যাই বলুক, প্রদীপ্তও চাইবে যেমন আছে এমনই থাকুক। অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে ভাবভালবাসা হ'লে নিজেই বলবে, ডিভোর্স করো ।

সোয়ামি উকিলের খবর নেবে বলেছে, কিন্তু অনুরূপকে বিয়ে করতে চাই বললেই কত কি বলবে কে জানে। হয়তো বলে বসবে, লোকটাকে আমি চিনি, মোটেই ভাল লোক নয়। কারণ ওর যে স্বার্থ জড়িত রয়েছে। ভেতরে ভেতরে চাপা প্রেম কি না কে

জানে। হয়তো ভাবছে বিয়েটা না করলে একটু একটু করে একদিন আমি ওর হাতের মুঠোয় চলে যাব। তা না হ'লে আত্রেয়ীর চোখেও পড়বে কেন। 'হি নীড্স ইয়োর কম্পানি।' কেন, তুমি কি করছ, তুমি তো ওকে কম্পানি দিতে পারতে। দাও কি না তাই বা কে জানে। অত বিজ্ঞানপ্রীতি আমি অনেক দেখেছি। লিউকেমিয়া জেনেও স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলে ছেলের কাছে, সে বম্বের হাসপাতালে, আর তুমি খুঁজতে বেরোলে তার সহপাঠিনী বন্ধুকে, এই আত্রেয়ীকে, কেন না সেও সমান 'ব্রিলিয়ান্ট জেনেটিসিস্ট'। কেউ বিশ্বাস করবে এ সব কথা। তুমি আসলে আমার কাছে প্রমাণ করতে চাইছিলে তুমি কত মহৎ।

এই সোয়ামিকে যদি জিগ্যেস করি অনুরূপকে আমার বিয়ে করা উচিত কি না, ও তো এক কথায় নাকচ করে দেবে।

সকলের কাছে স্বার্থটাই বড়, আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কারও কোনও দুর্ভাবনা নেই।

সোয়ামি প্রথমেই বলে বসবে, তুমি কি পাগল হয়েছ, তোমার চেয়ে বয়েসে এত ছোট। ওর যখন আটত্রিশ বছর বয়েস হবে, তুমি ?

তখন তোমার মনেও পড়বে না, তুমি কি করে এই বয়েসে আমার বন্ধু হয়ে গেলে।

সবচেয়ে আপন তো মা। অথচ মাকে জিগ্যেস করলে কোনও স্পষ্ট জবাব দেবে না। মা জানে আমার কাছে কারও কোনও যুক্তির দাম নেই। ভাববে এই জেদি মেয়েটাকে বাধা দিলে ও আরও এগিয়ে যাবে। কারও নিষেধ মানবে না। বলে বসবে, যা ভাল বুঝিস কর।

কেউ বুঝবে না, কেউ বিশ্বাস করবে না, ওর জীবনে অনুরূপের মতো কেউ কখনও এভাবে এগিয়ে আসেনি। এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এসে বলেনি, আই ওয়ান্ট টু ম্যারি ইউ।

সেই রেস্টুরেন্টে 'হোয়াট এ কাপ্ল' বলে যখন তনুকা হেসে উঠেছিল, অনুরূপ ওর চেয়ে বয়েসে এত ছোট জেনে, তখনও বলেছে, আমি আমার ডিসিশন বদলাতে রাজি নই।

বিবাহিত জেনে একটু থমকে গিয়েছিল। মুখ ফ্যাকাশে, কিন্তু তারপর সব শুনে প্রশ্ন করেছে, ডিভোর্সটা আমার জন্যে করছ না তো ?

—না।

ধীরে ধীরে বলেছিল, আমি নিজের স্বার্থের জন্যে কারও সংসার ভাঙতে চাই না।

হাউ গ্রেট। এমন লোকের সঙ্গে সোয়ামির তুলনাই হয় না। লোকটাকে এখন আরও দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

ও কি চায় ? 'হি নীডস ইয়োর কম্পানি'। কথাটার মধ্যে একটা প্রেম প্রেম গন্ধ রয়েছে। আত্রেয়ী যাই বলুক, সেটা অবশ্য বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। ওটা আসলে আত্রেয়ীর জেলাসি। কই, কোনওদিন তো আমার কাঁধে হাত রাখতে যায়নি, তা হ'লে সেদিন তোমার কাঁধেই বা ওভাবে চাপড় দিল কেন ! উৎসাহ দেখানো ?

প্রথমে আত্রেয়ীকে ভিড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। পরে নিজেই কেন কোল্যাবরেট করতে চাইলে জানি। নতুন একটা ব্যাকটিরিয়া তৈরি করার যে স্বপ্ন আমি দেখিয়েছি, তুমি তার মধ্যে একটা সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছ। জেনেটিকসের ব্যাপারগুলো তো তুমি জানো, হয়তো খুবই সহজ। তাই আমার পরিশ্রম থেকে তুমি খ্যাতি চাও। অথবা আমারই সাকশেস দেখিয়ে সেন্টারটার নাম বাড়াতে চাও। তাতে তোমারই খ্যাতি।

তা না হ'লে সোয়ামি কেন বলল, ডিসিশন নেবার আগে দুবার ভেবে দেখো।

কথাটা ডিভোর্স সম্পর্কে, নাকি বিয়ে সম্পর্কে ? তনুকা জানে না।

একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। পরিচ্ছন্ন সুন্দর তালাওগুলোর স্থির জলের ধারে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে বসল শ্বেতপাথরের সিঁড়ির ওপর। ও আর অনুরূপ। পাশাপাশি।

অনুরূপের একটা হাত আলতো ভাবে এসে ওর কাঁধে পড়ল।

শরীরের মধ্যে মুগ্ধতার কি এক শিরশিরে আনন্দ। কি পরম নির্ভরতা। তনুকার সমস্ত শরীর লুটিয়ে পড়তে চাইছিল অনুরূপের আলিঙ্গনে।

একটু আগে পুকুরটার ধার দিয়ে হেঁটে আসার সময়ে জলের ধারে একটা সুন্দর ফুল ফুটে থাকতে দেখে তনুকা লাফিয়ে উঠেছিল : আরে এত চমৎকার একটা ওয়াটার লিলি এখানে ?

ফুলটা তনুকার চেনা, আমেরিকায় দেখেছে, তাই লাফিয়ে উঠেছিল।

মার্বেলের সিঁড়িতে বসে থাকতে থাকতে একজন গার্ড এগিয়ে এল, গার্ড না মালি কে জানে।

অনুরূপ তাকে ডেকে বলল, ওই ফুলটা এনে দাও, টাকা দেব।

পকেট থেকে পার্স বের করে দশটা টাকা এগিয়ে দিল।

লোকটা প্রথমে একটু দ্বিধা দেখাল, তারপর ফুল আনতে চলে গেল।

এনে দিতেই লোকটাকে টাকা দিতে গেল অনুরূপ, নিল না সে।

হেসে বললে, 'এটা দিদির জন্যে'।

অনুরূপ একটু ঘা খেল যেন। টাকা নেবে না কেন!

আর লোকটা ফুল নিয়ে এসে 'এটা দিদির জন্যে' বলেছে বলে তনুকা খুশি হল, একটা উচ্ছল হাসি উপহার দিল লোকটিকে।

সেই ওয়াটার লিলি তনুকার হাতে দিল অনুরূপ।

(ধুৎ, তুমি তো আমার খোঁপায় পরিয়ে দিতে পারতে, সেটুকু রোমান্টিক হতে পারছ না ? সব সময় তোমার মধ্যে একটা ব্যবসাদার উঁকি দেয় কেন ?)

অনুরূপ বললে, বিয়ের পর সুরাটে আমাদের বাড়ির সামনে এই রকম একটা ছোট্ট ট্যাঙ্ক বানাব, অনেক ওয়াটার লিলি এনে বসাব।

একটু থেমে বললে, আমি তো বিয়ে করবই না ঠিক করেছিলাম। ছেলেবেলায় একবার সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছে হয়েছিল। গুরুমা মাথায় হাত দিয়ে বললে, তুই সন্ন্যাসী হবি কি রে, তোর যে অনেক টাকা হবে।

গুরুমা, গুরুমা। শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তনুকার। ও প্রেমের কথা শুনতে চাইছে, স্বপ্নের কথা।

অনুরূপ হঠাৎ বললে, এই ওয়াটার লিলিটা ওখানে দেখে তুমি লাফিয়ে উঠলে আনন্দে। আমিও এত জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছি, এত তালাও দেখেছি, ফুল দেখেছি, শেষে এই কলকাতায় এসে একটা লিফটের সামনে একটা সবচেয়ে সুন্দর ওয়াটার লিলি দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এই ফুলটা আমার চাই, না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ।

তনুকা কৌতুকের হাসি হাসল। শুনতে ভালই লাগল।

(ফুলটা পাওয়ার জন্যে দশটা টাকা কাকে দেবে ঠিক করতে পারছ না বলে আমাকেই বারবার তোমার ঐশ্বর্যের কথা শোনাচ্ছ। পুকুর কাটিয়ে কয়েক শো ওয়াটার লিলি লাগিয়ে দেবে বাড়ির সামনে। কিন্তু তা দেখে কি আমি আজকের মতো অবাক হব ?)

তপতী বললে, দিব্যি রোমান্টিক। প্রেমই মনে হচ্ছে, গভীর প্রেম ?

তনুকা হেসে বললে, তারপর শোন। হঠাৎ মেঘ দেখা দিল আকাশে। বৃষ্টি আসবে

মনে হ'ল। বাড়ি যেতে চাইলাম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, বেরিয়ে পড়ার সময়।

—তারপর ? তপতী জিগ্যেস করল।

—তারপর ? অনুরূপ বললে, বাড়ি কেন যাবে, চলো আমার হোটেলে। ওখানে ডিনারের পর তোমাকে পৌঁছে দেব।

তপতী একেবারে চুপ করে গিয়েছিল। কোনও কথা বলেনি। বুঝতে পেরে তনুকা হেসে উঠেছে। —যাইনি রে বাবা, যাইনি।

## এগারো

এমন একটা সমস্যার সামনে এসে দাঁড়ায়নি কখনও তনুকা। ক'দিন আগেও ওর ধারণা হয়েছিল জীবন বুঝি নতুন করে শুরু হতে চলেছে।

এখনও পারে একটা নতুন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে। সমস্ত কিছু ওর ইচ্ছের ওপরই নির্ভর করছে। কিন্তু সেই ইচ্ছের সামনে বারবার একটা দ্বিধা এসে দাঁড়াচ্ছে। কেন। এই দেয়ালটাকে সরাতে পারছে না কেন ?

সোয়ামি ওকে একদিন সেই উকিল ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

সব শুনে বললেন, মিউচুয়েল হলে তো কোনও প্রবলেমই নেই। কিন্তু ছ'সাত মাস সময় তো লাগবেই।

তখনই কি রকম হতাশ লেগেছে তনুকার। ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠেছে, আই হ্যাভ মেড এ মেস অফ মাই লাইফ। ডিভোর্সটা আগে থেকে নিয়ে রাখতে যে কি হয়েছিল। অথচ সবাই বলেছে ডিভোর্সটা করে রাখ।

শোনেনি। কেন যে শোনেনি তাও জানে না।

প্রদীপ্তকে কথাটা বলতে সঙ্কোচ ছিল ? বলতে ভয়, হঠাৎ কি ভাবে নেবে ! সেই তো বলতে হ'ল শেষ অবধি। কথাটা সে হাসিমুখেই নিল, অন্তত স্বাভাবিক কণ্ঠে।

বললে, সব ব্যবস্থা করে রাখ, আমি যাব সে সময়। কোনও অসুবিধে হবে না।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ। রিসিভার কানে তনুকা।

প্রদীপ্তর গলা। —তারপর কি আর দেখাই হবে না ? সেরকম কোনও শর্ত আছে নাকি, তোমার হবু বরের সঙ্গে !

তনুকা বললে, দীপ, তুমি বলছ এ কথা ? শর্ত দিয়ে কি আমাকে বাঁধা যায় ?

আবার চুপচাপ।

প্রদীপ্ত বললে, বেশ খারাপ লাগবে জানি। এখনও লাগে। কিন্তু চেষ্টা করেও তো নিজের স্বভাব বদলাতে পারলাম না।

আবার চুপচাপ।

—কখনো যদি দেখা হয়, তুমি যদি আস কখনও, প্লীজ তনু, অচেনা করে দিয়ো না। আই ফীল ফর ইউ, আমি চাই তুমি সুখী হও।

তনুকার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল।

এই মানুষটার সঙ্গে ও এতকাল পাশাপাশি কাটিয়ে এসেছে। সবাই বলে, বোকার মতো জীবনটা নষ্ট করলি। আর সব ব্যাপারে তোর এত বুদ্ধি, অথচ...

একটা সরল কথা কেউ বুঝতে পারে না। মানুষের যেমন একটা মস্তিষ্ক আছে, সেটাই তাকে চালনা করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার একটা হৃদয়ও আছে। তনুকা সব সময় সকলের কাছে জাহির করে এসেছে, ওর শুধুই মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় নেই। ওটা সেই ছেলেবেলায় ঘা খাওয়ার অভিমান। নিজেকেই বোঝাতে চেয়েছে, আমার শুধুই একটা হেড, হার্ট বলে

কোনও বস্তু নেই।

অথচ সেই হৃদয়ের কাছেই ও কত দুর্বল।

—তোমাকে কখনো অচেনা ভাবব এ কথা ভাবলে কি করে। আমি তো মানুষ, না অন্য কিছু।

একটু থেমে : দু'জন বন্ধু দুরে দূরে থাকলেই কি দূরে চলে যায় ? দেখা হলেই মনে হয় এই তো সেদিন বসে গল্প করেছি। দু'জনেরই জীবনের কাছে অনেক চাহিদা থাকে, সেজন্যেই দুরে সরে যায়। কিন্তু বন্ধুত্ব বিদায় নেয় না।

বলতে বলতে নিজেকে সংযত করল তনুকা। ওর গলার সুর এরপর গাঢ় হয়ে যেতে পারে। তাতে ওর চেয়ে প্রদীপ্তর ক্ষতি বেশি। হয়ত আবার আশা পাবে। অথচ ও নিজেও জানে আইনের সম্পর্কটা টেকানো যায় না।

সান্ত্বনার স্বরে বললে, দীপ, একটা কথা বলব ?

—বলো।

—যদি তেমন কাউকে মনে ধরে, বিয়ে কর। আমি চাই, তুমিও সুখী হও।

একটু থেমে বললে, তখনো আমি তোমার বন্ধুই থেকে যাব।

ফোন নামিয়ে রাখল তনুকা।

মুখে যতটুকু বলল, তার চেয়েও বেশি বুকের গভীরে গিয়ে নাড়া দিল। মন বিষণ্ণতায় ভরে গেল। অথচ এই প্রদীপ্তর বিরুদ্ধে ওর অভিযোগের অন্ত নেই। ওর জন্যেই তনুকার জীবন শূন্যতায় ভরে গিয়েছিল। নাকি নিজেরই নির্বুদ্ধিতা।

সেদিনের সেই কথাগুলো মনে করতে করতে বার বার মনে হয়েছে, প্রদীপ্তর কাছেই কি পরামর্শ চাইবে।

এক দিকে দ্বিধা, সংশয়। আরেকদিকে উজ্জ্বল আনন্দের স্বপ্ন।

কার কাছে গিয়ে ও দাঁড়াবে। প্রশ্ন করবে ?

সুপর্ণা বললেন, তুই যা ভাল বুঝিস। তুই তাকে কতখানি চিনেছিস সে তো আমার জানার কথা নয়।

তনুকা বেশ বুঝতে পারে ওটা মা'র মনের কথা নয়। বোধহয় বাধা দেবার সাহসই পাচ্ছে না। বাধা দিলে যদি জেদের বশে ভুল করে বসে সেই ভয়ে।

ওর মনের এই সংশয় দূর করতে ও কার কাছে যাবে। একবার মনে হয়েছিল, সব কথা খুলে বলে ফেলে প্রদীপ্তকেই জিগ্যেস করে। কিন্তু জিগ্যেস করলে সে তো তার স্বার্থের দিক ভেবেই বলবে। সে চায় সম্পর্কটা থাকুক, অন্তত আইনের বন্ধনে।

সোয়ামি প্রথমে এমন ভাব দেখিয়েছিল যে সে দারুণ খুশি। মনে মনে হয়ত ভেবেছে, যাক্ মেয়েটার হিল্লে হয়ে গেল। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করার ঢঙে যে বলেনি, সুখী হও, সেটাই সান্ত্বনা।

আসলে এরা কেউই বুঝতে পারছে না তনুকা নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করছে। যতই ভাবছে ও যেন ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছে। দাঁড়াবার শক্তিটুকুও নেই।

প্রদীপ্ত জানতে চাইল না ওর সেই ভালবাসার পাত্রটি কে। সোয়ামিও জানতে চায়নি। চায়নি, কারণ সে জানে একদিন তনুকা নিজেই বলবে। সোয়ামির কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গেছে তনুকা তার কাছে কোনও কিছুই লুকোবে না। লুকোতে জানেও না ও।

সোয়ামিকে একদিন বললে, আমি তো তাকে ভীষণ ভালবাসি। ভালবাসার চেয়ে বড় কিছু আছে ?

সোয়ামি হাসতে হাসতে বললে, আমি জেনেটিক সায়েন্সের লোক, আমি জীবনকে এক

ভাবে দেখি। তুমি মাইক্রোবায়োলজিস্ট। তোমার মাইক্রোসকোপে জীবনের চেহারা আরেকরকম। তোমাকেই ডিসাইড করতে হবে কি করবে।

—তা হ'লে আর তোমার কাছে এলাম কেন।

তপতী একটুও হাসাহাসি করল না। বেশ গম্ভীর ভাবেই বললে, ঝটাপট ক'টা দিনের মধ্যে প্রেম হয়ে গেল, এইসব চারিচক্ষুর মিলনে আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। প্রেম গড়ে ওঠে তিলে তিলে।

—তালে তালে নয় কেন ?

তপতী এবার হেসে ফেলল। এই মেয়েটা কোনও সময়েই সিরিয়াস হতে জানে না।

একটু আগেই বলেছে, বুকের মধ্যে ভীষণ ব্যথা হয় রে, আর এখন ঈষৎ দুষ্টুমির রসিকতা করতেও ছাড়ছে না।

সোয়ামি বলেছিল, লুক হিয়ার তনুকা, নিজের ভালবাসাকে আগে যাচাই করে দ্যাখো। দু'ধরনের ভালবাসা হয়। একটা নিজের হৃদয় থেকে উঠে আসে। আরেকটা তার ইগো। আমাকে একজন ভীষণ ভালবাসে, আমার ইগো চরিতার্থ হচ্ছে, অতএব তাকে ভালবাসার প্রতিদান দিয়ে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

হেসে বলেছে, তোমার মাইক্রোসকোপে ফেলে দেখে নাও।

এরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা বলছে। সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হবে।

জীবনে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তনুকা কখনও কারও মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেনি। সব সিদ্ধান্ত ও নিজেই নিয়ে এসেছে, নিতে পেরেছে। শুধু প্রদীপ্তর বেলাতেই একটা বড় রকমের ভুল হয়ে গিয়েছিল।

আসলে জীবনের সিদ্ধান্ত ও কখনওই নিতে পারে না।

মাত্র পনেরো দিনের জন্যে অনুরূপ টোকিও গেছে। ব্যবসাদার মানুষ, ব্যবসা খুঁজতে গেছে। এক একজন একটা জিনিস খোঁজে। তনুকা খুঁজছে একটা বা একাধিক বিশেষ ধরনের ব্যাকটিরিয়া। সিউয়েজের ময়লা জমে পাথর হয়ে গেলে তাকে জলবৎ করে দিতে পারে এমন ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার হয়ে গেছে। মাটিতে ব্যাকটিরিয়া ছড়িয়ে তাকে উর্বরতা দেওয়া যায় এমন ব্যাকটিরিয়ারও হদিশ পাওয়া গেছে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে জঞ্জাল সাফ করে দিতে পারে এমন ব্যাকটিরিয়াই বা পাওয়া যাবে না কেন ? পেট্রোলশোধন যদি করা যায়, শহরশোধন কেন নয়।

—একটা কি যেন ডিস্টার্বেন্স বারবার এই টেস্ট টিউবে এসে যাচ্ছে।

তনুকা বলেছিল সোয়ামিকে, টেস্ট টিউব হাতে নিয়ে।

দৈনন্দিন রাউন্ডে এসে প্রগ্রেস জানতে চাইছিলেন সোয়ামি।

তনুকার কথা শুনে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, ইট্‌স ইয়োর লাভ অ্যাফেয়ার।

দু'একজন হাসাহাসি দেখল। এই রকম কোনও একটা দৃশ্য দেখেই হয়তো আত্রেয়ী দেশপাণ্ডে বলতে সাহস পেয়েছিল, হি নীডস ইয়োর কম্পানি। অকারণ রেগে গিয়েছিল তনুকা, এই সোয়ামির ওপরেই।

আসলে তনুকারই দোষ।

ও তখন অনুরূপকে ভালবেসে ফেলে এমন একটা স্বপ্নের রঙিন জগৎ বুনে ফেলেছে সকলের সামনে, যে হাজারো দ্বিধা সত্ত্বেও পিছিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না। মুখ ফুটে বলতেও পারছে না, আমি দ্বিধাগ্রস্ত।

ওর বুকের মধ্যে যখন যন্ত্রণা নিঙড়ে উঠেছে, একবার মনে হয়েছিল, এত তো টাকার কথা শুনিয়েছ, টাকার পিছনে ছুটছ, টোকিও থেকে একটা ফোন করতে পারো না ?

তনুকার সে কথা বলতে লজ্জা বা সঙ্কোচ হয়েছিল। তুমি তো হঠাৎ একটা ফোন করতে পারতে।

তার বদলে ! ফিরে এসে ফোন করব।

অর্থাৎ ব্যবসার নেশায় ছোটাছুটি করার সময় আমার জন্যে পাঁচটা মিনিট সময় খরচকেও তোমার অপব্যয় মনে হয়েছে। শুধু সময়, না ওই লং ডিসটেন্সের টাকাটাও ?

শেষ অবধি কে তেমন বন্ধু আছে যার কাছে সব কথা বলে নিজের সংশয় কাটানো যায় ভাবতে গিয়ে সোয়ামি ছাড়া আর কারও কথা মনে এল না। একবার একটা ক্ষীণ সন্দেহও উঁকি দিল, আমি কি ওই হাঁড়িমুখ টাকমাথার...

বুকের ভেতর থেকে কে যেন ছি ছি ছি ছি করে ধিক্কার দিয়ে উঠল। রেগে গিয়ে মনে মনে বলল, অনুরূপ, তুমি আমার কি ক্ষতি করে দিয়েছ তুমি নিজেই জানো না। ইউ হ্যাভ স্পয়েল্ট এ পীসফুল হ্যাভেন। নোঙড় ফেলে শান্তিতে থাকার মতো একটা বন্দর পেয়েছিলাম, তুমি সেটা নষ্ট করে দিয়েছ। আমি সোয়ামিকে আবার হাঁড়িমুখ টাকামাথা ভাবতে পারছি।

—তোমার কি আজ একটু সময় হবে ? সেই আলোর ঝর্নার ধারে গিয়ে একবার বসতে চাই।

তনুকা সোয়ামিকে বলল।

সোয়ামি তনুকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমাকে আজ খুব অশান্ত লাগছে। ডিস্টার্বড ?

ওর এক এক সময় মনে হয় এই লোকটা যেন অন্তর্যামীর মতো মানুষের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়। অন্তত আমাকে। আমি তো হাসি হাসি মুখ করেই গেলাম, কথা বললাম, ও কি করে বুঝতে পারল আমার মধ্যে একটা অশান্ত ঢেউ উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষুব্ধ ভাবটা গোপন করার চেষ্টা কবেও পারল না। —তোমার যাওয়ার সময় হবে কিনা বলো না। অর আর ইউ হেটিং মাই কম্পানি নাও !

কথাটা বলে ফেলেই তনুকা নিজেই অবাক হয়ে গেল। এমন ধরনের একটা রূঢ় কথা ও সোয়ামিকে বলতে পারল কি করে। ধীরে ধীরে সোয়ামির ওপর কি ওর একটা অধিকারবোধ জন্মে যাচ্ছে নাকি। অথবা ও ভেতরে ভেতরে সন্দেহ করতে শুরু করেছে যে ও প্রেমে পড়েছে, ও বিয়ে করতে চলেছে, এই খবরটায় মুখে যতই হাসি ফোটাক, সোয়ামি আসলে জেলাস হয়েছে, অথবা আঘাত পেয়েছে। হয়তো সেজন্যেই সঙ্গে সঙ্গে রাজি না হয়ে ও ডিস্টার্বড কিনা জানতে চাইছে। হয়তো এরপর বলবে, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নাও, তুমি আজ ক্লান্ত।

যতখানি সুর নরম করা যায় সেভাবেই বলল, তুমি যেতে পারবে কিনা সেটাই জানতে চাইছি।

সোয়ামি হেসে বলল, কেন, তোমার বাড়িতে কি কোন লুকিংগ্লাস নেই ?

তনুকা বুঝতে পারল না, অবাক হয়ে বললে, আয়না ? অবশ্যই আছে।

—সে আয়নায় তুমি নিজেকে দেখতে পাও না ?

ভুরুতে প্রশ্ন এঁকে তনুকা তাকাল সোয়ামির মুখের দিকে।

সোয়ামি হাসতে হাসতে বলল, সেই আয়নায় তুমি নিশ্চয় দেখেছ এবং জানো যে তুমি কোয়াইট অ্যাট্রাকটিভ, সুন্দরীই বলা যায় ?

কথাটা শুনতে ভালই লাগল ওর। হেসে ফেলল।

সোয়ামি আবার বলল, তুমি জানো এই সোয়ামি নামের লোকটা সারাজীবন কাটিয়ে এসেছে শুধু ডি এন এ আর আর এন এর হিসেব রেখে রেখে। ল্যাবের অন্ধকূপেই কেটে

গেছে বেশির ভাগ জীবন।

তনুকা অধৈর্য হয়ে উঠছিল। এই মানুষটাকে এত কথা বলতে কখনো দেখেনি। চুপচাপই থাকে। যা কিছু কথা সে তো ও নিজেই বলে, সোয়ামি শুধু শোনে। মাঝে দু'একটা মন্তব্য শুধু। কোনও কোনওদিন একেবারে গুম হয়ে থাকতেও দেখেছে, ওকে রিল্যাক্সড অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে তনুকাকেই চেষ্টা করতে হয়েছে কৌতুককর কথা বলে।

মুখ খুলেছিল শুধু একটা দিনই। যেদিন নিজের স্ত্রীর কথা বলেছিল। দেবযানীর লিউকেমিয়ার কথা, আত্রেয়ী দেশপাণ্ডের কথা, রাত্তিরে ফিরে গিয়ে টেলিফোনের সামনে অসহ্য উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকার কথা বলেছিল।

সে সব কথা তনুকাকে যে খুব একটা স্পর্শ করেছিল তা নয়। মুহূর্তের জন্যে একটা সন্দেহও দেখা দিয়েছিল, এসব বলে সমবেদনা আদায় করার চেষ্টা করছে না তো ? তার পরই হয়তো প্রেম নিবেদন করে বসবে।

সেই যে বাইরে কোথায় গিয়েছিল, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, দিল্লি গিয়েছিল সেন্টারের জন্যে টাকা আদায় করতে, ফিরে আসার পর : এই দুটো দিন তোমাকে ভীষণ মিস করেছিলাম, সারাক্ষণ তোমার কথা মনে পড়ত।

তনুকা নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল, ও কতখানি কঠোর হতে পারে ভেবে। বলে উঠেছে, কই, আমি তো তোমার কথা ভাবিনি।

সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল সত্যি কথাই বলছি, কিন্তু পরে ভেবে দেখেছে তনুকাও তো ওর কথা ভেবেছিল। সারাক্ষণ, হ্যাঁ সারাক্ষণ। শুধু নিজেই সচেতন ছিল না।

প্রেম, ভালবাসা নয়। প্রেম কি তা ও জানতে পেরেছে অনুরূপের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর। অনুরূপ ওকে প্রেম চিনিয়েছে। তা হ'লে সোয়ামির সঙ্গে সম্পর্কটা কি ? বন্ধুত্ব ? একটা আটান্ন বছরের লোকের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ? এ রকম একটা সম্পর্কের অন্য কোনও নাম হয় না কেন ? এই যে প্রদীপ্ত, আইনের বাঁধন কেটে যাওয়ার পরেও, তুমি তো আমার বন্ধুই থাকবে। কেন বলেছে ? কারণ এই সম্পর্কগুলোর আর কোনও নাম নেই, তাই। অথচ প্রত্যেকটি সম্পর্কের এক একটা পৃথক নাম থাকা উচিত ছিল।

—যাবে না ? একটু কঠোর শোনাল কথাটা।

আসল উত্তরটা না দিয়ে সোয়ামি অনেক আজেবাজে কথা বলছে। মনে হ'ল তনুকার।

সোয়ামি ওর রাগ দেখে হেসে ফেলল। বলল, এই রকম এক সুন্দরী মহিলা, কোয়াইট অ্যাট্রাকটিভ, সে বলছে...

তনুকা হেসে ফেলে বলল, মহিলা নয়, এ বেবি...

সেই যে আমেরিকায়, এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে বলেছিল, 'হোয়াই আর ইউ উইপিং বেবি', সে কথাটা মাঝে মাঝেই সোয়ামিকে মনে পড়িয়ে দিয়ে কৌতুক করেছে এর আগেও।

সোয়ামি হেসে বলেছে, কি করবো বলো, তুমি যে বয়েস-চোর জানব কি করে।

—সেটাই তো এখন একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ...আসল কথাটা কিন্তু তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ !

সোয়ামি বলল, এই আর্টিফিসিয়াল লাইটে জীবন কেটে গেছে, এই বদ্ধ হাওয়ায়। তুমি এসে বলছ, ফাঁকা মাঠে প্রচুর অক্সিজেন খাওয়াবে, বিকেলের আলো দেখাবে, সন্ধে হয়ে গেলে হয়তো আকাশে তারাও দেখতে পাব, দিস ওলড ম্যান হ্যাজ নট দি পাওয়ার টু সে নো।

—এই ইয়াং বেবিকে কিন্তু তার জন্যে অনেক তোষামোদ করতে হ'ল।

সোয়ামি হেসে বলল, হাউ লাকি আই অ্যাম !

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দিয়ে আলোর ঝর্নার দিকে যেতে যেতে ছোট্ট একটা কথা মাথার মধ্যে ঘুরল। আচ্ছা, এই জায়গাটা তো আমাকে সোয়ামিই চিনিয়েছিল, আমরা একটা বেঞ্চিতে গিয়ে পাশাপাশি বসেছিলাম। মনে হয়েছিল ভেতর থেকে সব শূন্যতা দূর হয়ে যাচ্ছে। আসলে শূন্যতা দূর হয়ে গেল অনুরূপ আসার পর। অনুরূপের সঙ্গে সম্পর্কটা চিনতে একটুও অসুবিধে হ'ল না। প্রেম। অথচ তাকে নিয়ে এসে সেই বেঞ্চিটাতেই কেন বসলাম, যেখানে সোয়ামির পাশাপাশি একদিন বসেছিলাম।

আলোর ঝর্নায় ঢুকেই একটা খালি বেঞ্চ দেখতে পেয়ে সোয়ামি বসতে যাচ্ছিল, তনুকা বললে, এই, না।

ও সেই পুরনো বেঞ্চ, পুরনো জায়গায় গিয়ে বসল। বললে, জানো, সেই প্রেমিককে নিয়ে এসে ঠিক এখানেই বসেছিলাম।

—আমার কি তাতে খুশি হয়ে ওঠা উচিত ? নাকি জেলাস হতে হবে ?

তনুকা হেসে ফেলে বলল, জেলাস ? কেন ? তুমি কি আমার প্রেমে পড়ে গেলে নাকি ?

সোয়ামির মুখে মৃদু হাসি। বলল, আমার মাথায় অনেকগুলো কম্পার্টমেন্ট আছে, যে কোনও ঘরের জানালা আমি ইচ্ছে করলে খুলে দিতে পারি, আবার বন্ধ করতেও পারি।

তনুকা বলল, আমিও তাই ভাবতাম। কিন্তু একটা জানালা খোলা রাখতে গিয়ে দেখছি পটাপট অন্য সব জানালাই বন্ধ করে দিতে হচ্ছে।

একটু থেমে বলল, ও এত বয়েসে ছোট, এটা কি কোন প্রবলেম ?

সোয়ামি বলল, তুমি সবই তো বলেছ আমাকে, আমি জানি। তুমি কি আমার সত্যি মতামত জানতে চাও ?

তনুকা বলল, সেজন্যেই তো তোমাকে ডেকে আনলাম।

সোয়ামি বলল, তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে, তুমি তোমার হাসব্যান্ড প্রদীপ্তকে যেদিন প্রথম দেখো, তুমি মনে মনে বলে উঠেছিলে, বাঃ। তুমি নিজে কোনদিন বুঝতে পারনি, কিন্তু আই অ্যাম সিওর, ইউ ফেল ইন লাভ উইথ হিম।

একটু থেমে বলল, বাট ইজ দ্যাট অল ?

তনুকার মুখে একটা ম্লান হাসি দেখা দিল। নিজেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। সেটাই কি সত্যি নাকি ? তা না হ'লে বারবার কেন বলেছে, কেন ভেবেছে, ডিভোর্সের পরেও বন্ধু থাকবে।

ও একদিন ভেবেছিল, আমেরিকার সঙ্গে আমার একটা লাভ অ্যান্ড হেট রিলেশন। মনে হচ্ছে, প্রদীপ্তর সঙ্গেও।

সোয়ামি বলল, ভেবে দ্যাখো, যাকে ভালবাসি ভাবছ, বিয়ে করতে যাচ্ছ, তার সম্পর্কে তোমার মনে এখনই দ্বিধা। মানে, হেট্রেড। তোমার দাঁড়িপাল্লার একদিকে সুরাটের মতো একটা শহর, পাথর বসানো আংটি, গুরুমা, স্ট্রাইক ভাঙার জন্যে যে কোনও ধরনের নিষ্ঠুরতা, টাকার পিছনে ছোটাছুটি, যাকে ডিভোর্স করছি সে যে বন্ধু থাকতে পারে তা ভাবতেই পারে না। আর অন্যদিকে তোমার ধারণা স্বর্গীয় প্রেম। যার সাম টোট্যাল হ'ল হ্যাপিনেস ইন আনহ্যাপি বণ্ডেজ। অবাঞ্ছিত বন্ধনের মধ্যে সুখ।

—উঃ, সোয়ামি, এ ভাবে বলো না। আমার কাছে অসহ্য লাগছে।

সোয়ামি বলল, এগুলো সবই কিন্তু তোমার ভেতর থেকেই উঠে এসেছে। এর একটাও আমার কথা নয়। তুমি এখন একটা দ্বিধার মধ্যে রয়েছ। কারণ এই আনহ্যাপি বণ্ডেজের অন্যদিকে আছে হ্যাপি ফ্রিডম। তোমার এই কলকাতা, তোমার এই সেন্টার,

তোমার রিসার্চ, সো মেনি ফ্রেশুস। তোমার আশা, তোমার স্বপ্ন, তোমার সম্ভাবনা। আমার মতো একজন জেনেটিসিস্টের সঙ্গে কোল্যাবরেট করে সেই ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করা, যা সমস্ত আবর্জনা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে দিতে পারে।

তনুকা সোয়ামির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আই অ্যাম নট গোয়িং টু ম্যারি হিম। না, আমি ওকে বিয়ে করতে পারব না।

সোয়ামি হাসতে হাসতে বললে, জানি, কারণ তুমি আমাকে ভালবাসো। ইউ লাভ মি।

—কি বলছ তুমি ? আর ইউ ম্যাড ? তনুকা হাসতে হাসতে বলল।

সোয়ামি বলল, তনুকা, ইউ হ্যাভ এ ওয়াইড ভিশন, অনেক বড় জিনিস তুমি ভাবতে পারো, কিন্তু এখন ইউ আর লুকিং উইথ ইওর ন্যারো আই ; ব্যাকটিরিয়া খোঁজার চোখ দিয়ে তুমি দেখছ।

সোয়ামি হাসতে হাসতে বলল, আমার এই বল্ড হেড, এই রাউন্ড ফেস, দিস ব্ল্যাক কমপ্লেকসন নিয়ে যে সোয়ামি, তার কথা আমি বলিনি। আমি বলছি অন্য একজন সোয়ামির কথা।

একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার মনে আছে, এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে তুমি যখন কান্নার গলায় বলেছিলে তুমি তোমার ফিউচারকে বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছ। আমেরিকা মানে তোমার ফিউচার।

—হ্যাঁ, বলেছিলাম।

সোয়ামি বলল, আর আমি বলেছিলাম, আমি তোমাকে তোমার ফিউচার ফিরিয়ে দেব।

একটু থেমে বলল, আমি সেই সোয়ামির কথা বলছি।

তনুকা মনে মনে বলল, জানি, জানি, আমি যা কিছু ভালবাসি, আমার স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষা, তুমিই তার প্রতীক।

## বারো

বাপী, আমার জন্মের আগেই কোন অশুভ মুহূর্তে আমার এই অশুভ নামকরণ করেছিলে। সুতনুকা। ডিকশনারি খুলে বহুকাল আগে শব্দটার মানে দেখে নিয়েছিলাম। সুন্দর, কৃশ, কমনীয়। যারা বারাণসীর সেই দেবদাসীর নামকরণ করেছিল, তারা সেই লাবণ্যময়ী মেয়েটির সুন্দর শরীরটুকুই দেখেছিল। তারও যে একটা মন আছে তার খবর নেয়নি। একজন রূপদক্ষ, দেবদত্ত না কি নাম তার, হয়তো পাথরের ওপর তার রূপ ফুটিয়ে তুলতে তুলতেই তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। দেবদাসী সুতনুকাও।

শাস্তি তারা কাকে দিতে চেয়েছিল ? নির্বাসন দিয়েছিল দেবদত্তকে। যে তার মনের দুঃখ খোদাই করে রেখে গেছে একটা গুহার গায়ে। কিন্তু শাস্তি পেয়েছিল আসলে সুতনুকা।

আমার নাম কেন তুমি সুতনুকা রেখেছিলে ! আমার এই শরীর ছাড়া আর কেউই কিছু কেন দেখতে চায় না। কেন বোঝে না আমারও মন বলে কিছু আছে।

শুভব্রত বললেন, তুই উঠে দাঁড়া। আমি সব শুনেছি। এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না।

সুপর্ণা বললেন, তুই শুধু নিজেকে শক্ত কর।

কিন্তু তনুকার মনে হচ্ছে ওর মধ্যে আর যেন উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই, ও যেন গুঁড়ো

গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ছে। কোথাও কেউ সহায় নেই, সম্বলহীন।

অনুরূপ ওকে একেবারে ভেঙে দিয়ে গেছে। একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

তনুকা জানে সেই সুন্দর স্বপ্নটা আর কিছুই নয়, একটা মুক্ত আকাশের পাখিকে ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখা। খাঁচাটা সোনার হলেও সেটা যে খাঁচাই এটুকুই বোঝে না অনুরূপ, কোনওদিনই বুঝবে না। বাড়ির সামনে মার্বেলে বাঁধানো ছোট্ট একটা পুল বানিয়ে তার ধারে কয়েকশো ওয়াটার লিলি ফুটিয়ে তুললেই যে আনন্দে অবাক হওয়ার মুহূর্তটা ফিরে পাওয়া যায় না সেই অনুভবই তার নেই। পাথর বসানো আংটি, আর গুরুমার আশীর্বাদ যে ওর কাছে অসহ্য বন্ধন তা সে জানবে কি করে। আর এই সুরাট শহর! 'তুই কি শেষে ওখানে গিয়ে প্লেগে মরবি নাকি?' তপতী হেসে উঠেছিল। আই অ্যাম নট গোয়িং টু ম্যারি হিম। জোর দিয়ে বলেছিল তনুকা।

না, বিয়ে করতে পারবে না অনুরূপকে।

এখন মনে মনে বলছে, ওই কদিনের ওর ভালবাসা কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ো না। ওর ওপর আমার সেই ভালবাসা যেন সারাজীবন আমার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র অবলম্বন হয়ে থাকে।

—আমি যে ওকে ভালবাসি, ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি।

সোয়ামি হাসতে হাসতে বলছে, বর্তমানকে কেউ ভালবাসে না তনুকা, কেউ ভালবাসে না। বর্তমান দুদিনেই অতীত হয়ে যাবে, অস্পষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ ভালবাসে শুধু ভবিষ্যৎকে।

হাসতে হাসতে বলেছে, প্যান্ডোরাজ বক্স খোলার পর কি পাওয়া গিয়েছিল তুমি তা জানো। বিষাক্ত পোকামাকড়, আরো কত কি। কিন্তু শেষ অবধি মানুষের একটা পরম লাভ হয়েছিল কি জানো? কৌটোর সব নীচে ছিল 'হোপ' : আশা। ওটাই ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎকেই মানুষ ভালবাসে।

ভেঙে পড়া গলায় তনুকা বলেছে, কি ভবিষ্যৎই বা আছে! টেস্ট টিউব হাতে নিয়ে মিউটেশন করে করে একটা নতুন ধরনের ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার; যা কিনা শহরের আবর্জনা দূর করে দেবে। কিন্তু সমাজের মধ্যে যে গার্বেজ চতুর্দিকে, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে, সে আবর্জনা দূর করবে কি দিয়ে। কুসংস্কার, টাকার পিছনে দৌড়নো, অহঙ্কার, একটা সরল বিশ্বাসী পবিত্র মনের মেয়ের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা...এসব আবর্জনা তুমি দূর করবে কি দিয়ে!

সোয়ামি চুপ করে থেকেছে, উত্তর দিতে পারেনি।

তারপর ধীরে ধীরে বলেছে, বাট ইউ লাভ মি, বিলিভ ইট। তুমি আমাকে ভালবাসো, কারণ আমি তোমার কাছে একটা সিম্বল। তোমার ফিউচারের। আর তুমি তোমার ভবিষ্যৎকে ভালবাসো।

তনুকা বললে, আমি জানি, আমি জানি। তুমি যখন বললে, ইউ লাভ মি, অন্য কেউ বললে আমি তো হো হো করে হেসে উঠতাম। উঠিনি, বরং রেগে গিয়ে বলেছি, তুমি পাগল হয়ে গেছ। কেন জানো, কারণ ভেতরে ভেতরে আমি নিজেই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।

তারপরই আবার সেই ভেঙে পড়া গলা। তনুকা বললে, অনুরূপকে আমি বিয়ে করছি না, সুরাটে গিয়ে একজন প্রিন্সেস ইন বন্ডেজ হয়ে থাকতে চাই না। ফিরে এসে ফোন করলেই তা জানিয়ে দেব। কি ভাবে বলব সেটাই ভয়। একটা মানুষ আশা নিয়ে আছে, তাকে ফিরিয়ে দিতেও কম কষ্ট নয়।

তপতীকে বললে, বেচারি, ও বিশ্বাস করেছে আমি ওকে বিয়ে করব, বলতে কষ্ট হবে

রে। ও বড় কষ্ট পাবে।

একটু থেমে বললে, এভরিটাইম আই ফাইন্ড অ্যান ওয়েসিস, ইট টার্নস আউট টু বি এ মিরাজ। জল আর গাছ দেখে ছুটে যাই, দেখি সেটা মরীচিকা!

তারপর হঠাৎ জেদি মেয়ের মতো বলে উঠল, কিন্তু ওর ভালবাসা, আমি সারাজীবন আমার বুকের মধ্যে ধরে রাখব, কেউ সেটা ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

তপতী কোনও কথা বলল না, শুধু সমবেদনার একটা ম্লান হাসি হাসল।

দিনগুলো একে একে পার হয়ে যাচ্ছে। দিন, সপ্তাহ, মাসও পার হয়ে গেল।

সোয়ামি বলল, এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছ কেন, চলো না, একটু কোথাও গিয়ে বসি। তোমার সঙ্গে আমি যতক্ষণ বসে থাকি, দেবযানীর জন্যে আমার কষ্ট দূর হয়ে যায়।

তনুকা বললে, না, না, আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। হয়তো অনুরূপ ফোন করবে। হয়তো কোনও কারণে আটকে গিয়েছিল।

একটু থেমে বললে, সোয়ামি, তুমি একদিন বলেছিলে, বাড়ি ফিরে তোমার একটাই কাজ, একটাই কষ্ট। ফোনের কাছে বসে থাকা, তোমার ছেলে কি খবর পাঠায় দেবযানী সম্পর্কে।

—আঃ, মনে পড়িয়ো না, মনে পড়িয়ো না।

তনুকা হাসল, বিষণ্ণ হাসি। বলল, সেদিন কথাগুলো আমাকে স্পর্শও করেনি। আজ আমি বুঝতে পারছি, সেটা কি ধরনের যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা বুকের মধ্যে নিয়ে আমিও অপেক্ষা করি। হয়তো অনুরূপ ফোন করবে।

—না রে তপু, কাল রাত্রেও করেনি।

হতাশার কণ্ঠে তনুকা বললে।

তপতী বলল, তুই ভুলে যা, ভুলে যা। ও আর ফোন করবে না। আর কোনওদিন আসবেও না। দু' দিনের মোহ, ফিরে যেতেই ভেঙে গেছে। ভুল বুঝতে পেরেছে। দুটো অমিল ছন্দকে মিলিয়ে মিশিয়ে ছন্দে বাঁধা যায় না, সে কথা বুঝতে পেরেছে।

—আমার কিন্তু সে কথা বিশ্বাসই হচ্ছে না। অন্তত ভালবেসেছিল সে ব্যাপারে সন্দেহই নেই। বিয়ে হয়তো নাও করতে পারে, কি যায় আসে। আমিই তো চাইছি না।

তপতী হাসল। —তুই এত অবুঝ হয়ে গেছিস। সব বুঝিস, এটুকু বুঝলি না?

—কি?

—কেউ প্রেমে পড়লে প্রথমেই বলে না, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। কেউ এত অধৈর্য হয়ে লিফটের মধ্যে সুযোগ পেয়ে চুমু খায় না। তারপর তুই ভেবে দ্যাখ, তোকে নিজের হোটেলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

অল্পক্ষণ চুপচাপ।

তারপর তপতী আবার বলল, আমি প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম। লোকটার শুধু তোর শরীরের ওপর লোভ জন্মেছিল, আর কিছু নয়। আসলে তুই তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলি, তাই কিছুই দেখতে পাসনি, বুঝতে পারিসনি।

সমস্ত কথাগুলো যেন তনুকার মস্তিষ্কের কোষে কোষে গিয়ে আঘাত করল। সব যেন জলের মতো সহজ, স্পষ্ট। কোথাও কোনও অস্বচ্ছতা নেই।

তীব্র একটা রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হল তনুকার। যে শব্দ ও কোনওদিন উচ্চারণ

করবে বলে ভাবেনি, ওর মতো কোমল স্বভাবের একটা মেয়ের মুখ দিয়ে যা বেরোতে পারে না, তেমন একটা শব্দ।

তনুকা প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, দ্যাট বাস্টার্ড।

তবু সেদিন রাত্রে ফোন বাজতেই ছুটে গেল তনুকা। হয়তো অনুরূপ।

না।

—কে দীপ! হ্যাঁ, আমি বলছি।

ও প্রান্ত থেকে শোনা গেল, কেমন আছ তনু, তোমার জন্যে বড্ড ভাবনা হয়, আবার ভুল না করে বসো।

তনুকা চুপ।

ও প্রান্ত : কবে যেতে হবে বলো। গিয়ে সই করে দেব। বিয়ের সময় যেতে পারব না, নিজের চোখে দেখতে পারব না, কিছু মনে করো না।

তনুকা কিছুই বলতে পারছে না। বলতে পারছে না ও শুধু একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, ঘুম ভেঙে গেছে।

ও প্রান্ত : একেবারে যেন ভুলে যেও না আমাকে। আই ওয়ান্ট টু সি ইউ হ্যাপি। বাই।

ফোন নামিয়ে রেখে দিল তনুকা। বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা।

দিনের পর দিন। দিন, সপ্তাহ। আরও একটা মাস পেরিয়ে গেল।

কাজের মধ্যে ডুবে গেছে তনুকা। সেই আমেরিকা-ফেরত মাইক্রোবায়োলজিস্ট, যে একদিন ভেবেছিল, আমার ভবিষ্যৎকে আমি ফেলে যাচ্ছি।

ধীরে ধীরে গিয়ে নিজের রিসার্চ টেবলের সামনে বসল।

ব্যাকটিরিয়ার গতিবিধি দেখছে মাইক্রোসকোপে চোখ এঁটে। গতকালই একটু আশা দেখতে পেয়েছে। ও আর সোয়ামি, দুজনে মিলে একটা নতুন মিউটেশন করিয়েছে। একটা নোংরা মাইক্রোসকোপিক টুকরো টেস্ট টিউবে ফেলেছিল। আজ আর দেখতে পাচ্ছে না।

ওর ইচ্ছে হল আবার একবার ভাল করে দেখে সোয়ামির কাছে ছুটে যাবে, খবরটা দিতে।

তার আগেই আত্রেয়ী দেশপাণ্ডে নিজের চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে গুটি গুটি পায়ে ওর দিকে এগিয়ে এল।

চোখ তুলে তাকাল তনুকা, আত্রেয়ী কাছে এসে দাঁড়াতেই।

তনুকার ভুরুতে প্রশ্ন।

আত্রেয়ী ধীরে ধীরে বলল, তনুকা, সোয়ামি আজ সকালের ফ্লাইটেই বম্বে চলে গেছে। রাত্রে ফোন পেয়েছে, দেবযানীর অবস্থা খারাপ। এ মান্থ অর টু।

একটু থেমে বলল, সোয়ামি ওর স্ত্রীর পাশে থাকতে চায়, মৃত্যুর আগের শেষ কটা দিন। দু' মাসের ছুটি নিয়ে চলে গেছে।

আবার একটু থেমে : দেবযানী মারা গেলে, কোনওদিনই ফিরবে কি না কে জানে, আমার বড় ভয় হচ্ছে...

সোয়ামির জন্যে ভীষণ কষ্ট হল। কই, অনুরূপকে 'বাস্টার্ড' বলে ফেলার পর এমন তো লাগে নি। বরং একটা প্রশান্তি অনুভব করেছিল।

আবার সেই ভয়েড। কোথাও কিছু নেই যেন।

কোনও কথা না বলে তনুকা সাততলায় উঠে গেল। লিফটে।

অকারণ সোয়ামির ঘরে ঢুকল। সোয়ামির চেয়ারটা পড়ে আছে, অসীম শূন্যতা। সারা ঘর ওর বুকের মতোই ফাঁকা।

সেকালে প্রেমিককেই হয়তো নির্বাসনে পাঠানো হত। শুধু দেবদত্তই নয়, মেঘদূতের যক্ষকেও হয়তো সেই একই অপরাধে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল রামগিরিতে। একালে নির্বাসন দেওয়া হয় শুধু সুতনুকাদের।

তনুকার মনে হল নির্বাসনই তো।

অনুরূপ হয়তো ওকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, কিংবা ভুলে যেতে চায়। নির্বোধ, নির্বোধ। ও কি ভেবেছে, তনুকা সত্যি বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে! উন্মাদ যদি ও হয়েই থাকে, সে শুধু অনুরূপের ভালবাসার জন্যে। একটা বন্ধনহীন ভালবাসা তো সে বাঁচিয়ে রাখতে পারত। নির্বাসনে থেকেও সারাজীবনের জন্যে সেই প্রেমের স্মৃতিটুকু অন্তত তনুকার একমাত্র পুঁজি হয়ে থাকতে পারত। আজ আর তাও অবশিষ্ট নেই। এখন অনুরূপ আমার কাছে শুধুই একজন প্রবঞ্চক। এ চীট, এ ড্যামনড্ চীট।

অনুরূপ তুমি জানো না, যদি সত্যি এই শরীরের ওপর তোমার লোভ ছিল, তোমার নিখাদ ভালবাসার প্রতিদানে আমি তা কত সহজে উৎসর্গ করতে পারতাম। কারণ, আমি যে শুধুই ভালবাসার কাঙাল, যা আমি জীবনে কোনওদিনই পাইনি।

এভাবে তুমি আমাকে নির্বাসন দিয়ে গেলে কেন। এখন যে সমস্ত ভালবাসা কেড়ে নিয়ে তুমি আমার মনের মধ্যে তোমার প্রতি শুধুই অসীম ঘৃণা রেখে গেছ। শুধুই ঘৃণা।

সোয়ামিও চলে গেছে। যাকে আমি আমার পরম বন্ধু মনে করেছিলাম। আমরা পরস্পর কত সহজে একজনের নিঃস্বতা দিয়ে আরেকজনের নিঃস্বতা দূর করে দিয়েছিলাম। সোয়ামি, তোমাকে আমি কোনওদিন আমার ভবিষ্যতের প্রতীক ভাবিনি, শুধু মনে হয়েছিল আমার যন্ত্রণার গভীরে একটি প্রশান্ত স্পর্শ। শেষে তুমিও আমাকে নির্বাসন দিয়ে চলে গেলে। এই সায়েন্টিফিক সেন্টার আজ আমার কাছে অর্থহীন, হৃদয়হীন।

তনুকা নিজেই এখন এই পৃথিবীতে একটা নিরর্থ জীবাণু। একটা আননেসেসারি মাইক্রোব। তার বেশি কিছু নয়।

বিষণ্ণ মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এল তনুকা। অনুরূপ ওর শূন্যতা ভরে দিয়েছিল। এখন সেখানে শুধুই মানুষের ওপর অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই। হায়, শরীরের যে সৌন্দর্য সেই ছেলেবেলা থেকে ওকে আত্মতুষ্টি দিয়ে এসেছে সেটাই আজ মনে হচ্ছে ওর প্রধান শত্রু। সেই রূপের আড়ালে যে একটা নরম স্নিগ্ধ মন আছে কেউ তার খোঁজ রাখতে চায়নি।

সোয়ামি একটা পথ দেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু সেও বোধহয় আর ফিরবে না।

একদিন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, দেবযানী যদি মারা যায়, তা হ'লে আর জীবনের কোনও অর্থ থাকবে না আমার কাছে। আমি আর কিছুই করতে পারব না। আই উইল বি এ ডেড ম্যান।

তনুকা বলেছে, কেন ভয় পাচ্ছ। আমি তো থাকব, তোমার পাশে পাশে, সব সময়।

সোয়ামি তনুকার দিকে তাকিয়ে হেসেছে শুধু।

অনেক দিন আগে, তনুকা যখন মুগ্ধ আনন্দে ওর প্রেমে পড়ার অনুভূতির কথা বলছে সোয়ামিকে সেই দিনের কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেল।

সোয়ামি বলেছিল, তনুকা, লাভ ইজ লাইক এ ল্যাবিরিন্থ, ওর মধ্যে ঢুকে পড়া খুব সহজ, যে কেউ ঢুকতে পারে। কিন্তু ওই গোলকধাঁধা তোমাকে কোথাও পৌঁছে দিতে পারে না, শুধুই ঘুরতে হয়, ঘুরতে হয়। বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল তনুকা। একাই। আজ আর শূন্যতা দূর করার জন্যে সঙ্গে কোনও সোয়ামি নেই। যে লোকটা হয়তো ওকে গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ বাতলে দিতে পারত।

নিজেই মনে মনে বলল, আই ফীল সো হিউমিলিয়েটেড অনুরূপ। তুমি আমাকে এভাবে অপমান করলে কেন ? আমার মন নিয়ে এই ছিনিমিনি, কেন কেন কেন ?

প্রদীপ্ত, দীপ, তুমি আর প্লিজ আমাকে ফোন করে জানতে চেয়ো না বিয়েটা কবে, কখন। ডিভোর্স তাড়াতাড়ি দিতে হবে কিনা। তোমার ওই প্রশ্নগুলোও আমাকে এখন অপমান করে।

আবার ভেঙে পড়েছে তনুকা। শরীরে কোনও শক্তি নেই। জীবনে কোথাও যেন কোনও আশ্রয় নেই।

ফিরে এসে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেও পারছে না।

ঘরে ঢুকে ডিভানের ওপর বসে পড়তেই সুপর্ণা বললেন, তোর একটা চিঠি আছে।

এনে দিলেন।

কোনও কৌতূহল নেই এখন আর। দেখল আমেরিকার চিঠি। কে লিখেছে ? প্রদীপ্ত নাকি ? তা হ'লে এখন আর পড়ে দেখারও ইচ্ছে হবে না।

না, সেই রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এচেভেরিয়া, সেই সহৃদয় ইহুদি ভদ্রলোক।

চিঠিটা খুলে পড়ল।

পড়তে পড়তে হঠাৎ যেন শরীরে শক্তি এল। সোজা হয়ে বসল। দীর্ঘ চিঠি।

তনুকা চিৎকার করে ডাকল, মা।

সুপর্ণা আসতেই চিঠিটা এগিয়ে দিল তনুকা। মুখে সেই হারিয়ে যাওয়া হাসি।

এচেভেরিয়া লিখেছে, তুমি শীগগির চলে এসো এখানে। এ ব্রাইট ফিউচার ইজ ওয়েটিং ফর ইউ। চলে যাওয়ার আগে যে রিসার্চ রিপোর্ট দিয়ে গিয়েছিলে, কেউ চেপে রেখেছিল, এখন সেটা নিয়ে তুমুল সেনসেশন। ইনস্টিটিউট তোমাকে ফিরে পেতে চায়। চলে এস টাঙ্কা।

তনুকার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বেশ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে করে বলল, 'সোয়ামি, আই হ্যাভ কাম আউট অব দি ল্যাবিরিন্থ। গোলকধাঁধা থেকে বেরোনোর রাস্তা পেয়ে গেছি। ধন্যবাদ সোয়ামি, ধন্যবাদ অনুরূপ। আমি আবার মুক্ত। উড়ে বেড়াবার আবার একটা আকাশ পেয়ে গেছি।

---